হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ।

তৃতীয় খণ্ড।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ

তৃতীয় খণ্ড

সম্পাদনা

দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৮২

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা-৭০০০২৯

প্রচ্ছদপট
চারু খান

অক্ষরবিন্যাস
ওয়ার্ডওয়ার্কস
৭২/৩এফ/১, আর কে চ্যাটার্জী রোড
কলিকাতা-৭০০০৪২

মুদ্রক
ট্রায়ো প্রসেস
পি ১২৮ সি. আই. টি. রোড
কলকাতা-৭০০০১৪

নিবেদন

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ১৩১তম জন্মদিনে রচনা-সংগ্রহের তৃতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হল। মাতৃভাষায় উচ্চতর শিক্ষায় প্রয়োজনীয় পাঠ্য ও সহায়ক গ্রন্থ প্রকাশ রাজ্য-পুস্তক-পর্যদের নীতি। এই মূল নীতি অনুযায়ী মানবিকী-বিদ্যার নানা শাখায় পঠন-পাঠনে একান্ত প্রয়োজনীয় শাস্ত্রীমশায়ের বাংলা রচনাগুলি বিষয় অনুসারে এক-একটি খণ্ডে সংকলনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এসব রচনা দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত ছিল। শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে নৈহাটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গবেষণা-কেন্দ্র বিস্তৃত প্রাসঙ্গিক তথ্য সংযোজন করে এই রচনা-সংগ্রহ সম্পাদন করছেন। প্রথম খণ্ড দুটি বিদ্বৎসমাজে অতি মূল্যবান্ প্রকাশন রূপে গৃহীত হয়েছে। তৃতীয় খণ্ডে বৌদ্ধবিদ্যা বিষয়ে শাস্ত্রীমশায়ের যাবতীয় প্রবন্ধ এবং প্রাচীন পণ্ডিতদের পরিচয়-মূলক দশটি রচনা সংকলন করা হয়েছে। ভারতীয় সাংস্কৃতিক ইতিহাস চর্চায় অমূল্য সহায় এইসব প্রবন্ধ একত্র সমাহৃত হওয়ার সুযোগ করে দিতে পারায় আমরা কৃতার্থ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, প্রকাশনার ব্যয় অত্যন্ত বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক শম্ভু ঘোষের নির্দেশে এই রচনা-সংগ্রহের দাম সাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখবার চেষ্টা করা হচ্ছে।

কলকাতা

৬ ডিসেম্বর ১৯৮২

বিষয়সূচি

পৃষ্ঠাঙ্ক

কুঞ্চিকা

চ-গী-প	'চর্যাগীতি-পদাবলী', সুকুমার সেন, বর্ধমান, ১৯৭৩ খৃ.।
বা-ই	'বাঙ্গালীর ইতিহাস', আদিপর্ব ; নীহাররঞ্জন রায়, কলকাতা, ১৩৫৮ ব.।
বা-ঙ্গা-ই	'বাঙ্গালার ইতিহাস', প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৯৭৪ খৃ.।
বা-সা-ই	'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', সুকুমার সেন, প্রথম খণ্ড, পূর্বার্ধ, কলকাতা ১৯৭০, অপরার্ধ, কলকাতা ১৯৭৫ খৃ.।
বৌ-গা-দো	'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা', হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কলকাতা ১৩২৩ ব.।
সং-সা-বা-দা	'সংস্কৃত সাহিত্যে বাঙ্গালীর দান', সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা ১৩৬৯ ব.।
সা-প-প	সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা।
স্মারকগ্রন্থ	'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী স্মারকগ্রন্থ', সত্যজিৎ চৌধুরী-দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য-নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত সম্পাদিত, কলকাতা ১৯৭৮ খৃ.।
হ-র-সং	'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনা-সংগ্রহ'।
A-I	*Ancient India*, R. C. Majumdar, Delhi, 1974.
B-M	*Buddhist Monuments*, Debala Mitra, Calcutta 1971.
C-H-I	*The Cultural Heritage of India*, Calcutta, 2nd Edition.
E-B	*Encyclopaedia of Buddhism*, G. P. Malalasekera ed., Srilanka.
G-O-S	*Gaekwad's Oriental Series*, Oriental Institute, Baroda.
HB-1	*The History of Bengal*, Vol. I, R. C. Majumdar ed., Dacca 1963.
*H-B-I-*1	*History of Buddhism in India*, Tāranath, Tr. Lama Chimpa and Alaka Chattopadhyaya, Calcutta 1980.
H-I-L	*History of Indian Literature*, M. Winterinitz, New Delhi 1977.
H-I-Lc	*A History of Indian Logic*, Satish Chandra Vidyabhusana. Delhi 1971.

H-I-P	*A History of Indian Philosophy*, S. N. Dasgupta, Cambridge 1952.
H-O-L	*History of Oriya Literature*, Mayadhar Mansinha, Sahitya Akademi, New Delhi 1962.
H-S-L	*A History of Sanskrit Literature*, S. N. Dasgupta, S. K. De, Calcutta 1975.
I-B-I	*The Indian Buddhist Iconography*, Benoytosh Bhattacharya, Calcutta 1968.
I-H-Q	*Indian Historical Quarterly*.
I-P-L-S	*Indian Pandits in the Land of Snow*, Sarat Chandra Das, Calcutta 1965.
J-A-S-B	*Journal of the Asiatic Society of Bengal.*
J-B-O-R-S	*Journal of the Bihar and Orissa Research Society.*
L-L-M-I	*Languages and Literature of Modern India*, Suniti Kumar Chatterjee, Calcutta.
M-A-S-B	*Memoirs, Asiatic Society of Bengal.*
Mitra-Notices	*Notices of Sanskrit MSS.*, First Series, Rajendralal Mitra.
Notices-Shastri	*Notices of Sanskrit MSS., Second Series*, Haraprasad Shastri.
O-R-C	*Obscure Religious Cults*, S. B. Dasgupta, Calcutta 1946.
S-B-L-N	*The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*, Rajendralal Mitra, Calcutta 1882.
S-I-I	*Select Inscriptions*, D. C. Sircar, Vol-I, Calcutta 1942.
Shastri-Cat.	*A Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Govt. Collection under the the care of The Asiatic Society of Bengal*, Haraprasad Shastri ed.
S-M-II	*Sādhanamālā*, Vol. 11, Benoytosh Bhattacharya, Beroda 1968.
2500 years	*2500 years of Buddhism*, P. V. Bapat ed., New Delhi 1976.

ভূমিকা

রচনা-সংগ্রহের তৃতীয় খণ্ডে বৌদ্ধবিদ্যা বিষয়ে হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য শাস্ত্রীর (১৮৫৩-১৯৩১ খৃ.) যাবতীয় বাংলা রচনা এবং পুরানো কালের পণ্ডিতদের জীবন ও কীর্তির সমীক্ষা— দশটি প্রবন্ধ সংকলন করা হল।

২

শাস্ত্রীমশায়ের সারা জীবনের আগ্রহ ও অনুশীলনের বিষয়গুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধবিদ্যা। ছাত্র বয়সে তিনি বঙ্কিমচন্দ্র এবং 'বঙ্গদর্শনে'র লেখকদের সংস্পর্শে আসেন। 'বঙ্গদর্শনে'র মূল ভাবনামন্ত্রের মধ্যে একটি ছিল দেশের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার। আমাদের আধুনিক বিদ্যাচর্চার আর-সব বিষয়ের মতো ইতিহাস-চর্চার প্রাথমিক দীক্ষাও ইংরেজ লেখকদের কাছে। কিন্তু ইংরেজের লেখা এদেশের ইতিহাসে নবাব-বাদশাহ্‌দের শাসন পদ্ধতি আর তাঁদের ব্যক্তিপরিচয় ভিন্ন অন্য তথ্য বিশেষ পাওয়া যেত না। ইংরেজ শাসনের অনিবার্যতা এবং শুভফল প্রতিপন্ন করার গূঢ় উদ্দেশ্যে এসব ইতিহাসে তথ্যের বিশ্লেষণ করা হত বিকৃত ভাবে। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' বইটির সমালোচনায় "বাঙ্গালার ইতিহাস" প্রবন্ধে ('বঙ্গদর্শন' মাঘ ১২৮১ ব.) বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস রচনার মূল দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্ন তোলেন। ছোটো এই বইটিকে তিনি "সুবর্ণের মুষ্টি" বলেছিলেন, কারণ, "ইহা কেবল রাজগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকা মাত্র নহে; ইহা প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস"। (পৃ. ৪৫০)। অগ্রহায়ণ ১২৮৭-র 'বঙ্গদর্শনে' "বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" প্রবন্ধে তিনি স্পষ্ট ভাষায় স্টুয়ার্ট, মার্শম্যান, লেথ্‌ব্রিজদের সাম্রাজ্যিক অভিপ্রায়মূলক ইতিহাসের সমালোচনা করে বললেন, "বাঙ্গালী জাতির ইতিহাস ইহাতে কিছুই নাই।" (পৃ. ৩৬৩)। স্বদেশের ইতিহাসের তথ্য নিজেদেরই অনুসন্ধান করতে হবে— এই আহ্বান জানাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রবন্ধটিতে তিনি

অনুসন্ধানের বিষয়-সূচি নির্দেশ করে দিয়েছিলেন। বিভিন্ন যুগের কৃষি ও কারুশিল্পের উৎপাদন থেকে সাহিত্য-ললিতকলা ধর্ম-দর্শন অবধি যাবতীয় মানবিক গতিবিধি এই বিষয়-সূচির অন্তর্গত। বিশেষ যুগের সমাজ-কাঠামোর বাস্তব ভিত্তি, সমাজের বিভিন্ন বর্গের মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, গোটা সমাজের স্তরে স্তরে বৈষয়িক ও মানসিক সৃষ্টির প্রক্রিয়া নিরূপণ এই ইতিহাস ভাবনার কেন্দ্রীয় তত্ত্ব। এর কিছু আগে, শ্রাবণ ১২৮৫-র 'বঙ্গদর্শনে' "প্রাচীন ভারতবর্ষ" প্রবন্ধে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ইতিহাস-চর্চার নতুন তত্ত্বগত অবস্থান সম্পর্কে লিখেছিলেন, "...রাজা বা সেনানীর জীবনবৃত্তান্ত ইতিহাস নহে। ব্যক্তিবিশেষের কার্য্যাবলী ইতিহাসের পটে অবস্থান মাত্র অধিকার করিতে পারে; সমাজের পরিবর্ত্তন প্রদর্শনই ইতিহাসের প্রকৃত বিষয়। সুতরাং ঐতিহাসিক চিত্রে রাজা অপেক্ষা সর্ব্বসাধারণ প্রজাগণের প্রাধান্য ' লোকের রীতি, নীতি, জ্ঞান, ধর্ম্ম, শিল্প, শাস্ত্র, কৃষি, বাণিজ্য, ধন, বল প্রভৃতি কালে কালে কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, ইহা লিপিবদ্ধ করাই ইতিহাসের প্রধান উদ্দেশ্য।" (পৃ. ১৭৫)। সমকালীন ইতিহাস-চেতনা একটা যুক্তিযুক্ত ভিত্তি পায় এই তত্ত্বে। সচল, বিবর্তমান সমাজ সম্পর্কে সর্বতোমুখ জিজ্ঞাসা জাগে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে এবং রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেনের মতো লেখকেরা এদেশের দূরতর কালের সমাজ বিন্যাসে ভাঙাগড়া, শিল্প-সাহিত্যের নজির, ধর্ম ও দর্শন ভাবনার বিবর্তন নিয়ে তখন পর্যন্ত জানা তথ্য-নির্ভর আলোচনা শুরু করেছিলেন। এ'দের লেখায় খুব দৃঢ় সিদ্ধান্ত হয় তো আসে নি। কিন্তু আনার্য ভারতে আর্য অনুপ্রবেশের ফলাফল, ব্রাহ্মণ্য-বিরোধী বৌদ্ধ-জৈন-লোকায়ত ধর্মের অভ্যুদয়ের সামাজিক কারণ সন্ধান বা পরবর্তী হিন্দু সমাজের গড়ন বোঝবার চেষ্টায় ভারতীয় মানুষের বাস্তব সচল ইতিহাস সন্ধানের দৃষ্টি ক্রমে পরিপুষ্ট হয়েছে।

কৃতী ছাত্র এবং জিজ্ঞাসু তরুণ হরপ্রসাদ যে 'বঙ্গদর্শনে'র ইতিহাস-চর্চার এই পরিবেশ থেকে মনের দৃষ্টি আহরণ করবেন এ খুব স্বাভাবিক। কনিষ্ঠ সহযোগী হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের "মজলিসে" তাঁর মর্যাদা কম ছিল না। ইতিহাস-বিষয়ে লেখার তথ্যের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপরে নির্ভর করতেন। (হ-র-সং-২, পৃ. ২০ দ্র.)। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে যে হরপ্রসাদ নিজের রচনার বিষয় সম্পর্কে মূল্যবান ইঙ্গিত-

পরামর্শ পেতেন— দু জনের লেখার বিষয় মিলিয়ে দেখলে তা বোঝা যায়। বিশেষভাবে বৌদ্ধবিদ্যার গুরুত্ব সম্পর্কে হরপ্রসাদ রামদাস সেনের লেখার দৃষ্টান্তে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। ১৮৭০ খৃস্টাব্দে লেখা "On The Modern Buddhistic Researches" ('রামদাস-গ্রন্থাবলী', তৃতীয় ভাগ, বহরমপুর ১৩২২ ব.) প্রবন্ধে আমাদের এশিয়াটিক সোসাইটি ও বিশ্বের অন্যান্য বিদ্যাকেন্দ্রে বৌদ্ধবিদ্যা-চর্চার ধারার সঙ্গে রামদাস সেনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের এবং দেশের বৌদ্ধ প্রত্ন-নিদর্শন সম্পর্কে তাঁর সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার প্রমাণ পাওয়া যাবে। 'বঙ্গদর্শনে' তিনি লেখেন "আর্যগণ ধর্ম্ম সাধন করিতে গিয়া নিষ্ঠুরতার একশেষ উদাহরণ প্রদর্শন করিলেন। এ সময় সমাজের বিপ্লব নিতান্ত আবশ্যক, বিপ্লব না হইলে সমাজের মঙ্গল হওয়া দুরপরাহত। …মনুষ্যের মনোমধ্যে অভিনব চিন্তায় অবতারবৎ সমাজের পরিত্রাতা শাক্যসিংহ উদয় হইলেন।" ("বৌদ্ধ ধর্ম্ম", 'বঙ্গদর্শন' জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ ব., পৃ. ৪৯)। "বৌদ্ধ আচার্য্য প্রণীত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে ; কিন্তু আমাদিগের আর্যশাস্ত্র ব্যবসায়িগণ তাহার নাম পর্যন্ত শ্রবণ করেন নাই। তাঁহারা প্রবোধ চন্দ্রোদয় নাটক এবং সর্বদর্শন সংগ্রহ মধ্যে যেটুকু বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিবরণ আছে তাহাই জানেন মাত্র ; কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদিগের কোন২ বঙ্গদেশীয় সামান্য নৈয়ায়িক, ভাষাপরিচ্ছেদ, সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী এবং কিয়দংশ কুসুমাঞ্জলি পড়িয়াই বৌদ্ধমতে দোষারোপ করিতে উদ্যত হইয়া থাকেন। তাঁহারা মূল বৌদ্ধসূত্র সকল পাঠ করিলে এরূপ বালসুলভ চাপল্য প্রকাশ করিতে কখনই সাহসী হইতেন না।" (পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ. ৬৫)। কথা-গুলো মৌলিক নয়। কিন্তু রামদাস সেনের লেখার ধরনে দেশের ইতিহাসের দিক থেকে বৌদ্ধবিদ্যা-চর্চার গুরুত্বের উপরে জোর পড়ত। জৈনধর্ম সম্পর্কেও তিনি 'বঙ্গদর্শনে' লিখেছেন। ১২৮২ সালেই তাঁর লেখা "পালি ভাষা ও তৎসমালোচন" (মাঘ সংখ্যা) এবং "বৌদ্ধ মত ও তৎসমালোচন" (ফাল্গুন সংখ্যা) প্রবন্ধ দুটি প্রকাশিত হয়েছিল।

এঁদের সাহচর্যে হরপ্রসাদ অনুভব করতে পারছিলেন, ইতিহাস-চর্চার বাঁধা ছক ভেঙে যাচ্ছে। অনুসন্ধান এবং বিচারের দিগন্ত প্রসারিত হচ্ছে। বুঝতে পারছিলেন, প্রাচীন ভারতীয় সমাজের বাস্তবতা শুধু আর্য-তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। 'বঙ্গদর্শনে'ই তিনি বৌদ্ধবিদ্যা বিষয়ে

তাঁর জীবনের প্রথম প্রবন্ধ "ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ" (শ্রাবণ ১২৮৪ ব.) লেখেন।

১৮৭৭-এ এম. এ. পাশ করে বেরোবার পরেই হরপ্রসাদ রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেলেন। ভারতে প্রাচ্যবিদ্যা-চর্চার মূল কেন্দ্র এশিয়াটিক সোসাইটিতে রাজেন্দ্রলাল ১৮৪৬ খৃস্টাব্দে লাইব্রেরিয়ান এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি পদে চাকরি নিয়েছিলেন। মাইনে ছিল একশো টাকা। ১৮৫৬-র ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনি এই চাকরিতে ছিলেন। তার পরে জুনে সোসাইটির কাউন্সিল-সদস্য হন এবং ক্রমে সম্পাদক, সহ-সভাপতি এবং ১৮৮৫তে সভাপতি হয়েছিলেন। হরপ্রসাদ ১৮৭৮-এ রাজেন্দ্রলালের কাজে সাহায্য করতে এলেন, তখন রাজেন্দ্রলাল সোসাইটির সহ-সভাপতি। চাকুরে হিসেবে সোসাইটিতে এলেও রাজেন্দ্রলাল ধরাবাঁধা কাজের মধ্যে আটকা থাকেন নি, প্রথম থেকেই এখানে নিজের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ করে নিয়েছিলেন। ১৮৪৭ থেকে সোসাইটির জর্নাল ও প্রসিডিংস্-এ এবং অন্যান্য পত্রিকায় তাঁর রচনা প্রকাশিত হয়ে এসেছে। ১৮৭৮, অর্থাৎ হরপ্রসাদ যখন তাঁর সঙ্গে কাজ করতে এলেন তার মধ্যে ৭০টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এসব প্রবন্ধের বিষয় শিলালিপি, মুদ্রা, প্রত্ন-নিদর্শন এবং প্রাচীন পুথির পর্যালোচনা। ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল *The Antiquities of Orissa* (প্রথম খণ্ড, ১৮৭৫ খৃ.), *An Introduction to the Lalita Vistara* (১৮৭৭ খৃ.), *Buddha Gayā, the Hermitage of Śākya Muni* (১৮৭৮ খৃ.) বই তিনটি। ১৮৭০ থেকে *Notices of Sanskrit Manuscripts* প্রকাশ শুরু করেছিলেন। হরপ্রসাদকে রাজেন্দ্রলাল যখন কাছে টেনে নিলেন তখন তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির গবেষণা প্রকল্পে পূর্ণ কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত। 'বঙ্গদর্শনে'র পরিবেশ থেকে হরপ্রসাদ যে ইতিহাসের দৃষ্টি আহরণ করেছিলেন রাজেন্দ্রলালের দৃষ্টির সঙ্গে তার কোনো বিরোধ ছিল না। রাজবৃত্তের পরিচয়কে রাজেন্দ্রলালও ইতিহাসের সারকথা মনে করেন নি। প্রাচীন স্বদেশের অবসিত অতীতের তথ্য উদ্ধারে তাঁরও লক্ষ্য ছিল সামাজিক জীবন-যাত্রার যথাসম্ভব সামগ্রিক পরিচয় প্রস্ফুট করে তোলা। তাই সাহিত্যের এবং ভাস্কর্যের দৃষ্টান্ত থেকে দূর কালের মানুষের বাস্তব জীবনের চেহারা

ফুটিয়ে তুলতেন ঘরবাড়ি তৈরি, বাড়ির সাজসজ্জা, পোশাক-আশাক, যানবাহন, তৈজস, অস্ত্রশস্ত্র কিংবা পান ভোজনের অভ্যাসের খুঁটিনাটি বিবরণে। তাঁর পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণে ভারতীয় সামাজিক জীবন সম্পর্কে বুকানন্ হ্যামিল্টন বা ফার্গুসনের মতো লেখকদের অনেক উদ্‌ভট তত্ত্ব খারিজ হয়ে যায়। রাজেন্দ্রলাল ভারতবর্ষের বা বাংলা দেশের কোনো পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করেছিলেন, "কি বাঙ্গালী, কি ইংরেজ, সকলের অপেক্ষা যিনি এই দুরূহ কার্যের [বাংলার ইতিহাস রচনার] যোগ্য, তিনি ইহাতে প্রবৃত্ত হইলেন না। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মনে করিলে স্বদেশের পুরাবৃত্তের উদ্ধার করিতে পারিতেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি যে এ পরিশ্রম স্বীকার করিবেন, আমরা এত ভরসা করিতে পারি না।" ('বঙ্গদর্শন', মাঘ ১২৮১ ব., পৃ. ৪৪৯-৫০)। 'বঙ্গদর্শনে' ইতিহাস বিষয়ে আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র এবং অন্যান্য সকলেই রাজেন্দ্রলালের রচনার উপরে নির্ভর করতেন। 'বঙ্গদর্শনে'র আবহাওয়ায় মানুষ হরপ্রসাদ তাই রাজেন্দ্রলালের কাছে কাজ করতে গিয়ে মনে কোনো বাধা পান নি। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে হরপ্রসাদের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন। তারপর থেকে দু জনের ঘনিষ্ঠতার বিবরণ ননীগোপাল মজুমদার সংকলিত "চল্লিশ বৎসর পূর্বে : রাজেন্দ্রলাল মিত্র" প্রবন্ধে ('স্মারকগ্রন্থ' দ্র.) শাস্ত্রীমশায়ের অনবদ্য আলাপচারি থেকেই জানা যায়। অনুভব করা যায়, ক্রমে হরপ্রসাদ রাজেন্দ্রলালের কত বড়ো অবলম্বন, কতখানি মমতার পাত্র হয়ে উঠেছিলেন। প্রাচ্যবিদ্যার, বিশেষত বৌদ্ধবিদ্যার গবেষণায় হরপ্রসাদ একান্তভাবে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের হাতে গড়া এবং তাঁর যোগ্য ওয়ারিশ।

৩.

বৌদ্ধবিদ্যা অনুশীলনে শাস্ত্রীমশায়ের প্রস্তুতি এবং মনীষা বিকাশের আলোচনায় রাজেন্দ্রলালের কাছে দীক্ষার গুরুত্ব যেমন মনে রাখতে হয়, তেমনি মনে রাখা দরকার যে আবিশ্ব মানব-সংস্কৃতির এই বিশেষ দিকটির আধুনিক চর্চা কোনো একজন তত্ত্বানুসন্ধানীর কৃতিত্বে অকস্মাৎ শুরু হয় নি। প্রাচ্যের প্রকৃতি এবং মানুষ সম্পর্কে আধুনিক ইউরোপে ক্রমিক

ঔৎসুক্য বিস্তারের সঙ্গে প্রাচ্যবিদ্যার এক প্রধান শাখা বৌদ্ধবিদ্যা-চর্চার ধারাবাহিক বিকাশ ঘটেছে। বিজ্ঞান বা মানববিদ্যার সব আধুনিক গবেষণাতেই কাজ চলে দুই স্তরে : তথ্য আবিষ্কার ও জানা তথ্যের শ্রেণীবিন্যাস এবং শৃঙ্খলাময় মনন-পদ্ধতি প্রয়োগ করে যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত বের করে আনা। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বৌদ্ধবিদ্যা-চর্চার ইতিহাসেও এইভাবে ক্রমান্বয়ে কাজ এগিয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশে বৌদ্ধ প্রত্নকীর্তির প্রচুর নিদর্শন পাওয়া গেল। ১৭৮৪ খৃস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পর থেকে ভারতের প্রত্ন-নিদর্শন খোঁজার কাজ চলে এসেছে। ১৮৬১ খৃস্টাব্দে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া নামে সরকারি সংস্থা প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত প্রধানত এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্যোগে খুব সংগঠিতভাবে না হলেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়েছিল। চার্লস উইলকিন্‌স Charles Wilkins (১৭৪৯/৫০-১৮৩৬ খৃ.), হোরেস হেম্যান উইলসন Horace Hayman Wilson (১৭৮৬-১৮৬০ খৃ), জেম্‌স ফার্গুসন James Fergusson (১৮০৮-৮৩ খৃ.), জেম্‌স প্রিন্সেপ James Prinsep (১৭৯৯-১৮৪০ খৃ.) প্রত্ন-নিদর্শন সন্ধান এবং প্রাচীন লিপির পাঠ উদ্ধারে ইতিহাসের অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে বৌদ্ধযুগের পরিচয় উন্মোচনেরও সূচনা করেছিলেন। ১৮৬১তে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার প্রথম সার্ভেয়ার নিযুক্ত হবার আগেই আলেকজাণ্ডার কানিংহ্যাম Alexander Cunningham (১৮১৪-৯৩ খৃ:) পঞ্জাবের মানিকিয়ালা বৌদ্ধস্তূপ, সারনাথ, ভিল্‌সাস্তূপ নিয়ে কাজ করেছিলেন। সরকারি সমীক্ষক নিযুক্ত হবার পরে তিনি এই নতুন সংস্থার উদ্যোগে শৃঙ্খলাবদ্ধ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাজের ধারা প্রবর্তন করার সুযোগ পেলেন। তাঁরই নেতৃত্বে ফা-হিয়েন ও হিউয়েন্‌-ৎসাঙের বিবরণ অনুযায়ী প্রাচীন বৌদ্ধ তীর্থগুলির সঠিক অবস্থান ও পরিচয় পুনরুদ্ধার করা শুরু হয়েছিল। ক্রমে বুদ্ধদেবের জন্ম-মৃত্যু এবং কর্ম ও কীর্তির সঙ্গে জড়িত জায়গাগুলি চিহ্নিত করা সম্ভব হল। ভারতীয় সংস্কৃতির এক সমৃদ্ধ যুগের বিস্ময়কর সব স্মারক গোচরে এল। ব্রাহ্মণ্য-বিরোধী বৌদ্ধধর্মের উত্থান এবং ব্যাপক বিস্তার সম্পর্কে এইসব সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত ভারতীয় ইতিহাসের কালানুক্রম, পর্ব-পর্বান্তর সম্পর্কে ধারণা বদলে দেয়। প্রশ্ন ওঠে, উদ্ভবভূমি থেকে বৌদ্ধধর্ম কী করে একেবারে উৎখাত হয়ে

গেল। অন্য দিকে জানা গেল, প্রাচ্যের যেসব দেশ বৌদ্ধধর্মে আশ্রিত রয়ে গেছে— সে দেশগুলির বৌদ্ধ সংস্কৃতির রূপ এক নয়। মান্য শাস্ত্র, দর্শন এবং আচারবিধিতে অনেক প্রভেদ। যেমন, তিব্বতীয় বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কৃতি এবং শ্রীলংকার ধর্মসংস্কৃতিতে প্রায় মৌলিক তফাত। তাই স্থাপত্য-ভাস্কর্য-চিত্রকলা এবং শাস্ত্রগ্রন্থের নজির আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে আদি ও মূল বৌদ্ধ মতবাদ এবং পরবর্তী বিকাশ-বিবর্তনের স্তরগুলি নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করার প্রয়োজন দেখা দিল। প্রাচ্যবিদ্যার এই শাখা ক্রমে আন্তর্জাতিক গবেষক মণ্ডলীর নিবিষ্ট চর্চা ও অনুধ্যানের বিষয় হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন বিদ্যাকেন্দ্রের কাজের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার সেতু রচিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে প্রাচ্যভুবনের সভ্যতা-সংস্কৃতির এই জটিল ও পরিব্যাপ্ত শাখাটির উৎসভূমি ভারতবর্ষ সর্বদা গবেষকদের বিচার-বিবেচনার কেন্দ্রে থেকেছে।

ষোড়শ শতাব্দী থেকে পর্তুগিজদের মাধ্যমে ব্রহ্মদেশ, শ্রীলংকা প্রভৃতি দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির বৌদ্ধধর্মের খবর ইউরোপে অল্পবিস্তর পৌঁছেছিল। উনবিংশ শতাব্দীর আগে অবধি বৌদ্ধবিদ্যায় আগ্রহী পণ্ডিতেরা এই দক্ষিণী বৌদ্ধধর্মেরই ইতিহাস অনুশীলন করেছেন। পালিভাষায় নিবদ্ধ বৌদ্ধশাস্ত্রের বাইরে এই ধর্মের আর-কোনো রূপ তখন জানা ছিল না। বৌদ্ধ-সংস্কৃতির ভিন্ন আর-একটি শাখা, যাকে এখন Northern Buddhism বা উদীচ্য বৌদ্ধবিদ্যা বলা হয়, তার পরিচয় জানা গেছে মাত্র উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশক থেকে। দক্ষিণী বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কৃতি, যাকে সাধারণভাবে স্থবিরবাদ বা থেরবাদ বলা হয়, তার আচরণবিধি অত্যন্ত কঠোর, সমাজজীবনে সংঘের নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত দৃঢ়। থেরবাদীরাই পালিভাষায় বুদ্ধের মূল উপদেশ অবিকৃত-ভাবে সংরক্ষণ করে এসেছেন। উদীচ্য বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কৃতির পরিচয় গোচরে আসার আগে বৌদ্ধবিদ্যার গবেষণা থেরবাদী দক্ষিণী বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কৃতির ইতিহাস এবং তাৎপর্য বোঝার চেষ্টায় সীমাবদ্ধ ছিল। এই চর্চার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন আলেকজান্ডার চোমা দ্য কোরোস Alexander Csoma de Kórös (৪ এপ্রিল ১৭৮৪—১১ এপ্রিল ১৮৪২ খৃ.) এবং ব্রায়েন হটন হজ্‌সন Brian Houghton Hodgson (১ ফেব্রুয়ারি ১৮০০—২৩ মে ১৮৯৪ খৃ.)।

চোমার জীবন অতি বিচিত্র। নিজের গ্রাম কোরোস-এ প্রচলিত উপকথার প্রভাবে এই হাঙ্গেরীয় মানুষটির চেতনায় স্বজাতির পূর্ব বাসভূমি খুঁজে বের করার আকুলতা জেগেছিল। হাঙ্গেরির অধিবাসীরা ফিনো-উগ্রীয় ভাষাগোষ্ঠীর ম্যাগিয়ার Magyar ভাষাভাষী। ম্যাগিয়াররা ছিলেন এক যাযাবর জাতি, উরাল অঞ্চল থেকে উত্তর-ককেশিয়া হয়ে এঁরা নবম শতাব্দীর শেষে হাঙ্গেরিতে স্থায়ী হন। চোমার ধারণা হয়েছিল, ম্যাগিয়ার জাতির দূরতর শিকড় খুঁজে পাওয়া যাবে মধ্য বা পূর্ব-এশিয়ায়। কলেজে পড়বার সময়েই চোমা এই শিকড়ে রসন্ধানে দেশ ছেড়ে বেরোবার সংকল্প করেছিলেন। ছাত্র বয়সে ইতিহাসে তাঁর প্রবল আকর্ষণ ছিল। গ্রীক ও লাতিন শিখেছিলেন। ফরাসি ও জর্মান সাহিত্যে তাঁর ভালো দখল ছিল। পরে ইংরেজি শিখেছিলেন। ভালো জীবিকার প্রলোভন উপেক্ষা করে চোমা ১৮১৯-এর ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর রক্তে লালিত সংকল্প উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে পায়ে হেঁটে যাত্রা শুরু করেন। নিঃসম্বল অভিযাত্রী চোমা কন্‌স্তান্তিনোপ্‌ল-আলেক্‌জান্দ্রিয়া-সিরিয়া-বাগদাদ-তেহেরান-বোখারা-পেশোয়ার অতিক্রম করে লাহোরে আসেন এবং লাহোর থেকে যাত্রা করে ১৮২২-এর জুন মাসে লাদাকের রাজধানী লেহ-তে পৌঁছন। এ পথে মধ্য-এশিয়ায় যাওয়ার আশা তাঁকে ছাড়তে হয়। নতুন পথ খুঁজে ফিরছেন, এমন সময়ে কাশ্মীর সীমান্তে মূরক্রফ্‌ট Moorcroft নামে একজন ইংরেজ অভিযাত্রীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। মূরক্রফ্‌টের সঙ্গে যোগাযোগে চোমার জীবনে বড়ো রকমের বাঁক এল। তিনি মূরক্রফ্‌টের সঙ্গে আবার লেহ্‌-তে ফিরে এলেন এবং গিয়োর্গির 'অ্যাল্‌ফাবেটাম টিবেটানাম্‌' (Giorgi, *Alphabetum Tibetanum*, ১৭৬২ খৃ.) সংকলন আশ্রয় করে তিব্বতি ভাষা শিখতে শুরু করেন। তিব্বতে যাওয়া সম্ভব হল শেষ পর্যন্ত এবং একজন লামার কাছে তিনি তিব্বতি ধর্মীয় সাহিত্য চর্চার সুযোগ পেলেন। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ৯ফুট একটি ঘরে পাথরের খালি মেঝেয় বসে দিনের আলো যতক্ষণ পাওয়া যায় কাজ করে যাওয়া, ওই মেঝেতেই শুয়ে রাত কাটানো— এইভাবে দুঃসহ কষ্ট উপেক্ষা করে চোমা সেই লামার সঙ্গে কাজ করেছেন। তিব্বতি পুথির যথাযথ অনুলিপি তৈরি করেছেন দিনের পর দিন।

৩২০ খানি পুথির অনুলিপি এবং তিব্বতি অভিধানের খসড়া শেষ করে তিনি তিব্বত থেকে নেমে এলেন। তাঁর এই কাজ সম্পর্কে রাজেন্দ্রলাল মিত্র পরে মন্তব্য করেছিলেন, আর কোনো ইউরোপীয় তিব্বতিবিদ্যা-চর্চায় এত বড়ো সাফল্য অর্জন করেন নি।

তখন তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সাহায্য চেয়েও কোনো আনুকূল্য পান নি। ১৮২৭-এ চোমা গভর্নর-জেনারেল আমহার্স্টের Amherst সঙ্গে দেখা করে আবার তিব্বতে যাবার জন্য সাহায্য চাইলেন। আমহার্স্ট মাসে ৫০ টাকা সাহায্যের ব্যবস্থা করে দেন। শরৎকালে চোমা আবার তিব্বতে রওনা হয়ে গেলেন। সোসাইটিতে তাঁর কাজের মূল্য সম্পর্কে সচেতনতা দেখা দিল শেষ পর্যন্ত। ১৮২৯-এর মাঝামাঝি সোসাইটি থেকেও তাঁকে আরো ৫০ টাকা মাসিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা হল। ১৮৩১-এর এপ্রিল মাসে চোমা তাঁর বিরাট সংগ্রহ নিয়ে কলকাতায় ফিরে এলেন। নিজের জাতি সত্তার শিকড় খোঁজার নেশায় চোমা ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখ বহনের অসীম ক্ষমতা এবং মেধার অশেষ শক্তি শেষ পর্যন্ত নিয়োজিত হল প্রাচ্যবিদ্যা-চর্চার এক বড়ো রাস্তা খুলে দেবার কাজে। তিব্বতি বৌদ্ধ-সাহিত্যের এই বিরাট সংগ্রহ গোচরে না এলে বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কৃতির ইতিহাস খণ্ডিত রয়ে যেত। চোমার অমানুষিক শ্রমে আবিষ্কৃত তথ্য-ভাণ্ডারের উপরে নির্ভর করে পরবর্তী বৌদ্ধবিদ্যাবিদেরা নিজেদের পাণ্ডিত্যের সৌধ গড়েছেন।

এশিয়াটিক সোসাইটিতেই চোমা থাকতেন। শাস্ত্রীমশায়ের ভাষায় "intrepid Hungarian scholar" চোমা সংস্কৃত বৌদ্ধ-শাস্ত্রের তিব্বতি অনুবাদের এক বিরাট সম্ভার গবেষকদের হাতে পৌঁছে দিলেন। চোমা তাঁর তিব্বতি ভাষার অভিধান ও ব্যাকরণ সংকলনের কাজ বছর তিনেকের মধ্যে শেষ করেন। *A Grammar of the Tibetan Language in English* ১৮৩৪-এ প্রকাশিত হল। স্বভাবগত বিনয়ে চোমা এই কাজকে "elementary works" বলেছিলেন। কিন্তু বিশ্বের পণ্ডিত সমাজে এ গ্রন্থ বৌদ্ধবিদ্যা-চর্চার পক্ষে অপরিহার্য সহায় বিবেচিত হয়ে এসেছে। তাঁর অন্যান্য মূল্যবান প্রবন্ধ ডেনিসন রসের Denison Ross সম্পাদনায় *Tibetan Studies* (১৯১২ খৃ.)

নামে প্রকাশিত হয়েছিল। বৈষয়িক লাভক্ষতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন, প্রকৃত সন্ন্যাসীর জীবনাচরণে অভ্যস্ত এই পথিকৃৎ মনীষীর জীবনাবসান হয় দার্জিলিঙে[১]।

ব্রায়েন হটন হজ্‌সন ছিলেন একেবারেই ভিন্ন ধরনের মানুষ। ইংলণ্ডের এক অভিজাত পরিবারে তাঁর জন্ম। পারিবারিক ঐতিহ্য-সম্মত শিক্ষাদীক্ষায় লালিত হজ্‌সন ১৮১৬য় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করেন এবং ১৮১৮য় ভারতে আসেন। কলকাতার জলবায়ুতে শরীর ভেঙে পড়ায় চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁকে পাহাড়ি প্রশাসনিক কেন্দ্রে চাকরি নিতে হয়। প্রথমে কুমায়ুনে এবং পরে নেপালের কাঠমন্ডুতে অ্যাসিস্ট্যান্ট রেসিডেন্ট পদে, পোস্ট অফিসের দায়িত্বে এবং শেষে স্থায়ীভাবে ১৮৩৩ থেকে রেসিডেন্ট পদে তাঁকে নিয়োগ করা হয়। ১৮৪৩ পর্যন্ত তিনি রেসিডেন্ট পদে কাজ করে অবসর নেন। তাঁর চাকরি জীবনের নথি থেকে জানা যায়, ভারতে কোম্পানির প্রশাসনে তিনি একজন বিচক্ষণ ও দু'দে আমলা ছিলেন। নেপালকে কোম্পানির আধিপত্য মেনে চলতে বাধ্য করায়, গোর্খা সেনাবাহিনী গঠন করে বেঙ্গল আর্মি-র উপরে সরকারের নির্ভরতা কমিয়ে আনায়, ঠগি দমনে, নেপাল এবং নেপালের ভেতর দিয়ে মধ্যএশিয়া ও চীনে ব্যাবসা-বাণিজ্যের সুযোগ বাড়ানোয় তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ভারতের এবং উত্তরে হিমালয় অঞ্চলের মানুষের বাস্তব পরিচয় সম্পর্কে তথ্যনির্ভর প্রতিবেদন প্রস্তুত করে দিয়ে তিনি কোম্পানির শাসনে শৃঙ্খলা আনায় সর্বদা সাহায্য করেছেন। কখনো কখনো অযাচিতভাবেও নিজের মতামত উচ্চতর মহলে জানিয়েছেন। যেমন উইলিয়ম ক্যাভেন্ডিশ বেন্টিঙ্কের William Cavendish Bentinck (বাংলার শেষ গভর্নর জেনারেল ১৮২৮-৩৩ খৃ., ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ১৮৩৩-৩৫ খৃ.) আমলে ভারতে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি অথবা সংস্কৃত-আরবি হওয়া উচিত — এ-নিয়ে তুমুল বিতর্কের সময়ে হজ্‌সন কোনো পক্ষই সমর্থন না করে

---

১. দ্র. Theodore Duka, *Life and Works of Alexander Csoma de Kórós*, London 1885; Hirendra Nath Mukerjee, HERMIT-HERO FROM HUNGARY, New Delhi 1981.

স্পষ্ট জানান, দেশীয় ভাষার মাধ্যম ভিন্ন আধুনিক বিদ্যা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করেন, দেশীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রসারের ফলেই ইউরোপের দেশগুলিতে আধুনিক জ্ঞানের বিকিরণে মধ্যযুগের অবসান হয়েছিল। তাঁর এই জোরালো এবং যুক্তিযুক্ত মতটি আজও স্মরণীয় এবং প্রাসঙ্গিক মনে হয়।

অবশ্যই হজ্‌সন সাম্রাজ্যিক প্রশাসনের স্বার্থে এদেশের জনবৃত্তের নৃতাত্ত্বিক বৈচিত্র্য ও বিশিষ্টতা, ধর্মকর্ম, নানান্ জনগোষ্ঠীর জাতিগত বিশিষ্ট প্রকৃতি, ভূগোল-ইতিহাসের খুঁটিনাটি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং নির্দিষ্ট মত গঠনের চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাঁর সারা জীবনের বহু শাখায়িত জ্ঞানচর্চা সেই সংকীর্ণ সাম্রাজ্যিক স্বার্থবুদ্ধির পরিসীমা ছাপিয়ে উঠেছিল, শুদ্ধ জ্ঞানচর্চার স্তরে উন্নীত হয়েছিল। স্বীকার না করা অকৃতজ্ঞতা হবে যে, তিনি ভারতের বিভিন্ন উপজাতির পরিচয়, ফুলফল জীবজন্তুর পরিচয়, ধর্ম-সংস্কৃতির বহু অজানা উপাদান সম্পর্কে প্রথম তথ্য সংগ্রহ করে ভারতবর্ষকে জানার পথ খুলে দিয়েছিলেন। সে সময়ের আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতি তাঁর পরিপূর্ণ আয়ত্তে ছিল এবং তাঁর সব জিজ্ঞাসার কেন্দ্রে ছিল "মানুষ"। একটানা ২১ বছর হজ্‌সন নেপালে কাটিয়েছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ে নেপালে বৌদ্ধধর্মের যে-রূপ তিনি দেখেছিলেন, সে বিষয়ে ১৮টি প্রবন্ধ লেখেন। এর মধ্যে দুয়েকটি প্রবন্ধ তাঁর অভিজ্ঞতাপ্রসূত মতামতের সমালোচনার তীব্র জবাব। নেপালের বিভিন্ন মন্দিরের বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি এঁকে বৌদ্ধ-শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে এবং নির্ভরযোগ্য ভিক্ষুদের সঙ্গে দিনের পর দিন আলাপ আলোচনা করে তিনি তাঁর মতামতের ভিত্তি প্রস্তুত করেছিলেন। এই নিষ্ঠা, শ্রম এবং গবেষণা-দৃষ্টির জন্যই তিনি সমকালীন আন্তর্জাতিক পণ্ডিত সমাজে বৌদ্ধবিদ্যা-চর্চার অনন্য-নির্ভররূপে সম্ভ্রম এবং মর্যাদা পান। কোরোসকে বলা হয়েছে "হার্মিট স্কলার", হজ্‌সনকে বলা যায় "ডিপ্লোম্যাট স্কলার"। রাজদূতের পদমর্যাদার সুযোগ সুবিধার মধ্যে হজ্‌সন কাজ করেছেন, তাই কোরোসের মতো দারিদ্র এবং অমানুষিক কষ্ট তাঁকে সইতে হয়নি। কিন্তু হজ্‌সনের কাজের মূল্যও অপরিসীম। স্বয়ং কোরোসই মন্তব্য করেছিলেন, বৌদ্ধ-সাহিত্য এবং ধর্ম সম্পর্কে

হজ্‌সনের কাজের নিদর্শন বিষয়বস্তুর নতুনত্ব ও দার্শনিক অবলোকনের গভীরতায় অত্যাশ্চর্য"। ইউজিন বুর্নুফ Eugene Burnouf (১৮০১-৫২ খৃ.) তাঁর *Introductio a l' Histoire du Bouddhisme Indien* (Paris 1844) গ্রন্থে লিখেছিলেন, হজ্‌সনের লেখা নেপাল ও তিব্বতের ভাষা-সাহিত্য-ধর্ম সম্পর্কে সম্পূর্ণ নতুন ধারণায় পরিপূর্ণ। আরও বলেন, তাঁর বিবরণেই নেপালে যে সংস্কৃতে, বৌদ্ধধর্মের মূল ভাষায় (the original language of Buddhism) লেখা প্রচুর গ্রন্থ রয়েছে— সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এই তথ্য জানা গেল।

হজ্‌সনের রচনায় বৌদ্ধধর্মের সম্পূর্ণ ভিন্ন যে রূপের পরিচয় পাওয়া গেল, বহু বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব এবং অন্যান্য বৌদ্ধ দেবদেবীর পুজোর সেই বিবরণ স্বভাবতই বৌদ্ধবিদ্যায় আগ্রহী লেখক-গবেষকদের বিস্মিত করেছিল। এ বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে দাক্ষিণী বৌদ্ধধর্মের কিছুই মেলে না। হজ্‌সনের "European Speculations on Buddhism" (*J-A-S-B*, 1834) প্রবন্ধে এ নিয়ে তীব্র বিতর্কের পরিচয় রয়েছে।

উদীচ্য বৌদ্ধবিদ্যা-চর্চার তথ্যভিত্তি কেঙ্গুর ও তেঙ্গুর নামে দুই ভাগে বিভক্ত বিরাট বৌদ্ধশাস্ত্র সংগ্রহ। কেঙ্গুর বুদ্ধ-বাণীর তিব্বতি অনুবাদ, তেঙ্গুর বৌদ্ধতত্ত্ব বিষয়ে ভারতীয় ও তিব্বতি পণ্ডিতদের লেখার সংগ্রহ। ৩৩৪ খানি করে দুই প্রস্থ কাঠের ব্লক থেকে ছাপাই এই পুথির সংগ্রহ তিব্বতি বৌদ্ধশাস্ত্রের মহাকোষ। হজ্‌সন বিরাট এই মহাকোষের বহু গ্রন্থ সংগ্রহ করে আনেন এবং কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে ১৭৯ খানি, লন্ডনের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে ৮৫ খানি, ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে ৩০ খানি, অক্সফোর্ডের বর্ডলিয়ান লাইব্রেরিতে ৭ খানি এবং পারির সোসাইতে আশিয়াতিক ও বুর্নুফের কাছে ১৭৪ খানি গ্রন্থ জমা দেন। ফলে বৌদ্ধধর্মের নতুন এক রূপের পরিচয় জানার এবং এ শাখায় নতুন কাজ শুরু করার সুযোগ সৃষ্টি হল। এখানে স্মরণীয় চোমা এশিয়াটিক রিসার্চেস ও জর্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধে বৌদ্ধবিদ্যা-চর্চায় হজ্‌সনের এই গ্রন্থ সংগ্রহের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করেন।[২]

---

২. দ্র. William Wilson Hunter, *Life of Brain Houghton Hodgson*, London 1896; Rajendralal Mitra, *The Sanskrit Buddhist Litera-*

কোরোস-হজ্‌সনের সংগ্রহ করা পুথিপত্রের সাক্ষ্যে এটা নিশ্চিত-ভাবে প্রমাণ হয়ে গেল, বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন শুধু পালি ভাষায় নিবদ্ধ নয়, সংস্কৃতেও বিপুল বৌদ্ধশাস্ত্র লেখা হয়েছিল। ভারতে লুপ্ত হয়ে গেলেও সে সাহিত্য নেপালে এবং তিব্বতি অনুবাদে সংরক্ষিত থেকেছে। এ শাস্ত্রের চর্চাও অব্যাহত থেকেছে। তর্ক উঠেছে, পালি এবং সংস্কৃত শাস্ত্রের মধ্যে কোন্ ধারাটি প্রাচীন। পালিতে ও সংস্কৃতে নিবদ্ধ শাস্ত্রের মধ্যে— কোন্ শাস্ত্রকে মূল ধরা হবে। খাঁটি বৌদ্ধধর্মের রূপ কোন্‌টি। সংস্কৃত বৌদ্ধশাস্ত্রের ভাষা প্রায়ই অত্যন্ত বিকৃত, ব্যাকরণদুষ্ট। আবার পালিকেই বুদ্ধদেবের নিজের ধর্মপ্রচারের ভাষা বলে মানাতেও বিস্তর অসুবিধে। এসব তর্ক সত্ত্বেও এটা মানতেই হল, দক্ষিণী বৌদ্ধধর্মের মতোই উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের প্রবাহও ব্যাপ্ত এবং দূরদূরান্তে প্রবাহিত হয়ে গেছে।

প্রশ্ন হল, বৌদ্ধধর্ম কেন দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে গেল, কেনই-বা দক্ষিণী এবং উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের মধ্যে এত দুস্তর প্রভেদ। বুদ্ধদেবের জীবনকাল ৫৬৩-৪৮৩ অথবা ৫৬৬-৪৮৬ খৃস্টপূর্বাব্দ। তাঁর পরি-নির্বাণের ১০০ বছরের মধ্যে ভিক্ষুদের আচরণবিধি নিয়ে প্রবল মত-বিরোধ দেখা দেয়। বৈশালীতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় মহাসঙ্গিতীতে রক্ষণশীল স্থবিরবাদী এবং আচরণ-শিথিলতার পক্ষপাতী মহাসাংঘিকেরা পৃথক হয়ে গেলেন। অশোক স্থবিরবাদী বা থেরবাদীদের পক্ষপাতী ছিলেন। রাজশক্তির পরিপোষণে থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম সিংহল এবং সিংহল থেকে দক্ষিণ এশিয়ার নানা দেশে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে। "মহাযান কোথা হইতে আসিল" এবং "মহাসাংঘিক মত" প্রবন্ধ দুটিতে শাস্ত্রীমশায় বৌদ্ধদের দলাদলি এবং নানা সম্প্রদায়ের উদ্ভব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। তিনি মনে করেন, তিন শো বছরের মধ্যে মহাসাংঘিকরাই নানা বিবর্তনের ভেতর দিয়ে মহাযান মতে উপস্থিত হন। অন্য দিকে থেরবাদীরা পালিভাষায় নিবদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ এবং আপেক্ষিকভাবে কঠোর নিয়ম-সংযম আঁকড়ে থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখেন।

---

ture of Nepal, Preface, Calcutta 1882; B. H. Hodgson, *Essays on the Languages, Literature and Religion of Nepal and Tibet*, London 1874, Reprint New Delhi 1972.

হীনযান এবং মহাযান এই দুটি বৌদ্ধধারার অনেক শাখাপ্রশাখা যে ছিল তার প্রমাণ ক্রমে জানা গেছে। হীনযানের থেরবাদী সম্প্রদায়ের শাস্ত্র নিয়েই বৌদ্ধবিদ্যা-চর্চার পত্তন হয়েছিল। রীজ ডেভিড্স Rhys Davids দম্পতির উদ্যোগে Pali Text Society থেকে পালি বৌদ্ধ-শাস্ত্র প্রকাশের আয়োজনে থেরবাদী বৌদ্ধধর্মের মূল গ্রন্থ সহজলভ্য হওয়ায় এই প্রশাখার চর্চা ব্যাপক হতে পেরেছে। এবারে সংস্কৃত বৌদ্ধ-সাহিত্যের সন্ধান পাওয়ায় মহাযান শাখার পরিচয় সম্পর্কে ধারা-বাহিক বিচার-বিবেচনা শুরু হল। এ বিষয়ে হজ্সনের সংগ্রহ নিয়ে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ কাজ করলেন ইউজিন বুর্নুফ। ১৮৪৪-এ পারি থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর *Introductio a l' Histoire du Bouddhisme Indien* (ইংরেজি অনুবাদ *Legends of Indian Buddhism*, London 1911)। তিনি ১৮৫২-তে প্রকাশ করেন মহাযানসূত্র গ্রন্থমালার অন্যতম 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক'-এর অনুবাদ *Lotus de la Bonne Loi.* মহাযান পন্থার বিশিষ্টতা বোঝার পক্ষে 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক' অপরিহার্য বই।

কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটিতে গচ্ছিত হজ্সন-সংগ্রহের বইগুলির বিষয়বস্তু পরীক্ষা শুরু করেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং এই কাজে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর প্রধান সহায় হলেন। ১৮৮২ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত রাজেন্দ্রলালের *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* হজ্সন-সংগ্রহের বিস্তৃত বিষয়-বিবরণী এবং এ গ্রন্থের দীর্ঘতর ১৬টি অধ্যায় হরপ্রসাদ প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন।

এই কাজের ভেতর দিয়ে হরপ্রসাদ সংস্কৃত বৌদ্ধ-সাহিত্য এবং মহাযান বৌদ্ধধারার গবেষণা পদ্ধতিতে পারদর্শী হয়ে উঠলেন। উদীচ্য বৌদ্ধবিদ্যায় তাঁর সারাজীবনের আগ্রহের সূত্রপাত হল এইভাবে। তিনি অনুভব করলেন এবং দৃঢ় প্রত্যয়ে উপনীত হলেন যে উত্তর-পূর্ব ভারতের বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য উদ্ধার— দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাস গড়ে তোলার পক্ষে এক অবশ্যকৃত্য। এবং ভারতবর্ষে রচিত সংস্কৃত মহাযান সাহিত্য উদ্ধার করতে হলে নেপাল-তিব্বতে অনুসন্ধান চালাতে হবে।

১৮৯১-এ রাজেন্দ্রলালের মৃত্যু হল এবং তাঁর জায়গায় হরপ্রসাদ এশিয়াটিক সোসাইটির ডিরেক্টর অব দি অপারেশন্স ইন দি সার্চ

অব স্যান্স্ক্রিট ম্যানুস্ক্রিপ্টস পদে নিযুক্ত হলেন। তাঁর স্বাধীন গবেষক জীবনের সূচনা হল।

৪.

লাইব্রেরিতে বসে অন্যের শ্রমের উপরে নির্ভর করে কাজ করবেন—এ শাস্ত্রীমশায়ের স্বভাবে ছিল না। যেসব ইঙ্গিত ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে সেই সূত্র ধরে ব্যাপকতর অনুসন্ধান চালানো, আভাসিত অনুমানগুলি প্রচুর তথ্যের সহায়ে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা— এই প্রবণতা দেখা যাবে তাঁর কাজের ধারায়। বিশেষ করে উদীচ্য বৌদ্ধবিদ্যাচর্চার প্রসর বাড়াবার জন্য তিনি চার বার নেপালে গিয়েছেন। ১৮৯৭-এ, ১৮৯৮-এ সিসিল বেন্ডলের Cecil Bendall (১৮৫৬-১৯০৬ খৃ.) সঙ্গে, ১৯০৭-এ এবং শেষবার ১৯২২-এ। শুধু পুথি খোঁজা নয়, নেপালি সমাজে কোথায় কীভাবে বৌদ্ধ আচার-অনুষ্ঠান টিকে আছে সেই সজীব সাক্ষ্যের সঙ্গে পরিচিত হবার আগ্রহেই তিনি বার বার এমন পরিশ্রম স্বীকার করেছেন। এই আগ্রহে বিদ্যাচর্চা, গবেষণা এক স্বতন্ত্র মানবিক আয়তন পায় তাঁর কাজে। বোধ ও পর্যবেক্ষণের তীক্ষ্ণতায় যেসব খুঁটিনাটি বিষয় তাঁর নজরে আসত, সেইসব অভিজ্ঞতার ভেতরের ঐকসূত্র আশ্চর্যভাবে ধরতে পারতেন। পুথি থেকে পাওয়া জ্ঞান মিলিয়ে নিতেন জীবনের সামগ্রিক পটের সঙ্গে। একটা গোটা সমাজের প্রাণস্পন্দন ফুটে উঠত তাঁর লেখায়। এই সংকলনের প্রবন্ধগুলি পড়া তাই এক তৃপ্তিকর অভিজ্ঞতা।

হজ্‌সন নেপালে যে অনুসন্ধানের সূত্রপাত করেছিলেন, শাস্ত্রীমশায় বার বার নেপালে গিয়ে সেই সংস্কৃত বৌদ্ধ-সাহিত্য উদ্ধারের কাজ বহু দূর পর্যন্ত এগিয়ে নেন। নেপালের প্রধানমন্ত্রী বীর সম্‌সের জঙ্‌ রানার চেষ্টায় দরবার লাইব্রেরির বিরাট পুথি সংগ্রহ গড়ে উঠেছিল। শাস্ত্রীমশায় এই সংগ্রহের তালপাতার ও কাগজের পুথি পরীক্ষা করে "Notes on Palm Leaf Manuscripts in the Library of H. E. the Maharaja of Nepal" (*J-A-S-B*, 1897, Lxv-1) ; *Catalogue of Palm-leaf and Selected Paper Mss. belonging to the Durbar Library, Nepal,* Vol. I, 1905 এবং Vol. II, 1915 বিবরণী

প্রকাশ করেন। পুথির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, নেপালে যে বৌদ্ধ-ধর্ম টিকে রয়েছে তার সঙ্গে অন্য কোনো দেশের বৌদ্ধধর্মের মিল নেই। কালচক্রতন্ত্র, বজ্রাবলিতন্ত্র, হেবুকতন্ত্র, চণ্ডমহারোষণতন্ত্র, চক্রসম্বর প্রভৃতি বৌদ্ধতন্ত্রের বই, ততকরগুপ্তর লেখা 'আদিকর্মবিধি' এবং অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিতকাব্য', 'সৌন্দরনন্দকাব্য' ; রত্নাকর শান্তির 'অন্তর্ব্যাপ্তি সমর্থন' প্রভৃতি আগেই আবিষ্কৃত বইয়েরও পুথি এই সংগ্রহে রয়েছে জানান। তাঁর এইসব বিবরণ ইউরোপে নতুন করে বৌদ্ধবিদ্ পণ্ডিতদের মনে কৌতূহল জাগায়। পারি থেকে সিলভ্যাঁ লেভি Sylvain Lévi (১৮৬৩-১৯৩৫ খৃ.) নেপালে কাজ করতে আসেন, ইংলন্ড থেকে বেন্ডল আসেন। শাস্ত্রীমশায়ের এই অনুসন্ধানের ফলে বাংলায় মুসলমান আধিপত্যের আগের বিদ্যাচর্চার বিস্তৃত তথ্যপ্রমাণ উদ্ধার সম্ভব হল। বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের, ভাষা-সাহিত্যের ইতিহাসের অতি মূল্যবান দলিল পাওয়া গেল। এরই সঙ্গে উল্লেখ করা উচিত, এশিয়াটিক সোসাইটির জন্য তিনি ১৮৯৭-১৯০৭-এর মধ্যে যেসব মূল বৌদ্ধ-পুথি এবং পুথির অনুলিপি সংগ্রহ করে এনেছিলেন, ১৯১৭য় তার বিবরণ দিয়ে *Descriptive Catalogue*-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশ করলেন।

উদীচ্য বৌদ্ধবিদ্যার তথ্যভিত্তির এক বিশেষ দিক সম্পর্কে তিনি যে প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার জগতে অনন্য নির্ভরস্থল ছিলেন, ইউরোপীয় পণ্ডিত-দের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা এবং তাঁকে লেখা তাঁদের চিঠিপত্র ('স্মারকগ্রন্থ' দ্র.) থেকে তা বুঝতে পারা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন বিদ্যাকেন্দ্রে যাঁরা কাজ করছিলেন এই সময়ে— তাঁরা, সিলভ্যাঁ লেভি, য়ুলিউস য়োলি Julius Jolly (১৮৪৯-১৯৩২ খৃ.), ভিলেম কালান্ড Willien Caland (১৮৫৯-১৯৩২ খৃ.), লুই দ্য লা ভ্যালে পুসাঁ Louis de la Valee Poussin (১৮৬৯-১৯৩৯ খৃ.), ফিদর ইপ্পোলিতোভিচ শ্চের-বাট্‌স্কোই Fedor Ippolitovich Stcherbatsky (১৮৬৬-১৯৪২ খৃ.), হারমান গেয়র্গ য়াকোবি Herman Georg Jacobi (১৮৫০-১৯৩৭খৃ.), স্টেন কোনো Sten Kono (১৮৬৭-১৯৪৮ খৃ.), আর্থার অ্যান্টনি ম্যাক্‌ডোনেল Arthur Anthony Macdonnel (১৮৫৪-১৯৩০ খৃ.)— এঁদের মতো কৃতকীর্তি মনস্বী শাস্ত্রীমশায়ের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন। নিজেদের কাজে তাঁর সাহায্য-পরামর্শ নিতেন। কেউ কেউ

এদেশে এসে তাঁর সঙ্গে কাজ করে গেছেন। বেন্ডলের সঙ্গে শাস্ত্রীমশায়ের পরিচয়ের ঘটনাটি বেশ কৌতুককর। বেন্ডল ভাটপাড়ার টোল দেখতে যাবেন, সঙ্গী শাস্ত্রীমশায়। তখনো তিনি শাস্ত্রীমশায়কে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন না। বেন্ডল বললেন, ভারতে এত সংস্কৃত পণ্ডিত রয়েছেন কিন্তু কেউ বৌদ্ধবিদ্যায় উৎসাহী নন। কী তিনি জানতে চান, প্রশ্ন করায় বেন্ডল বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তুলছেন, শাস্ত্রীমশায় উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। বেন্ডল বললেন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পর্কে খুব প্রশংসা করতেন তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে পারেন? মৃদু হেসে শাস্ত্রীমশায় বললেন, অনায়াসেই পারি। অগত্যা আত্মপরিচয় দিতে হল। বেন্ডল জিজ্ঞাসা করলেন, পুরো বৌদ্ধধর্মটা কোথায় মিলিয়ে গেল? তখনি শাস্ত্রীমশায় এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নি। এরপর থেকে বেন্ডল চিঠিপত্রে শাস্ত্রীমশায়ের কাছে বার বার এই একই প্রশ্ন তুলেছেন। "For several years we were regular correspondents and the burden of every one of his letters was 'where was all that Buddhism gone?" এ প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজেছেন শাস্ত্রীমশায় সারা জীবন ধরে।

শাস্ত্রীমশায়ের তৈরি বৌদ্ধপুথির বিবরণ ও তালিকাগুলির সঙ্গেই উল্লেখযোগ্য— এই হাতেকলমে কাজের ফল, এখনো অসংকলিত, প্রচুর ইংরেজি প্রবন্ধের কথা। এই প্রবন্ধাবলীর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ "Northern Buddhism" (*I-H-Q*, March, June, Sept. 1925.)। এ ছাড়া রয়েছে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'বৃহৎস্বয়ম্ভূপুরাণ' (১৮৯৪-১৯০০ খৃ.), 'চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণ' (১৮৯৮ খৃ.), সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' (১৯১০ খৃ.), *Six Buddhist Nyāya Tracts* (১৯১০ খৃ.), অশ্বঘোষের 'সৌন্দরনন্দকাব্য' (১৯১০ খৃ.), আর্যদেবের 'চতুঃশতিকা' (১৯১৪ খৃ.) এবং 'অদ্বয়বজ্র সংগ্রহ' (১৯২৭ খৃ.)। এই সূত্রেই 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' (১৩২৩ ব.) বইটিও স্মরণীয়।

৫.

বৌদ্ধধর্মের উদয়-বিকাশ-বিলয়ের ইতিহাস গঠনের উপাদান সংগ্রহে শাস্ত্রীমশায় যে শ্রম ও মেধাশক্তি ব্যয় করেছিলেন তার উদ্দেশ্য,

ভারতবর্ষের, বিশেষত বাংলার সামাজিক বিবর্তনের আদ্যন্ত পরিচয় উদ্ধার। তরুণ বয়সে মনস্বী অভিভাবকদের প্রভাবে তাঁর মনে যে ইতিহাস জিজ্ঞাসা জেগেছিল, জীবনের অন্যান্য কাজের মতো এই কাজটিতেও তারই নিষ্ঠাময় বিস্তার দেখা যায়। বাংলার সংস্কৃতির বৌদ্ধ উপাদান নিয়ে এত মাথা ঘামানোর জন্য তাঁকে আমাদের বিদ্বৎসমাজে "বৌদ্ধবাতিকগ্রস্ত" বলে খোঁটা দেওয়াও হত। কিন্তু কাজের অভিজ্ঞতায় তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল বাংলা দেশের আদি ইতিহাস বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণামের তথ্য ছাড়া কিছুতেই গঠন করা যাবে না। অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া এই বিশ্বাসই বিষয়টির প্রতি তাঁর মনোযোগ নিবিষ্ট রেখেছে শেষ বয়স পর্যন্ত।

দক্ষিণী ও উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের ধারা দুটি যখন স্পষ্ট হল, নতুন তথ্যে ধারা দুটির আচার-আচরণগত এবং দার্শনিক ভিন্নতা বোঝা সহজ হল, তখনো শাস্ত্রীমশায় একপেশে ভাবে উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য নিয়ে কোনো গোঁড়ামির পরিচয় দেন নি। স্পষ্টই বলেছেন, ভৌগোলিক ভাবে এ দুটি ধারার অবিমিশ্র স্বাতন্ত্র্য কখনো ছিল না। বলেছেন, মহাযান বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক ভিত্তি যে দু জন মনীষী রচনা করেছিলেন— সেই নাগার্জুন ও আর্যদেব দাক্ষিণাত্যেরই মানুষ ছিলেন। বহুকাল ধরে বহু দেশ জুড়ে যেসব ধ্যানধারণা প্রভাব বিস্তার করে চলে, তার বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিমিশ্রণ ঘটবেই। বৌদ্ধধর্মেও ঠিক এই বিশিষ্টতা দেখা গেছে। এক হীনযানের আওতাতেই তো ১৮টি ভিন্নভিন্ন মত ছিল। মহাসাংঘিকদের মধ্যেও ক্রমে অন্তত দশটি মত সৃষ্টি হয়। মহাযান মহাসাংঘিকেরই উত্তর-ধারা, এই মহাসাংঘিকদের প্রভাব যে দক্ষিণভারতে ছিল— কার্লের ও অমরাবতীর প্রত্ন-নিদর্শন থেকে তা প্রমাণ হয়। মহাসাংঘিকদের ভেতর থেকেই বুদ্ধদেবকে দেবতা রূপে পুজোর প্রচলন হয়। ঐতিহাসিক মানুষ বুদ্ধদেব দেব মর্যাদায় উন্নীত হলেন, তাঁকে ঘিরে অজস্র অতিলৌকিক আখ্যান রচিত হল, তাঁর জন্ম-জন্মান্তর বাহিত অবতারত্ব নিয়ে জাতক-কাহিনী রচিত হল এবং 'মহাবস্তু অবদানে'র মতো বুদ্ধ-পুরাণ সৃষ্টি হল। বুদ্ধি মার্গে নির্বাণ সাধনার তত্ত্বের রূপান্তর ঘটে গেল। ব্যক্তিগত নির্বাণ নয়, লোক সাধারণের প্রতি করুণা এবং সর্বলোকের মুক্তির পথ প্রদর্শনের মহৎ আদর্শের অভ্যুদয়ে

অর্হতের চেয়ে বোধিসত্ত্বের তত্ত্ব স্বভাবতই জনসমাজে সমাদৃত হয়েছিল। মহাযানে বৌদ্ধপন্থার আচরণবিধির কঠোরতা ঘুচে গিয়ে মানবিক করুণা, মৈত্রী বড়ো হয়ে উঠল। বাঁধুনি যখন শিথিল হয় তখন বাইরের উপাদান সহজে প্রবেশ করে। মহাযান বৌদ্ধধর্মেও তেমনি আঞ্চলিক বহু উপাদান জায়গা করে নিয়েছিল। এরই ফলে সহজযান এবং সহজযানের নানা প্রশাখা সৃষ্টি হল। খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতকে কনিষ্কের সভাকবি ও গুরু অশ্বঘোষ 'মহাযান-শ্রদ্ধোৎপাদসূত্রে' (Disetsu Teitaro Suzuki, *Aśvaghoṣa's Discourse on the Awakening of Faith in Mahāyāna*, 1900) যে তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, নাগার্জুনের মতো তীক্ষ্ণধী মনীষী 'মাধ্যমিককারিকা'য় যে ধর্মের দৃঢ় দার্শনিক ভিত গড়ে দিয়েছিলেন— তার মহিমা ক্ষয় হতে হতে সাত-আট শো বছরে এমন রূপান্তর ঘটে গেল, যে তাকে আর বুদ্ধদেবের ধর্ম বলে চেনা সম্ভব ছিল না। তান্ত্রিক অভিচারে আকীর্ণ এই বৌদ্ধধর্মের অবলেশ সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায় নেপালে যে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন, তার প্রতিক্রিয়ায় বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করেন, "এক-একবার মনে হয় তিন-চারি শত বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধেরা ইন্দ্রিয়াসক্ত, কুকর্মান্বিত ও ভূতপ্রেতের উপাসক হইয়া যে নিজেও অধঃপাত গিয়াছিল এবং দেশটাকে সুদ্ধ অধঃপাতে দিয়াছিল, মুসলমানদের আক্রমণ তাহারই প্রায়শ্চিত্ত। বিধাতা যেন তাহাদের পাপের ভরা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদের সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য মুসলমানদের এদেশে পাঠাইয়াছিলেন। তাহাদের সেই ঘৃণিত উপাসনা, বিষ্ঠামূত্র ভক্ষণ করিয়া সিদ্ধিলাভের চেষ্টা, ভূতপ্রেত পূজা করিয়া বুজরুক হইবার চেষ্টা এবং উৎকট ইন্দ্রিয়াসক্তিকেই ধর্ম বলিয়া মনে করা ও তাহাই শিখানো— এই সকলের পরিণামে তাহাদিগকে বঙ্গ দেশ চিরকালের জন্য ছাড়িতে হইল।" (এই বইয়ের পৃ. ৩৮১-৮২)।

অথচ এও ঠিক যে বৌদ্ধধর্মের শেষ দশায় বাংলার সামাজিক অবস্থা কী দাঁড়িয়েছিল না জানলে বাংলার ইতিহাস আদ্যন্ত জানা সম্ভব নয়। এমন-কি মুসলমান আধিপত্যের পরেও সমাজে যখন বৌদ্ধ-উত্তর ব্রাহ্মণ্য বা হিন্দু নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হল, সেই সমাজেও বৌদ্ধ রীতিনীতি, জীবনাচার একেবারে লুপ্ত হয়ে গেল না। তার প্রচ্ছদটা

শুধু বদল হল। যা বৌদ্ধ নামে অভিহিত হত, সেই সব আচার-অনুষ্ঠান পূজা-পার্বন অনেকটাই হিন্দুধর্মের মধ্যে গৃহীত হল। নিম্নবর্গের মানুষের জীবনাচরণে এর জের আজো রয়ে গেছে। শাস্ত্রীমশায়ই এই বিমিশ্রিত সমাজবাস্তবতার কথা বারবার জোর দিয়ে বলেছেন। তিনি বলেন, "ছেলেবেলা গল্প শুনিতাম, যদি একটি কাঁচপোকা ও একটি আরশুল্লাকে একটা শিশি বা বোতলের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে কিছুদিন পরে দেখিতে পাওয়া যাইবে, আরশুল্লাটা কাঁচপোকা হইয়া গিয়াছে; দুইটাই কাঁচপোকা হইয়া গিয়াছে। তাহাদের ইতর বিশেষ করা যায় না। মুসলমান অধিকার রূপ শিশিতে বা বোতলে হিন্দু ও বৌদ্ধ দুই জাতিকে বন্ধ রাখিয়া এই সাত শত বছরের পর দেখা যাইতেছে, দুই-ই এক হইয়া গিয়াছে, ইতর-বিশেষ করা যায় না।" (এই বইয়ের পৃ. ৫৭৭)। ওপর থেকে ইতর-বিশেষ করা যায় না ঠিকই, কিন্তু সমাজের বিন্যাস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তাঁর দৃষ্টিতে স্পষ্ট হল, আজ যে হিন্দু সমাজের কাঠামো দেখা যাচ্ছে তার গড়নে বৌদ্ধ জনস্তরকে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে। জাতি ব্যবস্থায়, সামাজিক মর্যাদায় বৌদ্ধ জনস্তরকে হিন্দু সমাজের ভেতরে কোনো-না-কোনো ভাবে খাপ খাওয়ানো হয়েছে। এই ব্যবস্থায় বৌদ্ধধর্ম আশ্রিত যাঁরা হিন্দু সমাজে স্থান পেলেন, তাঁরা নিজেদের পূজা-পার্বনের, আচারবিধির আদি বিশিষ্টতা খানিকটা বদলে নিতে বাধ্য হলেন, কিন্তু জড় রয়েই গেল। শাস্ত্রীমশায় মনে করতেন, বাংলা দেশ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। হিন্দু সমাজে যাঁরা ঠাঁই পেলেন না তাঁরা মুসলমান ধর্ম আশ্রয় করে স্বতন্ত্র হয়ে গেলেন। আর যাঁরা ঠাঁই পেলেন, তাঁদের বেশির ভাগ হিন্দু সমাজে মর্যাদায় হীন এবং নিম্নবর্গের মানুষ হয়ে রইলেন। এ'দের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের জের রয়ে গেল। এই বইয়ের পরিশিষ্টে ছাপা "Buddhism in Bengal Since the Muhammadan Conquest" এবং "রমাই পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল" প্রবন্ধে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এসব উপাদান সম্পর্কে আলোচনা পাওয়া যাবে। ১৮৯৭-এ প্রকাশিত তাঁর *Discovery of Living Buddhism in Bengal* পুস্তিকাটির কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। শাস্ত্রীমশায়ের মত নিয়ে বহু বিতর্ক হয়েছে, কিন্তু শাস্ত্রীমশায়ের

যুক্তি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। নগেন্দ্রনাথ বসুর *The Modern Buddhism and its followers in Orissa* (1911) বইয়ে শাস্ত্রীমশায়ের লেখা ভূমিকা-প্রবন্ধটিও প্রসঙ্গত স্মরণীয়, যে প্রবন্ধের বক্তব্য এই বইয়ের "উড়িষ্যার জঙ্গলে" প্রবন্ধেরও বিষয়।

উচ্চতর সংস্কৃতির স্তরেও যে বৌদ্ধ-পণ্ডিতদের প্রভাব দীর্ঘ দিন অব্যাহত থেকেছে তার প্রচুর দৃষ্টান্ত "বাংলার বৌদ্ধসমাজ" প্রবন্ধে পাওয়া যাবে। ব্যাকরণ-অভিধান-ছন্দোশাস্ত্র, ন্যায়-স্মৃতি এবং বিশেষ ভাবে বৌদ্ধতন্ত্রের প্রভাব সাক্ষাৎভাবেই হিন্দুধর্মে বর্তেছে। শাস্ত্রীমশায় সিদ্ধান্ত করেন, "আমরা বাঙালি ব্রাহ্মণেরা এখন অর্ধ-হিন্দু, অর্ধ-বৌদ্ধ। যখন আমরা সাবিত্রী দীক্ষা লই, তখন আমরা ব্রাহ্মণ। আর যখন গুরু আমাদের কানে ফুঁ দিয়া যান, আর আমরা গুরুর পায়ে লুটাইয়া পড়ি, তখন আমরা বৌদ্ধ।" (এই বইয়ের পৃ. ৬০৩)। ১৫০০ থেকে ১৬০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে নবদ্বীপের ভট্টাচার্যদের অভ্যুত্থানে নতুন করে সমাজ বাঁধা হল। এই সময় থেকে ক্রমে বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির উপরস্তরে বৌদ্ধ মনীষার প্রভাব লুপ্ত হয়ে গেল। যা টিকে রইল সে ধর্মকর্মে, আচার-অনুষ্ঠানে।

কোন্ তরুণ বয়সে হরপ্রসাদের মনে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের, রামদাস সেনের প্রভাবে আর্যতত্ত্বের গোঁড়ামিমুক্ত সত্যসন্ধানের প্রেরণা জেগেছিল। দেশের প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধারের আগ্রহে তিনি আয়ত্ত-গত সুযোগের সদ্ব্যবহার করে বিপুল তথ্য এবং তার চেয়েও মূল্যবান্, স্বদেশের জনবৃত্তের বিশিষ্টতা বুঝবার দৃষ্টির আলো উত্তরকালের ঐতিহাসিকদের দিয়ে গিয়েছেন। তাঁর অনেক সিদ্ধান্ত নতুন গবেষণায় টলে গেছে ঠিকই। জ্ঞানচর্চার ইতিহাসে এমন ঘটনা বিরল নয়। মনে পড়ে, শাস্ত্রীমশায়ের একটি দৃঢ় মতের যথার্থতা নিয়ে কথা প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায় একদিন বলেছিলেন, "তথ্যের ভুল পাবে শাস্ত্রীমশায়ের লেখায়, কিন্তু দৃষ্টিতে কোন ভুল ছিল না। বাঙালি জাতির পরিচয় ওঁর মতো আর-কেউ ঠিকভাবে ধরতে পারেনি।" ঐতিহাসিক হিসেবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর এই শ্রেষ্ঠত্ব আজো মান্য।

৬.

তাঁর গুরু রাজেন্দ্রলাল বা সমকালীন মান্য দেশী বিদেশী আরো অনেক মনস্বী তখন ইতিহাস-পুরাবৃত্তের বিশেষ বিশেষ এলাকায় প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছিলেন। বিশেষ চর্চার ক্ষেত্রে শাস্ত্রীমশায়ের চেয়ে এ'দের অনুশীলন অনেক গভীর এবং মৌলিক এটা দেখানো যায়। কিন্তু শাস্ত্রীমশায়ের মনীষার চরিত্র ছিল অন্য ধরনের। জ্ঞানের প্রশাখাগুলির স্বতন্ত্র চর্চাই রীতি ছিল তখন, বিশেষজ্ঞতার কদর ছিল। কোনো-একটা বিষয়ে শেষ কথা বলার লোকের অভাবও ছিল না। কিন্তু শাস্ত্রীমশায় পুরাবৃত্তের বিভিন্ন শাখার আবিষ্কৃত তথ্যের মধ্যে ঐকসূত্র খুঁজতেন। একই সময়ে সমাজে যা-কিছু সৃষ্টি হয়ে উঠেছে, সমাজমানস কীভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে সেই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যে, কোন্ মূল প্রবণতা প্রকাশ পাচ্ছে, এই জিজ্ঞাসার সূত্রে তিনি বিচ্ছিন্ন তথ্য এবং তত্ত্ব গেঁথে তুলে মানুষের যাবতীয় কৃতি সমগ্রভাবে দেখতে চেষ্টা করতেন। এই দৃষ্টি-বৈশিষ্ট্যে তাঁর মনীষার চরিত্র সমকালীন পণ্ডিতদের তুলনায় অনেক অগ্রসর এবং আধুনিক।

যেমন, "কোথা হইতে আসিল" প্রবন্ধে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক বেদ-বিরোধী আজীবিক, জৈন প্রভৃতি ছয়টি ধর্মের উত্থান সম্পর্কে আলোচনায় তিনি পূর্ব-ভারতের সমকালীন সংস্কৃতির একটা স্বতন্ত্র এবং অনন্য চরিত্র ফুটিয়ে তোলেন। "আর্যগণ যখন সেই সুসভ্য দেশ আক্রমণ করিয়া তাহার রাজ্য সমাজ আচার-ব্যবহার রীতিনীতি সব ভাঙিয়া তাহাদিগকে আর্য সভ্যতা দান করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে তাহাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় উঠিতে লাগিল এবং সেই-সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে তাহাদের পূর্ব-সমাজ, পূর্ব-আচার ও পূর্ব-ব্যবহার বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাই এত ধর্ম হইল, শেষ সব ধর্ম উঠিয়া গিয়া এক বৌদ্ধধর্মই পূর্ব-ভারতে থাকিয়া পূর্ব-ভারতের অতীত গৌরবের সাক্ষী দিতে লাগিল।" (এই বইয়ের পৃ. ২৯৮-৯৯)। শাস্ত্রীমশায় আর্য-পূর্ব পূর্ব-ভারতীয় জনবৃত্তের স্তরেই বৌদ্ধধর্মের শিকড় খোঁজেন। ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রমের ঘোর বিরোধী আজীবিক প্রভৃতি সম্প্রদায় সম্পর্কে যেসব বিবরণ সচরাচর দেওয়া হয় তার কতটা খাঁটি এ সংশয় আছেই।

এঁদের বিকৃত চরিত্রের মানুষ হিসেবে দেখানো হয়ে এসেছে। ব্রাহ্মণ্য গৌরব প্রতিপন্ন করাই এর উদ্দেশ্য। কিন্তু এইসব লোকধর্মের সমপর্যায় থেকে যে বৌদ্ধধর্ম উত্থিত হল তার উৎকর্ষে, তার সামগ্রিক সাংস্কৃতিক মহিমায় সম্ভ্রম বোধ করতেই হয়। বুদ্ধদেবের বিনয়-উপদেশে মানবিক সদাচারের চরম উৎকর্ষ প্রতিফলিত হয়েছিল। মানুষের সামনে বুদ্ধদেব কোনো অবাস্তব, দুঃসাধ্য জীবনাদর্শ স্থাপন করেন নি। তাঁর উপদেশের মূল কথা ছিল "মধ্যপথ", "মজ্‌ঝিমো পটিপদা"। আত্মশ্রেয়ত্বের অহমিকা প্রকাশ পায় যে কৃচ্ছ্রসাধনে, চিত্তের শুদ্ধি ও অগ্রগতির সঙ্গে সম্পর্কহীন তেমন কৃচ্ছ্রসাধন বুদ্ধদেব অনুমোদন করতেন না। কিন্তু বিনয় ও সদাচার মানুষমাত্রেরই অর্জনীয় মনে করতেন। বর্ণ নির্বিশেষে যে-কোনো মানব-মানবীর সন্তান পূর্ণ মানবিক মর্যাদার অধিকারী— এই তাঁর মত। 'মজ্‌ঝিমো নিকায়'-এর অস্‌সলায়ন সূত্রে বুদ্ধদেব বলেছেন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পুরুষ-নারীর মিলনে উৎপন্ন সন্তান মানুষই হয়ে থাকে কিন্তু পুরুষ গর্দভ এবং ঘোটকীর সন্তান হয় অশ্বতর। বর্ণাশ্রম বিরোধী, সকল মানুষের সমান মর্যাদার কথা সে সময়ের অন্য লৌকিক ধর্ম-সম্প্রদায়ের গুরুরাও বলতেন। অন্য সম্প্রদায়ের তুলনায় বুদ্ধের ধর্ম যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে পারল এর কারণ, শাস্ত্রীমশায় বলেন, বুদ্ধদেবের সংগঠন নৈপুণ্য। "তিনি রাজার ছেলে, রাজা হইবার সব-শিক্ষা তাঁহার হইয়াছিল। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াও রাজার প্রধান যে গুণ, দশ জনকে লইয়া সুন্দররূপে কাজ চালানো, তাহা ছাড়েন নাই। ভিক্ষুসংঘের পরম উন্নতির জন্য, তাঁহার যেসব রাজগুণ ছিল, সব প্রয়োগ করিয়াছেন। বাস্তবিকও তাঁহার সংঘ যেমন প্রবল হইয়াছিল এমন আর-কাহারো হয় নাই। তিনি যে শুদ্ধ ভিক্ষুদের বন্দোবস্ত করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন তাহা নহে। তিনি গৃহস্থ বৌদ্ধদিগের জন্যও বেশ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের পঞ্চশীল ও অষ্টশীল দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।" (এই বইয়ের পৃ. ৩০১)। মন্তব্যটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ।

অবশ্য প্রাচীন সমাজে বিশেষ কোনো ধর্ম বিশেষ কালের উৎপাদন-বণ্টন এবং উদ্বৃত্ত পণ্যের বাণিজ্যিক বিধিব্যবস্থা থেকে আয়ের নিয়ন্ত্রক সামাজিক শ্রেণী-বিশেষের স্বার্থের অনুকূল হওয়াতেই প্রবল হয়ে উঠত,

ধর্ম যে সামাজিক শক্তিরই অভিব্যক্তি— এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বদৃষ্টি শাস্ত্রী-মশায়ের লেখায় আসে নি। কোথাও কোথাও তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তির সঙ্গে দেশের আর্থিক জীবনের সম্পন্নতার যোগাযোগ লক্ষ করেছেন। যেমন মহাযানের সমৃদ্ধি প্রসঙ্গে লিখেছেন, "ভারতবর্ষে তখন বড়ো বড়ো রাজ্য ছিল, নানারূপ ধনাগমের পথ ছিল, কৃষি-বাণিজ্য ও শিল্পের যথেষ্ট বিস্তার হইতেছিল, বিদ্যার যথেষ্ট আদর ছিল, ধর্মেরও যথেষ্ট আদর ছিল। তাই এত লোকে এত শত বৎসর ধরিয়া একই বিষয়ে চিন্তা করিয়া এতদূর উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন।" (এই বইয়ের পৃ. ২৭২)। এমন সব অপরিস্ফুট কিন্তু ইঙ্গিতময় উক্তি পড়ে মনে হয়, একালে দামোদর ধর্মানন্দ কোসম্বী বা রোমিলা থাপারদের বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সমাজদৃষ্টির যেন পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বদৃষ্টির কোনো নির্দিষ্ট কাঠামো শাস্ত্রীমশায়ের কাছ থেকে আশা করা যায় না ঠিকই। কিন্তু যে-কোনো বৈজ্ঞানিক আলো-চনার প্রাথমিক যে শর্ত, বিষয়কে সমস্ত আয়তন থেকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে, বস্তুনিষ্ঠভাবে দেখা; শাস্ত্রীমশায়ের বৌদ্ধবিদ্যা সম্পর্কিত লেখাগুলি তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বৌদ্ধ-হিন্দু দ্বন্দ্ব সমন্বয়ে সমাজের চেহারাটা ঠিক কেমন দাঁড়িয়েছিল বুঝবার জন্য তিনি শুধু দার্শনিক মত-সংঘাতের বিবরণ দেন নি। মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনের খুঁটিনাটি আচার-বিচার তুলনা করে করে দুই সংস্কৃতির প্রভেদ দেখিয়েছেন। বিশেষ বিশেষ তিথি যাপন, কামানো, বিছানাপত্র ব্যবহার, পোশাক-আশাক, স্নানের নিয়ম, মুখ ধোয়ার নিয়ম, কাপড় কাচা, তেল মাখা, শৌচ— এমন অজস্র প্রসঙ্গ এনেছেন "হিন্দু বৌদ্ধে তফাত" প্রবন্ধটিতে। মানুষকে, মানুষের সমাজকে বোঝার এমন আগ্রহ, এমন নিষ্ঠার নজির গবেষকদের মধ্যে সত্যিই বিরল। আর এই অবলোকনে শাস্ত্রীমশায় সর্বদাই তুলনামূলক দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব, সাংস্কৃতিক ভূগোল, নৃতত্ত্ব, সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বের জ্ঞান কাজে লাগাতেন। সামগ্রিক এবং সমন্বিত দৃষ্টির আলো বিকিরণ করে বলেই বৌদ্ধবিদ্যা বিষয়ে তাঁর রচনাবলী আজও, কোনো কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণীয় মনে না হলেও, সজীবতায় আমাদের মনোযোগ নিবিষ্ট রাখে।

৭.

এই সংকলনে বৌদ্ধবিদ্যা বিষয়ে রচনার মধ্যে 'নারায়ণ' পত্রিকায় ১৩২১-এর অগ্রহায়ণ থেকে ১৩২৪-এর বৈশাখ পর্যন্ত প্রকাশিত ১৬টি প্রবন্ধ (এই বইয়ে পৃ. ২৩৯-৪৮২) শাস্ত্রীমশায় নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী লিখেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কৃতির অভ্যুদয়-বিকাশ-বিলয়ের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দিয়েছেন ১৬টি লেখায়। ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে পূর্বাশা লিমিটেড 'বৌদ্ধধর্ম্ম' নামে বইয়ে প্রবন্ধগুলি সংকলন করেছিলেন। এই লেখাগুলির সঙ্গে শাস্ত্রীমশায়ের জীবনের একটি তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ জড়িত আছে। ১৩০৯ বঙ্গাব্দে তাঁর 'মেঘদূত ব্যাখ্যা' প্রকাশিত হয়। বাংলায় কালিদাস চর্চার একটি স্মরণীয় কাজ এই বইটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এর বিরুদ্ধে অশ্লীলতার অভিযোগ উঠল। তখন তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। অশ্লীল লেখার অভিযোগ সরকারের কানেও তোলা হল। সরকারি কর্তারা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মত জানতে চাইলে এমন-কি হীরেন্দ্রনাথ দত্তর মতো মানুষও বইটিকে অশ্লীল বললেন। এই ঝামেলায় বিরক্ত শাস্ত্রীমশায় সাময়িকভাবে সাহিত্য-পরিষৎ থেকে সরে যান এবং বাংলা লেখা ছেড়ে দেন। অভিমান করে বলতেন, আমি তো খেউড় গাই। ১৩০৯ বঙ্গাব্দের পর থেকে অনেক দিন তিনি বাংলায় কিছুই লেখেন নি। শাস্ত্রীমশায়ের সেজো ছেলে পরিতোষ ভট্টাচার্য মশায়ের কাছে শুনেছি, একদিন চিত্তরঞ্জন দাশ শাস্ত্রী-মশায়ের প'লডাঙার (কলকাতা) বাড়িতে এসে তাঁকে 'নারায়ণ' পত্রিকায় নিয়মিত লিখতে অনুরোধ করেন। চিত্তরঞ্জনের পেড়াপিড়িতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও লিখতে রাজি হলেন শাস্ত্রীমশায়। শর্ত হল, তাঁর লেখায় কেউ হাত দেবেন না এবং তিনিই প্রিন্ট অর্ডার দেবেন। প্রতিটি লেখার জন্য তাঁকে ১২৫/১৫০ টাকা দক্ষিণা পাঠিয়ে দিতেন চিত্তরঞ্জন। এইভাবে শাস্ত্রীমশায় আবার বাংলায় লিখতে শুরু করেন। 'নারায়ণ' পত্রিকায় তিনি বৌদ্ধধর্ম ছাড়াও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে অনেক মূল্যবান্ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। শাস্ত্রীমশায়ের মতো পারঙ্গম বৌদ্ধবিদ্যাবিদের হাত থেকে যে বাংলা ভাষায় একটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনা পাওয়া গেছে, তার জন্য বাঙালি পাঠক মাত্রেই চিত্তরঞ্জন দাশের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করবেন।

সম্পাদক

পণ্ডিত-জীবনী

শংকরাচার্য কী ছিলেন?

বঙ্গ দেশে বেদান্তশাস্ত্রের প্রচার নাই, এজন্য বঙ্গ দেশে শংকরাচার্যের মত লোকে বিশেষ অবগত নহে। বঙ্গ দেশে তাঁহার প্রভাবও বড়ো অধিক নহে। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে, বিশেষ দাক্ষিণাত্যে শংকরাচার্যকে লোকে দেবতা বলিয়া পূজা করে; তাঁহার গ্রন্থাবলী আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ করে; তাঁহার মত অভ্রান্ত বলিয়া মনে করে এবং অনেকে তাঁহার মত অনুসারে সংসারধর্মে জলাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করে। মধ্য-সময়ে ইউরোপে আরিস্ততালের যেমন প্রভুত্ব। হইয়াছিল আধুনিক ভারতবর্ষে শংকরাচার্যেরও প্রায় তেমনি প্রভুত্ব তাঁহার জীবনচরিত সম্বন্ধে নানা অদ্ভুত উপন্যাস শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন,

তিনি ৩২ বৎসর বয়সে সমস্ত বেদ-বেদান্তের টীকা লিখিয়া কাশীতে প্রাণত্যাগ করেন। কেহ 'অপরস্বা ভবিষ্যতি' বিষয়ক অদ্ভুত গল্পটি তাঁহার জীবনীতে প্রয়োগ করেন। কেহ আবার বলেন, শংকরাচার্য মহীশূরে স্বর্ণবৃষ্টি করিয়াছিলেন সেই স্বর্ণ পাইয়া টেপু সুলতান ইংরেজ-দিগের সঙ্গে যুদ্ধ করাতেই হারিয়া যায়।

হিন্দুরা শংকরাচার্যকে শংকরের অবতার মনে করেন এবং শৈব-ধর্মের মিশনরি মনে করেন। ওদিকে আধুনিক ইংরেজিওয়ালারা বলেন শংকরাচার্য একজন সমাজসংস্কারক, তিনি বৌদ্ধদিগকে এ দেশ হইতে দূর করিয়া দেন। তাঁহা হইতেই ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রচার হয় ; তিনি লুথর[১] লয়োলা[২] প্রভৃতি সংস্কারকদিগের ন্যায় উচ্চদরের লোক। যাঁহার বিষয়ে এরূপ ভিন্ন ভিন্ন মত চলিয়া আসিতেছে, যাঁহার কথা এখনো বেদ বলিয়া কোটি কোটি লোক মানিয়া আসিতেছে, তাঁহার কার্যকলাপ, তাঁহার জীবনচরিত ও তাঁহার মত বঙ্গদর্শনের পাঠকবর্গ কিছু জানিতে পারিবেন, এই অভিপ্রায়ে উপস্থিত প্রস্তাবের অবতারণা হইল।

শংকরাচার্যের জীবনচরিত বিষয়ে সংস্কৃত গ্রন্থ ॥

আমরা শংকরাচার্যের বহু-সংখ্যক জীবনচরিতের নাম শুনিয়াছি। এমন-কি অনেক বৈদান্তিকের বিশ্বাস, তাঁহার সকল শিষ্যই তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস থাকে থাকুক। আমরা এক্ষণে দুইখানি পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। একখানি শংকরাচার্যের একজন প্রধান ছাত্র আনন্দগিরির[৩] লিখিত, অপরখানি মাধবাচার্যের[৪]। প্রথমখানির নাম 'শংকরবিজয়', দ্বিতীয়খানির নাম 'শংকরদিগ্বিজয়'। প্রথমখানি গদ্য, দ্বিতীয়খানি মহাকাব্য— ষোড়শ সর্গে সম্পূর্ণ। বর্তমান প্রস্তাব প্রধানত এই দুইখানি গ্রন্থ হইতেই সংগৃহীত হইবে। আনন্দগিরি ও মাধবাচার্যের এস্থলে বিশেষ পরিচয় আবশ্যক করে না, উভয়েই সংস্কৃত সাহিত্যে প্রথিতনামা। একজন শংকরাচার্যের শিষ্যদিগের মধ্যে পদ্মপাদাচার্যের পরই প্রধানতম বলিয়া গণ্য এবং স্বীয় আচার্যের বহু-সংখ্যক ভাষ্যের টীকাকার। অপরজন বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরের ছাত্র, প্রসিদ্ধ 'বেদার্থপ্রকাশ' নামক বেদব্যাখ্যার রচয়িতা।

'শংকরবিজয়ে'র প্রাধান্য ॥

মাধবাচার্যের গ্রন্থ অপেক্ষা 'শংকরবিজয়ে'র ঐতিহাসিক মূল্য অনেক অধিক। আনন্দগিরি আচার্যের সমসাময়িক লোক। মাধবাচার্য অন্তত তাঁহার ছয় শত বৎসর পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আনন্দ-গিরি গদ্যে ইতিহাস লিখিব প্রতিজ্ঞা করিয়া লিখিয়াছেন। মাধব মহাকাব্য লিখিতে গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে তিনি কল্পনাশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন তাঁহাকে রাজা নব কালিদাস উপাধি দিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার কথায় আমরা অধিক বিশ্বাস করিতে পারি না। কিন্তু কল্পনা যতই ক্ষমতা বিস্তার করুক না, ধর্মভয়ে আচার্যের জীবনের ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনায় মাধব ও আনন্দে বড়ো ইতর বিশেষ নাই।

শংকরাচার্য কী ছিলেন ?

শংকরাচার্য বিষয়ে কতকগুলি লোকায়ত কুসংস্কার আছে। তাঁহার জীবনী লিখিবার পূর্বে সেইগুলি দূর করা আবশ্যক। প্রথম কুসংস্কার এই যে তিনি একজন সমাজসংস্কারক, কেহ তাঁহাকে বুদ্ধের সহিত, কেহ চৈতন্যের সহিত, কেহ লুথরের সহিত, কেহ অন্যান্য প্রসিদ্ধ সংস্কারকদিগের সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। বাস্তবিক তিনি সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না। পূর্বোক্ত মহাত্মাগণের সহিত তুলিত হইবার তাঁহার কোনো অধিকার নাই। তাঁহার হৃদয় অতি ক্ষুদ্র, স্বার্থপর ও উদারতাবিরহিত। তিনি বুদ্ধিমান্, বিচারপটু, অগাধবিদ্যাসমুদ্রপারযায়ী, যে ক্ষমতাবলে অনেক লোক আয়ত্ত হয়, অনেকে দেবতা, গুরু, অবতার বলিয়া মান্য করে, সেই ক্ষমতা তাঁহার অপর্যাপ্ত ছিল। তাঁহার ন্যায় বক্তৃতাশক্তি, তাঁহার ন্যায় রচনার গভীরতা, প্রাচীন ভারতবর্ষে দুর্লভ। কিন্তু তথাপি তিনি সমাজসংস্কারক নহেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র প্রভৃতি চারি জাতি এক করিয়া ভারতবর্ষের মুখ উজ্জ্বল করিব, সকলকে সন্নীতি, সৎকার্য, সদ্ধর্মে আনিয়া নূতন সভ্যতার ভিত্তিপাত করিব, এ-সকল তিনি পারিতেন, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও এ-সকল উদারভাব তাঁহার অনুদার হৃদয়কন্দরে স্থান পায় নাই। সংস্কার বিষয়ে তিনি যাহা যাহা করিয়াছিলেন, তাহা এই— তিনি ব্রাহ্মণদিগকে শিব, শক্তি প্রভৃতি নানা

উপাসনা হইতে বিরত করিয়া শুদ্ধাদ্বৈতমত গ্রহণ করিয়া মঠাশ্রমী হইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। এইটুকু তাঁহার সংস্কারকার্য। ইহাতে ভারতবর্ষের দুই প্রকার অনিষ্ট হইয়াছে। প্রথম হিন্দুদিগের মধ্যে মঠাশ্রমের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে এবং অন্যান্য বর্ণের সহিত ব্রাহ্মণদিগের সহানুভূতি হ্রাস হইয়াছে। 'শংকরবিজয়' গ্রন্থে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই তিনি যখন উজ্জয়িনী নগরে বাস করিতেছেন, সেই সময় শূদ্রজাতীয় উন্মত্ত-ভৈরব নামা কাপালিক তাঁহার সহিত বিচার করিতে উপস্থিত হইল। তিনি তাহাকে বলিলেন, "গচ্ছ কাপালিক, স্বচ্ছন্দে বেড়াও গিয়া ; দুষ্ট মতাবলম্বী ব্রাহ্মণদিগকে দমন করিবার জন্যই আমার আগমন। অগ্রজাতিপাদসেবনই অন্ত্যজাতির কর্ম। অতএব শিষ্যগণ উহাকে দূর করিয়া দেও।" বলিবামাত্র শিষ্যেরা কশাঘাত পুরঃসর কাপালিককে দূর করিয়া দিল।* এই তাঁহার সমাজসংস্কার।

বিরুদ্ধমত খণ্ডন ॥

অনেকে বলিবেন শংকরাচার্য যে-সময়ের লোক সে-সময়ে শংকরাচার্যের ব্রাহ্মণদমন কার্য দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়াছিল। সত্য, হইয়াছিল। তাঁহার পর ব্রাহ্মণদিগের যথেষ্ট বিদ্যোন্নতি হয়। তিনি স্বীয় মনের অগ্নিময় তেজোবলে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একটি নূতন সাহসের আবির্ভাব করেন, তাহার ফল আমরা আজিও অনুভব করিতে পারি। তাই বলিয়া তাঁহাকে আমরা রিফরমর বা সমাজসংস্কারক বলিতে পারি না। যদি বলিতে হয়, তিনি উচ্চদরের সংস্কারক ছিলেন বলিতে পারিব না। তাঁহার কৃত সংস্কার ব্রাহ্মণ জাতিতে পর্যবসিত। বুদ্ধদেবের আগে হইলে তাঁহার ঐ সংস্কারেই বাহাদুরি হইত বটে, কিন্তু বুদ্ধদেবের পর ওরূপ অল্পায়ত সংস্কার তাঁহার অনুদার মনোবৃত্তির পরিচয় দেয় মাত্র।

তিনি বৌদ্ধদিগকে তাড়ান নাই ॥

তাঁহার বিষয়ে দ্বিতীয় কুসংস্কার এই যে তিনি বৌদ্ধদিগকে এ দেশ হইতে দূর করিয়া দেন। ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। 'শংকরবিজয়' গ্রন্থের

---

* 'শংকরবিজয়' ২৪ প্রকরণ।

নির্ঘণ্ট পত্রে নয়ন নিক্ষেপ করিলেই জানিতে পারা যাইবে এইটি ভ্রমাত্মক সংস্কার। তিনি বৌদ্ধ জৈন মত নিরাকরণ করিয়া তন্মতাবলম্বী ব্রাহ্মণদিগকে স্বমতে আনয়ন করেন। এই নবদীক্ষিত বৌদ্ধেরা তাঁহার শিষ্যাদিগের পদসেবা প্রভৃতি কার্য করিত ও তাহাদিগের উচ্ছিষ্ট আহার করিত। জৈনেরা এই অবধি বণিক হইল, সৌগতেরা দাস হইল, বৌদ্ধেরা বন্দী অর্থাৎ স্তুতিপাঠক হইল। একথা সত্য, কিন্তু তিনি যেমন বৌদ্ধমত নিরাকরণ করেন তেমনি বৈষ্ণবমত শৈবমত সৌরমত কাপালিকমত বৈদিক কর্মকাণ্ডমত এবং ঔপনিষদিক সাংখ্যমতও নিরাকৃত করেন, অতএব তিনি বৌদ্ধদিগকে তাড়াইলেন কী রূপে ? পূর্বে বৌদ্ধদিগের যেমন প্রভুত্ব ছিল তাঁহার সময়ে তেমন ছিল না। তাঁহার সহিত বিচারে উহাদের বিলক্ষণ ক্ষতি হয় কিন্তু তিনি উহাদের তাড়াইলেন কই ? আর যদিই তাড়াইলেন তবে তাহার পর লোক আবার বৌদ্ধমত খণ্ডন করিতে যায় কেন ?

তাঁহা হইতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রচার হয় নাই॥

তিনি বৌদ্ধদিগকে তাড়ান নাই, বৌদ্ধেরা তাঁহার পূর্ব হইতেই নানাবিধ পৌত্তলিক উপাসনার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত ও হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। ঐ পৌত্তলিক উপাসনাপ্রবর্তক পৌরাণিকগণই ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের পুনঃসংস্থাপক। তাহাদের নিকট হইতেই আবার লোকে ব্রাহ্মণকে ভয় করিতে, ভক্তি করিতে, ভূদেব বলিয়া প্রণাম করিতে শিখে— তাহাদের দ্বারাই বিষ্ণু, শিব, দুর্গা প্রভৃতি বৈদিক অবৈদিক দেবতাদিগের উপাসনা প্রচারিত হয়। ইহার পর এই-সকল পৌত্তলিক ব্রাহ্মণদিগকে বৈদিকধর্মে আনয়ন করিবার জন্য চেষ্টা করা হয়। আবার বৈদিকধর্মের পুনঃপ্রচার হয়। সে প্রস্তাবও শংকরাচার্যের নহে। যখন বৈদিকধর্ম ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আবার চলিতেছে, সেই সময়ে তিনি উপস্থিত হইয়া কর্মকাণ্ড হইতে উহাদিগকে জ্ঞানকাণ্ডে অধিকতর মনোযোগ দিতে আজ্ঞা করেন। ইহারই নাম দুষ্ট ব্রাহ্মণদমন।

তিনি শৈবমত প্রচারক ছিলেন না॥

যাঁহারা মনে করেন শংকরাচার্য শৈবমত প্রচারক তাঁহারা একবার

'শংকরবিজয়' খুলিয়া দেখিবেন। উহার নির্ঘণ্টপত্রেই পাইবেন "শৈবমত নিরাকরণম্"। বাস্তবিকই শংকরাচার্যকে— শুদ্ধাদ্বৈত মতের পোষক অদ্বিতীয় দিগ্বিজয়ী পুরুষকে— শৈবমত প্রচারক বলিলে তাঁহাকে গালি দেওয়া হয় মাত্র।

সংক্ষিপ্তার্থ ॥

এতক্ষণ শংকরাচার্য কী ছিলেন না তাহাই দেখাইতেছিলাম। তিনি সমাজসংস্কারক ছিলেন না। বৌদ্ধদিগকে তিনি তাড়ান নাই। ব্রাহ্মণ্যধর্ম তিনি পুনঃপ্রচার করেন নাই। শৈবমতের তিনি সংস্থাপক নহেন। তবে তিনি কী ছিলেন ? তাঁহার এত প্রভুত্ব কেন ? এত লোকে তাঁহাকে মানে কেন ? যে-সকল মহৎকার্যের জন্য তাঁহার নাম ভারতের হিতাকাঙ্ক্ষীদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য হওয়া উচিত এক্ষণে সেই-সকলের কথঞ্চিৎ উল্লেখ করিব। সবিস্তারে লিখিতে গেলে বিস্তর হয় এইজন্য সংক্ষেপে কয়েকটি সার কথা মাত্র বলিবার চেষ্টা করিব।

১. তাঁহার যশের প্রধান কারণ বিদ্যা ॥

তাঁহার খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রভুত্বের প্রধান কারণ তাঁহার বিদ্যা। অতি অল্প বয়সেই তিনি তৎকালপ্রচলিত সমস্ত সংস্কৃতগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং পাঠসমাপ্তির পূর্বেই গুরুর আসনে উপবেশন করিয়া সমস্ত সহাধ্যায়ীদিগকে দুরূহ দুর্বোধ শাস্ত্রসমূহের বিশদ প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছিলেন। "চতুঃষষ্টি কলা, চতুর্দশ বিদ্যা, সমস্ত বেদ, সূত্র ইতিহাস তাপনীয়, আগম, মন্ত্র, যন্ত্র, তন্ত্র সমস্ত বিষয়ে তিনি কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন। পূর্ব পর্বতে যেমন বালভানু, বিদ্যা অদ্রিমালায় তিনি তেমনি, ব্রহ্মাণ্ড গোলকীলকে তিনি ধ্রুবের ন্যায়, যজ্ঞবিদ্যায় যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায়, (ইত্যাদি) উপবিষ্ট হইয়া তিনি শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতেন।" ইহাতেও তাঁহার বিদ্যার পরিচয় দেওয়া হইল না। তাঁহার প্রধান গ্রন্থ 'শাংকরভাষ্য' পাঠ করিলে জানা যাইবে তাঁহার বিদ্যার পার ছিল কিনা। ব্রাহ্মণগ্রন্থ, বৌদ্ধগ্রন্থ, জৈনগ্রন্থ, কাপালিকগ্রন্থ সমস্তই তাঁহার নখদর্পণ মধ্যে ছিল। যিনি এত লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন তিনি যে জগদ্বিখ্যাত হইবেন তাহাতে বিচিত্র কী ?

২. রচনা ॥

শংকরাচার্যের রচনা তাঁহার প্রতিপত্তির দ্বিতীয় কারণ। সরল মিষ্ট সুললিত পদবিন্যাস করত তিনি দুরূহ, দুর্বোধ, অতি জটিল, শাস্ত্রসমূহের অতি কঠিন অতি সূক্ষ্ম অতি নীরস অংশ সকলের অতি বিশদ মূঢ়জনেরও সুবোধ্য অর্থ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন লেখনী ধারণ করিতেন বোধ হয় তাঁহার হৃদয় লেখনীর অনুসরণ করিত। ভাষা তাঁহার ভাব প্রকাশে কাঁপিত। যখন লেখনী ধরিতেন কোথাও যে বিশ্রাম করিতে হইত, ভাবিয়া ভাবসংগ্রহ করিতে হইত, মস্তিষ্ক বিলোড়ন করিতে হইত, একেবারে বোধ হয় না। বোধ হয় অন্তঃস্থ বিদ্যাসমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া তীব্রস্রোতে অজস্র লেখনীমুখে নির্গত হইত। কখনো স্তুতি, কখনো নিন্দা, কখনো হৃন্মর্মভেদী শ্লেষ বাক্য, কখনো ভক্তি, কখনো জটিল শাস্ত্রার্থ, সমান বেগে, সমান তেজে, সমান ওজস্বিতার সহিত বহির্গত হইত। শংকরাচার্যের মত কুসংস্কারাপন্ন বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে, প্রাচীন বলিয়া দূরীকৃত হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার রচনা, তাঁহার ওজস্বিনী লেখনীমুখ নিঃসৃত বাক্য পরম্পরা, তাঁহার কীর্তিস্তম্ভ 'শাংকরভাষ্য', কখনোই বিস্মৃতিসমুদ্রে নিমজ্জিত হইবে না।

আচার্য শুদ্ধ নিজেই লিখিতে পারিতেন এমন নহে, তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যেও অনেকে তাঁহার অনুকরণ করিয়া ভাষাজ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। তিনি কেবল স্বয়ং অদ্বিতীয় লেখক নহেন, তিনি এক অদ্বিতীয় লেখক সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। আনন্দগিরি, শ্রীধরস্বামী তাঁহার শিষ্য পরম্পরামধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। শুদ্ধ তাঁহার শিষ্যগণ কেন যে-কেহ তাঁহার পর লেখনী ধরিয়াছেন সকলেই তাঁহাকে অনুকরণ করিতে গিয়াছেন কিন্তু কেহই কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। তাঁহার রচনা অনুকরণের অতীত।

৩. বিচারপটুতা ॥

বিচারপটুতায় তাঁহার অপেক্ষা বড়ো অতি অল্প লোক আছেন। তিনি দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন অর্থাৎ ভারতবর্ষের নানাস্থানে পর্যটন করিয়া তত্তৎস্থানস্থ পণ্ডিতবর্গকে পরাস্ত করিয়া স্বমতগ্রহণ করাইয়াছিলেন।

এই-সকল পণ্ডিতদিগের মধ্যে সর্বধর্মবিরোধী চার্বাক ও কাপালিক, হিন্দুধর্মবিরোধী বৌদ্ধ, সৌগত, জৈন, হিন্দুধর্মের উচ্চতর বেদধর্মবিরোধী পৌত্তলিক ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদির উপাসক, বৈদিকদিগের মধ্যে জ্ঞানকাণ্ড-বিরোধী কর্মকাণ্ড আশ্রয়ী মীমাংসক, জ্ঞানকাণ্ড আশ্রয়ীদিগের মধ্যে শুদ্ধাদ্বৈত মত বিরোধী সাংখ্যাদি। এই-সমস্ত পণ্ডিতদিগকে স্বীয় মনীষা প্রভাবে যিনি জয় করিয়াছেন তিনি কি অদ্বিতীয় নহেন ? তিনি হিন্দু মনে এমনি একটি সীলমোহর মারিয়া গিয়াছেন যে এখন আর শুদ্ধ সাংখ্যমত, শুদ্ধ পৌত্তলিক মত, দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রায়ই সকলে অদ্বৈত ধর্ম বজায় রাখিয়া আপন আপন মত প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। পুরাণ, তন্ত্র, নূতন স্মৃতি, সর্বত্র অদ্বৈত মতই চলিতেছে। যে পুরাণ সাংখ্যমতে লিখিত সেও শেষ বলে প্রকৃতি পুরুষ উভয়ে মিলিয়া অদ্বৈত ঈশ্বর। কেবল বঙ্গীয় নৈয়ায়িকেরা শংকরাচার্য হইতে আপনাদিগের স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া গিয়াছেন। এজন্য তাঁহাদের বিলক্ষণ বাহাদুরি আছে।

৪. গ্রন্থ ও টীকার সংখ্যা ॥

শংকরাচার্য যে কত গ্রন্থ ও টীকা রচনা করিয়াছেন বলা যায় না। সকল এখনো ছাপা হয় নাই। বাদরায়ণ প্রণীত বেদান্ত সূত্রের তিনি ভাষ্য করেন। যদিও টীকা বলিয়া প্রসিদ্ধ, তথাপি এই ভাষ্য টীকা নহে। এখানি শংকরাচার্যের নিজ মত প্রচারের উপায়। সূত্রগুলি এমনি প্রহেলিকার ন্যায় যে, উহা হইতে যে যেরূপ ইচ্ছা অর্থ করিতে পারে। ঐ এক সূত্রমালা হইতে নানা দর্শনের নানা প্রস্থানের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ সূত্র হইতেই একখানি বৈষ্ণবদর্শন ও 'পূর্ণপ্রজ্ঞ' নামে আর-একখানি দর্শন হইয়াছে। শংকরাচার্য ঐ সূত্রগুলিকে দ্বার মাত্র করিয়া তাঁহার গভীর অন্তর মধ্যে শিষ্যগণকে প্রবেশ করাইয়াছেন। তাঁহার প্রণীত 'ভগবদ্গীতা'র ভাষ্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। আনন্দগিরি সেই ভাষ্যের টীকা করিয়াছেন এবং শ্রীধর স্বামী তাহার সংক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহার সময়ে যে-সকল উপনিষদ্ চলিত ছিল, শংকরাচার্য সে-সমস্তেরই টীকা করিয়াছিলেন। অনেক উপনিষদ্ তাহার পরে লিখিত, ইহাতে তাঁহার টীকা নাই। অনেক উপনিষদের টীকা তাঁহার লিখিত বলিয়া প্রসিদ্ধ

কিন্তু বাস্তবিক সেগুলি জাল। শংকরাচার্য সমস্ত বেদের টীকা করেন, সেটি মিথ্যা কথা। তাঁহার জ্ঞানকাণ্ডে প্রয়োজন, তিনি জ্ঞানকাণ্ডেরই টীকা লিখিয়াছেন। সমস্ত বেদের ব্যাখ্যা তাঁহার অনেক পরে লিখিত হয়।

৫. স্বমত প্রচার॥

শুদ্ধাদ্বৈত মত প্রচারই শংকরাচার্যের প্রভুত্বের প্রধান কারণ— একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ইত্যাদি উপনিষদ্ বাক্যের তিনি অদ্বৈত মতে অর্থ করেন। তাঁহার মতে জগতে যা-কিছু দেখি সমস্তই ভ্রম, তুমি, আমি, বাড়ি, ঘর, নদ, নদী পর্বতাদি সমস্তই ভ্রম। কেবল এক ঈশ্বরই সত্য। তিনিই সব তিনি ভিন্ন আর-কিছুই সত্য নহে। তবে আমাদের যে তুমি আমি জ্ঞান হইতেছে সে অধ্যাস (যেটা যে জিনিস সেইটাতে সেই জিনিস বলিয়া জ্ঞান)। শংকর এই মত কুমারিকা হইতে হিমালয় পর্যন্ত সমস্ত দেশে ব্রাহ্মণমণ্ডলী মধ্যে প্রচার করেন। লোকে বৈষ্ণবাদি ধর্ম ত্যাগ করিয়া তাঁহার মত গ্রহণ করে। তিনি কোন্ কোন্ মত খণ্ডন করেন পরে লিখিত হইবে।

৬. মঠ স্থাপন॥

পূর্বেই বলা গিয়াছে শংকরাচার্য কর্মকাণ্ডের বিরোধী— তিনি বহুসংখ্যক লোককে সন্ন্যাসী করেন। পূর্বকালে সন্ন্যাসী ছিল কিনা, ঠিক বলা যায় না। মনুতে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলিয়া একদল লোক আছে। তাহারা বাল্যকাল হইতে গুরুর আলয়ে বাস করিয়া লেখাপড়া ও ধর্মকর্ম করিত-- তাহারা বিবাহ করিত না কিন্তু তাহারা সন্ন্যাসী ছিল না। চতুর্থ আশ্রমই সন্ন্যাসাশ্রম। ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ আশ্রম কাটাইয়া লোকে সন্ন্যাসী হইত যোগাদিকর্মে নিযুক্ত থাকিত। শংকরাচার্যের কিছুদিন পূর্ব হইতে একটি মত ক্রমে প্রবল হইতেছিল যে "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" যেদিন সংসারে বিরক্তি হইবে সেই দিন হইতেই সন্ন্যাসী হইতে পারিবে। শংকরাচার্য এই মত অনুসারে ব্রহ্মচারী অবস্থাতেই সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। শংকরাচার্যের সময় হইতেই সন্ন্যাসী মোহান্তের কিছু বাড়াবাড়ি। এখানকার সকল সন্ন্যাসীই শংকরকে

আপনাদের গুরু বলিয়া স্বীকার করে। শংকরাচার্য আপন শিষ্য সন্ন্যাসী-দিগের জন্য ভারতী নামক সম্প্রদায় স্থাপন করেন। অনেকে বলেন তিনি গিরি পুরী ভারতী— তিন সম্প্রদায়ের মোহান্তদিগেরই সংস্থাপক, 'শংকরবিজয়ে' কিন্তু আমরা ভারতী ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাই না।

এই ভারতী সম্প্রদায়ের মোহান্ত ভারতবর্ষের সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। তারকেশ্বরের মোহান্ত গিরি, কিন্তু তাঁহার দশনামার মধ্যে দুই-তিন জন ভারতী আছেন। শংকরাচার্য স্বশিষ্য সন্ন্যাসীদিগের জন্য তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে শৃঙ্গগিরি নামক স্থানে মঠ স্থাপন করেন। ঐ মঠ এখন সিংহারী নামে খ্যাত। কাঞ্চী নগরে তাঁহার দুই পুরী বা মঠ ছিল। এখন আছে কিনা বলা যায় না। শংকরাচার্য কী ছিলেন কিসের জন্য তাঁহার এত মান্য এক প্রকার উক্ত হইল। তাঁহার জীবন-চরিত বিষয়ে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।

'বঙ্গদর্শন'
আশ্বিন, ১২৮৪ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য।

১. জর্মান প্রোটেস্টান্ট রিফর্মেশন আন্দোলনের পথিকৃৎ Martin Luther, মার্টিন লুথারের জীবনকাল ১৪৮৩-১৫৪৬ খৃস্টাব্দ। নতুন জেগে ওঠা জর্মান জাতীয়তাবোধের পরিপোষক লুথার ধর্ম বিষয়ে পোপের সর্বময় কর্তৃত্ব এবং চার্চের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। যে-কোনো মানুষ ধর্মযাজকের সাহায্য ছাড়াই উপাসনা করতে পারে, ঈশ্বরের করুণা পেতে পারে—এই মতবাদ প্রচারের জন্য তাঁকে ১৫২১ খৃস্টাব্দে চার্চ থেকে বহিষ্কার করা হয়। পোপের এই বহিষ্কার আদেশ তিনি প্রকাশ্যে আগুনে পুড়িয়ে দেন। এই সময়ে লুথার জর্মান ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেন। ফলে বাইবেল জর্মানির সাধারণ মানুষের আয়ত্তে এসে যায়।

২. সোসাইটি অফ জিসাস-এর প্রতিষ্ঠাতা Saint-Ignatius of Loyola, সেণ্ট ইগ্‌নেটিয়স অব লোয়োলা স্পেনের মানুষ, জীবনকাল ১৪৯১-১৫৫৬ খৃস্টাব্দ। ১৫৩৪ খৃস্টাব্দে লোয়োলা এবং তাঁর ছয় জন অনুগামী কৃচ্ছ্রতাময় পবিত্র জীবন যাপনের ব্রত নেন। ১৫৩৯ খৃস্টাব্দে পোপ তৃতীয় পল ইগ্‌নেটিয়স প্রণীত খৃস্টীয় আচরণবিধি অনুমোদন করেন। আজও জেসুইট সম্প্রদায় এই আচরণবিধি মেনে চলেন।

৩. আনন্দগিরি বা আনন্দজ্ঞান সম্ভবত গুজরাটের অধিবাসী ছিলেন। এঁর জীবনকাল ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। সংসার জীবনে তাঁর নাম জনার্দন ছিল অনুমান করা হয়, 'তত্ত্বালোক' গ্রন্থের লেখকরূপে এই নামটি পাওয়া যায়। আনন্দগিরি দ্বারকার শংকরমঠের আচার্য ছিলেন। তিনি সমগ্র শংকরভাষ্যের উপরে টিপ্পনী প্রণয়ন করেন। মৌলিক রচনা বৈশেষিক মতবাদ খণ্ডন মূলক 'তত্ত্বসংগ্রহ' এবং ভাস্করের পরিণাম-তত্ত্ব সমেত অন্যান্য মতবাদ খণ্ডনের উদ্দেশ্যে লেখা 'তত্ত্বালোক'। দ্র. *H-I-P*, Vol. II, pp. 192-94.

৪. 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ' প্রণেতা বিদ্যারণ্য মাধবাচার্যর জীবনকাল চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। ইনি বেদের ভাষ্যকার প্রখ্যাত সায়ণাচার্যের ভাই। শংকর-বেদান্ত বিষয়ে মাধবাচার্যের তিনখানি গ্রন্থ— 'বিবরণপ্রমেয়-সংগ্রহ', 'পঞ্চদশী' ও 'জীবনমুক্তিবিবেক'।

শংকরাচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

আজ আমরা শংকরাচার্যের জীবনচরিত লিখিব, লিখিবার পূর্বে একটি কথার মীমাংসা চাই। সে কথাটি এই, শংকরাচার্যের জীবনচরিতের জন্য যে দুইখানি গ্রন্থ আমরা পাইয়াছি, তাহাতে অনেক অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ আছে। সেগুলি উনবিংশ শতাব্দীর লোকে কখনোই বিশ্বাস করিতে পারিবেন না। এক জায়গায় আছে, শংকরাচার্য বেদব্যাসের সঙ্গে বিচার করিতেছেন, অথচ বেদব্যাস তাঁহার জন্মিবার হাজার বৎসর পূর্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। নিতান্ত ভক্তি-অন্ধ লোক ভিন্ন এ-সকল কথা কাহারো বিশ্বাস করিবার জো নাই। এরূপ স্থলে কী করা উচিত? এক-দল লোক আছেন, তাঁহারা বলেন, সত্য বাছিয়া লইয়া মিথ্যা পরিত্যাগ

করাই যুক্তিযুক্ত। আর-একদল আছেন, তাঁহাদের মতে এরূপ স্থলে কোনো কথাই বিশ্বাস করা যায় না। প্রথমোক্ত মতের উত্তর এই যে, কোন্ ঘটনাটি সত্য, কোন্‌টি মিথ্যা স্থির করিয়া উঠা যায় না। অনেক সময়ে লেখক সকলই সত্য বিবেচনা করিয়া লিখেন। অনেক সময়ে ধর্মভাবে উন্মত্ত হইয়া গুরুদেব বা ধর্মপ্রচারককে ঈশ্বরতুল্য বিবেচনা করিয়া তাঁহার সমস্ত কার্যই ঈশ্বরের কার্য বলিয়া লিখিয়া বসেন। সে স্থলে কোন্‌টি লেখকের স্বকপোলকল্পিত ও কোন্‌টিতে কত পরিমাণে ঐতিহাসিক সত্য আছে স্থির করা যায় না। সুতরাং সত্য বাছিয়া লইয়া মিথ্যা পরিত্যাগের চেষ্টা বিফল। আবার এইরূপ অর্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থে কিছুমাত্র সত্য নাই, ইহা বলাও নিতান্ত নির্বোধের কাজ। আমাদের মত এই যে, যখন 'শংকরবিজয়ে'র ন্যায় কোনো অর্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ আমরা পাইব, আমরা এমত বিবেচনা করিব না যে উহাতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে লিখিত জীবনচরিতের ন্যায় প্রকৃত ঘটনা সমূহ বিশেষরূপে বিচার করিয়া লিখিত হইয়াছে। আমরা শংকরাচার্যের নিকটেও যাইব না। আমরা দেখিব, লেখকের মনে শংকরাচার্য বলিলে কিরূপ ভাব হইত অর্থাৎ তাঁহার মনে শংকরাচার্যের ideal কিরূপ। আবার যখন সেই গ্রন্থ তৎকালীন জনসমাজে বিশেষ সমাদৃত দেখিব তখন জানিব গ্রন্থকারেরও যেরূপ ideal তৎকালীন লোকেরও তদ্রূপ। আমরা জানিব শংকরাচার্য যে ঐরূপ অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য করিয়াছিলেন ইহা এককালে অনেক লোক বিশ্বাস করিত। গ্রন্থকার যতই শংকরাচার্যের নিকটবর্তী কালের লোক হইবেন ততই সে ideal যথার্থ বলিয়া মনে করিব।

এই মত অনুসারে আমরা 'শংকরবিজয়' ও 'শংকরদিগ্বিজয়' হইতে সত্য মিথ্যা বাছিয়া লইবার চেষ্টা করিব না। যেমনটি দেখিব, ঠিক তেমনটি লিখিব। দুই গ্রন্থে অনেক স্থানে মিল হয় না, তাহার দুই একটা দেখাইয়া দিব। প্রধানত 'শংকরবিজয়' আমাদের অবলম্বন।

'শংকরবিজয়ে'র প্রথমেই আছে, একদিন নারদমুনি পৃথিবীতে নানারূপ অসদ্ধর্মের প্রচার দেখিয়া; কাপালিক, ভৈরব, বৌদ্ধ, জৈন, ক্ষপণক প্রভৃতি নানা মতের প্রভাবে বৈদিকধর্মের বিলোপ হইতেছে দেখিয়া ব্রহ্মার নিকট গেলেন। ব্রহ্মা নারদকে লইয়া, শিবের নিকট উপস্থিত হইলেন। পরামর্শ হইল, শিব শংকরাচার্যরূপে অবতার হইবেন। শিব আসিয়া

চিদম্বর নামক দেশে আকাশলিঙ্গ নামক শিবমূর্তিতে অধিষ্ঠান হইলেন। সেখানে মহেন্দ্র পণ্ডিতের বংশে সর্বজ্ঞ নামক একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার পত্নী কামাক্ষী চিদম্বরপুরেশ্বর শিবের আরাধনা করিয়া বিশিষ্টা নামে এক তনয়া লাভ করেন। বিশ্বজিৎ নামক এক ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিশিষ্টা "আমার স্বামী বিশ্বজিৎ আর আকাশলিঙ্গ শিব দুই এক" এই ভাবনা করিয়া এক সন্তান লাভ করেন, সেই সন্তানই অদ্বৈত মতের গুরু শংকরাচার্য।

'শংকরদিগ্বিজয়ে' অবতারের কথা কিছু অধিক। শিব বলিলেন আমি তো অবতার হইবই, আমার সঙ্গে আরো পাঁচ জনের তো অবতার হওয়া চাই, তা কার্তিক তুমি আগে ভট্টপাদ কুমারিল নামে অবতার হইয়া বৈদিক কর্মকাণ্ডের উদ্ধার করো, জৈমিনির যে পূর্বমীমাংসা আছে, তাহার টীকা করো। ইন্দ্র তুমি সুধন্বা নামে রাজা হইয়া ভট্টপাদের সহায়তা করো ও বৌদ্ধদিগের বিনাশ করো, বিষ্ণু ও শেষনাগ তোমরা সংকর্ষণ ও পতঞ্জলি হইয়া ও ব্রহ্মা মণ্ডন মিশ্র রূপ ধরিয়া ভট্টপাদের সহকারী হও। একবার বাল্মীকি দেবতাদিগকে বিষ্ণুর দোসর করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন! আবার মাধবাচার্য কবি তাঁহাদিগকে আনাইলেন। সুধন্বা রাজা প্রথম বৌদ্ধ ছিলেন, নাস্তিক-মণ্ডলীতে সর্বদা পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন, একদিন ভট্টপাদ রাজসভায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

মলিনৈশ্চেন্ন সংসর্গো নী চৈঃ কাককুলৈঃ পিক।
শ্রুতিদূষক নির্হ্রাদৈঃ শ্লাঘনীয়স্তদাভবেঃ ॥

"হে কোকিল তোমার যদি শ্রুতিদূষক (বেদনিন্দক) শব্দকারী কাক-কুলের সহিত সংসর্গ না থাকিত তাহা হইলে তুমি শ্লাঘার পাত্র হইতে।" রাজা শীঘ্রই ভট্টপাদের শিষ্য হইলেন। বৌদ্ধেরা প্রতিপদে অপদস্থ হইতে লাগিল। শেষ এই বন্দোবস্ত হইল যে, ভট্টপাদ ও বৌদ্ধেরা [বৌদ্ধদের] একটি উচ্চ পাহাড়ের উপর হইতে পড়িতে হইবে, যে বাঁচিবে তাহারই মত সত্য। ভট্টপাদ পড়িলেন, বাঁচিয়া রহিলেন। বৌদ্ধেরা পড়িয়া মরিয়া গেল।*

* আধুনিক পণ্ডিতগণকে এইরূপ পরীক্ষা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিলে ভালো হয় না? তাহা হইলে অনেক কুতর্ক মিটিয়া যায়। বং সং।

শংকরের বংশাবলী সম্বন্ধে দুই গ্রন্থে বিশেষ গোলযোগ। 'দিগ্বিজয়' বলেন, কেরল দেশে পূর্ণা নদীর পুণ্য তটে বৃষাদ্রি নামক স্থানে মহাদেব অধিষ্ঠান করিয়া একজন রাজাকে স্বপ্ন দিলেন; সে তাঁহার মন্দির নির্মাণ করাইয়া দিল। সেই রাজার অধীনস্থ ব্রাহ্মণদিগের কালটি [কালাতি] নামে একজন প্রধান ছিলেন, কালটির অধীনে বিদ্যানিবাস নামে একজন সর্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বাস করিতেন, তাঁহার পুত্র শিবগুরুও সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত। তিনি প্রথমে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়া আজীবন গুরুকুলে বাস করিবেন ইচ্ছা করিয়াছিলেন, পরে পিতামাতার দুঃখে কাতর হইয়া বিবাহ করিলেন, তিনি বিবাহ করিতে কন্যার বাড়ি যান নাই। কন্যাই কন্যা-যাত্র লইয়া বরের বাড়ি উপস্থিত হইয়াছিল। এই নূতনতর বিবাহের ফল শংকরাচার্য। 'শংকরবিজয়ো'ক্ত বংশাবলীর কথা পূর্বেই কথিত হইয়াছে।

গোবিন্দ ভগবৎপাদের নিকট শংকরাচার্য বিদ্যাধ্যয়ন আরম্ভ করেন। পঞ্চম বৎসরে বিদ্যারম্ভ করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হয়েন। গুরুর আজ্ঞা লইয়া মধ্যে মধ্যে তিনি ব্রহ্মাসনে উপ-বেশন করিয়া শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার শিক্ষা অদ্বৈত মত। চৈতন্য একমাত্র, সমস্ত জড়পদার্থের পরিচালক বা অধিষ্ঠাতা। অথচ দেখিতেছি সকল মনুষ্যই চৈতন্যবান্ অতএব সকল মনুষ্যের চৈতন্যই এক। অতএব ব্রহ্ম ও আমি এ দুইয়ে অভেদ। নৈয়ায়িকেরা যে জীবাত্মা বলিয়া এক জাতীয় স্বতন্ত্র পদার্থ স্বীকার করেন সেটুকু সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, যখন সকল চৈতন্যই এক, তখন এ জীবাত্মগত চৈতন্য, ও পরমাত্মগত চৈতন্য এইরূপ প্রভেদেই হইতে পারে। যেমন আকাশ এক হইলেও ঘটমধ্যবর্তী আকাশ ও বাক্সমধ্যবর্তী আকাশ এ দুইয়ে অভেদ আছে এইরূপ। কিন্তু জীব স্বতন্ত্র পদার্থ ও ঈশ্বর স্বতন্ত্র পদার্থ ইহা কদাপি সম্ভব নহে।

শংকরের পিতা শিবগুরু অনেক চেষ্টা করিয়াও সন্ন্যাসী হইতে পারেন নাই কিন্তু শংকর প্রথম বয়সেই সন্ন্যাসী হইলেন। সন্ন্যাসী হইয়া বহু-সংখ্যক গ্রন্থ রচনা করিলেন। ব্যাসোক্ত বেদান্ত সূত্রের টীকা করিলেন। তৎপরে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন।

দিগ্বিজয় শব্দে কী বুঝায় প্রাচীন লোক অনেকেই বুঝিতে পারেন,

কিন্তু একালের কেহ বুঝিবেন না। সেকেন্দর, তৈমুরলঙ্গ, জঙ্গিস যেমন দিগ্বিজয় করিয়াছিলেন এ তেমন দিগ্বিজয় নহে। ইহাতে দিগ্বিজয়ীর সূচ্যগ্র প্রমাণ ভূমিও লাভ হয় না। বরং যাহা থাকে, তাহাও দুরন্ত দায়াদেরা বেদখল করিয়া দেয়। প্রথম দ্বিগ্বিজয়ের অস্ত্র লৌহনির্মিত, দ্বিতীয়টির অস্ত্র, কণ্ঠনিঃসৃত গালি-বালি-শাণিত উড়িয়াদিগের মতো দ্রুত উচ্চারিত বচন পরম্পরা। এরূপ বিদ্যা অস্ত্রে দিগ্বিজয় শুদ্ধ আমাদেরই দেশে ছিল। ইহার আদি জানা যায় না এবং আজিও "আমার ছেলে যেন দিগ্বিজয়ী হয়" এই বলিয়া ভট্টাচার্য মহাশয়েরা দিবানিশি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন। সেকালে যেমন এক নাইট আর-এক নাইটের নিকট "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া দাঁড়াইলে প্রতিপক্ষকে যুদ্ধ করিতেই হইত; সেইরূপ একজন পণ্ডিত আর-একজনের নিকট "বিচার করো" বলিয়া দাঁড়াইলে যদি শেষোক্ত পণ্ডিত ইতস্তত করিতেন, তখনি তিনি পণ্ডিতমণ্ডলীতে অপদস্থ হইতেন। এইরূপ দিগ্বিজয় বহুকাল প্রচলিত ছিল, আজিও আছে। শংকরাচার্য সেই দিগ্বিজয়ীদিগের অগ্রগণ্য।

তিনি চিদম্বরপুর হইতে বহির্গত হইয়া পদ্মপাদ, হস্তামলক, বিষ্ণুগুপ্ত, আনন্দগিরি প্রভৃতি শিষ্য সমভিব্যাহারে মধ্যার্জুন নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। শংকর মধ্যার্জুনেশ্বর শিবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্ দ্বৈতবাদ সত্য না অদ্বৈতবাদ সত্য?" শিব সশরীরে আবির্ভূত হইয়া মেঘগম্ভীর ধ্বনিতে তিন বার বলিলেন, "সত্যমদ্বৈতং, সত্যমদ্বৈতং, সত্যমদ্বৈতং"। তত্রত্য লোকদিগকে অদ্বৈত মতে আনিয়া শংকর সেতুবন্ধ রামেশ্বর যাত্রা করিলেন। সেতুবন্ধ রামেশ্বর শৈবদিগের এক প্রধান আড্ডা। সাত প্রকারের শিবোপাসক তাঁহার সহিত বিচারার্থ উপস্থিত হইল। শংকর তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া স্বমতে আনয়ন পূর্বক অনন্তশয়ন নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। অনন্তশয়ন বৈষ্ণবদিগের কেন্দ্রস্থান। সেখানে ছয় প্রকারের বৈষ্ণব আসিয়া তাঁহার সহিত বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইল। ইহারাও হারি মানিয়া শংকরের শিষ্যত্ব স্বীকার করিল। তাহার পর একদল কর্মহীন বৈষ্ণবকে স্বীয় ধর্ম গ্রহণ করাইয়া পনরো দিন পশ্চিমাভিমুখে গমন করিলেন। সুব্রাহ্মণ্য স্থানে কুমারধারা নামক নদীতটে তাঁহার বাসা ছিল। সেখানে হিরণ্যগর্ভ অগ্নি ও সূর্য উপাসকদিগের সহিত তাঁহার ঘোরতর বিচার হয়। এই সময়ে শংকরাচার্যের তিন সহস্র

শিষ্য। শঙ্খ-ঘণ্টা-করতালাদি দ্বারা দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ করিয়া চামরাদি দ্বারা গুরুদেবকে ব্যজন করিতে করিতে শিষ্যগণ ক্রমাগত বায়ুকোণে যাত্রা করিতে লাগিল। কৌমুদী নদীতীরবর্তী গণেশের মন্দিরে তাহারা একমাস বিশ্রাম করে। এই সময়েই পদ্মপাদাদি পাঁচ জন প্রধান শিষ্য দিগ্‌গজ বলিয়া অভিহিত হন এবং এইখানে সকলে মিলিয়া মহাসমারোহে গুরুর স্তুতি করেন। ছয় প্রকার গণপতি উপাসক এইখানে স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করিয়া অদ্বৈত মত অবলম্বন করে। এখান হইতে ভবানীনগরে পৌঁছিয়া শংকরাচার্য দুর্গা, লক্ষ্মী, শারদা উপাসক ও কতকগুলি বামাচারী শাক্তকে শিষ্য করিয়া লয়েন। বামাচারীদিগের বাস ঠিক ভবানীনগর নহে, তাহারা নিকটবর্তী স্থান হইতে আসিয়াছিল।

ভবানীনগর হইতে শংকরাচার্য উজ্জয়িনীনগরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে বহু-সংখ্যক কাপালিক ভৈরবোপাসক আসিয়া আচার্যকে কহিল, "তুমি অতি সৎপাত্র, কাপালিক হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তুমি কেন সন্ন্যাসী হইয়া ঘুরিয়া বেড়াও।" আচার্য কহিলেন, "পাজি মাতাল লম্পট তোর আবার ধর্ম ? আজ তোকে মারিয়াই ফেলিব।" বলিয়াই মার। কাপালিক গুরু মারি খাইয়া তিন বার হুং হুং হুং করিয়া শব্দ করিল ; অমনি খড়্গ-কপাল-ঘণ্টা-শূলপাণি দিগম্বর সংহার ভৈরব উপস্থিত। ভৈরব শংকরকে প্রণাম করিয়া কাপালিকগণকে শংকরের শিষ্য হইতে আদেশ দিয়া অন্তর্ধান হইলেন। ইহার পর উন্মত্ত ভৈরব সংবাদ (বঙ্গ ৫ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা ২৪৩) ও চার্বাক এবং সৌগত, কাল, জৈন, বৌদ্ধমত নিরাকরণ। এই বৌদ্ধমত প্রাচীন বৌদ্ধমত হইতে অনেক ভিন্ন। (২৮ অধ্যায় শং বিং)। উজ্জয়িনী পরিত্যাগ করিয়া আচার্য অনুমল্ল, মরুন্ধ, মাগধ, ইন্দ্রপ্রস্থ, যমপ্রস্থপুরে গমন করত মল্লারিমত, বিষ্যক্‌সেনমত, মন্মথমত, কুবেরমত, ইন্দ্রমত, যমমত নিরাকরণ করত গঙ্গাযমুনা মধ্যবর্তী প্রয়াগ নগরে উপস্থিত হইয়া বরুণ, বায়ু, ভূমি, উদক, উপাসকদিগকে স্বদলাক্রান্ত করিয়া লইলেন। প্রয়াগে একজন শূন্যবাদী আসিয়া বলিল, "স্বামিন্ এ-সকলই ফাঁক, সবই শূন্য, আমার নাম নিরালম্ব, পিতার নাম কল্পিতরূপ, মাতার নাম নির্ভরিতা। সবই শূন্য, ব্রহ্মাণ্ড নাই।" আচার্য ইহাকেও নিজমতে আনয়ন করিলেন। প্রয়াগে বরাহমত, লোকমত, গুণ-মত, সাংখ্যমত, যোগমত এবং কাশীতে পীলুমত, কর্মমত, চন্দ্রমত,

গ্রহমত, কালব্রহ্মবাদী ক্ষপণকমত, পিতৃমত, শেষ ও গরুড়মত, সিদ্ধমত, গন্ধর্বমত, তালবেতালমত খণ্ডন করেন। কাশীতে একদিন ভগবান্ মণিকর্ণিকায় স্নান করিয়া নিদিধ্যাসন করিতেছেন ; এমন সময়ে একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি না ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যা করিয়াছ ? বলো দেখি কোথায় অর্থ করিতে তোমার বড়োই কষ্ট পাইতে হইয়াছে ?" শংকর বলিলেন, "তুমি কোথায় ঠেকিয়াছ বলো আমি অর্থ করিয়া দিই।" বৃদ্ধ বলিল, "তদন্তর প্রতিপত্তৌ রংহতি সম্পরিষ্যক্তঃ প্রশ্ন নিরূপণাভ্যাং" এই সূত্রের অর্থ কী ? দুই জনে দুই প্রকার অর্থ করিলেন। কেহই ছাড়িবার পাত্র নহেন। এক কথায় দুই কথায় দুই জনেই মহাগরম। শংকরাচার্য বৃদ্ধের গালে এক চড়। চড় মারিয়াই পদ্মপাদকে বলিলেন, "বুড়াটার পা দুটা উপরপানে করিয়া ঝুলাইয়া দূর করিয়া দিয়া আইস।" বৃদ্ধ বেগতিক দেখিয়া আপনা হইতেই সরিয়া গেল। তখন পদ্মপাদ আচার্যকে নমস্কার করিয়া কহিলেন—

শংকরঃ শংকরঃ সাক্ষাৎব্যাসো নারায়ণঃ স্বয়ং।
তয়োর্বিবাদে সম্প্রাপ্তে কিংকরঃ কিংকরোম্যহং ॥[১]

তখন শংকর অনেক করিয়া ব্যাসকে ফিরাইলেন। তাঁহার পূজা করিলেন ও তাঁহার আশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন। ব্যাস অদ্বৈতবাদের সর্বত্র জয় হইবে ও একশো বর্ষ পরমায়ু হইবে বলিয়া শংকরকে আশীর্বাদ করিলেন।

কাশী হইতে অমরলিঙ্গ, কেদারলিঙ্গ নামক শিবদর্শন করিয়া শংকর কুরুক্ষেত্র দিয়া বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সেখানে শীত জলে স্নান করায় আচার্যের বড়ো কষ্ট হয়, এইজন্য নারায়ণ তাহার জন্য উষ্ণ জলের নদী সেইখান দিয়া প্রবাহিত করিয়া দেন। তাহার পর আচার্য অযোধ্যা, গয়া, দ্বারিকা, জগন্নাথ ভ্রমণ করিলেন। বুদ্ধাখ্যপুরে ভট্টাচার্য নামক একজন পণ্ডিতের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। সে ব্রাহ্মণ উত্তর দেশ হইতে বুদ্ধাখ্যপুর অঞ্চলে আসিয়া বৌদ্ধদিগকে জয় করেন। তিনি তাহাদের শিরশ্ছেদ করেন এবং অনেককে উদুখলে চূর্ণ করেন। শেষ জৈনাচার্যের নিকট যেন কিছু উপদেশ পাইল বোধ হওয়াতে মনে করিলেন, "কী সর্বনাশ জৈনের কাছে শিক্ষা, তবে তো আমি গুরু বধ

করিয়াছি।" এই ভাবিয়া বিজন প্রদেশে হোমাগ্নিতে দেহ দগ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। জানু পর্যন্ত দগ্ধ হইয়াছে এমন সময়ে শংকরাচার্য বিচারার্থ ভট্টাচার্যকে আহ্বান করিলেন। ভট্টাচার্য কতকগুলি গালি দিয়া বলিলেন, "যদি এত কণ্ডুয়ন বাসনা হইয়া থাকে, আমার ভগিনীপতি মণ্ডন মিশ্রের কাছে যাও। আমি মরিলাম", এই বলিয়া তিনি গতাসু হইলেন।

মণ্ডন মিশ্র কর্মকাণ্ডে অতি সুদক্ষ। তিনি জ্ঞানকাণ্ডাবলম্বীদিগের ঘোর বিদ্বেষী। নিবাস হস্তিনাপুর হইতে অগ্নিকোণে, বিজিলবিন্দু নামক বিদ্যালয়ের অতি নিকটে, একটি বিস্তৃত তালবনে। তিনি এই সময়ে পুরদ্বার রোধ করিয়া শ্রাদ্ধ করিতেছিলেন। স্বয়ং ব্যাস নারায়ণ মন্ত্রবলে আহূত হইয়া তথায় রহিয়াছেন। মণ্ডন মিশ্রের অধ্যাপনার এমনি আশ্চর্য গুণ, যে, তাঁহার দাস দাসী সারিশুক পর্যন্ত বড়ো বড়ো সংস্কৃত কবিতা রচনা করিতে পারে।

শংকর পুরদ্বার রুদ্ধ দেখিয়া যোগবলে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সন্ন্যাসী দেখিয়াই মিশ্রঠাকুর চটিয়া লাল। ক্ষণেক বচসার পর ব্যাসের কথায় বন্দোবস্ত হইল, যে, আহারান্তে বিচার আরম্ভ হইবে, যিনি হারিবেন তিনি জেতার মত অবলম্বন করিবেন। সারসবাণী— মণ্ডন মিশ্রের স্ত্রী— মধ্যস্থ থাকিবেন। প্রত্যহ মিশ্র মহাশয় জিজ্ঞাসা করেন কত দূর। শত দিন বিচার। শত দিনের দিন সারসবাণী বলিলেন, নাথ, চলো ভিক্ষা করি গিয়া। বিচারে পরাস্ত হইয়া মণ্ডন সন্ন্যাসী হইলেন। পতিব্রতা সারসবাণী স্বামীর যত্যাশ্রম স্বীকারের পূর্বেই স্বামী জীবিত থাকিতে বিধবা হইতে হইল, দেখিয়া আকাশ পথে ব্রহ্মলোক অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। শংকরাচার্য বলিলেন, সারসবাণী যাও কোথা, আমার কাছে তোমারো পরাভব স্বীকার করিতে হইবে। সারসবাণী তথাস্তু বলিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। সন্ন্যাসী সর্বশাস্ত্রবিশারদ দেখিয়া তিনি প্রথমেই কামশাস্ত্র আলাপ আরম্ভ করিলেন। শংকরের চক্ষু স্থির। শংকরাচার্য একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "মাতঃ আপনি ছয় মাস এই ভাবে থাকুন আমি কামশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া আসি।" এই বলিয়া কামশাস্ত্র শিক্ষার্থ বহির্গত হইলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন, এক রাজার মৃতদেহ শ্মশানে নীত হইতেছে। অমনি মৃত সঞ্জীবনী বিদ্যাপ্রভাবে রাজার দেহ

মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং স্বদেহ রক্ষার্থ চারি জন শিষ্যকে নিযুক্ত করিয়া গেলেন। রাজদেহমধ্যবর্তী শংকরাচার্য রানীর নিকট সমস্ত কামশাস্ত্র শিক্ষা করিলেন। কিন্তু রানী অতি চতুরা, রাজার আচার ব্যবহার তাঁহার কাছে ভালো বলিয়া বোধ হইল না। কেমন একটুকু সন্দেহ হইল। তিনি হুকুম দিলেন, "নিকটে কোথায় মৃতদেহ আছে খুঁজিয়া দাহ করো।" কর্মচারীরা শংকরের দেহ দাহ করিতেছে। চিতা ধু-ধু করিয়া জ্বলিতেছে এমন সময়ে শংকর রাজদেহ পরিত্যাগ করত স্বদেহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। চিতা হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। নৃসিংহদেব অমৃত-বৃষ্টি করিয়া তাঁহার আরোগ্য সাধন করিলেন। শংকর ত্বরান্বিত হইয়া সারসবাণীর নিকট উপস্থিত হইলেন। সারসবাণী দেখিলেন অশ্লীল আলাপ হইবার সম্ভাবনা। আপনিই বলিলেন আমি পরাস্ত হইয়াছি।

এই বলিয়াই সারসবাণী ব্রহ্মলোক গমনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন এবং শংকরাচার্য যোগবলে তাঁহার গতিরোধ করিলেন। কারণ, পূর্বেই উক্ত হইয়াছে মণ্ডন মিশ্র স্বয়ং ব্রহ্মা এবং সারসবাণী স্বয়ং ব্রহ্মপত্নী সরস্বতী। শংকর সরস্বতীকে এইরূপে আয়ত্ত করিয়া শৃঙ্গগিরি নামক স্থানে যাত্রা করিলেন। শৃঙ্গগিরি তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে। সেখানে মঠ নির্মাণ করিয়া সরস্বতীকে বলিলেন, তুমি এইখানে চিরকাল স্থির থাকো। শৃঙ্গগিরিস্থ শিষ্যমণ্ডলীর নাম হইল ভারতী সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ে মূর্খ লোক ছিল না, এই সম্প্রদায়ের লোকই সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পূজনীয়। কিন্তু এক্ষণকার ভারতীদিগের অনেকের বর্ণজ্ঞান পর্যন্ত নাই, অনেকে ভারতী লিখিতে ভারথি লিখিয়া থাকেন।

বিদ্যামঠে অনেক দিন বাস করিয়া পরমগুরু সুরেশ্বর নামে একজন শিষ্যের উপর মঠের সমস্ত ভার দিয়া আবার স্বধর্ম প্রচারার্থ বহির্গত হইলেন। অহোবল নামক স্থানস্থিত নৃসিংহ উপাসকদিগকে অদ্বৈত-বাদী করিয়া বৈকল্যাগিরি পার হইয়া কাঞ্চী নগরে উপস্থিত হইলেন। কাঞ্চী নগরে শিব ও বিষ্ণুর মন্দির ছিল। সেই মন্দিরের নিকটে আচার্য শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণুকাঞ্চী নামক নগরদ্বয় নির্মাণ করিলেন এবং উপাসকদিগকে অদ্বৈতমতাবলম্বী করিয়া তুলিলেন। কাঞ্চী নগর ত্যাগ করিয়া বহুকাল গুহাবাসিনী বিদ্যাকামাক্ষী নাম্নী রুদ্রশক্তির উদ্ধার সাধন

করিলেন। নগর নির্মাণের পর শ্রীচক্র নির্মাণ। তান্ত্রিকদিগের নিকট চক্র অতি আদরণীয়। শ্রীচক্র নয়টি ক্ষেত্রে নির্মিত। ত্রিকোণ চতুষ্কোণ অষ্টকোণ দশকোণ বিন্দু ইত্যাদি। বৈদান্তিকেরা মনে করেন, এই নয়টি ক্ষেত্র প্রকারবিশেষে সংস্থাপন করিলে হরগৌরীর মূর্তি নির্মাণ করা হয়। শ্রীচক্র নির্মাণের পর মোক্ষধর্মোপদেশ।

কিছুকাল এমন বোধ হইল যে শংকরাচার্যের মতই সর্বত্র চলিত থাকিবে, কিন্তু অল্পদিনেই জানা গেল যে লোকে তাঁহার মত গ্রহণ করিতে পারে নাই। আবার অনেকেই পৌত্তলিক হইয়া গিয়াছে। শংকরের মনে বড়োই আশঙ্কা হইল আবার বুঝি নানা অসৎ মতের প্রাবল্য হয়। তিনি নিজ শিষ্য পরমত কালানলকে ডাকিয়া কহিলেন, "কলিতে লোকের বুদ্ধিসুদ্ধি নাই, আমার অদ্বৈত মত কেহ গ্রহণ করিতে পারে নাই. অতএব তুমি অদ্বৈত ধর্মের অবিরোধে শৈব মত প্রচার করত দিগ্বিজয় করো।" পরমত কালানল তাহাই করিলেন, এইরূপে আবার শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, গাণপত্য, সৌর ও কাপালিক মত অদ্বৈত মতের সঙ্গে যোগ হইয়া চলিত হইল, এবং এই ভাবেই আজিও চলিয়া আসিতেছে।

কাঞ্চী নগরেই শংকরাচার্য অলীক দেহ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ চৈতন্য আনন্দময়ে বিলীন হন। শিষ্যেরা মহাসমারোহে তাঁহার সমাধি করিল।

এতদূরে শংকরাচার্যের জীবনচরিত শেষ হইল। 'শংকরদিগ্বিজয়ে'র সঙ্গে উপর্যুক্ত জীবনী অনেক স্থানে মিলিবে না। না মিলিলেও এইটুকু পড়িয়াই বুঝা যাইবে যে শংকরাচার্য কী প্রকারের লোক ছিলেন। তাঁহার জীবনীর সার এই, তিনি একজন অতি বড়ো ভট্টাচার্য ও একজন প্রধান মোহন্ত এই দুইয়ের সমষ্টি।

'বঙ্গদর্শন'
ফাল্গুন, ১২৮৪ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

"বঙ্কিমচন্দ্র কাঁটালপাড়ায়" প্রবন্ধে শাস্ত্রীমশায় লিখেছেন, "নূতন বঙ্গদর্শনে নূতনের মধ্যে আমি, আমি প্রায়ই লিখিতাম, কিন্তু কখনো নাম সহি করি নাই। সেইজন্য এখন সেই-সকল লেখা যে আমার তাহা প্রমাণ করা কঠিন হইয়াছে।" (হ-র-সং-২, পৃ. ২২)। এখন পর্যন্ত তাঁর রচনাপঞ্জীতে অন্তর্ভুক্ত রচনার বাইরেও কিছু লেখা রয়ে যাওয়া খুবই সম্ভব। শাস্ত্রীমশায়ের অনুমোদনে হেয়ার প্রেস থেকে প্রকাশিত *Mahamahopadhyaya Haraprasad Shastri M. A., C. I. E.*, F. A. S. B. (1916) পুস্তিকার রচনাপঞ্জী বা অন্য কোনো রচনাপঞ্জীতে 'বঙ্গদর্শনে'র ফাল্গুন ১২৮৪ সংখ্যায় প্রকাশিত "শংকরাচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী" প্রবন্ধটি গৃহীত হয় নি। কিন্তু এই প্রবন্ধ শাস্ত্রীমশায়েরই লেখা মনে করার কারণ আছে। আশ্বিন ১২৮৪-র 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত "শংকরাচার্য কী ছিলেন?" রচনাটি তিনি শেষ করেছেন এই লিখে, "তাঁহার জীবনচরিত বিষয়ে কিছু বলিবার ইচ্ছা রহিল।" ১২৮৪-র ফাল্গুন সংখ্যাতেই শংকরাচার্যের জীবনী বিষয়ক প্রবন্ধ "শংকরাচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনী" ছাপা হয়েছে। এই প্রবন্ধের মাঝামাঝি অংশে উন্মত্ত ভৈরবের গল্প প্রসঙ্গে বন্ধনীর মধ্যে "বঙ্গ ৫ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা ২৪৩" এইভাবে আগের প্রবন্ধের উল্লেখ রয়েছে। বঙ্গদর্শন ৫ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যাই হচ্ছে ১২৮৪-র আশ্বিন সংখ্যা। আর "শংকরাচার্য কী ছিলেন?" প্রবন্ধের ২৪৩ পৃষ্ঠাতে উন্মত্ত ভৈরবের গল্প বলা হয়েছে। সুতরাং ফাল্গুন সংখ্যার প্রবন্ধটি যে তাঁরই এতে আর সন্দেহ থাকে না। তাছাড়া, লেখার ধরন থেকেও বোঝা যায় প্রবন্ধটি শাস্ত্রীমশায়েরই। শ্রীসুকুমার সেনও প্রবন্ধটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বলে অনুমোদন করেন।

১. অনুবাদ: শংকর (আচার্য) সাক্ষাৎ শিব, ব্যাস স্বয়ং নারায়ণ। দুজনের বিবাদ হলে চাকর আমি করি কী।

ভরত মল্লিক

ভরত মল্লিকের নাম বোধ হয় অনেকেই শুনিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে কে কী বৃত্তান্ত তা বোধ হয় সকলে জানেন না। তিনি কত কালের লোক তাহাও লোকের জানা নাই; কিন্তু তিনি একজন প্রকাণ্ড পুরুষ ছিলেন, ব্যাবসা ছিল চিকিৎসা। তাঁহার বংশাবলী এখনো চিকিৎসা করিতেছেন।

তাঁহার বাড়ি কোথায়?

তাঁহার টীকায় তাঁহার বাড়ির নাম দেওয়া আছে মালঞ্চ। তাঁহার বংশধরেরা চুঁচুড়ায় থাকিতেন। দ্বারিক (মল্লিক) কবিরাজ মহাশয় চুঁচুড়ায় চিকিৎসা করিতেন। তিনি বলিতেন, তাঁহাদের বাড়ি জামগাঁর নিকট পাতিলপাড়া। তাঁহার

আর-এক বংশধর লোকনাথ মল্লিক কবিরাজ মহাশয় শেষ বয়সে কলিকাতায় আসিয়া চিকিৎসা করিতেন। তিনিও বলিতেন, তাঁহাদের বাড়ি জামগাঁর নিকট পাতিলপাড়া। লোকনাথ কবিরাজ মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র জ্যোতির্ময় মল্লিক মহাশয় কলিকাতায় চিকিৎসা করেন। পাতিলপাড়ায় এখনো তাঁহার ভিটা আছে।

তাঁহার সময়।

লোকনাথ কবিরাজ মহাশয় বলিতেন, "তিনি আমার বৃদ্ধ-প্রপিতামহ ছিলেন।" তাহা হইলে খৃস্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রথমাংশে ভরত মল্লিক মহাশয়ের প্রাদুর্ভাবের কাল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মুগ্ধবোধের টীকাকার দুর্গাদাস[১] ভরত মল্লিকের অনেক জায়গা তুলিয়া দিয়াছেন। দুর্গাদাসের মুগ্ধবোধের টীকা ১৬৩৯ সালে লেখা। সুতরাং ভরত মল্লিক তাঁহারো আগেকার লোক। তিনি ইংরেজি সপ্তদশ শতকের প্রথমাংশে জীবিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। ভরত মল্লিক আপনার পিতার নাম দিয়াছেন গৌরাঙ্গ মল্লিক এবং বলিয়া গিয়াছেন তাঁহারা বিনায়ক সেন-সন্তান হরিহর খানের বংশসম্ভূত।

কিন্তু বাংলায় একটা কথা আছে— অনাশ্রয়া ন তিষ্ঠন্তি পণ্ডিতা বনিতা লতাঃ। তিনি পণ্ডিত ছিলেন; তিনি কাহার আশ্রয়ে এ-সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন? তিনি এক জায়গায় বলিয়াছেন, সূর্য-বংশীয় একজন ক্ষত্রিয় রাজার অধীনে থাকিয়া তাঁহার একখানি টীকা রচনা করিয়াছেন। এ সূর্যবংশের রাজা কে ঠিক জানা যায় না, বোধ হয় চকদিঘির রায়েরা। তিনি আর-এক জায়গায় বলিয়া গিয়াছেন, ভুরশুটের একজন রাজার আশ্রয়ে একখানি টীকা লিখিয়াছেন। সুতরাং চকদিঘির রায়েরা এবং ভুরশুটের রাজারা তাঁহার আশ্রয় ছিলেন। এই ভুরশুট রাজাদের বংশে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে ভরতচন্দ্রের প্রাদুর্ভাব কাল। তখন কিন্তু ভুরশুট মুসলমান-দিগের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া করদ-রাজ্যে পরিণত হইয়াছে।

ভরত মল্লিক মহাশয় 'মুগ্ধবোধ' ব্যবসায়ী ছিলেন। 'মুগ্ধবোধে'র সেকালের যত টীকা টিপ্পনী ছিল সকলই তাঁহার দুরস্ত ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, 'মুগ্ধবোধ' লোকে আর পড়িয়া উঠিতে পারিবে না, তাই তিনি 'মুগ্ধবোধে'র দুইখানি সংক্ষিপ্তসার তৈরি করেন। উঁহাদের

মধ্যে যেখানি বই, তাহার নাম 'দ্রুতবোধ'। প্রথমে বাংলা অক্ষরে ছাপা হইয়াছিল। তিনি ইহার টীকাও করেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, সেই টীকার নাম 'দ্রুত-বোধিনী'। উহাতে তিনি 'সুপদ্ম', 'কাতন্ত্র' ও 'সংক্ষিপ্তসার' ব্যাকরণের সাহায্য লইয়াছিলেন। তিনি আর-একখানি ছোটো ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন, তাহার নাম 'প্রসিদ্ধপদবোধ'। এত ছোটো ব্যাকরণ আর সংস্কৃতে নাই। এখানি গত শতাব্দীর প্রথমে বাংলা অক্ষরে ছাপা হইয়াছিল। তিনি যাঁহার উৎসাহে ব্যাকরণগুলি লিখিয়াছিলেন, তাঁহার নাম কল্যাণমল্ল, তাঁহার পিতার নাম গজমল্ল, পিতামহের নাম ত্রৈলোক্যচন্দ্র। ইনি ভরত মল্লিকের বাড়ির নিকটে কোথাও জমিদার ছিলেন, বোধ হয়, চকদিঘির।

কোষের টীকা।

তিনি 'অমরকোষে'র একখানি টীকা লিখিয়াছিলেন। তিনি 'মুগ্ধবোধ'-ভক্ত; সেইজন্য টীকার নাম দিয়াছিলেন 'মুগ্ধবোধিনী'। Eggeling (*Catalogue of Sanskrit Mss.* —Part II, p. 276, Column b.) বলেন, তিনি 'দ্বিরূপকোষ' নামে একখানি অভিধান লিখিয়া গিয়াছিলেন। ইহাতে যে-সকল সংস্কৃত শব্দের দু রকম বানান আছে তাহাদের একটা কোষ আছে। অনেকেই সেই রকম কোষ লিখিয়াছেন, ভরত মল্লিকও একখানি লিখিয়াছেন।

কাব্যের টীকা।

ভরত মল্লিক 'মুগ্ধবোধে'র মতে বহু-সংখ্যক সংস্কৃত কাব্যের টীকা লিখিয়াছেন। 'শিশুপালবধ', 'মেঘদূত টীকা', 'ভট্টিকাব্যটীকা', 'নলোদয়', 'নৈষধটীকা', 'ঘটকর্পরটীকা', 'কুমারসম্ভবটীকা', 'কিরাতার্জ্জুনটীকা', 'রঘুবংশটীকা', তিনি এই-সকল গ্রন্থের টীকা লিখিয়াছেন। তাঁহার কয়েকখানি টীকার নাম 'মুগ্ধবোধিনী', অধিকাংশ টীকার নাম 'সুবোধ'।

তিনি উপসর্গের অর্থ এবং প্রয়োগ সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লেখেন, তাহার নাম 'উপসর্গবৃত্তি'। একখানি একাক্ষর:শব্দকোষ লেখেন, তাহার নাম 'একবর্ণার্থসংগ্রহ' এবং আর-একখানি গ্রন্থ লেখেন তাহার নাম 'কারকোল্লাস'। 'কারকোল্লাস' গ্রন্থখানি গত দুই শত বৎসর ধরিয়া নৈয়ায়িকেরা বিশেষ শাব্দিকেরা বড়ো পছন্দ করিতেন। প্রায় সকল

বাড়িতে 'কারকোল্লাসে'র পুথি পাওয়া যায়। উহাতে কারকের বাদার্থ (Logical relations) দেওয়া আছে। ব্যাকরণ শেষ হইলে পণ্ডিতেরা, বিশেষত শাব্দিকেরা প্রায়ই বাদার্থের বই পড়িতেন বা লিখিতেন। ইহাতে ব্যাকরণঘটিত দর্শন-শাস্ত্রের কথা আছে, যাহাকে এখন Philosophy of Grammar বলা হয়।

ভরত মল্লিক ছিলেন বৈদ্য। তাঁহার বাদার্থের পুথি ভট্টাচার্য মহাশয়েরা আদর করিয়া পড়িতেন ও পড়াইতেন, এ বড়ো কম গৌরবের কথা নয়।

ভরত মল্লিক বৈদ্যদিগের মধ্যে মহাকুলীন। তাঁহার বংশের কৌলীন্য-মর্যাদা এখনো খুব আছে। ভরত মল্লিক বৈদ্যদিগের একখানি কুলগ্রন্থ লিখিয়া যান : ইহার নাম— 'বৈদ্যকুলতত্ত্ব'।

'পঞ্চপুষ্প'

ভাদ্র, ১৩৩৭ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য।

১. "The next important Paṇḍit of this school [*Mugdha-bodh* school of Grammar] is Durgādās Vidyā-vāgīśa, who describes himself as the son of Gāṅgo-līya Vāsu-deva Sārva-bhauma, who is not to be confounded with the great Vāsu-deva Sārva-bhauma (a Banerji) who brought Nyāya-Śāstra from Mithilā and who died at Purī as a disciple of Caitanya about 1533 A.D., in his old age. Durgā-dāsa wrote a commentary on *Mugdha-bodha* entitled *Śubodhā* and another on *Kavi-Kalpa-druma*, both of which are still used by students." (*Sastri-Cat.*, Vol. VI, p. Lxxxiv.)

চিরঞ্জীব শর্মা

আদিশূর[1] যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ বাংলায় লইয়া আসেন, তাঁহাদের মধ্যে দক্ষ একজন। ইনি কাশ্যপ গোত্রের লোক ছিলেন। ইঁহার বংশে ১৬ জন লোক গ্রাম প্রাপ্ত হন এবং গ্রামীণ উপাধি লাভ করেন। গ্রামীণদিগকে বাংলায় গাঞি বা গাঁই বলে। ঘটকদের কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় — কাশ্যপ গোত্রে ষোলো গাঁই। এই ১৬ গাঁইয়ের মধ্যে চাটুতি গাঁইয়ের ছয় ঘর বল্লালের[2] নিকট কৌলীন্য মর্যাদা লাভ করেন। তাঁহারা আপনাদের চট্টোপাধ্যায় বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহারা কখনো দক্ষের দোহাই দেন না।

আমাদের চিরঞ্জীব শর্মা দক্ষের দোহাই দিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছেন।

তাহাতে বুঝিতে হইবে, তিনি কুলীন নন— চট্টোপাধ্যায় নন। কাশ্যপ গোত্রের আর যে পনরোটি গাঁই আছে, তাহার কোনোটিতে তাঁহার জন্ম হইয়াছে। সেটি কোন্ গাঁই, তাহা আমরা জানি না। তবে চিরঞ্জীব শ্রোত্রিয় ছিলেন, এটা ঠিক।

এই বংশে ইংরেজি ১৬০০ অব্দের কাছাকাছি কোনো সময়ে কাশীনাথ নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে খুব পণ্ডিত ছিলেন। তিনি হাত দেখিয়া লোকের ভাগ্যের কথা বলিতে পারিতেন— তিনি লোকের আকৃতি দেখিয়াও তাহার স্বভাব-চরিত্র এবং ভূত-ভবিষ্যৎও বলিতে পারিতেন। হাত দেখিয়া ভাগ্য গণনার নাম সামুদ্রক শাস্ত্র। কাশীনাথের উপাধি ছিল— সামুদ্রকাচার্য।

তাঁহার তিন পুত্র ছিল— রাজেন্দ্র, রাঘবেন্দ্র, মহেন্দ্র। ইঁহারা সকলেই কবি ও পণ্ডিত ছিলেন। রাঘবেন্দ্রের প্রতিভা খুব উজ্জ্বল ছিল। ইনি অনেক শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন। ইনি ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশের ছাত্র ছিলেন।

ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক। ন্যায়শাস্ত্রের মূলগ্রন্থ 'তত্ত্বচিন্তামণি'র উপর রঘুনাথ শিরোমণি[৩] যে 'দীধিতি' নামে টীকা করেন, তিনি তাহার উপর 'প্রকাশিকা' নামে টীকা লেখেন। এই গ্রন্থ পণ্ডিতসমাজে 'ভবানন্দী' নামে প্রসিদ্ধ। 'ভবানন্দী' বাংলা দেশে বড়ো চলে না। চলে পশ্চিমে, চলে মহারাষ্ট্র দেশে। মহাদেব পুন্তামকর নামে একজন মহারাষ্ট্রদেশীয় পণ্ডিত, 'ভবানন্দী'র উপর দুই টীকা লেখেন। একখানির নাম— 'সর্বোপকারিণী'। এখানি ছোটো। আর-একখানি বড়ো টীকা লেখেন, ইহার নাম 'ভবানন্দীপ্রকাশ'। 'ভবানন্দী' বাংলায় চলিল না কেন? ভবানন্দের টোল ছিল নবদ্বীপে। তিনি মুখোপাধ্যায় ছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার কুল ভাঙিয়াছিল। কিন্তু তিনি ঘোর তান্ত্রিক ছিলেন এবং তান্ত্রিক হইলে যাহা হয়— অত্যন্ত মাতাল ছিলেন। তাই নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা তাঁহাকে নবদ্বীপ হইতে তাড়াইয়া দেন। তখন তিনি কাটোয়া ও দাঁইহাটের মধ্যে গঙ্গাতীরে নলাহাটি নামক স্থানে বাস করিতে থাকেন। তাঁহার বংশের পৌত্র ও দৌহিত্রে নলাহাটি এককালে একটা বড়ো পণ্ডিতসমাজ হইয়া উঠিয়াছিল।

রাঘবেন্দ্র নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন এবং তাঁহার অসাধারণ স্মৃতি-শক্তিও ছিল। তাঁহার পাশে বসিয়া একশত জন লোকে একশতটি কবিতা পাঠ করিল। তিনি প্রত্যেকের কবিতা হইতে এক-একটি কথা লইয়া নূতন একশতটি কবিতা করিয়া দিলেন। এইটি তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। লোকে তাঁহাকে শতাবধান বলিত। সাধারণত শতাবধান বলিতে যে একশত বিষয়ে মন দিতে পারে, তাহাকে বুঝায়। পর পর একশত লোক কথা বলিল— সেই কথা মনে করিয়া যে বলিতে পারে, তাহাকে শতাবধান বলে। কিন্তু রাঘবেন্দ্র আর-একরূপ শতাবধান। সমস্যাপূরণেও রাঘবেন্দ্রের যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল। তিনি নানারূপ সমস্যা পূরণ করিতে পারিতেন। তিনি দুইখানি বই লিখিয়াছিলেন। এক-খানির নাম 'মন্ত্রদীপ', আর-একখানির নাম 'রামপ্রকাশ'। একখানি বৈদিকমন্ত্রের বই, আর-একখানি স্মৃতির। মন্ত্রের অর্থ না জানার দরুন যে-সকল বৈদিক কার্য তখনো চলিতেছিল— তাহাতে অনেক গোল ছিল। সেই গোল দূর করিবার জন্য তিনি 'মন্ত্রদীপ' লেখেন। এখানি বোধ হয়, বৈদিকমন্ত্রের ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্তগ্রন্থ। 'রামপ্রকাশ' ধর্মকার্যের কালনির্ণয়ের বই।

দুই জন কবি তাঁহার সম্বন্ধে দুইটি কবিতা লিখিয়াছেন। প্রথমটি এই—

> অহং হরিহরঃ সিদ্ধেরবলম্বা সরস্বতী।
> সাক্ষাচ্ছতাবধানত্বমবতীর্ণা সরস্বতী॥

হরিহর নামে তাঁহার কোনো ছাত্র বা বন্ধু ছিলেন। তিনি বলিতেন, সরস্বতী হইতেই আমার সিদ্ধিলাভ হইয়াছে। সেই সরস্বতীও সাক্ষাৎ শতাবধানরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

আর-একজন কবি বলিয়াছেন—

> পুংরূপাদরিণী সাক্ষাদবতীর্ণা সরস্বতী।
> জিতঃ শতাবধানোঽতো বিষ্ণুনাপি ন জিষ্ণুনা॥

সরস্বতী পুরুষের রূপ ভালোবাসেন বলিয়া পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেইজন্য বিষ্ণুও শতাবধানকে জয় করতে পারেন নাই।

ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ ছাত্র হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে এই শ্লোকার্ধ বলিয়াছিলেন—

অয়ং কোঽপি দেবোঽনবদ্যাতিবিদ্য-
শ্চমৎকারধারামপারাং বিভর্ত্তি ॥

এ ছাত্রটি কোনো দেবতা হইবেন। ইঁহার পড়াশুনা করিবার ধারা নূতন রকম ও চমৎকার।

রাঘবেন্দ্রের একটি পুত্র হইয়াছিল। পিতা রাশি দেখিয়া নাম রাখিলেন— বামদেব। তাঁহার জেঠা মহাশয় তাঁহাকে আদর করিয়া বলিতেন—`তুমি চিরঞ্জীব। তিনি জেঠার দেওয়া নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। বালককালে তাঁহার প্রতিভা দেখিয়া অনেকেই মুগ্ধ হইয়া যাইত। তিনি পিতার নিকট প্রায় সমস্ত শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন। স্বীয় প্রতিভার বলে অপঠিত শাস্ত্রেরও তিনি অধ্যাপনা করিতেন।

তিনি অনেকগুলি বই লিখিয়াছেন এবং অনেক শাস্ত্রে বই লিখিয়া গিয়াছেন— দর্শন, ন্যায়, কাব্য, নাটক, অলংকার, ছন্দ ইত্যাদি। তিনি যশোবন্ত সিংহ[৪] নামক রাঢ় দেশের একজন জমিদারের সভাপণ্ডিত হইয়াছিলেন। এই যশোবন্ত সিংহ ঢাকার নায়েব-দেওয়ান হইয়া প্রভূত যশ ও অর্থ উপার্জন করেন। তখন মুর্শিদকুলি খাঁর জামাই বাংলার স্বাধীনপ্রায় রাজা [সুজা-উদ্-দৌল্লা, রাজত্বকাল ১৭২৭-৩৯ খৃ.]— নামে মাত্র দিল্লির সুবেদার। ঢাকায়ও তখন একজন ফৌজদার থাকিতেন [সৈয়দ গালিব আলি খান্]। যশোবন্ত তাঁহারই কাছে নায়েব ছিলেন। ১৬৬২ সালের পর কয়েক বৎসর ধরিয়া শায়েস্তা খাঁ বাংলার সুবেদার ছিলেন। তখন ঢাকা বাংলার রাজধানী। শায়েস্তা খাঁর সময় বাংলায় আট মণ করিয়া চাউল টাকায় বিক্রয় হইত। এটা একটা মস্ত কথা। শায়েস্তা খাঁ এই ব্যাপারের স্মৃতি রক্ষার জন্য ঢাকায় একটা গেট নির্মাণ করেন ও তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া যান এবং বলিয়া দিয়া যান— আর-যাহার রাজত্বকালে টাকায় আট মণ চাউল হইবে, সেই এই গেট খুলিতে পারিবে। ১৭৩৩ খৃস্টাব্দে যশোবন্তের নায়েব-দেওয়ানির সময় আবার টাকায় আট মণ চাউল বিক্রয় হয়। তাই তিনি মহা-সমারোহে শায়েস্তা খাঁর গেট খুলিয়াছিলেন। এখনো ঢাকার কেল্লায় লোকে সেই গেট দেখাইয়া দেয়।

চিরঞ্জীব এই যশোবন্ত সিংহের বাড়ির পণ্ডিত ছিলেন বা তাঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি যে অলংকারের বই লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম 'কাব্যবিলাস'। 'কাব্যবিলাসে' তিনি সিংহভূপতির নাম করিয়াছেন। কিন্তু 'বৃত্তরত্নাবলী'তে তিনি যশোবন্ত সিংহের প্রচুর স্তুতি-গান করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা একটি শ্লোক তুলিয়া দিলাম। তিনি ৭২ শ্লোকে শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দের লক্ষণ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

কোদণ্ডধ্বনিখণ্ডিতারিপৃতনাসর্ব্বাতিগর্ব্ব প্রভো
গৌড় **শ্রীযশবন্ত সিংহ** নিতরামাকর্ণয়াকর্ণয়।
যত্র স্যুর্মসজা গণাস্ততগণৌ তাখ্যো গণোঽন্তেগুরু-
র্বিশ্রামো রবিভির্ণগৈস্তদুদিতং শার্দূলবিক্রীড়িতম্ ॥[৫]

তিনি তাঁহার 'কাব্যবিলাসে' জয়সিংহ নামক এক নৃপতির উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্লোকটি এই—

উপেত্য ত্রেতাতো নিজচরণহানিক্রমমতঃ
সমস্তাদ্ধর্ম্মোঽভূদ্বলবতি কলাবেকচরণঃ।
পুরস্তাদদ্যৈবং জয়িনি জয়সিংহক্ষিতিপতৌ
বুভূবুশ্চত্বারঃ পুনরভিনবাস্তস্য চরণাঃ ॥[৬]

এই জয়সিংহ বোধ হয়, জয়পুরের রাজা। ইঁহার নাম ছিল—সেওয়াই জয়সিংহ। জয়পুরে ইঁহার রাজত্ব ছিল। এখনকার আলোয়ার তখন তাঁহার রাজত্বভুক্ত ছিল। সেখাবাটিও তাঁহার রাজত্বভুক্ত ছিল। তাহার উপর তিনি বাদশাহের সেনাপতি ছিলেন এবং প্রায়ই দিল্লিতে থাকিতেন। কয়েক বার তিনি ভিন্ন ভিন্ন সুবার সুবেদারিও করিয়াছিলেন। চিরঞ্জীব বলিতেছেন, তিনি জয়লাভ করিলে ধর্ম যে যুগে যুগে এক-একটি পা হারাইয়াছিলেন, সেই সব-কয়টি পা তিনি নূতন করিয়া পাইয়াছিলেন। যে জয়সিংহ সম্বন্ধে চিরঞ্জীব এত বড়ো কথা বলিলেন, তিনি বাংলার সাধারণ জমিদার হইতে পারেন না। তিনি এই বড়ো জয়সিংহই হইবেন। জয়সিংহের নাম সমস্ত দিল্লি সাম্রাজ্যময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

ইনি ১৭১৪ সালে দক্ষিণ হইতে অনেক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়া জয়পুরে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই সময় বাঙালি এক বৈদিক

ব্রাহ্মণ জয়পুর নগর পত্তন করেন। ইঁহার নাম বিদ্যাধর। ইঁহার পূর্বে আমের [অম্বর] জয়পুরের রাজধানী ছিল। আমের দুই পাহাড়ের মাঝখানে একটা গলি। রাজ্য বড়ো হইলে সেখানে আর রাজধানী রাখা চলে না বলিয়া সেখান হইতে ৭ মাইল দূরে এই নগর স্থাপিত হয়।[৭] ইহা এক কূর্মপৃষ্ঠ ভূমির উপর নির্মিত— চারি দিকেই জল চলিয়া যাইবার বন্দোবস্ত আছে। রাস্তাঘাটের ব্যবস্থাও অতি চমৎকার। এই নগর নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গেই বোধ হয়, জয়সিংহের অশ্বমেধ করিবার ইচ্ছা হয়। অশ্বমেধ করিতে হইলে অশ্বকে তো যথেচ্ছভাবে বিচরণ করিতে ছাড়িয়া দিতে হয়। জয়সিংহ তো তাহা পারেন না। তাই তিনি অশ্বকে নিজের মণ্ডলের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন— দিল্লির এলাকায়ও যাইতে দেন নাই— যোধপুরের এলাকায়ও যাইতে দেন নাই।

জয়পুরের রাজা মানসিংহ সম্বন্ধেও চিরঞ্জীব অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। মানসিংহ আকবরের সময় দিল্লির প্রধান ওমরাহ্ ছিলেন। জাহাঙ্গীরের তো তিনি মামাই ছিলেন। তিনি দুই বার বাংলার সুবেদারি করেন। শেষবার প্রতাপাদিত্যকে দমন করিয়া যান।[৮] বাংলায়— বিশেষ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহলে— তাঁহার যথেষ্ট নাম ছিল। তিনি অনেককে অনেক ভূমি ইত্যাদি দান করেন। বাংলার পণ্ডিতরাও তাঁহার অনেক গুণগান করিয়াছেন, তাঁহার নামে নিজেদের বই উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। চিরঞ্জীব তাঁহার সম্বন্ধে এই কবিতাটি লিখিয়াছেন—

অদ্যোবায়ং প্রলয়জলধিস্ত্যক্তবেলোঽপ্যবেলম্
অদ্যাপ্যেষ ভ্রমতি পরিতো ভূপতির্মানসিংহঃ।
ইত্থং কীর্ত্তিক্ষিতিপ! ভবতো জৈত্রযাত্রান্তরালে
ভূয়োভূয়ঃ প্রসরতি সতাং ত্যক্তবাদঃ প্রবাদঃ ॥[৯]

মানসিংহ প্রায় একশত বৎসরের পূর্বেকার লোক হইলেও তখনো তাঁহার কথা লোকের নিকট প্রত্যক্ষের মতো ছিল।

চিরঞ্জীব তাঁহার 'কাব্যবিলাসে' বিজয়সিংহ নামক এক রাজার গুণের কথা বলিয়াছেন। এই বিজয়সিংহ সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না; তিনি বলিয়াছেন, মৃগমদ পাত্র হইতে সরাইয়া লইলেও যেমন অনেক দিন পর্যন্ত তাহার গন্ধ থাকে, সেইরূপ বিজয়সিংহের মৃত্যু হইলেও তাঁহার যশ ভুবনবিস্তৃত ছিল।

চিরঞ্জীব অত্যন্ত পিতৃভক্ত ছিলেন। তাঁহার যা-কিছু লেখাপড়া, তাহা পিতার নিকট হইতেই শেখা। তিনি পিতাকে শিবস্বরূপ বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহা হইতে বড়ো অন্য দেবতা কেহ আছেন বলিয়া জানিতেন না। 'মাধবচম্পূ' নামে তাঁহার যে কাব্য আছে, তাহার প্রত্যেক সর্গের সর্গ-ভঙ্গ শ্লোকে তিনি তাঁহার পিতার গুণগান করিয়াছেন। তিনি বড়ো বাপের ছেলে বলিয়া গুমর করিতেন— নিজের কার্যকে ছোটো বলিয়া প্রচার করিতেন। আমরা সর্গ-ভঙ্গের একটি শ্লোক তুলিয়া দিলাম—

দ্বৈতাদ্বৈতমতাদিনির্ণয়বিধিপ্রোদ্বুদ্ধবুদ্ধিশ্রুতো
ভট্টাচার্য্যশতাবধান ইতি যো গৌড়োদ্ভবোঽভূৎ কবিঃ।
বাল্যে কৌতুকিনা তদাত্মজচিরঞ্জীবেন যা নির্ম্মিতা
চম্পূর্মাধববর্ণিকেহ সমভূদুচ্ছাসকঃ পঞ্চমঃ ॥[১০]

এই শ্লোক হইতেই বুঝা যায়, তিনি এই গ্রন্থখানি তাঁহার পিতার জীবিতকালেই লিখিয়াছিলেন। তিনি ইহা কৌতুকবশত বা বাল্যকালে চাপল্যবশত লিখিয়াছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার পিতা যখন কাশীবাস করেন, তখন তিনি সঙ্গে ছিলেন। পিতার কাশীপ্রাপ্তি হইলে তিনি নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া এই গ্রন্থ প্রচার করেন। তিনি অতি বিনয়-সহকারে নবদ্বীপের পণ্ডিতদিগকে এই গ্রন্থখানি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

বাগ্‌দেবীবদনাদনাদিরচনাবিন্যাসদীব্যন্নব-
দ্বীপপ্রাপ্তজনৈরনেকদিবসং বারাণসীবাসিনঃ।
বিদ্যাসাগরজাগরোন্নতমতের্ভাব্যা মমৈষা কৃতি-
[মৈমাংসকাকৃতি-]
বিদ্বদ্ভিঃ কৃপয়া কয়াপি সহসা মাৎসর্য্যমুৎসৃজ্য তৈঃ ॥[১১]

ইনি ইহাতে যে বিদ্যাসাগরের উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি কে, তাহা ঠিক বলা যায় না। বাংলায় যত পণ্ডিত ছিলেন, তাহার মধ্যে এক বিদ্যাসাগরের নাম সুবিখ্যাত, তিনি কলাপ ও ভট্টির টীকাকার। কিন্তু তাঁহার কাল নির্ণীত হয় নাই।

ইনি 'কাব্যবিলাসে' গুরুবিষয়া রতির উদাহরণে গুরু রঘুদেব ভট্টাচার্যের নাম করিয়াছেন। বোধ হয়, ইনি ইঁহার নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন

করিয়াছিলেন। ইঁহার মতে রঘুদেবের নিকট যাঁহারা অধ্যয়ন করিতেন, তাঁহাদের আর অন্য গুরুর উপাসন করিবার কোনো দরকার হইত না। ইনি লিখিয়াছেন—

ইমৌ ভট্টাচার্য্যপ্রবররঘুদেবস্য চরণৌ
শরণ্যৌ চিত্তান্তর্নিরবধি বিধায় স্থিতবতঃ।
কিমন্যৈর্বাগ্‌দেবীপ্রমুখভাজাং প্রভজনৈঃ
পরিস্ফূর্ত্ত্যৈ বাচামমৃতলহরীনির্ঝরজুষাম্ ॥[১২]

রঘুদেব, জগদীশ তর্কালংকারের সমসাময়িক লোক। ইনি জগদীশের ছাত্র ছিলেন। ন্যায়শাস্ত্রে ইঁহার লেখা অনেকগুলি বই আছে।

চিরঞ্জীব শর্মার একখানা কাব্যের নাম 'মাধবচম্পূ'। গদ্যপদ্যময় কাব্যের নাম চম্পূ। এই চম্পূর নায়ক শ্রীকৃষ্ণ। তাঁহার রাজধানী মধুপুর। তিনি একবার মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। মৃগয়ায় যে-সকল পশু লক্ষিত হয়, কবি সে-সকলের বেশ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বোধ হয়, কখনো মৃগয়া দেখেন নাই— কখনো শিকার খেলিতে যান নাই। তাঁহার গ্রন্থে শিকারের আমোদ আমরা পাই না। কিন্তু তবু তিনি জানোয়ারদের যেরূপ প্রকৃতি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে আশ্চর্য হইতে হয়। 'নহি কিঞ্চিদবিষয়ো ধীমতাম্।' এই মৃগয়াব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের এক সহচর ছিলেন, তাঁহার নাম কুবলয়াক্ষ। এ নাম আমরা পুরাণাদিতে পাই না। মৃগয়ার বর্ণনায় জানোয়ারদের পরস্পর লড়াইয়ের বর্ণনাই বেশি। হাতিতে হাতিতে লড়াই, কুকুরে হরিণে লড়াই, সিংহে শূকরে লড়াই, বানরের উকুন খাওয়া— এই-সকলই দেখিতে পাই।

অনেকক্ষণ মৃগয়া করিয়া শ্রীকৃষ্ণের তৃষ্ণা পাইল, তিনি এক হ্রদের ধারে বসিলেন। সেখানে কলাবতী নামে একটি মেয়ে স্নান করিতে আসিল। শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে দেখিলেন— কলাবতীও শ্রীকৃষ্ণকে দেখিল। উভয়ে উভয়ের মন চুরি করিয়া চলিয়া গেলেন।

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় পৌঁছিলে কিছুদিন পরে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া গেল— "উড়িষ্যার রাজার কন্যা কলাবতীর স্বয়ংবর। সেখানে অনেক দেশের রাজা আসিবেন, আপনিও চলুন।"

স্বয়ংবরে আসিয়াছিলেন বাংলা দেশের রাজা, গৌড় দেশের রাজা, মিথিলার রাজা, কাশীর রাজা, নেপালের রাজা, দক্ষিণ দেশের রাজা,

কাশ্মীরের রাজা ও মধুপুরের স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। স্বয়ংবরের যাহা ফল, তাহা তো জানাই আছে। কলাবতী শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠে মাল্য অর্পণ করিলেন— শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে লইয়া চলিলেন। রাস্তায় রাক্ষসদের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হইল। সে যুদ্ধে জয়ী হইয়া তিনি মধুপুরে কিছুকাল কলাবতীকে লইয়া আমোদ আহ্লাদে বসবাস করিতে লাগিলেন। এমন সময় নারদ আসিয়া তাঁহাকে দ্বারকায় যাইতে বলিলেন। তিনি দ্বারকায় গেলে কলাবতী বিরহে ছটফট করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে তিনি এক হংসকে দূত করিয়া দ্বারকায় পাঠাইলেন। হংস কলাবতীর বিরহের অবস্থা বর্ণনা করিলে শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ করিয়া দিলেন— "ভারতখণ্ডে বড়ো রাক্ষসের উপদ্রব। আমি তাহা নিবারণ করিতে চলিলাম।" এই বলিয়া তিনি মধুপুরে কলাবতীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তাঁহার আর-একখানি বই 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী', ইহাতে আটটি তরঙ্গ আছে। প্রথমটিতে কবির নিজের এবং বংশের পরিচয়। দ্বিতীয় তরঙ্গ হইতে গ্রন্থের আরম্ভ। এক প্রভুর বাড়িতে অনেক পণ্ডিতের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। তাঁহারা ক্রমে আসিতেছেন। প্রথম আসিলেন বৈষ্ণব— নাক হইতে মাথা পর্যন্ত তিলক; সমস্ত শরীরে শঙ্খ, চক্র, পদ্মের ছাপ; হলুদে ছোপানো কাপড়; গলায় তুলসীর মালা; মুখে হরি-নাম। তিনি আসিয়া প্রভুকে আশীর্বাদ করিলেন— "নারায়ণ আসিয়া তোমার চিত্তে আবির্ভূত হউন।" তাহার পর শৈব আসিলেন। তাঁহার মাথায় জটা, কোমরে ব্যাঘ্রচর্ম, সর্বাঙ্গে বিভূতি আর আধখানা শরীর রুদ্রাক্ষে ঢাকা। তার পর শাক্ত আসিলেন— মাথায় জবাপুষ্প, গলায় মল্লিকা ফুলের মালা, ললাটে রক্তচন্দনের তিলক, গায়ে চন্দন মাখা। তাহার পর আসিলেন হরিহরাদ্বৈতবাদী ও নৈয়ায়িক— নৈয়ায়িকের হাত ধরিয়া আছেন বৈশেষিক। তাহার পর মীমাংসক, বৈদান্তিক, সাংখ্য পণ্ডিত ও পাতঞ্জল পণ্ডিত, পৌরাণিক, জ্যোতির্বিদ, কবিরাজ মহাশয়, বৈয়াকরণ, আলংকারিক, নাস্তিক পর পর আসিলেন। নাস্তিক ঝাঁটা দিয়া পথ পরিষ্কার করিতে করিতে এবং পাছে কীট পতঙ্গ মারা যায়, এই ভয়ে সাবধানে পা ফেলিতে ফেলিতে আসিতে লাগিলেন। তাঁহার মস্তক মুণ্ডিত— চুলগুলি উপড়াইয়া ফেলা হইয়াছে। তিনি বলিতে

লাগিলেন, বঞ্চকেরা তোমাদের শিখাইয়াছে— দেবতাদের অর্চনা করো, প্রতিদিন জন্মান্তরে ভোগের জন্য পুণ্য করো, মহাযজ্ঞের জন্য হিংসা করো। এই-সকল কথা তোমরা শুনিও না। যাহাতে প্রত্যক্ষ পদার্থ নাই, এমন পথে তোমাদের বুদ্ধি যাউক অর্থাৎ ধর্ম সম্বন্ধে তোমাদের বুদ্ধি কল্পনার বিষয় হউক। সকলে হাসিয়া উঠিল এবং বলিল, এ দুরাত্মা পাপিষ্ঠ কে, কোথা হইতে আসিল? সে বলিল, আমি পাপিষ্ঠ দুরাত্মা আর তোমরা ভারি পুণ্যশীল— কেবল বৃথা পশু হিংসা কর। মীমাংসক সদর্পে বলিলেন— যজ্ঞে হত পশু স্বর্গে যায়। তাহাতে দেবতাদের তৃপ্তি হয়, যজমানের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়। এমন বৈধ হিংসাকে তুমি অন্যায্য বল। নাস্তিক বলিল, কী ভুল, দেবতা কোথায়, যজ্ঞ কোথায়, জন্মান্তরই বা কোথায়? মীমাংসক বলিলেন, এ কী, বেদ-পুরাণশাস্ত্রে যে-সমস্ত জিনিসের প্রশংসা আছে, তাহাকে তুমি নিন্দা করিতেছ?

নাস্তিক— বেদ তো বঞ্চকের কথা। তাহার প্রামাণ্য কী? পুরাণেরই বা প্রামাণ্য কী? তাহারা অতীন্দ্রিয় বস্তুর কথা দিয়া সমস্ত জগৎকে বঞ্চনা করে মাত্র।

মীমাংসক— কর্ম যদি না থাকে, কী কারণে লোক সুখ-দুঃখ ভোগ করে?

নাস্তিক— কর্ম কোথায়? কে দেখিয়াছে? কে সেই কর্ম অর্জন করিয়াছে? যদি বল, জন্মান্তরকৃত কর্ম, তবে তাহার প্রমাণ কী? সুখ-দুঃখাদি তো প্রবাহধর্ম। মানুষ কখন সুখ, কখন দুঃখ ভোগ করে, তাহার ঠিকানা নাই। বস্তুত জগৎটাই অসৎ। আর যাহা-কিছু দেখিতেছি, সমস্তই ভ্রম।

এই কথা শুনিয়া মীমাংসক চুপ করিয়া গেলেন। তখন বেদান্তী আসিলেন। তিনি বলিলেন, ঠিক বলিয়াছ, জগৎ মিথ্যা ঠিক। কেবল সত্য এক ব্রহ্ম আছেন। তাহাতেই মিথ্যা জগৎকে সত্য বলিয়া ভ্রম হয়। নাস্তিক বলিলেন, বেশ, বেশ, তুমি তো আমার মতেই আসিয়াছ। তবে আবার একটা ব্রহ্ম কেন? তোমার ব্রহ্ম কিরূপ?

বেদান্তী— তিনি ক্রিয়াহীন, নিরাকার, নির্গুণ, সর্বগামী, তেজঃস্বরূপ, তিনি পরমানন্দ ও বাক্য এবং মনের অগোচর।

নাস্তিক— তবে আর মিথ্যা আকারশূন্য ক্রিয়াশূন্য একটা ব্রহ্ম লইয়া কী করিবে ?

এই কথা বলিলে বেদান্তী চুপ করিয়া গেলেন। তখন লোকে নৈয়ায়িকের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। নৈয়ায়িক গর্বভরে বলিলেন, তুমি আপনার মতটা আগে পরিষ্কার করিয়া বলো, তার পর অন্য কথা কহিও। যে কানা, সে যদি বলে— তোমার চক্ষু সুন্দর নয়, তবে লোকে হাসিবে। নাস্তিক ভাবিলেন, আমরা যুক্তিধারা বর্ষণ করি। এ দেখিতেছি, ঝড় হইয়া আমাদিগকে উড়াইয়া দিতে আসিতেছে। কিছু ভাবিয়া বলিল, আমাদের মত শোনো— মাধ্যমিকদিগের শূন্যবাদ, যোগাচারদিগের ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ, সৌত্রান্তিকদিগের জ্ঞানাকারানুমেয় ক্ষণিকবাহ্যার্থবাদ, বৈভাষিকদিগের ক্ষণিকবাহ্যার্থবাদ, চার্বাকদিগের দেহাত্মবাদ এবং দিগম্বরদিগের দেহাতিরিক্ত দেহ-পরিমাণবাদ, আমাদের এই ছয়টি প্রস্থান। আমাদের সকলেরই এই সিদ্ধান্ত— স্বর্গ নাই, নরক নাই, ধর্ম নাই, অধর্ম নাই, এ জগতের কর্তা, হর্তা, ভর্তা কেহ নাই। প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ নাই। দেহ ভিন্ন কর্মফলভোগী কেহ নাই। সমস্তই মিথ্যা ; এগুলিকে যে সত্য বলিয়া মনে হয়, সে কেবল মোহ। অহিংসাই পরম ধর্ম, আত্মপ্রপীড়ন মহাপাপ, অপরাধীনতাই মুক্তি, অভিলষিত বস্তু ভক্ষণের নাম স্বর্গ।

তার্কিক উপহাস করিয়া বলিলেন, যদি তোমার প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর প্রমাণ না থাকে, তবে তুমি যখন বিদেশে যাও, তখন তোমার স্ত্রী বৈধব্য আচরণ করুক ; কেন-না, বিদেশগত আর মৃত এই দুই জনই অদর্শন বিষয়ে তুল্য।

নাস্তিক বলিলেন, মৃতের পুনর্বার দর্শন হয় না। কিন্তু যে বিদেশে গিয়াছে তাহার পুনর্বার দর্শনের সম্ভাবনা আছে।

তার্কিক জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপে সম্ভাবনা আছে ? সে যখন বিদেশে গিয়াছে, তখন না-আছের দিকেই সম্ভাবনা বেশি। তাহা হইলে, কেন শোক না হইবে ?

নাস্তিক— পত্রাদির দ্বারা যখন খবর পাওয়া যায়, তখন কেন তাহার জন্য শোক করিবে ?

তার্কিক— তাহা হইলে পত্রাদি পড়িয়া অনুমান করিয়া লইতে

হইবে তো ? তবে অনুমানও তো প্রমাণ দাঁড়াইল, এইরূপে শব্দও প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ; কেন-না, যদি আপ্তবাক্যে তোমার বিশ্বাস না থাকে, তবে চিঠিতে তোমার বিশ্বাস কী ?

নাস্তিক অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, মানিলাম, শব্দ ও অনুমান প্রমাণ হইল। কিন্তু তাহাতে ঈশ্বরসিদ্ধি হয় কী করিয়া ?

নাস্তিক যদি অনুমান ও শব্দকে প্রমাণ বলিয়া মানিলেন, তাহা হইলেই তো তিনি হারিয়া গেলেন। তাঁহার আর সে সভায় কথা কহা উচিত নহে। কিন্তু চিরঞ্জীব শর্মা তাঁহাকে দিয়া আরো কথা কহাইয়াছেন।

এইরূপে নাস্তিক প্রতি পদেই হারে এবং হারিয়া একটা নূতন প্রশ্ন তোলে। সকল কথায় সে হারিয়া গেল। তখন সভার যিনি প্রভু ছিলেন— তিনি প্রথম নৈয়ায়িককে, তাহার পর মীমাংসককে, তাহার পর সাংখ্যমতবাদীকে, তাহার পর যোগবাদীকে আপন আপন মত ব্যক্ত করিতে বলিলেন এবং অন্য অন্য দর্শনের সহিত যে যে বিষয়ে তাঁহাদের বিবাদ আছে, তাহা ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। যোগশাস্ত্রজ্ঞ তাঁহার মত ব্যাখ্যা করিলে পর শৈব বলিলেন, যোগীকে মুক্তি দিবার কর্তা শিব। বৈষ্ণব বলিলেন, না, বিষ্ণু। তাহার পর রামাইত আসিয়া বলিলেন, রাম। তখন তিন জনে ঝগড়া বাধিয়া গেল। মাঝে আর-একজন আসিয়া বলিলেন, না, না, মুক্তি তো রাধা দিবেন। এইরূপে চার-পাঁচ জনে খুব তর্ক-বিতর্ক হইতেছে, এমন সময় একজন সর্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত সভায় প্রবেশ করিলেন। প্রভু তাঁহাকে জানিতেন, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বিচারের মীমাংসা করিয়া দিতে বলিলেন। তিনি মীমাংসা করিলেন— হরি ও হরের অদ্বৈত জ্ঞানই মুক্তির কারণ এবং উপসংহারে বলিলেন—

> যে চাত্মনো নূনমভিন্নতায়াং
> শরীরভেদাদপি ভেদমাহুঃ।
> তেষাং সমাধানকৃতে হরেণ
> দেহার্দ্ধধারী হরিরপ্যকারি ॥[১৩]

এই বইয়ে চিরঞ্জীব শর্মা লোকায়ত, দিগম্বর জৈন, আর বৌদ্ধদের চারি দার্শনিক সম্প্রদায়কে এক করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি লোকায়ত-

দের জৈনদের মতো পথ ঝাঁট দিতে দিতে যাইবার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাহারা এরূপ কখনো করিত না। তাহাদের মত যথার্থ নাস্তিক। কেন-না, যাহারা পরকাল মানে না, তাহারাই প্রকৃত নাস্তিক। লোকায়তেরা পরলোক মানিত না। কিন্তু বৌদ্ধ ও জৈন উভয়েই পরলোক মানে। তাহাদিগকে লোকায়তদের সহিত এক করা ভালো হয় নাই। যদি বলো, উহারা সকলেই নিরীশ্বর ; সেইজন্য নাস্তিক বলিব, তাহা হইলে সাংখ্যবাদী এবং মীমাংসকাদিগকেও নাস্তিক বলিতে হয়। চিরঞ্জীব মনে করিতেন— যাহারা বেদ মানে না, তাহারাই নাস্তিক।

দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী'তে যে-সমস্ত কথা আছে, তাহা দর্শন শাস্ত্রের চটি বইয়ের অপেক্ষা অনেক বেশি। চটি বইয়ে এক-এক দর্শনের সিদ্ধান্তগুলি মাত্র পাওয়া যায়— অন্য দর্শনের মতের খণ্ডন-মণ্ডন পাওয়া যায় না। চিরঞ্জীব দুই-ই দিয়াছেন। তাহাতে চিরঞ্জীবের বই সাধারণের খুব উপযোগী হইয়াছে এবং নাট্যাকারে ও একটু রসালো ভাষায় লেখা বলিয়া ইহা সাধারণের নিকট খুব মিষ্ট লাগে। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে শোভাবাজারের রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর[১৪] এই গ্রন্থখানির একটি বাংলা তর্জমা করিয়াছিলেন, তর্জমা এখন আর পাওয়া যায় না— কিন্তু বৃদ্ধদের মুখে শুনিয়াছি, তিনি আরো রসালো ভাষায় তর্জমা করিয়াছিলেন— পড়িবার সময় লোকে হাসি থামাইতে পারিত না। এইরূপ আমাদের স্বদেশী বইয়ের এখন যদি প্রচার হয়, তাহা হইলে বাঙালিকে এখন আর দর্শনশাস্ত্রের জন্যে পরের দ্বারে ভিক্ষা করিতে যাইতে হয় না।

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'
তৃতীয় সংখ্যা, ১৩৩৭ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্যবিবরণীর খাতায় উল্লেখ আছে, ২৪ মাঘ ১৩৩৭, ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩১, শনিবার ৫টায় অনুষ্ঠিত নবম বিশেষ অধিবেশনে 'চিরঞ্জীব শর্মা' প্রবন্ধটি পড়া হয়েছিল। শারীরিক অপটুতার জন্য লেখক সভায় অনুপস্থিত থাকায় সভাপতি হীরেন্দ্রনাথ দত্তের অনুরোধে চিন্তাহরণ চক্রবর্তী প্রবন্ধটি পড়ে শোনান। পড়া শেষ হলে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মন্তব্য করেন, "অদ্যকার প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের উপযুক্ত প্রবন্ধ। প্রবন্ধে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে ইহাতে প্রত্নতত্ত্বের আলোচনার ভাব সমান রহিয়াছে— তিনি এই বিষয়টি শৃঙ্খলার সহিত সাজাইয়াছেন। চিরঞ্জীবের 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী' শোভাবাজার রাজবাটী হইতে একশত বৎসর আগে ছাপা হইয়াছিল। ইহা সংগ্রহ করিয়া পরিষৎ হইতে প্রকাশের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। এই কার্য্যের জন্য তিনি শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণবাবুকে শোভাবাজার রাজবাটী অনুসন্ধান করিয়া উক্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করিলেন। তৎপর তিনি প্রবন্ধ লেখক ও পাঠক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।..."

১৩৩৭-এর চতুর্থ সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন, কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী'র বাংলা অনুবাদ করেন নি, ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন। 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায় ৪ ফাল্গুন ১২৩৮, ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৩২ তারিখে ইংরেজি অনুবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, "উদ্ধৃত অংশ হইতে জানা যাইতেছে যে, চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য 'গুপ্তপল্লি-নিবাসী' এবং তাঁহার বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী আনুমাণিক ১৭৬০ খ্রীষ্টীয় সালে রচিত।" ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই আলোচনায় উল্লেখ করেছেন, 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী'র বাংলা পদ্য অনুবাদ করেছিলেন রাধামোহন সেন দাস। এই অনুবাদ ১২৩২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল, পরে ১১ আশ্বিন ১২৫৪ বঙ্গাব্দে বইটি কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটির উদ্যোগে পুনর্মুদ্রিত হয়।

১. আদিশূর নামে কোনো রাজা কনৌজ থেকে পাঁচ জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনিয়েছিলেন, এই কাহিনী পাওয়া যায় কুলশাস্ত্রে। কুলজিকে

নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক দলিল মনে করা হয় না। বিভিন্ন কুলজিতে ব্রাহ্মণ আনার তারিখ ভিন্ন ভিন্ন— ৬৫৪, ৬৭৫, ৮০৪, ৮৫৪, ৮৬৪, ৯১৪, ৯৫৪, ৯৯৪, ৯৯৯ শকাব্দ। ফলে কুলশাস্ত্র অনুসারেও আদিশূরের সময় ঠিক করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন কুলশাস্ত্রে আদিশূরের বংশ-পরিচয়ও এক রকম নয়। কোথাও বলা হয়েছে ইনি বল্লালসেনের মাতামহ, কোথাও বল্লালের প্রাচীনতর পূর্বপুরুষ। পাঁচ জন ব্রাহ্মণের নামও সর্বত্র এক নয়।

নবম শতাব্দীর মৈথিল পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র তাঁর সমকালীন এক আদিশূর রাজার উল্লেখ করেছেন। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার অনুমান করেন, ইনি পালরাজাদের সামন্তরূপে বিহার ও বাংলার উত্তর অঞ্চলের কিছু অংশ শাসন করতেন। হয়তো এঁরই কোনো কীর্তির প্রতিফলন ঘটেছে পূর্বভারতে পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ আনার গল্পে। আদিশূরের গল্পে শকাব্দের উল্লেখ করা হয়, সেন-আমলে শকাব্দের ব্যবহার প্রতিষ্ঠিত হবার পরে গল্পটি প্রচলিত হয়ে থাকবে।

পাল-আমল থেকে দক্ষিণ-ভারতীয়দের বাংলায় আসা শুরু হয়েছিল। পালরাজাদের অনেকে দক্ষিণী রাজবংশে বিয়ে করেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে কর্ণাট এবং চোল জাতির সম্পর্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেন রাজবংশ কর্ণাট থেকে বাংলায় এসেছিলেন এবং তাঁদের আনুকূল্য পাবার আশায় দক্ষিণ ভারত থেকে অনেকে বাংলায় বসবাস করতে এসেছিলেন। চোলরাজ তৃতীয় কুলোত্তুঙ্গের সময়ের (আ. ১১৭৮-১২১৬ খৃ.) একটি শিলালিপিতে উল্লেখ আছে, অরিন্দম নামে কোনো প্রাচীন চোলরাজা অন্তর্বেদি থেকে, অর্থাৎ গঙ্গা-যমুনার মাঝের কান্যকুব্জ অঞ্চল থেকে, অনেক পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ আনিয়ে চোল দেশে বসতি করিয়েছিলেন। এই ব্রাহ্মণদের সঙ্গে ছাতি-জুতো বহন করে গিয়েছিলেন শূদ্র চাকরেরা। অধ্যাপক সরকার মনে করেন, দক্ষিণ থেকে আগতদের সঙ্গে চোলরাজা অরিন্দমের কাহিনীটি বাংলায় এসে আদিশূরের কাহিনী রূপে আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা। দ্র. দীনেশচন্দ্র সরকার, 'পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত', কলকাতা, ১৯৮২, পৃ. ১৫৭-৬৪ ; বা-ই, পৃ. ২৬৩-৬৫, বাঙ্গা-ই-১, পৃ. ২৩০-৩৫।

২. বিজয়সেন ও বিলাসদেবীর ছেলে বল্লালসেনের রাজত্বকাল আনুমানিক ১১৫৯-৭৯ খৃ.। আনন্দ ভট্ট রচিত 'বল্লালচরিত' (১৫২০ খৃ.) অনুযায়ী বল্লালসেনের রাজত্ব ছিল বঙ্গ, বরেন্দ্র, রাঢ়, বাগড়ি এবং মিথিলা— এই পাঁচটি প্রদেশে বিস্তৃত। বাংলার কুলজি-বিবরণে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজে কৌলীন্যপ্রথা প্রবর্তকরূপে বল্লালসেনের উল্লেখ

আছে। এইসব তথ্যের ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্য অনিশ্চিত। বল্লালসেন সুপণ্ডিত ছিলেন। 'দানসাগর' সম্পূর্ণ এবং 'অদ্ভুত-সাগর' গ্রন্থের অধিকাংশ তাঁর রচনা। বৃদ্ধবয়সে বল্লালসেন ছেলে লক্ষ্মণসেনের হাতে রাজ্যের ভার দিয়ে সম্ভবত সমহিষী গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দেন। দ্র. দীনেশচন্দ্র সরকার, পূর্বোক্ত সূত্র।

৩. গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের 'তত্ত্বচিন্তামণি'র উপরে শ্রেষ্ঠ টীকা 'তত্ত্বচিন্তামণি-দীধিতি'-প্রণেতা রঘুনাথ শিরোমণির জন্ম ১৪৫৫-৬০ খৃস্টাব্দের মধ্যে, মতান্তরে ১৪৭৭ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে। প্রচলিত কিংবদন্তি অনুসারে ইনি বাসুদেব সার্বভৌমের ছাত্র, চৈতন্যদেবের সতীর্থ এবং মিথিলায় নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রের কাছে পড়তে গিয়ে গুরুকেই তর্কে পরাস্ত করেন। সাল তারিখের বিচারে এসব কিংবদন্তির কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি পাওয়া যায় না। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ দেখিয়েছেন পক্ষধর মিশ্র এবং রঘুনাথ এক সময়ের মানুষ ছিলেন না। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগেই রঘুনাথ অন্য সব পণ্ডিতের উপরে আধিপত্য বিস্তার করে নব্যন্যায়ে নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন। তাঁর গ্রন্থ ভারতের সর্বত্র সমাদৃত।

তাঁর আনুমানিক মৃত্যুকাল ১৫৪৭ খৃস্টাব্দ। দ্র. *H-I-L*, pp. 463-65.

৪. "On the transfer of Murshid Quli II to Orissa after the death of Muhammad Taqi Khān, the deputy governorship of Dacca was formally conferred on Sarfarāz Khān. Sarfarāz did not personally go to the seat of his government, but sent there, as his deputy, Sayyid Ghālib Āli Khān. Jaswant Rāy, formerly a *munshi* in the government of Murshid Quli Ja'far Khān and guardian-tutor of Sarfarāz, was appointed his *diwān* ;... Trained in the art of government under Murshid Quli Ja'far Khān, Jaswant Rāy, by the steady and conscientious discharge of his duties, succeeded in contributing to the peace and prosperity of the people of Dacca as well as in securing an increased revenue for the state. The various monopolies, introduced by Mir

Habib, and the duties upon grain, were abolished. The prices of articles became consequently as low as in the days of Shāistā Khān, that is, 8 mounds of rice per rupee, and the western gate of the city of Dacca, which had been closed by Shāistā Khān with the injunction that no governor should open it till he had reduced the price of grain to that level, was now reopened for the first time." (*H-B*-II, pp. 426-27).

নিখিলনাথ রায় "যশোবন্ত সিংহ ও যশোবন্ত রায়" প্রবন্ধে যশোবন্ত সিংহ, জয়সিংহ এবং বিজয়সিংহ সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁর মতে রাঢ় দেশের জমিদার যশোবন্ত এবং ঢাকার নবাব দেওয়ান যশোবন্ত এক ব্যক্তি নন। প্রবন্ধটির প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে তুলে দেওয়া হল—

"শাস্ত্রী মহাশয় চিরঞ্জীব শর্ম্মাকে যে যশোবন্ত সিংহের সভাপণ্ডিত বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন, তাঁহাকে কর্ণগড়ের রাজা বলিয়াই মনে হয়। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাকে রাঢ় দেশের এক জন জমীদার বলিতেছেন। চিরঞ্জীব শর্ম্মা তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

কোদণ্ডধ্বনিখণ্ডিতারিপৃতনাসর্ব্বাতিগর্ব্ব প্রভো।
গৌড় শ্রীযশবন্ত সিংহ নিতরামাকর্ণয়াকর্ণয় ॥

"এই যশোবন্ত সিংহ যে এক জন সামান্য জমীদার নহেন, তাহা অবশ্য বুঝা যাইতেছে। কর্ণগড়ের যশোবন্তের এবং ইঁহার একই সময় হওয়ায় দুইজনকে একই ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। বিশেষতঃ চিরঞ্জীব শর্ম্মার যশোবন্ত যেরূপ পরাক্রান্ত, কর্ণগড়ের যশোবন্তও যে সেইরূপ ছিলেন, তাঁহাদের বংশপরিচয় হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়। আর একটি কথা এই যে, চিরঞ্জীব শর্ম্মা তাঁহার যশোবন্ত সিংহকে 'গৌড়' যশবন্ত সিংহ বলিতেছেন, সুতরাং তখন গৌড়ে এক জন প্রসিদ্ধ যশোবন্তই ছিলেন বলিয়া মনে হয়। ইহাকে 'গৌড়' নামে অভিহিত করার কারণ বোধ হয়, সে সময়ের বিখ্যাত মাড়ওয়াররাজ যশোবন্ত সিংহ হইতে তাঁহাকে স্বতন্ত্র বলিয়া বুঝান হইয়াছে। যদিও মাড়ওয়ারের যশোবন্ত সিংহ ইহার কিছু পূর্ব্বে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার স্মৃতি তখনও পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। শাস্ত্রী মহাশয় চিরঞ্জীব শর্ম্মার যশোবন্ত সিংহকে যে মুন্সী যশোবন্ত রায় বলিতেছেন, তাহা সম্ভব নহে। চিরঞ্জীব শর্ম্মার বর্ণিত যশোবন্ত সিংহ

কোদণ্ড পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদে আসিয়া যে লেখনী ধারণ করিয়া মুন্সীর কার্য্য করিয়াছিলেন, ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার কর্ণগড়ের রাজা হওয়াই সম্ভব।

"শাস্ত্রী মহাশয় চিরঞ্জীব শর্ম্মার উল্লিখিত জয়সিংহকে রাজপুতনা-জয়পুরের সওয়াই রাজা জয়সিংহ বলিতেছেন। অবশ্য সে সময়ে বঙ্গদেশে জয়সিংহ নামে কোন প্রসিদ্ধ রাজার কথা জানা যায় না। আর চিরঞ্জীব শর্ম্মা তাঁহার যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে এক জন বিখ্যাত রাজা ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। চিরঞ্জীব শর্ম্মার সময়ে সওয়াই জয়সিংহ বিদ্যমান থাকায় তিনিই তাঁহার উল্লিখিত জয়সিংহ হইতে পারেন। ১৭১৪ খৃঃ অব্দে সওয়াই জয়সিংহের অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানের কথা শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন। আবার ১৭২৮ খৃঃ অব্দে তাঁহার কর্ত্তৃক জয়পুর নগর প্রতিষ্ঠার কথাও জানা যায়। কিন্তু তাঁহার সহিত চিরঞ্জীবের কিরূপে পরিচয় ঘটিল, তাহা অবশ্য বুঝা যায় না। বাদশাহ দরবারে সওয়াই জয়সিংহ আসিতেন এবং কোন কোন প্রদেশে তিনি রাজকার্য্যের জন্যও যাইতেন এবং কাশীতেও সময় সময় আসিতেন, কাশীর মানমন্দির তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে তাঁহার নাম প্রচারিত হইয়াও থাকিতে পারে।

"চিরঞ্জীব শর্ম্মা বিজয়সিংহ নামে এক রাজার কথাও বলিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারেন নাই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। চিরঞ্জীব শর্ম্মার উল্লিখিত জয়সিংহ যদি জয়পুরের সওয়াই জয়সিংহ হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাঁহার ভ্রাতা বিজয়সিংহ চিরঞ্জীব শর্ম্মার উল্লিখিত বিজয়সিংহও হইতে পারেন। বিজয়সিংহ বাদশাহ মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে উজীর কামায়উদ্দীন খাঁকে হীরাজহরতাদি উপঢৌকন দিয়া জ্যেষ্ঠ জয়সিংহকে অম্বরের রাজগদী হইতে অপসারিত করিয়া নিজে তাহা অধিকার করিবার জন্য সনন্দ বাহির করাইয়াছিলেন। কিন্তু জয়সিংহের কৌশলে তাহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া নিজেই অবশেষে বন্দী হইতে বাধ্য হন। ইহার পর তাঁহার পরিণাম কি হইয়াছিল, তাহা জানা যায় না। কিন্তু অম্বরের জয়সিংহ ও বিজয়সিংহের সহিত বাঙ্গালার চিরঞ্জীব শর্ম্মার কিরূপে পরিচয় ঘটিয়াছিল, তাহা অবশ্য ভাবিবার বিষয় বটে।" ('মাসিক বসুমতী,' শ্রাবণ ১৩০৮)।

৫. অনুবাদ : হে প্রভু, গৌড় (বংশাবতংস) শ্রীযশোবন্ত সিংহ, (তোমার) ধনুকের টংকারে শত্রুবাহিনীর সকল গর্বই খর্ব হয়েছে। ভালো করে শোনো, শোনো।

যেখানে থাকবে ম, স, জ (এই) গণগুলি ; স, ত গণ দুটি ; (আর) ত নামক গণ, (ও) শেষ অক্ষর গুরু, (এবং) যতি আঠারো অক্ষরে, তাকে বলে শার্দূলবিক্রীড়িত (ছন্দ)।

[শ্লোকটির প্রথমার্ধ যশোবন্ত সিংহের প্রশংসা, শেষ অর্ধ শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দের লক্ষণ। ক্ষীণ শ্লেষের সূত্রে দুটি অর্ধ জোড়া হয়েছে। শার্দূলবিক্রীড়িত ছন্দের লক্ষণ : ম = তিন গুরু অক্ষর, স = দুই লঘু এক গুরু অক্ষর, জ = দুই লঘু অক্ষরের মধ্যে গুরু অক্ষর, ত = দুই গুরু এক লঘু অক্ষর, গ = একটি মাত্র গুরু অক্ষর। দ্বাদশ অক্ষরের পর যতি। শ্রীসুকুমার সেন]

৬. অনুবাদ : ত্রেতাযুগ থেকে (আরম্ভ করে) একটা একটা করে পা হারানোর পর চারপেয়ে (চতুষ্পদ) ধর্ম তাই প্রবল কলিযুগে সব দিকেই হয়েছে একপেয়ে। আজ কিন্তু জয়সিংহ পূর্বদেশ বিজয় করায় (ধর্মের যেন আবার) চার পা হয়েছে। তবে সে চরণ নতুন রকম।

৭. অম্বর থেকে জয়পুরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় ১৭২৮ খৃস্টাব্দে।

৮. আকবরের রাজত্বকালে মানসিংহ দুবার সুবেদার হয়ে বাংলায় আসেন। প্রথমবার ১৫৯৪-৯৯ খৃ., দ্বিতীয়বার ১৬০০-০৫ খৃ.। জাহাঙ্গীর সম্রাট হবার পরে আর-একবার মানসিংহকে বাংলাদেশে পাঠান ১৬০৬ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে। তৃতীয়বারে মানসিংহ খুব অল্পদিন বাংলায় ছিলেন। মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে দমন করেন নি, প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে মুঘল রাজশক্তির সংঘর্ষ হয় ইসলাম খাঁর সুবেদারির সময়ে (১৬০৮--১৩খৃ.)।

৯. অনুবাদ : আজও এই প্রলয় জলধি অসময় বলে তীরভূমিকে পরিত্যাগ করে রয়েছে। আজও এই রাজা মানসিংহ চার দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হে কীর্তিরাজা, এইভাবে আপনার জয়যাত্রার অন্তরালে সৎলোকের অকুণ্ঠিত প্রশংসা অনবরত ছড়িয়ে পড়ছে।

১০. অনুবাদ : দ্বৈতাদ্বৈত প্রভৃতি মত-নির্ণয় ব্যবস্থায় যাঁর বুদ্ধি ও বিদ্যা সমুজ্জ্বল হয়েছিল, যাঁর নাম ছিল শতাবধান ভট্টাচার্য, যিনি গৌড়ীয় ও কবি ছিলেন, তাঁর পুত্র চিরঞ্জীব ছেলেখেলায় মেতে যে চম্পূ রচনা করেছেন তার পঞ্চম উচ্ছ্বাস— বসন্ত বর্ণনা এই শেষ হল।

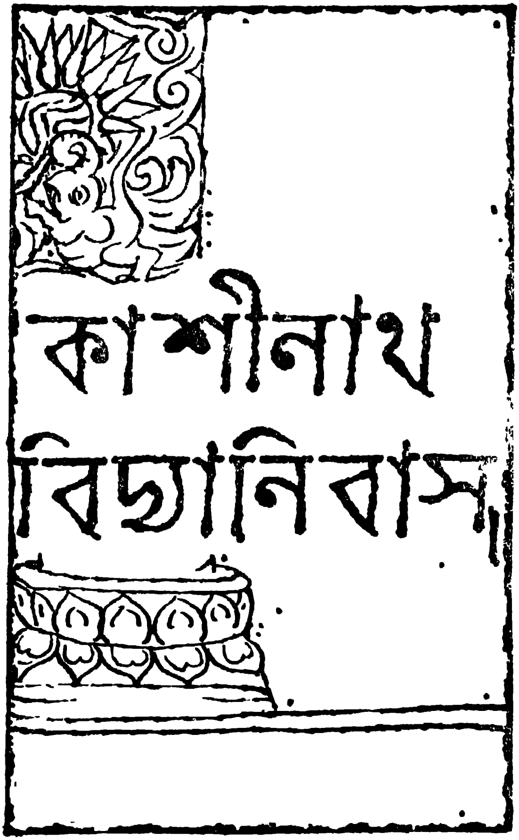
১১. অনুবাদ : সরস্বতীর মুখ থেকে অনাদি কাল ধরে যে রচনাবলী সৃষ্টি হয়ে এসেছে, তাতে বিলাস করেন যে নবদ্বীপের অধিবাসী বিদ্বান ব্যক্তিরা, অনেক দিন থেকে কাশীবাসী বিদ্যাসাগর, যাঁদের বুদ্ধি জাগ্রত ও উন্নত এবং যাঁরা মৈমাংসকরূপী, তাঁরা কিছুমাত্র কৃপা করে ও বিরূপতা কোনো মতে বর্জন করে আমার এই রচনাটি ভালো করে যেন পড়েন।

১২. অনুবাদ : ভট্টাচার্য-শ্রেষ্ঠ রঘুদেবের এই দুই পা মনের মাঝে আশ্রয় করে যে বরাবর রয়েছে, তার পক্ষে কী আবশ্যক বাগ্‌দেবীর রচনাবিলাসী অমৃত স্রোতের নির্ঝর-দেবী উপাসনায়, বাগ্‌ ব্যবহারে সুগমতার জন্যে ?

১৩. অনুবাদ : যাঁরা নিজেদের অভিন্নতা সত্ত্বেও দেহের ভিন্নতা ছাড়াও ভিন্নতা অবলম্বন করেছেন, তাঁদের (এই সমস্যার) সমাধানের জন্যে হর (চেষ্টা) করেছেন, দেহার্ধধারী হরিও।

১৪. শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ দেবের নাতি, রাজকৃষ্ণ দেবের মেজো ছেলে কালীকৃষ্ণর জন্ম ১৮০৮ খৃস্টাব্দে। সংস্কৃত, ফারসি, উর্দু এবং ইংরেজি ভাষায় তাঁর ভালো অধিকার ছিল। দেশাচারে সরকারি কর্তৃত্ব উচিত নয় এই যুক্তিতে রাধাকান্ত দেবের সতীদাহ নিবারণে সরকারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলনে ইনি যুক্ত ছিলেন। অন্য দিকে স্ত্রী-শিক্ষা প্রচারে এবং সমাজ কল্যাণমূলক কাজে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। কালীকৃষ্ণ ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটির সভ্য এবং বেথুন স্কুল, বেথুন সোসাইটি, ওরিয়েন্টাল সেমিনারি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৮৫১ খৃস্টাব্দে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি হন। তিনি 'র‍্যাসেলাস' ও 'গে'জ ফেব্‌ল্‌স' বাংলায় এবং 'সদ্বিদ্যাবলী', 'নীতি-সংকলন', 'বেতাল পঁচিশী' ও 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী' ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। 'বিদ্বন্মোদ তরঙ্গিণী'র বাংলা অনুবাদ করেছিলেন একথা ঠিক নয়। (দ্র. এই বইয়ের পৃ. ৪১)।

১৮৭৪ খৃস্টাব্দে কালীকৃষ্ণ দেবের মৃত্যু হয়।



কাশীনাথ বিদ্যানিবাস নিজে একজন বড়ো লোক ও বড়ো পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পূর্বপুরুষেরাও বেশ বড়ো লোক ছিলেন। তাঁহার বংশেও অনেক বড়ো লোক জন্মিয়া গিয়াছেন। তিনি যে বংশে জন্ম-গ্রহণ করেন, তাহার নাম আখণ্ডল বংশ। রাঢ়ীয় সমাজে আখণ্ডলেরা আদি বংশজ। বল্লালের[১] সভায় যাঁহারা কুল পাইয়াছিলেন, আখণ্ডল তাঁহাদেরই একজনের প্রপৌত্র। ইনি কেন কুল হারাইয়াছিলেন, ঘটকেরা তাহা বলিতে পারেন। কুল হারাইয়া তাঁহাদের বিবাহ দিতে কষ্ট পাইতে হইত বটে, কিন্তু তাঁহারা মান হারান নাই। বঙ্গ দেশে একটা কথা চলিত আছে, "বঙ্গে আখণ্ডলঃ পূজ্যঃ"।

ইহার কারণ, এই বংশে অনেক অসাধারণ ধনী ও অসাধারণ পণ্ডিতের উৎপত্তি হয়।

ইঁহাদের আদি বাসস্থান ছিল— মধ্যমগ্রাম বা মাঝের গাঁ। লোকে সকালে এই গ্রামের নাম করে না; বলে, করিলে সেই দিন আহার জুটে না। কারণ আখণ্ডলেরা অত্যন্ত কৃপণ ছিলেন— অতিথিদের আদৌ সৎকার করিতেন না। অনেক সময় অতিথিরা দ্বিপ্রহরে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। এখন কিন্তু সেই গ্রামে আখণ্ডল আর নাই বলিলেই হয়। তাঁহাদের দৌহিত্র-বংশে সেই গ্রাম ছাইয়া গিয়াছে। আখণ্ডলদের আদিস্থান মাঝের গাঁ হইলেও ইঁহারা নবদ্বীপেই টোল করিতেন। কেহ পুরী, কেহ বা কাশীতেও বাস করিতেন। একঘর আখণ্ডল লোহাগড়াতে (যশোহর) সসম্মানে বাস করিতেছেন। নলডাঙার রাজারা আখণ্ডল-বংশের লোক। তাঁহারা বহুকাল হইতে বঙ্গ দেশে সসম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। লোকে বলে— 'দানে কৃষ্ণনগর, মানে নলডাঙা।'

রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় বাংলার প্রসিদ্ধ প্রথম নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌমের[২] ভাই। তিনি নিজেও খুব পণ্ডিত ছিলেন এবং পঠন-পাঠন লইয়াই থাকিতেন। বাংলার সুলতানেরা ও সুবেদারেরা তাঁহার পায়ে নমস্কার করিতেন। তাহাতে তাঁহার পায়ের নখ মুকুটের হীরার রঙে রঞ্জিত হইয়া যাইত। তাঁহার পুত্র কাশীনাথ বিদ্যানিবাস। ইনি নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন এবং নানা শাস্ত্রে গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইনি কবিচন্দ্র নামে একজন কায়স্থকে বাড়িতে রাখিতেন এবং তাঁহার দ্বারা পুরানো পুথি নকল করাইয়া লইতেন। ১৫৮৮ সালে কবিচন্দ্র তাঁহার জন্য লক্ষ্মীধরের 'কৃত্যকল্প-তরু'র[৩] এক অংশ নকল করেন। সে পুথিখানি এখন ইণ্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরিতে আছে।

বিদ্যানিবাস এইরূপে অনেক পুথি নকল করাইয়াছিলেন। তাঁহার একটি বেশ ভালো লাইব্রেরি ছিল। তাই তিনি ও তাঁহার পুত্রেরা অনেক বই লিখিতে পারিয়াছিলেন। বাংলায় তাঁহার প্রধান কীর্তি [illegible]বোধ' ব্যাকরণ চালানো। 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণের উৎপত্তি হয়— [illegible]তে— মহারাষ্ট্র দেশে। যখন হিন্দুস্থানে মুসলমান অধিকার

হইয়া গিয়াছে, দাক্ষিণাত্যে একেবারেই হয় নাই, সেই সময় বোপদেবের[৪] বাপ কেশব রাজার ছাউনিতে প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। বোপদেব সেই ছাউনিতে বসিয়া অনেক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি 'মুগ্ধবোধ' লিখিলে চারি দিকে ঐ গ্রন্থের পসার হইয়া উঠে। এক সময়ে এমনও বোধ হইয়াছিল যে, 'মুগ্ধবোধ'ই ভারত ছাইয়া যাইবে। কিন্তু তাহা হইল না ; কারণ, ব্রাহ্মণদের ভিতর একটা সংস্কার আছে যে, যে বাড়ির যে ব্যাকরণ সেই বাড়ির সব ছেলেই সেই ব্যাকরণ পড়িবে। যদি না পড়ে তবে ব্যাকরণ-সরস্বতী কুপিত হন এবং তাহাদের ব্যাকরণে সংস্কার হয় না।

যখন সংস্কার এতই দৃঢ় তখন আমাদের দেশের প্রচলিত ব্যাকরণগুলি সরাইয়া দিয়া নবদ্বীপের মতো পাণ্ডিতবহুল স্থানে, এমন-কি, গঙ্গার দুই ধারেই, 'মুগ্ধবোধ' চালানো যে কী কঠিন কাজ, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। 'মুগ্ধবোধে'র যে-সব টীকা প্রচলিত আছে, সকলেই বিদ্যানিবাসের টীকার দোহাই দেন। কেহ বলেন, তিনি আদি টীকাকার ; কেহ বলেন, তিনি প্রাচীন টীকাকার, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা এখন পর্যন্ত তাঁহার টীকা পাই নাই।

এঁড়েদার ঘোষালদের আদিপুরুষ 'মুগ্ধবোধে'র টীকাকার রাম তর্কবাগীশ[৫] একজন বড়ো শাব্দিক ছিলেন। শব্দশাস্ত্রে তাঁহার অনেক বই আছে। একখানি প্রাকৃত ব্যাকরণ আছে, অন্য অন্য গ্রন্থও আছে। কিন্তু তাঁহার প্রধান কীর্তি 'মুগ্ধবোধে'র টীকা। তিনি এই টীকার গোড়ায় লিখিয়াছেন—

> পরেঽত্র পাণিনীয়জ্ঞাঃ কেচিৎ কালাপকোবিদাঃ।
> একে বিদ্যানিবাসাঃ স্যুরন্যে সংক্ষিপ্তসারকাঃ॥[৬]

তিনি বিদ্যানিবাসকে পাণিনি,[৭] সর্ববর্মা[৮] ও ক্রমদীশ্বরের[৯] ন্যায় একটা মতপ্রবর্তক বলিয়া মনে করিতেন এবং তাঁহাকে তাঁহাদের সঙ্গে সমান আসন দিয়া গিয়াছেন। বিদ্যানিবাসের এরূপ আসনপ্রাপ্তির একমাত্র অধিকার তাঁহার রচিত 'মুগ্ধবোধে'র টীকা। অন্য ব্যাকরণে এবং অন্য শাস্ত্রেও বিদ্যানিবাসের অধিকার ছিল। বিদ্যানিবাসেরই তুল্য কালে ভট্টোজি দীক্ষিত[১০] পাণিনির সূত্রগুলি বিষয়ানুসারে

সাজাইয়া 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' নামে একখানি ব্যাকরণ লেখেন। উহার অর্থ এই যে, উহাতে কেবল সিদ্ধান্তগুলি দেওয়া আছে। সে সিদ্ধান্ত কাহাদের ? ব্রাহ্মণদের। পাণিনির যে-সকল বৌদ্ধ টীকাকার ছিলেন, ভট্টোজি দীক্ষিত তাঁহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই : কেবল পাণিনি, কাত্যায়ন,[১১] ব্যাড়ি,[১২] পতঞ্জলি,[১৩] ভর্তৃহরি[১৪] ও কৈয়ট[১৫] প্রভৃতি ব্রাহ্মণদিগের সিদ্ধান্তগুলি তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন। এইজন্য তাঁহার পুস্তকের নাম হইয়াছে—'সিদ্ধান্তকৌমুদী'। ভট্টোজি নিজেই এই 'সিদ্ধান্তকৌমুদী'র একখানি টীকা লেখেন ; তাহার নাম 'প্রৌঢ়-মনোরমা'। ভট্টোজি দীক্ষিতের ছাত্র বরদরাজ[১৬] 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' ছাঁটিয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর তিনখানি পুস্তক লেখেন। একখানির নাম 'লঘুকৌমুদী', আর-একখানির নাম 'মধ্যকৌমুদী', আর-একখানির নাম সারকৌমুদী'। ইহাদের মধ্যে একখানি নিতান্ত ছোটো। যাহারা ব্যাকরণ আরম্ভ করিতেছে, তাহাদের জন্য একখানি ; যাহাদের ব্যাকরণে কিছু দখল হইয়াছে, তাহাদের জন্য আর-একখানি।

'সিদ্ধান্তকৌমুদী'র যে মনোরমা টীকা ছিল, রামচন্দ্র শর্মা শিবানন্দ ভট্ট বা শিবানন্দ গোস্বামীর অনুরোধে তাহা হইতে বাছিয়া লইয়া এবং নিজের মত যোজনা করিয়া 'মধ্যকৌমুদী'র এক টীকা লেখেন : তাহার নাম 'মধ্যমনোরমা'। এই বইখানি রামচন্দ্র বিদ্যানিবাসের নামে উৎসর্গ করেন। যে ভাবে উৎসর্গ করেন, তাহাতে বোধ হয়, বিদ্যানিবাস তাঁহার গুরু ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—

কণ্ঠে বিদ্যানিবাসস্য স্থিতা মধ্যমনোরমা।
গোস্বামী শ্রীশিবানন্দো মুদং বিতনুতাং সদা ॥[১৭]

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়, বিদ্যানিবাস সে সময়ে একজন মস্ত বড়ো পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। ১৮৭৭ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'মধ্যমনোরমা'র বিবরণ দিতে যাইয়া লিখিয়াছিলেন—

"Nothing can be said with certainty concerning the time and place of Rāmachandra Śarma, the author, or of Sivānanda Bhaṭṭa or Gosāin at whose request

the work was written, nor about Vidyānivāsa, the tutor or spiritual guide of the author." [*Mitra-Cat*, Grammar 1877, p. 91]

ভারতবর্ষের যেখানেই যাও দেখিবে নৈয়ায়িকেরা ভাঙা ভাঙা বাংলায় কথা কহিতে পারেন এবং নবদ্বীপের নাম করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা বিদ্যানিবাসের নাম জানিতেন। তাঁহারা জানিতেন বিদ্যানিবাস বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চাননের পিতা। আর বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চাননের 'ভাষা-পরিচ্ছেদ' হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত সকল দেশের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পড়িয়া থাকেন, মুখস্থ করেন এবং উহার 'মুক্তাবলী' টীকা লইয়া বিচার করেন।

এইখানে বলিয়া রাখি, ভট্টোজি দীক্ষিতের 'প্রৌঢ়মনোরমাতে'ই অধিক পরিমাণে 'মুগ্ধবোধে'র মত খণ্ডন করা হইয়াছে এবং 'মুগ্ধবোধ' যে পশ্চিম ও মধ্য ভারত হইতে তাড়িত হইয়াছে, তাহার কারণও এই 'মনোরমা'। বিদ্যানিবাস যখন 'মুগ্ধবোধে'র পক্ষ হইয়া বাংলায় উহাকে আশ্রয় দিলেন, তখন ভট্টোজির তিনি বিরুদ্ধবাদী হইলেন। রামচন্দ্র শর্মা বোধ হয়, এই দুই বিরুদ্ধ মতের কোনোরূপ সমন্বয় করিয়াছিলেন। তাই ভট্টোজির বইয়ের টীকা করিতে গিয়া বিদ্যানিবাসকে স্মরণ করিয়াছেন।

বিদ্যানিবাস যে সময়ে বাংলার প্রধান ভট্টাচার্য, সে সময়ে ভারতবর্ষে সর্বত্রই লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারের চেষ্টা হইতেছে। চৈতন্যদেবের গুরু মাধবেন্দ্র পুরী[১৮] মথুরা ও বৃন্দাবন উদ্ধার করেন। সন্ন্যাসীরা কুরুক্ষেত্র উদ্ধার করেন। এইরূপে এই সময়ে অযোধ্যা প্রভৃতি অনেক তীর্থ উদ্ধার হয়। কাশীর উপর মাঝে মাঝে মুসলমান আক্রমণ হইলেও কাশী তীর্থটির লোপ হয় নাই। কারণ প্রত্যেক শতাব্দীতেই আমরা দেখিতে পাই— ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা কাশীবাস করিতে যাইতেছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে অনেকগুলি উড়িয়া পণ্ডিত রাজার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া কাশীবাস করেন। চতুর্দশের শেষে বা পঞ্চদশের গোড়ায় কুল্লূকভট্ট[১৯] কাশীবাস করিয়াছিলেন। বিদ্যানিবাসের পিতামহ নরহরি বিশারদও কাশীবাস করিয়াছিলেন। চৈতন্যদেবও কাশী গিয়াছিলেন। তিনি বাস করিয়াছিলেন নীলাচলে অর্থাৎ

জগন্নাথক্ষেত্রে। তখনো জগন্নাথক্ষেত্রে মুসলমানদের হাত পড়ে নাই। বাংলা দেশের— বিশেষ রাঢ়ের— প্রধান তীর্থই ছিল জগন্নাথ। সেইজন্য জগন্নাথতীর্থের যাত্রা ও পূজা-পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক পুথি বাংলা দেশে লেখা হয়। এই-সকল লেখকদের মধ্যে বিদ্যানিবাস একজন প্রধান। বারো মাসে জগন্নাথের যে বারো পর্ব হইয়া থাকে, তিনি তাহার এক বিবরণ লিখিয়া যান। এই বারো পর্বকে দ্বাদশ যাত্রা বলে। এ দ্বাদশ যাত্রা ছাড়া তিনি আরো অন্যান্য যাত্রার কথাও লিখিয়া যান। যাত্রার বিবরণ লিখিতে অনেক কাঠখড়ের দরকার। প্রথম জ্যোতিষ জানা চাই। না হইলে যাত্রার সময় জানা যায় না। তারপর পুরাণ জানা চাই, নহিলে যাত্রার ফলাফল বুঝা যায় না। তাহার পর প্রতি যাত্রায় কিরূপ পূজা পাঠ করিতে হয়, কিরূপে ব্রত উপবাস করিতে হয়, কোন্ কোন্ ফুল দিতে হয়— এ-সকল জানা চাই। সুতরাং অনেক শাস্ত্রের বই দেখা না থাকিলে যাত্রার বই লেখা যায় না। বাঙালির যে প্রধান তীর্থ সে তীর্থে যাত্রা ও পূজা পদ্ধতির কথা লিখিয়া বিদ্যানিবাস রাঢ় ও গৌড়মণ্ডলের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। রঘুনন্দনের[২০] নামেও যাত্রার কতগুলি বই চলে, তবে উহা কে লিখিয়াছেন, বলা যায় না।

কাশীতে ছয় ঘর বড়ো বড়ো দাক্ষিণী ব্রাহ্মণ আছেন[২১]। প্রায়ই তাঁহারা মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছেন— ভট্টবংশ, বিশ্বামিত্র গোত্র ; আদি বাড়ি প্রতিষ্ঠানপুর, গোদাবরীর ধারে। রামেশ্বর এই বংশের একজন পণ্ডিত। তিনি আসিয়া কাশীতে বাস করেন। ইনি আমাদের রঘুনাথ শিরোমণির একজন গুরু। ইঁহার পুত্র নারায়ণ ভট্ট প্রকাণ্ড পণ্ডিত হইয়াছিলেন। উত্তর ও দাক্ষিণ দুই দেশেরই স্মৃতির বই তিনি লিখিয়াছেন। অনেক তীর্থ তিনি উদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার পুত্র শংকর ভট্ট[২২] একজন ব্যাপক পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নিজ বংশের একখানি ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন ; উহার নাম 'গাধিবংশানুচরিত'। রামেশ্বর, ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির গুণ বর্ণনা করাই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি তাহা করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে আরো অনেক পণ্ডিতের কথা তিনি বলিয়াছেন। দিল্লিতে এবং বোধ হয়, টোডরমলের বাড়িতে দুই বার ভারতবর্ষের সব স্থানের পণ্ডিত লইয়া

সভা হয়। শংকর লিখিয়াছেন, দুই সভায়ই ভট্টনারায়ণের জয় হয়। এই সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "দাক্ষিণাত্য মতমুর্জ্জিতত্বং নিনায়।"[২৩] একবার সভা হয়— কে গ্রহণ দেখিতে পারে এবং কে পারে না, তাহা লইয়া। আর-একবার হয়— জীবন্ত ব্রাহ্মণের সম্মুখে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে, না, কুশময় ব্রাহ্মণের উপর শ্রাদ্ধ করিতে হইবে— এই লইয়া। শংকর বলিতেছেন, এই দুই সভাতেই বাঙালির প্রধান পণ্ডিত বিদ্যানিবাস উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, এখনো দক্ষিণীরা জীবন্ত ব্রাহ্মণে শ্রাদ্ধ করে অথচ আমরা দর্ভময় ব্রাহ্মণে করি। যদি বিদ্যানিবাস প্রভৃতি কয়েক জন বড়ো পণ্ডিত আমাদের মত সমর্থন না করিতেন, তাহা হইলে আমরাও বোধ হয়, এতদিনে দক্ষিণী ব্রাহ্মণদের মতো জীবন্ত ব্রাহ্মণ বসাইয়া শ্রাদ্ধ করিতাম। সুতরাং এই-সকল স্থানে বিদ্যানিবাসই বাঙালিদের রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'
চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৩৭ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে ১৫ চৈত্র ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ, ২৯ মার্চ ১৯৩১ খৃস্টাব্দে দশম মাসিক অধিবেশনে শাস্ত্রীমশায়ের 'কাশীনাথ বিদ্যানিবাস' প্রবন্ধটি পড়েন মন্মথমোহন বসু। অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন অধ্যাপক বনমালী বেদান্ততীর্থ। দ্র. সা-প-প, ১৩৩৭ ব.।

১. এই বইয়ের পৃ. ৪২ সূত্র ২ দ্র.

২. বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্যের জীবনকাল আনুমানিক ১৪২০/৩০-১৫৪০ খৃ.। বাবা 'বেদান্তবিদ্যাময়' নরহরি (মতান্তরে মহেশ্বর) বিশারদ। ন্যায় ও বেদান্তে নবদ্বীপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত সার্বভৌম সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তি— ইনি মিথিলায় ন্যায়শাস্ত্র পড়তে যান এবং সেখানকার অধ্যাপক পক্ষধর মিশ্রর আপত্তিতে ন্যায়শাস্ত্র নকল করে আনা সম্ভব না হওয়ায় সমগ্র 'তত্ত্বচিন্তামণি' ও 'কুসুমাঞ্জলি' কণ্ঠস্থ করে এনে নবদ্বীপে ন্যায়ের চর্চা প্রবর্তন করেন। এই কিংবদন্তির কোনো ভিত্তি নেই মনে হয়, কারণ, খৃস্টীয় নবম শতাব্দী থেকেই বাংলা দেশে ন্যায়ের চর্চা প্রচলিত ছিল এবং কবিকর্ণপূর ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখা থেকে বোঝা যায় সার্বভৌম মুখ্যত বেদান্তের চর্চা করতেন। চৈতন্য নবদ্বীপে সার্বভৌমের ছাত্র ছিলেন এই মতবাদেরও কোনো সমর্থন পাওয়া যায় না। পুরীতে চৈতন্যের পরিচয় পাবার পরেও সার্বভৌম কখনো তাঁকে পূর্বপরিচিত বলেন নি। "রাজভয়ে" সার্বভৌম সপরিবারে নবদ্বীপ থেকে পুরীতে গিয়ে সেখানে অদ্বৈতবেদান্তের অধ্যাপনা করতেন। ওড়িশারাজ গজপতি প্রতাপরুদ্র (রাজত্বকাল ১৪৯৭-১৫৪০ খৃ.) তাঁকে মাননা করতেন। চৈতন্যের পরিচয় পেয়ে তিনি এই তরুণ সন্ন্যাসীকে অদ্বৈতমতে আনবার চেষ্টায় বেদান্ত পড়াতে শুরু করেন। চৈতন্য সার্বভৌমের ভাষ্য ভুল প্রমাণ করে তাঁর পাণ্ডিত্যের অহংকার চূর্ণ করে দেন, সার্বভৌম চৈতন্যের ভক্তিধর্ম গ্রহণ করেন।

চৈতন্যজীবনীকাররা যেভাবে চৈতন্য পুরীতে পৌছনোর পরেই সার্বভৌমর সঙ্গে সম্পর্কের কথা বলেছেন— তার সত্যতা সম্পর্কে সংশয় আছে। তাঁদের বিবরণ অনুযায়ী এই ঘটনা ১৫১০ খৃস্টাব্দের. কিন্তু সার্বভৌম 'অদ্বৈতমকরন্দ' গ্রন্থের টীকা (দ্র. *Mitra-Notices*, Vol. VIII, pp. 291-92) রচনা করেছেন ১৫১৩ খৃস্টাব্দের পরে। তখনো তিনি ঘোর অদ্বৈতবাদী। ঠিক সময় যখনই হোক, সার্বভৌমের মতো প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বশীভূত হওয়ায় পুরীতে চৈতন্যের প্রতিষ্ঠা দৃঢ় হয়, তিনি রাজা প্রতাপরুদ্রেরও শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম পান। জয়ানন্দ এবং বৃন্দাবন দাস সার্বভৌম রচিত 'চৈতন্যাষ্টক স্তোত্র', 'চৈতন্য সহস্রনাম' এবং 'শত-শ্লোকে'র উল্লেখ করেছেন।

সার্বভৌমের ছেলে জলেশ্বর বাহিনীপতি 'শব্দালোকোদ্দ্যোতঃ' নামে পক্ষধর মিশ্রের 'আলোক'-এর টীকা লিখেছিলেন। জলেশ্বরের ছেলে স্বপ্নেশ্বরাচার্যর 'শাণ্ডিল্যসূত্রভাষ্য' ভিন্ন 'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীপ্রভা' পাওয়া গেছে। দ্র. Sushil Kumar De, *Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal*, Calcutta 1961, pp. 84-90.

৩. মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্‌গোবিন্দ চন্দ্রদেবের মহাসান্ধিবিগ্রহিক ভট্ট হৃদয়-ধরের ছেলে ভট্ট লক্ষ্মীধর রচিত ১৪ কাণ্ডে সম্পূর্ণ ধর্মশাস্ত্র-নিবন্ধ 'কৃত্যকল্পতরু'। রচনাকাল দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। ধর্মশাস্ত্র-নিবন্ধ গ্রন্থ যা পাওয়া গেছে তার মধ্যে 'কৃত্যকল্পতরু' প্রাচীনতম এবং অপেক্ষাকৃত পূর্ণাঙ্গ। এই গ্রন্থেরও পূর্ণাঙ্গ পুথি একসঙ্গে পাওয়া যায় নি, খণ্ডিত পুথি বিভিন্ন সময়ে সংগ্রহ করা হয়েছে। মনোমোহন চক্রবর্তী প্রথম এই গ্রন্থ এবং ভট্ট লক্ষ্মীধরের পরিচয় ভারতবিদ্যার গবেষকদের গোচরে আনেন। দ্র. Monomohan Chakravarti, "Contributions to the history of Smṛti in Bengal and Mithila" : Part I Bengal, Part II Mithila, *J-A-S-B* : NS XI pp. 311-75, 377-406. ; K. V. Rangaswami Aiyangar ed. *KṚTYAKALPATARU*, *G-O-S* 1948.

৪. "The *Mugdha-bodha* was written in the last days of Hindu independence in the Mārāṭhā country during the reign of Mahādeva, the last but one king of the Yādava dynasty of Devagiri, the name of which was changed into Daulatābād, by

Muhammad Tughluq who wanted to transfer the capital of India from Delhi to it. The King Mahādeva had a minister, an architect, an engineer, a cheif-justice and general in one person, named Hemādri, who has written encyclopædic works on Hindu religious rites. He had a big Jāygir, and he had a friend named Vopa-deva. The derivation of the name is rather curiours, U means Siva and A means Viṣṇu ; U and A = Va ; and a worshipper of these two deities will be ealled a Vopa-deva. ... Vopa-deva was the son of Keśava who practiced medicine, perhaps he was an army sugeon. For Vopa-deva often says that his books were written in the house of his father in the camp. Vopa-deva was the pupil of Dhaneśvara who was a very learned man. He taught the Vaiśesika and the Vedānta darśanas.

"Vopa-deva wrote ten works on grammar. (1) *Mugdhabodha* (2) its Dhatu-pāṭha entitled *Kavi-kalpa-druma* with about 1754 roots and (3) its commentary, the *Kāvya-Kāmadhenu* which is much prized for the quotations it gives. Of the ten these three are well known.

"Vopa-deva is said to have been the author of the *Śrimad-vāgavata*. But this is wrong. Vopa-deva wrote a commentary on the *Bhāgavata* entiled *Parama-haṃsa-priyā* in which he has shown that the *Bhāgavata* contains at least 1000 archaic expressions not sanctioned by the grammars of the classical language....He also wrote two works on the *Bhāga-vata* (1) *Hari-līla* and (2) *Muktā-phala*. In writing these two works he was inspired by Hemādri. He wrote nine works on medicine (one of which was *Śata-ślokī*) which are still much used by Ayurvedic

physicians in Rājputānā. He wrote a work on Dharma-śāstra and three works on literature." (*Shastri-Cat.*, Vol. VI, Preface, pp. lxxx-lxxxii.)

৫. "The next big man in this school is Rāma Tarkavāgīśa, the progenitor of the Ghoṣālas of Ariādaha near Calcutta. Babu Girīśa Candra Ghoṣāla of of Belgharia subsequently settled at Naihāṭi. He died in the early years of the 20th century and was ninth in descent from him. He may therefore be safely placed in the early years of the 17th century and is quoted by Durgā-dāsa in 1639. Sir George Grierson says that Rāma Tarka-vāgīśa wrote a grammar on Prākṛta language also. But his great work is his commentary on the *Mugdha-bodha*, which though a school book at first, was made to vie Pāṇini by his commentary. He has reduced a number of Pāṇini's sūtras and the sūtras of other grammars into the algebrical language of *Mugdha-bodha* and have included them in his commentary, in order to make the work as comprehensive a grammar as possible. He also wrote a supplement to the *Mugdha-bodha*." (*Shastri-Cat.*, Vol. VI, Preface, pp. lxxxiii-lxxiv.)

৬. অনুবাদ : অন্য লোকে পাণিনির ব্যাকরণে অভিজ্ঞ। কেউ কেউ কলাপ ব্যাকরণে পণ্ডিত। কেউ কেউ বিদ্যানিবাসের ব্যাকরণ-পাঠী। অন্য লোকে সংক্ষিপ্তসার পড়ে।

৭. প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী, পৃথিবীর সমস্ত ভাষার ব্যাকরণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রচনা 'অষ্টাধ্যায়ী'র লেখক পাণিনির জীবনকাল অনিশ্চিত। বিভিন্ন গবেষকের সিদ্ধান্ত ধরে উর্ধ্বতম এবং নিম্নতম কালসীমা নির্দেশ করা যায় ৭০০ এবং ৩৫০ খৃস্টপূর্বাব্দ। পাণিনির জন্ম বর্তমান পশ্চিম-পকিস্তানে আটক্-এর কাছে শালাতুর-এ। হিউএন-ৎসাঙ শালাতুরে পাণিনির মূর্তি প্রতিষ্ঠিত দেখেছিলেন। পাণিনির মায়ের নাম

ছিল দাক্ষী। নানা প্রসঙ্গে শাস্ত্রীমশায় পাণিনি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু তাঁর সময় সম্পর্কে কোনো স্থির সিদ্ধান্ত করেন নি। দ্র. Sastri, *Birds' Eye View of Sanskrit Literature*, Calcutta 1917, p 7; Shastri, *Magadhan Literature*, Lecture II, Patna 1923; *Shastri-Cat.*, Vol. VI, Preface, pp. xvi-xx.

৮. বৌদ্ধ বৈয়াকরণ সর্ববর্মার 'কাতন্ত্র' ব্যাকরণের নামান্তর 'কৌমার' এবং 'কলাপ'। প্রচলিত ধারণা, কুমার কার্তিকেয়র অনুগ্রহে সর্ববর্মা এই ব্যাকরণ লিখেছিলেন, তাই এর নাম, কুমার থেকে 'কৌমার' এবং কার্তিকের বাহন ময়ূরের পেখম স্মরণে 'কলাপ' ব্যাকরণ। 'কাতন্ত্র' পাণিনি অনুসরণে একটি নতুন ব্যাকরণ রীতি গড়ে তোলার সম্ভবত প্রাচীনতম নিদর্শন। শাস্ত্রীমশায় লিখেছেন—

"The *Kālāpa* Vyākaraṇa had its origin in Southern India in the 1st century A. D. One of the Kings of the Sāta-vāhana dynasty took a wife from Northern India; she spoke Sanskrit which he did not understand, and often made curious and ludicrous mistakes. At last unable to bear the jeerings of his wife, he made-up his mind to study Sanskrit, and asked his Paṇḍita Sarva-varmā to write a treatise on grammar, that would give him a workable knowledge of Sanskrit. Sarva-varmā produced a grammar which in six months gave the king what he wanted. This tradition is given in detail in H. P. R, III, 50. The work is called *Kātantra* or a shortwork. It is in fact a Sanskrit grammar for beginners. How short it was, we have no means of ascertaining; for being very short many peopel threw into it rules that were likely to make it more useful. It had no rules for Kṛts or verbal nouns. That chapter was added to it by *Kātantra.* Similarly, sections on Taddhita suffixes were also added. Belvalkar says, 'Thus instead of nearly 4000 sūtras of Pāṇini, Sarva-Varmā

could finish his work in about 855 sūtras or including the Kṛt section, 1400 sūtras only'. The Dacca edition says that the number is 842, Eggeling's edition gives the number as 829.

"...Sarva-varmā being a clever teacher for royal pupils taught some topics of grammar by sūtras and others by examples only. Subsequent redactors added rules for which he gave examples only. So originally as the *Kātantra* came out from the hand of Sarva-varmā, it did not contain a quarter of the rules, as are now credited to him."—(*Shastri-Cat*, Vol. VI, Preface, pp. xxxviii-xl) দ্র. *H-I-L*-Vol. III, part II, pp. 439-41.

৯. ক্রমদীশ্বরের ব্যাকরণের নাম 'সংক্ষিপ্তসার'।' ইনি বাঙালি ছিলেন কিনা সন্দেহ, তবে বাংলা দেশে সমাদৃত। 'সংক্ষিপ্তসারে'র অষ্টম পাদে আত্মপরিচয় আছে, এই অংশ প্রক্ষিপ্ত মনে করা হয়। ফলে তাঁর ব্যক্তি পরিচয় এবং বংশ পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। কোনো মতে তিনি দশম শতাব্দীর মানুষ, মতান্তরে দ্বাদশ বা পঞ্চদশ শতাব্দীর। তাঁর সম্পর্কে প্রচলিত গল্প আছে যে ছোটোবেলায় বাপ-মার মৃত্যুতে অনাথ বালক কোনো পণ্ডিতের আশ্রয় পান এবং ক্রমে কৃতবিদ্য হয়ে ওঠেন। ব্যাকরণ লিখলেন, কিন্তু লেখা সরল-সহজ না হওয়ায় ক্ষোভে রাজা জুমরনন্দীর পুকুরে ফেলে দিয়ে আত্মহত্যা করেন। জুমরনন্দী বইখানি তুলে এনে সংশোধন সংযোজন করেছিলেন। এইজন্য 'সংক্ষিপ্তসার'কে 'জৌমর ব্যাকরণ'ও বলা হয়। জুমরনন্দী 'রসবতী' নামে এর বৃত্তি লেখেন। এই ব্যাকরণের টীকা লিখেছেন গোয়ীচন্দ্র, নারায়ণ ন্যায়পঞ্চানন, বংশীবদন কবিচন্দ্র প্রভৃতি।

"The Saṃkṣipta-sāra had four stages of development before it became a complete school :—

I. The sūtras of Kramadīśvara.
II. The commentary called *Rasavatī.*
III. Its revision by Jumara Nandi.
IV. Goyī-candra's Vivaraṇa commentary.

"Kramadīśvara has a high sounding title.

Vādīndra-cakra-cūḍāmaṇi or the 'crest jewel of the circle of controversialists.' The title of Vādīndra or Vādirāṭ was very common from tenth to the thirteenth century. The Bnddhist Mañju-śri had a title Vādirāṭ. Belvalkar says that Jaya Siṃha II, the Chālukya emperor, had a title Vādirāṭ. In the 13th century Ānanda-giri, the commentator of *Śaṃkara bhāṣya* was a Vādīndra. Kramadiśvara got this title from the Śaivas. He wrote the sūtras. But Kṛt-śeṣa uṇādi-pāda does not seem to be his work It seems to be the work of either the author of the Vṛtti or of Jumara Nandī, the revisor of it. The sūtras of the appendix of the taddhita section are by Goyī-candra. Kramadīśvara in the sanskrit portion of his work follows the arrangement of grammatical subjects by Bhartṛ-hari, who divides his work *Vākya-padīya* in three-Kāṇḍas. The Brahma-Kāṇḍa which treats of articulate sound, and philosophy connected with it. The Vākya-kāṇḍa, the essence of which is verbs, and the Pada-kāṇḍa which treats of nouns. These three Kāṇḍas have been split up, by Kramadīśvara into seven pādas, (1) Brahma-Kāṇḍa = Sandhi-pāda, (2) Vākya-Kāṇḍa = Verbs, verbal nouns and other nouns, (3) Pada-Kāṇḍa = syntax, declensions and compound words. He does not follow the arrangement of the Aṣṭādhyāyi, for in that arrangement Sandhi comes last of all.

"In seven only of his sūtras, he mentions his predecessors, Kātantra and Cāndra. Once he quotes Bhāga-vṛtti, Kāraka-pāda, 101, and once again Anu-pada-kāra = Sandhi-pāda, 224.

"Kramadīśvara evidently wrote his work in the interest of the Śaivas of Central India. His name shows that he was a Śaiva and his invocation shows

that he was a Śaiva. Śaivas at this period used the Prākṛtas and vernaculars in their propaganda work. The Bengal Śaivas of Candra-dvīpa wrote in the vernacular, traces of which are to be found in later Buddhist works, and the Kāśmīra Śaiva works are almost invariably accompanied with some verses in vernacular at the end of each chapter. Kramadīśvara, therefore, found it necessary to give some grammar of the Prākṛtas and the vernaculars. But, as will be stated later on, wicked people dropped it, and so, the eighth pāda of his work, has neither the vṛtti of Jumara Nandī nor the commentary by Goyī-candra. The only commentary on this section is by Nārāyaṇa Nyāya-pañcānana. In including a section for the Prākṛitas and excluding the Vaidika grammar he seems to be the inspirer of Hemacandra, who boasts that, the whole of his work is original or 'Svopajña." (*Shastri-Cat.*, Vol-VI, Preface, pp. lx-lxii).

১০. "Bhaṭṭoji Dīkṣita, whose *Siddhānta Kaumudī* is the standard work on Pāṇini's school of grammar, wrote a commentary on the Great Commentary. This commentary was entitled the *Śabda-kaustubha*, Aufrecht says, that this commentary went up to the first pāda of the first adhyāya. Dr. Belvalkar says, 'This was left probably incomplete though he must have written as far at least as the fourth āhnika of adhyāya three.' But our Catal. No. 4224 has a colophon 'the first āhnika of the first pāda of the fourth chapter.' It is in the course of publication in the Chowkhamba series. It is a voluminous work and Bālam-Bhāṭṭa wrote a commentary on it entitled *Prbhā*, still more voluminous a work it must be."

... ...

"The last and the most important recast of Pāṇini is the *Siddhānta-kaumudī* by Bhaṭṭoji-dīkṣita. This work has the widest currency of Sanskrit grammars. The exact date of its composition is not known ; but the commentator on *Bārāṇasī-darpaṇa*, a poem on Benares in eleven cantos (L. 765) tells us, that he obtained purity of speech from Bhaṭṭoji-dīkṣita and his son whose name as a Sannyāsī was Rāma-śarma. A pupil of Bhṭṭoji wrote a work on *Siddhānta-kaumudī* in 1636. Bhaṭṭoji's work was therefore written in the later years of the 16th century.

"Nārāyaṇa-bhaṭṭa was born in March 1514 ; (*Indian Antiquary*, January 1912, pp. 7-13) he obtained the title of Jagad-guru in 1572 A.D. from Akbar. At Benares he was the head of the paṇḍitas of the place. After his death his second son Śaṅkara-bhaṭṭa became the head. Bhaṭṭoji-Dīkṣita was a pupil of this Śaṅkara-bhaṭṭa. He was also a pupil of Śeṣa-kṛṣṇa..... After finishing his education with Śeṣa-kṛṣṇa Bhaṭṭoji became a pupil of Śaṅkara-Bhaṭṭa, for Koṣa and Vyākaraṇa are juvenile studies, Smṛti and Mīmāṃsā came later. Bhaṭṭoji finished his education, say about 1580. Then he wrote his *Siddhānta-kaumudī* and its commentary the *Prauḍha-manoramā*. Varada-rāja who was a pupil of Bhaṭṭoji, made the abstracts of the *S. Kaumudī* in the nineties and the *Madhya-manoramā* was written by Rāma-śarmā about that time. Bhaṭṭoji, after writing the grammars, busied himself in writing Smṛti works, many of which hold their ground still. So Bhaṭṭoji lived many years after writing his grammars. There will be no difficulty of Rāma-śarmā in dedicating his *Madhya-manoramā* to Vidyanivāsa, whom we find getting a part of the

Kṛtya-kalpataru copied by Kavi-candra, a Kāyastha, in 1588. (I.O. Catal. 1385) 'व्योमेन्दु-शरसितांसुमित शाके'।

... ...

"Bhaṭṭoji was early educated under two of the most prominent men of the 16th century; one was Śaṅkara-bhaṭṭa, the son of Nārāyaṇa-bhaṭṭa, on whom Akbar conferred the title of Jagad-guru. Śaṅkara-bhaṭṭa in a historical work entitled *Gādhi-vaṃśānu-carita*, speaks of Bhaṭṭoji Dīkṣita as one of his pupils. Perhaps, Bhaṭṭoji learnt from him Mimāṃsā and Smṛti, in which Bhaṭṭoji wrote several works which are still current. His other guru was Śeṣa-kṛṣṇa, the commentator of Prakriyā-kaumudī. Śeṣa-kṛṣṇa was a very proud man; proud of his learning and proud of his position in society. ...But Bhattoji was not very respectful to his guru and specially to Śeṣa-kṛṣṇa whome he severely criticises and whose work he eventually ousted from currency in Northern India. ...

"Bhaṭṭoji Dīkṣita was not so liberal as Rāma-candra. He would not tolerate any opinion expounded or any new facts of the language noted by the Buddhist commentators of Pāṇini. He discarded them all as a-Pāṇineya, *i.e.*, not sanctioned by Pāṇini, and as Bhāṣya-viruddha, or as contradicting the opinions of Patañjali. Rāma-candra left out many difficult sūtras of pāṇini but Bhaṭṭoji left out none. Bhaṭṭoji accepted the arrangement of Vopa-deva and he marshalled Pāṇini's sūtras strictly according to that arrangement, while Rāma-candra had to make his own arrangement as he came before Vopa-deva.

"As I have said before, Bhaṭṭoji wrote a commentary on the *Mahā-bhāṣya* entitled *Śabda-Kaus-*

tubha, so he had a deeper insight into the 'Great Commentary' than men living in his time. He always supported the orthodox view of Patañjali, Bharttṛ-hari and Kaiyaṭa and had scant courtesy for Jayāditya, Vāmana, Jinendra-buddhi, Hara-datta and others.

"*Siddhānta-kaumudī* means a collection of decisions by the best grammarians while Prakriyā-kaumudī meant the process of learning grammar. The difference of the object of the two authors is apparent from the names of the works. Bhaṭṭoji's work was meant to be a standard work for educational purposes. He had therefore to write two commentaries on that work for scholarly purposes of different degrees, one is called *Bāla-manoramā* and the other *Prauḍha-manoramā*. But all efforts of Bhaṭṭoji would have been futile, had he not written a commentary on the *Mahā-bhāṣya* followed by a short work on the philosophy of grammar, and had he not been followed by a galaxy of great authors supporting him in all that he did." (*Shastri-Cat.*, Vol. VI, Preface, pp. xxvi, civ-cviii).

১১. একাধিক লেখক-সংকলকের বই কাত্যায়নের নামে প্রচলিত। ভারতীয় জ্ঞানচর্চার ঐতিহ্যে কাত্যায়ন নামটির প্রতিষ্ঠা সম্ভবত পাণিনিসূত্রের বার্তিক-পাঠের জন্য। বার্তিকের লেখক বররুচি-কাত্যায়ন। এ'র সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায় লিখেছেন—

"Kātyāyana is said to have been an inhabitant of Kauśāmbī about 30 miles to the west of Allahabad, on the southern bank of the Yamunā, now called Kosam. He blonged to a powerful family, distinguished for writing authoritative works on the Vedas. ...

"The relation between Pāṇini and Kātyāyana

is often misunderstood. Some people think that Kātyāyana was a captious and a hostile critic and others think that he was more learned than Pāṇini. But my idea is that, Pāṇini belonged to Western India and Kātyāyana to Eastern India. Pāṇini belonged to the 5th or 6th century B.C. and Kātyāyana was much later. So Pāṇini's sūtras were open to criticism by an Eastern scholar younger by two or three or more generations. ...Kātyāyana did not write an independent work as he found it more convenient to append Vārttikas, *i.e.*, his criticisms, to certain rules of Pāṇini. Katyāyana was very respectful to Paṇini, sometime calling him even 'Bhagavān." (*Shastri-Cat.*, Vol. VI, pp. xix-xx). প্রাচীনতম প্রাকৃত ব্যাকরণ 'প্রাকৃতপ্রকাশ'ও' বররুচির নামে প্রচলিত। 'প্রাকৃতপ্রকাশ'-এ ৯টি অধ্যায়ে মাহারাষ্ট্রী প্রাকৃত এবং একটি অধ্যায়ে পৈশাচী, মাগধী ও শৌরসেনীর বৈশিষ্ট্য আলোচিত। বররুচিকে কাতন্ত্র বা কলাপ ব্যাকরণের কৃৎ-প্রকরণ অংশের লেখক মনে করা হয়। কাশ্মীরি 'বৃহৎকথা' এবং সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর'-এ বররুচিকে পাণিনির প্রতিদ্বন্দ্বী ও রাজা নন্দের একজন মন্ত্রী বলা হয়েছে। আর-একটি ঐতিহ্যে তাঁকে রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার অন্যতম রত্ন বলা হয়। তিব্বতি ঐতিহাসিক তারনাথ তাঁকে এক রাজা উদয়নের সভা-পুরোহিত বলে উল্লেখ করেছেন, এ'র কাছে উদয়ন ব্যাকরণ পড়েন। *H-I-L*, Vol. III, pt. II, pp. 427-28, 431-32 ; *Tāranāth*, p. 111 ; Shastri, *Magadhan Literature*, Patna, 1923, pp. 37-40.

১২. ব্যাড়ি নামে দু জন শাব্দিকের পরিচয় পাওয়া যায়। একজন শৌনক ভার্গবের শিষ্য ও পাণিনির পূর্ববর্তী, আর-একজন সম্ভবত পাণিনির শিষ্য ও মাতুলপুত্র বা মাতুলপৌত্র দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি। পাণিনির পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নানা বই থেকে বর্ষীয়ান ব্যাড়ির পরিচয় পাওয়া যায়, দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি সংগ্রহকার বলে প্রসিদ্ধ। ব্যাড়ি রচিত তিনটি বই— 'সংগ্রহ', 'উৎপলিনী' ও 'লিঙ্গানুশাসনসূত্র'। অনেকে মনে করেন, বর্ষীয়ান ব্যাড়ির কোনো সংগ্রহগ্রন্থ নিয়ে পাণিনীয়-নিয়মানুসারে কালোপযোগী করার জন্য দাক্ষায়ণ ব্যাড়ি তার সংস্কার করেছেন। দাক্ষায়ণ ব্যাড়ির

'উৎপলিনী' একটি কোষ গ্রন্থ। এটি 'লিঙ্গানুশাসন'এর একটি অংশ ছিল। এই বই এখন আর পাওয়া যায় না। মহারাজ হর্ষবর্ধন ও বামনাচার্য ব্যাড়ির 'লিঙ্গানুশাসন' দেখেছিলেন জানতে পারা যায়। শাস্ত্রীমশায় মন্তব্য করেছেন—

"The whole of the Pari-bhāṣā literature seem to emanate from Vyāḍi (Catal. No. 4337 to 4346). Vyāḍi seems to have collected the nucleus of the Pari-bhāṣās and subsequent writers have added to them till their number was fixed by the Vṛtti of Sīra-deva. The Pāṇinīya pari-bhāṣā seems to apply to all schools of grammar. The last word on the Pari-bhāṣas have been said by Nāgeśa and his pupil Vaidya-nātha Pāya-gunḍe." (*Shastri-Cat.*, Vol. VI, Preface,p. xviii). দ্র. গুরুপদ হালদার, 'ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড, কলকাতা ১৩৫০ ব., পৃ. ৫২৫-৩৩.

১৩. পতঞ্জলির আবির্ভাব কাল আনুমানিক খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগ। গোণর্দ বা আধুনিক উত্তরপ্রদেশের গোণ্ডায় জন্ম। তিনি গোণিকা পুত্র, গোণর্দীয় বা চূর্ণিকৃৎ নামেও খ্যাত। অনেকে তাঁকে অনন্তনাগের অবতার বলে থাকেন। পাণিনি ব্যাকরণের সূত্র ও কাত্যায়নের 'বার্তিক' অতি সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করে তিনি তাঁর মহাভাষ্য রচনা করেন। শুধু 'মহাভাষ্য' বললে এই ভাষ্যকেই বোঝায়। বইটির অপর নাম 'ফণিভাষ্য'। 'যোগদর্শন' রচয়িতা পতঞ্জলি ও ইনি এক ব্যক্তি কিনা এ বিষয়ে এখনো সংশয় আছে। শাস্ত্রীমশায় তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন—

"Sanskrit grammar is said to have been settled by three Munis. There is a dictum 'Tri-muni Vyākaraṇaṃ'. The three munies are Pāṇini, Kātyāyana and Patañjali. ...Patañjali is said to have written the 'Great Commentary' or the *Mahā-bhāṣya*....

"Patañjali's mothers's name was Goṇikā. He is often called Goṇikā-putra. He belonged to Gonarda, which Varāha-mihira's *Bṛhad-Saṃhitā* places along with Cedi and Kukura in one instance, and along Daśapura and Kerala in another. He

seems to have been familiar with Ujjayinī and Māhiṣmatī. He often says, setting out from Ujjayinī at sun-rise one could go to the other at sun-set. He was also familiar with Pāṭali-putrı, where he came to officiate in one of the great sacrifices held by Puṣya-mitra, perhaps a horse-sacrifice, and settled in its vicinity. Reading through the *Mahā-bhāṣya* one is struck with Pātañjali's familiarity with Pāṭali-putra, its walls, its palaces, roads emanating from it to distant cities, and even with the guides who used to 'teach' Pāṭali-putra. In fact in my *Magadhan literature*, I have said that, he was full of Pāṭali-putra. He was also familiar with Vātsāyanas and Gārgāyaṇas of whom the former we know from Harṣa-carita, were settled at Prītikūṭa in the hermitage of Cyavana twenty-five miles south west of Patna near the Śona, from remote antiquity. Patañjali says that he resided with his students for a time at Kāśmīra where he ate rice.

"He says that he officiated at a sacrifice of Puṣya-mitra. He also says that in his time the Greeks beseiged the Mādhyamikas and Sāketa but he did not see it. It is well known that Puṣya-mitra dethroned the last representative of the Maurya dynasty at Pātali-putra and assumed supreme power though under the humble name of Senā-pati. It is also well known that he performed the horse-sacrifice twice. It is also known that Puṣya-mitra fought with the Greeks and defeated them in a great battle. Puṣya-mitra's date, therefore, is well known. It is about 180 B.C. and he reigned for 36 years. So the literary activity of Patañjali will fall between 200 and 150 B.C." (*Shastri-Cat.*, Vol. VI, Preface, pp. xx-xxii).

১৪. "The philosophy of grammar was never treated of separately before the time of Bhartṛ-hari, who died

according to It-siang, in 650 A.D. He is said to have written a commentary, on the *Mahā-bhāṣya*. Gaṇa-ratna-maho-dadhi says, that Bharttṛ-hari explained only the first three pādas of the *Mahā-bhāṣya*, and Bühler says that, fragments of the commentary are to be found in the Royal Library of Berlin, and in the Daccan. Belvalkar says, that the work has not yet seen the light. We know that in the 17th century Bhaṭṭoji after writing a commentary on the *Mahā-bhāṣya* wrote 71 verses, on the philosophy of grammar. Bharttṛ-hari, thousand years before, seems to have done the same thing, that is, after writing a commentary on the *Mahā-bhāṣya*, he wrote a short metrical work, on the philosophy of grammar, in three chapters, called the *Vākya-padīya*. This short work would have no meaning without a commentary on the *Mahā-bhāṣya*.

"The grammarian Bharttṛ-hari is often identified with the poet Bhattṛ-hari, the writer of the three or four Śatakas. This is at best very doubtful, for the earliest quotation from the poet Bharttṛ-hari is by Kṣemendra in the 11th century.

"The grammarian Bharttṛ-hari laments the corruption of the text of the *Mahā-bhāṣya*, which, he says, Candrā-cārya re-edited shortly before his time." (*Shastri-Cat.*, Vol. VI, Preface, pp. xxxiv-xxxv).

১৫. "The next great name after Patañjali in the matter of explaining the *Aṣṭādhyāyī* of Pāṇini is Kaiyaṭa. His father was Jaiygaṭa. He was most probably, as the name indicates, a Kāśmīrian. Kaiyaṭa's date is not known, but he probably flourished in the tenth century of the Christian era. There is a gap of

nearly 1200 years between Patañjali and Kaiyaṭa, yet Kaiyata is a direct follower of Patañjali in the direct line of orthodox school of Pāṇini. The intermediate writers on Pāṇini were mostly Buddhists. They did not much care for Patañjali. Kaiyaṭa has made use of older grammarians, of these two are Āpiśali and Kāśa-kṛtsna. Āpiśali is quoted by Pāṇini himself and Kāśa-kṛtsna is several times mentioned in the *Mahā-bhāṣya*. ...Kaiyaṭa has quoted 34 more Vārttikas than Patañjali. Kaiyaṭa was a pupil of Maheśvara." (*Shastri-Cat.*, Vol. VI, Preface, p. xxv).

১৬. "Bhaṭṭojī Dikṣita had a disciple named Varadarāja, who made three abridgements of his work, *Madhya-siddhānta-kaumudī*, *Laghu-siddhānta-kaumudī* and *Sāra-siddhānta-kaumudī* The *Madhya* is of considerable extent and is intended to impart not only an elementary but a fully working knowledge of the language. The *Laghu* is intended for beginners and the *Sāra* is an absolutely elementary work current at present at Mithilā and Purnea. All these abridgements retain the sūtras of Pāṇini, only fewer and fewer in number, but arranged almost in the same order as in the *Siddhānta-kaumudī*. The *Laghu* and *Sāra* do not mind much about the Vaidika grammar and Vaidika phonetics and all the three discard anything that is difficult and minute. The commentary on the *Siddhānta-kaumudī* by the author himself is called *Manoramā*. The *Madhya* has a commentary called *Madhya-Manoramā*. It is simply an abridgement of the *Prauḍha-manoramā* as far as it relates to the sūtras of the *Madhya*. The commentary is by Rāmacandra Śarmā, who wrote it at the request of Śivānanda Bhaṭṭa or Sivānanda

Gosvāmī and it was dedicated to Vidyā-nivāsa, the most prominent Paṇḍita of Bengal at the time of Akbar, and who was perhaps the guru of the author." (*Shastri-Cat.*, Vol. VI, Preface, pp. cix-cx).

১৭. অনুবাদ : বিদ্যানিবাসের কণ্ঠে (শ্লেষে— কণ্ঠমালায়) রয়েছে মধ্য-মনোরমা (শ্লেষে— মধ্যমণি)। গোস্বামী শ্রীশিবানন্দ সর্বদা আনন্দ বিতরণ করুন।

১৮. মাধবেন্দ্রপুরী পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। দেশ কোথায় জানা যায় না। বাঙালি বা দক্ষিণের লোকও হতে পারেন। তাঁর প্রভাবে ভক্তি আন্দোলন জেগে ওঠে। অদ্বৈত আচার্য, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, গদাধর পণ্ডিতের বাবা মাধব মিশ্র এবং চৈতন্যের দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরী তাঁর শিষ্য। অনেকের মতে নিত্যানন্দও মাধবেন্দ্রের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁকে গুরুর মতো ভক্তি করতেন। গোবর্ধনে মাধবেন্দ্র গোপালমূর্তি প্রকট করিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গোপালের সেবার জন্য চন্দনকাঠ আনতে দু-চার বছর অন্তর দ্রাবিড় দেশে যেতেন। তাঁর পাঁচটি শ্লোক শ্রীরূপ গোস্বামী 'পদ্যাবলী'তে উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর "অয়ি-দীনদয়ার্দ্রনাথ" শ্লোকটি চৈতন্য আবৃত্তি করতে ভালোবাসতেন।

১৯. 'মন্বর্থমুক্তাবলী' নামে 'মনুসংহিতা'র সহজ এবং ছোটো টীকার লেখক কুল্লূকভট্টের আবির্ভাব কাল অনিশ্চিত। অনেকে এঁকে আরো আগের কালের মানুষ মনে করেন। 'স্মৃতিসাগর' নামে আর-একটি বই তাঁর নামে প্রচলিত।

২০. ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য। জন্ম নবদ্বীপে। বাবা হরিহর। হিন্দুর সামাজিক রীতিনীতিতে শৃঙ্খলা আনার জন্য 'অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব', 'তীর্থযাত্রাবিধি', 'দায়তত্ত্ব' প্রভৃতি স্মৃতি-গ্রন্থ এবং জীমূতবাহনের 'দায়ভাগ'এর টীকা রচনা করেন। হিন্দু সমাজ রঘুনন্দন প্রবর্তিত বিধিবিধানে দীর্ঘ দিন নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে।

২১. দ্র. Haraprasad Shastri, "Dakṣhiṇī Paṇḍits at Benares", *Indian Antiquary*, January 1912, pp. 7-13.

২২. নারায়ণ ভট্ট ও শংকর ভট্ট সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায় লেখেন—

"Nārāyaṇabhaṭṭa was born in March 1514; (*Indian Antiquary*, January 1912 p. 7-13); he obtained the title of Jagad-guru in 1572 A.D. from Akbar. At Benares he was the head of the paṇḍitas of the place. After his death his second son Śaṅkara-bhaṭṭa became the head. Bhaṭṭoji Dikṣita was a pupil of this Śaṅkara-bhaṭṭa. He was also a pupil of Śeṣa-kṛṣṇa, whose drama the *Kaṅsa-vadha* was enacted before Giri-dhārī, son of Toḍara-malla. ...Bhaṭṭoji must have read with Śeṣa-kṛṣṇa when the *Prakriyā-prakaśā* was in the making. Perhaps he and Kalyāṇa read together. After finishing his education with Śeṣa-kṛṣṇa Bhaṭṭoji became a pupil of Śaṅkara-bhaṭṭa, for Koṣa and Vyākaraṇa are juvenile studies, Smṛti and Mimāṃsā come later." (*Shastri-Cat.*, Vol. VI, Preface, pp. civ-cv).

২৩. অনুবাদ : দাক্ষিণাত্য মতের গুরুত্ব প্রতিপন্ন করেছিলেন।

রত্নাকর শান্তি

হিউয়েন-সাং[১] যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন নালন্দা[২]— বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান স্থান ছিল। নালন্দা— বুদ্ধদেবের প্রধান ছাত্র শারিপুত্রের[৩] জন্মস্থান, মগধের রাজধানী রাজগৃহ হইতে পাঁচ-ছয় ক্রোশ উত্তরে। এখানে একটি বড়ো রাস্তা ছিল, তাহার একধারে বহু-সংখ্যক বিহার, আর-একধারে বহু-সংখ্যক স্তূপ। অনেক বড়ো বড়ো পণ্ডিত এখানে থাকিতেন; সকলেই বৌদ্ধ ভিক্ষু। চারি দিকে ছাত্রদের কুটির ছিল; তাহারা সেখানে বাস করিত, খাইত এবং বিহারে আসিয়া পড়িত। অনেকে নালন্দাকে ইউনিভার্সিটি বলেন; এরূপ বলা সঙ্গত কিনা আমি জানি না; মঠ-সমষ্টি বলাই আমার মতে ঠিক।

নবম শতকে যখন ধর্মপাল[৪] ও দেবপাল[৫] পেশোয়ার হইতে গোদাবরীর মুখ পর্যন্ত সমস্ত দেশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা বাড়ির কাছে আর-একটা বড়ো জায়গা, বৌদ্ধধর্মের প্রধান স্থান করিবার ইচ্ছা করিলেন এবং ভাগলপুরের একটু উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গার ধারে বিক্রমশিলা[৬] নামে একটা প্রকাণ্ড বিহার করিলেন। ক্রমে আরো অনেক লোক সেখানে বিহার করিতে লাগিলেন। বিক্রমশিলা নালন্দার মতনই জাঁকিয়া উঠিল। এখানে অনেক বড়ো বড়ো বৌদ্ধ ভিক্ষু, বড়ো বড়ো পণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে রত্নাকর শান্তি একজন। ইঁহার পূর্বাশ্রমের কথা কিছুই জানা যায় না। কিন্তু ভিক্ষু আশ্রমে তিনি একজন প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন, এবং বিক্রমশিলা-বিহারের তিনি দ্বার-পণ্ডিত ছিলেন। এখন যেমন বড়ো বড়ো রাজ-রাজড়ার বাড়ি সভা-পণ্ডিত থাকে, তেমনি সেকালে বড়ো বড়ো মঠের দ্বার-পণ্ডিত থাকিত। তিনি না বলিলে মঠে নূতন লোক প্রবেশই করিতে পারিত না। তিনিও নূতন লোকের বিদ্যা-বুদ্ধি, পড়াশুনা, স্বভাব-চরিত্র বিশেষরূপ পরীক্ষা না করিয়া তাহাকে যাইবার অনুমতি দিতেন না। দ্বার-পণ্ডিতদের পক্ষে ন্যায়শাস্ত্র লইয়া কথাবার্তা কওয়াই সুবিধা ছিল। রত্নাকর শান্তিও একজন বড়ো নৈয়ায়িক ছিলেন। তিনি দু-চারটা ফাঁকি করিয়া যদি দেখিতেন, লোকটার জ্ঞান-বুদ্ধি আছে, তবে তাহাকে মঠে যাইতে দিতেন, নহিলে দিতেন না।

সেকালকার পণ্ডিতদের মধ্যে তাঁহার খুব প্রভাব ছিল। যিনি ভোট দেশে গিয়া মহাযান ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সেই দীপংকর শ্রীজ্ঞান[৭] তাঁহার শিষ্য ; আরো অনেক বড়ো বড়ো পণ্ডিত তাঁহার শিষ্য ছিলেন। ১০৩৫ সালে বিক্রমশিলা বিহারে এক মহাসভা হয়। দীপংকর সমস্ত ব্যবস্থা করেন ; কিন্তু সে সভায় কোন্ কোন্ বিষয়ের আলোচনা হইবে, কে কে আলোচনা করিবে, কী ভাবে আলোচনা হইবে— এই সমস্ত ব্যবস্থা রত্নাকর শান্তি করেন। এই সভায় নাঢ় পণ্ডিত[৮] উপস্থিত ছিলেন ; তিনি তখন এত বুড়া হইয়াছিলেন যে, ডুলি ভিন্ন চলিতে পারিতেন না। দীপংকর তাঁহাকে কোলে করিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট উচ্চ আসনে বসাইয়া দিয়াছিলেন। এই নাঢ় পণ্ডিত ও তাঁহার স্ত্রী নাঢ়ী— দু জনের চেলারাই বাংলা দেশে—

রাঢ়ে নাঢ়ানাঢ়ী নামে বিখ্যাত হইয়াছে। নাঢ়ী, নাঢ় পণ্ডিত অপেক্ষাও পণ্ডিত ছিলেন। বৌদ্ধ সমাজ হইতে তিনি জ্ঞানডাকিনী উপাধি পাইয়াছিলেন। এ সভায় কিন্তু নাঢ়ী গিয়াছিলেন বলিয়া কোনো উল্লেখ নাই।

বিক্রমশিলা হইতে ফিরিবার সময় ডুলিতে উঠিবার পূর্বে নাঢ় পণ্ডিত দীপংকরকে ডাকিয়া বলেন— আমাদের তো দিন ফুরাইয়াছে, এখন এই-সব ধর্মের ভার তোমার উপর ; তুমি খুব হুঁশিয়ার হইয়া কাজ করিবে, গুরুজনের কথা কখনো অবহেলা করিও না। আহা ! বেচারা ডুলি করিয়া যাইতে যাইতে পথেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুতে রত্নাকর ও দীপংকর দু জনেই অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন।

এই সময়ে ভোট দেশের রাজার একজন দূত অনেক লোকজন ও টাকাকড়ি লইয়া প্রায় তিন বৎসর বিক্রমশিলায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার উপর রাজার হুকুম ছিল, তুমি যে করিয়া পার, দীপংকর শ্রীজ্ঞানকে ভোট দেশে আনিবে। দুই-তিনবার যাইতে পারিব না বলিয়া এবার দীপংকর একটু নরম হইয়াছিলেন। তাই একদিন রত্নাকর শান্তি তাঁহাকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন— দেখ, নাঢ় পণ্ডিত তো মরিয়া গেল। আমরাও কোন্ দিন যাইব। মগধে— এমন-কি, সমস্ত ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের মঙ্গলামঙ্গল তোমার উপর নির্ভর করিতেছে। ব্রাহ্মণেরা সর্বত্রই মাথা তুলিয়া উঠিতেছে। আমাদের ধর্মের ভিতরও নানারূপ দলাদলি মতামতি হইয়া পড়িতেছে। এ সময়ে তোমার দীর্ঘ প্রবাসের জন্য ভোট দেশে যাওয়া উচিত নয়। তাহা হইলে এদেশে ধর্ম লোপ হইবে। তুমি কি দেখিতেছ না যে, একটা ভীষণ জাতি ভারতবর্ষের পশ্চিম দুয়ারে ভীষণ আঘাত করিতেছে। উহারা যদি দেশের মধ্যে ঢোকে, বৌদ্ধধর্মের চিহ্নমাত্রও থাকিবে না। ধর্মের এই ঘোর দুর্দিনে সকলেই তোমার মুখ চাহিয়া আছে। তুমি এ সময়ে কিছুতেই ভোট দেশে যাইও না।

দীপংকর সেকথা শুনিলেন না। পাছে গুরু বাধা দেন, তাই লুকাইয়া লুকাইয়া বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। নদীর উত্তর পারে যান-বাহন সব জড়ো হইতে লাগিল। একদিন রাত্রি দুই প্রহরের সময় দীপংকর গঙ্গা পার হইয়া একেবারে ৫০/৬০ মাইল দূরে গিয়া

পৌঁছাইলেন। রত্নাকর শান্তি এই কথা শুনিয়া 'হায় ! হায় !' করিতে লাগিলেন। তিনি যা ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণে বর্ণে ফলিয়াছে। সেই দুর্দান্ত জাতি ভারতবর্ষের পশ্চিম দুয়ার ভাঙিয়া, ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের নাম পর্যন্তও লোপ করিয়া দিয়াছে। ভারতবর্ষ যে এককালে বৌদ্ধপ্লাবিত ছিল, এ কথাটা খৃস্টীয় উনিশ শতকের শেষে আবিষ্কার করিতে হইয়াছে। রত্নাকর শান্তির এই দূর ভবিষ্যদ্দৃষ্টি হইতেই বুঝা যায়, তিনি কত বড়ো পণ্ডিত ছিলেন।

ন্যায়শাস্ত্রে রত্নাকর শান্তির অনেক বই ছিল। এখন সব পাওয়া যায় না। একখানি পাওয়া গিয়াছে, সেখানির নাম— 'অন্তর্ব্যাপ্তি-সমর্থন'।[৯] অতীন্দ্রিয় বিষয়ের অনুমান করিতে হইলে, সে তো বাহিরের ব্যাপ্তি দ্বারা হয় না। আমরা জানি, যেখানে ধূম আছে, সেখানেই বহ্নি আছে, এখানে তো ব্যাপ্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইল। কিন্তু অতীন্দ্রিয় ব্যাপারে ব্যাপ্তি তো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না ; তাহার জন্য একটা অন্তর্ব্যাপ্তি চাই। সেই অন্তর্ব্যাপ্তিকে তিনি খুব সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ নৈয়ায়িকেরা অন্তর্ব্যাপ্তি মানেন না ; না মানার দরুণ তাঁহাদের কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী[১০] প্রভৃতি অনেক পদার্থ মানিতে হইয়াছে।

রত্নাকর শান্তি নৈয়ায়িক ছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যে বালশাস্ত্রের বই লেখেন নাই, তাহাও নহে। তাঁহার একখানি ছন্দের বই ছিল।[১১] উহার এক নকল ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে আছে এবং সেই সঙ্গে উহার ভোটভাষায় তর্জমাও আছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, ব্রাহ্মণ টীকাকারেরা বহুদিন অবধি রত্নাকর শান্তির এই ছন্দে রবই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছেন। রত্নাকর এখানে 'পিঙ্গলসূত্র'কেই অবলম্বন করিয়া বই লিখিয়াছেন।

এগারো শতকে বাংলা বিহারের বৌদ্ধ-পণ্ডিতেরা যিনি যত বড়ো পণ্ডিতই হউন, পুরোহিতের বই লিখিতেন অর্থাৎ উপাসনার প্রয়োগ ও পদ্ধতি লিখিতেন এবং দেশী ভাষায় দুই-চারিটা পদও লিখিতেন। টীকাটিপ্পনী লেখা তো তাঁহাদের কাজই ছিল। রত্নাকর শান্তি 'হেবজ্র-তন্ত্রে'র এক টীকা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম 'মুক্তিকাবলী'। হেবজ্র বলিতে বৌদ্ধদের এক যুগনদ্ধ দেবতা বুঝায়। যুগনদ্ধ মানে— জোড়া, যুগল। আড়ংঘাটায় কৃষ্ণ-রাধিকার যুগলমূর্তি আছে, সে কৃষ্ণ-রাধায়

যুগল-মিলন। হেবজ্র কিন্তু আর-একরকম যুগল : 'হে' বলিতে গেলে করুণা বুঝায় ; 'বজ্র' বলিতে গেলে শূন্যতা বুঝায়। করুণা ও শূন্যতা— এই দুইটির যুগল মিলনের নাম হেবজ্র। একখানি তন্ত্রগ্রন্থ আছে, তাহার নাম 'হেবজ্রতন্ত্র'। রত্নাকর শান্তি তাহার এক পঞ্জিকা টীকা লেখেন। টীকা অনেক রকম আছে, তাহার মধ্যে তিন রকম প্রধান— লঘু, বৃহৎ ও পঞ্জিকা। লঘু টীকা মানে— টিপ্পনী, এখানে একটু, ওখানে একটু নোট ; বৃহৎ টীকা— দণ্ডান্বয় করিয়া প্রত্যেক শব্দের প্রতিবাক্য দেওয়া, আভাস দেওয়া ও তাৎপর্য দেওয়া ; পঞ্জিকা সকলের চেয়ে বড়ো টীকা— উহার অর্থ সর্বার্থভঞ্জিকা, শ্লোকে যত রকম অর্থ হইতে পারে, সব অর্থ দিয়া দেওয়া— সামাজিক, সাংসারিক, দার্শনিক ইত্যাদি ইত্যাদি। পঞ্জিকা লেখা কিছু বেশি বিদ্যার দরকার ; তাই রত্নাকর শান্তি 'হেবজ্র-তন্ত্রে'র 'মুক্তিকাবলী' নামে এক পঞ্জিকা টীকা লেখেন।

ইনি অনেকগুলি সাধনা লেখেন। কিন্তু সে সাধনাগুলি যে সব তাঁরই, একথা আমরা বলিতে পারি না। কারণ, তাহাতে 'শান্তি' নাম আছে, 'রত্নাকর শান্তি' নাই। তন্ত্রের কয়েকখানি ভালো ভালো বই রত্নাকর শান্তির নামে লেখা আছে, তাহার মধ্যে একখানির নাম 'সুখদুঃখদ্বয়পরিত্যাগদৃষ্টি', অর্থাৎ সুখ এবং দুঃখ-- দুয়ের কিছুই নাই। বৌদ্ধদের চারিটি ধ্যানে কেমন করিয়া প্রথমে বিতর্ক যায়, তাহার পর বিচার যায়, তাহার পর সুখ যায় ও তাহার পর দুঃখ যায়, একথা যাঁহারাই বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থ পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। রত্নাকর শান্তি সে বিষয়ে একখানি নূতন বই লিখিয়া গিয়াছেন।

সিদ্ধাচার্য শান্তির নামে 'বৌদ্ধগান ও দোহা'য় দুটি গান আছে (১৫, ২৬)। প্রথমটি এই—

সঅ সম্বেঅণ সরুঅ বিআরেঁতে অলকৃখলকৃখণ ন জাই
জে জ্জে উজু বাটে গেলা অনাবাটা ভইলা সোঈ ॥

এই গানটির টীকায় টীকাকার শান্তির একটি বিশেষণ দিয়াছেন— "নির্ভরপরমানন্দমুদিতঃ"। এ গানের অর্থ এই যে, যে সোজাপথে গিয়াছে, তাহার রাস্তা শীঘ্রই ফুরাইয়া যায়।

দ্বিতীয় গানটি— তুলা ধুণি ধুণি আঁসুরে আঁসু।
আঁসু ধুণি ধুণি নিরবর সেসু ॥

ইহার অর্থ এই যে, তুলা ধুনিতে ধুনিতে কেবল আঁশ থাকে, আঁশ ধুনিতে ধুনিতে শূন্য হইয়া যায়।

এই দুই গানেরই ভাষা অন্যান্য গান হইতে একটু তফাত। আমার বোধ হয়, রত্নাকর শান্তি বিহার অঞ্চলের লোক ; কেননা, তিনি এক জায়গায় 'বলিতেছি' অর্থে 'বোলথি' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এটা বাংলায় ব্যবহার হয় না, তখনো হইত না, এখনো হয় না।

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'
প্রথম সংখ্যা, ১৩৩৮ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-এর কার্যবিবরণীর খাতায় উল্লেখ আছে ৩১ শ্রাবণ ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার পরিষদের প্রথম মাসিক অধিবেশনে চিন্তাহরণ চক্রবর্তী শাস্ত্রী-মশায়ের এই প্রবন্ধটি পাঠ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

১. মহাযানপন্থী বৌদ্ধ ভিক্ষু হিউয়েন্-ৎসাঙ (৬০০-৬৪ খৃ.) বা ইউয়ান-চুয়াঙের জন্ম চীনের হো-নান্ প্রদেশের কু-শিহ্ শহরের কাছে ছেন্-পাও-কু গ্রামে। ৬২৯ খৃস্টাব্দে মধ্য-এশিয়ার উত্তর দিক দিয়ে ভারতে আসেন এবং ১৪ বছর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভ্রমণ করেন। নালন্দায় ৫ বছর অধ্যক্ষ শীলভদ্রের কাছে যোগাচার ও বিজ্ঞানবাদ অধ্যয়ন করেন। তাঁর রচিত বইয়ের সংখ্যা ৭৬ খানি, এর মধ্যে ভারতবর্ষ বিষয়ে লেখা 'সি-য়্যু-কি' সমকালীন ভারতের ইতিহাস বিষয়ে এক মূল্যবান আকর। ভারতীয় বৌদ্ধ-পণ্ডিত সমাজে তাঁর নাম হয়েছিল মোক্ষাচার্য ও মহাযানদেব। ৬৪৫ খৃস্টাব্দে তিনি দেশে ফিরে যান।

২. বুদ্ধদেবের অন্যতম ঘনিষ্ঠ শিষ্য শারিপুত্রের জন্মস্থান এবং স্বয়ং বুদ্ধদেবের অন্যতম প্রিয় বিশ্রামের জায়গা প্রাবারিক-আমবাগানের জন্য নালন্দা বৌদ্ধ ঐতিহ্যে একটি পবিত্র তীর্থের মর্যাদা পেয়ে এসেছে। তারনাথের বিবরণে উল্লেখ আছে, সম্রাট অশোক এখানে এসে শারিপুত্রের চৈত্যে উপাসনা করেছিলেন এবং একটি মন্দির নির্মাণ করিয়েছিলেন। বিহার রাজ্যের রাজগির থেকে ১০ কিলোমিটার উত্তরে বড়গাঁওয়ে নালন্দা মহাবিহারের উৎখনিত ধ্বংসস্তূপ থেকে এই প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জানা সম্ভব হয়েছে। খৃস্টীয় পঞ্চম শতকে গুপ্ত রাজাদের আমলে নালন্দার সমৃদ্ধির সূচনা হয়েছিল। কনৌজের রাজা হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে (৬০৬-৪৭ খৃ.) নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ বিকাশ ঘটে। এই সময়ে চীনা পণ্ডিত হিউয়েন্-ৎসাঙ নালন্দার অধ্যক্ষ শীলভদ্রের কাছে পড়তে এসেছিলেন।

হিউয়েন্-ৎসাঙের বিবরণ থেকে নালন্দার বিশদ পরিচয় জানা যায়। পরবর্তী পাল রাজবংশের রাজত্বকালে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত নালন্দার গৌরব এবং সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে মুসলমান আক্রমণের সময় থেকে এই বিখ্যাত বিদ্যাকেন্দ্রের অবক্ষয় শুরু হয় এবং ক্রমে চতুর্দশ শতকের মধ্যে বিহারটি পরিত্যক্ত হয়। সাত-আট শো বছর ধরে প্রতিষ্ঠানটিতে বিদ্যাচর্চা এবং ধর্মচর্চার ধারায় স্বভাবতই বহু পরিবর্তন ঘটেছিল। পাল রাজত্বকালে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে নালন্দা মহাবিহার। তবে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদবিদ্যা এবং সমকালীন ভারতীয় বিদ্যার সমস্ত শাখাই অনুশীলিত হত। এই বিহারে ধাতু ঢালাইয়ে নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায় ব্রোন্জ মূর্তির উৎকর্ষে। নালন্দায় ১০ হাজার ছাত্র বসবাস করতেন। কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এখানে প্রবেশাধিকার পেতে হত। ছাত্রজীবন শেষ হত ৩০ বছর বয়সে। ছাত্ররা এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিজ নিজ বিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান এবং সুগঠিত চরিত্র নিয়ে স্নাতক হয়ে বেরোতেন। ফলে সর্বত্র নালন্দার ছাত্ররা মান্যতা পেতেন। ১০০ খানি গ্রামের আয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত খরচ চলত। খাওয়া পরা বা আবাসের জন্য ছাত্রদের ভাবতে হত না। হিউয়েন্-ৎসাঙ বলেছেন, ভারতে তখন হাজার হাজার বিদ্যাকেন্দ্র ছিল, কিন্তু শিক্ষণীয় বিষয়ের বৈচিত্র্যে, শিক্ষা-পদ্ধতির উৎকর্ষে এবং বিরাটত্বে নালন্দার স্থান সর্বশ্রেষ্ঠ। দ্র. *A-I*, pp. *452-54* ; *B-M*, *pp. 85-89.*

৩. মহাবস্তুঅবদানের বিবরণ অনুসারে বুদ্ধদেবের অন্যতম প্রধান শিষ্য শারিপুত্র উপতিষ্য, পালিতে সারিপুত্ত উপতিস্সর জন্ম নালন্দা গ্রামে। ব্রাহ্মণসন্তান শারিপুত্রর বাবা বঙ্গন্ত, মা রূপসারী। শারিপুত্র এবং বুদ্ধদেবের অপর প্রধান শিষ্য মৌদ্গল্যায়ন কোলিত একই গুরুকুলে বেদ অধ্যয়ন করেন। এঁরা দু জন রাজগিরে সঞ্জয় নামে একজন পরিব্রাজকের শিষ্য ছিলেন। পরিব্রাজক ধর্মে মুক্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে দুজনেরই মনে সন্দেহ জন্মে। একদিন উপসেন নামে এক ভিক্ষুকে দেখে শারিপুত্র আকৃষ্ট হন এবং তাঁর কাছে বুদ্ধদেবের উপদেশের মর্ম শোনেন। উপসেন শারিপুত্রকে বেণুবনে বুদ্ধদেবের কাছে নিয়ে গেলেন। বুদ্ধদেবের আকর্ষণে শারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন সঞ্জয়ের কাছ থেকে বিদায় নিলেন এবং ৫০০ জন পরিব্রাজক সঙ্গে নিয়ে ভিক্ষু-সঙ্ঘে যোগ দিলেন। ভিক্ষু হবার ২ সপ্তাহের মধ্যে শারিপুত্র অর্হৎ হন। শারিপুত্রের উপরে বৌদ্ধ সঙ্ঘের একতা ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ছিল। বুদ্ধ-পরিনির্বাণের আগেই শারিপুত্রর মৃত্যু হয়।

৪. পাল রাজবংশের দ্বিতীয় রাজা ধর্মপালের রাজত্বকাল ৭৭০-৮১০, মতান্তরে ৭৭৫-৮১০ খৃস্টাব্দ। পরাক্রান্ত ধর্মপাল উত্তরভারতের অধিকাংশ অধিকার করে কনৌজের রাজা ইন্দ্রায়ুধকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজের প্রতিনিধি চক্রায়ুধকে তাঁর জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করেন। অন্য দিকে ধর্মপাল গুর্জর-প্রতিহার বৎসরাজ এবং রাষ্ট্রকূটের রাজা ধ্রুব ও তাঁর ছেলে তৃতীয় গোবিন্দর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। ধর্মপালের সময়েই ভারতবর্ষের বিশাল অঞ্চল পাল রাজত্বের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। গুজরাতের কবি সোড্ঢল 'উদয়সুন্দরীকথা' কাব্যে ধর্মপালকে 'উত্তরাপথস্বামী' বলে উল্লেখ করেছেন। ধর্মপালের রাজত্বের আয়তনের আভাস পাওয়া যায় 'পঞ্চগৌড়' উল্লেখে, — পূর্বপঞ্জাব, কান্যকুব্জ, গৌড়, মিথিলা ও উৎকল এই পাঁচটি অঙ্গ নিয়ে পঞ্চগৌড়। অবশ্য উত্তরভারতে ধর্মপালের অধিকার দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। 'আইন-ই-আকবরী'র উল্লেখ অনুসারে পাল রাজাদের কায়স্থ মনে করা হয়, এ বিষয়ে আর-কোনো নিশ্চিত প্রমাণ নেই। ধর্মপালের মহিষী রণ্ণাদেবী রাষ্ট্রকূটবংশ জাত পরবলের মেয়ে। তাঁর মন্ত্রী ছিলেন ব্রাহ্মণ, নাম গর্গ। বুদ্ধভক্ত ধর্মপালকে পরম-সৌগত বলে উল্লেখ করা হত। তাঁর উপাধি বিক্রমশীল, বিক্রমশীল-বিহার ও রাজশাহি জেলার পাহাড়পুরে সোমপুর-বিহার ধর্মপালের সময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বিহারশরিফের ওদন্তপুরী-বিহার তাঁর কীর্তি কিনা, নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। দ্র. *H-B*, Vol. I, pp. 104-16 ; দীনেশচন্দ্র সরকার, 'পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত', কলকাতা ১৯৮২, পৃ. ৫৮-৬৬।

৫. পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ দেবপাল ধর্মপালের ছেলে এবং পাল রাজবংশের তৃতীয় রাজা। রাজত্বকাল ৮১০-৮৫০, মতান্তরে ৮১০-৮৪৭ খৃস্টাব্দ। দেবপাল ধর্মপালের যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন এবং পাল সাম্রাজ্যের গৌরব অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার অনুমান করেন, দেবপাল সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হবার আগে ধর্মপালের অন্য ছেলে ত্রিভুবনপাল— যিনি সোড্ঢলের 'উদয়সুন্দরীকথা' কাব্যে 'পালকুল-প্রদীপ' হারবর্ষ নামে উল্লেখিত হয়ে থাকতে পারেন — তিনি সম্ভবত কিছুদিন (আ. ৮১০-৮১২ খৃ.) রাজত্ব করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। বলা হয়, উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে সেতুবন্ধ এবং পুবে বঙ্গোপসাগর থেকে পশ্চিমে আরব সাগরের মধ্যগত সমগ্র অঞ্চল দেবপালের অধিকারভুক্ত ছিল। দেবপালের তাম্রশাসন এবং বাদাল প্রশস্তির শ্লোকের এই দাবি নিশ্চয়ই অতিকথন। ধর্মপালের মতো দেবপালও ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজশক্তির সঙ্গে

সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলেন এবং কখনো কখনো নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সমর্থ হয়েছিলেন। দু জনের মধ্যেই রাজ্যসীমা বিস্তার এবং শক্তি বাড়ানোর উদ্যম ও শৌর্য ছিল। যবদ্বীপ, সুমাত্রা এবং মালয়েশিয়ার শৈলেন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধ রাজাদের সঙ্গে দেবপালের বন্ধুতার সম্পর্ক ছিল। দেবপালের মহিষী মাহটা ছিলেন বল্লভরাজের মেয়ে। মাহটা বারাণসীতে মন্দির নির্মাণ করিয়ে মাহটেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। দ্র. *H-B*, Vol. I, pp. 116-25 ; দীনেশচন্দ্র সরকার, পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ. ৬৭-৭১।

৬. বিক্রমশীল, বিক্রমশিলা মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেন রাজা ধর্মপাল (রাজত্বকাল আ. ৭৭০/৭৭৫-৮১০ খৃ.)। এখানকার ভিক্ষুরা শীল বা সদাচারে শ্রেষ্ঠ ছিলেন বলে বিহারের নাম বিক্রমশীল হয়ে থাকতে পারে। নয় তো প্রতিষ্ঠাতা রাজা ধর্মপালের বিরুদ বা স্তুতি-নাম বিক্রমশীল অনুযায়ী বিহারের এই নামকরণ করা হয়েছিল। অষ্টম শতাব্দীর শেষ দিকে বিহারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মনে করা হয়। বিক্রমশীলের অবস্থান নিয়ে কিছু মতান্তর থাকলেও সাধারণভাবে স্বীকৃত যে ভাগলপুর জেলায় গঙ্গার ধারে পাথরঘাট নামে একটি ছোটো পাহাড়ের উপরে এই বিহার ছিল। জায়গাটি চোলগোঙ রেল স্টেশন থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার উত্তরে। অন্তিছক্ নামে পরিচিত এই জায়গায় উৎখননে কিছু বৌদ্ধ স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে ইটের তৈরি একটি বিশাল ইমারতের গড়নে ধর্মপালেরই সময়ে প্রতিষ্ঠিত সোমপুর (পাহাড়পুর) বিহারের স্থাপত্যের খুব মিল পাওয়া যায়। এই মহাবিহারের মাঝখানে ছিল অবলোকিতেশ্বর মন্দির। মূল মন্দির ঘিরে তান্ত্রিক দেবদেবীর ৫৩টি মন্দির ছিল। ধর্মপালের পরিপোষণে বিক্রমশীল মহাবিহার দ্রুত সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। ৮ জন মহাপণ্ডিত এবং ১০৮ জন পণ্ডিত এখানে অধ্যাপনা করতেন। এই বিহারের অধ্যক্ষকে বলা হত বজ্রাচার্য। তারনাথের বিবরণ অনুযায়ী প্রথম বজ্রাচার্য ছিলেন আচার্য বুদ্ধজ্ঞানপাদ। তারপর ক্রমান্বয়ে দীপংকরভদ্র, লঙ্কা-জয়ভদ্র, শ্রীধর, ভবভদ্র, ভব্যকীর্তি, লীলাবজ্র, দুর্জয়চন্দ্র, কৃষ্ণ-সময়-বজ্র, তথাগত-রক্ষিত, বোধিভদ্র, কমল-রক্ষিত বিক্রমশীল বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। রত্নাকর শান্তি এই বিহারের অন্যতম দ্বার-পণ্ডিত ছিলেন। দীপংকরশ্রী জ্ঞান ছিলেন উপাধ্যায়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল এবং ভারতের বাইরে থেকে বহু ছাত্র এখানে পড়তে আসতেন। দ্র. *B-M*, p. 57 ; *2500 years*, p. 203 ; *H-B*-I, p. 115.

৭. বাংলার বৌদ্ধ ঐতিহ্যে দশম-একাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম মনীষী দীপংকরশ্রী জ্ঞান অতিশ-এর জন্ম ৯৮২ খৃস্টাব্দে। বিক্রমণিপুর বা বিক্রমপুরের, মতান্তরে বজ্রাসনের পুবে জাহোর বা সাহোরের রাজা কল্যাণশ্রী ও প্রভাবতীর মেজো ছেলে। ছেলেবেলার নাম চন্দ্রগর্ভ। অল্প বয়সে তিনি আচার্য জেতারির সংস্পর্শে আসেন। তাঁর সময়ে ভারতে বৌদ্ধদর্শনের মাধ্যমিক ও যোগাচার শাখার প্রতিপত্তি অম্লান ছিল, অন্য দিকে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা সূচিত হয়েছিল। চন্দ্রগর্ভ কৃষ্ণগিরি বিহারে রাহুল গুপ্তর কাছে তান্ত্রিক তত্ত্ব শেখেন, তাঁর নাম হয় গুহ্যজ্ঞানবজ্র। কিন্তু তান্ত্রিক আচারে আবদ্ধ না থেকে তিনি হীনযান ও মহাযান ধারার এবং ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য ও যোগ দর্শনের পূর্ণ জ্ঞান আয়ত্ত করেন। ওদন্তপুরী বিহারের মহাসাঙ্ঘিক আচার্য তাঁর নাম দেন দীপংকরশ্রী জ্ঞান। কল্যাণশ্রীর নামের সাদৃশ্যে দীপংকরশ্রী নামই স্বাভাবিক, জ্ঞান সেকালের পণ্ডিতদের প্রচলিত উপাধি। মহিলা পণ্ডিতের উপাধি হত জ্ঞান-ডাকিনী। দীপংকরশ্রীর উদ্দেশে রচিত স্তোত্রে তাঁর প্রধান তিব্বতি শিষ্য হব্রোম্-স্তোন্-পা (Ḥbrom-ston-pa) তাঁকে দীপংকরশ্রী নামেই উল্লেখ করেছেন (দ্র. *A-T*, pp. 371-76)। তিব্বতে এবং মঙ্গোলিয়ায় তাঁর অতিশ বা অতীশ নাম প্রচলিত। তিব্বতে বলা হয় জো-বো-র্জে (Jo-bo-rje)-অতিশ, মহাপ্রভু অতিশ। অতিশ সংস্কৃতমূলক শব্দ, সম্ভবত 'অতিশয়' অর্থে প্রযুক্ত। তিব্বতি প্রতিশব্দ ফুল-হব্যুঙ (phul-ḥbyuṅ), তুরীয় দশাপ্রাপ্ত। ভারতে থাকতেই দীপংকরশ্রী অতিশ নামে পরিচিত ছিলেন। নগ্-ছো লো-চা-বা (Nag-tsho lo-tsā-bā) বিক্রমশীল মহাবিহারে ভিখারি বালকদের 'ভালা হো ও নাথ অতিশ' সম্বোধন শুনে তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন (দ্র. *I-P-L-S*, p. 65)। অতিশ ১২ বৎসর বিক্রমশীল মহাবিহারে দ্বার-পণ্ডিত নারো-পার এবং ২ বৎসর বজ্রাসনে মহাবিনয়ধর শীলরক্ষিতের ছাত্র ছিলেন। তারপরে সুবর্ণ দ্বীপে (আধুনিক সুমাত্রা) যান সমকালীন বৌদ্ধজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ধর্মকীর্তি বা ধর্মপালের কাছে পাঠ নিতে। মহাযান বৌদ্ধদর্শনের বিভিন্ন শাখায় গভীরতর জ্ঞান উপার্জন করে ১২ বৎসর পরে দেশে ফেরেন। তখন তাঁর বয়স ৪৪ বৎসর। দেশে ফেরার কিছুদিনের মধ্যে রাজা মহীপালের আহ্বানে ১০২৫/২৬ খৃস্টাব্দে বিক্রমশীল মহাবিহারে মহাচার্য পদে যোগ দেন। ধর্ম সংস্কারের জন্য তিব্বতের রাজা য়ে-শেস্ হওদ্ (Ye-śes ḥod)-এর প্রতিনিধি অতিশকে তিব্বতে নিয়ে যাবার চেষ্টায় ব্যর্থ হন। য়ে-শেস্-এর মৃত্যুর পরে তাঁর ভাইপো ব্যঙ্-ছুব্ হওদ্ (Byaṅ-chub ḥod) রাজা হয়ে নগ্-ছো লো-চা-বা-কে পাঠালেন। তাঁর চেষ্টায় অতিশ

তিব্বতে যেতে রাজি হলেন। অতিশ দেশ ছেড়ে যাবেন জেনে মহাবিহারের স্থবির রত্নাকর শান্তি বলেছিলেন, "ভারতীয়দের পক্ষে অতিশ চোখের মতো। সে চলে গেলে আমরা অন্ধ হয়ে যাব।" ১০৪০ খৃস্টাব্দে অতিশ নেপালের উদ্দেশে যাত্রা করলেন, তখন নয়পালের রাজত্বকাল। এক বৎসর নেপালে থেকে ১০৪২য়ে তিব্বতে পৌঁছলেন। জীবনের শেষ ১৩ বৎসর কঠোর পরিশ্রম করে তিনি তিব্বতের ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের পত্তন করেন। তিব্বতে তাঁর মূল কাজ 'বুদ্ধ-শিক্ষা' বা 'ব্কহ্ গ্দমস্ পা' (Bkaḥ-gdams-pa) নামে নতুন ধর্ম-সম্প্রদায় গঠন এবং এই সম্প্রদায়ের শাস্ত্রগ্রন্থ 'বোধিপথ-প্রদীপ' রচনা। এই গ্রন্থে তিনি হীনযান, মহাযান, তান্ত্রিক দর্শন ও সাধন পদ্ধতির সমন্বয় করেন।

"By systematizing the vital principles of all Buddhist Scriptures into a whole, by combining the ways of cultivation of the two main schools, the one known for its profundity (the School of the Noumenal) and the other for its extensiveness (the School of the Phenomenal), and by synthesizing the teachings of Nāgārjuna, Asaṅga and Śāntideva, this *Śāstra* provides a unique broad path for obtaining good births and emancipation ; and it is the key to the essentials of all sūtras and *Śāstras*." (*E-B*, Vol. III, p. 216). অতিশ এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ শিষ্যমণ্ডলীর প্রভাবে সমগ্র তিব্বতে ক্রমে শুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম গৃহীত হয় এবং তিনি পূজ্য দেবতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন।

তেঙ্গুরের তালিকায় লেখক ও অনুবাদক রূপে একাধিক দীপংকরের নাম মিশে আছে। যেমন দীপংকর-ভদ্র, ইনি একজন তান্ত্রিক লেখক। দীপংকর-রাজ বা দীপংকর-চন্দ্রও ভিন্ন লেখকের নাম। অতিশের রচনা বলে চিহ্নিত করা যায় ১৯৪ খানি বই। এর মধ্যে ৩৮ খানিতে তাঁর নাম আছে শুধু লেখক রূপে, তিনি লিখেছেন এবং অনুবাদও করেছেন ৭৯ খানি বই। আর অন্য লেখকের বই অনুবাদ করেছেন ৭৭ খানি। ভারতে লুপ্ত হয়ে যাওয়া অনেক বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ তিনি তিব্বতে আবিষ্কার করেন। বৌদ্ধবিদ্যা-চর্চার ইতিহাসে এই সমন্বয়পন্থী মনীষীর মূল রচনা, অনুবাদ ও টীকা বিশিষ্ট সম্পদ।

১০৫৪ খৃস্টাব্দে নবম চান্দ্র মাসের ১৮ তারিখে লাসার কাছে স্ঞে-থঙ্ (Sñe-thaṅ)-এ তাঁর মৃত্যু হয়।

অতিশের উদ্দেশে নিবেদিত একটি তিব্বতি প্রশস্তি-শ্লোক—

মান্যবর আসেন নি যত দিন
তিব্বতের মানুষ বাস করত আঁধারে, দৃষ্টিহীনের মতো ;
যে-ক্ষণে এলেন তিনি, সেই প্রজ্ঞাবান্ মহাজ্ঞানী,
জ্ঞানসূর্যের উদয় হল এদেশে।

৮. চুরাশি সিদ্ধাচার্যের অন্যতম, বৌদ্ধ তান্ত্রিক-সাধক। নাড়, নাড়-পাদ, নাড়ো-পা, নাঢ়, নরোত্তম-পাদ, নারো প্রভৃতি নামে এঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। নাড় বা ণাড় শব্দের অর্থ জ্ঞানী। জ্ঞাতক > জ্ঞাট > ণ্ণাট > ণাড়। জন্ম বরেন্দ্রভূমিতে। বিখ্যাত নৈয়ায়িক জেতারির ছাত্র। নাড় পণ্ডিতকে রাজা নয়পালের (আ. ১০৩৮-৫৫ মতান্তরে ১০২৭-৪৩ খৃ.) সমসাময়িক মনে করা হয়। মগধের ফুল্লহরিতে তিনি তন্ত্র-সাধনা করেন। পরে বিক্রমশীল মহাবিহারের উত্তর-দ্বারের দ্বার-পণ্ডিত নিযুক্ত হন। নবাগত শিক্ষার্থীদের বিদ্যাবুদ্ধি পরীক্ষা করে নির্বাচনের দায়িত্ব থাকত দ্বার-পণ্ডিতদের উপরে। নাড় দীপংকরশ্রী জ্ঞানের অন্যতম শিক্ষাগুরু। তিব্বতের বিখ্যাত সিদ্ধাচার্য মার-পা তাঁর ছাত্র। তেঙ্গুরের তালিকায় তাঁর 'বজ্রগীতি' 'নাড়পণ্ডিতগীতিকা', 'একবীরহেরুকসাধন', 'গুহ্যসমাজ-উপদেশপঞ্চকর্ম', 'বজ্রযোগিনীগুহ্যসাধন' ইত্যাদি বইয়ের নাম আছে। শাস্ত্রীমশায় বলেন, যোগী হলেও নাড়পণ্ডিত গৃহাশ্রমে ছিলেন, তাঁর স্ত্রীর নাম নিগু, উপাধি জ্ঞান-ডাকিনী (শব্দটি বিদুষী অর্থে ব্যবহার হত)। এঁরা দুজনেই হেবজ্রের উপাসক ছিলেন।

নিগু নাড় পণ্ডিতের স্ত্রী— এই তথ্যের সূত্র শাস্ত্রীমশায় উল্লেখ করেন নি, তবে তেঙ্গুরের তালিকায় জ্ঞান-ডাকিনী নিগু বা নিগু-মার 'উপায়মার্গচণ্ডালিকাভাবনা', 'চক্রসম্বরমণ্ডলবিধি', 'প্রণিধানরাজ', 'মহামর-জ্ঞান' প্রভৃতি বইয়ের নাম আছে। দ্র. *H-B-I*, pp. 419-20 ; *B-E*, pp. 65-66 ; *2500 years*, pp. 200-01 ; *B-L-T*, p. 16.

৯. দ্র. Haraprasad Shastri ed. *Six Buddhist Nyāya Tracts* (Authors : Ratna Kīrti, Aśoka and Ratnākar Śānti), *Bibliotheca India*, 1910.

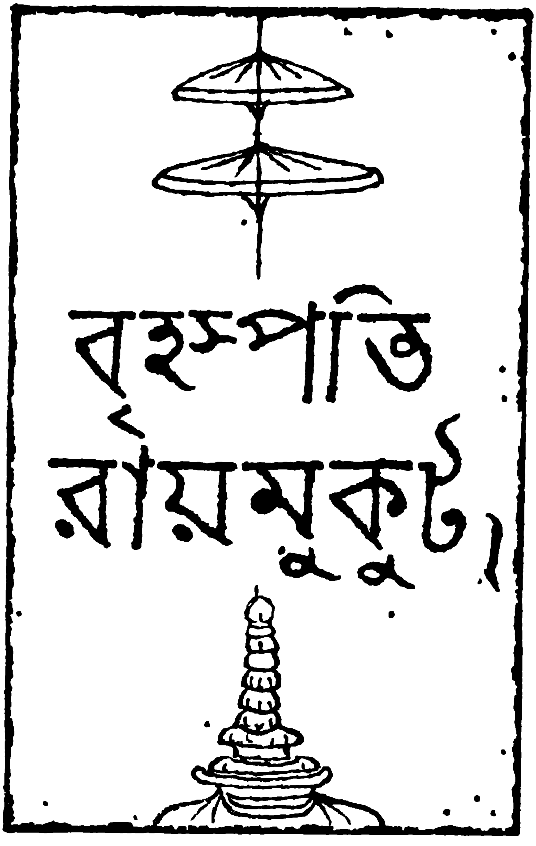
১০. কোনো বস্তু সম্পর্কে অপ্রত্যক্ষ ধর্মের জ্ঞান পাবার উপায় স্বরূপ বিচার-প্রণালীকে ন্যায়শাস্ত্রে অনুমান বলা হয়। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ,

উপনয় (প্রয়োগ), নিগমন (সিদ্ধান্ত) এই পাঁচটি স্তর যথাক্রমে সাজিয়ে যুক্তি দাঁড় করানো অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান পাবার উপায়। যেমন—

১.	প্রতিজ্ঞা	: পর্বত বহ্নিমান্।
২.	হেতু	: কারণ, পর্বতে ধূম আছে।
৩.	উদাহরণ	: যেখানে ধূম আছে সেখানেই অগ্নি আছে, যেমন পাকশালা।
৪.	উপনয় (প্রয়োগ)	: এই পর্বতের ধূমও সেই রকম।
৫.	নিগমন (সিদ্ধান্ত)	: অতএব, এই পর্বত বহ্নিমান্।

অনুমানকে কেবলান্বয়ী, কেবল-ব্যতিরেকী ও অন্বয়-ব্যতিরেকী— এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। কোনো অনুমান হেতু ও সাধ্য বা কারণের (বহ্নি) কেবল অন্বয়-ব্যাপ্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হলে কেবলান্বয়ী অনুমান বলা হয়। যেখানে সাধ্য নেই সেখানে হেতুও নেই এই নেতিমূলক ব্যাপ্তি নির্ভর অনুমানকে কেবল-ব্যতিরেকী অনুমান বলা হয়। অন্বয়-ব্যতিরেকী অনুমান হেতু ও সাধ্যের মধ্যে অন্বয় ও ব্যতিরেক দু ধরনের ব্যাপ্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

১১. "কলিকালসর্বজ্ঞ" রত্নাকর শান্তি রচিত ছন্দের বইটির নাম 'ছন্দোরত্নাকর'। মূল সংস্কৃত ও তিব্বতি অনুবাদ Georg Huth ১৮৯০ খৃস্টাব্দে বার্লিন থেকে প্রকাশ করেন।



যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ প্রথম রাঢ় দেশে আসেন, তাঁহাদের মধ্যে বাৎস্য গোত্রে ছান্দড়ের বংশে রবি. মহিন্তা-গ্রামের গ্রামণী হন। সেইজন্য রবির বংশকে 'মহিন্তা-গাঁই' বলে। মহিন্তা-গাঁইয়ে অনেক বড়ো বড়ো পণ্ডিত— অনেক বড়ো বড়ো রাজকর্মচারী জন্মিয়া গিয়াছেন। একখানি ঘটকের বইয়ে দেখিয়াছিলাম—"মহিন্তা মাধবাচার্য্যো রাঢ়দ্বয়ে দণ্ডধৃক্" অর্থাৎ তিনি উত্তর ও দক্ষিণ— দুই রাঢ়েরই দণ্ডধারী ছিলেন। দণ্ডধারী অর্থে সংস্কৃতে সেনাপতিও বুঝায় এবং বিচারপতিও বুঝায়। মাধবাচার্য কী ছিলেন, জানি না।

খৃস্টীয় দ্বাদশ শতকে এই বংশে একজন জ্যোতিষী জন্মান। তাঁহার

নাম শ্রীনিবাস মহিন্তা। তাঁহার এক গ্রন্থ আছে,— তাহার নাম 'শুদ্ধি-দীপিকা'। উহাতে হিন্দুর ধর্মকর্মের উপযুক্ত কাল নির্ণয়ের ব্যবস্থা আছে। কোন্‌টা বিবাহের যোগ্য কাল, কোন্‌টা উপনয়নের যোগ্য কাল, কোন্‌টা যাত্রার যোগ্য কাল— এইসব বিষয়েরই আলোচনা এই গ্রন্থে আছে। শুদ্ধি শব্দের পরবর্তী কালে যে অর্থই হউক, শ্রীনিবাসের সময় উহার অর্থ ছিল, ধর্মকর্মের শুদ্ধ কাল। শ্রীনিবাসের আরো একখানি বই আছে। সেখানি বিশুদ্ধ গণিতের বই। নাম 'গণিত-চূড়ামণি'; ইংরেজি ১১৫৮ সালে লেখা। হলায়ুধ তাঁহার 'ব্রাহ্মণ-সর্বস্বে' 'শুদ্ধিদীপিকা'র উল্লেখ করিয়াছেন।

বল্লালসেন যে কুল-মর্যাদার সৃষ্টি করেন, তাহাতে তিনি মহিন্তাদের কাহাকেও কুলীন করেন নাই। সিদ্ধ শ্রোত্রিয়দের মধ্যে উহাদের আসন খুব উচ্চে ছিল। কিন্তু এই বংশের শ্রীনিবাস আপনাকে কুলীন বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, রায়মুকুটও আপনাকে কুলীন বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা হয় বল্লালি কুল মানিতেন না, অথবা তাঁহারা কুলীন শব্দ সাধারণ অর্থে (উচ্চ-কুল প্রসূত এই অর্থে) ব্যবহার করিয়াছেন।

এখন আমাদের বৃহস্পতি মহিন্তার জীবনচরিত লিখিতে হইবে। ইঁহার কথা লিখিবার পূর্বে মুসলমান অধিকার হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহস্পতির সময় পর্যন্ত বাংলার বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস একটু দেওয়া উচিত। নহিলে তাঁহার জীবনচরিতের মর্ম বুঝা যাইবে না। ইংরেজি ১২০০ হইতে ১৪০০ পর্যন্ত দুই শত বৎসর বাংলায়, বোধ হয়, বাংলা সাহিত্যও ছিল না, সংস্কৃত সাহিত্যও ছিল না। আমি তো চল্লিশ বৎসর ধরিয়া পুথি খুঁজিতেছি। কিন্তু ঐ সময়ের লেখা কোনো বইয়ের পুথি পাই নাই। ঐ সময়ের নকল করা পুথির মধ্যেও দুই-একখানি ছাড়া পাই নাই। পাই নাই বলিয়া যে, একেবারে ছিল না, তাহাও বলিতে পারি না। আর-কোনো ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ঐ কালের লেখা বা নকল করা পুথি পাইতে পারেন। কিন্তু এখন আমরা যত দূর জানি, তাহাতে এই দুই শত বৎসরের সাহিত্যিক ইতিহাস একেবারে সাদা। মুসলমান অধিকারের প্রথম আশি বৎসর তো কেবল কাটাকাটি মারামারি। মুসলমানেরা টানা বাংলা দেশ সমস্ত অধিকার করিতে পারেন নাই, যেটুকু অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার চার পাশে হিন্দু

রাজারা ছিলেন। তাঁহাদের সহিত নিরন্তর যুদ্ধ লাগিয়াই ছিল। মুসলমানে মুসলমানে যখন এই যুদ্ধ হইত, তখন ইহা ভীষণ হইত। এই আশি বৎসর বাংলা দেশে এত বেশি যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছিল যে, দিল্লিতে বাংলা দেশের নামই ছিল— ঝগড়ার দেশ।

১২৮০ সালে তোগরল বলিয়া একজন আফ্‌গান, দুই-একটা হিন্দু রাজা মারিয়া আপনাকে এত বড়ো বলিয়া মনে করিলেন যে, তিনি দিল্লির বাদশাহ্‌কে গ্রাহ্যও করিলেন না। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া গিয়াসুদ্দিন বল্‌বন[১] অনেক সেনা লইয়া বাংলায় আসিলেন। প্রথমেই সুবর্ণগ্রামের রাজার সহিত সন্ধি করিলেন। বলিলেন, জলপথে যদি তোগরল পালায়, আপনি তাহাকে আটকাইবেন। ক্রমে তোগরল ধরা পড়িল। গিয়াসুদ্দিন বল্‌বন, তোগরল এবং তাঁহার হিন্দু ও মুসলমান সাহায্যকারীদিগকে গৌড়ের বাজারে শূল দিলেন। কথিত আছে, এই সময়ে এক লক্ষ শূল পোঁতা হয়। দু সারি শূলের মধ্যে তিনি ও তাঁহার বড়ো ছেলে বোখারা খাঁ ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বাবা ছেলেকে বলিলেন, তুমি বাংলায় থাকিতে চাও, থাকো। কিন্তু যদি দিল্লি হইতে পৃথক হইতে চাও, তাহা হইলে জানিবে, তোমারও এই দশা হইবে।

বোখারা খাঁ নাজীর-উদ্দিন উপাধি লইয়া বাংলার শাসনকর্তা হইলেন। তিনি দিল্লির সুলতানের পুত্র। তাই তাঁহার উপাধি হইল সুলতান। দিল্লির তক্ত তাঁহার বংশ হইতে চলিয়া খিলিজি ও তোগলকের বংশে গেলেও, বাংলায় তাঁহার বংশে সুলতান উপাধি অটুট রহিল। ইঁহারা তিন পুরুষে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করেন এবং একটু একটু করিয়া বাংলার অনেক স্থান দখল করেন। শেষ পূর্ববাংলা ও বিক্রমপুর দখল করিয়া লন। ইঁহাদের পর বাংলাকে তিন ভাগ করার চেষ্টা হয়— গৌড়, সাত গাঁ ও সোনার গাঁ। সুতরাং মারামারি কাটাকাটি আরো বেশি হয়। সাম্‌সুদ্দিন্ ইলিয়স শাহ্[২] নামে একজন পরাক্রান্ত মুসলমান তিনটি রাজ্য দখল করিয়া ১৩৪৫ সালে বাংলায় স্বাধীন সুলতান হন। ইলিয়স শাহ্‌ও যেমন আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন, দিল্লির বাদশাহ্‌ও অমনি বারবার বাংলা আক্রমণ করিলেন। আরো ১০/১২ বৎসর মারামারি কাটাকাটি চলিল। বলিতে গেলে ১৩৫৫ সালে বাংলায় শান্তি স্থাপিত হইল। কিন্তু তাহাতেও

রক্ষা নাই। ক্রমে ইলিয়স শাহ্ ও তাঁহার ছেলে সিকন্দর পরস্পর মারামারি করিতে লাগিলেন।

ইলিয়স শাহের পুত্র সিকন্দর ও তাঁহার পুত্র গিয়াসুদ্দিন বাংলায় কতকটা শান্তি পাইয়াছিলেন।[৩] তখন দিল্লিও পড়িয়া আসিয়াছিল। সুতরাং বাহির হইতে আসিয়া কেহ বাংলার শান্তিভঙ্গ করে নাই। তৈমুর[৪] আসিয়া যখন ১৩৯৮ সালে দিল্লি ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিয়া গেলেন, তখন বাংলার অবস্থা বেশ ভালো। ইলিয়সশাহিরা দেশবাসীর সহিত খুব ভালো ব্যবহার করিতেন। এমন-কি, তাঁহাদের হিন্দু ও বৌদ্ধ বড়ো লোকের সাহায্য না লইলে চলিত না। তাঁহাদের রাজত্বে অনেক জায়গায় বড়ো বড়ো হিন্দু ও বৌদ্ধ জায়গিরদার ছিল। একজন হিন্দু রাজা একটি টাকা রাজস্ব দিয়া ভাদুড়িয়ার জমিদারি ভোগ করিতেন। সেই জমিদারির নাম ছিল একটাকিয়া। অনেক কায়স্থ মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দিয়া বিস্তর জমিদারি ভোগ করিত ; বিশেষ উত্তররাঢ়ী কায়স্থরা। আর করিত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা ; কেন-না, তাহারা রাজধানীর অতি নিকটে থাকিত। মুসলমানদের মধ্যে এই সময়ে অনেকগুলি বড়ো বড়ো পীর খুব প্রতিপত্তি করিয়া তুলিয়াছিলেন।

ইলিয়সশাহিরা কিন্তু গৌড় ছাড়িয়া দশ ক্রোশ দূরে পাণ্ডুয়ায় আপনাদের রাজধানী করিয়াছিলেন। কেন করিয়াছিলেন, সে ইতিহাস পাওয়া যায় নাই। এইখানে সেকেন্দর ইলিয়সশাহির আদিনা মসজিদ[৫]। ইহার ৩৬০টি গম্বুজ ছিল। এখনো বোধ হয়, ১৬০টি আছে। এত বড়ো মসজিদ ভারতবর্ষে আর কোথায়ও নাই। এখানেই দু জন বড়ো বড়ো পীরের আস্তানা আছে। একজনের নাম শাহ্ জালাল। ইনি বাইশ হাজার বিঘা জমি পাইয়াছিলেন, এজন্য ইঁহার আস্তানার নাম বাইশহাজারি। আর-একজনের নাম নুর্ উল্ কুতব্ উল্ আলাম। ইনি ছয় হাজার বিঘা জমি পাইয়াছিলেন। ইঁহার আস্তানার নাম ষষ্‌হাজারি।

এখান হইতে সেকেন্দর বাংলা দেশ জরিপ করেন। জরিপ করায়, বড়ো বড়ো মসজিদ তৈয়ারি করায়, বড়ো বড়ো মকবরা তৈয়ারি করায়, আর পীরেদের চেষ্টায়, বেশ বোধ হয়, ইলিয়সশাহিরা বাংলায় শান্তিই ভোগ করিতেছিলেন। কিন্তু গিয়াসুদ্দিন আজম শাহের সময় হইতে

রাজা গণেশের প্রতিপত্তি খুব বাড়িয়া যাইতেছিল।[৬] তাঁহারা উত্তর-রাঢ়ী কায়স্থ, কাশ্যপ গোত্র ও দত্ত ছিলেন। তাঁহার পূর্বপুরুষেরা গিয়াসুদ্দিন বল্‌বনের বংশধর বাংলার সুলতানদিগের এবং ইলিয়সশাহি সুলতানদিগের অধীনে কার্য করিয়া অনেক জমি পাইয়াছিলেন এবং দত্তখান উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। গণেশ কিন্তু পূর্বপুরুষদের ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন। গিয়াসুদ্দিনের পর সইফুদ্দিন ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের নামে মাত্র রাজা খাড়া করিয়া, তিনি আপনিই বাংলার রাজ্য শাসন করিতেন। শেষে তাহাদিগকে তাড়াইয়া তিনি আপনি রাজা হইয়াছিলেন। গণেশ রাজা হইলে মুসলমানেরা অত্যন্ত চটিয়া যায়, এবং তাহাদের পীর নুর উল্ কুতব্ উল্ আলম দিল্লি হইতে কোনো সাহায্য পাইবার আশা বৃথা জানিয়া, জোয়ানপুরের শর্কি সুল্‌তান ইব্রাহিমকে বাংলা আক্রমণ করিতে অনুরোধ করেন। তিনিও সেই অনুরোধ অনুসারে অনেক দূর অগ্রসর হন। ইহার কিছু পূর্বেই তিনি মিথিলা হইতে অর্সলান নামক একজন তুর্কিকে তাড়াইয়া দিয়া কীর্তি-সিংহকে রাজা করিয়া যান। সুতরাং তিনি পূর্বাঞ্চলে তাঁহার ক্ষমতা বিস্তার করিবার এ সুযোগ ছাড়িতে পারেন নাই।

ধূর্ত গণেশ কিন্তু নুর উল্ কুতব্ উল্ আলমের নিকট গিয়া বলিলেন, আপনি কেন ইব্রাহিমকে ডাকিতেছেন। আমার ছেলেকে আপনি মুসলমান করুন। আমি তাহাকেই রাজা করিয়া চলিয়া যাই। হইলও তাহাই। তাঁহার পুত্র যদু, জালালুদ্দিন নাম ধারণ করিয়া বাংলার রাজা হইলেন। ইব্রাহিম ফিরিয়া গেলেন। গণেশও ছেলেকে আবার হিন্দু করিয়া নিজেই রাজা হইয়া বসিলেন এবং দনুজমর্দন নামে টাকা চালাইতে লাগিলেন।

অদ্বৈত প্রভুর[৭] ঠাকুরদাদা নরসিংহ, শ্রীহট্ট অঞ্চলে নারিয়া নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিবাসী ছিলেন। তিনি আসিয়া রাজা গণেশের মন্ত্রী হইলেন। মহিন্তা বৃহস্পতি এই সময় গৌড়ে আসিয়া বাস করিলেন এবং বহু ছাত্র পড়াইতে লাগিলেন। এক-একবার মনে হয়, গণেশের ছেলে যদুও যেন তাঁহার কাছে পড়িয়াছিলেন। তিনি বৃহস্পতিকে আচার্য এবং কবিচক্রবর্তী উপাধি দিয়াছিলেন। তিনি জগদত্তের পুত্র। এই জগদত্তই রাজা গণেশ। যদু রায়রাজ্যধর পদবি

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি সেনাপতি হইয়াছিলেন— অনেক হাতি, ঘোড়া, বাজনা, ছত্র, সোনা রূপা প্রভৃতি পাইয়াছিলেন। তাঁহার নাম জালালুদ্দিন হইয়াছিল। তিনি নানা গুণে বিভূষিত ছিলেন। তিনি ষোড়শ মহাদানের মধ্যে অনেক মহাদান করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড, সোনার ঘোড়া, সোনার রথ, বিশ্বচক্র, পৃথিবী, কৃষ্ণাজিন, কল্পতরু প্রভৃতি দান করিয়া ব্রাহ্মণদিগের দারিদ্র দূর করিয়াছিলেন। তিনি আবার সুলতানদের মন্ত্রীও ছিলেন।

বৃহস্পতি 'স্মৃতিরত্নহার' নামে যে স্মৃতির গ্রন্থ লেখেন, তাহাতে তাঁহার উপরিলিখিত পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি 'অমরকোষে'র 'পদার্থচন্দ্রিকা' বা 'অমরচন্দ্রিকা' নামে যে টীকা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার আরো অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা হইতে জানা যায়, তাঁহার পিতার নাম গোবিন্দ, মাতার নাম নীলমুখায়ী দেবী ও স্ত্রীর নাম রমা।[৮] তাঁহার অনেকগুলি ছেলে ছিল। তাঁহাদের মধ্যে বিশ্রাম ও রাম, এই দুইটি বড়ো। তাঁহারা দিগ্‌বিজয়ীদিগকেও জয় করিয়াছিলেন, অনেক বই লিখিয়াছিলেন এবং অনেক মহাদান করিয়াছিলেন। বৃহস্পতি 'গৌড়াবনীবাসবের' (জালালুদ্দিন) নিকট হইতে ছয়টি উপাধি পাইয়াছিলেন। প্রথম— আচার্য, তারপর কবিচক্রবর্তী, পণ্ডিতসার্বভৌম, কবিপণ্ডিতচূড়ামণি, মহাচার্য, রাজপণ্ডিত। কিন্তু রাজা যখন তাঁহাকে সর্বশেষে 'রায়মুকুটমণি' এই উপাধি দেন, তখন খুব জাঁক করা হইয়াছিল। তাঁহাকে হাতির উপর চড়াইয়া নানাবিধ বৈধ স্নান করানো হইয়াছিল। তাঁহাকে একগাছি হার দেওয়া হইয়াছিল— তাহাতে অনেক হীরামাণিক লাগানো ছিল — তাহাতে তাহা ঝলমল করিতেছিল। তাঁহাকে যে কুণ্ডল দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও ঝক্‌ঝক্ করিত। দুই হাতে 'রতনচূড়' দেওয়া হইয়াছিল; তাহাতে দশ আঙুলে দশটি আঙ্‌টি এবং তাহাতে হীরা লাগানো ছিল। দুইটি ছাতা দেওয়া হইয়াছিল, অনেকগুলি ঘোড়া দেওয়া হইয়াছিল।[৯]

তিনি 'শিশুপালবধে'রও এক টীকা লিখিয়াছিলেন, তাহার নাম 'নির্ণয়বৃহস্পতি'। ইহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, তিনি শ্রীধর মিশ্রের নিকট হইতে ব্যাকরণ ও অলংকার অধ্যয়ন করিয়াছিলেন এবং গৌড়ের রাজার নিকট হইতে তিনি প্রচুর প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি

যে সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যে ভাবে 'শিশুপালবধ' ও 'অমরকোষে'র টীকা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে বেশ বোধ হয়, ইনি আরো অনেক কাব্য নাটকের টীকা লিখিয়াছিলেন। তিনি 'অমরকোষে'র টীকায় আপনাকে 'ব্যাখ্যানদীক্ষাগুরু' ['বিবিধব্যাখ্যানদীক্ষাগুরু'] বলিয়াছেন। তাহাতেও বোধ হয়, তিনি নানা গ্রন্থের ব্যাখ্যা লিখিয়া সংস্কৃত আলোচনায় নব জীবন দিয়াছিলেন। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে তাঁহার লিখিত 'রঘুবংশ' ও 'কুমারসম্ভবে'র টীকার পুথি ['ব্যাখ্যাবৃহস্পতি'] আছে।

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা 'শিশুপালবধে'র টীকা লেখেন, তাঁহারা তাহার পূর্বে আরো অন্য প্রচলিত কাব্যের টীকা লিখিয়া থাকেন। দুই শত বৎসরের পর নূতন করিয়া সংস্কৃত ও বাংলার চর্চা আরম্ভ হইবার সময়ে যে নানা বইয়ের টীকার দরকার হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সব টীকাই যে বৃহস্পতি লিখিয়াছিলেন, তাহাও ঠিক বলা যায় না। তবে কতকগুলির যে লিখিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মাঘ কাব্যখানি ['শিশুপালবধ'] বড়ো কঠিন। উহাতে আবার কতকগুলি কঠিন কঠিন বন্ধও আছে। মাঘের টীকা লিখিতে গেলে, নীতিশাস্ত্রে বিলক্ষণ দখল থাকা দরকার। অশ্বশাস্ত্র, গজশাস্ত্র ও কাম-শাস্ত্রেও খুব দখল থাকা চাই। এইসব কারণেই মল্লিনাথ লিখিয়াছেন —'মেঘে মাঘে গতং বয়ঃ'।

কিন্তু তাঁহার স্মৃতির বইখানি বাংলায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ইতিহাসে এক অমূল্য রত্ন। অনেক স্মৃতির বইতেই বারো মাসে যে তেরো পার্বণ হয়, তাহার প্রয়োগ ও পদ্ধতি লেখা থাকে। রঘুনন্দন, রায়মুকুটের দেড় শত বৎসরের পরের লোক। উপর উপর রঘুনন্দনের বই ও এখনকার পাঁজির সহিত রায়মুকুটের বই মিলাইয়া আমরা যে ফল পাইয়াছি, তাহা নিম্নে দিতেছি। মাঘ-টীকার মঙ্গলাচরণ হইতে বেশ বোধ হয়, রায়-মুকুট বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার 'স্মৃতিরত্নহারে' জন্মাষ্টমীর কথা নাই, রামনবমীর কথা নাই— রথের কথা নাই— দোলেরও কথা নাই। রাসের বদলে সুখরাত্রি আছে। ইহাতে কার্তিক পূজা ও কালী পূজার কথাও নাই। দূর্বাষ্টমী, তালনবমী, অনন্তব্রত প্রভৃতিও ইহাতে নাই।

নূতন পর্বের মধ্যে শ্রাবণ মাসে উৎসর্গ ও উপাকর্মের উল্লেখ আছে।

সেকালের ব্রাহ্মণেরা বর্ষাকালে বাড়ি হইতে বাহির হইতে পারিত না। বাড়িতে বসিয়া মুখস্থ বেদের আবৃত্তি করিত। অতি পূর্বকালে শ্রাবণ মাসে আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিত এবং পৌষ মাসে শেষ করিত। কিন্তু বৃহস্পতি, উৎসর্গ ও উপাকর্ম দুইটিকেই শ্রাবণ মাসে ফেলিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, তাঁহার সময়ে বাঙালি ব্রাহ্মণেরা অতি অল্পমাত্রায় বেদ পড়িত। তাঁহারা এক মাসের মধ্যেই একটু একটু করিয়া যতটুকু বেদ পড়া ছিল, দুরস্ত করিয়া লইত। এ প্রথা এখন উঠিয়া গিয়াছে। এখন আমরা নিরগ্নিক ও প্রায় নির্বেদ হইয়া পড়িয়াছি।

বৃহস্পতির আর-এক নূতন জিনিস, যাহা এখন উঠিয়া গিয়াছে, তাহা শক্রোত্থান বা ইন্দ্রপূজা। বর্ষার শেষে— এখন যাহাকে আমরা ব্রতপক্ষ বলি, সেই শুক্ল পক্ষে ইন্দ্রের একটা ধ্বজা তোলা হইত এবং তাহার চারি দিকে নাচ, গান, আমোদ-প্রমোদ করা হইত। কালিদাস 'রঘু'র চতুর্থ সর্গে ইন্দ্রধ্বজের বর্ণনা করিয়াছেন।[১০] 'ভরত-নাট্যশাস্ত্রে'[১১] বলে দেবাসুরদের যুদ্ধে অসুররা পরাজিত হইলে, দেবতারা ইন্দ্রের ধ্বজা তুলিয়া, সেইখানে তাঁহারা কেমন করিয়া অসুরদের পরাজিত করিয়াছিলেন, তাহার অভিনয় করেন। ইহাতে অসুরেরা রাগিয়া ধ্বজা ভাঙিতে চেষ্টা করে ও দেবতাদের মারিতে আসে। ইন্দ্র তখন ধ্বজা উপড়াইয়া তাহাদিগকে জর্জরিত করেন। সেইজন্য উহার নাম হয় জর্জর। প্রত্যেক অভিনয়ের পূর্বে জর্জরের পূজা করিতে হইত। নেপালে এখনো ইন্দ্রপূজা হইয়া থাকে। একদিন এইরূপ ইন্দ্রপূজায় কাটমণ্ডুর সমস্ত লোক উন্মত্ত, এমন সময় গোর্‌খারাজ পৃথ্বীনারায়ণ আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করেন ও কাটমণ্ডু দখল করেন। বৃন্দাবনে ইন্দ্রপূজা বন্ধ করিয়া কৃষ্ণ বড়ো গোলে পড়িয়াছিলেন। ইন্দ্র রাগিয়া এতো বৃষ্টি করেন যে, সকল ভাসিয়া যায়। তখন কৃষ্ণ গোবর্ধন ধারণ করিয়া সমস্ত রক্ষা করেন। মহীশূরে এখনো ইন্দ্রপূজা হয়, পশ্চিমেও হয়। বাংলায় এখন উঠিয়া গিয়াছে।

রায়মুকুট, অষ্টকাশ্রাদ্ধ কেবল অগ্রহায়ণ মাসের কৃত্যের মধ্যে ফেলিয়াছেন। তাহাতে বোধ হয় যে, তাঁহার সময়ে এবং তাঁহার দেশে শাকাষ্টকা, পূপাষ্টকা এবং মাংসাষ্টকা— এই তিনটি অষ্টকা চলিত না। কেবল একটি মাত্র চলিত। এখন অষ্টকাশ্রাদ্ধ প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

বৃহস্পতির উল্লিখিত দুর্গোৎসব দুই রকমের— এক রকমের বড়ো, এক রকমের ছোটো। বড়ো দুর্গোৎসবে কৃষ্ণপক্ষের নবমীতে কল্পারম্ভ হয়। ছোটো দুর্গোৎসবে ষষ্ঠীতে কল্পারম্ভ হয়। প্রতিপদাদি কল্পারম্ভের কথা তাঁহার বইয়ে নাই। বড়ো দুর্গোৎসবে নবপত্রিকাস্নান বা কলাবৌ নাওয়ানোর উল্লেখ আছে; ছোটো দুর্গোৎসবে নাই। বড়ো ও ছোটো, কোনো দুর্গোৎসবেই সন্ধিপূজার কথা নাই। বড়ো দুর্গোৎসবে অষ্টমী পূজার দিন মধ্যরাত্রিতে ভদ্রকালীর পূজার বিধান আছে। বিজয়ার দিন ক্রীড়া-কৌতুক-মঙ্গল এবং নীরাজনের কথা আছে। ক্রীড়া-কৌতুক-মঙ্গলের আর-এক নাম শবরোৎসব অর্থাৎ চণ্ডালের ব্যাপার। জীমূতবাহন[১২] ইহার অর্থ করিয়াছেন, অশ্লীল গান ও কুৎসিত ব্যবহার। রঘুনন্দনও তাহাই করিয়াছেন। বৃহস্পতির বোধ হয়, তাহা অভিপ্রেত নহে। কারণ, তিনি কেবল জীমূতবাহনের মতটি তুলিয়াছেন— তাহার সমর্থন করেন নাই। মনে হয়, এইরূপ আচার মুসলমান আমলে রাজধানী গৌড়ে চলিত ছিল না।

শ্রাদ্ধে বৃহস্পতি, জীবন্ত ব্রাহ্মণ রাখার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কোন্ ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে প্রশস্ত— কোন্ ব্রাহ্মণ নিষিদ্ধ, তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, এইরূপ ব্রাহ্মণের অভাব হইলে দর্ভময় ব্রাহ্মণের উপর শ্রাদ্ধ করা যাইতে পারে। যে-সকল লক্ষণ হইলে ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে বসানো যায়, সে-সকল লক্ষণ অনেক কাল হইতেই ব্রাহ্মণে পাওয়া যাইত না। হেমাদ্রি[১৩] স্পষ্টই লিখিয়াছেন, বঙ্গ দেশে বাস করিলে ব্রাহ্মণ আপাঙ্‌ক্তেয় হয় অর্থাৎ শ্রাদ্ধের পঙ্‌ক্তিতে বসিতে পারে না। এ পঙ্‌ক্তির অর্থ শ্রাদ্ধ করিবার সময় পিতৃপিতামহাদির উদ্দেশে পাত্রে যে অন্ন দেওয়া হয়, তাহাই ভোজনের জন্য ব্রাহ্মণের পঙ্‌ক্তি— শ্রাদ্ধান্তে ভূরিভোজনের পঙ্‌ক্তি নহে। বোধ হয়, বৃহস্পতির সময়ে দুই প্রথাই ছিল— জীবন্ত ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধে বসাইবার প্রথা ক্রমে উঠিয়া যাইতেছিল এবং দর্ভময় ব্রাহ্মণে শ্রাদ্ধ করার বহুল প্রচলন হইতেছিল। এখন আর বাংলায় কেহ শ্রাদ্ধে জীবন্ত ব্রাহ্মণ বসাইবার চেষ্টা করেন না।

বোধ হয়, বৃহস্পতির সময়েও ব্রাহ্মণেরা চারি বর্ণে বিবাহ করিতেন। কারণ, তিনি বর্ণ-সন্নিপাতাশৌচের ব্যবস্থা করিয়াছেন, অর্থাৎ এক

ব্রাহ্মণের যদি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিবাহ থাকিত এবং সেই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের স্ত্রীর সন্তান থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের কিরূপ অশৌচ হইবে, তিনি তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন। রঘুনন্দনের এবং এখনকার চলিত স্মৃতির বইয়ে এইরূপ অশৌচের উল্লেখ নাই। কারণ, এখন বর্ণ-সন্নিপাতই নাই। নেপালে এখনো ব্রাহ্মণে চারি বর্ণে বিবাহ করে; কিন্তু ব্রাহ্মণী স্ত্রীকেই রাঁধিয়া সকলকে খাওয়াইতে হয়— অন্য বর্ণের স্ত্রীকে রাঁধিতে দেওয়া হয় না। এক ব্রাহ্মণের চারি বর্ণের চারিটি স্ত্রী ছিল এবং সকলেরই কয়েকটি করিয়া সন্তান ছিল। হঠাৎ ব্রাহ্মণী স্ত্রীটি মরিয়া গেল। ব্রাহ্মণটিকে নিজে রন্ধন করিয়া সকলকে খাইতে দিতে হইত। জীমূতবাহনের দায়ভাগে চারি বর্ণে বিবাহের কথা আছে, এবং চারি বর্ণের সন্তানের দায়ভাগের কথাও আছে। বৃহস্পতির সময় প্রথাটা বোধ হয়, উঠিয়া আসিতেছিল— কিন্তু একেবারে লোপ পায় নাই।

'অমরকোষে'র দুইখানি প্রধান প্রাচীন টীকা বাংলা দেশে লেখা হয়। একখানি ১১৫৯ সালে, সর্বানন্দ বন্দ্যঘটীয় (বন্দ্যোপাধ্যায়) কর্তৃক লিখিত হয়।[১৪] আর-একখানি 'পদচন্দ্রিকা'—বৃহস্পতি রায়-মুকুটের লেখা। দুই জনেই পাণিনীয় ব্যাকরণে দক্ষ ছিলেন। শ্রীশ চক্রবর্তী মহাশয় বলিয়াছেন, রায়মুকুট 'অষ্টাধ্যায়ী'তে খুব ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কিন্তু তখনো তো ভট্টোজি দীক্ষিতের 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' হয় নাই। সুতরাং এই-সকল প্রাচীন লেখকদিগকে বৌদ্ধ টীকাকারদের উপর অনেকটা নির্ভর করিতে হইয়াছিল। ভট্টোজি পঞ্চদশ শতকে বৌদ্ধ টীকাকারদের একেবারে ছাঁটিয়া ফেলেন। সুতরাং তাঁহার বইখানি পূরা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বই। সে সম্প্রদায় এইরূপ— পাণিনি, কাত্যায়ন, ব্যাড়ি, পতঞ্জলি, ভর্তৃহরি, কৈয়ট, ভট্টোজি দীক্ষিত।[১৫] ভট্টোজি দীক্ষিতের 'সিদ্ধান্তকৌমুদী' ও 'মনোরমা' চলিলে পর, সেই অনুসারে 'অমরকোষে'র আর-একখানি টীকা লেখা দরকার হয়। সেখানি লেখেন— ভট্টোজি দীক্ষিতের পুত্র ভানুজি দীক্ষিত।[১৬] তাঁহার টীকাই এখন পশ্চিমাঞ্চলে খুব চলে। পশ্চিমের লোকে রায়মুকুটের উপর অনেক সময় কটাক্ষ করিয়া থাকেন। সে কটাক্ষের মানে আর কিছুই নয়— রায়মুকুট বৌদ্ধ টীকাকারদের মত অনেক সময় গ্রহণ করিয়াছেন।

সর্বানন্দের টীকার সহিত রায়মুকুটের টীকার তুলনায় সমালোচনা দরকার। দু জনেই বাঙালি, দু জনেই প্রকাণ্ড পণ্ডিত অথচ দু জনে প্রায় তিন শো বৎসরের তফাত। এক বিষয়ে সর্বানন্দের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করা যায় না। তিনি 'অমরকোষে'র প্রায় দুই শত শব্দের তখনকার চলিত বাংলায় মানে দিয়া গিয়াছেন। রায়মুকুট দুই-চারিটা দিয়াছেন বটে, কিন্তু এতো নয়। সর্বানন্দ 'অমরকোষে'র দশখানি টীকা দেখিয়া 'টীকাসর্বস্ব' লিখিয়াছিলেন। রায়মুকুট ষোলোখানি টীকা দেখিয়া আপনার বই লিখিয়াছেন। সর্বানন্দ ১৯৪ খানি পুথি হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। রায়মুকুট ২৭০ খানি হইতে করিয়াছেন। রায়মুকুট গৌড়ের সুলতানের আশ্রিত ছিলেন— তাঁহার লাইব্রেরি খুব বড়ো ছিল। কিন্তু সর্বানন্দ যে-সকল পুস্তক পাইয়াছিলেন, তিনি তাহা সকল পান নাই। অনেক বই দুই-তিন শো বৎসরে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তথাপি তিনি সর্বানন্দ অপেক্ষা প্রায় একশো খানি বেশি পুথি হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। হয়তো দু-চার জায়গায় রায়মুকুটকে প্রমাণের জন্য অন্য লোকের উপর নির্ভর করিতে হইতে হইয়াছিল। তিনি অন্যের উদ্ধৃত প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সর্বানন্দ ও রায়মুকুট উভয়েই অনেকগুলি বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে আপনাদের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই-সকল গ্রন্থের মধ্যে তিনখানি মহাকাব্য। একখানি—'বুদ্ধচরিত', একখানি 'সৌন্দরনন্দ', আর-একখানি 'কপ্‌ফণাভ্যুদয়'। প্রথম দুইখানি অশ্বঘোষের, তৃতীয়খানি শিবস্বামীর। দুঃখের বিষয়, দুই-তিন শতাব্দী ধরিয়া আমাদের পণ্ডিতেরা এইসব গ্রন্থের নামও জানিতেন না। প্রথম দুখানি নেপাল হইতে সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তৃতীয়খানি আরো সম্প্রতি পুরী ও দক্ষিণ-ভারত হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে রায়মুকুট 'বুদ্ধচরিত' হইতে যে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা তিনি 'গণরত্নমহোদধি' হইতে লইয়াছেন— সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 'বুদ্ধচরিত' হইতে নয়।

কাব্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও দুই জন টীকাকারই অভিধান ও ব্যাকরণের অনেক বৌদ্ধ বই হইতে প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন; যথা, চন্দ্রগোমী,[১৭] জয়াদিত্য,[১৮] বামন,[১৮] জিনেন্দ্রবুদ্ধি,[১৮] পুরুষোত্তমদেব,[১৯]

মৈত্রেয় রক্ষিত।[২০] হিন্দু ও ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহারা বৌদ্ধ-লিখিত গ্রন্থ হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। রায়মুকুট কোনো কোনো স্থানে 'বৌদ্ধাগম' হইতেও প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। যে সময়ে সর্বানন্দ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তখন বাংলা তো বৌদ্ধে ভরা ছিল। নালন্দা[২১] মগধে, বিক্রমশিল[২২] ভাগলপুরে, জগদ্দল[২৩] বগুড়ায়, বড়ো বড়ো বিহার ও সঙ্ঘারামে পরিপূর্ণ ছিল। তখনো বাংলায় বৌদ্ধ বই নকল হইতেছিল। ১৪৩৬ সালে বর্ধমানে বেণুগ্রামে 'বোধিচর্য্যাবতার' নকল হইয়াছিল। ইহার দশ বৎসর আগে মালদহে 'কালচক্রতন্ত্র' নকল হইয়াছিল। উহা এখন কেম্ব্রিজে আছে। ইহারই কয়েক বৎসর পরে একজন বৃদ্ধ মঠধারীর শখ হয়, তিনি সংস্কৃত শিখিবেন। তিনি 'কলাপ-ব্যাকরণ' টীকার সহিত নকল করান। ঐ পুথির কয়েক খণ্ড এখন বৃটিশ মিউজিয়মে আছে। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, রায়মুকুট যখন বই লেখেন, তখনো বাংলায় বৌদ্ধ প্রভাব বেশ ছিল।

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'
দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৩৮ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে ৩ আশ্বিন ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৩১ খৃস্টাব্দ রবিবার চতুর্থ মাসিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে শাস্ত্রীমশায়ের "বৃহস্পতি রায়মুকুট" ও "পুরুষোত্তমদেব" প্রবন্ধ দুটি পড়েন চিন্তাহরণ চক্রবর্তী। সাহিত্য-পরিষদের কার্যবিবরণীতে উল্লেখ আছে— "প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় এই দুই প্রবন্ধের জন্য মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়কে পরিষদের পক্ষে এবং বঙ্গের সকলের পক্ষে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, তিনি এই বার্দ্ধক্যে পরিষদের প্রতি যেরূপ অপরিসীম স্নেহবশতঃ অশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠাইতেছেন, তাহা তরুণগণের অনুকরণের বিষয়। তাঁহার দয়ায় আমরা এ পর্যন্ত বঙ্গের অনেক বিস্মৃতপ্রায় খ্যাতনামা পণ্ডিতের বিবরণ পাইয়া উপকৃত হইতেছি।" দ্র. সা-প-প, ১৩৩৮ ব.।

১. তুর্কি ক্রীতদাস গিয়াসুদ্দিন বলবনকে তাঁর প্রভু খাজা জামালুদ্দিন ১২৩২ খৃস্টাব্দে ভারতে আনেন এবং সুলতান ইল্‌তুতমিসের কাছে বিক্রি করেন। ইল্‌তুতমিস তাঁকে খাস্‌দার— সুলতানের ব্যক্তিগত পরিচারক নিযুক্ত করেন। নিজের যোগ্যতা এবং প্রতিভায় বলবন ক্রমেই প্রশাসনে উচ্চতর পদ অধিকার করে শেষ পর্যন্ত নাসিরউদ্দিন মাহ্‌মুদের মৃত্যুর পরে ১২৬৬ খৃস্টাব্দে দিল্লির শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। সুলতানি শাসনের চরম দুঃসময়ে কর্তৃত্ব হাতে পেয়ে শূন্যপ্রায় রাজকোষ পূর্ণ করে তুলে, সৈন্যবাহিনী সুগঠিত করে, রাজ্যের ভিতরের বিদ্রোহীদের দমন এবং বাইরের আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা করে বলবন বিচক্ষণ শাসন-প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন। ১২৭৯ খৃস্টাব্দে বাংলার প্রাদেশিক শাসনকর্তা সুলতান মুঘিসুদ্দিন তুঘ্রল (রাজত্বকাল আ. ১২৬৮-৮১ খৃ.) কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বিচলিত বলবন মালিক তুরমতির নেতৃত্বে একটি বাহিনী বাংলায় পাঠান।

মালিক তুরমতি পরাস্ত হলেন। পরের বছরে মালিক শিহাবুদ্দিনের নেতৃত্বে আর-একটি বাহিনী পাঠানো হয়, কিন্তু এই অভিযানও ব্যর্থ হল। ফলে বল্‌বন নিজেই রাজধানী ছেড়ে বাংলায় বিদ্রোহ দমনে বেরোলেন। তুঘ্রলকে দমনের জন্য ব্যাপক আয়োজন করতে হয়েছিল। এই আয়োজনের অঙ্গ সোনার গাঁওয়ের রাজার সঙ্গে বল্‌বনের মিত্রতা। সমকালীন মুসলমান ঐতিহাসিকেরা উল্লেখ করেছেন 'সোনরগওঁ'-এর রাজার নাম দনুজরাই। ইনি সম্ভবত চন্দ্রদ্বীপের (আধুনিক বরিশাল জেলা, বাংলাদেশ) স্বাধীন রাজা দনুজ রায় কায়স্থ। তুঘ্রল যাতে জলপথে পালিয়ে যেতে না পারে সেইজন্য বল্‌বন দনুজ রায়ের সাহায্য চেয়েছিলেন। দনুজ রায় শর্ত দিয়েছিলেন, তিনি দেখা করতে গেলে বল্‌বনকে উঠে দাঁড়িয়ে সংবর্ধনা জানাতে হবে। দনুজ উপস্থিত হলে বল্‌বন সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে একটি বাজকে পাখি ধরবার জন্যে ছেড়ে দিলেন। উপস্থিত সবাই ভাবল, বাজ ছাড়বার জন্যই সুলতান উঠে দাঁড়িয়েছেন। এই কৌশলে বল্‌বন দনুজকেও খুশি করেন এবং নিজের মর্যাদা বাঁচান। চুক্তি অনুযায়ী দনুজ জলপথ অবরোধের ব্যবস্থা করেন এবং বল্‌বন নিজের বাহিনী নিয়ে তুঘ্রলের গোপন আশ্রয় খুঁজে বের করার অভিযান শুরু করেন। মালিক শের-আন্দাজ নামে এক সেনাপতি তুঘ্রলকে খুঁজে পান। নদী সাঁতরে পালাতে চেষ্টা করলে তুঘ্রলকে তীর মারা হয় এবং ধরা পড়লে মাথা কেটে ফেলা হয়। বল্‌বন রাজধানী লক্ষণাবতী অধিকার করে তুঘ্রলের পুত্র ও জামাতাদের এবং মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজকর্মচারীদের লক্ষ্মণাবতীর বাজারে ফাঁসি দেন। ছোটো ছেলে বুঘ্‌রা খানের উপরে বাংলার শাসনভার দিয়ে বল্‌বন প্রচুর ধনসম্পদ ও বন্দিদের নিয়ে দিল্লি ফিরে যান। ১৩২৪ খৃস্টাব্দে গিয়াসুদ্দিন আবার বাংলা দেশে আসেন এবং গৌড়ের শাসক বহাদুর শাহকে পরাস্ত করে বাংলা দেশ তিনভাগে ভাগ করে যান। গৌড়ের শাসনক্ষমতা পান সুলতান নাসিরুদ্দিন, সোনার গাঁ ও সাত গাঁর কর্তৃত্ব পান বহ্‌রাম্‌ খাঁ। বাংলা দেশ থেকে ফেরার পথে আফগানপুরে কাঠের মঞ্চ চাপা পড়ে গিয়াসুদ্দিনের মৃত্যু হয় (ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৩২৫)। তাঁর ছেলে মুহম্মদ জুনার (সুলতান মুহম্মদ বিন্‌ তুঘলক) ষড়যন্ত্রে তিনি এইভাবে নিহত হন। *HB-II*, pp. 58-70.

২. হাজি ইলিয়াস ১৩৪৫ খৃস্টাব্দে সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্‌ নাম নিয়ে স্বাধীন সুলতানরূপে বাংলার শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৩৫৭ খৃস্টাব্দে পাণ্ডুয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়।

৩. সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্‌র ছেলে সিকন্দর শাহ্‌র রাজত্বকাল ১৩৫৭-৮৯ খৃস্টাব্দ। সিকন্দর শাহ্‌ প্রথম থেকেই রাজ্যে শান্তি রক্ষা ও দিল্লির সঙ্গে সদ্ভাব রাখার নীতি অনুসরণ করেন। সুলতান ফিরুজ তুঘলকের আক্রমণ কৌশলে প্রতিহত করে সিকন্দর শাহ্‌ তাঁর সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি করেন। ১৩৫৯ খৃস্টাব্দে ফিরুজ দিল্লি ফিরে গেলেন এবং এর পরে প্রায় ২০০ বছর বাংলায় দিল্লি থেকে কোনো অভিযান হয় নি। সিকন্দর শাহ্‌র মৃত্যুর পরে তাঁর ছেলে গিয়াসুদ্দিন আজম শাহ্‌ ১৩৮৯ থেকে ১৪০৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

৪. সমরকন্দের আমির তৈমুরলঙের জীবনকাল ১৩৩৬-১৪০৫ খৃস্টাব্দ। ১৩৬৯ খৃস্টাব্দে তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার কিছু পরে বিদেশ অভিযান শুরু করেন এবং মেসোপোটেমিয়া, পারস্য, আফগানিস্তান বিধ্বস্ত করে ১৩৯৮ খৃস্টাব্দের শেষ দিকে দিল্লির উপকণ্ঠে উপস্থিত হন। তৈমুর মাত্র ১৫ দিনে দিল্লি ধ্বংস করে লুণ্ঠিত ধনসম্পদ নিয়ে ফিরে যান।

৫. পাণ্ডুয়া, হজরত-পাণ্ডুয়া বা ফিরোজাবাদে সামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্‌র আগেই আলাউদ্দিন আলি শাহ্‌র সময়ে (রাজত্বকাল ১৩৩৯-৪২ খৃ.) রাজধানী সরিয়ে নেওয়া হয়ে থাকতে পারে, কারণ, আলাউদ্দিনের কোনো কোনো মুদ্রায় ফিরোজাবাদ লেখা দেখা যায়। পাণ্ডুয়ার আদিনা মস্‌জিদ সম্ভবত সিকন্দর শাহ্‌ ১৩৭৫ খৃস্টাব্দে তৈরি করিয়েছিলেন। ফারগুসন্‌ বলেন, আদিনা মস্‌জিদ দামাস্কাসের বিখ্যাত জুম্মা মস্‌জিদের অবিকল প্রতিরূপ। দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৫৫ মিটার, প্রস্থে ৮৭ মিটার। শ্রীযুক্তা দেবলা মিত্র লিখেছেন, "স্তম্ভ, বাতায়ন-সংকলিত পশ্চাতের দেওয়াল এবং খিলানযুক্ত মকসুরার উপর ন্যস্ত ছাদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গম্বুজে বিভক্ত। গম্বুজের সংখ্যা পূর্বদিকে ১০৮, উত্তরদিকে ৩৯ এবং দক্ষিণদিকে ৫১।" দ্র. "পাণ্ডুয়া", 'ভারতকোষ'।

৬. ইলিয়াসশাহি বংশের সৈফুদ্দিন হামজা শাহ্‌ ১৪০৯ অথবা ১৪১০ খৃস্টাব্দে সুলতান হন। এঁর সময় থেকে দেশের মধ্যে তীব্র ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়। ভাতুড়িয়া অঞ্চলের হিন্দু জমিদার গণেশ, ফারসিতে কানস্‌ বিশৃঙ্খল অবস্থার সুযোগ নিয়ে শাসনব্যবস্থা নিজের আয়ত্তে আনেন। সুলতান নামে মাত্র সিংহাসনে ছিলেন, প্রকৃত ক্ষমতা গণেশের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ১৪১৪/১৫ খৃস্টাব্দে দনুজমর্দনদেব নাম নিয়ে গণেশ গৌড়ের সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁর বড়ো ছেলে যদু

মুসলমান ধর্ম নিয়ে জালালুদ্দিন নামে বাবার মৃত্যুর পরে ১৪১৮-৩১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা দেশ শাসন করেছিলেন। তাঁর ছেলে সাম্‌সুদ্দিন আহ্‌মেদের রাজত্বকাল অনুমানিক ১৪৪২ খৃস্টাব্দে শেষ হয়। অবিবেচক সামসুদ্দিনের আচরণে বিরক্ত হয়ে রাজপুরুষেরা তাঁকে হত্যা করান।

দুর্গাচরণ সান্যাল বারেন্দ্রকুলশাস্ত্রের ভিত্তিতে 'বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস' গ্রন্থে রাজা গণেশকে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বলেছিলেন, নগেন্দ্রনাথ বসু কায়স্থ কুলশাস্ত্রের ভিত্তিতে গণেশকে কায়স্থ প্রমাণ করেন। অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ না থাকায় গণেশের জাতি পরিচয় এখনো অনিশ্চিত। দ্র. *H-B-II*, pp. 120-29; বাঙ্গা-ই, দ্বিতীয় খণ্ড, পরিশিষ্ট (ছ) পৃ. ১৪৫-৪৬।

৭. অদ্বৈত আচার্যের জন্ম শ্রীহট্ট জেলার লাউড় গ্রামে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কুবের পণ্ডিতের ছেলে, মা নাভা দেবী। জন্ম ১৪৩৪ খৃস্টাব্দে। দীক্ষা নেবার আগে এ'র নাম ছিল কমলাক্ষ। মাধবেন্দ্র পুরীর কাছে দীক্ষা নিয়ে অদ্বৈত আচার্য পদবি পেয়েছিলেন। শ্রীহট্ট থেকে শান্তিপুরে বাস উঠিয়ে আনেন, নবদ্বীপেও অদ্বৈত আচার্যের বাড়ি ছিল। চৈতন্যের চেয়ে বয়সে বড়ো, সুপণ্ডিত অদ্বৈত ছিলেন নবদ্বীপের ভক্তিবাদী বৈষ্ণবদের নেতৃস্থানীয়। তিনি চৈতনদেবকে প্রথম ভগবানজ্ঞানে চন্দন-তুলসী দিয়ে প্রণাম করেন। পরে পুরীতে রথযাত্রার সময়ে সর্বসাধারণের কাছে চৈতন্যদেবকে অবতার বলে ঘোষণা করেন। চৈতন্যদেব তাঁকে গুরু মানতেন কিন্তু অদ্বৈত নিজেকে মহাপ্রভুর দাস মনে করতেন। চৈতন্য-দেবের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে দীর্ঘায়ু অদ্বৈতের মৃত্যু হয়।

৮. "হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভুল করে মনে করেছিলেন এ'র স্ত্রীর নাম রমা। কিন্তু আসলে যে নিবৃতা তা স্পষ্ট করে বোঝা যায় রঘুবংশ-টীকা থেকে, 'যস্যোচিতা প্রিয়তমা প্রতিমানবৃত্তিমূর্ত্তেব নিবৃতিরভুদ ভুবি নির্বৃতোতি'।" (দ্র. সুকুমার সেন, 'মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালি', বিশ্বভারতী ১৩৫২ ব., পৃ. ১১)।

৯. শাস্ত্রীমশায়ের প্রবন্ধে বৃহস্পতির রায়মুকুটমণি উপাধি প্রাপ্তির সময়ে যে জাঁকজমক হয়েছিল তার কিছু বর্ণনা আছে। অনুরূপ ব্যাপারের একটি বিস্তৃততর বর্ণনা পাচ্ছি উড়িষ্যার গজপতি রাজা প্রতাপরুদ্রের (ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ) পণ্ডিত মন্ত্রী বিরচিত 'হরিহরচতুরঙ্গ' পুথির অষ্টম অধ্যায়ের পুষ্পিকা থেকে। এই পুষ্পিকায় আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে লেখক গোদাবর মিশ্র বলেছেন যে স্বয়ং মহারাজাধিরাজ প্রতাপরুদ্র স্বহস্তে

সোনার ঘড়ায় করে কবিশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতবর রাজগুরু বাজপেয়যাজী মন্ত্রীবর গোদাবর মিশ্রের মাথায় জল ঢেলে তাঁর অভিষেক করেছিলেন। তখন তাঁর চার দিকে রাখা হয়েছিল চারটি সোনার ঘোড়া। তাঁর মাথায় ধরা হয়েছিল 'মেঘাড়ম্বর' নামক শ্বেতচ্ছত্র (…প্রতাপরুদ্রদেব-স্বহস্ত-ধারিত-কনককেশরিচতুষ্টয়বেষ্টিত - শতকুম্ভময়কুম্ভসংভৃত - মেঘাড়ম্বরাভিধান সিতাতপত্র-শোভমান…)। বৃহস্পতিও সম্ভবত রাজগুরু ও মন্ত্রীর অভিষেক পেয়েছিলেন। 'হরিহরচতুরঙ্গ' বইটির বিষয় রাজনীতি ও সমরনীতি। প্রকাশিত হয়েছিল মাদ্রাজ ওরিয়েন্টাল সিরিজে (১৯৫০)।

সুকুমার সেন।

১০. পুরুহূতধ্বজস্যেব তস্যোন্নয়নপংক্তয়ঃ।
নবাভ্যুত্থানদর্শিন্যো ননন্দুঃ সপ্রজাঃ প্রজাঃ ॥

রঘুবংশ, ৪/৩

অনুবাদ: ঊর্ধ্বনেত্রে ইন্দ্রধ্বজের উদয় দেখে যেমন লোকে আনন্দিত হয়, পুত্রপৌত্রসহ প্রজারাও তেমনি রঘুর নব অভ্যুদয়ে আনন্দিত হল।

১১. 'নাট্যশাস্ত্র' ভরত বা ভরতমুনি রচিত মনে করা হয়। তাঁর আবির্ভাব-কাল সম্পর্কে মতভেদ আছে। নিম্নতম সীমা খৃস্টীয় অষ্টম শতকের শেষ ভাগ। শাস্ত্রীমশায় মনে করতেন খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক। দ্র. "ভরতের নাট্যশাস্ত্র", 'পঞ্চপুষ্প', আষাঢ় ১৩৩৬ ব.; "The Origin of Indian Drama", *J-A-S-B*, 1909, NS : Vol. V, pp. 351-61; *Shastri-Cat.*, Vol. VI, pp. clxxvii-clxxxvii.

১২. জীমূতবাহনের জন্ম সম্ভবত রাঢ় অঞ্চলে। জন্মকাল অনিশ্চিত। পাণ্ডুরঙ্গ বামন কানে অনুমান করেন জীমূতবাহনের গ্রন্থগুলি ১০৯০ থেকে ১১৩০ খৃস্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল। তাঁর প্রথম রচনা বোধ হয় 'কালবিবেক', বিষয়— বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কাল নিরূপণ। দ্বিতীয় রচনা 'ব্যবহারমাতৃকা'র বিষয় মামলার প্রাথমিক আইন কানুন। জীমূতবাহনের প্রসিদ্ধ রচনা 'দায়ভাগ' উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিধিবিধান। বাংলা দেশে সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কে 'দায়ভাগ'কে প্রামাণ্য মেনে আসা হয়েছে।

১৩. 'চতুর্বর্গ-চিন্তামণি' গ্রন্থের লেখক, দক্ষিণ ভারতীয় পণ্ডিত হেমাদ্রি দেব-গিরির (আধুনিক দৌলতাবাদ) যাদবরাজা মহাদেবের (রাজত্বকাল

১২৬১-৭০ খৃ.) মন্ত্রী ছিলেন। 'চতুর্বর্গ-চিন্তামণি' ব্রত, দান, তীর্থ, মোক্ষ ও পরিশেষ— এই পাঁচ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ হবে পরিকল্পনা ছিল। ব্রত এবং দান অংশ দক্ষিণ ও উত্তর-ভারতে অচিরে প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত হয়। হেমাদ্রি সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায় মন্তব্য করেছেন—

"When Hemādri was writing his great digest, Northern India was in the complete grasp of the Muhammadans. But they had not yet penetrated to the south of the Vindhya ranges, and so the Dākṣinātya people were writing comprehensive and almost Imperial digests on the various topics of Hindu Law. Hemādri had a very admirable coadjutor in Bopadeva, the author of the *Mugdhabodh*. They commented on each other's work and otherwise helped each other in various ways, in the cause of Sanskrit learning." (*Shastri-Cat.*, Vol. III, Preface, p. xvii).

১৪. সর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'টীকাসর্বস্ব' 'অমরকোষে'র সবচেয়ে পুরানো টীকা। সর্বানন্দ বহু জানা অজানা কবির কাব্য থেকে শ্লোক উদ্ধার করেছেন। এর মধ্যে বাংলা দেশে লেখা সংস্কৃত কাব্যও আছে। সর্বানন্দ বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, বইয়ের শুরুতে গোপাল-কৃষ্ণের বন্দনা করেছেন।

"Sarvānanda Banerji wrote his work in Western Bengal, but the MSS. of his work have generally migrated to Southern India and it has been published in the Trivendrum Series. The only MS. of the work in the Asiatic Society's Library is in Oriyā character. It is reported that the Dacca University has got a copy in Bengali character. If so, it will help greatly in deciphering the numerous Bengali words given in Amara. These Bengali words coming through Tāmil, Malaylam, Telegue [Telugu] and Oriyā are hard to decipher and Bengali scholars are at great difficulty, some deciphering in one way and others in another. Sarvānanda quotes from about twenty Buddhist works in his commen-

tary. In the preamble he says that he has studied ten commetaries on *Amara-Koṣa* and at the end he says that he studied three systems of grammar, looked into all works in poetry, listened with attention to wise teachers and his commentary has been corrected word for word and letter for letter by Sanātana."(*Shastri-Cat.*, Vol. VI, p. cxxvii).

১৫. এই বইয়ের পৃ. ৬৩,৬৭-৭৬ সূত্র ৭, ১০-২৫ দ্র.

১৬. ভট্টোজি দীক্ষিতের ছেলে ভানু দীক্ষিত বীরেশ্বর দীক্ষিত ও রামাশ্রম নামেও পরিচিত ছিলেন। ভানুজি পারিবারিক ঐতিহ্য অনুসারে পাণিনি সম্পর্কে বৌদ্ধ-বিরোধী ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টি অনুসরণ করেছেন।

১৭. চন্দ্রগোমী বৌদ্ধ ছিলেন এবং বৌদ্ধদের ব্যবহারের উপযোগী ব্রাহ্মণ্য প্রভাবমুক্ত 'চান্দ্রব্যাকরণম্' রচনা করেন। পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলির মনীষা ও শ্রমের ফল কালোপযোগীভাবে নিজের রচনায় ব্যবহারে তার বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়। পতঞ্জলির পরে সংস্কৃত ভাষায় ক্রমে যেসব পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল তার আলোয় চন্দ্রগোমী নিজের রচনায় সূত্র ও বার্তিক পরিমার্জনা করে নতুনভাবে বিন্যস্ত করেন। তাঁর রচনা অনুসরণে সংস্কৃত ব্যাকরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা গড়ে উঠেছিল।

শাস্ত্রীমশায় লিখেছেন—

"Vopa-deva in his *Kavi-Kalpa-druma* quotes a verse giving the names of eight ancient schools of sanskrit grammar. They are :—

इन्द्रश्चन्द्रः काशकृत्स्नापिशली शाकटायनः ।
पाणिन्यमरजैनेन्द्रा जयन्त्यष्टादिशाब्दिका ॥

"In this enumeration he makes Candra the second school of sanskrit grammar. The founder of this school is Candra-gomī, whose birth place was in the Vārendra country or North Bengal, but he lived at Candra-dvīpa, in the Barisal district, where he wrote his grammar. This account of Candra-gomī is to be

found in *Pug-Sam-Zom-Zam*, a rather late Tibetan authority. His date is to be inferred from the fact that, he mentions the victory of the Guptas over the Huns, as occuring in his time, which he might have seen if he wished ; and it is well known that the Huns were defeated by the Guptas in the third quarter of the 5th century ; and therefore, Belvalkar has placed him in 470 A.D., which may be accepted as correct if the Vṛtti-Kāra is the author himself. This was the period when Candra-dvīpa was an important city. It was invaded by Candra-varmā, who was defeated and killed by Samudra-Gupta, and it was also at Candra-dvīpa about this time, that the Kaula system of Śaivaism took its rise. Chandragomī was a Buddhist and he wrote his work in the interest of his co-religionists. In fact from this period Buddhist Śramaṇas began to write in correct Sanskrit. All Buddhist works before this time were written in what in called Buddhist Sanskrit *i.e.*, ungrammatical Sanskrit. Even the very best of them confounded the participles, in the use 'ktva' and 'yap'.

"As Candra wrote in the interest of the Buddhists, he did not treat of the Vaidik grammar and phonetics. For centuries Candra's grammar remained in India, only as a name, till Bühler from Kāśmīra and Professor Bendall from Nepal recovered fragments of it, and I acquired a complete copy of it, from that interesting and ancient country, Nepal. Dr. Bruno Liebich, then brought the whole system from Tibet in translation. He has published the work in original Sanskrit with some accessories.

"In a way Candra is an improvement on Pāṇini and the three sages. He has reduced Pāṇini's fourteen Śiva-sūtras into thirteen ; he has modified

the system of Pratyāhāras of Pāṇini; he has changed the wording of Pāṇini's rules and their arrangement; he has thirty-five sūtras more than Pāṇini's. Jayāditya and Vāmana have incorporated these into the *Kāśka*, but Kaiyyaṭa has pronounced them as Apāṇineya. The nnmber of sūtras in Candra is 3060 as against 3983 of Pāṇini.

"Candra has not put the Saṁjñās or grammatical technical terms and their definitions in one place but has distributed them over the whole work and they are so few that this grammar is called Asaṁjña. The arrangement of subjects in his work is suited for scholars and not for beginners.

"Candra-gomī is invariably confounded with Candrācārya mentioned in the second Kāṇḍa of *Vākya-padīya*. Candrācārya is mentioned in verse No. 489 in the word चन्द्राचार्य्यादिभिः। The Commentator Puṇya-rāja explains;—

'चन्द्राचार्य्य-वसुरात-गुरु-प्रभृति'।

"Vasu-rāta was the guru of Bharttṛ-hari, the author of the *Vākya-padīya*. This we learn from the summary given, at the end of the second Kāṇḍa, by Puṇya-rāja. In this summary, he says, Vasu-rāta brought the Bhāṣya from Parvata, while the text says Candrācārya and others did it; and among the others the commentator includes Vasu-rāta. So Candrācarya and Vasu-rāta must belong to the seme generation. Therefore Belvalkar is not justified in saying, 'That Chandrācarya was two generations before Bharrttṛ-hari'. He was an elder contemporary; so Candrācārya must come about 600 A.D., while Chandra-gomī, if he has written the Vṛtti himself, would be placed in about 470 A.D., if not earlier. How much earlier, we cannot say. The

arguments, that Malli-nātha quotes Candra-gomī about the use of the optional forms, Viśrama and 'Viśrāma' fails ; because we get no sūtra sanctioning the optional form in Candra-gomī. The optional forms might have the sanction of Candrācārya.

"*Agṇi-purāṇa*, chapters 248 to 258 both inclusive, treat of grammar. In this grammar, the alphabet is not taken as it is current. It takes it in the Śiva-sūtra form, so this does not belong to the Aindra school. It treats the greater part of the grammar by examples. But there are more examples in this than are to be found in the *Kātantra* grammar. The few rules that are given do not belong to *Kātantra*. In the Taddhita chapter, it derives the word 'Cāndraka' as, one who either knows, or studies the Cāndra grammar. I, therefore, take these eleven chapters of the *Agṇi-purāṇa* to belong to the Cāndra grammar.

"In this catalogue, *Cāndra Vyākarṇa* is described in three numbers, 4411 to 4413 ; the first two are accompanied with Ananda-dattas commentary,* and the third with that of Bhikṣu Ratna-mati. But they are so fragmentary that no inference can be drawn from them ; so are the descriptions of this Vyākaraṇa in Bendall's *Cam. Cat.*, and in my *Nepal cat.* Liebich gives the Sūtra-pāṭha in six chapters divided into four pādas each, the Uṇādi-pāṭha in three chapters, and the Dhātu-pāṭha. The number of Dhātus mentioned are 1182 and the number of Cāndra-sūtras are 3060 and the number of Uṇādi-sūtras are 328. The Liṅgānuśasana and the Gaṇa-paṭha of this school are referred to by authoritative writers of other schools. The Upa-sarga vṛtti

*Eggeling in page 196, line 19, speaks of two other commentators (1) Bimalmati (2) Ratna-Śrī-pāda.

is found in Tibetan version only, the Varṇa-sūtra is to be found in a MS. in the Deccan College Collection No. 289 of 1875-76. No work on Pari-bhāṣā has yet come down to us. These are the accessories of the Cāndra School of grammar. So, it was a school fully equipped with all the accessories, like the Paṇini school.

"The *Cāndra-Vyākaraṇa*, at one time, had an extensive circulation in Buddhist India, and with the decadence and fall of Buddhism, it has very nearly disappeared from the soil of India. In Ceylon it was much in use at one time, but, the *Bālāvabodha*, a school book of this school, has completely ousted other works from Ceylon." (*Sastri-Cat.*, Vol VI, pp. xlviii-lii) ; দ্র. S. K. Belvalkar, *Systems of Sanskrit Grammar*, Delhi 1976, pp. 29-31.

১৮. বামন ও জয়াদিত্যের যৌথ রচনা 'কাশিকা' নামে পাণিনির 'অষ্টাধ্যায়ী'র উপরে লেখা বৃত্তি বা সূত্র-ব্যাখ্যা সমগ্র ভারতে সমাদৃত। 'কাশিকা'র কোন্ অংশ জয়াদিত্যের এবং কোন্ অংশ বামনের লেখা এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মত বিরোধ আছে। চীনা পরিব্রাজক ইৎ-সিঙের বিবরণ অনুযায়ী কাশ্মীরি বৈয়াকরণ জয়াদিত্যের মৃত্যু হয়েছিল ৬৬০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে। ইৎ-সিঙ জয়াদিত্যের গ্রন্থের নাম বলেছেন 'বৃত্তিসূত্র'। 'কাশিকা' এবং 'বৃত্তিসূত্র' একই গ্রন্থ কিনা সে বিষয়েও সন্দেহ আছে। বর্তমানে মনে করা হয় 'কাশিকা'র প্রথম ৫ অধ্যায় জয়াদিত্যের এবং অবশিষ্ট ৩ অধ্যায় বামনের রচনা। প্রখ্যাত আলংকারিক বামন এবং বৈয়াকরণ বামন এক ব্যক্তি নন। এই ধারায় 'কাশিকাবিবরণ পঞ্জিকা' বা 'কাশিকা ন্যাস' নামে টীকার লেখক জিনেন্দ্রবুদ্ধির আবির্ভাব কাল ৭৫০ খৃস্টাব্দের আগে। দ্র. S. K. Belvalkar, পূর্বোক্ত সূত্র, pp. 29-32 ; Śriśa Chandra Chakravarti ed., 'কাশিকাবিবরণপঞ্জিকা', Vol. I-III, Varendra Research Society, Rajsahi 1914-25.

১৯. এই বইয়ে "পুরুষোত্তম দেব" প্রবন্ধ দ্র.

২০. "Every grammarian had to make his own list of verbal roots from the pre-existing indices. Pāṇini's Dhātu-pāṭha consists of 1944 roots, plus 20 Śrauta dhātus which have to be picked up from the sūtras of Pāṇini. The works on roots of the school of Pāṇini have many commentaries. Our 4350 [MS. No.] is by Kṣira-Svāmī, the Kāśmīrian. It gives the meanings of roots. Numbers 4351 to 53 are by Bhīma-sena and 4354 is by Maitreya-rakṣita, one of the Buddhist commentators of Pāṇini. It is later than Bhīma-sena. Maitreya flourished according to Śrīsa Babu about 1100 A. D. ... Babu Śrīśa Chandra has written a commentary on the *Dhātu-Pradīpa* by Maitreya in his edition published by Vārendra Research Society." (*Shastri-Cat.*, Vol. VI, pp. xxxi-xxxii).

২১. এই বইয়ের পৃ. ৮৫ সূত্র ২ দ্র.

২২. এই বইয়ের পৃ. ৮৮ সূত্র ৬ দ্র.

২৩. পাল-রাজা রামপালের রাজত্বকালে (১০৭৭-১১২০ খৃ., মতান্তরে ১০৭২-১১২৬ খৃ.) তাঁর আনুকূল্যে বরেন্দ্রভূমিতে জগদ্দল বিহার স্থাপিত হয়েছিল। গঙ্গা-করতোয়ার সঙ্গমে রামাবতী রামপালের রাজধানী ছিল। শাস্ত্রীমশায় মনে করেন রামাবতীতেই জগদ্দল বিহার ছিল। এ বিষয়ে ভিন্ন মত আছে। বিভূতিচন্দ্র, দানশীল, মোক্ষাকরগুপ্ত, শুভাকরগুপ্ত প্রভৃতি পণ্ডিত এখানে অধ্যাপনা করতেন। এই পণ্ডিতেরা তিব্বতে সুপরিচিত ছিলেন। কোনো কোনো সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থ জগদ্দল বিহারেই তিব্বতি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। দ্র. *H-B*-I, p. 418 ; *2500 year*, p. 169.

বাণেশ্বর বিদ্যালংকার

বাণেশ্বর বিদ্যালংকারের বাড়ি গুপ্তিপাড়া। গুপ্তিপাড়া কালনার একটু দক্ষিণে গঙ্গার ধারে, শান্তিপুরের প্রায় আরপার। এখানে বহুদিন ধরিয়া অনেক সম্ভ্রান্ত রাঢ়ী শ্রেণীয় ব্রাহ্মণের বাস। এখানকার ব্রাহ্মণেরা বড়োই স্পষ্টবাদী ছিলেন এবং বড়োই রসিক ছিলেন। শান্তিপুর, গুপ্তিপাড়া, উলো, এই তিন জায়গায় ব্রাহ্মণেরা পরস্পর ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া বাংলা দেশকে অনেক দিন সজাগ রাখিয়াছিলেন। শান্তিপুরের লোক গুপ্তিপাড়ার লোককে বাঁদর বলিত এবং গুপ্তিপাড়ার লোক উলো শান্তিপুরের লোককে পাগল বলিত। তাহাই লইয়া পরস্পর খুব ঠাট্টা বিদ্রূপ চলিত।

বাণেশ্বর শোভাকরের সন্তান। শোভাকর দেবীবর ঘটকের গুরু ছিলেন। খৃস্টীয় ১৪৮২ সালে দেবীবর রাঢ়ী শ্রেণীর বড়ো বড়ো কুলীনকে একত্র করিয়া তাহাদের মেলবন্ধন করেন। যোগেশ্বর পণ্ডিত ও দেবীবর মাসতুতো ভাই ছিলেন। যোগেশ্বর বড়ো কুলীন, দেবীবর শ্রোত্রিয়, সেইজন্য যোগেশ্বর পণ্ডিত মাসির বাড়ি ভাত খান নাই। তাহাতে দেবীবর অত্যন্ত চটিয়া যান, এবং কুলীনের যত দোষ আছে, সেইগুলি প্রচার করিয়া দিবার জন্য সব কুলীনদের লইয়া সভা করেন। সভায় সব বড়ো বড়ো কুলীন উপস্থিত ছিলেন। সভা হয় গুরু শোভাকরের বাড়িতে। গুরুর বাড়ি ছিল আয়দায়। কালনা হইতে ২ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিম। এই সভায় যত কুলীনের এক রকম দোষ ছিল, তাহাদের এক একটি মেল করিয়া দেওয়া হয়, তাহারা সেই মেলের মধ্যেই বিবাহ করিতে পারিবে, এদিক ওদিক করিতে পারিবে না। সে-সকল দোষ নানা রকম। সেসব পুরানো কাশুন্দি আর ঘাঁটিয়া কাজ নাই। এই-রূপে ছত্রিশটি মেলের উৎপত্তি হয়। বড়ো দোষে বড়ো মেল হয়।

শোভাকর ২/৩ দিন দেবীবরের কার্যকলাপ দেখিয়া একদিন ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবীবর! আমার কী কুল হইল? তাহাতে দেবীবর উত্তর করিলেন—

ডাক দিয়ে কয় দেবীবর।
নিষ্কুল শোভাকর ॥

শোভাকর বলিলেন—

ডাক দিয়ে কয় শোভাকর ॥
নির্বংশ দেবীবর ॥[১]

শোভাকরের কুল হইল না বটে, কিন্তু শোভাকরের বংশ নানা কারণে বাংলায় খুব খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিল। শোভাকরের বংশ আয়দার চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। সেই বংশে বাণেশ্বর বিদ্যালংকারের জন্ম।

আয়দা হইতে গুপ্তিপাড়া বেশি দূর নয়। সেখানে শোভাকরের বংশ থাকা বিচিত্র নয়। গুপ্তিপাড়া একটি গণ্ডগ্রাম। সেখানে বৃন্দাবন-চন্দ্র নামে এক ঠাকুর আছেন। তাঁহার বিস্তর সম্পত্তি। একজন সন্ন্যাসী সেই সম্পত্তির মালিক। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের বারো মাসে তেরো পার্বণ হয়। রথে বেশ জাঁক হয়। রামসীতারও একটি মন্দির আছে।

মন্দিরের কিছু সম্পত্তি আছে। অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সেখানে ছিলেন। গুপ্তিপাড়ায় পত্র দিতে হইলে ৫/৭ খানি পত্র প্রায় দিতে হইত। এক-খানি মাত্র পত্র দিতে হইলে একজন বড়ো নৈয়ায়িককে দিতে হইত ; তাঁহাকে একপত্রী বলিত।

শোভাকরের বংশে গুপ্তিপাড়ায় রাম নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নৈয়ায়িক ছিলেন। বিচারে তাঁহার সহিত কেহ আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। বিচারকালে তাঁহাকে সিংহের মতো বলিয়া মনে হইত ; অথচ তিনি বেশ কবিও ছিলেন, তাঁহার কবিতায় অনেকে মুগ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র রাঘবেন্দ্র ; তাঁহার খুব খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার পুত্র বিষ্ণু সিদ্ধান্তবাগীশ ; ইনি পিতার নিকট মন্ত্র পাইয়া সেই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার কাব্যে পাথরও গলিয়া যায়, বজ্রও শিরীষফুলের মতন নরম হইয়া যায়। তাঁহার বিদ্যার যশ চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার পুত্র রামদেব তর্কবাগীশ। রামদেবের পুত্র বাণেশ্বর বিদ্যালংকার।

বাণেশ্বর ছেলেবেলায় খুব চালাক-চতুর ছিলেন, এবং বোধ হয়, বড়ো দুষ্টও ছিলেন। পিতা রামদেব বাণেশ্বরের আকার-প্রকার দেখিয়া বলিয়াছিলেন, কালে বানুও পণ্ডিত হবে। হইয়াছিলও তাই। বাণেশ্বর গুপ্তিপাড়ার লোকের মতো সাহসী এবং স্পষ্টবাদী ছিলেন। টোলের পড়া শেষ করিয়া তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় পণ্ডিত হইয়াছিলেন। কিন্তু একদিন কী রসিকতা করিয়া তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের কোপে পড়েন। তাই তিনি কৃষ্ণনগর ত্যাগ করিয়া বর্ধমানে যান এবং সেখানে রাজা চিত্রসেনের সভাপণ্ডিত হন। খৃস্টীয় ১৬৯৬ সালে বরদা পরগণার রাজা শোভাসিংহ যখন উড়িষ্যার পাঠানদের সহিত মিলিয়া রাঢ় দেশে মহা-উৎপাত আরম্ভ করেন, তখন রাজা কৃষ্ণরাম বর্ধমানের রাজা। তাঁহার কন্যাকে আক্রমণ করিয়া কিরূপে শোভাসিংহ সেই কন্যার হাতে প্রাণ হারান, সেকথা ইতিহাসে প্রসিদ্ধ আছে।[২] কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরায়। তাঁহার পুত্র কীর্তিচন্দ্র। কীর্তিচন্দ্রের খুব নাম হইয়াছিল। তাঁহার পর চিত্রসেন রাজা হন। চিত্রসেন রাজার সময় রাঢ়ে বর্গির হাঙ্গামা হয়। রাজা চিত্রসেন বাণেশ্বর বিদ্যালংকারকে গুপ্তিপাড়া হইতে আনাইয়া আপনার সভাপণ্ডিত করেন এবং তাঁহাকে 'চিত্রচম্পূ' নামে আপনার এক জীবনচরিত লিখিতে বলেন। ১৭১৪

[১৭৪৪] খৃস্টাব্দে যখন বর্গির হাঙ্গামা খুব চলিতেছে, সেই সময়ে 'চিত্রচম্পূ' লেখা হয়।[৩] গদ্য ও পদ্য মিশ্রিত হইয়া যে কাব্য হয়, তাহার নাম চম্পূ। বাণেশ্বরের এই চম্পূ বাংলার এক অপূর্ব কাব্য। এখন ইহার পুথি বড়ো পাওয়া যায় না। কোলব্রুক সাহেব একখানি পুথি সংগ্রহ করিয়া লণ্ডনে ইণ্ডিয়া অফিসে দিয়াছেন। আর-একখানি সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের পুথিখানায় আছে। ইহা হইতে আমরা বর্গির হাঙ্গামার অনেক কথা জানিতে পারি।[৪] বর্গির হাঙ্গামার সময় মহারাজা চিত্রসেন বর্গিদের সহিত অনেকবার লড়াই করিয়াছিলেন। তিনি বর্গিদের হাত হইতে প্রজাদের ধনপ্রাণ রক্ষা করিবার জন্য দক্ষিণ-প্রয়াগে অর্থাৎ ত্রিবেণীতে গমন করেন এবং ত্রিবেণী হইতে সমুদ্রের মধ্যে গঙ্গার পূর্বপারে এক প্রকাণ্ড দুর্গ নির্মাণ করেন। সে দুর্গের চিহ্ন এখনো আছে; উহাকে কাউগাছির গড় বলে। শ্যামনগর স্টেশনের প্লাটফরমের কিছু পূর্বে ঐ গড়ের খাদ এখনো দেখা যায়। ৭০ বৎসর পূর্বে সেখানে বড়ো বড়ো ফটক ছিল। সে ফটকের ভিতর দিয়া হাতি অনায়াসে চলিয়া যাইত। এইখান হইতে মহারাজা চিত্রসেন রাঢ়ে বর্গিদের উপর খুব উৎপাত করিতেন ও তাহাদের তাড়াইয়া দিতেন। বর্গিরা গঙ্গা পার হইতে পারে নাই। এখন যেখানে হুগলির পোল হইয়াছে, গঙ্গা সেখানে অতি সরু থাকায় পার হইয়া বর্গিরা একবার গরিফার হাতিবাগানে উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেখান হইতে মাঠ দিয়া দক্ষিণ মুখে আসিতেছিল। সে সময়ে যশোরের চাঁচড়ার রাজারা আতপুরে থাকিতেন, সেখানে তাঁহাদের গঙ্গাবাসের বাটি ছিল। তাঁহারা মাঠে পগার কাটিয়া, তাহার উপর পাকাটি বিছাইয়া, তাহার উপর ঘাসের চাপড়া দিয়া এমন করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, বর্গিরা টের পায় নাই, এখানে গর্ত আছে। যেমন ঘোড়া ছুটাইয়া আসিবে, অমনি গর্তে পড়িয়া ঘোড়ার পা খোঁড়া হইয়া গেল। তারপর তাহারা আর এপারে আসিবার চেষ্টা করে নাই।

চিত্রসেন রাজার মাণিক্যচন্দ্র নামে একজন মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহার বাড়িও গুপ্তিপাড়ায় ছিল। কারণ, প্রেম-ভক্তি দেবী যখন চিত্রসেন রাজাকে স্বপ্নে নানা তীর্থ দেখাইয়া তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করেন, তখন তিনি গুপ্তিপাড়ার উপর হইতে মাণিক্যচন্দ্র ও বাণেশ্বর বিদ্যালংকারকে দেখাইয়া বলিয়া গিয়াছিলেন, তুমি ইহাদিগকে প্রতিপালন করিও। বড়ো

রাজার দাওয়ান হইতে হইলে যে-সকল গুণ থাকা আবশ্যক, মাণিক্যচন্দ্রের সে-সকলই ছিল। বাণেশ্বর বলিয়াছেন, তিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতি ছিলেন। তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন; নিজেও গদ্য-পদ্য লিখিতেন এবং অন্যে গদ্য-পদ্য লিখিলে তাহার গুণদোষের বিচার করিতে পারিতেন এবং তাহার রস গ্রহণ করিতে পারিতেন।

তিনি খুব যোদ্ধা ছিলেন। শত্রুপক্ষের সৈন্যসাগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাদের বিহত বিধ্বস্ত করিয়া দিতে পারিতেন। তিনি যখন ধনু হইতে বাণ ছাড়িতেন অথবা তরবারি চালাইতেন, তখন শত্রুর মুণ্ডে পৃথিবী ছাইয়া যাইত। তিনি রামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমান্— ইঁহাদের মূর্তি নির্মাণ করিয়া তিনি মন্দির দিয়াছিলেন। নীতিশাস্ত্রে তিনি সুনিপুণ ছিলেন। বর্ধমানরাজের প্রকাণ্ড জমিদারি তিনি নখদর্পণের ন্যায় দেখিতে পারিতেন। তিনি যাহার উপর সুনজর করিতেন, সে অট্টালিকায় বাস করিত, তাহার দ্বারে হাতি বাঁধা থাকিত। একজন কবি তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন—

রে বিদ্যা বিবিধাঃ কলাশ্চ সকলাঃ সঙ্গীতনৃত্যাদয়ো
রে বৈদগ্ধ্যবিলাস দেবি কবিতে ধীরাঃ কবীনাং করাঃ।
ব্রূত ব্রূত কথং কুতঃ ক্ব নু ভবেদ্বিশ্রান্তিলেশোঽদ্য বঃ
শ্রীমান্ বিজ্ঞশিরোমণিঃ ক্ষিতিতলে মাণিক্যচন্দ্রো ন চেৎ ॥[৫]

বাণেশ্বর বিদ্যালংকার মহারাজ চিত্রসেনের মৃত্যুর পর বর্ধমান ছাড়িয়া আবার কৃষ্ণনগরে আসেন এবং মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত হন। তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে পুরাণ পড়িয়া শুনাইতেন। এই সময়ে পলাশির যুদ্ধের পর ইংরাজের রাজত্ব আরম্ভ হয়। বাণেশ্বর সকল সময়েই ইংরাজদের সহায়তা করিতেন। ইংরাজেরা ধর্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা লইতে হইলে তাঁহারই কাছে লইতেন। কিন্তু অল্পদিন পরে একজন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হইল। তিনি ত্রিবেণীর জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন।[৬]

একবার কোম্পানির বহর কলিকাতা হইতে মুর্শিদাবাদ যাইতেছিল। সেদিন একটা যোগ ছিল। ত্রিবেণীর ঘাটে লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। সকলেই স্নান করিতে উৎসুক; কিন্তু কোম্পানির হুকুম হইল— বহর যতক্ষণ না চলিয়া যায়, ততক্ষণ কেহ জলে নামিতে পারিবে না।

জগন্নাথ দেখিলেন, তাহা হইলে যোগ বহিয়া যায় ; লোকের স্নান করা হয় না। তিনি অধ্যক্ষকে বলিয়া পাঠাইলেন, বহর বরং একটু পরে যাইবে। ইহাদের যোগ বহিয়া যাইতে দেওয়া উচিত নয়। অধ্যক্ষ বলিয়া পাঠাইলেন, আমরা বাণেশ্বর বিদ্যালংকারের ব্যবস্থা পাইয়াছি। তখন জগন্নাথ হুকুম দিলেন, "তোমরা সব গঙ্গায় নাব"। কাজেই বহর ঘণ্টা দুই আটকাইয়া রহিল। বাণেশ্বর মরিলে কৃষ্ণনগরের রাজার বাড়িতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের খুব প্রতিপত্তি হইয়াছিল এবং ইংরাজ কোম্পানিও তাঁহাকে খুব খাতির করিতেন।

বাণেশ্বর বলিতেছেন, কলিযুগের যখন ৪৮৪৩ বৎসর এবং শকাব্দ ১৬৬৪ অর্থাৎ খৃ. ১৭৪২, সেই সময় বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি রাজা সাহুর সৈন্যগণ বাংলায় আসিয়া পড়িল। রাজা সাহু শিবজির পৌত্র। খৃ. ১৬৮৯ সালে আরঙ্গজীব শিবজির ছেলে শম্ভুজিকে ধরিয়া ফেলেন এবং তাঁহার জিব কাটিয়া ফেলিয়া তাঁহার প্রাণনাশ করেন। সেই সময় শম্ভুজির পুত্র ছোটো শিবজিকে আপনার রঙমহলে আটক করিয়া রাখেন। শিবজির বয়স তখন অতি অল্প। আরঙ্গজীব বড়ো শিবজি ও শম্ভুজিকে চোট্টা বা চোর বলিতেন ; এই জন্য ছোটো শিবজিকে তিনি সাহু বা সাধু বলিতেন। এমনি বিধাতার বিড়ম্বনা— শিবজির পৌত্র সাহু নামেই চলিয়া গেলেন। মহারাষ্ট্র এই সময় নামে রাজা সাহুর অধীন হইলেও কাজে অনেকগুলি রাজত্ব হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথম— তাঁহার প্রধান মন্ত্রী (পন্থপ্রধান) পেশোয়া, রাজার সব ক্ষমতা নিজে গ্রাস করিয়াছিলেন এবং মালোয়ার সুবেদারি বাদশার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া সিন্ধিয়া, হোলকার ও উদোজি পোয়ারকে ভাগ করিয়া দেন। মহারাষ্ট্র রাজ্যের প্রধান সেনাপতি কুন্দেরাও ধাবাড়ে প্রায় সমস্ত গুজরাটই দখল করিয়া লন। কিন্তু পেশোয়া লড়াই করিয়া তাঁহার প্রাণ বধ করেন। বন্দোবস্ত হয় যে, গুজরাটের অর্ধেক পেশোয়ার ও অর্ধেক কুন্দেরাও ধাবাড়ের ছেলের হইবে। কুন্দেরাও-এর ছেলে তখন খুব ছোটো ; কাজেই পিলেজি গুইকোয়াড় তাঁহার অভিভাবক হইলেন। ছেলেটি অল্পদিনেই মারা গেল। পিলেজির বংশ এখনো গুজরাটের অর্ধেক ভোগ করিতেছেন। নাগপুরের ভোঁসলা রাজা সাহুর এক বংশের লোক এবং রাজা সাহুকে কিছু মানিয়াও চলিতেন। বাংলার বর্গির

হাঙ্গামা তাঁহারই কীর্তি। বাণেশ্বর বিদ্যালংকার রাজা সাহুর উপর দোষ দিলেও, নাগপুরের রাজা যে বাংলায় বর্গির হাঙ্গামার কারণ— ইহা সকলেই জানে। মহারাষ্ট্র ভাষায় ঘোড়সোয়ার সৈন্যকে বারগির বলে; সেইজন্য তাহাদের বাংলা আক্রমণকে বারগির হাঙ্গামা বলে। বাংলায় আমরা উহাদের বর্গি বলি। সুতরাং 'বারগির' কথার শেষ র-টি বাংলায় সম্বন্ধের চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

বাণেশ্বর বর্গির হাঙ্গামার কিরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার নমুনা দেওয়া যাইতেছে। লোকে বলে, সংস্কৃতে ইতিহাস নাই; আছে কিনা, তাহা এই নমুনা হইতেও বুঝা যাইবে।*

বর্গিরা দিনে শত যোজন পথ অতিক্রম করে। যাহাদের অস্ত্র নাই, যাহারা দীন— তাহাদিগকে মারিয়া ফেলে। স্ত্রী বালককেও ছাড়ে না। সমস্ত ধন হরণ করে। সাধ্বী স্ত্রীদিগকে লইয়া যায়। আর যুদ্ধ উপস্থিত হইলে চুপি চুপি দেশান্তরে পলাইয়া যায়। তাহাদের প্রধান বল— ছোটো ছোটো ঘোড়া। তাহাদের বেগ অপরিসীম।

বর্গিদের এরূপ স্বভাব-চরিত্র দেশময় রাষ্ট্র ছিল। তাহারাই আবার মিলিত হইয়া আসিয়াছে। তাহাদের রোধ করা অতি কঠিন। তাহাদের সৈন্য সাগরের মতো। এই কথা ভাবিয়া গৌড়ের প্রজারা বড়োই ব্যাকুল হইয়া পড়িল। যেহেতু তাহারা স্বভাবতই ভীরু এবং অল্পেই ভাঙিয়া পড়ে। তাহাদের মধ্যে শব্দ হইতে লাগিল— কী করা যায়, কোথায় যাওয়া যায়; কোথায় থাকা যায়, কী উপায়, কে আমাদের সহায় হইবে! হা দেবতা! তুমি এ কী অতি নিষ্ঠুর কার্য করিলে। মনে হইল, যেন অকস্মাৎ প্রকাণ্ড প্রচণ্ড বজ্রাঘাতে গণ্ডশৈল-সকল খণ্ডিত হইয়া পড়িতেছে ও তাহাতে প্রচণ্ড ঝন্‌ঝন্ শব্দ হইতেছে। বোধ হইতে লাগিল, যেন মন্দর পর্বতকে মন্থনদণ্ড করিয়া দেবাসুরে সমুদ্র মন্থন করিতেছে, মহা-সমুদ্রের মহাজলরাশি উত্তাল তরঙ্গমালা বিস্তার করিয়া এমন ভীষণ শব্দ

* শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ৩৫শ ভাগে "বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামার প্রাচীনতম বিবরণ" নামক প্রবন্ধে বাণেশ্বর লিখিত সংস্কৃত সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এবং স্যর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় প্রবাসীতে (১৩৩৮—১ম খণ্ড) "বর্গীর হাঙ্গামা" নামক প্রবন্ধে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন।

করিতেছে, তাহাতে দশ দিক পরিপূর্ণ হইয়া যাইতেছে এবং ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডের মধ্যে অন্য শব্দ গ্রহণের অবসরও দিতেছে না।

সকলেই পলায়নপর। কেহ গাড়িতে, কেহ পালকিতে, কেহ হাতিতে, কেহ ঘোড়ায়, কেহ নৌকায় পলাইতেছে। যানবাহন দিনরাত চলিতেছে। উটগুলি চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। নিয়ম নাই, শৃঙ্খলা নাই। যেন দশ দিক ছাইয়া ফেলিতেছে। পৃথিবী ও আকাশের মধ্যস্থান ভরিয়া দিতেছে। অথচ যাহারা পলাইতেছে, তাহারা দ্রুত যাইতে পারিতেছে না। তাঁহাদের ধনজন, ভার সব সঙ্গে রহিয়াছে। সুতরাং ধীরে ধীরে যাইতে হইতেছে। মহাধনীরা যখন যাইতেছেন, তাঁহাদের ঘরের যত-কিছু মূল্যবান্ বস্তু সব সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন। ব্রাহ্মণগণ যাইতেছেন– তাঁহাদের কোলে চঞ্চল বালক, গলদেশে গৃহদেবতা শালগ্রামশিলা ঝোলানো, পৃষ্ঠে সঞ্চিত নানাবিধ পুঁথির বিষম বোঝা ; দেহ এই প্রকার নানা ভারে পীড়িত, মনটিও এতদিনে সঞ্চিত পুঁথিগুলি নষ্ট হইয়া যাইবে, এই চিন্তায় সন্তপ্ত। স্ত্রীলোকেরা যাইতেছেন ; কেহ বা গর্ভভার হেতু, কেহ বা আপন দেহের গুরুত্ব হেতু মন্থরগমনা ; পথে এখানে কর্দম, ওখানে কুশাঙ্কুর, সেখানে কণ্টক– এই ভয়ে পদে পদে শিহরিয়া উঠিতেছেন, দারুণ গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে রৌদ্রের তীব্র তাপ সহ্য করিতে পারিতেছেন না, সঙ্গের ছেলেপুলেরা যথাসময়ে পানাহার না পাওয়ায় কাতরভাবে আর্তনাদ করিতেছে, তাহারা নিজেরাও ব্যাকুল হইয়াও অতি করুণভাবে রোদন ও বিলাপ করিতেছেন, তাঁহাদের মনে হইতেছে, যেন সমস্ত পৃথিবীই বর্গিপূর্ণ। এইরূপ নানাবিধ আর্তনাদ ও বিলাপে সমগ্র পৃথিবী যেন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

বর্গির হাঙ্গামায় রাঢ় দেশে বহু সম্পন্ন গৃহস্থকে দেশত্যাগ করিয়া গঙ্গার এপারে আসিয়া বাস করিতে হইয়াছিল। প্রত্যেক গ্রামেই তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া যায়। যখন স্বয়ং বর্ধমানের মহারাজাধিরাজ কাউগাছির গড়ে আসিয়াছিলেন, তখন "অন্যে পরে কা কথা"।

আমাদের কিন্তু বর্গির হাঙ্গামা লেখা উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য– বাণেশ্বর বিদ্যালংকারের জীবনচরিত লেখা। তিনি অতি সাহসী পুরুষ ছিলেন। সেকালে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা চাকরি করিতেন না, মাইনে লইতেন না, কাঁহারো হুকুমের তাঁবে থাকিতেন না। তবে কথাই আছে– "অনাশ্রিতা

ন তিষ্ঠন্তি পণ্ডিতা বণিতা লতাঃ"; সেইজন্য পণ্ডিত মহাশয়েরা একজন-না-একজনকে ধরিয়া থাকিতেন। পঠন-পাঠন তখন ব্যবসায় ছিল। যে যেমন পড়াইতে পারিত, তাহার তেমনি বিদায়-আদায় বেশি হইত। বাণেশ্বর বিদ্যালংকার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে ছাড়িয়া রাজা চিত্রসেনকে আশ্রয় করেন, আবার বর্ধমানের আশ্রয় ছাড়িয়া কৃষ্ণনগরে আসেন, আবার কৃষ্ণনগর ত্যাগ করিয়া মহারাজা নবকৃষ্ণের আশ্রয়ে আসেন এবং তাঁহার দেওয়া জমিতে কলিকাতায় বাড়ি তৈয়ারি করেন।[৭]

তিনি অতি সাত্ত্বিক নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। প্রতিদিন অরুণোদয় কালে অবগাহন স্নান করিয়া, তান্ত্রিক এবং বৈদিক সন্ধ্যা সমাপন করিয়া তিনি মন্দিরে প্রবেশ করিতেন। সেখানে সোনা ও রূপার পূজার পাত্রে নানাবিধ পূজার উপকরণ সাজানো থাকিত। পুষ্পপাত্রে বকুল, বঞ্জুল, কেতক, কেতকী, কমল, কৈরব, চম্পক, কুরুবক, বক, ফোটা মুচকুন্দ, কুন্দ, করবীর, কাঞ্চন, পলাশ, কদম্ব, কহ্লার, রক্তপদ্ম, কঙ্কেলি, মালতী, মহুয়া মাধবী, পুন্নাগ, নাগকেশর, যূথী, জাতি প্রভৃতি পুষ্প রাশি রাশি থাকিত: মন্দিরটি তাহাদের গন্ধে আমোদিত হইত। সেখানে কুঙ্কুম, মৃগনাভি, চন্দন, বেণা, গুগ্‌গুলু এবং নানা রকম ধূপের গন্ধ তাহার সহিত মিশিয়া যাইত। পাণিশঙ্খের উপর অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য সাজানো থাকিত। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণেরা ক্ষীর, ননী, দধি, চিনি, নানারূপ মোদক, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পিঠে, লাড়ু এবং তিপান্ন ব্যঞ্জন দিয়া ভোগ উপস্থিত করিয়া দিতেন। রাজা তাহা দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া দিতেন। সেই-সকল ভোজ্য বস্তু দ্বারা পরে ব্রাহ্মণ ভোজন হইত। রাজা সোনার আসনে বসিয়া, সোনার অলংকার পরিয়া, দুইখানি উত্তরীয় গ্রহণ করিয়া বৈষ্ণবমতে আচমন করিতেন। তাহার পর সামান্যার্ঘ্যস্থাপন, দ্বারদেবতা ও গুরু-পরম্পরাকে নমস্কার করিয়া ভূতশুদ্ধি করিতেন। পরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ভিতর ও বাহিরে সংহারমাতৃকান্যাস করিতেন। পরে আটত্রিশ ও পঞ্চাশ কলা কেশবাদিমাতৃকা, শ্রীকণ্ঠ, কেশব, কীর্তি প্রভৃতি ন্যাস করিয়া প্রাণায়াম করিতেন। তারপর পীঠমন্ত্র, ঋষ্যাদিমন্ত্র পড়িয়া ও সর্বাঙ্গে ছাপা দিয়া "মুদ্রারচিতমূর্ত্তিপঞ্জরকিরীটেন্দ্রিয়ব্যাপকন্যাসোধ্যাত্বা"[৮] বিশেষার্ঘ্যস্থাপন করিয়া জলের ভিতর জপ আরম্ভ করিতেন।

চন্দ্রকান্ত, সূর্যকান্ত, নূতন প্রবাল, পদ্মরেখা, গোমেদ, হীরা, সবুজমণি,

পুষ্পরাগ, নব্য ইন্দ্রনীলমণি, রূপা, মহামরকত, চিন্তামণি প্রভৃতি দিয়া মন্দিরের প্রাচীর তৈয়ারি হইয়াছে, এবং কল্পবল্লী দ্বারা কুঞ্জাবলী প্রস্তুত হইয়াছে। সেখানে তাহার তোরণ, দ্বার উজ্জ্বল এবং অদ্ভুত মহারত্ন-সমূহে প্রস্তুত। সে তোরণের মস্তক পর্যন্ত স্তরে স্তরে মুক্তার আসন বিছানো। তাহার উপর নানা মণিমাণিক্যযুক্ত কালীর মূর্তি, তাহা হইতে আলোর ছটা বাহির হইতেছে। মনে হইতেছে, যেন নূতন মেঘ হইতে বিদ্যুৎ প্রকাশ হইতেছে। দেবীমূর্তি মুক্তাময় মঞ্চের উপর স্থাপিত; তাঁহার অঙ্গে নানা রত্নাদি নির্মিত কেয়ূর, কঙ্কণ, কিরীট, হার, মঞ্জীর প্রভৃতি অলংকার। তিনি দুইখানি স্বর্ণখচিত বিচিত্র প্রভাময় বস্ত্র এবং মনের মতো সুন্দর ও স্বাদু ভোগরাগের দ্বারা দেবীকে পূজা করিলেন। তারপর পুরাণাগমপ্রোক্ত স্তোত্র পাঠের সঙ্গে সঙ্গে নূতন কবিদের রচিত এবং নিজেরও রচিত স্তোত্র পাঠ করিলেন। তারপর মন্দির হইতে নামিয়া আসিয়া দেখিলেন, শ্রীতরুর পলাশ দিয়া জ্বালানো অগ্নিতে ধূনা, চন্দন, ঘৃতযুক্ত গুগ্‌গুলু, অগুরু প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্য দেওয়ায় তাহার ধূমে চারি দিক ভরিয়া গিয়াছে। কোথাও রুদ্রাধ্যায় পাঠ হইতেছে, কোথাও ত্রিয়ম্বক-সূক্ত পাঠ হইতেছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অনবরত গঙ্গাজল ঢালিয়া শিবের স্নান হইতেছে, কোথাও নারায়ণস্তব, কোথাও রাসপঞ্চাধ্যায়ী পড়া হইতেছে, কোথাও গণেশের স্তব পড়া হইতেছে, কোথাও পুষ্পদন্ত গন্ধর্ব-রচিত মহিম্নঃস্তব পাঠ হইতেছে, কোথাও উচ্চৈঃস্বরে নীলকণ্ঠ-স্তব পাঠ হইতেছে, কোথাও শৈলীপুত্রীমাহাত্ম্য সপ্তশতী পাঠ হইতেছে। সেখানে তাঁহাদের পূর্বপুরুষপ্রতিষ্ঠিত পুরুষার্থের চরম উৎকর্ষরূপ মহা-মন্দিরের মধ্যে অবস্থিত প্রসন্নমূর্তি লিঙ্গময় মহাদেবকে প্রণাম করিয়া ও পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, গুরুর চরণে নমস্কার করিয়া গঙ্গা নামে গোরুটিকে ডাকিলেন। গঙ্গাও তাঁহার ডাক শুনিবামাত্র মহাহর্ষভরে অনেক পক্ব ফল আহারের লোভে রাজার দিকে দৌড়িয়া আসিল। কামধেনুও বুঝি কল্পবৃক্ষের কাছে এরূপ ছুটিয়া আসে না। নানারূপ ফলে গঙ্গার তৃপ্তি সাধন করিয়া, তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া, তাহার পুচ্ছ দ্বারা নিজের সমস্ত অঙ্গ মার্জনা করিয়া তাহার আরতি করিলেন। অবশেষে তাহাকে রাশিকৃত উত্তম ভোজ্য-দ্রব্য দিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে দান করিয়া, বন্ধু-বান্ধব সমেত আহার করিতে বসিলেন।

১৭৫৭ খৃস্টাব্দে পলাশির যুদ্ধের পর ইংরাজরা একরকম বাংলার মালিক হইয়া উঠিলেন। সে সময়ের কৃষ্ণনগরের রাজা ইংরাজদের একজন প্রধান সহায়। বাণেশ্বর বিদ্যালংকার কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিত। সুতরাং বাণেশ্বরও ইংরাজদের বন্ধু হইয়া দাঁড়াইলেন।

পলাশির যুদ্ধের পর ইংরাজরা দেশের কর্তা হইলেন বটে; কিন্তু আইন মতো তাঁহারা কেহই নহেন। দিল্লির বাদশাহ্ ভারতের সম্রাট; মীরজাফর[৯] বাংলার সুবেদার; রাজা দুর্লভরাম[১০] বাংলার দেওয়ান। অথচ ইংরাজ নহিলে বাংলা-বেহারের কোনো কাজই হয় না। ১৭৬৫ অব্দে এ রকম বে-আইনি অনেকটা উঠিয়া গেল। ইংরাজরা সেই বৎসর দিল্লির বাদশাহের নিকট বাংলার দেওয়ানি পাইলেন। দুর্লভরাম এবং তাঁহার বংশের দেওয়ানি লোপ হইল। কিন্তু ইংরাজরাও দেওয়ানি করিতে পারেন না; কাজেই মহম্মদ রেজা খাঁ[১১] ও রাজা সীতাবরায়কে[১২] নায়েব দেওয়ান রাখিয়া বাংলা-বেহারের কাজ চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতেও ইংরাজের মনঃপূত হইল না। ১৭৭২ অব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস গবর্নর হইয়া আসিয়া বলিলেন, আমি দাওয়ান হইয়া দাঁড়াইতে চাই। সুতরাং নায়েব দেওয়ানদের চাকরি গেল। কোম্পানি দেওয়ানি লইলেন। কিন্তু দেওয়ানি লইলে দেওয়ানি মোকদ্দমা তো করিতে হইবে। মুসলমানদের দেওয়ানি আইন ছিল, সেই মতে কাজ চলিতে লাগিল। হিন্দুদের বেলায় কী হইবে? দেওয়ান মোকদ্দমার ব্যাপারটা বুঝিয়া লইতেন, তাহার পর আইন বা ধর্ম কী, জানিবার জন্য ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা প্রশ্ন পাইয়া তাহার উত্তর লিখিয়া দিতেন ও তজ্জন্য তোলবট পাইতেন। মুসলমান আমলে এইভাবেই দেওয়ানি চলিয়া আসিত। হেস্টিংস উহা পছন্দ করিলেন না। তিনি বলিলেন, কোড চাই, সংহিতা চাই। তখন ইংরাজদের মধ্যে কেহই সংস্কৃত জানেন না; মুসলমানদের মধ্যেও অতি অল্প লোকে জানে। সুতরাং বাঙালি বন্ধুদিগের সহযোগে ওয়ারেন হেস্টিংস এগারোজন বড়ো বড়ো পণ্ডিত সংগ্রহ করিলেন।[১৩] এই এগারোজনের প্রথমেরই নাম হইতেছে— বাণেশ্বর বিদ্যালংকার। তাহার পর পশপুরের কৃপারাম, তাহার পর নবদ্বীপের জোড়াবাড়ির দুই পণ্ডিত— একজনের নাম রামগোপাল তর্কপঞ্চানন, আর-একজনের নাম

কালীকিংকর [কালীশংকর]। আর সাত জনের কোনো খবর পাওয়া যায় না। তাহার ভিতর একজন ছিলেন— তাঁহার নাম সীতারাম ভাট। ইঁহারা এগারো জনে একত্র হইয়া দেওয়ানি আদালতের বহুদিনের নজির দেখিয়া একখানি বই প্রস্তুত করিয়া দেন; সেখানির নাম— 'বিবাদার্ণবসেতু'। হেস্টিংস্ একজন সংস্কৃতজানা মৌলবিকে দিয়া উহা পারসিতে তর্জমা করাইয়া লন এবং হ্যাল্‌হেড নামক একজন ইংরাজকে দিয়া সেই পারসি হইতে ইংরাজিতে তর্জমা করাইয়া ১৭৭৬ সালে ছাপাইয়া দেন। উহার নাম হয়— হ্যাল্‌হেড্‌স জেন্টু ল।[১৪] পণ্ডিত মহাশয়েরা যতদিন এই কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, ততদিন তাঁহাদের টোল খরচের জন্য রোজ একটি করিয়া টাকা পাইতেন। কার্য শেষ হইয়া গেলেও তাঁহারা সকলেই যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন, একটি করিয়া টাকা রোজ পাইতেন। কেহ বা তাঁহাদের বাড়িতে টোল থাকা পর্যন্ত সে টাকা পাইয়াছিলেন।

এই পণ্ডিতমণ্ডলীর প্রধান ছিলেন— বাণেশ্বর বিদ্যালংকার। সুতরাং এ গ্রন্থ প্রণয়নে তাঁহাকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল এবং তিনিই যে সকলকে চালাইয়া লইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কয়েক বৎসর এই কোডই সুপ্রীম কোর্টের ভরসা ছিল। তারপর সার উইলিয়ম জোন্‌স[১৫] আসেন। তিনি নিজে সংস্কৃত জানিতেন এবং জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে দিয়া 'বিবাদভঙ্গার্ণব' নামে একটি নূতন কোড তৈয়ারি করিয়া লন।

সুতরাং বাণেশ্বর বিদ্যালংকার যে শুধুই কবিতা লিখিয়া, চম্পূ লিখিয়া বেড়াইতেন, তাহা নহে, স্মৃতিশাস্ত্রেও তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ইংরাজের হাতে হিন্দু ল-এর ব্যবস্থা দিবার ভার তুলিয়া দিবার তিনিই একজন প্রধান হেতু। এই সময় হইতেই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে নিজেদের প্রাধান্য হারাইতে লাগিলেন; ক্রমে ক্রমে এখন সব হারাইয়া বসিয়া আছেন।

বাণেশ্বর বিদ্যালংকারের নামে অনেক উদ্ভট শ্লোক চলিত আছে। উদ্ভটসাগর শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, বি এ[১৬] মহাশয়ের নিকট হইতে কয়েকটি সংগ্রহ করিয়াছি। নিচে সেগুলি তাহাদের প্রাসঙ্গিক ঘটনার সঙ্গে তুলিয়া দিলাম।

১. একবার কৃষ্ণচন্দ্র কয়েকটি পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া নৌকাযোগে

কলিকাতায় আসিতেছিলেন। ত্রিবেণীতে আসিয়া দেখেন যে, সেখানে গঙ্গায় স্রোত কমিয়া গিয়াছে। তখন বাণেশ্বরকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন—

সগরসন্ততিসন্তরণেচ্ছয়া
প্রচলিতাতিজবেন হিমাচলাৎ।
ইহ হি মান্দ্যমুপৈতি সরস্বতী-
যমুনয়োর্বিরহাদিব জাহ্নবী ॥[১৭]

২. একদিন সন্ধ্যাকালে কৃষ্ণচন্দ্র বাণেশ্বর প্রভৃতি পণ্ডিতদিগকে লইয়া ৺কালীপূজার পূর্বে ৺কালীদেবীকে দর্শন করিতে যান। কুম্ভকার সেখানে উপস্থিত ছিল। মহারাজ তাহাকে ও দেবীমূর্তিকে দেখিয়া বলিলেন— "কিমদ্ভুতম্।" তখন বাণেশ্বর বলিলেন—

শিবস্য নিন্দয়া হি যাহত্যজদ্
বপুঃ স্বকীয়কম্।
তদঙ্ঘ্রি পঙ্কজদ্বয়ং শবে শিবে কিমদ্ভুতম্ ॥[১৮]

ইহা শুনিয়া রামপ্রসাদ সেন বাণেশ্বরকে ঠকাইবার জন্য কহিলেন—

মহাযুদ্ধমধ্যে সদানন্দরূপা-
পদস্পর্শমাত্রাচ্ছবোহভূন্মহেশঃ।
শিবে পাদপদ্মং ন দত্তং কদাচি-
চ্ছবে পাদপদ্মং ন দত্তং কদাচিৎ ॥[১৯]

৩. মাঘ মাসে কৃষ্ণচন্দ্রের মাতৃশ্রাদ্ধে বড়োই ধুমধাম হইয়াছিল। দানসাগর হইবে বলিয়া হাতি ঘোড়া প্রভৃতিকে গঙ্গাস্নান করাইয়া আনা হইয়াছিল। হাতিগুলি শীতে কাঁপিতেছে দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র বাণেশ্বরকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বাণেশ্বর বলিলেন—

হস্তন্যস্তকুশোদকে ত্বয়ি ন ভূঃ সর্বংসহা কম্পতে
দেবাগারতয়ৈব কাঞ্চনগিরিশ্চিত্তে ন ধত্তে ভয়ম্।
অজ্ঞাতদ্বিপভক্ষ্যাভিক্ষুভবনপ্রস্থানদুঃস্থাশয়া
বেপন্তে মদদন্তিনো নরপতে হন্ত্যুত্তমাস্তাবকাঃ ॥[২০]

৪. বাণেশ্বর, কৃষ্ণচন্দ্রকে ত্যাগ করিয়া বর্ধমানরাজের শরণাগত হন। কিন্তু সেখান হইতে পুনর্বার কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট আসেন। কৃষ্ণচন্দ্র

দেখিবামাত্র তামাশা করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন— "আপনি কে? আপনার পরিচয় দিন।" ইহা শুনিয়া বাণেশ্বর বলিলেন—

চিন্তাচক্রে ভ্রমতি নিয়তং মন্মনোমৃত্তিকেয়ং
আর্দ্রীভূতা নয়নসলিলৈর্ভ্রাম্যতে দৈন্যদণ্ডৈঃ।
আশাকুম্ভাঃ কতি কতি কৃতাশ্ছেদিতাঃ কর্ম্মসূত্রৈ-
র্জাত্যা বিপ্রঃ পুনরহমহো কুম্ভকারোঽস্মি বৃত্ত্যা ॥[২১]

৫. একবার বাণেশ্বর, বর্ধমানের মহারাজের নিকট ছুটি লইয়া গুপ্তিপাড়ায় আসেন। বর্ধমানে ফিরিলে মহারাজ তাঁহার পারিবারিক কুশল জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কৌশলপূর্বক আপনার দারিদ্র বর্ণনা করিতেছেন—

লজ্জা মানসুতা মমাদ্য বণিতা ভিক্ষাঽপরা দৈন্যজা
তাতৈশ্বর্য্যবিগর্ব্বিতা বলবতী ভিক্ষা প্রগল্‌ভাঽভবৎ।
সালজ্জা নিহতা তয়ৈব তনয়া শোকেন মানো মৃতো
ভিক্ষা দৈন্যসুতা চিরাৎ পতিরতা নাদ্যাপি মাংমুঞ্চতি ॥[২২]

৬. বর্ধমান ত্যাগ করিয়া বাণেশ্বর কৃষ্ণনগরে যাইলে, কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার স্ত্রীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে তিনি বলিতেছেন—

ন ভালে সিন্দূরং ন চ নয়নয়োরঞ্জনরসো
ন গাত্রে স্নেহাদির্ন চ খদিররাগোঽধরোপুটে।
অবৈধব্যং কিঞ্চিৎ কথয়তি মদম্ভোরুহদৃশো-
লুঠত্যগ্রে বাহোর্বিগতকলহো লোহবলয়ঃ ॥[২৩]

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'
তৃতীয় সংখ্যা, ১৩৩৮ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-এর কার্যবিবরণীর খাতায় উল্লেখ আছে ২৭ অগ্রহায়ণ ১৩৩৮, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৩১ রবিবার অপরাহ্ণ ৫টায় নিখিলনাথ রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশনে চিন্তাহরণ চক্রবর্তী "বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার" প্রবন্ধটি পড়ে শোনান। পড়বার আগে তিনি মন্তব্য করেন, "এই প্রবন্ধটি পরিষদের জন্য লিখিত স্বর্গীয় শাস্ত্রী মহাশয়ের শেষ প্রবন্ধ"।

১৩৩৯-এর প্রথম সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে কিছু পরিপূরক তথ্য জানান। নিম্নবর্তী টীকায় অন্যান্য তথ্যের সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের তথ্যগুলি সংকলন করে দেওয়া হল।

১. লালমোহন বিদ্যানিধি শোভাকরের নিষ্কুল হওয়ার জনশ্রুতি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। দেবীবর মায়ের অনুজ্ঞায় কালীর আরাধনা করে সিদ্ধ হন, তখন তাঁর নাম হয় দেবীবর। পূর্বনাম বিলুপ্ত। ইনি বন্দ্যোবংশের শঙ্কেতের অধস্তন পঞ্চম, সর্বানন্দ ঘটক বিশারদের ছেলে, সর্বানন্দী মেল। কালীর বরে বাক্‌সিদ্ধ হয়ে দেবীবর কৌলীন্য মর্যাদা সংস্কারের জন্য ঘটক চূড়ামণিদের সভার আয়োজন করেন। সভা অনুষ্ঠানের কয়েক দিন আগে দেবীবর নাকি দৈববাণী শোনেন যে, সভার নির্ধারিত দিনে মাত্র দশদণ্ড কাল তাঁর কুলমর্যাদা দেবার অদ্বিতীয় ক্ষমতা থাকবে। শোভাকর ভট্টাচার্য লক্ষ্মণসেনের পূজিত পণ্ডিত হলায়ুধ ভট্টের বংশজাত, অতএব চট্টোপাধ্যায় বংশীয়। শোভাকর দেবীবরের মন্ত্রদাতা গুরু। দেবীবর কুলমর্যাদা দেবার সময়ে তাঁকেই শ্রেষ্ঠ কুলীন ঘোষণা করবেন আশা করে সভায় বিশেষভাবে দেবীবরের চোখে পড়ার জন্য শোভাকর আগেভাগে এক উঁচু আসনে উঠে বসে থাকলেন। বিরক্ত দেবীবরের মুখে শোভাকরের নিষ্কল হবার ঘোষণা উচ্চারিত হল। দ্র. লালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য, 'সম্বন্ধ-নির্ণয়', কলকাতা ১৩১৫, পৃ. ২৯৩-৯৮।

২. "At Bardwan in making an attempt upon the honour of Raja Krishna Rām's daughter, Shovā Sing was stabbed to death by that heroic girl, who next plunged the dagger, into her own heart."— *H-B*, Vol. II, p. 394.

৩. 'চিত্রচম্পূ' কাব্য ১৭৪৪ খৃস্টাব্দে রচিত, ১৭১৪ খৃস্টাব্দে নয়। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দের দ্বিতীয় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত "বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গামার প্রাচীনতম বিবরণ" প্রবন্ধে চিন্তাহরণ চক্রবর্তী লিখেছেন, "গুপ্তপল্লীর প্রসিদ্ধ কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার-রচিত 'চিত্রচম্পূ' নামক কাব্যগ্রন্থ ১৬৬৬ শকাব্দ বা ১৭৪৪ খৃস্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। স্পষ্টতই এই গ্রন্থ মহারাষ্ট্র পুরাণের পূর্ব্ববর্তী এবং বঙ্গে মহারাষ্ট্রাভিযানের সমসাময়িক। যেহেতু, ১৭৪২, ১৭৪৩ এবং ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দ— এই তিন বৎসর তিনবার মহারাষ্ট্রগণ বঙ্গে অভিযান করিয়াছিলেন বলিয়া জানিতে পারা যায়। চিত্রচম্পূ গ্রন্থের প্রারম্ভে প্রসঙ্গক্রমে ১৭৪৪ খৃস্টাব্দে বর্গীর উপদ্রবের এক জ্বলন্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে এই বিবরণকেই এ বিষয়ে প্রাচীনতম বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। এ কথা স্থির যে, এ বিষয়ে অন্য যে সকল বিবরণ পাওয়া যায়, তাহার কোনটীরই তারিখ এত প্রাচীন বলিয়া নির্ণীত হয় নাই। ঘটনার সমসাময়িক বলিয়া ইহার ঐতিহাসিক প্রামাণ্যও যথেষ্ট, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

"...এ গ্রন্থ এখন পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। কলিকাতা সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে এই গ্রন্থের একখানি খণ্ডিত পুথি রহিয়াছে। লণ্ডনে ইণ্ডিয়া অফিসের সুবিশাল পুস্তকাগারেও এই গ্রন্থের পুথি রহিয়াছে। বৎসরাধিককাল পূর্ব্বে সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের সংস্কৃত পুথির বিবরণ প্রস্তুত করিবার সময় এই গ্রন্থখানি পড়িতে পড়িতে ইহার মধ্যে বর্গীর উপদ্রবের বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাই।...

"বর্দ্ধমান-রাজবংশের ভূতপূর্ব্ব মহারাজ চিত্রসেনের (খৃঃ ১৭৪০-১৭৪৪) নামানুসারে গ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে 'চিত্রচম্পূ'। চিত্রসেন যেমন গ্রন্থের নায়ক— সেইরূপ তাঁহারই এক কল্পিত মৃগয়াভিযান গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়। চিত্রসেনের সভাসদ্‌রূপেই বাণেশ্বর এই গ্রন্থ রচনা করেন। কথিত আছে, মহারাজ চিত্রসেনের সহিত কোনও কারণে মনোমালিন্য হওয়ায় বাণেশ্বর কিছু দিনের জন্য বর্দ্ধমানাধিপতি চিত্রসেনের সভায় অবস্থান করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ সেই সময়ই এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।...

"গ্রন্থের প্রারম্ভে গ্রন্থের নায়ক মহারাজ চিত্রসেনের প্রজাবাৎসল্য, বীরত্ব, রাজ্যপালনে নৈপুণ্য প্রভৃতি গুণ বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গেই 'খণ্ডপ্রলয়বিধিৎসু' 'সর্ব্বসর্ব্বস্বাপহরণ-স্বেচ্ছাবিহরণ-প্রতিষিদ্ধাচরণমাত্র-নিপুণ' 'গর্ভবত্যর্ভকদেবতদ্বিজসূনুদীনদারণদারুণপণ' 'কৃপাকৃপণ' 'প্রচণ্ড-শীল' 'বর্গিবর্গ' মহাধূমকেতুর ন্যায় মহারাজ সাহুর বিপুল বাহিনীর বঙ্গে আগমন, প্রজাবর্গের ভীতি ও মহারাজ চিত্রসেন কর্তৃক তাহাদের আশ্রয়-দানের কথা বর্ণিত হইয়াছে। বর্গীদিগের অতর্কিত আগমনের সংবাদে বর্গীর অত্যাচারে রসজ্ঞ 'নিসর্গভীরু' 'গৌড়জনপদপ্রকৃতি'গণ বড়ই বিপন্ন ও ব্যাকুল হইয়া পড়ে।"

যদুনাথ সরকার প্রবাসী পত্রিকার ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় তাঁর "বর্গীর হাঙ্গামা" প্রবন্ধে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'দি হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের (১৯৭২) ২৪ অধ্যায়ে (পৃ. ৪৫৮) বাণেশ্বর বিদ্যালংকারের চিত্রচম্পূ কাব্যের উল্লেখ করেছেন।

৪. দাক্ষিণাত্যে মুঘল শাসন শিথিল হয়ে আসায় মারাঠারা মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে ৬টি সুবায় চৌথ ও সরদেশমুখি কর সংগ্রহের অধিকার আদায় করে। বালাজি বিশ্বনাথ এই সীমা ছাড়িয়ে মারাঠা জায়গির-দারদের মুঘল সাম্রাজ্যের প্রদেশগুলি থেকেও কর আদায়ের অধিকার দেন। মহারাষ্ট্রের বিপর্যস্ত আর্থিক অবস্থায় জোর করে আদায় করা এই করই ছিল আয়ের প্রধান উৎস। রঘুজি ভোঁসলের দেওয়ান ভাস্কররাম কোল্হাতকর বা ভাস্কর পণ্ডিত ১৭৪২ খৃস্টাব্দে বাংলা আক্রমণ করেন এবং নবাব আলিবর্দির কাছে চৌথ দাবি করেন। আলিবর্দি দাবি অগ্রাহ্য করায় বাংলায় মারাঠাদের পর্যায়ক্রমে আক্রমণ শুরু হয়। বাংলায় এই আক্রমণকে বর্গির হাঙ্গামা বলা হয়ে এসেছে। বারগির শব্দ বাংলায় বর্গি দাঁড়িয়েছে। নিম্নতম পদের মারাঠা সৈন্যদের বলা হত 'বারগির'। শাসনকর্তারা এদের ঘোড়া এবং অস্ত্র সরবরাহ করতেন।

৫. অনুবাদ: ওগো বিবিধ বিদ্যা, গান নাচ ইত্যাদি কলা সকল, ওগো বিদগ্ধতার বিলাস, ওগো দেবী কবিতা, (ও) কবিদের ধীর হস্ত! (তোমরা) বলো, বলো কোথায় কী করে হতে পারত এখন তোমাদের একটুকু মাত্র বিশ্রামের সুযোগ, যদি পৃথিবীতে বিজ্ঞচূড়ামণি শ্রীমান্ মাণিক্যচন্দ্র না থাকতেন।

৬. স্মৃতিশাস্ত্র ও ন্যায়শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য খ্যাত জগন্নাথ

তর্কপঞ্চানন ১৬৯৪ খৃস্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর হুগলি জেলার ত্রিবেণীতে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা রুদ্রদেব তর্কবাগীশের মৃত্যুর পর ২৪ বছর বয়সে তিনি ত্রিবেণীতে চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠা করে অধ্যাপনা শুরু করেন। অচিরকালের মধ্যে পাণ্ডিত্যের জন্য অপ্রতিহত প্রতিষ্ঠার অধিকারী হন। শোভাবাজার রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা রাজা নবকৃষ্ণের সভায় জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত রূপে গৃহীত হন। ওয়ারেন হেস্টিংস (ভারতের গবর্ণর জেনারেল, ১৭৭৪-৮৫ খৃ.) এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা হিন্দু আইন সংক্রান্ত পরামর্শের জন্য ত্রিবেণীতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের কাছে যেতেন। জগন্নাথের জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ 'বিবাদভঙ্গার্ণব' নামক গ্রন্থ রচনা (১৭৯২ খৃ.)। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি স্যর উইলিয়ম জোন্সের অনুরোধে জগন্নাথ হিন্দু-ব্যবহারশাস্ত্রের বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য সাধন করে তিন বৎসরের পরিশ্রমে আট শো পৃষ্ঠার এই গ্রন্থ রচনা করে দেন। হেনরি টমাস কোলব্রুক *A Digest of Hindu Law on Contracts and Successions* (১৭৯৮ খৃ.) নামে চারখণ্ডে 'বিবাদভঙ্গার্ণব'-এর ইংরেজি অনুবাদ করেন। ভারতীয় আদালতে দীর্ঘ দিন হিন্দু আইনের ব্যাখ্যার জন্য এই গ্রন্থ ব্যবহৃত হয়। দীর্ঘজীবী জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু হয় ১৮০৭ খৃস্টাব্দের ১৯ অক্টোবর।

৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে ২৩ মে ১৮৫৪ খৃস্টাব্দের 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকা থেকে গোরীশঙ্কর তর্কবাগীশের রচনার নিম্নবর্তী অংশ উদ্ধার করেছেন—

"শোভাবাজারীয় মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের শ্রীবৃদ্ধি কালেও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা তাঁহার সভায় বিচার করিয়া পারিতোষিক পাইতেন আমরা মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের এক খাতা দেখিয়াছি তাহাতে লিখিত আছে শঙ্কর তর্কবাগীশ, বলরাম তর্কভূষণ, মাণিক্যচন্দ্র তর্কভূষণ, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননাদি মহামহিম অধ্যাপকদিগের এক সপ্তাহ বিচারে সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর এক দিনেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে লক্ষ টাকা দিয়াছেন,...।"

৮. অনুবাদ: মুদ্রার দ্বারা কিরীট (মস্তক) থেকে পঞ্জর (দেহ) এবং ইন্দ্রিয় (হস্তপদাদি) সমেত ন্যাসের ধ্যান করে।

৯. পলাশির যুদ্ধে (১৭৫৭ খৃ.) জয়লাভের পর ইংরেজরা মীরজাফরকে বাংলার নবাব করেন। তিনি ১৭৫৭-৬০ এবং ১৭৬৩-৬৫ খৃস্টাব্দ

পর্যন্ত বাংলার নবাব ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা ছিল ইংরেজদের হাতে।

১০. সৈয়দ গোলাম হোসেন খাঁ-র 'সিয়র-উল্-মুতাখেরিন' থেকে জানা যায়, গবর্নর পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য দুর্লভরাম সন্ন্যাসী ফকিরদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকতেন এবং তাদের দ্বারাই পরিচালিত হতেন। এই সন্ন্যাসীদের অধিকাংশই ছিল রঘুজি ভোঁসলের গুপ্তচর। রঘুজি দুর্লভরামের অপদার্থতা ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ওড়িশার সীমান্তে উপস্থিত হন। শেষে দুর্লভরাম মারাঠাদের দ্বারা বন্দি হন। দ্র. "একজন বাঙালি গবর্নরের অদ্ভুত বীরত্ব", হ-র-সং-১, পৃ. ৪৮১-৮৮।

১১. মীরজাফরের মৃত্যুর (১৭৬৫ খৃ.) পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মুহম্মদ রেজা খাঁকে ডেপুটি নবাব এবং পরে ডেপুটি দেওয়ান নিযুক্ত করে। ১৭৬৯-৭০ খৃস্টাব্দে বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলেও রেজা খাঁ জোর করে খাজনা আদায় এবং এই উপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। পরে কোম্পানি নিজেই খাজনা আদায়ের ভার নেয় এবং রেজা খাঁকে সদর নিজামত আদালতে প্রধান নিযুক্ত করা হয়।

১২. ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দেওয়ানি লাভের (১৭৬৫ খৃ.) পর সীতাব রায়কে ডেপুটি নায়েব এবং বিহারের রাজস্ব আদায়কারী নিযুক্ত করে। ডিরেক্টরদের আদেশ অনুসারে হেস্টিংস তাঁকে ঐ পদ থেকে অপসারণ (১৭৭২ খৃ.) করেন। তহবিল তছরুপের দায়ে অভিযুক্ত হন ও পরে মুক্তি পান।

১৩. ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭৩ খৃস্টাব্দের মে মাসে যে এগারো জন পণ্ডিতের উপরে হিন্দু আইনের গ্রন্থ রচনার ভার দিয়েছিলেন তাঁদের নাম রামগোপাল ন্যায়ালংকার, বীরেশ্বর পঞ্চানন, কৃষ্ণজীবন ন্যায়ালংকার, বাণেশ্বর বিদ্যালংকার, কৃপারাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণচন্দ্র সার্বভৌম, গৌরীকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণকেশব তর্কালংকার, সীতারাম ভাট, কালী-শংকর বিদ্যাবাগীশ ও শ্যামসুন্দর ন্যায়সিদ্ধান্ত। দুই বৎসরের মধ্যে এঁরা 'বিবাদার্ণবসেতু' নামক গ্রন্থ প্রস্তুত করে দেন। গ্রন্থখানি প্রথমে ফারসিতে অনুবাদ করানো হয়, পরে ফারসি অনুবাদ থেকে ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হ্যাল্‌হেড ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ *A Code of Gentoo Law* নামে ১৭৭৬ খৃস্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়।

১৪. Nathaniel Brassey Halhed ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকরি নিয়ে ভারতে আসেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের পরামর্শে তিনি হিন্দু আইনের বই *A Code of Gentoo Law* অনুবাদ করেন এবং লণ্ডন থেকে ১৭৭৬ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখা 'বোধপ্রকাশং শব্দ-শাস্ত্রং বা *A Grammar of the Bengal Language*' ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে লেখা ভদ্র শৈলীর বাংলা ভাষার প্রথম সম্পূর্ণ ব্যাকরণ, হুগলিতে ১৭৭৮ খৃস্টাব্দে ছাপা হয়। ইংরেজিতে লেখা এই বইয়ে বাংলা দৃষ্টান্তগুলি খোদাই করা বাংলা হরফে ছাপা। ছাপা বাংলার এটাই প্রথম দৃষ্টান্ত।

১৫. প্রাচ্যবিদ্যাবিদ উইলিয়ম জোন্‌স ১৭৮৩ খৃস্টাব্দে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি পদে নিযুক্ত হয়ে কলকাতায় আসেন। তাঁর উদ্যোগে কলকাতায় ১৭৮৪ খৃস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটির তিনি আজীবন সভাপতি ছিলেন। কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্‌' সংস্কৃত থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। অনুবাদটির প্রকাশকাল ১৭৮৯ খৃস্টাব্দ।

রচনাবলী : *Histoire de Nader Chh* (1770) ; *A Grammar of the Persian Language* (1771) ; *Poems, consisting chiefly of translations from the Asiatick Languages* (1772); *Poeseos Asiatical Commentariorum Libri Sex* (1774) ; *The Speeches of Isaeus in causes concerning the Law of succession to property at Athens* (1778) ; *Essay on the Law of Bailments* (1781) ; *The Mahomedan Law of Succession to the Property of Intestates* (1782) ; *Hitopadesa* (1786) ; *Gita Govinda* (1786) ; *Sakuntala* (1789) ; *Institutes of Hindu Law* (1794)।

১৬. 'উদ্ভটশ্লোকমালা', 'উদ্ভটসমুদ্র', 'স্তবসমুদ্র ', 'প্রশ্নোত্তরমণিরত্নমালা', 'মোহমুদ্গর' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক পূর্ণচন্দ্র দে-র জন্মস্থান হুগলি জেলার ভদ্রকালী, জন্মকাল ১৮৫৭ খৃস্টাব্দ। আশুতোষ কলেজে অধ্যাপনা করতেন। সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোক সংগ্রহের জন্য তিনি উদ্ভট সাগর উপাধি পেয়েছিলেন। শাস্ত্রীমশায়ের সঙ্গে পূর্ণচন্দ্রর ঘনিষ্ঠতা ছিল।

১৯৪৬ খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৭. অনুবাদ : সাগরতনয়দের উদ্ধারের ইচ্ছায় অতি বেগে হিমালয় থেকে

নিঃসৃত হয়ে এখানে এসে গঙ্গা যেন সরস্বতী ও যমুনার বিরহে ক্ষীণগতি প্রাপ্ত হয়েছেন ।

১৮. অনুবাদ : শিবনিন্দার জন্য যিনি দেহত্যাগ করেছিলেন, তাঁর পদপঙ্কজ দুটি শব শিবের (বুকে) কী না অদ্ভুত (দেখাচ্ছে) ।

১৯. অনুবাদ : ঘোর যুদ্ধের মধ্যে সর্বদা আনন্দরূপিণী (দেবীর) পদস্পর্শ পাওয়া মাত্রই মহেশ্বর শব হয়ে গেলেন । শিবের গায়ে (দেবী) কখনো পা দেন নি, শবের গায়েও তিনি কখনো পা ঠেকান নি ।

২০. অনুবাদ : (দান করাবার উদ্দেশ্যে) তুমি যখন হাতে কুশ ও জল নাও তখন সর্বংসহা পৃথিবী কেঁপে ওঠে না । দেবতার মন্দির বলে কাঞ্চনাগার মনে ভয় জাগায় না । হাতি যা কখনো জানে না এমন খাদ্য পাবার আশায় ভিক্ষুর ভবনে যাত্রা করবার ভয়ে তোমার অতি উত্তম মদস্রাবী দাঁতালো হাতিগুলি, হে রাজা (ঠক্ ঠক্ করে) কাঁপে । (কৃপণ রাজার নিন্দা) ।

২১. অনুবাদ : আমার এই মন-মাটি সর্বদা ঘুরছে চিন্তা-চাকায় । চোখের জলে নরম হয়ে (সে মাটি) দারিদ্র-দণ্ডের দ্বারা ঘোরানো হচ্ছে । আশা-কলসি যা-কিছু তৈরি হয় তা কর্মসূত্রে ভেঙে যায় । জাতিতে বামুন আমি, কিন্তু হায়, বৃত্তিতে কুমোর হয়েছি ।

২২. অনুবাদ : মানের কন্যা লজ্জা আজ আমার পত্নী ; আর-এক (পত্নী) হল দৈন্য থেকে উৎপন্ন ভিক্ষা । পিতার ঐশ্বর্যে অতিশয় গর্ব বোধ করে প্রবল হয়ে ভিক্ষা সুয়ো হয়েছে । সে-ই লজ্জাকে মেরে ফেললে । কন্যার শোকে মানও মরে গেল । তারপর থেকে দৈন্যের কন্যা ভিক্ষা, পতিব্রতা (পত্নী), আজও আমাকে ছাড়ছে না ।

২৩. অনুবাদ : না আছে কপালে সিঁদুর, না আছে চোখ দুটিতে কাজল । গায়ে তেলের সম্পর্ক নেই । ঠোঁটেও নেই খয়েরের রঙ । (তবে) আমি যে বিধবা নই সে কোনো রকমে জানাচ্ছে আমার মৃণালবাহুর প্রান্তে কলহবিহীন (মানে চুড়িটুড়ি কিছু না থাকায় নিঃশব্দ) লেগে থাকা লোহার বালাটি ।

রাম মাণিক্য বিদ্যালংকার

বরিশাল জেলায় কলশকাঠি নামে একখানি গণ্ডগ্রাম আছে। তথাকার রায় মহাশয়েরা রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ভঙ্গ। তাঁহারা অনেক পুরুষ ধরিয়া কলশকাঠিতে কুলীন ব্রাহ্মণ বাস করাইতেছেন। প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে মুকুন্দরাম নামে এক ব্রাহ্মণ রায় মহাশয়দিগের আশ্রয়ে তথায় বাস করেন। তাঁহার বংশ বিস্তৃত না হইলেও অনেক পণ্ডিত এ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। মুকুন্দরামের পৌত্র রামমাণিক্য ১৭৮০ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে জন্মান। তাঁহার আর ভাই বা ভগিনী ছিল না। সুতরাং, তিনি বাপ-মার খুব আদরের ছেলে ছিলেন। তিনি বাড়িতেই ব্যাকরণাদি বালশাস্ত্র পড়েন এবং ন্যায়শাস্ত্রের কিছুদূর পড়িয়া, নৈহাটিতে

মাণিক্যচন্দ্র তর্কভূষণ ভট্টাচার্যের[১] নিকট আসিয়া ব্যাপ্তিখণ্ড ও শব্দখণ্ড অধ্যয়ন করেন। এখানে তাঁহার এক সহাধ্যায়ী জুটিয়া যায়। তাঁহার নাম শ্রীনাথ।[২] তিনি তর্কভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের দ্বিতীয় পক্ষের মধ্যম পুত্র। দু জনেই খুব বুদ্ধিমান্ এবং খুব উৎশাহশালী ছাত্র ছিলেন। দু জনের খুব ভাবও ছিল। এমন-কি দু জনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, একজনের ছেলে ও একজনের মেয়ে হইলে তাহাদের বিবাহ সূত্রে বদ্ধ করিয়া দু জনে বৈবাহিক হইবেন।

মাণিক্যচন্দ্র তর্কভূষণের তখন খুব নাম। স্যর উইলিয়ম জোন্সের[৩] বিচারালয়ে তাঁহার কয়েকটি ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ায় তাঁহার নাম খুব পড়িয়া গিয়াছিল। তাঁহার অনেক ছাত্র ছিল, একটা টোলে ধরিত না। তাঁহাকে দুইটা টোল করিতে হইয়াছিল। মেদিনীপুর, হুগলি, ২৪ পরগনা, যশোর, ফরিদপুর, বরিশাল এমন-কি, বিক্রমপুর হইতেও ছাত্র আসিয়া তাঁহার টোলে পড়িতেন। ক্রমে শ্রীনাথ ও রামমাণিক্য পাঠ শেষ করিলেন। সেকালে অনেকে দ্বিতীয়াদি ব্যুৎপত্তিবাদ ও 'কুসুমাঞ্জলি' পড়িয়া পাঠ সমাপন করিত। ইঁহারা পাঠ সমাপন করিয়া একজন তর্কালংকার ও আর-একজন বিদ্যালংকার উপাধি পাইলেন। উপাধি দিবার সময় অধ্যাপকই উপাধি দিতেন। কিন্তু ছাত্রদিগকে নিজ ব্যয়ে সমাজের সমস্ত পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করিতে হইত। তাঁহাদিগকে খৈ দৈয়ের ফলাহার দিতে হইত ও কিছু কিছু বিদায়ও দিতে হইত। এই-সকল পণ্ডিতেরা ঐ ছাত্রদের নাম নিজ নিজ তালিকা-ভুক্ত করিয়া লইতেন এবং কর্ম উপস্থিত হইলে তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বিদায় দিতেন।

উপাধি পাইয়াই দু বন্ধু বাড়ি হইতে পলায়ন করিলেন। কোথায় গেল, কোথায় গেল, কেহ স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য সন্দেহ করিলেন— তাহারা মুর্শিদাবাদে গিয়াছে। সেকালে বড়ো বড়ো নৈয়ায়িকদের বিচারের এক-একটা পদ্ধতি ছিল, যে-কোনোরূপ আপত্তি অর্থাৎ ফাঁকি হউক না কেন তাহার উত্তর দিবার এক-একটা প্রণালী ছিল, নৈহাটির প্রণালী খুব প্রসিদ্ধ ছিল। যে পুথিতে এই পদ্ধতি বা প্রণালী লেখা হইত, তাহার নাম পাতড়া, পেঁতে বা ক্রোড় পত্র ছিল। ভট্টাচার্য মহাশয় ভাবিলেন, আমার দুই ছাত্র আমাদের সব পাতড়া দুরস্ত

করিয়া, কৃষ্ণকিংকরের পাতড়া শিখিবার জন্য মুর্শিদাবাদে গিয়াছে। তিনি ইহাতে চটিলেন। কারণ, কোনো ভট্টাচার্যই ছাত্র ভিন্ন আর-কাহাকেও আপন ঘরের পাতড়া দেখিতে দিতেন না। যক্ষের ধনের মতো সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। আমার ছাত্র যদি আমার পাতড়া শিখিয়া অন্যের পাতড়া শেখে, সে তো উৎপাত ঘটাইতে পারে— এই ভাবিয়া তিনি উহাদের উপর চটিলেন। ফলিলও তাই। বছর খানেকে তাঁরা দুই বন্ধু যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহারা যে মুর্শিদাবাদ গিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণকিংকরের পাতড়া অভ্যস্ত করাই যে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সেটা প্রকাশ হইয়া পড়িল। বাবা বড়োই চটিয়া গেলেন। ছেলেকে বলিলেন, তুমিই এখন টোল করো, আমি আর টোলে যাব না। রামমাণিক্য বিদায় হইয়া দেশে গেলেন।

শ্রীনাথ তর্কালংকারের অদৃষ্ট বড়ো খারাপ। এইসব ব্যাপারের ছয় মাসের মধ্যে বর্ধমানের রানী (যে প্রতাপচাঁদ[৪] পরে জাল হইয়া-ছিলেন তাঁহার মা) তুলাপুরুষ দান[৫] করিবেন কালনায়— তাঁহাদের গঙ্গাবাসের বাড়িতে। তর্কভূষণের পত্র আসিল ; তিনি গেলেন না, বলিলেন, "শ্রীনাথ যাক"। তিনি বাড়ি হইতে বড়ো বাহির হইতেন না। তাঁহার বয়স তখন প্রায় ১০০ হইয়াছিল। শ্রীনাথ গেলেন। অধ্যক্ষ বলিলেন, তর্কভূষণ আসেন নাই— প্রতিনিধি পাঠাইয়াছেন। তাঁহাকে চতুর্থাংশ বাদ বিদায় দেওয়া হউক। শ্রীনাথ রাজি হইলেন না। বলিলেন, আমি কি তেমনি প্রতিনিধি. আমার সঙ্গে বিচার হউক, দেখুন আমার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড়। তাহার পর বিদায়ের ব্যবস্থা করা হইবে। বিচারে তাঁহার জয় জয়কার হইল। মহারাজা সন্তুষ্ট হইয়া হুকুম দিলেন যে, তর্কভূষণের তো পূরা বিদায় দেওয়া হউক, শ্রীনাথকেও সেই খুঁটের বিদায় দেওয়া হউক। বিদায়ের প্রধান সামগ্রী এক-একটা রূপার ঘড়া। এখনকার মতো বিদায় শুধু টাকায় দেওয়া হইত না, তাহার সঙ্গে তৈজস-পত্র ও বড়ো বড়ো সিধা থাকিত। শ্রীনাথ দু প্রস্থ বিদায় লইয়া মহা-আনন্দভরে বাড়ি ফিরিলেন। তখন যে রাস্তায় ঠেঙাড়িয়ারা থাকে তাহা তাঁহার মনে পড়িল না। অন্য অন্য ভট্টাচার্য মহাশয়েরা পিছে পড়িয়া রহিলেন, তিনি ক্রোশ দুই আগাইয়া পড়িলেন। ডুমুরদহের নিকটবর্তী হইবামাত্র বাবুদের ঠেঙাড়িয়ারা তাঁহাকে বধ করিয়া তাঁহার

সমস্ত তল্পি লুটিয়া লইল। ভট্টাচার্য মহাশয়েরা একটা বটগাছের নিকট একটা পুকুর পাড়ে দেখিলেন রক্তের দাগ আর সিধার জিনিস সব ছড়াছড়ি। কী হইয়াছে বুঝিতে আর বাকি রহিল না। ক্রমে বাড়িতে সব সংবাদ পৌঁছিল। বৃদ্ধ পিতা উপযুক্ত পুত্রের অতর্কিত মৃত্যুতে ২/১ মাসের মধ্যেই দেহত্যাগ করিলেন। শ্রীনাথের স্ত্রীও পতিশোক সহ্য করিতে না পারিয়া চার বছরের একটি ছেলে রাখিয়া দেহত্যাগ করিলেন।

এদিকে রামমাণিক্য পাঠ শেষ করিয়া দেশে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার শ্বশুর একজন তালুকদার ছিলেন এবং ভদ্র ব্রাহ্মণোচিত শাস্ত্রাদিও পড়িয়াছিলেন এবং মেয়েটিকে ব্যাকরণ সাহিত্য যথেষ্ট পড়াইয়াছিলেন। তাঁহার কন্যা নারায়ণী ৩০০/৪০০ কবিতা বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত মুখে মুখে বলিতে পারিতেন। 'কলাপ' ব্যাকরণ তাঁহার খুব অভ্যস্ত ছিল, জ্যোতিষেও তাঁহার বেশ জ্ঞান ছিল। তিনি পাঁজি দেখিতে পারিতেন। সে এখনকার মতো ছাপা পাঁজি নয়। তালপাতায় শুদ্ধ অঙ্ক বসানো— এখনকার পাঁজির ডান দিকে যেটি থাকে ঐটা মাত্র। তিনি কোষ্ঠী দেখিতে পারিতেন, করকোষ্ঠীও দেখিতে পারিতেন। শ্বশুর জিদ করিতে লাগিলেন-- রামমাণিক্য, তুমি আমার এখানে টোল করো। রামমাণিক্য রাজি হইলেন না। কলশকাঠিতে টোল করিলেন। আবার একদিন নৌকাযোগে শ্বশুর বাড়ি গিয়া স্নানের ঘাট হইতে স্ত্রীকে চুরি করিয়া পলায়ন করিলেন। শ্বশুর পোষ্যপুত্র লইলেন। পোষ্যপুত্র লইলেও কন্যার একটা ভাগ পাওনা থাকে। নারায়ণী বা মাণিক্য তাহাও লইলেন না।

কিন্তু বেশিদিন তিনি কলশকাঠিতে থাকিতে পারিলেন না। অভয়াচরণ তর্কবাগীশ নামে আর-একজন নৈয়ায়িক সেখানে টোল করিয়াছিলেন। দু জনের সেখানে সর্বদাই ঠোকাঠুকি লাগিত। ছাত্রে ছাত্রে প্রায়ই লাগিত, অনেক সময় পণ্ডিতে পণ্ডিতেও লাগিত। জেলার লোক উত্যক্ত হইয়া উঠিল, দুই পণ্ডিতই দেশত্যাগ করিলেন। অভয়াচরণ গেলেন ঢাকায়, রামমাণিক্য আসিলেন বরাহনগরে।

কাশীপুরে তখন রামরত্ন রায় মহাশয় একজন বড়ো জমিদার। রানী ভবানীর রাজত্ব ভাঙিয়া যে দু জন বড়ো জমিদার হইয়াছিলেন,

তাঁহাদের মধ্যে রামরত্ন রায় একজন। তাঁহার ঠিকানা ছিল নড়াইল। কলিকাতার কাছে কাশীপুরেও তিনি বাড়ি করিয়াছিলেন, কেননা তখন ইংরেজ রাজা। ইংরেজের কাছে থাকা অনেক সময়ে জমিদারদের দরকার হয়। রামরত্ন রায় মহাশয় রামমাণিক্যের পরিচয় পাইয়া ও তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি ও আভিজাত্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আপনার সভা-পণ্ডিত নিযুক্ত করিলেন এবং প্রথম সুযোগেই বরাহনগর হইতে উঠাইয়া আনিয়া কাশীপুর ঘাট রোডের উপর অনেক জমিজায়গা দিয়া টোল ও বাড়ি করিয়া দিলেন। রামমাণিক্যের অনেক ছাত্র জুটিল। সাতক্ষীরার জমিদারদের গুরুবংশের অনেকেই তাঁহার ছাত্র হইল। নেপালের রাজ-গুরুও তাঁহার নিকট পুত্রকে ন্যায়শাস্ত্র শিখিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। রামমাণিক্য শ্রীনাথের ছেলের সঙ্গে আপন কন্যার বিবাহ দিয়া বাল্যবন্ধুর নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিলেন।

বিচারে রামমাণিক্যের সহিত কেহ পারিয়া উঠিত না, দুই ঘরের যত কৌশল সব তাঁহার জানা ছিল। তাহার পর তিনি দেখিলেন, শিরোমণি মূলের উপর টীকা করিয়াছেন, তাহাতে অবচ্ছেদক স্মরণই বড়ো কাজ। মূলে যেখানে বলিলেন ধূম, শিরোমণি সেখানে বলিলেন, ধূমত্বাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ যেটা কথায় ব্যক্তিমাত্র বুঝাইত, তাহাকে জাতি বুঝাইয়া দিলে। গো বলিলে গলকম্বলাদিমান্ বুঝায়, গোত্বাবচ্ছেদকা-বচ্ছিন্ন বলিলে সব গরুই বুঝাইবে। রামমাণিক্য তাহার উপরও সূক্ষ্ম বাহির করিলেন; "অবচ্ছেদকিতা" বলিয়া একটা পদার্থ স্বীকার করিলেন। অবচ্ছেদক হইতে অবচ্ছেদকিতা আরো সূক্ষ্ম ও পরিষ্কার হইল। রামমাণিক্যের অবচ্ছেদকিতার ভিতর পড়িলে কাহারো উদ্ধার ছিল না।

বহু-বৎসর এইরূপে দক্ষতা ও সম্মানের সহিত অধ্যাপনার পর রামরত্ন রায়ের সহিত তাঁহার মনান্তর ঘটিল। একদিন তিনি শুনিলেন, রামরত্ন রায় একটি ব্রাহ্মণের ছেলেকে চুনের গারদে দিয়াছেন। শুনিয়াই তিনি হায় হায় করিতে লাগিলেন এবং নিজে চুনের গারদে গিয়া ছেলেটি উদ্ধার করিয়া আনিলেন এবং তাহাকে খাওয়াইয়া কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। কলিকাতায় গেলে সেখানে জমিদারদের জোর জুলুম খাটিত না।

রামরত্ন রায় রাত্রে কাছারি করিতেন। তিনি যখন শুনিলেন ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার কয়েদি ছাড়াইয়া দিয়াছেন, তখন তিনি ভট্টাচার্য মহাশয়কে তলপ করিয়া পাঠাইলেন। ভট্টাচার্য মহাশয় ঘুমাইতেছিলেন; তিনি উপস্থিত হইলে রায় মহাশয় বলিলেন, আপনি আমার কয়েদি ছাড়িয়া দিয়াছেন কেন? তিনি বলিলেন— চক্ষের উপর ব্রহ্মহত্যা হয় আমি দেখিতে পারি না। রায় মহাশয় বলিলেন, দেখুন, শাস্ত্র সম্বন্ধে আপনি যা বলিবেন, আমরা মাথা পাতিয়া লইব, কিন্তু বিষয় কর্মে যদি আপনি হস্তক্ষেপ করেন ভালো হইবে না কিন্তু। তখন রামমাণিক্য বলিলেন, তবে ভালো না হউক, আমি এ অবস্থায় আপনার সভাপণ্ডিতি করিতে পারিব না।

এই বলিয়া রামমাণিক্য চলিয়া আসিলেন। ১৮২৪ সাল হইতে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন হইয়া অবধি রামমাণিক্য বিদ্যালংকারকে ন্যায়ের পণ্ডিত করিয়া লইয়া যাইবার অনেক বার চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু বেতন লইয়া পড়ানো— বিশেষ ম্লেচ্ছ গবর্নমেণ্টের বেতন লওয়া তাঁহার অকার্য মনে হইত। এখন তিনি বলিলেন যে, খোশামোদ অপেক্ষা পাপ ভালো, খোশামোদ করিতে গিয়া ব্রহ্মহত্যাও দেখিতে হয়, পাপে আর সেটা হয় না। এইরূপ মনের ভাব লইয়া এবং বন্ধুবান্ধবদের কাছে এই-সব কথা বলিয়া তিনি কলেজে আসিয়া নিজে কর্মপ্রার্থী হইলেন, তখন অন্য কাজ খালি ছিল না, এসিস্টাণ্ট সেক্রেটারির পদ খালি ছিল। ১৮৪৫ সালের মে মাসে তিনি ঐ পদ পান এবং ১৮৪৬ সালের বারুণীর দিন তাঁহার মৃত্যু হয়।[৬] দশ মাস মাত্র চাকরি করিয়া তিনি দেহত্যাগ করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এপ্রিল মাসে এসিস্টাণ্ট সেক্রেটারি হন।

এই পদের কার্য প্রধানত পরীক্ষা করা ও কলেজ পরিদর্শন করা। কে আসিল, কে না আসিল, কে পড়াইতেছে, কে না পড়াইতেছে। প্রশ্ন ভালো হইল কি না হইল দেখিতে হইত এবং দরকার মতো সকল শাস্ত্রেরই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করিতে হইত।

রামরত্ন রায়ের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে রামমাণিক্য বিদ্যালংকার এই কবিতাটি লিখিয়াছিলেন। অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মুখে কবিতাটি এখনো শুনা যায়—

অস্মান্ বিচিত্রবপুষঃ চিরপৃষ্ঠলগ্নান্ কস্মাদ্ বিমুঞ্চসি
বিভো যদি মুঞ্চ মুঞ্চ।

হা হন্ত কেবাবর [কেকারব] হানিরিয়ং তবৈব
গোপালমৌলিশিখরে ভবিতা স্থিতির্নঃ ॥[৭]

আর-একটি কবিতা তিনি যশোরে গিয়া তথাকার অবস্থা দেখিয়া লিখিয়াছিলেন।

রাজা কিশোরঃ সচিবঃ কিশোরঃ পুরোহিতো দম্ভময়ঃ কিশোরঃ
অহো যশোরে পরিতঃ কিশোরে কিশোরখেলাঃ পরিতঃ স্ফুরন্তি।[৮]

পুথি সংগ্রহ করা ও পুথি নকল করানো বিদ্যালংকারের বাতিক ছিল। তিনি দু জন কায়স্থকে মাহিনা দিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারা ক্রমাগত পুরাণের পুথি নকল করিত। কিন্তু তাঁহার ও তাঁহার পুত্রের মৃত্যুর পর কলিকাতার একজন বড়ো মানুষ ১৬টি টাকা দিয়া তাঁহার সমস্ত পুথি তুলিয়া লইয়া আসেন। তাহার মধ্যে তাঁহার অবচ্ছেদকিতার পুথিও ছিল।

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'
চতুর্থ সংখ্যা, ১৩৩৮ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-এর কার্যবিবরণীর খাতায় উল্লেখ আছে ১৭ আশ্বিন ১৩৩৮, ৪ অক্টোবর ১৯৩১ রবিবার অপরাহ্ণ ৬টায় জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে হেমচন্দ্র ঘোষ "রামমাণিক্য বিদ্যালংকার" প্রবন্ধ পড়ে শোনান। সভাপতি এই প্রবন্ধের জন্য শাস্ত্রীমশায়ের প্রতি পরিষদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানান।

১৩৩৯-এর চতুর্থ সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এই প্রবন্ধ সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়। এই আলোচনায় 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকার উদ্ধৃতিতে কলকাতার ধর্মসভার সঙ্গে রামমাণিক্য বিদ্যালংকারের সংস্রব বিষয়ে তথ্য আছে।

১. মাণিক্যচন্দ্র তর্কভূষণ ভট্টাচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রপিতামহ।

"রামবল্লভের তৃতীয় পুত্র মাণিক্য তর্কভূষণ অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি পলাসীর যুদ্ধের পরেই নৈহাটীতে চলিয়া আসেন।··· কুমিরাতেই [বর্তমান বাঙলাদেশ-এর অন্তর্গত খুলনা জেলায় অবস্থিত গ্রাম, ভট্টাচার্য্য-পরিবারের পূর্ব নিবাস] তাঁহার পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি ছিল।···

"নৈহাটী আসিয়াই তিনি চতুষ্পাঠী করিয়া টোলে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। খুব সম্ভবতঃ এদেশে আসিবামাত্র হালিসহরের জমিদার সাবর্ণ সন্তোষ রায় চৌধুরী ১১৬৪ সালে (খৃঃ ১৭৫৭-৮) তাঁহাকে ৬১ বিঘা ভূমি দান করেন। 'পূর্ব্ব-দেশ হইতে আসিয়া নৈহাটী গ্রামে চৌপাড়ী করিয়া অধ্যাপনা' করার কথা যথাসময়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রেরও কর্ণগোচর হইল। তিনিও ১১৬৭ সালে (খৃঃ ১৭৬০-১) মাণিক্যকে অনেকখানি ব্রহ্মোত্তর জমি নৈহাটীতে ('পরগণে হাবেলী সহর') দান করিলেন।···

"···তাঁহার এক ছাত্র পরে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার। ইনি বরিসাল কলসকাঠীবাসী। ইঁহার সহিত

মাণিক্যের পুত্র শ্রীনাথের খুব ভাব ছিল। ইনি পরে সংস্কৃত কলেজের প্রথম সহকারী সম্পাদক হন। ইঁহার কন্যা চন্দ্রমণির সহিত শ্রীনাথের পুত্র রামকমলের বিবাহ হয়।

... ...

"মাণিক্য নব্য ন্যায়ে অনেক 'পত্রিকা' (অর্থাৎ কূটপ্রশ্নের সমাধা) রচনা করিয়া গিয়াছিলেন। নৈহাটীর পত্রিকাগুলির পণ্ডিতসমাজে অত্যন্ত আদর ছিল এবং অনেকে এই গুলি আয়ত্ত করিবার জন্য টোলে পাঠ লইতে আসিত।...স্মৃতিতেও তিনি বিলক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। ...সার উইলিয়ম জোন্সের বিচারালয়ে তাঁহার কতকগুলি ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ায় তাঁহার খুব নামডাক হইয়াছিল।

... ...

"মাণিক্যের দ্বিতীয়া স্ত্রীর নাম জগদীশ্বরী। তাঁহার পাঁচ পুত্র, সদাশিব তর্কপঞ্চানন, শ্রীনাথ তর্কালঙ্কার, জয়নারায়ণ ন্যায়ভূষণ, নীলমণি ন্যায়পঞ্চানন, গোবিন্দ শিরোমণি এবং এক কন্যা ভাগীরথী।

"মাণিক্য খুব দীর্ঘায়ু ছিলেন। '১২০৫ সালেও তিনি জীবিত ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হয় সৌর ফাল্গুন মাসে। মৃত্যুর পর জগদীশ্বরী স্বামীর সহিত সহমৃতা হন।" (মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য, 'নৈহাটীর ভট্টাচার্য্য বংশ', নৈহাটি ১৩৫২, পৃ. ৮-১১)।

"Manikya later saw Warren Hastings as the Governor-General and Sir William Jones as the Chief Judge of the Supreme Court. Sir William had great regard for Manikya, and always respected his views on intricate questions of Hindu Law. Manikya died at the ripe old age of 107 years, and was said to have been living as late as 1798 A.D.

"...Manikya also was in favour of healthy social reforms, and did not follow blindly the customs that had outlived their utility and become obsolate. He himself married the daugter of one Chhaku Mallik who was not a Kulin. He had a daughter Bhagirathi by name who was given in marriage on the bank of the Ganges to Ramchandra Gangopahyaya who was a Kulin. Thus,

Manikya not only broke Kulin bonds himself but encouraged others to do it." Dr. B. Bhattacharyya, *Our Ancestry*, Baroda 1943, pp. 13-14.

২. "মাণিক্যের তৃতীয় পুত্র শ্রীনাথ তর্কালঙ্কার। ইনি একটু উদ্ধত এবং চঞ্চল প্রকৃতির ছিলেন।...

"তাঁহার এই চঞ্চল প্রকৃতিই তাঁহার কাল হইল। তিনি ঠেঙ্গাড়েদের হাতে মারা যান। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে নানা গল্প শুনিয়াছি। একটি বিবরণ ১৩৩৮ সালের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার চতুর্থ খণ্ডে রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারের জীবনীতে আছে।...

"এ বিবরণগুলি সবই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া রচিত হইয়াছে। সঠিক ব্যাপারটি সৌভাগ্যবশতঃ জানা গিয়াছে। ইনি অম্বিকা (কালনা)-তে এক শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন, তাহার পর আর ফেরেন নাই। তাঁহার সহিত মাণিক্যের' জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্রের পুত্র বৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌমও ছিলেন। বহু খোঁজ করা হয়। অবশেষে নিম্নলিখিত বিবরণটি এক পুঁথির পাতায় কেহ লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

" সন ১২১৫ সালের ১৩ শ্রাবণ বৃহস্পতিবার নৈহাটীর বাটী হইতে অম্বিকার লক্ষ্মীনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সার্ব্বভৌম তথা শ্রীল শ্রীনাথ তর্কালঙ্কার জগন্মোহন চঙ্গ মুটিয়া লইয়া যান তথা হইতে শ্রীশ্রী৺কাশী প্রস্থান করেন ইহা জ্ঞাপনার্থ লিখিয়া রাখিলাম পরে দিগড়ার শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ ন্যায়ভূষণের সহিত অগ্রদ্বীপের শ্রীযুক্ত গোপীনাথ ঠাকুর বাটীতে সন্দর্শন হইয়াছিল তাহাতে তাহার সহিত কহিয়াছিলেন আমরা ২১ টাকা নৌকা ভাড়া পাটনা পর্য্যন্তের করিয়াছি পরে তথা হইতে কাশীতে প্রস্থান করিব একথা বাটীর কাহার সহিত দেখা হইলে তাঁহারদিগের বলিবা তদনুসারে শ্রীরামপুরের নিমন্ত্রণে শ্রীসদাশিব তর্কপঞ্চাননের স্থানে কহিয়াছিলেন।'

"এই বিবরণ হইতেই বোঝা যায় যে বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই। এবং সেইজন্য এই বিবরণটি লেখা দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। বাড়ীর সকলেই ছোট (শ্রীনাথের বয়স ৩০/৩২ ছিল) অতএব সদাশিবের ন্যায় রাশ ভারি লোক যে এ বিষয়ে বেশী বাড়ীর লোকের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। সুতরাং মুখে মুখে নানা গল্প রচিত হইয়া গিয়া থাকিবে— তবে প্রত্যেক বিবরণেই কালনার উল্লেখ আছে। শ্রীনাথ দস্যু হস্তে নিহত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই — তবে তাঁহার মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছিল কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।...শ্রীনাথের পুত্র রামকমল [হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর

বাবা] পিতার মৃত্যু কালে শিশু ছিলেন। শ্রীনাথের স্ত্রীর নাম শশিমুখী।" (মঞ্জুগোপাল ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ. ১৩-১৬)।

৩. এই বইয়ের পৃ. ১৩৬ সূত্র ১৫ দ্র.

৪. প্রতাপচাঁদের জন্ম আনুমানিক ১৮২৯ খৃস্টাব্দে। বাবা তেজচন্দ্র। সম্পত্তির অধিকাব থেকে বঞ্চিত হবার আশঙ্কায় বাবার অনুমতিক্রমে বিষয়-আশয় বুঝে নেন। কিন্তু মানসিক অসুস্থতার জন্য পরিবারের সংস্রব ছেড়ে কালনায় গঙ্গাতীরে চলে যান। তাঁর মৃত্যু হয়েছে জেনে তেজচন্দ্র এক শ্যালককে পোষ্য নেন। ১৮৩২ খৃস্টাব্দে তেজচন্দ্রের মৃত্যু হলে এই পোষ্যর বাবা জমিদারি অধিকার করেন। এই সময়ে এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয় এবং সবাই এঁকে প্রতাপচাঁদ বলে চিহ্নিত করে। আদালতে এঁকে জাল প্রতাপচাঁদ প্রতিপন্ন করা হয়। প্রতাপ-চাঁদের প্রকৃত মৃত্যু হয় ১৮৫৮ খৃস্টাব্দে।

৫. কোনো পুণ্য তিথিতে; যজ্ঞ, বিবাহ বা দুঃস্বপ্ন দর্শনে তুলাদান বা তুলাপুরুষদান অনুষ্ঠান করা যায়। দাতার দেহের সমান ওজনের স্বর্ণ প্রভৃতি বস্তু দান বিধি।

৬. সংস্কৃত কলেজের নথি থেকে জানা যায় মে মাসে নয়, ২৬ জুন ১৮৪৫ খৃস্টাব্দে রামমাণিক্য বিদ্যালংকার সহকারী সম্পাদক পদে যোগ দিয়েছিলেন। সহকারী সম্পাদক পদটি সৃষ্টি হয়েছিল ১৮৩৯ খৃস্টাব্দের ১ আগস্ট তারিখে। এই পদে প্রথম নিযুক্ত হন মধুসূদন তর্কালংকার। রামমাণিক্য বিদ্যালংকারের নিয়োগ সম্পর্কে কলেজের সম্পাদক রসময় দত্তর মন্তব্য —

"...I have the honor to report that Ram-manikya Vidyalankar assumed charge, of the office of the Assistant Secretary of this Institution this day. — Russomoy Dutt Secretary, Sanskrit College, dated 26th June 1845, to the Secretary to the Council of Education."

রামমাণিক্যর মৃত্যুর তারিখ ২৬ মার্চ ১৮৪৬ খৃস্টাব্দ। সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক শিক্ষা-সংসদকে জানিয়েছিলেন —

"With regret I beg to report the death of Ram-

manikya Vidyalankar, Assistant Secretary to this Institution, on Thursday, the 26th instant.

"2. The deceased was a Pundit of very great eminence in Bengal and a worthy successor to Ramchunder Vidyabageesha ... (28th March 1846.)" দ্র. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড, কলকাতা ১৯৪৮, পৃ. ৪৫-৪৭।

৭. অনুবাদ : বিচিত্র রঙধারী আমরা (তোমার) পিঠে চিরকাল লগ্ন আছি। হে প্রভু, কেন আমাদের পরিত্যাগ করছ ? (যদি) পরিত্যাগ করতে চাও (তবে) কর।

হায় হায়, হে কেকাধ্বনিকারী (ময়ূর) শ্রেষ্ঠ, সে ক্ষতি তোমারই (হবে)। আমাদের স্থান হবে গোপালের মাথার চূড়ার উপরে।

৮. অনুবাদ : রাজা কিশোর, মন্ত্রী কিশোর, পুরোহিত দাম্ভিক কিশোর। আহা, কিশোর ছড়ানো যশোরে চার দিকেই কৈশোর লীলা দেখা যাচ্ছে।

পুরুষোত্তম দেব

বাংলায় বৌদ্ধদের মধ্যে অনেক বড়ো বড়ো শাব্দিক জন্মিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে পুরুষোত্তমদেব একজন। পুরুষোত্তমদেবের একজন টীকাকার সৃষ্টিধর, ইংরেজি ১৭ শতকে বলিয়াছেন যে, লক্ষ্মণসেনের[১] দরকার হয় যে, পাণিনির বৈদিক প্রক্রিয়া ছাঁটিয়া একখানি ব্যাকরণ লেখেন। হিন্দুর মধ্যে আর-কাহাকেও পাওয়া যায় নাই, তাই বৌদ্ধ পুরুষোত্তমদেবকে এই কার্যে নিযুক্ত করা হয়। তিনি বৈদিক অংশ ছাঁটিয়া 'ভাষাবৃত্তি' নামে এক ব্যাকরণ লেখেন এবং তাহার বৌদ্ধমতে উদাহরণ ইত্যাদি দেন। আমরা যতদূর জানি, এ কথাটি ঠিক নয়। সৃষ্টিধর অনেক পরের লোক; তিনি নিজের মাথা হইতে বোধ হয় এ

কথাটি লিখিয়াছেন। লক্ষ্মণসেন ১১৬৯ সালে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর রাজা হন। তখন তাঁহার পিতা 'দানসাগর' নামে বই লিখাইতে-ছিলেন, শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। লক্ষ্মণসেন তাহা শেষ করেন ১১৭১ সালে। কিন্তু সর্বানন্দ বাঁড়ুজ্যে[২] ১১৫৯ সালে 'অমর-কোষে'র যে টীকা লেখেন, তাহাতে পুরুষোত্তমদেবের বই হইতে অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। সুতরাং পুরুষোত্তম তাঁহার আগের লোক। কত আগের, জানা যায় না। আমরা তাঁহাকে ১১০০ সালের বলিয়া মনে করি। ব্রাহ্মণেরা যেরূপ বৌদ্ধদ্বেষী, তাহাতে বাঁড়ুজ্যেমশাই যে তাঁহার তুল্যকালের কোনো বৌদ্ধের গ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিবেন, তাহা মনে হয় না; প্রাচীন হইলে, সেকথা স্বতন্ত্র। প্রমাণও তিনি যে দু-একটি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা নহে, অনেক। অন্যান্য বৌদ্ধ পণ্ডিতের ন্যায় পুরুষোত্তমেরও উপাধি ছিল[৪]– উপাধ্যায়; তারপর হন মহোপাধ্যায়, শেষে হন মহামহোপাধ্যায়। তিনি যে বই লিখিবার জন্য অনেক খাটিতেন, তাহার এক প্রমাণ আছে— 'হারাবলী' নামক অভিধান। এই ছোট্ট অভিধানখানি লিখিবার জন্য তিনি ১২ বৎসর খাটিয়াছিলেন। শুধু খাটা নয়, তিনি ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতের বাড়ি দু মাস ছ মাস এমন-কি, এক বৎসর পর্যন্ত বাস করিয়া আসিয়াছিলেন।

আমরা এখানে শাব্দিক বৌদ্ধ পুরুষোত্তমদেবেরই নাম করিতেছি। আর-একজন বৌদ্ধ পুরুষোত্তম ছিলেন— তিনি কাশীবাসী। তিনি অনেকগুলি বৌদ্ধদের পুরোহিতের অর্থাৎ সাধনার পুথি লিখিয়াছেন। আর-একজন পুরুষোত্তমদেব খুব পণ্ডিত ছিলেন; তিনি উড়িষ্যার রাজা। কিন্তু তিনি আমাদের পুরুষোত্তমদেবের ৪০০ বৎসর পরের।

পুরুষোত্তমদেবের প্রধান বই 'ত্রিকাণ্ডশেষ'[৩]। অমরসিংহ তাঁহার অভিধান লেখেন খৃস্টীয় ৬ শতকে। ৬ হইতে ১১ পর্যন্ত ৫০০ বৎসরে অনেক নূতন নূতন শব্দ সংস্কৃতে ঢুকিয়াছিল। সেইগুলি পুরুষোত্তমদেব তালিকা করিয়া দিয়াছেন। অভিধানে যে তিনটি কাণ্ড থাকে, তার সব কয়টি অমরসিংহের বইয়ে আছে, অর্থাৎ ১ পর্যায়, ২. নানার্থ ও ৩. লিঙ্গ; সেইজন্য উহার নাম ত্রিকাণ্ড। পুরুষোত্তমদেব উহারই পরিশিষ্ট লিখিয়াছেন, এইজন্য উহার নাম হইয়াছে 'ত্রিকাণ্ডশেষ'। 'ত্রিকাণ্ডশেষে' পুরুষোত্তম অমরের সঙ্কেত, অমরের পরিভাষা এবং অমরের

রীতি ও বর্গক্রম গ্রহণ করিয়াছেন, একটুও বদলান নাই। তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, যে-সকল শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, তাহাই তিনি 'ত্রিকাণ্ডশেষে' লইয়াছেন এবং যাহার প্রয়োগ লোপ হইয়াছে, সে-সকল শব্দ তিনি 'উৎপলিনী' প্রভৃতি অন্য অভিধানে দেখিতে বলিয়াছেন। যে শব্দ 'অমরকোষে' নাই, অথচ 'ত্রিকাণ্ডশেষে' আছে, সে-সকল শব্দ ৬০০ হইতে ১১০০ পর্যন্ত এই ৫০০ বৎসরে চলিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। 'অমরকোষে' বুদ্ধের নাম ১৭টি আছে এবং শাক্যসিংহের নাম ৭টি আছে। পুরুষোত্তমে এ ১৭ ও ৭টি ছাড়া আরো ৩৭টি ও ৪টি নাম দেওয়া আছে। বৌদ্ধধর্ম যখন খুব প্রবল, তখন ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বুদ্ধের ভিন্ন ভিন্ন নাম হইয়াছিল, তাই তাঁহার এত নাম। 'অমরকোষে' মঞ্জুশ্রী ও অবলোকিতেশ্বরের নাম নাই; ইঁহারা দুই জনেই বড়ো বড়ো বোধিসত্ত্ব। মহাযান মত খুব প্রচার হইলে ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে ইঁহাদের, আবির্ভাব হয়। পুরুষোত্তমদেব অবলোকিতেশ্বরের ২২টি নাম দিয়াছেন এবং মঞ্জুশ্রীর ২৪টি নাম দিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে ২১টি বুদ্ধশক্তির নাম দিয়াছেন। 'অমরকোষে' এ-সকলের কোনো উল্লেখ নাই। কিন্তু অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী ও বুদ্ধশক্তিদের অনেকের উপাসনার বিষয় 'সাধনমালা'য় দেওয়া আছে। যে সময় 'সাধনমালা' সংগৃহীত হয় (অর্থাৎ ১০০০-১১০০ বৎসরে), পুরুষোত্তমদেব সেই সময়েরই লোক, সুতরাং তিনি ইঁহাদের অনেকের নাম দিয়াছেন। বোম্বাই হইতে খেমরাজ শ্রীকৃষ্ণদাস যে সটীক 'ত্রিকাণ্ডশেষ' ছাপাইয়াছেন, সে টীকা-কারের নাম শীলস্কন্ধ; ইনি সিংহল দেশের একজন যতি, এখনো বর্তমান আছেন। ইনি হীনযানের লোক। আর ইঁহারা মহাযানের দেবতা, তাই তিনি বুদ্ধশক্তিদের উপদেবতা বলিয়া লিখিয়াছেন, অবলোকিতেশ্বরকে বুদ্ধবিশেষ ও মঞ্জুশ্রীকে উপাস্যদের-বিশেষ বলিয়া লিখিয়াছেন। সিংহলের বৌদ্ধেরা এই ৫০০ বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের যে পরিণতি হইয়াছিল, তাহার কিছুই খবর রাখেন নাই। সেইজন্য শীলস্কন্ধ এগুলির যথাযথ বিবরণ দিতে পারেন নাই।

পুরুষোত্তমদেব তান্ত্রিক বৌদ্ধদের অনেক দেবতার নাম করিয়াছেন—তাহার মধ্যে হেবজ্র ('হেবক্র' ছাপাইয়াছেন), হেরুক, চক্রসংবর, বজ্র-কপালী, নিসম্ব, শশিশেখর, বজ্রকীট, এই কয়টির নাম দেখা যায়।

ইঁহাদের অনেকের নামে স্বতন্ত্র তন্ত্র আছে, এবং ইঁহাদের অনেকের সাধনা আছে। হেবজ্র ও হেরুক যুগনদ্ধমূর্তি— শূন্যতা ও করুণার একত্র সম্মিলন। এই-সকল মূর্তি তান্ত্রিক বৌদ্ধদিগের শেষকালে প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল।

পুরুষোত্তমদেব যেমন বুদ্ধ বোধিসত্ত্বদের অনেক নাম দিয়াছেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণদের দেবতাদেরও অনেক নাম দিয়াছেন। অমরসিংহ ব্রহ্মার ২০টি নাম দিয়াছেন; পুরুষোত্তমদেব ১৬টি দিয়াছেন, ইহার মধ্যে ৪/৫টি নাম দু জনেই দিয়াছেন। নাম কম হওয়ায় বেশ বোধ হইতেছে যে, এই ৫০০ বৎসরের মধ্যে ব্রহ্মার উপাসনা কমিয়া আসিতেছিল। কেহ কেহ যে বলেন, ব্রহ্মার উপাসনা ছিল না; সেকথা সত্য নহে। 'পদ্মপুরাণে' ভিন্ন ভিন্ন দেশে ব্রহ্মার ১০৮টি মন্দিরের কথা উল্লেখ আছে। অমরসিংহ কিন্তু ব্রহ্মার সঙ্গে সরস্বতীর নাম দেন নাই। পুরুষোত্তমদেব ব্রহ্মার পরই বলিয়াছেন—

"* * * ব্রাহ্মী তু ব্রহ্মকন্যকা।
বাগ্দেবী শারদা শুক্লা মহাশ্বেতা সরস্বতী॥"[৪]

ইহাতে বেশ বুঝা যায়, এই পাঁচশো বৎসরে ব্রহ্মার সহিত সরস্বতীর একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছিল। অমরসিংহ ভাষাপর্য্যায়ে বলিয়াছেন—

"ব্রাহ্মী তু ভারতী ভাষা গীর্বাগ্‌বাণী সরস্বতী।
ব্যাহার উক্তির্লপিতং ভাষিতং বচনং বচঃ॥"[৫]

অর্থাৎ তখন ব্রহ্মার সঙ্গে সরস্বতীর বড়ো কোনো সম্পর্ক ছিল না। সরস্বতী ভাষার দেবতাই ছিলেন অথবা নদী ছিলেন।

বিষ্ণুর নামের তালিকা লইয়া মূল গ্রন্থ ও পরিশিষ্টে বিস্তর ভেদ। অমরসিংহ বিষ্ণুর ৩৯টি নাম দিয়াছেন, পুরুষোত্তম ৬৬। এই ৫০০ বৎসরের মধ্যে পাঞ্চরাত্র নামে এক প্রকাণ্ড সাহিত্য সৃষ্টি হইয়াছিল, পুরাণে আমরা ২৪ খানি পাঞ্চরাত্রের নাম পাই কিন্তু ডক্টর অটো ষ্রাডের সাহেব মাদ্রাজের আডেয়ার লাইব্রেরি হইতে 'অহির্বুধ্ন্য সংহিতা' নামে যে একখানি পাঞ্চরাত্রের বই ছাপাইয়াছেন, তাহার ভূমিকায় ২০০ শতেরও অধিক পাঞ্চরাত্রের পুস্তকের নাম করিয়াছেন। পাঞ্চরাত্র সমস্তই বিষ্ণু উপাসনার গ্রন্থ। এই উপাসনা তান্ত্রিক রীতিতে করা হইয়া থাকে।

'অমরকোষে'র ৩৯টি নামের বাহিরে যেসব নাম পুরুষোত্তম দিয়াছেন, তাহার অনেক পাঞ্চরাত্র হইতে আসিয়াছে, অনেক অপর অন্যান্য শাস্ত্র হইতেও আসিয়াছে। 'হরিবংশ', 'ভাগবত' হইতেও বিষ্ণুর অনেক নাম সংগ্রহ করা হইয়াছে। হরিবংশ ও ভাগবতে কৃষ্ণের অনুচরদেরও অনেক নাম সংগ্রহ আছে। পুরুষোত্তম লক্ষ্মীর যে কয়টি নাম দিয়াছেন, তাহা অমরসিংহের অপেক্ষা অনেক কম। বোধ হয়, লক্ষ্মীর উপাসনা এ সময় কিছু কম পড়িয়া গিয়াছিল।

অমরসিংহ শিবের ৪৮টি নাম দিয়াছেন। পুরুষোত্তম ৬৩টি দিয়াছেন। অমরসিংহ দুর্গার নাম দিয়াছেন ১৭টি। পুরুষোত্তম দিয়াছেন ৩৭টি। ইহাতে শৈব ও শাক্ততন্ত্রের প্রভাব প্রকাশ পাইতেছে। শৈব ও শাক্ততন্ত্রের সংখ্যা তখনো ঠিক হয় নাই। নবম ও দশক শতকে কাশ্মীরে যে শৈব দর্শন লেখা হয়, তাহাতে প্রায় ৩০ খানি শৈবতন্ত্র হইতে বচন উদ্ধার করা হইয়াছে। শুধু যে এক কাশ্মীরেই শৈব মত প্রচলিত ছিল, তাহা নহে। ভারতবর্ষের সর্বত্রই শৈব মত এই সময়ে মাথা তুলিয়া উঠে। নাকুলীশ মত, পাশুপত মত, মত্তময়ূর মত প্রভৃতি নানা মত নানা দেশে আবির্ভূত হইয়াছিল এবং তাহাতে প্রচুর তন্ত্র-সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। বড়ো বড়ো রাজারা এই-সকল শৈবাচার্যের শিষ্য হইয়াছিলেন, এবং শিব ও দুর্গার মন্দিরে দেশ ছাইয়া গিয়াছিল। প্রভাস হইতে আরম্ভ করিয়া ভুবনেশ্বর পর্যন্ত, নেপাল কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া কন্যাকুমারী পর্যন্ত বড়ো বড়ো শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শিবের পূজা দুই রকমে হইত— লিঙ্গমূর্তিতে ও বেরমূর্তিতে; কিন্তু শতকরা ৮০টি লিঙ্গমূর্তি; বেরমূর্তি ২০টি হইবে কি না সন্দেহ। অনেক জায়গায় শিবদুর্গার যুগলমূর্তি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ইন্দ্রের নাম 'অমরকোষে' ৩৫টি, পুরুষোত্তমে ২৬টি। ইহাতে বুঝা যায়, ইন্দ্রের পূজা ক্রমশই কমিয়া আসিতেছিল। কিন্তু অনেক জায়গায় শরৎকালের পূর্ণিমায় ইন্দ্রধ্বজ উঠিত এবং সেই সময় লোক খুব আনন্দে উন্মত্ত হইত। ইন্দ্রধ্বজ তোলাকে 'কৌমুদী মহোৎসব' বলিত।

ভূমিবর্গে অমরসিংহ কোনো দেশের নাম করেন নাই। ভূমি কত রকম হইতে পারে, তাহাই তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। মাটি, বালি,

পাথর, কাঁকর, কুরুই, দোআঁশ, মরু প্রভৃতি নানারূপ ভূমিরই নাম করিয়াছেন। পুরুষোত্তম সেইখানে তুরস্ক, বাহ্লীক হইতে তমলুক পূর্ববঙ্গ (বর্তনী) কামরূপ পর্যন্ত নানা দেশের নাম করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে-সকল দেশের নাম করিয়াছেন, সেগুলি ৯০০ হইতে ১০০০ পর্যন্ত স্বাধীন ছিল। বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে কোনো দেশের নাম তিনি করেন নাই।

ব্রহ্মবর্গে অমরসিংহ ব্রাহ্মণের পূজার আয়োজন, যজ্ঞের আয়োজন সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু একজনও ঋষি মুনি প্রভৃতির নাম দেন নাই; এমন-কি, চারিটি আশ্রমেরও নাম দেন নাই। কিন্তু পুরুষোত্তম ঋষি, মহর্ষি, পরমর্ষি, দেবর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, শ্রুতর্ষি, রাজর্ষি, কাণ্ডর্ষিদের পর্যন্ত নাম দিয়াছেন। কবিদিগের মধ্যে তিনি বাল্মীকির নাম দিয়াছেন, বলিয়াছেন— "বাল্মীকিঃ প্রাচেতসঃ"। কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নাম দিয়াছেন, তাঁহাকে তিনি মাঠরও বলিয়াছেন, বাদরায়ণও বলিয়াছেন ; হস্তিশাস্ত্রের কর্তা পালকাপ্যের নাম দিয়াছেন, চাণক্য বিষ্ণুগুপ্তের নাম দিয়াছেন, এবং তাঁহাকেই বাৎস্যায়ন. মল্লনাগ, পক্ষিল স্বামী বলিয়াছেন ; পাণিনি, ব্যাড়, কাত্যায়ন, পতঞ্জলি, ভর্তৃহরি প্রভৃতি বৈয়াকরণের নাম দিয়াছেন। কবির মধ্যে বাল্মীকি ও বেদব্যাস ছাড়া রঘুকার কালিদাসের নাম দিয়াছেন। বোধ হয়, মেধাবী রুদ্রেরও নাম দিয়াছেন, ভারবি ভবভূতির নাম দিয়াছেন, মাঘের নাম দেন নাই।

ক্ষত্রিয়বর্গে অমরসিংহ নীতিশাস্ত্রের শব্দ, যুদ্ধশাস্ত্রের শব্দ, অস্ত্রশাস্ত্রের শব্দ প্রভৃতির নাম দিয়াছেন ; কিন্তু কোনো রাজা-রাজড়ার নাম দেন নাই। পুরুষোত্তমদেব অত্রি হইতে চন্দ্রবংশের জনমেজয় পর্যন্ত অনেক রাজার নাম দিয়াছেন। সূর্যবংশে রাম লক্ষ্মণ পর্যন্ত নাম দিয়াছেন।

'অমরকোষ' গোধূমের নাম দিয়াছেন এবং তাহার পর্যায় দিয়াছেন— সুমনঃ ; কিন্তু পুরুষোত্তমদেব ক্ষত্রিয়বর্গে বলিয়াছেন— "গোধূমো ম্লেচ্ছ-ভোজনঃ"। গমটা সে কালে আমাদের দেশে চলিত না। এখন যেমন নবান্ন হয়, বেদের সময় সেইরূপ 'আগ্রয়ণ' হইত অর্থাৎ শস্যের আগ খাওয়া অর্থাৎ শস্যের নবান্ন খাওয়া। একটা 'আগ্রয়ণ' হইত ব্রীহি দিয়া, একটা হইত শ্যামাক দিয়া, আর-একটা হইত যব দিয়া। ব্রীহি দিয়া হইত শরতে, যব দিয়া বসন্তে, আর শ্যামাক দিয়া বর্ষায়।

পুরুষোত্তম প্রত্যেক কাণ্ডেরই প্রথমে বলিয়াছেন, 'অমরকোষে' যাহা নাই, আমি তাহাই বলিতেছি। নানার্থকাণ্ডের প্রথমে তিনি বলিতেছেন—

"স্বরকাদ্যাদিকাদ্যন্তক্রমান্নানার্থসংগ্রহম্ ।
বিহায়ামরকোষোক্তমকার্ষীৎপুরুষোত্তমঃ ॥"[৬]

নানার্থ শব্দগুলি ব্যঞ্জনান্ত-ক্রমে সাজানো হইয়াছে, যথা— কান্ত, খান্ত, গান্ত প্রভৃতি। কিন্তু তাহার ভিতরে শব্দগুলিকে স্বরাদি ও ব্যঞ্জনাদি-ক্রমে সাজানো হইয়াছে। পুরুষোত্তম বলিতেছেন— 'অমরকোষে' যে-সকল শব্দ নাই, আমি সেগুলি দিলাম। আবার লিঙ্গকাণ্ডের গোড়ায় তিনি বলিতেছেন— "লিঙ্গাদিসংগ্রহেঽনুক্তমমরেণাভিদধ্মহে"। লিঙ্গাদিসংগ্রহে অমর যাহা বলেন নাই, আমি তাহা বলিতেছি। সুতরাং দেখিতেছি, তিন কাণ্ডেই অমর যাহা বলেন নাই, পুরুষোত্তম সেইগুলি বলিয়াছেন ; সুতরাং পুরুষোত্তমের বই 'অমরকোষে'রই পরিশিষ্ট। এরূপ একখানি পরিশিষ্ট হওয়ারও দরকার হইয়াছিল। কেন-না, ১১ শতকের প্রথমার্ধে নৈষধকার শ্রীহর্ষ 'অমরকোষে'র ভীষণ সমালোচনা করিয়াছিলেন। পুথিখানি ১১ পাতা মাত্র, কিন্তু তিনি উহাতে 'অমরকোষ'কে ছকড়া-নকড়া করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 'অমরকোষে'র লিঙ্গ ভুল, পর্যায় ভুল, নানার্থ ভুল। তাই ১১ শতকের শেষে পুরুষোত্তম একখানি পরিশিষ্ট লিখিয়া অমরের মান বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

'ত্রিকাণ্ডশেষ' তো 'অমরকোষে'র পরিশিষ্ট ; ইহাতে পুরুষোত্তমকে 'অমরকোষে'র বশেই যাইতে হইয়াছে। তিনি আর-একখানি অভিধান স্বতন্ত্র লিখিয়াছেন— সেখানির নাম 'হারাবলী'। সেখানিতে ২৭৮টি বৈ শ্লোক নাই। তাহারো দুই-চারিটি শ্লোকে তাঁহার নিজের কথা আছে, নিজের পরিচয় আছে। সুতরাং ২৭২টি শ্লোক লইয়া অভিধান। এই অভিধানে যে-সকল শব্দ আগে প্রচলিত ছিল, ক্রমশ অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছিল, তাহাদেরই অর্থ দেওয়া আছে। অর্থাৎ 'অমর-কোষে'র সময় প্রচলিত যে-সকল শব্দ পুরুষোত্তমের সময় অপ্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাদেরই সংগ্রহ ইহাতে আছে। এই-সকল অপ্রযুক্ত শব্দ সংগ্রহ করা অভিধান লেখার চেয়ে একটু কঠিন কাজ ;

সুতরাং গ্রন্থকারকে বড়োই খাটিতে হইয়াছিল। অনেক পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিতে হইয়াছিল, এ শব্দের প্রয়োগ চলিবে কিনা। তাঁহার দুই ছাত্র ও বন্ধু ধৃতিসিংহ ও জনমেজয় তাঁহার খুব সাহায্য করিয়াছিলেন। এক সময়ে তিনি ধৃতিসিংহ নামক আর-একজন পণ্ডিতের বাড়িতে প্রায় একবৎসর অতিথি ছিলেন। যাঁহারাই এই পুস্তক পড়িয়াছেন, তাঁহারা এক বাক্যে স্বীকার করেন— বইখানি বড়ো ভালো এবং সংস্কৃত পাঠার্থীদের খুব উপযোগী।

পুরুষোত্তমের আর-এক কীর্তি— 'ভাষাবৃত্তি'। পাণিনির স্বরের ও বেদের সূত্রগুলি বাদ দিয়া শুধু ভাষার যে সূত্রগুলি, সেগুলির উপর লঘুবৃত্তি দিয়া 'ভাষাবৃত্তি' তৈয়ার হইয়াছে। অনেক সময় পাদকে পাদই বাদ দেওয়া হইয়াছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২য় পাদটি বৈদিক স্বরের ব্যাপার; সেটি একেবারেই নাই। স্বর্গগত শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় বইখানি ছাপাইয়াছেন। অনেক সময় বৈদিক সূত্রগুলি ত্যাগ করিয়াছেন, অনেক সময় বৈদিক সূত্রগুলি ছাপাইয়া নিচে বলিয়া দিয়াছেন— ছান্দস। স্বর-বৈদিকী বাদ যাওয়ায় বইয়ের তিন ভাগের এক ভাগ বাদ গিয়াছে। পুরুষোত্তম মঙ্গলাচরণে বলিয়াছেন—

"নমো বুদ্ধায় ভাষায়াং যথাত্রিমুনিলক্ষণম্।
পুরুষোত্তমদেবেন লঘ্বী বৃত্তির্বিধীয়তে॥"[৭]

অর্থাৎ তিনি পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি, এই তিন জনের মতে ব্যাকরণ লিখিতেছেন, কিন্তু আসলে তিনি পাণিনির বৌদ্ধটীকা 'কাশিকা' ও 'ন্যাসে'র উপরই বেশি নির্ভর করিয়াছেন।

বাংলা দেশে, বিশেষ উত্তর-বাংলায় অর্থাৎ যেখানে পাল রাজাদের প্রাদুর্ভাব খুব বেশি ছিল, সেখানে তাঁহার বই অনেক দিন চলিয়াছিল; অনেক টীকাটিপ্পনীও হইয়াছিল। এখন আর চলে না; তখন কিন্তু ভট্টোজি দীক্ষিতের বই হয় নাই। ভট্টোজি দীক্ষিতের বই হইয়া 'ভাষাবৃত্তি'র অনেক ক্ষতি করিয়াছে। বাংলায় 'ভাষাবৃত্তি' চলিলেও অনেক বড়ো বড়ো পণ্ডিত পুরা 'অষ্টাধ্যায়ী' পড়িতেন। শ্রীশবাবু বলিয়া গিয়াছেন— রায়মুকুট, শিরোমণি ভট্টাচার্য, কুল্লূকভট্ট, ইঁহারা সকলেই 'অষ্টাধ্যায়ী'তে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। পুরুষোত্তমদেব 'ভাষাবৃত্তি'তে

পাণিনির সূত্রগুলিকে খুব সহজ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু 'অষ্টাধ্যায়ী'-ক্রমব্যবস্থা বদলান নাই।

পুরুষোত্তমের প্রধান কীর্তি কিন্তু সংস্কৃতের বানান ঠিক করিয়া দেওয়া ; সেইজন্য তিনি 'বর্ণদেশনা', 'দ্বিরূপ কোষ', 'একাক্ষর কোষ' নামে একখানি অভিধান লিখিয়াছিলেন, 'বর্ণদেশনা'র ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায় ভিন্ন ভিন্ন বই বলিয়া চলিতেছে, যেমন— জকারভেদ, শকারভেদ, নকার-ভেদ ইত্যাদি। আমি এইটিকেই তাঁহার প্রধান কীর্তি বলি ; কেন-না, এ বিষয়ে বোধ হয় তিনিই প্রথম নজর দেন। সংস্কৃতের উচ্চারণ ক্রমেই বদলাইয়া যাইতেছিল। উচ্চারণভেদে ক্রমে ভাষারও ভেদ হইয়াছিল ; তাহাতে নানারূপ প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি হইয়াছিল। কিন্তু ৯ম ও ১০ম শতকে সংস্কৃতের বানানটাও প্রাকৃতের মতো হইয়া যাইতেছিল। সকলেই চান, সংস্কৃতের বানান সংস্কৃতের মতো থাকুক, প্রাকৃতের বানান প্রাকৃতের মতো হউক ; কেহই চান না— সংস্কৃতের বানান প্রাকৃতের মতো হউক। এই বানানের গোলযোগটা পূর্বাঞ্চলেই বেশি হইয়াছিল ; বিশেষ বাংলায়। বাঙালিরা 'সম্বৎ' লিখিত, 'কিম্বা' লিখিত ; কিন্তু সংস্কৃতে 'সম্বৎ' 'কিম্বা' হয় না, 'সংবৎ' 'কিংবা' হয়। আমরা 'যদু'কে 'জদু' উচ্চারণ করি, 'যদা'কে 'জদা' উচ্চারণ করি ; দুটা 'ন'র কোনো ভেদই করি না, তিনটা 'শ' যে কেন থাকে, তাহা বুঝিতেই পারি না। ক্রমে এইরূপ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরও তফাত হইয়া গেল ; সেটা বাংলায় তত বেশি হয় নাই, কিন্তু হিন্দি নেওয়ারিতে খুব হইয়াছে ; যেমন খ, ঘ, ক্ষ, তিনটাই এক রকম লিখিত, একটার জায়গায় আর-একটা লিখিত, হ ও ঘ ইচ্ছামতো লিখিত, সিংহও লিখিত, সিংঘও লিখিত।

পুরুষোত্তমদেব এই-সব গোলযোগ দেখিয়া 'বর্ণদেশনা' লিখিয়া তাহাতে বলিলেন, রাজার আদেশ যেমন মানিতেই হয়, অন্যথা করিলে চলে না ; বানানের আদেশও সেই রকম মানিতেই হইবে, অন্যথা করিলে চলিবে না। উহার কারণ জিজ্ঞাসার দরকার নাই, অনুসন্ধানেরও দরকার নাই। এই সময় হইতেই সংস্কৃত পণ্ডিতেরা যাহাতে বর্ণাশুদ্ধি না হয়, সে বিষয়ে চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; এবং সংস্কৃত ভাষা ক্রমে প্রাকৃতের প্রভাব হইতে রক্ষা হইতে লাগিল। এমন-কি, লেখারও ছাঁদ

বদলাইল। বাংলায় অনেক কাল ধরিয়া খ, ক্ষ, ষ-এ আর গোলমাল করে না, এবং সিংহীর জায়গায় সিংঘী লেখে না। মূর্ধণ্য ণ, ন, এবং তিনটা শ, দুইটি ব'রও পণ্ডিতেরা তফাত করিতে পারেন ও করেন; এই সকলের মূল পুরুষোত্তমদেব। মহেশ্বর নামে আর-একজন বৌদ্ধ পণ্ডিতও বানানের বই লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি লেখেন খৃস্টীয় ১১১১ সালে। পুরুষোত্তমের পরে হইবারই সম্ভাবনা। পুরুষোত্তমের পরে গদসিংহ বলিয়া আর-একজন লোক বানানের বই লিখিয়া গিয়াছেন; তিনি কিন্তু পুরুষোত্তমেরই পদানুসরণ করিয়াছেন।

'দ্বিরূপকোষ' মানে— যে-সকল শব্দের দুই রূপ বানান হইতে পারে, তাহাদের সংগ্রহ। যেমন— কোশল, কোসল; শস্য, সস্য; বশিষ্ঠ, বসিষ্ঠ ইত্যাদি। এইরূপ সংগ্রহে পুরুষোত্তমের কৃতিত্ব 'হারাবলী' অভিধানে খুব প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি অনেক খুঁজিয়া কোথায় কোথায় দুই রূপ চলিতে পারে, আর কোথায় পারে না, তাহা স্থির করিয়াছিলেন।

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'
প্রথম সংখ্যা ১৩৩৯ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য।

১. সূত্র

"বৃহস্পতি রায়মুকুট" প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক তথ্য অংশের সূচনা দ্র.

নেপাল থেকে পুরুষোত্তমের এক প্রাকৃত ব্যাকরণের পুরানো পুথি খণ্ডিতভাবে পাওয়া গেছে। ইনিই শাস্ত্রীমশায়ের উক্ত পুরুষোত্তমদেব কিনা তা বলবার মতো কোনো উপাদান বা উপকরণ পাওয়া যায় নি। পুথিতে প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষাগুলির যে বিস্তৃত বিবরণ মিলেছে তা আর কোথাও পাওয়া যায় নি। পুথিটি সম্পাদনা করেছিলেন পরলোকগত শ্রীমতী নিত্তি দল্‌টি। প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীসুকুমার সেন।

১. বল্লালসেনের ছেলে লক্ষ্মণসেন আনুমানিক ১১৭৯/৮০ খৃস্টাব্দে সিংহাসনে বসেন। মিন্‌হাজুদ্দিন্‌ তাঁর 'তবকাত-ই-নাসিরি' গ্রন্থে লক্ষ্মণসেনের দয়াদাক্ষিণ্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তাঁকে সমকালীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা বলেছেন। লক্ষ্মণসেন প্রায় ৬০ বছর বয়সে রাজা হন এবং প্রায় ৮০ বছর বয়স অবধি বেঁচে ছিলেন। তাঁর ঠাকুরদা এবং বাবা শৈব হলেও তিনি বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন, বিষ্ণুর নরসিংহ অবতারের ভক্ত ছিলেন। সুপণ্ডিত লক্ষ্মণসেনের সভায় জয়দেব, হলায়ুধ, শ্রীধর-দাস, ধোয়ী, শরণ, উমাপতিধর, গোবর্ধন প্রভৃতি কবি ও পণ্ডিত পরি-পোষিত হতেন। বল্লালসেনের অসম্পূর্ণ 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থ লক্ষ্মণসেন শেষ করেছিলেন বলা হয়। মিন্‌হাজুদ্দিন্‌ বখ্‌তিয়ার খল্‌জির আকস্মিক আক্রমণে লক্ষ্মণসেনের পলায়নের যে লোক-মুখে শোনা বিবরণ দিয়েছেন তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। লক্ষ্মণসেনের প্রথম রাজধানী ছিল বিক্রমপুর, দ্বিতীয় রাজধানী লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়। বখ্‌তিয়ারের আক্রমণের সময়ে সম্ভবত তিনি পরিত্যক্ত রাজধানী নবদ্বীপে বাস করছিলেন। বখ্‌তিয়ার নবদ্বীপ আক্রমণ করলে লক্ষ্মণসেন বিক্রমপুরে

চলে যান। বখ্‌তিয়ার লক্ষ্মণাবতী অধিকার করে মুহম্মদ ঘুরির নামে সোনার টাকা প্রচার করেছিলেন। এতে গৌড় বিজয়ের তারিখ আছে ১৯ রমজান ৬০১ হিজরি, খৃস্টাব্দের হিসাবে ১০ মে ১২০৫। এর কিছু পরেই লক্ষ্মণসেনের মৃত্যু হয়। দ্র. দীনেশচন্দ্র সরকার, 'পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত', কলকাতা ১৯৮২, পৃ. ১২৫-৩৩।

২. এই বইয়ের পৃ. ১১০ সূত্র ১৪ দ্র.

৩. 'ত্রিকাণ্ডশেষ' সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায় বিনয়তোষ ভট্টাচার্যকে ৩১ এপ্রিল ১৯৩১ খৃস্টাব্দে একটি চিঠিতে জানান—

"বিনয়, অনেক দিন, প্রায় মাসখানেক তোমার কোনো পত্র পাই নাই। তুমি এখন বড়ো ব্যস্ত তাহা আমি জানি। একটা খবর দিবার জন্য আজ তোমায় এই পত্র দিতেছি। তুমি বোধ হয় জানো পুরুষোত্তম-দেবের 'ত্রিকাণ্ডশেষ' নামে একখানি 'অমরকোষে'র পরিশিষ্ট আছে। অমরের পরিভাষা সংকেত ও বর্গভাগ পুরুষোত্তম লইয়াছেন। সদানন্দ [সর্বানন্দ] বাঁড়ুয্যে 'টীকাসর্ব্বস্বে' ইহা হইতে অনেক কোটেশন করিয়াছেন। সুতরাং ইনি ১১ শতকের লোক হওয়াই সম্ভব। ইহার বইতে বৌদ্ধ দেবীদের দুই ভাগ করা হইয়াছে, একভাগে যশোধরার পর্যায় শব্দ। ১ মারীচী ২ ত্রিমুখ ৩ বজ্রকালিকা ৪ বিকটা ৫ বজ্রবারাহী ৬ গৌরী ৭ পৌত্রিরথা। আবার ১ তারা ২ মহাশ্রী ৩ ওঙ্কার ৪ স্বাহাশ্রী ৫ মনোরমা ৬ তারিণী ৭ জয়া ৮ অনন্তা ৯ শিবা ১০ লোক-শ্বরাত্মজা ১১ খদূরবাসিনী ১২ খদূরবাসিনী [?] ১৩ ভদ্রা ১৪ বেশ্বালী ১৫ সরস্বতী ১৬ শংখিনী ১৭ মহাতারা ১৮ বসুধারা ১৯ ধনন্দদা ২০ ত্রিলোচনা ২১ লোচনা।

"শিবের পর দুর্গার নামও অনেক আছে। মঞ্জুশ্রীর অনেক নাম অবলোকিতেশ্বরের অনেক নাম। হেরুকের আটটি নাম ১ হেবজ্র ২ হেরুক ৩ চক্র ৪ সংবর ৫ দেব ৬ বজ্রকপালী ৭ নিশম্ভ ৮ শশিশেখর।"

৪. অনুবাদ : ব্রাহ্মী, ব্রহ্মার কন্যা, বাক্যের দেবতা, শারদা, শ্বেতবর্ণা, সর্ব-শ্বেতবর্ণা, সরস্বতী—(এইগুলি সমার্থক)।

৫. অনুবাদ : ব্রাহ্মীর সমার্থক হল ভারতী, ভাষা, গীঃ, বাক্, বাণী ও সরস্বতী।

কথাবার্তার সমার্থক হল উক্তি, লপিত, ভাষিত, বচন, বচঃ।

৬. অনুবাদ : অমরকোষের কথিত (ক্রম)-কে ত্যাগ করে পুরুষোত্তম

স্বর (বর্ণ) এবং 'ক' বর্ণ থেকে আরম্ভ করে ('হ' বর্ণ পর্যন্ত) যে শব্দক্রম, তার নানার্থ সংগ্রহ করেছেন।

৭. অনুবাদ : বুদ্ধকে নমস্কার। যেমন তিন জন ব্যাকরণের মুনি (অর্থাৎ পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি) দেখিয়েছেন তেমনি পুরুষোত্তমদেব 'লঘুবৃত্তি' রচনা করছেন।

২. অনুষঙ্গ

Descriptive Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the Collection of the Asiatic Society, Vol. VI (1931)-এর ভূমিকায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তিন জায়গায় পুরুষোত্তমদেব সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনা সংকলন করে দেওয়া হল।

"In our present catalogue there are two works which may be considered as supplements to the *Amara-koṣa*, viz., Catal. Nos. 4653 and 4655, the first is *Tri-kaṇḍa-śeṣa* by Puruṣottama-deva and the second *Muktā-valī* or *Viśva-locana* by Śri-dhara, the son of Muni-sena. *Tri-kaṇḍa-śeṣa* has been several times printed. The author like Amara was a Buddhist. Amara gives 17 names for Buddha and five for Śākya-muni but Puruṣottama adds thirty-seven more names for Buddha and three more names for Śākya-muni. During the centuries between Amara and Puruṣottama, Buddhism developed several Yānas, and the words given currency to by these Yānas, have all been given by Puruṣottama and not by Amara. At the end, Puruṣottama says that words in constant use only are recorded in this work. Obsolete and obsolescent words, though found in Paṇini and others, have been neglected. There is a MS. (No. 4654) of this work in our catalogue in which names in a string of synonyms are seperated by comas or slanting strokes. Groups of synonyms are seperated by two such strokes which serve the same purpose as semi-colons, but unfortunately the MS. is a mere fragment." (p. cxxv)

"Two most prominent men in the department of lexicography of this sub-period are undoubtedly Puruṣottamadeva, a Buddhist, and Hema-candra, a Śvetāmbara Jaina. Puruṣottama has been mentioned as the author of the Bhāsā-vṛtti in the grammar section of this preface, and his *Tri-kaṇḍa-śeṣa* has been mentioned in connection with the suppliments of the *Amara-koṣa*. He wrote another lexicon named *Hārāvali*, treating of uncommon words in 278 verses divided into two groups, one synonymous and the other homonymous. The synonymous group extend over a full verse, a half verse, and a quarter verse. The other group in three sections, half verse, quarter verse, and a single word. Puruṣottama seems to have taken very great care in writing this small work of obsolescent words. In one place he says he had to remain a guest of Dhṛti-siṃha for twelve months, and in another, he says that Janamejaya and Dhṛtī-siṃha, both helped him in writing this work and all experienced poets know how much trouble has been taken for this koṣa. It took him twelve years to write this rather very useful work. He says in verse 273, that the koṣa *Śabdārṇava* is by Vācas-pati, *Utpalinī* by Vyāḍi, and *Saṃsaravarta* by Vikramāditya. He has taken the substance of these and other works in preparing the *Hārāvali*. In this work the author salutes Maha-deva in the opening verse and names Buddha nowhere.

"Śeṣa-giri Śāstri has pointed out in page 41 of his report for 1893-94 that when writing *Tri-kāṇḍa-śeṣā*, Puruṣottama had not the title of Mahāmahopādhyāya. That title was conferred on him before the *Hārāvali* was written." (pp. cxxxvi-cxxxvii)

"*Varṇa-deśanā* (I.O. 1039) is by Puruṣottama-deva. In the preamble the author says, this work is written for

regulating the spelling and it is to be regarded as a command of the king.

"The Sanskrit alphabet is purely phonetic but with the advance of the Aryans towards the east and the admission of many non-Aryan tribes into the Aryan society, the purely phonetic character of the alphabet changed, and the change is nowhere more marked than in Eastern India, especially in Bengal. In Bengal ja (ज) and ya (य) are similarly pronounced, ba (ब) and va (व) are similarly pronounced. No distinction is made between the cerebral ṇa and dental na. The three sibilants have the same pronunciation. This is true so far as the sound reaches the ear. The form of letters in different provinces, specially in the east, also creates confusion ; kha and kṣa are often confused in writing, sometimes ṣa is written for both. Gha and ha, are often confused, ḍa and ṇḍa are scarcely distinguishable. Puruṣottama writes his *Varṇa-deśanā* to prevent all these confusions and to regulate the spelling according to the old phonetic alphabet. Maheśvara in the appendix to his *Viśva-prakāśa*, entitled *Śabda-bheda-prakāśa*, made an attempt to regulate spelling in the same direction. But Puruṣottama seems to have taken up the work in earnest. Besides his *Varṇa-deśanā*, he has written *Ekākṣara-koṣa* 4731—VI. *Sakāra-nirṇaya* 4728—III, is a spelling book designed to point out, what words have the letter śa, what words ṣa and what words sa ; what words have ṇa and what words have ja ; and from this it appears that Puruṣottama was a Bengali." (pp. cli-clii).

বৌদ্ধবিদ্যা

ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ

অবতারণা ॥

অশোক রাজার সময়ে— মৌর্যবংশের অধিকার কালে— মগধ সাম্রাজ্যের উন্নতির মুখে— খৃস্টীয় শক আরম্ভ হইবার ২/৩ শত বৎসর পূর্বে, যখন সভ্য ভারতের অধিকাংশ লোকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়— যখন বুদ্ধদেবের নাম বিশ্বামিত্র, বাদরায়ণ প্রভৃতি বেদপ্রবর্তক ঋষিদিগের নাম ঢাকিয়া ফেলে— যখন ব্রাহ্মণগণও আমাদের সর্বনাশ হইল মনে করিয়া বৌদ্ধধর্মের নব অভ্যুদয় দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হন, তখন কে ভাবিয়াছিল যে, ঐ অল্প-সংখ্যক হীনবল, বীর্যহীন, বিচার-পরাজিত ব্রাহ্মণগণই আবার ভারতবর্ষের একাধিপতি হইবেন— আবার তাঁহাদিগেরই গৌরবে

ভারত গৌরবান্বিত হইবে বোধ হয় কেহই এরূপ প্রত্যাশা করেন নাই : সকলেই ভাবিয়াছিলেন আজি হউক, কালি হউক, দশ দিন পরেই হউক, ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধদিগের পদানত হইবেন। কিন্তু তাহা হইবার নহে। বিচ্ছিন্ন ক্ষমতাশূন্য ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে একটি শক্তি ছিল। যে শক্তি থাকিলে কিছুতেই লোকের মার নাই সেই শক্তি ছিল ; যে শক্তি বলে ইহুদিরা আজিও ইহুদি আছে— গৈবিরেরা[১] আজিও গৈবির আছে— সেই শক্তি ছিল। যদি পৌরাণিক ধর্মের উৎপত্তি না হইত, যদি চীনের ন্যায় সমস্ত ভারতবর্ষ বৌদ্ধ হইত, তথাপি ব্রাহ্মণ নাম বিলুপ্ত হইত না। সে শক্তিটি স্বশ্রেণীহিতৈষিতা। এখন যেমন লোকের স্বদেশহিতৈষিতা (patriotism) বলিয়া একটি শক্তি জন্মিতেছে — তেমনি ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে তৎকালে স্বশ্রেণীর অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতির (সমস্ত দেশের বা লোকের নয়) ঐক্য এবং ক্ষমতা বজায় রাখিবার জন্য একটি প্রবৃত্তি ছিল। স্বীয় ধর্মে অটল বিশ্বাস, উচ্চতর জ্ঞানজনিত অভিমান, আমার জ্ঞান আছে এই অহংকার, ব্রাহ্মণমাত্রেরই চিরকালই আছে। এই কয়টি শক্তি ছিল বলিয়াই তাঁহারা অনেকবার অনেক বিপদে রক্ষা পাইয়াছেন। এই শক্তি ছিল বলিয়াই দুর্দমনীয় মুসলমানের অসির আঘাতেও পারস্যের ন্যায় ভারতসমাজ ছিন্ন ভিন্ন হয় নাই। এক্ষণে আমরা যে প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ করিতেছি তাহাতে বৌদ্ধের সহিত সংগ্রামে বহু-শতাব্দী পরে ব্রাহ্মণ কী উপায়ে জয়লাভ করিয়াছেন তাহাই দেখানো যাইবে।

ধর্ম প্রচারার্থ বৌদ্ধদিগের অবলম্বিত উপায়াবলী॥

আমাদের গৌরবের প্রথম সময়ে— গম্ভীর চিন্তাশীল লোকদিগের সময়ে— যখন উচ্চদরের দার্শনিক মত-সকল চারি দিকে প্রচারিত হইতেছিল, সেই সময়ে বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি। বুদ্ধদেবের অমানুষশক্তি, নিঃস্বার্থ প্রাণীহিতৈষিতা প্রভৃতি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া অনেকে তাঁহার অনুগামী হয়— তৎকালীন সামাজিক অবস্থাও উহাদের উন্নতির কারণ হয়। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী লোকগণ প্রধানত তিন দলে বিভক্ত ছিল। একদল মঠে থাকিত উঞ্ছবৃত্তি ও ভিক্ষাদ্বারা উদরপূর্তি করিত— এবং বুদ্ধত্ব লাভের জন্য ধ্যান ধারণায় রত থাকিত। ইহাদিগেরই জ্ঞানের

উন্নতি অবনতিক্রমে ভিক্ষু, অর্হৎ, বোধিসত্ত্ব নাম হইত। উচ্চ বিষয়ের মতামত আলোচনা মঠেই হইত, কোনো মত বিষয়ে সন্দেহ হইলে এইখান হইতেই তাহার মীমাংসা হইত। বড়ো বড়ো রাজারা ধর্মমত মীমাংসা করিবার জন্য এই ভিক্ষুদের লইয়া সভা করিতেন। দ্বিতীয় দল বিষয়ী লোকদিগকে ধর্মশিক্ষা দিত। তাহারা কোনো প্রকাশ্য স্থানে উপস্থিত হইয়া ধর্ম, নীতি, বিনয় প্রভৃতি শিক্ষা দিত। ইহাদিগের নাম শ্রাবক। একজন শ্রাবক শব্দের অর্থ করিয়াছেন যাহারা শুনে; কিন্তু বাস্তবিক শ্রু ধাতু ণিচ্ প্রত্যয় করিয়া শ্রাবক পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে, যাহারা শুনে তাহাদিগকে শ্রোতা বলে ও যাহারা শুনায় তাহারাই শ্রাবক।* এই শ্রাবকেরাও বিবাহাদি করিত না। তৃতীয় দল বিষয়ী লোক। ইহারা পরিশ্রম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। বৌদ্ধদিগের ইচ্ছা নয় যে, কেহ বিষয়কর্ম করে। তাহাদের চেষ্টা এই যে, লোকে চিন্তা করিয়া বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য, নির্বাণের জন্য, চেষ্টা করুক— কিন্তু তাহা হইলে জগৎ চলে না। অতএব কতক লোক সংসার লইয়া থাকুক, তাহারা শুনিয়া যেটুকু ধর্মশিক্ষা করিতে পারে করুক, এই পর্যন্ত; সুতরাং তাহারা ইতর সাধারণের ধর্ম শিক্ষার জন্য চেষ্টা করিত এবং সে চেষ্টায় অনেক লোককে আয়ত্ত করিয়াছিল। দেখ উহাদের একদল প্রচারক ছিল, একদল প্রচারকদিগের উপর তত্ত্বাবধারণ করিতে থাকিত; ধর্মোন্নতির জন্য এই দুই দলই একান্ত উদ্যোগী, ইহাতেও শীঘ্র শীঘ্র ধর্মপ্রচার হইয়া পড়িল। বৌদ্ধেরা স্ত্রীলোকদিগকেও ধর্মপ্রচার করিতে দিত এবং উহাদিগকেও মঠের মধ্যে স্থান দিত। যে ব্রাহ্মণদিগের সহিত বৌদ্ধদিগের বিবাদ তাহারা বৈদিক ক্রিয়াসক্ত; স্ত্রী ও শূদ্র, ধর্মশাস্ত্র ও বৈদিক ক্রিয়াতে একেবারে বঞ্চিত। বৈশ্যগণও বড়ো একটা যাগ-যজ্ঞাদিতে থাকিতে পারিত না। সুতরাং সাধারণ লোকের পক্ষে ব্রাহ্মণ্যধর্ম এক প্রকার বন্ধ বলিলেই হইল।

---

* কনিংহাম [Alexander Cunningham] যেরূপ বলেন যদি শ্রাবকেরা সেইরূপই ছিল, যদি তাহারা কেবল শ্রোতা অর্থাৎ বুদ্ধদিগের সর্বনিম্ন শ্রেণীর লোক ছিল এবং তাহারাই মংক যতি বা মোহন্ত হইল, তবে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সকলেই কি মোহন্ত ছিল? তবে অশোক রাজা বৌদ্ধ হইলেন কিরূপে?

ব্রাহ্মণদিগের উপায়॥

এখন নিয়ম এই যে, ইতর সাধারণ লোকে যে ধর্ম অবলম্বন করিবে সেই ধর্মেরই গর্ব অধিক। একে বৌদ্ধধর্ম রাজার ধর্ম, তাহাতে ধর্মপ্রচার জন্য লোক নিযুক্ত, তাহার উপর আবার বৌদ্ধগণ যে কেবল ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকে স্বধর্মে দীক্ষিত করিতে ইচ্ছুক এমন নহে— যে কোনো জাতীয় লোককেই উন্নত পদ প্রদানেও কাতর নহে* সুতরাং অনেক লোক ঐ ধর্মে আসিয়া পড়িল।[২] হিন্দুস্থানের পশ্চিমাংশই ব্রাহ্মণদিগের প্রধান স্থান ; ব্রাহ্মণগণ এখন আপনাদিগের ভ্রম দেখিতে পাইলেন ; তাঁহারাও সাধারণ লোকদিগকে আপনার দলে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন ; যেখানে বৌদ্ধদিগের ক্ষমতা প্রবল হয় নাই— সেইখানে যাইয়াই তাহাদিগকে স্মৃতি উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন ; অনার্যদিগের দেবতা আপন. দেবতা বলিয়া গ্রহণ করত দলবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। পূর্বে দেবতা উপাসনা বলিলে প্রায়ই পৌত্তলিকতা বুঝাইত না। জৈমিনী বেদব্যাখ্যার মীমাংসায় লিখেন তাঁহার মতে দেবতা বলিয়া কোনো জীব পদার্থ নাই কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখনকার ব্রাহ্মণেরা কার্য গতিকে সাকার উপাসক হইলেন, তাঁহাদের মত হইল "সাধকানাংহিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা"। সাধকেরা নিরাকার ব্রহ্ম বুঝিতে পারে না অতএব ঈশ্বরের রূপকল্পনা আবশ্যক।

অন্ত্যজ বর্ণ॥

অনার্যগণ যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ

---

* বুদ্ধদেবের প্রধান শিক্ষা [শিষ্য] মণ্ডলী মধ্যে রাহুল[৩] ক্ষত্রিয় ছিলেন, কশ্যপ[৪] ব্রাহ্মণ, কাত্যায়ন[৫] বৈশ্য ও উপলি[৬] শূদ্র ছিলেন। ইঁহারা সকলেই সম্প্রদায় প্রবর্তক, সকলেই বুদ্ধদেবের নিজ শিষ্য। উপলি যদিও শূদ্র তথাপি বুদ্ধদেবের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। যখন বুদ্ধদিগের প্রথম ধর্মসভা হয়, বুদ্ধ উপলির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিয়াছিলেন উপলিই বিনয়ধর্ম প্রচারের প্রকৃত উপযুক্ত পাত্র। বিনয়ধর্ম সাধারণ লোকদিগের জন্য। বুদ্ধদেব বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন শূদ্রদিগের দ্বারাই তাঁহার মত সাদরে গৃহীত হইবে এবং তাহার জন্য একজন শূদ্রই বিশেষ উপযুক্ত। উপলি ধর্মভ্রাতা কশ্যপের সমস্ত প্রশ্নে সম্যক উত্তর করিয়াছিলেন।

এই যে, প্রাচীন স্মৃতিতে আমরা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিমাত্র বর্ণের উল্লেখ পাই— কিন্তু অনেক পুরাণ এবং অন্যান্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাই যে বর্ণ পাঁচটি— এই শেষ বর্ণের নাম অন্ত্যজ বা নিষাদ। মাধবাচার্য ঋগ্বেদের টীকায় উহাদের নিষাদ নাম দিয়াছেন; অন্যান্য পুরাণে নিষাদ ও অন্ত্যজ শব্দ এক পর্যায়ক রূপে ব্যবহৃত।[৭] আমরাও আধুনিক সমাজে দেখিতে পাই একদল শূদ্রের জল ব্রাহ্মণেরা ব্যবহার করেন আর-একদল করেন না। যাহাদের জল ব্যবহার করা যায় তাহারা সৎশূদ্র যাহাদের করা যায় না তাহারা অন্ত্যজ। আহিরি গোয়ালা সৎশূদ্র, দেশী গোয়ালা অন্ত্যজ। চাষার মধ্যে সদেগাপ সৎশূদ্র, কৈবর্ত অন্ত্যজ, দুলে প্রভৃতি ছোটোলোকও এই অন্ত্যজ দলের মধ্যে।

জাত্যভিমান ॥

এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে ব্রাহ্মণেরা এত ঘৃণা করিলেও এই-সকল জাতি ব্রাহ্মণ্যধর্মে রহিল কেন? তাহার এক কারণ এই ব্রাহ্মণ্যধর্মে আসিবামাত্র উহাদের একটু জাত্যভিমান জন্মে, একজন দুলেকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলাম সেও বলিল, মুচি মুসলমান হইতে দুলে উৎকৃষ্ট জাতি; মুচি চাম কাটে, মুসলমানের ব্রাহ্মণ নাই। ব্রাহ্মণদিগের সংশ্রবে উহাদের এই জাত্যভিমানটুকু জন্মিয়াছে।

কোথায় অনার্যদীক্ষা আরম্ভ হয় ॥

অনার্যদিগের প্রথম দীক্ষা দক্ষিণ রাজবারায় হয়। দক্ষিণ রাজবারায় নিষধ বলিয়া একটি রাজত্ব ছিল। নূতন যে পঞ্চম বর্ণ পুরাণে উল্লিখিত আছে সে পঞ্চম বর্ণের নাম নিষাদ (নিষাদ ও নিষধ একই শব্দ) তাহাতে বোধ হয় প্রথম অনার্য প্রবেশ এখানেই ঘটে। দক্ষিণ রাজবারায় হিন্দুদিগের প্রধান স্থান। শিব ও শক্তির উপাসনা ব্রাহ্মণেরা এই স্থান হইতেই প্রাপ্ত হন। কারণ এখনো দেখা যায় শৈবদিগের একটি প্রধান দুর্গ রাজবারা। এইরূপে আপন ধর্মে পৌত্তলিকতা প্রবেশ করাইবামাত্র হিন্দুদিগের দল বাড়িয়া উঠিল।

ব্রাহ্মণদিগেব উৎসব ॥

অশিক্ষিত লোকদিগের পক্ষে ব্রাহ্মণ্যধর্ম যত সুবিধা বৌদ্ধ এত নহে। ব্রাহ্মণ ধর্মের বারোটি সংস্কার আছে। একটি ছেলে হইলে গর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া ছেলের বিবাহ পর্যন্ত লোকে বারবার আমোদ করিতে পারিবে এবং ঐ বারোটি সংস্কারই তাহারা সমস্ত জীবনের মধ্যে সুখের দিন বলিয়া মনে করে। বৌদ্ধদিগের এরূপ ছিল কিনা সন্দেহ। শেষ বৌদ্ধদিগের মধ্যেও পৌত্তলিকতা প্রবেশ করিয়াছিল কিন্তু সে এক বুদ্ধের উপাসনা মাত্র— হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতা দেশভেদে ভিন্ন। যে দেশের লোক যে দেবতা চায় সে সেই দেবতা উপাসনা করিতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন—

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ [গীতা, ৭.২১]

শিবভক্ত শিব উপাসনা করিল— বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণু উপাসনা করিল অথচ ব্রাহ্মণের সর্বত্র মান্য হইল। উপরি উক্ত প্রবন্ধে প্রমাণ হইবে ইতর লোককে স্বধর্মে আনয়ন করিবার জন্য বাহ্যিক যে-সকল আড়ম্বর আবশ্যক, তাহাতে বৌদ্ধ অপেক্ষা ব্রাহ্মণের সৌভাগ্য অধিক।

ভক্তিশাস্ত্র ॥

মতামত সম্বন্ধেও সাধারণ লোক মোহিত করিবার পক্ষে হিন্দুদিগের প্রাধান্য ঘটিয়া উঠিল। বৈদিক সময়ে যাগযজ্ঞ স্বর্গলাভের উপায় ছিল। বুদ্ধবিপ্লবের সময় জ্ঞানই হয় সাযুজ্য, নয় সালোক্য, না-হয় নির্বাণ লাভের একমাত্র উপায় পরিগণিত হয়। এই সময়ে ভক্তিমার্গ ব্রাহ্মণেরা উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। শাণ্ডিল্যদেব বেদ উপনিষদাদিতে নিঃশ্রেয়স্‌লাভের উপায় না দেখিয়া এই ভক্তিমার্গ প্রচার করেন। এই ভক্তি এই সময়ে হিন্দুদিগের মূলমন্ত্র হয়। ভক্তি কাহাকে বলে শাণ্ডিল্যের প্রথম সূত্র এই—

"সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।"

ঈশ্বরে অর্থাৎ যে কোনো দেবতায় পরম অনুরাগই ভক্তি— সকলের সার ভক্তি; মুক্তি তার দাসী। পুরাণ বরাবর এই দুই সুরে গাইয়াছেন, ভক্তি ও জ্ঞান। জ্ঞান শিক্ষিতদিগের জন্য, ভক্তি অশিক্ষিতের জন্য।

ভক্তিতে শুদ্ধ যে অনার্যগণ মোহিত হন এমন নহে— ভক্তিতে অনেক খাঁটি বৌদ্ধও গলিয়া দেবোপাসক হইয়াছেন। ভক্তিশাস্ত্র যে নাস্তিক্য নিবারণের প্রধান উপায়, তাহা শুদ্ধ যে আমরাই বলিতেছি এমন নহে, 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটককার[৮] তাঁহার আশ্চর্য রূপক গ্রন্থে চার্বাক, মহামোহ, বৌদ্ধ প্রভৃতি যে-সকল হিন্দুধর্মবিরোধী পাত্র প্রবেশ করাইয়াছেন, তাহাদের কেবল ভয় যে, যোগিনী বিষ্ণুভক্তি তাহাদিগকে না তাড়াইতে পারে। ভক্তি গাঢ় হইয়া একবার মস্তকে প্রবেশ করিলে লোকের বুদ্ধিগুলি উচ্চতর সমালোচনায় কিরূপ অপারগ হয় তাহা আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং চার্বাক ও বৌদ্ধ যে উহাকে ভয় করিবে আশ্চর্য কী ?

বেদিতে বসিয়া ধর্ম প্রচার ॥

হিন্দুরা প্রচার কার্যও ছাড়েন নাই। বৌদ্ধেরা তাহাদের ধর্মশাস্ত্র প্রচার করিত। হিন্দুরা শেষ পুরাণ পাঠ আরম্ভ করিলেন। পুরাণে পাই যে নৈমিষারণ্য বা আর-কোনো স্থানে পরাশর বা অন্য কোনো ঋষি এই এই কথা বলিয়া গিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ আছে, তাহাতে স্পষ্ট বোধ হয় হিন্দুরা পরাশরাদি বৈদিক ঋষির নাম করিয়া আপনারা পুরাণ প্রচারকার্যে রত হন।

বৌদ্ধদিগের ধর্মব্যাখ্যা অপেক্ষা হিন্দুদিগের পুরাণ পাঠের মোহিনী শক্তিও অবশ্য অধিক। বৌদ্ধেরা বলিলেন, দান করো— ব্রাহ্মণ বলিলেন, দান করিয়া বলি রাজার সর্বস্ব গেল। শেষ আত্মদেহ পর্যন্ত দান করিলেন। বৌদ্ধ বলিলেন, সত্য কথা কও— ব্রাহ্মণ বলিলেন, যুধিষ্ঠির একটি অর্ধ মিথ্যা কথা কহিয়াছিলেন, এই পাপে নরক দর্শনযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন।

এই পুরাণ প্রচার আরম্ভ হইয়া অবধি অশিক্ষিতগণকে হিন্দুমতে আকর্ষণ করিবার বিশেষ সুবিধা হইল।

ব্রাহ্মণ শ্রমণের কার্যদক্ষতা এবং অনুরাগ ॥

উপরি উক্ত প্রবন্ধে বোধ হইল, সাকার উপাসনা, ভক্তিমার্গ উপদেশ

ও পুরাণ প্রচার এই তিন উপায়েই ব্রাহ্মণেরা জয়ী হন। ইহার উপর আর-একটি কারণও ছিল। বৌদ্ধধর্ম চালাইবার লোক কাহারা? সংসারত্যাগী বিবাহাদিশূন্য ভিক্ষুগণ। প্রথম ধর্মের প্রচার সময়ে ভিক্ষুদিগের দ্বারা বিশেষ উপকার হইয়াছিল। উহারা প্রাণপণে ধর্ম প্রচার চেষ্টায় রত ছিল। সংসারের সকল চিন্তা ত্যাগ করিয়া কেবল প্রাণপণে ধর্মের জন্য চেষ্টা করিত। কিন্তু সেই ধর্মার্থ উৎকট যত্ন কালসহকারে নষ্ট হইল। যখন ভিক্ষুগণ রাজা রাজপুরুষগণের উপর কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন, যখন মঠের অতুল ঐশ্বর্য হইল, তখন আর ধর্মপ্রচার কে করে। নিয়মমতো কার্য করিয়াই ভিক্ষুরা ক্ষান্ত থাকিত। ওদিকে ব্রাহ্মদিগের বড়ো সুবিধা— তাঁহাদের ধর্ম তাঁহাদের জীবনোপায়। একজন ব্রাহ্মণ যদি একটি গ্রাম হিন্দু করিল, সে গ্রাম পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে তাহার থাকিবে। সুতরাং একদিকে স্বার্থ সাধনার্থে উৎকট পরিশ্রম আর-দিকে সম্পূর্ণ উদাসীনতা. ইহার মধ্যে পড়িয়া বৌদ্ধধর্ম উৎসন্ন হইল। ব্রাহ্মণদিগের শ্রীবৃদ্ধি হইল।

শ্রমণের হীনবল হইবার আর-একটি কারণ॥

ভারতবর্ষ যেরূপ দেশ ব্রাহ্মণেরা যেরূপ বলবান, বৌদ্ধেরা যদি প্রাণপণে ভারতবর্ষ হইতে ব্রাহ্মণদিগকে এককালীন দূরীভূত করিয়া তাহার পর বিদেশে প্রচারক পাঠাইত, তাহা হইলে কী হইত বলা যায় না। কিন্তু তাহা না করিয়া, ঘরের শত্রু বিনাশ না করিয়া, যে-সকল লোক ধর্মবিষয়ে উৎকট শ্রম করিয়াছে ও করিতে পারে, এমন-সব লোক বাছিয়া বাছিয়া বিদেশে পাঠাইত। প্রথম অবস্থায় তাহাতে ক্ষতি হয় নাই; যেহেতু নূতন দীক্ষিতদিগের মধ্যে সকলেই সমান উদ্যোগী। কিন্তু শেষ যাহারা কার্যক্ষম তাহারাই দেশ হইতে বাহির হইতে লাগিল; ব্রাহ্মণের সুবিধা হইল। এই-সকল প্রচারকেরা বিদেশে বিলক্ষণ শ্রম করিয়াছে, ইহাদের মধ্যেও অনেক অগস্টিন[৯] স্কোয়ার্টজ[১০] ডফ[১১] সাহেব ছিল। ইঁহারা বহু-সংখ্যক বৌদ্ধগ্রন্থ তত্তদ্দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। বীল সাহেবের[১২] চৈন পুস্তকের তালিকায় অনেক এদেশীয় লোক অনুবাদক ছিলেন দেখা যায়।

বৌদ্ধধর্ম নাশের অপর কারণ ॥

বৌদ্ধধর্ম প্রচার যখন আরম্ভ হয় তখন যে উহারা শুদ্ধ ব্রাহ্মণদিগের সহিতই বিরোধ করিয়াছিল এমন নহে। প্রথম বিপ্লব সময়ে ব্রাহ্মণ-বিরোধী অথচ বৌদ্ধ-শত্রু আর-একদল লোক ছিল। তাহারা তৈর্থিকোপাসক[১৩]। আমরা প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে পূরণ নামক একজন তৈর্থিকের নাম দেখিতে পাই। প্রথম ইহারাও বৌদ্ধদিগের উন্নতিতে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া চুপ করিয়া থাকে। পরে যখন বৌদ্ধেরা বিধর্মী বলিয়া আপন দলের অনেক লোককে বৌদ্ধ সংঘ বা বৌদ্ধ সমাজ হইতে দূর করিয়া দিতে লাগিল, তখন তৈর্থিকোপাসকেরা উহাদের সঙ্গে মিলিতে লাগিল। বৌদ্ধদিগের দুর্বলতার আর-একটি কারণ হইল। বৌদ্ধগণ আর-এক দোষ করিতেন তাঁহারা দলাদলি বড়ো ভালো-বাসিতেন। বুদ্ধদেব মরিবার ২০০ বৎসরের মধ্যে ১৮টা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দল হয় শুনিতে পাই। ব্রাহ্মণের পক্ষে যত দল হউক না সবই উহাদের সহিত একতাসূত্রে বদ্ধ. হিন্দুধর্মের মধ্যে উচ্চতম অদ্বৈতবাদী হইতে জঘন্য লিঙ্গোপাসক পর্যন্ত এক রাজনৈতিকসূত্রে বদ্ধ আছে। বৌদ্ধধর্মে সেটি ছিল না। 'তুমি লবণ খাইবে আমি খাইব না' এই লইয়া উহাদের একবার বড়ো দলাদলি হয়। ইউরোপে আজিও ঠিক এইরূপ চলিতেছে। কাথলিকেরা পোপ মানিলেই আপনার লোক বলিয়া স্বীকার করেন। প্রটেস্টন্টেরা ফি-হাত ভিন্নমতাবলম্বীদিগকে আপন চর্চ হইতে দূর করিয়া দিতেছেন। একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, ইহাতে কাথলিকের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইতেছে। ব্রাহ্মণের ক্ষমতাও সেকালে ঠিক এইরূপে বাড়িয়াছিল।

ভারতবর্ষে বুদ্ধদিগের শেষদশা : অন্তর্জগতে ॥

কনিংহাম বলেন সেকন্দর শাহের সময় ব্রাহ্মণ ও শ্রমণের তুল্য সম্মান ছিল। খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে দেখিতে পাই অযোধ্যায় ব্রাহ্মণ ও শ্রমণে ঘোরতর বাগ্‌যুদ্ধ। প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের পর শ্রমণের জয় হয়। ফা-হিয়নের[১৪] সময় শুনিতে পাই, দুই-ই সমান; বৌদ্ধেরা যেন একটু অধিক বলবান। হিয়ানসাঙের সময় বিহারের সংখ্যা কমিয়া যাইতেছে। ইহার কারণ কী? কনিংহাম যাহা বলিয়াছেন তাহাই

অবলম্বন করিয়া আমরা তাহার এই কারণ নির্দেশ করিতে সমর্থ হইয়াছি। পূর্বোক্ত কারণসমূহের বলে অনেক বৌদ্ধ সংসারী হিন্দু হইয়া গিয়াছেন, যাহাদের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া বিহারের পোষণ হইত, সে-সকল লোক আর বিহারবাসীদিগকে ভিক্ষা দিতে সম্মত নহে। সুতরাং অনেক মঠ উঠিয়া গেল। ক্রমে যে-সকল বিহারের জমিদারি প্রভৃতি ছিল তাহাই রহিল, অবশিষ্ট উঠিয়া গেল। এই-সকল বিহারে বৌদ্ধ-দিগের দার্শনিক মতের তর্ক বিতর্ক হইত এবং বিদ্যাবিষয়ে তাহাদের বিশেষ খ্যাতিও ছিল। শংকরাচার্য এইরূপ মঠবাসীদিগেরই সঙ্গে বিচার করিয়া অনেককে আত্মাবলম্বিত শুদ্ধাদ্বৈতমতে আনয়ন করেন। যেখানে বুদ্ধের প্রতিমূর্তি ছিল, সেইখানে শংকরাচার্যের শিষ্যেরা শুদ্ধাদ্বৈত মতানু-যায়ী এক প্রকার পৌত্তলিক প্রতিমূর্তি স্থাপন করিলেন। যাহা বাকি ছিল ন্যায়শাস্ত্রের বহুল প্রচার সময়ে ১০ম বা ১১শ শতাব্দীর বিচারকালে তাহারো ধ্বংস হইল। উদয়নাচার্যের[১৫] 'আত্মতত্ত্ববিবেক'ই বৌদ্ধদিগের বিরুদ্ধে লিখিত শেষ গ্রন্থ। কিন্তু বোধ হয় তখনো বৌদ্ধধর্ম নির্মূল হয় নাই। 'প্রবোধচন্দ্রোদয়া'দি কাব্যগ্রন্থে উহার স্মৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় ১৫ শতাব্দীতে যে নানা প্রকার নূতন নূতন ধর্মের উৎপত্তি হয় ঐ সময়ে উহার যা-কিছু বাকি ছিল, তাহার শেষ স্মৃতি পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়। তাহার পর প্রায় চারি শত বৎসর আমরা উহাদের নামও শুনিতে পাই নাই। এখন আবার বৌদ্ধদিগকে সমাদর করিতে শিখিয়াছি।

বাহ্যজগতে ॥

অন্তর্জগতে বৌদ্ধদিগের যে আধিপত্য ছিল তাহার কথা উক্ত হইল। বাহ্য জগতে উহাদের আধিপত্য অনেক অগ্রেই উৎসন্ন গিয়াছিল। প্রথম প্রচার সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী রাজারা বুদ্ধকে বিস্তর উৎপীড়ন করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু[১৬] আইন করিয়া প্রজাদিগের বুদ্ধের নিকট গমন বন্ধ করিয়াছিলেন। দেবদত্ত[১৭] উঁহাকে হত্যা করিবার জন্য ঘাতক-পুরুষ প্রেরণ করিয়াছিলেন। শেষ দেখিতে পাই বৌদ্ধেরাই উৎপীড়ক, কনিংহামের এনসেন্ট ইন্ডিয়ায় [*The Ancient Geography of India,* London 1871.] দেখি ৭ম শতাব্দীতে অনেক বৌদ্ধ রাজাই উৎপীড়ক; বৌদ্ধ কুচবেহার অঞ্চলে একজন

ব্রাহ্মণ রাজা হইয়া হিন্দুদিগের উপর দারুণ অত্যাচার করিতেছে। বুন্দেলখণ্ডের নিকটও ঠিক তাহাই ঘটিয়াছে। ইহাতেই তাদৃশ রাজাদিগের শেষ দশা যে সন্নিকট, বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। শংকরাচার্যেয় সময় একজনও বৌদ্ধ রাজার নাম নাই।

বৌদ্ধেরা এদেশে না থাকুক আমরা যদি প্রণিধান করিয়া দেখি তাহাদের ধর্ম তাহাদের আচার আমাদের নিত্য কর্মমধ্যে নিত্যই দেখিতে পাই।

'বঙ্গদর্শন'
শ্রাবণ ১২৮৪ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. গৈবির শব্দে পারস্যের গাবারদের বোঝানো হয়েছে। পারস্যের জরথুশত্র ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যাঁরা ভারতে আসেন নি তাঁরা গাবার নামে পরিচিত। গাবার কাফির শব্দের রূপান্তর, অর্থ বিধর্মী। গাবাররা শান্তিপ্রিয় কৃষিজীবী। এঁদের ধর্মাচার অনুসারে ঘোড়ায় চড়া, অস্ত্র-ধারণ নিষিদ্ধ। ফলে সপ্তম শতাব্দীতে আরব থেকে পারস্যে মুসলমান আধিপত্যের সময়ে গাবারদের অসহায়ভাবে নির্যাতন ভোগ করতে হয়। তবুও এঁরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় সমর্থ হন।

২. 'মজ্‌ঝিম নিকায়'-এর অস্‌সলায়ন সুত্তে বুদ্ধদেব বলেছেন, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পুরুষ-নারীর মিলনে উৎপন্ন সন্তান মানুষই হয়ে থাকে কিন্তু পুরুষ গর্দভ এবং ঘোটকীর সন্তান হয় অশ্বতর। বৌদ্ধমতে মানুষমাত্রেই এক প্রজাতি, বর্ণভেদে মানুষের সমাজে প্রজাতিভেদ হয় না। জন্মসূত্রে মানুষে মানুষে কোনো ভেদ থাকতে পারে না, ভেদ কর্মসূত্রে। ব্রাহ্মণ্য বর্ণাশ্রম বুদ্ধদেব অগ্রাহ্য করেন। 'দীঘ-নিকায়'-এর অম্বট্‌ঠ সুত্তে তিনি বলেছেন, বিজ্জাচরণ বা বিদ্যা এবং আচরণের অধিকারে যে কোনো ব্যক্তি মানুষ ও দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হতে পারে। 'বিনয়পিটক'-এ বলেছেন, গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরভূ এবং মহী— বিশাল এইসব নদী সাগরে মিশে গিয়ে যেমন তাদের স্বাতন্ত্র্য হারায়, তেমনি সংঘে যোগ দিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র তাদের জন্মগত পরিচয় হারায়। 'মজ্‌ঝিম নিকায়'-এ এসুকারী নামে এক ব্রাহ্মণকে বুদ্ধদেব বলেছেন, সমাজ-ভেদ ব্রাহ্মণদের স্বেচ্ছাচার। এতে ব্যক্তির বা সমাজের কোনো উপকার হতে পারে না। চার বর্ণের সকলেই সৎ জীবন যাপন এবং 'ধম্ম' অনুসরণে সমান অধিকারী।

৩. রাহুল, রাহুলভদ্র গৌতম বুদ্ধের একমাত্র ছেলে। গৌতমের গৃহত্যাগের দুই বছর আগে, ভিন্ন মতে, গৃহত্যাগের দিনে রাহুলের জন্ম হয়। বোধিলাভের পরে শুদ্ধোদনের অনুরোধে বুদ্ধদেব কপিলবাস্তুতে এলে

মায়ের নির্দেশে রাহুল তাঁর কাছে দায়জ্জ বা পৈতৃক উত্তরাধিকার প্রার্থনা করেন। বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারের পরিবর্তে বুদ্ধদেব ছেলেকে আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার দান করেন। শারিপুত্র বুদ্ধদেবের নির্দেশে রাহুলকে দীক্ষিত করেন এবং রাহুল সংঘে গৃহীত হন। বিনয়বিধি পালনের নিষ্ঠায় সংঘে রাহুল শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হতেন।

৪. কশ্যপ, কাশ্যপ বা মহা-কস্সপের জন্ম মগধের অন্তর্গত মহাতীর্থ গ্রামে। বাবার নাম কপিল, মা সুমনা দেবী। কশ্যপের পূর্বনাম পিপ্পলি। নিরঞ্জনা তীরে যজ্ঞ নিরত কশ্যপ এবং তাঁর অনুগামী ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধদেবের অলৌকিক শক্তি প্রত্যক্ষ করেন। বুদ্ধদেবের অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞের আগুন জ্বালতে পারলেন না। আগুন জ্বালা হলে প্রবল বন্যা এল, সে বন্যা বুদ্ধদেব রোধ করলেন। অভিভূত কশ্যপ তাঁর অনুগামীদের নিয়ে বুদ্ধের শিষ্য হয়ে সংঘে প্রবেশ করলেন। বুদ্ধদেব কশ্যপকে কঠোর নিয়ম-সংযম মেনে চলার উপদেশ দেন, সে উপদেশ তিনি আজীবন অবিচলভাবে পালন করেন। বুদ্ধদেব তাঁর সঙ্গে অন্তর্বাস বিনিময় করেছিলেন। এজন্য কশ্যপ নিজেকে বুদ্ধের ধর্মপুত্র মনে করতেন। পরিপূর্ণ ভোগাসক্তি বর্জিত, কৃচ্ছ্রসাধনে অভ্যস্ত চরিত্রের জন্য বুদ্ধদেব তাঁকে বিশেষ প্রশংসা করতেন। সংঘজীবনে নৈষ্ঠিকতা শিথিল করার প্রবণতায় কশ্যপ উদ্বেগ বোধ করতেন। বুদ্ধ-পরিনির্বাণের পর চতুর্থ মাসে তাঁর উদ্যোগে এবং পরিচালনায় রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম সংগীতি বা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সংগীতিতে সদ্ধর্ম অক্ষুণ্ন রাখার জন্য তিনি উপালি এবং আনন্দর সহযোগিতায় 'বিনয়পিটক' ও 'সূত্রপিটক' সংকলন করেন। এই মূল শাস্ত্র নির্ভর করে প্রবর্তিত হয় থেরবাদ বা স্থবিরবাদ, জ্যেষ্ঠ ভিক্ষুদের ধর্মমত। কশ্যপ দীর্ঘজীবী ছিলেন।

৫. কাত্যায়ন, কচ্চায়ন, কচ্চান— বুদ্ধদেবের অন্যতম প্রধান শিষ্য। 'মহাবস্তু অবদানে' এঁকে কাত্যায়নকুলোদ্গত মহাপ্রাজ্ঞ বলা হয়েছে। কশ্যপের অনুজ্ঞায় ইনি দশভূমি-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। বোধিসত্ত্বদের আধ্যাত্মিক অগ্রগতির দশ স্তর বা ভূমি সম্পর্কে এই ধারণা মহাযান মতের বিশিষ্ট উদ্ভাবন। 'মহাবস্তু অবদানে' দশভূমির প্রত্যেক ভূমির বিশিষ্টতা, এক ভূমি থেকে অন্য ভূমিতে উদ্বর্তন কিভাবে সম্ভব হয় ইত্যাদি প্রসঙ্গ ইনি বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

৬. উপলি, উপালি ছিলেন গৌতম বুদ্ধের খুড়তুতো ভাই অনুরুদ্ধ, আনন্দ,

দেবদত্ত— এ'দের কপ্পক (কল্পক, ক্ষৌরকার) ও নহাপিত (স্নাপক, স্নান সহায়ক)। অনুরুদ্ধরা যখন সংসার ছেড়ে সংঘে প্রবেশ করেন তখন উপালিও তাঁদের সঙ্গে যান। রাজকুমারেরা তাঁদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র নিয়ে উপালিকে ফিরে যেতে অনুরোধ করলে তিনি আপত্তি করেন। তখন তাঁরা উপালিকেই প্রথম দীক্ষা দেবার জন্য বুদ্ধদেবকে অনুরোধ করেন। সেবক এবং হীনজাতীয় উপালি আগে দীক্ষা পেলে নিজেদের ক্ষত্রিয়ত্বগর্ব দূর হবে ভেবে তাঁরা এই অনুরোধ করেছিলেন। সংঘে উপালি অন্যতম প্রধান স্থবিররূপে সম্মানিত ছিলেন। প্রথম সংগীতিতে তিনি থেরবাদের ভিত্তিস্বরূপ 'বিনয়পিটক' সংকলন করেন।

৭. যাস্ক বলেন, "নিষণ্ণমত্র পাপকম্" (নি + √সদ্ + ঘঞ্ = নিষাদ)। অর্থাৎ পাপের আধার। মনু অনুসারে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রকন্যার গর্ভজাত সন্তান নিষাদ। এদের জীবিকা মাছমারা। ব্যাধ ও কিরাত অর্থে রামায়ণে (১. ২. ১৫) নিষাদ শব্দ আছে। নিষাদ ও অন্ত্যজ শব্দ এক পর্যায়ে থাকলে অন্ত্যজ শব্দের অর্থ অন্ত্য (শূদ্র) থেকে জাত সংকর জাতি। বর্ণ চারটি; আর সবই বর্ণসংকর। সংকীর্ণ বর্ণই জাতি। জাতি ও বর্ণ এক নয়।

৮. কৃষ্ণমিশ্র রচিত 'প্রবোধচন্দ্রোদয়'। চন্দেল্লরাজ কীর্তিবর্মার (রাজত্বকাল ১০৫০-১১১৬ খৃ.) জন্য কৃষ্ণমিশ্র এই রূপক নাটক রচনা করেন। একাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ১০৮০ খৃস্টাব্দ বা এর কিছু আগে রচিত। কীর্তিবর্মা চেদিপতি কর্ণকে পরাস্ত করার পরে কীর্তিবর্মার অমাত্য বা জ্ঞাতি কোনো গোপালের আদেশে নাটকটির অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন মানবিক প্রবৃত্তিকে এই নাটকে চরিত্ররূপ দেওয়া হয়েছে। মহামোহের পরাক্রমে রাজ্যচ্যুত বিবেক ও উপনিষদ্ দেবীর সন্তান প্রবোধোদয় মহামোহকে পরাস্ত করে— এই বিবরণে লেখক নৈতিক শক্তি ও আস্তিক দর্শনের শ্রেয়ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুর সংলাপে বলা হয়েছে, সৌগত ধর্মে সুখ এবং মোক্ষ এক সঙ্গেই মেলে।

৯. Saint Augustine of Canterbury (মৃত্যু আ. ৬০৫ খৃ.)। পোপ প্রথম গ্রেগরি এই বেনেডিকট-পন্থী রোমক সন্ন্যাসীকে ইংলণ্ডে পাঠান। ইনি ইংলণ্ডে রোমক ধর্মাচার এবং বর্ষপঞ্জী প্রবর্তন করেন। ক্যান্টারবেরির প্রথম আর্চবিশপ ছিলেন।

১০. সম্ভবত জর্মান ধর্মপ্রচারক Karl Schwartz (Schvärtz, জন্ম ১৯

নভেম্বর ১৮১২, মৃত্যু ২৫ মার্চ ১৮৮৫ খৃ)-এর কথা বলছেন। ধর্মমতের জন্য ইনি কারাবরণ করেন। উদার ধর্মমতের প্রবক্তারূপে প্রসিদ্ধ।

১১. *Rev.* Alexander Duff (১৮০৬-৭৮ খৃ.) স্কটল্যাণ্ডের খৃস্টান ধর্মপ্রচারক এবং শিক্ষাব্রতী। ১৮৩০ খৃস্টাব্দে ভারতে আসেন এবং এই বছরে ১৩ জুলাই রামমোহন রায়ের আনুকূল্যে চিৎপুর রোডে ফিরিঙ্গি কমল বসুর বাড়িতে যে স্কুল খোলেন তার কলেজ বিভাগ জেনেরাল অ্যাসেম্ব্লিজ ইন্‌স্টিটিউশন পরে স্কটিশ চার্চ কলেজ নামে পরিচিত হয়েছে। টাকি এবং বাঁশবেড়িয়ায় তিনি আরো দুটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর অন্যান্য কাজের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৮৪৫-৪৯ খৃস্টাব্দ অবধি *Calcutta Review* পত্রিকা পরিচালনা, প্রতিষ্ঠাকাল থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় অংশগ্রহণ, ১৮৫৯-৬৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বেথুন সোসাইটির সভাপতিত্ব, নীল-আন্দোলনের সময়ে কৃষকদের পক্ষ সমর্থন। *Calcutta Review* এবং অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় তাঁর বহু রচনা প্রকাশিত হয়। রামমোহন রায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল, কিন্তু হিন্দুধর্মের উগ্র সমালোচনার জন্য পরে ব্রাহ্ম-আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে প্রবল মতবিরোধ হয়। *India and India Mission* (১৮৪০ খৃ.) বইয়ে হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজ সম্পর্কে তাঁর মত খণ্ডনের জন্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর *Vedantic Doctrines Vindicated* (১৮৪৫) বইটি রচনা করেন।

১২. *Rev.* Samual Beal, *A Catena of Buddhist Scriptures from the Chinese*, London, 1871.

১৩. পূরণ কস্‌সপ, পকুধ কচ্চায়ন, মক্‌খলি গোসাল, অজিত কেসকম্বল, সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্ত এবং (নিগণ্‌থ) নাতপুত্ত নামে গৌতম বুদ্ধের সমকালীন ছয় জন সম্প্রদায় প্রবর্তক বা তীর্থংকরের নাম বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে পাওয়া যায়। এঁদের তিত্‌থিয় বা তৈর্থিক, অপধর্মীয় বলে নিন্দা করা হয়েছে। কিন্তু পরোক্ষ প্রমাণে বোঝা যায় জনসমাজে এঁদের ব্যাপক প্রভাব ছিল। এঁরা বেদবিরোধী ছিলেন। সব জাতির মানুষকে নিজেদের সম্প্রদায়ভুক্ত করতেন।

নগ্ন সন্ন্যাসী পূর্ণ কাশ্যপ সম্ভবত ব্রাহ্মণ ছিলেন। সিংহলি সূত্র অনুযায়ী তাঁর বংশে আগে ৯৯ জনের জন্ম হয় এবং তাঁর

জন্মে একশো পূর্ণ হওয়ায় নাম হয় পূর্ণ কাশ্যপ। ইনি অক্রিয়াবাদী ছিলেন, কোনো কর্মেরই নৈতিক মূল্য নেই— এই মত প্রচার করতেন।

পকুধ কচ্চায়ন বা প্রক্রুদ্ধ কাত্যায়ন, ভিন্ন উল্লেখে ককুধ, ককুদ্ধ কাত্যায়নও ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি প্রচার করতেন— মাটি, জল, আগুন, বাতাস এবং সুখ, দুঃখ ও আত্মা— এই সাতটি মূল উপাদান বন্ধ্যা; এ থেকে কিছুই উৎপন্ন হয় না, এদের পারস্পরিক ক্রিয়া নেই। এ'কে অন্যোন্যবাদী বলা হয়। বুদ্ধঘোষ বলেছেন, এই সম্প্রদায়ের লোকেরা বহু কীটের মৃত্যু হতে পারে আশঙ্কায় কখনো জলে নামত না।

মক্খলি, মংখলিপুত্ত গোসাল, বা মস্করী গোশাল সিংহলি সূত্র অনুসারে গোশালায় এক দাসীর গর্ভে জন্মান। ২৪ বছর প্রব্রজ্যার প্রথম ৬ বছর মহাবীরের সঙ্গে ছিলেন, মতবিরোধ হওয়ায় মহাবীরকে ত্যাগ করে যান এবং আজীবিক সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। আজীবিক সন্ন্যাসীরা নগ্ন থাকতেন, কঠোর নিয়ম-সংযম মেনে চলতেন। গোশাল অদৃষ্টবাদী দর্শন প্রচার করেন। উত্তর ও, বিশেষভাবে দক্ষিণ-ভারতে দীর্ঘদিন গোশালের প্রভাব টিকে ছিল।

অজিত কেশকম্বলী বা কেশকম্বল মাথার চুল দিয়ে তৈরি কম্বল পরতেন. সর্বদা মাথা কামাতেন। তাঁর মতে যাগযজ্ঞের, ভালোমন্দ কাজের অতিপ্রাকৃত ফল নেই. ইহলোক পরলোক বলে কিছু নেই, সুতরাং এসব বিষয়ে জ্ঞান বিতরণেরও কোনো অর্থ নেই। মৃত্যুর পরে জীব শরীরের চারটি মূল উপাদান মাটিতে, জলে, বাতাসে, আগুনে মিলিয়ে যায়, ইন্দ্রিয়সমূহ মিলায় আকাশে, কিছুই আর অবশিষ্ট থাকে না। অজিতের মতবাদ চার্বাকপন্থীদের মতের কাছাকাছি। অজিত অন্যতম ভারতীয় জড়বাদী দার্শনিক। তাঁকে উচ্ছেদবাদীও বলা হয়।

সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্ত এবং সারিপুত্ত ও মোগল্লায়নের গুরু পরিব্রাজক সঞ্জয়কে একই ব্যক্তি মনে করা হয়। সঞ্জয় চরম সন্দেহবাদী ছিলেন, কোনো জ্ঞানের সম্ভাবনা স্বীকার করতেন না। এ'র মতবাদ বিক্ষেপবাদ রূপে উল্লেখ করা হয়, সম্প্রদায়ের নাম অমরাবিক্খেপিক। তর্কের কৌশলে এ'রা দার্শনিক প্রশ্ন এড়িয়ে যেতেন।

নিগন্থ বা নিগণ্ঠ নাতপুত্ত অথবা নির্গ্রন্থনাথপুত্র সিংহলি মতে নাথ নামে এক কৃষকের ছেলে। তিনি বলতেন, এমন গ্রন্থ নেই যা আমি পড়ি নি, তাই তাঁর নাম হয় নির্গ্রন্থ। ভিন্ন মতে সংসারের বন্ধন ছেদন করায় নাম হয় নির্গ্রন্থ। এ'র ধর্মমত জৈন মতের অনুরূপ, জৈনরা এ'কে এবং মহাবীর স্বামীকে অভিন্ন মনে করেন। এ'কে চাতুর্যামসংবরবাদীও বলা হয়। চারটি যাম হল অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য) এবং অপরিগ্রহ।

'অবদান শতক'-এ দুই শ্রেষ্ঠীর মধ্যে ধর্ম নিয়ে বিবাদের গল্প আছে। এদের একজন বৌদ্ধ, অন্য জন কোনো তীর্থিকের অনুগামী, নাম পূরণ। রাজা প্রসেনজিৎ এদের বিবাদ মেটানোর জন্যে সভা ডাকেন এবং নিজ নিজ উপাস্য দেবতার পুজো করতে বলেন। পূরণের দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত ফুল সব মাটিতে পড়ল, কিন্তু অপর শ্রেষ্ঠী বুদ্ধের উদ্দেশে ফুল নিবেদন করতেই সব ফুল হাঁসের মতো উড়ে গেল জেতবনের দিকে। বুদ্ধ তখন জেতবনে ছিলেন। এতে অভিভূত হয়ে পূরণ নিজ দেবতা ছেড়ে বৌদ্ধ হল।

১৪. ফা-হিয়েনের জন্ম চতুর্থ খৃস্টাব্দে, চীনের শান্-সি অঞ্চলের উ-ইয়াংয়ে। তাঁর গুরু বৌদ্ধ ভিক্ষু তাও-আনের প্রভাবে ভারত পরিদর্শনে আগ্রহী হন। চার জন সঙ্গী নিয়ে ৩৯৯ খৃস্টাব্দে মধ্য-এশিয়ার পথে ভারতের উদ্দেশে যাত্রা করেন। তখন উত্তর-ভারতের সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য (রাজত্বকাল আ. ৩৮০-৪১৫ খৃ.)। ফা-হিয়েন উত্তর-ভারতের প্রধান বৌদ্ধতীর্থগুলি দেখেন। পাটলিপুত্রে তিন বছর ছিলেন। পরে তাম্রলিপ্তিতে আসেন। এখানে তিনি ২২টি সংঘারাম দেখেছিলেন। তাম্রলিপ্তিতে বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চা, পুথি নকল, বুদ্ধমূর্তির নকশা আঁকায় দু বছর কাটিয়ে এখান থেকে সমুদ্রপথে যবদ্বীপে যান। যবদ্বীপ থেকে ৪১৪ খৃস্টাব্দে স্বদেশে ফেরেন। ফা-হিয়েন সংস্কৃত শিখে ৬ খানি বৌদ্ধশাস্ত্র অনুবাদ করেন। 'ফো-কুয়ো-কিং' নামে ভারতভ্রমণ বৃত্তান্ত রচনা করেন।

১৫. বৈশেষিক-দর্শনের প্রসিদ্ধ টীকাকার উদয়নাচার্য দশম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। কুলজি-ঐতিহ্য অনুসারে তাঁকে উত্তরবঙ্গের ভাদুড়ী-ব্রাহ্মণ বলে দাবি করা হয়। এই দাবির অন্য কোনো সমর্থন নেই। উদয়নাচার্য 'কিরণাবলী' নামে প্রশস্তপাদের আকর গ্রন্থ 'পদার্থধর্মসংগ্রহ'-এর টীকা রচনা করেন। অন্যান্য রচনা 'লক্ষ্মণাবলী', 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি', 'বৌদ্ধ-ধিক্কার' বা 'আত্মতত্ত্ববিবেক' এবং 'লক্ষণমালা'। বৌদ্ধ নৈয়ায়িক কল্যাণ রক্ষিত (আ. ৮২৯ খৃ.) তাঁর 'ঈশ্বরভঙ্গকারিকা'য় ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে যে যুক্তি দেখিয়েছিলেন উদয়ন 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি' বইয়ে সেই যুক্তিগুলি খণ্ডন করেন। 'আত্মতত্ত্ববিবেকে' উদয়ন কল্যাণ রক্ষিতের 'অন্যাপোহ-বিচার কারিকা', 'শ্রুতিপরীক্ষা' এবং অপর বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্মোত্তর (আ. ৮৪৭ খৃ.) রচিত 'অপোহনামপ্রকরণ' ও 'ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি' প্রভৃতি গ্রন্থের অপোহতত্ত্ব, ক্ষণভঙ্গতত্ত্ব ও বেদের প্রামাণিকতা বিরোধী শ্রুত্যপ্রামাণ্যের কঠোর সমালোচনা করেছেন।

উদয়নাচার্য সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায়ের মন্তব্য, "Udayanācaryya holds the same position in the Nyāya-vaiśeṣika school as Śaṅkara holds in the Vedānta. His works are many and varied. His commentary on the bhāṣya of Praśastapāda on the Vaiśeṣika-Sūtras and his commentary in the fourth remove on the Gautama-Sūtras are well kown. His *Kiraṇavalī*, his *Bauddhadhikkāra*. and his *Kusumāñjali* are regarded as models of style and argument. A short but very important work by him entitled *Lakṣanāvatī* has been found at Darbanga. It gives accurate definition of the six categories of the Vaiśeṣika School".—*Report On The Search Of Sanskrit Manuscripts*. (1895-1900), p. 14. দ্র. *H-I-Lc*. pp. 142-47.

১৬. মগধের রাজা বিম্বিসারের ছেলে অজাতশত্রু। মায়ের পেটে থাকতেই দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা বলেছিলেন, এই ছেলে বাবাকে হত্যা করবে। জন্মের আগেই পিতৃহন্তা বলে ঘোষিত হওয়ায় তাঁর নাম হয় অজাত-শত্রু। আর-এক নাম কূণিক। দেবদত্তের প্ররোচনায় বাবাকে বন্দি করে সিংহাসন অধিকার করেন এবং কারাগারে লোক পাঠিয়ে বিম্বিসারের পা কেটে ক্ষতে নুন-টক মাখিয়ে, কয়লার আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করান। 'অবদান শতক'-এ উল্লেখ আছে, বিম্বিসার অন্তঃপুরে বুদ্ধের পায়ের নখ ও চুলের উপরে যে বিরাট স্তূপ তৈরি করিয়েছিলেন, অজাতশত্রু সেই স্তূপে পুজো বন্ধ করে দেন। নিষেধ অগ্রাহ্য করে দাসী শ্রীমতী পুজো দিতে গিয়ে নিহত হন। প্রজাদের বুদ্ধদেবের কাছে যাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়। দেবদত্ত জেতবনে বুদ্ধদেবকে হত্যা করার জন্য পাঁচশো সৈন্য পাঠান। বুদ্ধের জীবন নাশে তারা ব্যর্থ হয়। বাবার মৃত্যুর কারণ হওয়ায় অজাতশত্রুর মনের শান্তি নষ্ট হল, সর্বদাই বিমর্ষ থাকতেন। মন্ত্রীরা তাঁকে বুদ্ধদেবের কাছে নিয়ে যান এবং তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। 'কল্পদ্রুম অবদান'-এ বলা হয়েছে বুদ্ধদেবের বিরোধিতা করার জন্য প্রজারা অজাতশত্রুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং উপায়ন্তর না দেখে তিনি বুদ্ধের শরণ নেন।

১৭. দেবদত্ত বুদ্ধদেবের খুড়তুতো ভাই। 'ভদ্রকল্পাবদান'-এ বুদ্ধদেবের স্ত্রী যশোধরার প্রতি দেবদত্তের আসক্তির উল্লেখ আছে। 'বোধিসত্ত্বাবদান

কল্পলতা'য় আছে, দেবদত্ত পাঁচশো সশস্ত্র সন্ন্যাসী পাঠিয়ে রাজগৃহের বেণুবনে বুদ্ধদেবকে হত্যা করাতে চেষ্টা করেন। নিক্ষিপ্ত অস্ত্রগুলি সুগন্ধি ফুলের মালায় রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে দেখে অভিভূত সন্ন্যাসীরা বুদ্ধের ক্ষমা প্রার্থনা করেন। দেবদত্ত যৌবনে বুদ্ধদেবের কাছে দীক্ষা নিয়ে সংঘে প্রবেশ করা সত্ত্বেও বরাবর বুদ্ধদেবের বিরোধিতা করেছেন। সংঘের ভিক্ষুদের পালনীয় নিয়ম সম্পর্কেও তিনি বুদ্ধদেবের মতের প্রতিবাদ করতেন। অজাতশত্রুর উপরে তাঁর খুব প্রভাব ছিল। এঁরা দু জনে বুদ্ধদেবের মহিমা এবং প্রতিপত্তি লাঘবের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করেছেন।

ভারতের লুপ্ত রত্নোদ্ধার

বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা

পূর্বকালে ভূলোকস্বর্গ কাশ্মীর দেশে অনন্ত বর্ম নামে একজন প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে বহু-সংখ্যক হিন্দু ও বৌদ্ধ বাস করিতেন। তিনি একজন প্রকৃত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার রাজত্ব সময়ে হিন্দুদিগের মধ্যে ক্ষেমেন্দ্র[১] নামক একজন অতিশয় প্রতিভাসম্পন্ন সংস্কৃত কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা সংস্কৃত সাহিত্যে 'বৃহৎ কথা' নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের রচয়িতা ক্ষেমেন্দ্র নামক একজন কবির নাম শুনিতে পাই। অনন্ত বর্মদেবের সমকালবর্তী ক্ষেমেন্দ্র ও 'বৃহৎ কথা' রচয়িতা ক্ষেমেন্দ্র এক ব্যক্তি কিনা তাহা বলিতে পারা যায় না। 'বৃহৎ কথা' গ্রন্থ এক্ষণে লোপ হইয়া গিয়াছে। প্রবাদ

আছে উহা গদ্যে লিখিত। সোমদেব ভট্ট এই গদ্য গ্রন্থ হইতে 'কথা-সরিৎ-সাগর' নামক যে কবিতাময় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহাই এদেশে প্রচলিত আছে।[২]

আমাদের ক্ষেমেন্দ্রের বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ন্যক্ক নামে এক বন্ধু ছিলেন। কাব্য রচনায় ক্ষেমেন্দ্রের যশ চারি দিকে বিস্তৃত হইলে ন্যক্ক বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় কোনো গ্রন্থ রচনার জন্য তাঁহাকে বার বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বুদ্ধদেবের এবং তাঁহার সহচর বর্গের পূর্ব পূর্ব জন্মের পুণ্য কীর্তি-সকল বর্ণনা করিয়া জাতক ও অবদান নামে বহু-সংখ্যক গল্প প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী মনীষীগণ এই-সকল গল্প একত্রিত করিয়া বহু-সংখ্যক সংগ্রহ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। মহামতি হজ্‌সন সাহেব[৩] নেপাল হইতে এইরূপ কতকগুলি গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া ইউরোপীয় ও এদেশীয় পণ্ডিত সমাজে সমর্পণ করিয়াছেন। এই-সকল গ্রন্থের ভাষা সংস্কৃত হইলেও উহাতে অনেক প্রকার ব্যাকরণ দোষ দৃষ্ট হয়। উহার রচনা প্রণালী অতি কর্কশ ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় পারিভাষিক শব্দে পরিপূর্ণ। ন্যক্কের সময় এরূপ সংগ্রহ গ্রন্থ অনেক ছিল, কিন্তু তাহাদিগের ভাষার কাঠিন্য, লালিত্যশূন্যতা প্রভৃতি কারণে সেগুলি লোক-শিক্ষার সম্পূর্ণ অনুপযোগী বলিয়া ন্যক্কের ধারণা হইয়াছিল। তিনি ক্ষেমেন্দ্রের রচনার লালিত্য, ভাবের গাম্ভীর্য, ভাষার প্রাঞ্জলতা ও অসাধারণ কবিত্ব দর্শনে মনে করিতে লাগিলেন যদি ক্ষেমেন্দ্র দ্বারা জাতক ও অবদানগুলিকে কাব্যাকারে লিখাইয়া লওয়া যাওয়া যায় তাহা হইলে উহা পণ্ডিত সমাজে আদরণীয় হইবে ও লোকশিক্ষার যথেষ্ট সহায়তা করিবে। এইরূপ মনে করিয়াই তিনি ক্ষেমেন্দ্রকে অবদান রচনার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ক্ষেমেন্দ্র ব্রাহ্মণধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন সুতরাং তিনি প্রথমে এই কার্যে সম্মত হন নাই। কিন্তু হৃদয়বান্ধবের অনুরোধ লোকে কতক্ষণ উপেক্ষা করিতে পারে? অনেক তর্ক বিতর্কের পর অবশেষে তিনি বৌদ্ধ গ্রন্থ রচনা করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু ক্ষেমেন্দ্র তো বৌদ্ধদিগের অবদানাবলী অবগত নহেন তিনি কেমন করিয়া বৌদ্ধ গ্রন্থ রচনা করিবেন? ন্যক্ক তখন তাঁহাকে এক একটি করিয়া অবদান বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। এবং ক্ষেমেন্দ্র সেই অবদানগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাব্যাকারে লিখিয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপ তিন খানি ক্ষুদ্র

কাব্য রচনা হইলে ক্ষেমেন্দ্র কহিলেন আর পারা যায় না, আমি যে শাস্ত্র জানি না, শুদ্ধ তোমার নিকট শুনিয়া সেই শাস্ত্র সম্বন্ধে কিরূপে কাব্য লেখা যাইতে পারে ? তাহার পর আবার, ক্ষেমেন্দ্র কাশ্মীরাধিপতির মন্ত্রীবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে বিশিষ্ট সম্পত্তিশালী লোক ছিলেন। পরের জন্য তিনি দীর্ঘ কাব্য রচনার পরিশ্রম সহ্য করিতে পারিবেন কেন ? তিনি বৌদ্ধ কাব্য রচনার আশা পরিত্যাগ করিলেন। কথিত আছে ক্ষেমেন্দ্র বিরত হইলে একদিন ভগবান বুদ্ধ স্বপ্নযোগে ক্ষেমেন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এই পুণ্য কার্য হইতে নিবৃত্ত হইতে নিষেধ করিলেন। এবং এই পুণ্যে পরিণামে তাঁহার যে-সকল পারলৌকিক উন্নতি লাভ হইবে তাহা বর্ণনা করিলেন। নিদ্রা ভঙ্গের পর ক্ষেমেন্দ্র দেখিলেন সৌগত ধর্মাবলম্বী সৌগতবিদ্যা-বারিধি, বীর্যভদ্র নামক আচার্য তাঁহাকে জিন-শাসন-শাস্ত্রে[৪] শিক্ষা দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। পূর্বে তিনটি মাত্র অবদান লিখিত হইয়াছিল, এক্ষণে ভগবানের প্রসাদে বীর্যভদ্রের সাহায্যে পণ্ডিত মণ্ডলীর উৎসাহে এক এক করিয়া একশত সাতটি অবদান লিখিত হইল। এই একশত সাতটি অবদান লিখিতে এত দীর্ঘকাল লাগিয়াছিল যে সপ্তোত্তর শততম অবদান শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই ক্ষেমেন্দ্র জ্ঞান-বজ্রের দ্বারা সৎকায় দৃষ্টি রূপ শৈলকে ভেদ করত অর্হত্ব প্রাপ্ত হইলেন।

একশত আটটি অবদান হইলে মাঙ্গলিক সংখ্যা পূর্ণ হয়। কিন্তু ক্ষেমেন্দ্র তো আর জগতে নাই। তিনি যে পুণ্য কার্য আরব্ধ করিয়া গিয়াছিলেন তাহা কে শেষ করিবে ? সেই ভাষায়, সেই ছন্দে, সেই অলৌকিক কাব্য রসে, সেই নব নব ভাব মালায় বিভূষিত করিয়া কে আর-একটি অবদান রচনা করিয়া অষ্টোত্তর শত সংখ্যা পূর্ণ করিবে ? কিন্তু ক্ষেমেন্দ্র কাল কবলে পতিত হইলেও কাশ্মীরের কবিসিংহাসন শূন্য হয় নাই। নরেন্দ্র নামক কাশ্মীরাধিপতির জয়াপীড় নামক মন্ত্রীর বংশ এখনো কবি শূন্য হয় নাই। যে বংশে ভোগীন্দ্র ও সিন্ধু অবতীর্ণ হইয়া বহুকাল ধরিয়া কাশ্মীর রাজ্য শাসন করিয়া আসিয়াছিলেন সে বংশ অদ্যাপি কবি শূন্য হয় নাই। ক্ষেমেন্দ্রের দীর্ঘ কাব্য রচনা কালে তাঁহার পুত্র সোমেন্দ্র নিজেই একজন প্রধান কবি হইয়া উঠিয়াছিলেন। পিতার পুণ্য কার্য অসম্পূর্ণ রাখিতে তাঁহার মন সরিল না। তিনি জীমূতবাহন

অবদান নামে একটি সুদীর্ঘ অবদান রচনা করত অষ্টোত্তরশত সংখ্যা পূর্ণ করিয়া দিলেন। যে কারণে পিতৃদেব গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহার বর্ণনা করিলেন এবং বৈদিক সময়ের পর ভারতীয় গ্রন্থকার মধ্যে যে অনুক্রমণিকা প্রণয়ন লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল পিতৃদেবের বিরচিত গ্রন্থের সেইরূপ একখানি অনুক্রমণিকা প্রণয়ন করিলেন। গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে দৃষ্ট হইল যে বৌদ্ধদিগের মধ্যে এরূপ গ্রন্থ আর-কখনো রচিত হয় নাই। ন্যক্ক নিজেই বলিয়াছেন, আচার্য গোপ দত্ত প্রভৃতি গ্রন্থকারগণ যে-সকল অবদানমালা রচনা করিয়াছেন তাহার কোথাও পদ্য কোথাও গদ্য। গদ্য পদ্য লিখিবার কিছুমাত্র স্থিরতা নাই, যেখানে গদ্যে লেখা উচিত, হয় তো সে স্থলে পদ্যে লেখা হইয়াছে, আর যেখানে পদ্যে লেখা উচিত সেখানে গদ্যে লেখা হইয়াছে। অবদানগুলি সাজাইবার কিছুমাত্র নিয়ম নাই, যে অবদানের পর যে অবদান লিখিত হইলে সুন্দর হইত সেটি হয়তো দূরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। সকল অবদানই এক প্রণালীতে রচিত হওয়ায় অধিকক্ষণ সে গ্রন্থ পাঠ করিতে বিরক্তি বোধ হয়। ভাব স্থানে স্থানে এত গভীর যে বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধীয় নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ অবগত না থাকিলে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। ভাষা রচনা প্রণালী অত্যন্ত কর্কশ এবং বর্ণনা অত্যন্ত বিস্তীর্ণ এবং পুনরুক্তি দোষে একান্ত দূষিত। এইসকল গ্রন্থের পরিবর্তে যখন সোমেন্দ্রের গ্রন্থ প্রচলিত হইল তখন বোধ হইল বৌদ্ধ সাহিত্য গগনে সমুজ্জ্বল কিরণাবলী মণ্ডিত সূর্যদেবের আবির্ভাব হইল। এই অভিনব গ্রন্থে ভাষা এরূপ সরল ও প্রাঞ্জল যে গ্রন্থকার ও পাঠকের মধ্যে ভাষা রূপ একটি ব্যবধান আছে এরূপ অনুভবই হয় না। উহার ছন্দ পাঠ কালে কখনো বা কালিদাসের ছন্দ পাঠ করিতেছি, কখনো বা বাল্মীকির ছন্দ পাঠ করিতেছি, কখনো বা ভবভূতির ছন্দ পাঠ করিতেছি বলিয়া বোধ হয়। ইহার শ্রুতিমধুর ছন্দ পাঠে হৃদয় আর্দ্র হইয়া মধুরতর ধর্মবীজ ধারণার্থ প্রকৃষ্ট উর্বর ভূমি রূপে পরিণত হয়। অবদানগুলি এরূপ সুন্দর রূপে সজ্জিত হইয়াছে যে, প্রথমটি পাঠ করিলে দ্বিতীয়টি পাঠ করিতে ইচ্ছা হয়, দ্বিতীয়টি পাঠ করিলে তৃতীয়টি পাঠ না করিয়া থাকা যায় না, এইরূপে সমগ্র গ্রন্থ বার বার পাঠ করিলেও তৃপ্তি লাভ হয় না। যখন বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ পরম সৌগত মণ্ডলী মধ্যে ক্ষেমেন্দ্র প্রণীত 'অবদানকল্পলতা' পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন তখন

শ্রোতৃমণ্ডলীর মন ভগবান বুদ্ধের প্রেমে আপ্লুত ও নির্বাণ লাভ লালসায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত।

অল্পদিন মধ্যেই গ্রন্থ চারি দিকে প্রচারিত হইল। হিন্দুস্থানের প্রত্যেক মঠেই উহা লিখিত হইল। ক্রমে তিব্বত প্রভৃতি দেশেও 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা'র প্রচার হইল। তিব্বতীয় ভাষায় উহা অনুবাদিত হইল।* তিব্বত হইতে উহা দেশ-দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িল।

কিন্তু যে গ্রন্থ প্রণয়ন কালে ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হইয়াছিলেন; যে গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য হিন্দু বৌদ্ধে, ধনী দরিদ্রে, গৃহস্থ ভিক্ষুকে মিলিত হইয়াছিল; যে গ্রন্থের উৎসাহ দাতা কবি, শিক্ষা দাতা এমন-কি প্রথম লেখকের নাম পর্যন্ত বৌদ্ধগণ ভক্তি সহকারে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন; যাহা এশিয়ার সমস্ত মধ্য অংশে আমাদের 'রামায়ণ' ও 'মহাভারতে'র ন্যায় নিত্য অধীত ও গীত হইয়া থাকে, ভারতবর্ষবাসী কেহই তাহার অস্তিত্ব পর্যন্ত অবগত ছিলেন না। এ স্থলে বলা যাইতে পারে বৌদ্ধদিগের কোন্ গ্রন্থই বা ভারতবর্ষের লোক জানিত যে 'অবদানকল্পলতার' নাম না জানায় তাহাদিগকে দোষ দিতে হইবে?

ভারতবর্ষের সকল লোক জানিত না সত্য কিন্তু হিমানীবেষ্টিত-শিখরাবলী পরিবৃত নেপাল রাজ্যে অনেকেই বৌদ্ধ এবং তাহারা গ্রন্থাবলীর আদর জানুক আর নাই জানুক বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিকে তাহারা বিশেষ যত্নপূর্বক রক্ষা করিয়াছিল সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে যে এককালে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল জগৎকে সেই সংবাদ প্রচার করিবার জন্যই যেন নেপাল দেশীয় বৌদ্ধ মঠগুলি বহু-শতাব্দী ধরিয়া আপন বক্ষঃস্থলে জরাজীর্ণ তালপত্র লিখিত গ্রন্থগুলি ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল। যেন উপযুক্ত লোকের অভাবে তাহারা এই রত্নগুলি লুকাইয়া রাখিয়াছিল। পরে সত্য প্রচারাভিলাষী ইংরাজ মনীষীগণ প্রার্থনা করিবামাত্র সমস্ত গ্রন্থ তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। নেপাল রেসিডেন্ট শ্রীমান্ হজ্‌সন সাহেব ভারতের এই নিভৃত কোণে অপ্রচলিতধর্মের অপ্রচলিত বহু-সংখ্যক গ্রন্থাবলী দর্শন করিয়া আশ্চর্য হইলেন

* লাসা নগরীর মহামান্য শাক্য ভদ্রের আজ্ঞায় পণ্ডিত লক্ষ্মীকর ও লামা শোঙ তোন্ দরজে শান্তি সংঘ নামক বিহারে ১২৭৯ খৃ. অব্দে ইহার অনুবাদ করেন।

এবং প্রাণপণে সেইগুলি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পর শ্রীমান্ রাইট [Daniel Wrights] সাহেবও সেই কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। যদি এই দুই মহাপুরুষ গ্রন্থ সংগ্রহে ব্রতী না হইতেন তাহা হইলে অনেক গ্রন্থ একেবারে লোপ প্রাপ্ত হইত। একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে। যখন শ্রীমান্ রাইট সাহেব নেপালে অবস্থিতি করিতেছিলেন তখন একটি মন্দিরের পুনর্নির্মাণ আবশ্যক হয়। নেপালে এখন হিন্দু রাজা। তিনি সেই মন্দির মধ্যে যে-সকল বৌদ্ধ পুস্তক পাইলেন তাহা একেবারে ফেলাইয়া দিলেন। রাইট সেইগুলি সংগ্রহ করিলেন। শ্রীমান্ বেণ্ডল [Cecil Bendall] সাহেবের পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে যে উহার মধ্যে একখানি গ্রন্থ খৃ. পূ. ৮৫৯ সালে লিখিত হইয়াছিল এবং উহা 'পরমেশ্বরতন্ত্র' নামক বৌদ্ধদিগের একখানি তান্ত্রিক গ্রন্থ। এমন মহামূল্য গ্রন্থ ভারতবাসীর মূর্খতা প্রযুক্ত নষ্ট হইতেছিল, কেবল একজন ইংরাজ রাজপুরুষের চেষ্টায় রক্ষিত হইল।

হজ্‌সন ও রাইট অনেক পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছেন। অনেক পুস্তক লেখাইয়া লইয়াছেন। কিন্তু তাহার মধ্যেও ক্ষেমেন্দ্রকৃত 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা' পাওয়া গেল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হজ্‌সন সাহেব যেখানি পাইলেন তাহা ৫১ পল্লব হইতে আরম্ভ। রাইট সাহেব যে দুখানি পাইলেন তাহার একখানি পরীক্ষায় ৫১ পল্লব হইতে আরম্ভ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। নেপালাধিপতি অনন্ত মল্লদেবের রাজত্বকালে খৃস্টীয় ১৩০২ শতাব্দীতে মঞ্জুভদ্র সুধী কর্তৃক লিখিত হইয়াছিল। যখন লেখা হইয়াছিল তখন গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ ছিল, কিন্তু কিছুদিন পরে উহার ১৭৪ পৃষ্ঠা কোথায় গিয়াছে তাহার এ পর্যন্ত ঠিকানা হয় নাই। সে পুথিখানি ১৭৫ পৃষ্ঠা হইতে এবং একচল্লিশ পল্লবের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ। পূর্বে যে দুখানি পুথির উল্লেখ করা হইয়াছে পরীক্ষা দ্বারা জানা যায় যে সে দুখানি সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে এই পুথিখানিরই নকল। একখানির শেষে লিখিত আছে, "এতৎ ক্ষেমেন্দ্র কৃত অবদান শতক গ্রন্থস্য পরার্ধমেবায়ং পূর্বার্দ্ধং কুত্রাচৎ ন প্রাপ্তং শুভম্"।

এতদ্বারা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণীকৃত হইল যে ক্ষেমেন্দ্রকৃত অপূর্ব গ্রন্থের পূর্বার্ধ নেপালদেশেও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইংরাজগণ বিশেষ যত্নপুরঃসর সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, ক্যাম্বোডিয়া, চীন, জাপান, নেপাল, ভুটান

প্রভৃতি দেশে যত বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার তালিকা প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু কোথায় 'অবদানকল্পলতা'র পূর্বার্ধের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। যাহা ইংরাজগণ পারেন নাই, যাহা ফরাসিগণ পারেন নাই, যাহা উদ্যমশীল জর্মান জাতিতে পারে নাই, একজন বাঙালির যত্ন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায় বলে সেই কর্ম সমাহিত হইয়াছে।

বাবু শরচ্চন্দ্র দাস তিব্বত ভ্রমণকালে ডালর লামার রাজধানী লাসানগর হইতে বহু-সংখ্যক তিব্বত অক্ষরে লিখিত কাষ্ঠযন্ত্র মুদ্রিত সংস্কৃত ও তিব্বত ভাষায় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। লাসা নগরে অবস্থিতিকালে তিনি দেখিয়াছিলেন, আমাদের দেশে যেমন 'রামায়ণ', 'মহাভারত', প্রতিগৃহে পঠিত, গীত ও সর্বত্র অভিনীত হয় তিব্বত দেশে সেইরূপ একখানি গ্রন্থ প্রতিগৃহে পঠিত, গীত ও অভিনীত হইয়া থাকে। আমরা যেমন প্রতিকথায় 'রামায়ণ' ও 'মহাভারতে'র দোহাই দিয়া চলি, তিব্বতবাসীরাও সেই উক্ত গ্রন্থের দোহাই দিয়া থাকে। গ্রন্থখানির নাম 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা', গ্রন্থকারের নাম ক্ষেমেন্দ্র। এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহার অত্যন্ত আগ্রহ হইল। তিনি শুনিতে পাইলেন ডালক নামক মুদ্রা যন্ত্রে খোদিত কাষ্ঠ খণ্ড সমূহে এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছিল।* এবং কাষ্ঠ খণ্ড সকল অদ্যাপি তথায় বর্তমান আছে। তখন তিনি অনেক যত্ন সহকারে কাষ্ঠযন্ত্রে মুদ্রিত একখানি তিব্বত অক্ষরে লিখিত সংস্কৃত ও তিব্বত ভাষায় উক্ত গ্রন্থ সংগ্রহ করিলেন।

গত বৎসর তিনি যখন কলিকাতায় অবস্থিতি করিতেছিলেন তখন তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্যমহোদয়গণকে তিব্বতীয় ভাষার অনুবাদ সহিত উক্ত গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কিত করিতে অনুরোধ করেন। সভ্যগণ সংস্কৃতভাষার সাহায্যে তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা করিবার সুযোগ হইবে দেখিয়া অত্যন্ত উল্লাসিত হইলেন। যাঁহাদের গ্রন্থ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিবার ভার আছে প্রবন্ধ লেখক তাঁহাদের মধ্যে একজন। তিনি 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা' নাম শুনিয়াই শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র দাসকে উক্ত

* ডালর লামা সুমতি বাগীশ্বর ১৬৪৫ খৃ. অব্দে এই পুস্তক ও ইহার অনুবাদ কাষ্ঠ যন্ত্রে মুদ্রিত করেন। পোতাল নামক রাজপ্রাসাদে এই কাষ্ঠ যন্ত্র সযত্নে সংরক্ষিত হইয়াছে। দুই শত বৎসর অতীত হইয়াছে তথাপি উহার কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই।

গ্রন্থের প্রথম ভাগ পাওয়া গিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। বাবু শরচ্চন্দ্র দাস রোমান অক্ষরে লিখিত সমগ্র পুস্তক পাঠাইয়া দিলেন। পরীক্ষায় দৃষ্ট হইল গ্রন্থের যে অংশ ১৩০২ খৃস্টাব্দের পর বিলুপ্ত হইয়াছে, যে অংশ এ পর্যন্ত অনেক অনুসন্ধান করিয়াও প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, সেই প্রথমাবধি উক্ত পঞ্চাশ পল্লব শরৎবাবুর গ্রন্থে বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু তাহাতেও সন্দেহ ঘুচিল না। সোমেন্দ্র পিতৃ কৃত গ্রন্থের শেষ ভাগে যে পদ্যময় সূচিপত্র প্রদান করিয়াছিলেন তাহার সহিত পল্লবগুলি মিলাইয়া দেখিলেন সমস্তই মিলিয়া গেল। তখন প্রবন্ধ লেখক সোসাইটির সভ্য মহোদয়গণকে এই বহুকাল বিলুপ্ত গ্রন্থের পুনরুদ্ধার সংবাদ প্রদান করিলেন। শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র দাসের উপর তাঁহাদের সকলেরই শ্রদ্ধা বর্ধিত হইল। ভারতের একখানি লুপ্ত রত্নের উদ্ধার হইল।

'বিভা'
আষাঢ়, ১২৯৪ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. সূত্র

১. বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন লেখক ক্ষেমেন্দ্র একাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। কাব্য, নাটক, ছন্দ, অলংকার, কামশাস্ত্র প্রভৃতি নানা শাখায় তাঁর প্রতিভার শক্তি বিকশিত হয়। তিনি 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা'র ১০৭টি আখ্যান রচনা করেন। রচনাকাল নির্দেশ করেন নি। তাঁর ছেলে সোমেন্দ্র ১০৮তম জীমূতবাহন অবদান যোগ করে বই সম্পূর্ণ করেন ১০৫২ খৃস্টাব্দে। সোমেন্দ্রর. লেখা ভূমিকায় উল্লেখ আছে ক্ষেমেন্দ্র যথাক্রমে একজন ব্রাহ্মণ, নাক্ক নামে একজন পণ্ডিত বন্ধু এবং স্বপ্নে স্বয়ং তথাগতের নির্দেশে ১০৭টি পল্লব লিখেছিলেন। কাশ্মীরের শাক্য শ্রীপণ্ডিত ১২০২ খৃস্টাব্দে তিব্বত ভ্রমণে গিয়ে শাক্য পণ্ডিত কুন্‌গা গ্যালৎছেন্‌-কে এই বই উপহার দেন। এর ৭০ বছর পরে লক্ষ্মীকরের তত্ত্বাবধানে শোঙতোন (Soṅston Byaṅ) 'ছাঙ্‌ছুপ সেমপেহি তোগ্‌পা জোদ্‌পা পাগ্‌সাম ঠিশিঙ্‌' নামে এর তিব্বতি অনুবাদ করেন। অনুবাদ সংশোধন করেন ছোক্যোঙ্‌ সাঙপো।

দ্র. *Avadāna-Kalpalatā* (Tib. Rtogs Brjod Dpag Bsam Hkhri śin) of Kṣemendra (Sanskrit and Tibetan); ed. by Śaratchandra Dās, H. M. Vidyābhūṣaṇa and Satīśa Chandra Vidyābhūṣaṇa (2 Vol.); *Bibliotheca Indica Series* 1889-1917.

২. গুণাঢ্য পৈশাচী ভাষায় 'বৃহৎকথা' রচনা করেন ষষ্ঠ শতকের আগে। সে বই লুপ্ত হয়ে যায়। 'বৃহৎকথা'র কাহিনীগুলি প্রথম পাওয়া যায় বুদ্ধস্বামীর 'বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহ' পুঁথিতে। ছাপরা জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরীর সহায়তায় শাস্ত্রীমশায় অন্যান্য পুঁথির সঙ্গে এই পুঁথিখানি নেপাল থেকে সংগ্রহ করেন। এ বিষয়ে তিনি লেখেন—

"The twelfth MS. is labelled as unknown. The first page is missing and the end is far away. On

examination it is found that pages from 2 to 210 exist, with the exception of the 129th page. The handwriting is beautiful, much older than the rest of the collection. On examination it proved to be a portion of the *Vṛhat-Kathā*, about a-tenth of the whole work. It is not Somadeva's *Kathā-Sarit-sāgara*, nor Kṣhemendra's *Vṛhat-Kathāmañjarī* because in both these works the chapters are divided into *lambakas* and *tarangas*, where as in the present MS. it is divided into *adyāyas and sargas*. The work contains one complete *adhyāya* and a portion of the second. It has altogether 26 *sargas*, the colophons of many of which do not give any information at all. But in some of them appear these significant words *Vṛhatakathāyām-śloka-Saṁgrahe*. In the colophons appear the names of the *Sargas* ; they often contain proper names, none of which I have been able to identify either in Kṣemendra's or in Somdeva's work. So this fragment appears to be a third Sanskrit reduction or version of the original Paiśāchī *Vṛhat Kathā* by Guṇāḍhya, and the MS. which has been lebelled 'unknown' by my Nepalese vendor, turns out to be the most important work of the whole collection.

"The letter क in this MS. has a more archaic form than in most of the Nepalese MSS., which leads me to think that this MS. is of higher antiquity than the rest. The क has the turn of the Gupta-lipi. I may therefore be allowed to venture to say that I have laid my hands on a work copied even before Kṣemendra and Somadeva wrote their works on the *Vṛhat-Kathā*. Bühler, in his paper in Vol. I, *Ind. Ant.*, says that Kṣemendra had the Paiśāchī version of Gṇāḍhya before him. Might not he have consulted a big Sanskrit version, too, from which to

abridge? I have read the first *sarga* in my MS. It treats of king Gopāla renouncing the world, because people calumniated him as a parricide, and making over his kingdom to Pālaka, his brother, in spite of the remonstrances of the Brāhmaṇs. This is a very large work, the first *adhyāya* alone containing more than 4,200 *ślokas*. While Kṣemendra's whole work, according to Bühler, consists of a little more than 7,000 *ślokas*."—"On a new find of old Nepalese Manuscripts". *J-A-S-B* 1893, p. 254.

'বৃহৎকথাশ্লোকসংগ্রহ' প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে।

কাশ্মীরের কবি সোমদেব 'বৃহৎকথা'র বস্তু নিয়ে 'কথাসরিৎসাগর' লেখেন ১০৬৩-৮১ খৃস্টাব্দের মধ্যে। ১৮টি লম্বকে বিভক্ত এই গ্রন্থের শ্লোক সংখ্যা ২১,৩৮৮ ; কাহিনীর সংখ্যা প্রায় ৯০০। ক্ষেমেন্দ্রর 'বৃহৎকথামঞ্জরী' রচিত হয়েছিল 'কথাসরিৎসাগর'-এর চেয়ে বছর তিরিশ আগে।

৩. ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় করে তোলায় যেসব প্রতিভাবান্ ইংরেজ জীবনব্যাপী পরিশ্রম করেছেন Brian Houghton Hodgson (১৮০০-৯৪. খৃ) তাঁদের অন্যতম। ১৮ বছর বয়সে তিনি বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন। তাঁর চাকরি-জীবনের বেশির ভাগ, প্রায় ২০ বছর, কাটে নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে। পোস্টমাস্টার, রেসিডেন্টের সহকারী এবং ১৮৩৩-৪৩ পর্যন্ত রেসিডেন্ট পদে ছিলেন। সাম্রাজ্যের স্বার্থরক্ষায় তিনি বরাবর প্রশাসনিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। অন্য দিকে মানবিকীবিদ্যা এবং বিজ্ঞানবিদ্যার বিভিন্ন শাখায় শৃঙ্খলাময় অনুসন্ধিৎসায় তিনি হিমালয় অঞ্চলের মানবসমাজ ও প্রকৃতি বিষয়ে প্রচুর তথ্য ও তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। হিমালয়ের পশুপাখি, গাছপালা, ভূপ্রকৃতি, বাণিজ্যপথ ; বিভিন্ন জাতি-উপজাতির নৃতাত্ত্বিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিশিষ্টতা ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর মৌলিক গবেষণা এইসব শাখায় জ্ঞানের নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছে। সাম্রাজ্য শাসনের পক্ষে এই জ্ঞান অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিবেচিত হত, কিন্তু শুদ্ধ জ্ঞানচর্চার দিক থেকেও এই গবেষণা অশেষ মূল্যবান্। হজ্সন কাঠের ব্লক থেকে ছাপা তিব্বতি বৌদ্ধ-শাস্ত্র পুরো কেঙ্গুর-তেঙ্গুর সংগ্রহ করেন। আর নেপাল থেকে সংগ্রহ

করেন সংস্কৃত-বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রায় ২০০ পুথি। এই সংগ্রহ গচ্ছিত হয় কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি, লণ্ডনের রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি, অক্স্‌ফোর্ডের বড্‌লিয়ন লাইব্রেরি এবং প্যারির সোসাইতে আশিয়াতিক্‌-এ। হজ্‌সনের এই বিরাট সংগ্রহ উদীচ্য বৌদ্ধবিদ্যা চর্চার তথ্যভিত্তি এবং তিনিই বৌদ্ধবিদ্যার এই ধারার গবেষণায় পথিকৃৎ। প্রাচ্যবিদ্যা-গবেষণায় মৌলিক দানের জন্য রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি, সোসাইতে আশিয়াতিক্‌, আমেরিকান্‌ ওরিয়েণ্টাল সোসাইটি, জর্মান ওরিয়েণ্টাল সোসাইটি, কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি প্রভৃতি বিদ্যা-প্রতিষ্ঠান করেসপন্ডিং মেম্বার, অনারারি মেম্বার, ফেলো ইত্যাদি পদে বরণ করে তাঁকে সম্মানিত করেন। বৌদ্ধবিদ্যা বিষয়ে তাঁর রচনার সংকলন *Essays on the languages, literature and religion of Nepal and Tibet*, Serampur 1841; *Illustrations of the Literature and Religion of the Buddhists*. Serampur, 1841. দ্র. *S-B-L-N*. Introduction; William Wilson Hunter, *Life of Brian Houghton Hodgson*, London 1896.

৪ বুদ্ধদেবের ধর্মীয় অনুশাসন।

২. অনুষঙ্গ

এশিয়াটিক সোসাইটির কার্যবিবরণীতে শাস্ত্রীমশায়ের মন্তব্য—

The three copies of the *Bodhisattvāvadāna Kalpalatā* which we have in Cambridge and in Calcutta are incomplete. They contain, so to say, only the second volume of the work, *i.e.*, from 50 to 108th Pallava.

At the end of the colophon, in Add. 913, Combridge Libray, the scribe declares that the first half of the work is lost and could not be found anywhere.*

In noticing an old manuscript of the same work in the Asiatic Society's Library Dr. Rajendralāl Mitra says

vers

consu

* क्षेमेन्द्रकृत अवदानशतकग्रन्थस्य पराद्धमेव। पूर्व्वार्द्धं कुत्रचिन्न प्राप्तं।

that, "the codex under notice is obviously incomplete as it commences from the 51st chapter or pallava. It appears, however, from the presence of an invocatory verse at the beginning of the chapter and the absence of all such invocations at the beginning of subsequent chapters that the work was devided into two parts, of which the first included 50 chapters and the second 58."

From the similarity of names one might at first be inclined to infer that the *Bodhisattvāvadāna Kalpalatā* is the sequel of another work called the *Bodhisattvāvadāna*, but the following facts show that those two works are quite distinct.

In Add. 1306, Cambridge Library, a palm leaf manuscript copied in the reign of Anantamalla of Nepal in, N.S. 422, A.D. 1302, we get for the first time a glimpse of the existence of the first part of the work. The first 174 leaves of that manuscript are lost and the 175th leaf begins with the middle of the 41st *Avadāna* and continues to the end of the 49th and then begins the second half. The entire manuscript was in existence in 1302 and since then the first volume has been missing.

Further there is a metrical list appended at the end of the manuscript in the Society's Library which gives the names and contents of the *avadānas* of the first volume. On examination, I find that, with one exception, all the names mentioned in that list agree with the names of the *avadānas*, as given in the copy of the work brought from Tibet by Bābu Śarat Chandra Dās. The single exception is, that the Bābu's Tibetan MS. substitutes an *avadāna*, called *Garbhakrānti*, for the *avadāna* of the metrical list which is callled *Shaḍdanta*.

Since therefore among 50 *avadānas* there is only a difference of one name, the identity of the Tibetan manuscript with the lost work may be said to be

complete. To Bābu Śarat Chandra Dās, is due the credit of recovering an ancient and valuable work which was given up for lost in India for about six hundred years.

In editing the second volume of the work Bābu Śarat Chandra will have the benefit, besides the block-print and the Tibetan translation, which he has brought from Lhasa, of the three manuscripts in the Libraries of Cambridge and Calcutta. But in editing the first volume he will have to depend entirely on the excellent and very carefully executed block-print and the Tibetan translation. I shall of course be always ready to render him any assistance that lies in my power in editing the Sanskrit portion of this valuable work, which may be considered as a store-house of Buddist legends of the Mahāyāna school, as the *Mahāvastu* is a store-house of those of the Mahāsanghikas. The work is written in easy flowing verse and in simple poetic and idiomatic Sanskrit. It is entirely free from that verbosity and tediousness of narration which characterises Buddhist Sanskrit works in general, a circumstance which may be accounted for by the fact that, as tradition informs us, the *Kalpalatā* was composed by a Brahmanic Sanskrit scholar, at the request of his Buddist friends. Bābu Śarat Chandra's edition of *Kalpalatā* will not only be a valuable contribution to the Budhist Sanskrit Literature, but will be a great help to scholars desirous of studying the Tibetan language, because they will be able to learn it through the medium of Sanskrit.

The work will be published with the Sanskrit and Tibetan texts in juxta-position.

(*Proceedings of the Asiatic Society of Bengal*, December 1887, pp. 248-49)

রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল

বাংলা ভাষায় অনেকগুলি ধর্মঠাকুরের পুথি আছে। ময়ূরভট্ট[১] ধর্মায়ণের আদি কবি। তিনিও আবার 'হাকন্দপুরাণ'[২] অনুসারে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ময়ূরভট্টের পর খেলারামের[৩] ধর্মমঙ্গলের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। খেলারামের পর রূপরাম[৪] ও ঘনরাম[৫]। ইঁহারা ভিন্ন রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়[৬] ও মানিকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়[৭] ধর্মমঙ্গলের পুস্তক লিখিয়াছেন। বাংলা ভাষায় লিখিত প্রাচীন গ্রন্থের অনুসন্ধান সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। তাহাতেও আবার বৈষ্ণব গ্রন্থ ও 'রামায়ণ' 'মহাভারতা'দির জন্য বঙ্গীয় পাঠককুলের যত আগ্রহ ধর্মঠাকুরের পুথির জন্য তত নহে ; কারণ বঙ্গবাসীর ধর্মমঙ্গল প্রচার করিবার পূর্বে শিক্ষিত সমাজে ধর্মঠাকুরের নামও

জানা ছিল না। এই আট-দশ বৎসরের মধ্যেই পাঁচ-ছয়খানি ধর্মায়ণ পুস্তকের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। এরূপ অনুসন্ধান চলিতে থাকিলে আরো অনেক পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা।

এক-একখানি ধর্মঠাকুরের পুথি অতিশয় বিস্তারিত। উহার গান বারো দিনে শেষ হয়। ধর্মঠাকুরের গান গাহিয়া আজিও অনেকে জীবিকা উপার্জন করিতেছে এবং ধর্মঠাকুরের গান শুনিয়া নিম্ন শ্রেণীর বহু লক্ষ লোক কৃতার্থ হইতেছে। অনেক কবি এই গান লিখিবার জন্য মস্তিষ্ক বিলোড়ন করিয়াছেন। মানিক গাঙ্গুলি বাঙ্গাল-মেলের লোক, বাঙ্গাল-মেল রাঢ়ীশ্রেণীর ছত্রিশ মেলের একটি. সুতরাং তিনি সুব্রাহ্মণ, ঘনরামের মতো চণ্ডালের ব্রাহ্মণ নহেন। মানিকের বাড়ি বেলডিহা, রাঢ়ে। তিনি ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে ভুঙ্গাড়ি যাইতেছেন, পথে ব্রাহ্মণবেশে ধর্মঠাকুর দেখা দিলেন। ধর্মঠাকুর দেখিলেন এমন সুব্রাহ্মণকে দিয়া যদি গান লিখাইয়া লইতে পারি, তাহলে ভদ্রলোক মহলেও আমার একটু পসার হয়। তিনি নাছোড়বন্দা হইয়া মানিককে ধরিলেন—

"নিজ বীজ মন্ত্র লিখিয়া দিলেন নকল।
ইহা দেখি কবিতা রচিবে অবিকল ॥
গায়েন হবেক তোর চতুর্থ সোদর।
জগত ভরিয়া যশ হবেক বিস্তর ॥"

শুনিয়া মানিক তো অবাক! ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ছেলে, একজন গান রচিবে, আর-একজন গাহিবে? কী সর্বনাশ!!! তিনি স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার মনের ভাব তাঁহার নিজের কথাতেই ব্যক্ত করিব—

"এতেক শুনিয়া মোর উড়িল পরাণ।
জাতি যায় তবে প্রভু যদি করে গান ॥
অচিরাৎ অখ্যাতি হবে দেশে দেশে।
সুপক্ষের সন্তোষ বিপক্ষ পাছে হাসে ॥"

ধর্মঠাকুর তবু ছাড়িলেন না. লোভ দেখাইয়া আত্মীয়তা করিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া বলিতে লাগিলেন—

"জগত ঈশ্বর কন আমি তোর জাতি।
তোমার অখ্যাতি হলে আমার অখ্যাতি ॥
আমি যার সহায় এতেক ভয় কেন।

ময়ূরভট্টের কথা মন দিয়া শুন ॥
বৈকুণ্ঠে রেখেছি তাকে বিষ্ণুভক্তি দিয়া।
অদ্যাপি অপার যশ অখিল ভরিয়া ॥”

মানিকচন্দ্র এ টোপটি ছাড়িতে পারিলেন না। স্বীকার পাইলেন। জানা গেল, ধর্মঠাকুরের গান লিখিয়া ময়ূরভট্ট তো বৈকুণ্ঠে আছেনই, মানিকচন্দ্রও তথায় যাইবেন, হয়তো রামচন্দ্র কবিও যাইবেন, ঘনরাম খেলারাম রূপরামের তো কথাই নাই।

এ ধর্মঠাকুরটি কে? দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহার উপাধি রায়। বোড়াল হইতে যিনি আমরক্তের ঔষধ দেন তাঁহার নাম খুদি রায়, মেমারির পশ্চিমে যিনি পিত্তদোষের ঔষধ দেন তাঁহার নাম অচল রায়, মানিক গাঙ্গুলি মহাশয়ের যিনি মুরুব্বি হইয়াছিলেন তাঁহার নাম বাঁকুড়া রায়। রায় শব্দটি সংস্কৃত রাজ শব্দ ভাঙা। ধর্মঠাকুর অনেক জায়গায় রাজ উপাধিতে বিশোভিত। ঘেঁটুগাছিতে তিনি ধর্মরাজ, নদীয়ার নিকট জামালপুরে তিনি বুড়ো রাজ। সময়ে সময়ে তিনি সিংহও হইয়া থাকেন। মানিকের পুথি হইতে স্থানভেদে তাঁহার নামভেদ দেখাইতেছি—

“প্রথমে বন্দিব জয় জয় পরাৎপর।
স্থানে স্থানে মূর্ত্তিভেদ মহিমা বিস্তর ॥
বেলডিহার বাঁকুড়ারায়ে বন্দি একমনে।
অসংখ্য প্রণতি শীতলাসিংহের চরণে ॥
ফুল্লরের ফতেসিং বৈতলের বাঁকুড়ারায়।
শুদ্ধভাবে বন্দি দোহে নত হয়ে কায় ॥
পাণ্ডুগ্রামের বুড়াধর্ম্মে বন্দিয়া সাদরে।
শ্যামবাজারের দলুরায়ে দিয়ে জয় জয় কারে ॥
দেপুরে জগৎরায়ে যোড় করি কর।
গোপালপুরের কাঁকড়াবিছায় বন্দি তার পর ॥
সিয়াসের কালাচাঁদে ঐদাসের বাঁকুড়ারায়।
বন্দিব বিস্তর নতি করে নত কায় ॥
গাপুরের স্বরূপনারাণ স্বর্ণসিংহাসনে।
বন্দিয়া বন্দিব মঙ্গলপুরের রূপনারাণে ॥
পশ্চিমপাড়ার যাত্রাসিদ্ধি বন্দিয়া তাঁহায়।

বড়ুজা গ্রামের বন্দিব মোহন রায় ॥
গুছুড়া গ্রামের বন্দি শীতলনারাণে ।
আলগুড়চিন্নার খুদিরায়ে বন্দি সাবধানে ॥
আর্কুটিকুল্লার মাল্লার ধর্মের করিয়া স্তবন ।
বন্দিপুরের শ্যামরায়ের বন্দিয়া চরণ ॥
জাড়াগ্রামে কালুরায়ে কামিন্যা সহিত ।
জাজপুরে দেহারে বন্দি দার্ঢ্য করি চিত ॥”

এতো গেল দক্ষিণরাঢ়ের। উত্তররাঢ়েও এইরূপ গ্রামে গ্রামে ধর্মঠাকুর আছেন। তাঁহার নামভেদও অসংখ্য। নিজ কলিকাতায় কিছু কম দশ-বারোটি ধর্মঠাকুর আছেন, তন্মধ্যে যাঁহার নামে ধর্মতলা স্ট্রিট, তাঁহার জাঁক কিছু বেশি। বলরাম দে-র স্ট্রিটে একটি সরু গলি মধ্যে খাসা মন্দির আছে. মন্দিরের মাথায় একটি খোদিত লিপিও আছে, মন্দিরটি একজন কায়স্থের দেওয়া।

ধর্মঠাকুরকে কোনো কোনো স্থলে বিষ্ণুরূপে পূজা করে, তুলসী দেয়, বলিদান করে না। কোথাও শিবরূপে পূজা করে, বিল্বপত্র দেয়। কোথাও বা ছাগবলি, মেষবলিও দেয়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে মুরগি, শূকর বলিই হয়। ধর্মঠাকুরের পুরোহিত কোথাও কৈবর্ত, কোথাও দুলে, কোথাও বাগদি, কোথাও আগুরি। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে ডোম বা পোদ। শেষোক্ত দুই জাতি এখনো ব্রাহ্মণ লয় নাই, এখনো তাহারা আপনাদের জাতীয় পণ্ডিত দিয়া সব কাজ করায়। ধর্মঠাকুর ইহাদের নিজস্ব দেবতা।

এই ধর্মঠাকুর কে ? যে কোনো ধর্মায়ণ পাঠ করো, দেখিবে, তিনি ইচ্ছায় সৃষ্টি করিতেছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তাঁহার সৃষ্টির অংশমাত্র। কোনো পুস্তকে তাঁহার নাম আদ্য, কোনো পুস্তকে তাঁহার নাম অনাদ্য। ঘনরামের পুস্তকে দেখিতে পাই, তাঁহার বার্মাতি গাওয়া হইতেছে। কেহ কেহ বার্মাতি ভাঙিয়া বারমতি করিয়াছেন। অর্থ করিয়াছেন, বার দিনে গান হয় বলিয়া উহার নাম বার্মাতি। কিন্তু বাস্তবিক কথাটি বার্মাতি, ঘনরাম দুই-এক জায়গায় ব্রহ্মাতি পর্যন্ত লিখিয়াছেন।

“এতক্ষণে ধর্ম্মের বার্ম্মাতি হইল সায়।” ইহার অর্থ যদি এরূপ করা যায় তাহা হইলে সঙ্গত হয়, এতক্ষণে ধর্মকে ব্রহ্ম বলিয়া প্রমাণ করিবার

চেষ্টা সফল হইল অর্থাৎ সমস্ত ধর্মায়ণ লিখিয়া কবি প্রমাণ করিলেন যে ধর্মঠাকুর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের উপর সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান ব্রহ্মস্বরূপ।[৮] ধর্মঠাকুরের পুথি পড়িতে গেলেই একজন লোকের নাম সর্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, ইঁহার নাম রমাই পণ্ডিত।[৯] ঘনরামের মতে ইনি জাতিতে বাইতি, ময়নাগড়ের কিছু দূরে ইনি ধর্মঠাকুরের পূজা করিতেন। লাউ-সেনের মাতা রঞ্জাবতী ইঁহারই আশ্রমে শালে ভর দিয়াছিলেন। ইনি ধর্মপূজার আদি গুরু। ইঁহার লিখিত কোনো গ্রন্থাদি পাইতে পারিলে ধর্মতত্ত্ব ভালোরূপে বুঝা যাইতে পারিবে, এই আশয়ে ময়নাগড়ে সোসাইটির ভ্রমণকারী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থকে প্রেরণ করিয়াছিলাম। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণী অতি হৃদয়গ্রাহী বলিয়া পরিশিষ্টরূপে এই প্রবন্ধে সংযোজিত করিলাম।

ময়নাগড়ে রমাই পণ্ডিতের কোনো পুস্তক পাইলাম না; কিন্তু যাহা পাইলাম তাহাতে আশা ও আগ্রহ আরো বৃদ্ধি হইল। জানিতে পারিলাম যে, রমাই পণ্ডিতের পদ্ধতি লইয়া অনেক স্থলে ধর্মের পূজা হয়। পদ্ধতি ময়নাগড়ে পাওয়া গেল না, কিন্তু কয়েকটি বাংলা মন্ত্র পাওয়া গেল। সেগুলির ভাষা অনেক স্থলে অতি প্রাচীন, অনেক স্থলে বোধ হয় যেন পরবর্তী লোকে কিছু কিছু বদলাইয়াছে, দুই-এক স্থলে অর্থবোধই হইল না। কাব্যতীর্থ মহাশয় যেমন শুনিয়াছিলেন, তেমনি লিখিয়া আনিয়াছেন, আমরাও তেমনি উদ্ধৃত করিলাম।

ধ্যানের মন্ত্র ॥

"বর্ণ যুগপতি সর্ব্ব গুণধাম।
শুন শুন সর্ব্বজন যুগের বিধান ॥
যে দিনেতে ভৃঙ্গীভার আছিল মণ্ডলে।
অদ্য বাসুকী নাগের জন্ম সেই কালে ॥
যোড় করিয়া নাগে জিজ্ঞাসে বারতা।
এক মুণ্ডে ছিল তার সহস্রেক মাথা ॥
নির্মাইলেন প্রেম হংসের বাতাসে।
আসন করিয়া প্রভু মনের হরিষে ॥
জলেতে ডুবিল হংস আহার কারণে।
কিছু না পাইয়া উঠে প্রভু সন্নিধানে ॥

গরল মুখের বিন্দু থাকে মস্তকের দেশে ।
নাগের নিশ্বাস কৈল ভাঁটায় জোয়ার ।
রাত্রদিন সাঁওলেন অনার দয়িতার ॥
তাহার উপরে রুধির প্রকাশ ।
দ্বিজ মূরতি কৈল আড়ম্ব কৈলাস ॥
যোগেতে মঙ্গল সৃজিলেন ভৃঙ্গীভার ।
অনন্ত কোটীদিগের কে করে বিচার ॥
কে করিতে পারে প্রভু আদ্যের জ্ঞেয়ান ।
ঘটে আসি পূজা লও স্বরূপনারাণ ॥
হীন নয় জন্ম মোর জাতির নাহি স্থিতি ।
লহ লহ জল পুষ্প যুগের যুগপতি ॥
গাছের বাকল নাহি পরে নাহি ছায়া ।
আগে আগে নিরঞ্জন নির্ম্মাইলেন কায়া ॥
তাঁহার ভকতে প্রভু করিলেন তার ।
বিষ্ণুর কারণে ভ্রমেণ নৈরাকার ॥
আগেতে ছিলেন প্রভু ললিত অবতার ।
তিনরূপ হইলেন ভ্রমিলেন সংসার ॥
তবেতো ভ্রমণ কৈল পশ্চিম মূরতি ।
দক্ষিণে ভ্রমণ কৈল পূর্ব্বে আইলেন স্থিতি ॥
অঙ্গে হাত বুলাইতে সৃজিলেন পার্ব্বতী ।
দেখিতে সুন্দররূপ মনোহর জ্যোতি ॥
টলিল ধর্ম্মের বিন্দু দেবী নিল করে ।
ধর্ম্ম সমরিয়া মাতা পূরিল উদরে ॥
তিল প্রমাণ হৈয়া গড়িল বসুমতী ।
দিনে দিনে পার্ব্বতীর বাড়িল উদর ॥
চলিতে শকতি নাহি যুড়ে দুই কর ।
কে জন্মিল বলিয়া বলেন যজ্ঞেশ্বর ॥
ব্রহ্মতালু দিয়া হৈল ব্রহ্মের জনম ।
ব্রহ্মজালে বিষ্ণুর দাহিছে তখন ॥
ক্ষীণকটি কুপিল কুমণ্ডল লৈয়া ।

হাতে বিষ্ণুর জন্ম হৈল কর্ণমূল দিয়া ॥
মনেতে বিচারি ত্রিদশেশ্বর।
জীবন্ত্রি শীতল কৈল ভূমিষ্ঠ মহেশ্বর ॥
তিনবার জনমিল এইতো উদরে।
অপার মহিমা লীলা কে বুঝিতে পারে ॥
ধর্ম্মের মঙ্গল গীত পণ্ডিত রমাই গান।
একল রমাই দ্বিজ শয়ে লব ধান ॥"

ইহার দুই-এক জায়গায় হেঁয়ালির মতো বোধ হয়। প্রাচীন ভাষা অতি দুর্বোধ, এই নিমিত্তই বোধ হয় ঐরূপ।

ঠাকুরের স্নানের মন্ত্রটি এই—

স্নানের মন্ত্র ॥

"ওঁ আরতি ভারতী গঙ্গা যমুনা চ সরস্বতী।
সরযবাং গণ্ডকী পুণ্যা শ্বেতগঙ্গা কৌশিকী ॥
ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা।
সদা স্বয় মনোভৃত্বা ভৃঙ্গারৈ ॥[১০]
জল লইয়া স্নান করেন ধর্ম্ম আগম জলে।
অখণ্ড তুলসীপত্র দিয়া পদতলে ॥
অভিগঙ্গা চূড়ামণি করেন ভকতি।
তুরিতে যে স্নান লেন গোঁসাঞি যুবতী ॥
ঢোলে সমুদ্র এল গোসাঞি ক্ষীরনদী।
গঙ্গা যমুনা এল বসন্ন বদরী ॥
শোভাধাত্রীগণ এল হোয়ে এক স্থানে।
স্নান করেন প্রভু ভগবানে ॥
স্নান আচালিত গীত পণ্ডিত রামএ গান।
একল রামএ দ্বিজ শয়ে লব ধান ॥"

রমাইর খাঁটি লেখা কিছু পাওয়া গেল—সুতরাং রমাইর একখানি ধর্মপূজার যে পদ্ধতি আছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ রহিল না। রমাইর পুস্তক অন্বেষণ করিবার জন্য সোসাইটির অন্যতম ভ্রমণকারী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র কাব্যতীর্থকে ঘাঁটাল অঞ্চলে পাঠাইলাম। তিনি যে-সকল তত্ত্ব

আনিলেন, তাহারো মধ্যে মধ্যে রমাই পণ্ডিতের নাম পাওয়া গেল, তিনিও মুখে মুখে শুনিয়া লিখিয়াছেন—

"ওঁ ষোল সহস্র গতি লয়ে শ্রীরমাই পণ্ডিত ধর্ম্মপূজা করিবারে যান। সেই পথ দিয়া ঋষি মুনি মার্কণ্ড যান ধূপে ধূনায় ধর্ম্মঘর দেখিবারে পান॥ কহেন মার্কণ্ড মুনি, শুন হে কপিল মুনি, কিসের শুনি জয় জয় কার। বলে মিথ্যাই আলম চাঁদা, মিথ্যাই বাজনা বাজে মিথ্যাই ধর্ম্ম উজন। ধর্ম্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করে মুনি মার্কণ্ড যান জ্বর বলি বোধ হল ঋষি মুনির গায়। অষ্টকূট চেলি শূল ব্যাধি মুনি মার্কণ্ড স্থান। আদ্যের ধবল দিল মুনির মুখেতে জাঁতিয়ে রমাই পণ্ডিত বলে মধুর পুষ্করিণী দিবে পৃষ্ঠের জাঙ্গাল। মধু মাংসে এ ঘর করিবে এককার॥ গতি ভকতের উচ্ছিষ্ট মুনি কুড়ায়ে খাবে। তবে তো মার্কণ্ড মুনি অমর পদ পাবে॥"

ঘাঁটাল হইতেও সংবাদ আসিল, রমাই পণ্ডিতই ধর্মপূজার পদ্ধতি করিয়াছেন। সেই অঞ্চলের ধর্মপূজার ধ্যানের মন্ত্র এই—

"স্বর্গ মর্ত্ত্য না ছিল যে পাতাল। উৎপত্তি না ছিল যম কাল॥ দেবা দেবী গুরু শিষ্য কেহ না ছিল। নীল অনিল ধর্ম্ম জন্ম যে লভিল॥ ধর্ম্মকে বাপে না দিলেন জন্ম। মায়ে না দিলেন উদরে ঠাঁই। শূন্যভরে জন্মিলেন অনাদ্য গোসাঞি॥ নিরঞ্জন নৈরাকার বুঝিতে না পারি। আপনি করিলেন প্রভু আপনার কায়া। হস্তপদ স্কন্ধ চক্ষু নিরঞ্জনের হইল। নয়ন মিলাইয়া তিনি দৃষ্টি মিলাইল॥ দেখিলেন নবখণ্ড ব্রহ্মা অগ্নিময়। তস্মাৎ দেব নিরঞ্জনায় নম॥"

ইহা পদ্য না গদ্য! ছেলেবেলা ঠান্দিদির মুখে এইরূপ না-পদ্য না-গদ্য না-মিল না-অমিল ষষ্ঠী মার্কণ্ডেয়ের কথা শুনিতাম. একি সেই জাতীয় রচনা?

পরিশেষে কুয়ান গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত ভুবনেশ্বর বিদ্যালংকার মহাশয়ের যত্নে ও পরিশ্রমে রমাই পণ্ডিত কৃত পদ্ধতির একখানি পুথি পাইয়াছি, অশিক্ষিত ডোম বা পোদ পণ্ডিতের নিকট হইতে নকল করিবার জন্য ও পুস্তক লইতে অনেক সাধ্য সাধনা ও যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছে। অন্যান্য ধর্মায়ণ পুস্তকে যেমন নানা দেবদেবীর বন্দনা আছে, রমাইর পুস্তকে তাহার কিছুই নাই, তাহাতে বন্দনাই নাই। অন্য ধর্মায়ণ পুথি-গুলি হয় ব্রাহ্মণের লেখা, না-হয় ইদানীন্তন লোকের লেখা, সুতরাং

তাহাতে ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে অন্য দেবতাও আছেন, কিন্তু রমাই পণ্ডিত খাঁটি ধর্মপণ্ডিত, ধর্ম ছাড়া তিনি আর-কিছু জানেন না, তাই তাঁহার ধর্মায়ণে অন্য দেবদেবীর বন্দনা নাই। তাঁহার পদ্ধতির এক অংশ পুরাণের ন্যায় সৃষ্টির ব্যাপারে পূর্ণ, তাহার আরম্ভ এই—

"শ্রীশ্রীধর্ম্মায় নম।
শূন্যপুরাণ লিখ্যতে—
নাই রেক নাই রূপ নাই ছিল বর্ণ চিহ্ন।
রবি শশী নাই ছিল নাই রাত্রি দিন॥
নাই ছিল জল স্থল নাই ছিল আকাশ।
মেরু মন্দার না ছিল না কৈলাস॥
দেবতা দেহারা নাই পূজিবার দেহ।
মহাশূন্য মধ্যে প্রভুর আর আছে কেহ॥
ঋষি যে তপস্বী নাই নাহিক ব্রাহ্মণ।
পর্ব্বত পাহাড় নাই নাহিক স্থাবর জঙ্গম॥
পুণ্য স্থল নাই ছিল নাই গঙ্গা জল।
সাগর সঙ্গম নাই দেবতা সকল॥
নাই সৃষ্টি ছিল আর নাই সুর নর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু না ছিল না ছিল আধার॥
বার ব্রত না ছিল ঋষি যে তপসী।
তীর্থস্থল নাহি ছিল গয়া বারাণসী॥
প্রয়াগ মাধব নাই কি করি বিচার।
স্বর্গ মর্ত্ত্য নাই ছিল সব ধুন্ধুকার॥
দশদিক্‌পাল নাই মেঘ তারাগণ।
আয়ু মৃত্যু নাই ছিল যমের তাড়ন॥
চারি বেদ নাই ছিল শাস্ত্রের বিচার।
গুপ্ত বেদ করিলেন প্রভু করতার॥
শ্রীধর্ম্মচরণারবিন্দ করিয়া প্রণতি।
শ্রীযুত রমাই কয় শুনরে ভারতী॥"

তবেই তো দেখা যাইতেছে, ধর্মঠাকুর যজ্ঞ নিন্দা করেন। এই কথা বলিয়াছিল বলিয়া মার্কণ্ডেয় মুনির কুষ্ঠ হইল। ধর্মঠাকুরের নাম আদ্য,

তিনি শূন্য হইতে সৃষ্টি করেন। শূন্য হইতে সৃষ্টি তো আর-কোনো ঠাকুর করেন নাই। শূন্যও তো হিন্দুদিগের মত নয়। মনু বলিয়াছেন—

"আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং।"

[মনু-সংহিতা ১.৫][১১]

"নাসীৎ" এমন কথা তো বলেন নাই। তবে এই ঘোর শূন্যবাদী যজ্ঞনিন্দাকারী 'ললিত অবতার' কে? ইঁহার (ভকৎ) ভক্তগণ সবই তো অনাচরণীয় জাতি। হিন্দুরা— ব্রাহ্মণেরা যাহাদের জল খান, এমন জাতি নিতান্ত গরজে— মানেতে না পড়িলে ধর্মঠাকুরের কাছে যান না। ধর্মায়ণের অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধর্মঠাকুরের ভকতে হিন্দুদিগের যথেষ্ট দ্বেষও করে, হিন্দু নাম ধরিয়া গালি দেয়। বোধ হয়, অনেক স্থলে ব্রাহ্মণদিগের বিরুদ্ধে মুসলমানদিগকে ইহারাই ডাকিয়া আনিয়াছিল। রমাই পণ্ডিতের পুথিতে শ্রীনিরঞ্জনের রুষ্মা নামে একটি অধ্যায় আছে সেটি ছোটো, সকল স্থলে অর্থবোধ হয় না, কিন্তু যাহা হয়, তাহাতেই ভকতগণের হিন্দুদ্বেষ ও যবনমৈত্রী প্রকাশ পায়। সে অধ্যায়টি কোনো রূপ সংশোধন না করিয়া অবিকল উঠাইয়া দিলাম।

শ্রীনিরঞ্জনের রুষ্মা।

"জাজপুর পুর বাদি, সোলসয় ঘর বেদি, বেদি লয় কর্ণয় যুন।
দক্ষিণ্যা মাগিতে যায়, যার ঘরে নাঞি পায়,
সাঁপ দিয়া পড়ায় ভুবন ॥
মালদহে নাগে কর দিনয় কর্ণযুন ॥
দক্ষিণা মাগিতে যায়, যার ঘরে নাহি পায়,
সাঁপ দিয়া পড়ায় ভুবন।
মালদহে নাগে কর, না চিনে আপন পর,
জালের নাঞিক দিশপাস।
বোলিষ্ঠ হইল বড়, দশ বিশ হয়্যা জোড়, সধর্ম্মিরে করএ বিনাশ ॥
বেদে করে উচ্চারণ, বের্যায় অগ্নি ঘনে ঘন,
দেখিয়া সভাই কম্ফমান।
মনেতে পাইয়া মর্ম্ম, সভে বলে রাখ ধর্ম্ম,
তোমা বিনে কে করে পরিত্রাণ ॥

এইরূপে দ্বিজগণ, করে ছিষ্টি সংহারণ, এ বড় হৈইল অবিচার।
বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম্ম, মনেতে পাইয়া মর্ম্ম, মায়াতে হইল অন্ধকার॥
ধর্ম্ম হৈল্যা যবনরূপি, মাথায়েতে কাল টুপি,
হাতে শোভে ত্রিরুচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয়, ত্রিভুবনে লাগে ভয়, খোদায় বলিয়া এক নাম॥
নিরঞ্জন নিরাকার, হৈল্যা ভেস্ত অবতার, মুখেতে বলেন দম্বদার।
যতেক দেবতাগণ, সবে হয়্যা একমন, আনন্দেতে পরিল ইজার॥
ব্রহ্মা হৈল্য মহাঁমদ, বিষ্ণু হৈল্যা পেকাম্বর, আদম্ফ হৈল্যা শূলপাণি।
গণেশ হইয়া গাজি, কার্ত্তিক হৈইল্য কাজি, ফকির হইল্য যত মুনি॥
তেজিয়া আপন ভেক, নারদ হৈইল্যা শেক, পুরন্দর হইল মৌলনা।
চন্দ্র সূর্য্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সবে,
সবে মেলি বাজায় বাজনা॥
আপুনি চণ্ডিকা দেবি, তিঁহ হৈল্যা হাঁয়া বিবি,
পদ্মাবতি হল্য বিবিনুর।
যতেক দেবতাগণ, হয়্যা সবে এক মন, প্রবেশ করিল জাজপুর॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে, কাড়্যা ফিড়্যা খায় রঙ্গে,
পাখড় পাখড় বলে বোল।
ধরিয়া ধর্ম্মের পায়, রামাঞি পণ্ডিত গায়, ই বড় বিসম গণ্ডগোল॥"

ধর্মরাজ যবন হইয়া আইলেন ব্রাহ্মণের উপদ্রব নিবারণের জন্য। এ-সকল কথার অর্থ কী? এই যে জাজপুরের নাম হইতেছে, এ কোন্ জাজপুর? উড়িষ্যার রাজধানী জাজপুর নহে, কারণ উড়িষ্যায় ধর্মঠাকুরের বড়ো একটা প্রাদুর্ভাব নাই। ইহা মানিক গাঙ্গুলির জাজপুর, এখানে ধর্মের নাম দেহার, ইহা বঙ্গে— রাঢ়ে। জাজপুর অঞ্চলে যখন মুসলমান আসে, তখন ধর্মঠাকুরের ভকতেরা তাহাদের সঙ্গে মিশেন ও মিশিয়া ব্রাহ্মণদের জব্দ করেন।

ধর্মঠাকুরের সিংহলে বড়ো সম্মান ছিল, একথা আমরা রমাই পণ্ডিতের পুস্তকে দেখিতে পাই। যথা—

"আদ্য ভূপতি নিমাব দেহারা ধর্ম্ম যথা আদি স্থান। নবখণ্ড পৃথিবী ঠেকেছে মেদিনী।

শ্রীধর্ম্মদেবতা সিংহলে বহুত সম্মান ॥”

ধর্মঠাকুরের ধ্যান অনেক জায়গায় সংস্কৃতে পাইয়াছি, তাহার মধ্যে একটি এই—

“ওঁ যস্যান্তং নাদি মধ্যং ন চ করপদং ভয়ং নাস্তি কায়া নির্নাদং।
নাকারং নাধিরূপং সকলদলগতং ন চ ভয়মরণং
যস্য যোগিনং সংকল্পহীনং স্বর্ণমূর্ত্তিনিরঞ্জনায় নমঃ ॥”[১২]

এ মন্ত্রটি আমরা ঘাঁটালের নিকট বীরসিংহা গ্রামের ধর্মঠাকুরের জনৈক পণ্ডিতের নিকট পাইয়াছি। আর-একটি যথা—

“যস্যান্তো নাদি মধ্যো ন চ করচরণং নাস্তি কায়নিদানং
নাকারং নাদিরূপং নাস্তি জন্ম ঝ [চ] যস্য।
যোগীন্দ্রো জ্ঞানগম্যো সকলজনগতং সর্ব্বলোকৈকনাথম্।
তত্ত্বং তঞ্চ নিরঞ্জনং[ম]মরবরদ পাতু বঃ শূন্যমূর্ত্তিঃ ॥”[১৩]

এ মন্ত্রটি আমরা সূঞাগাছির [বর্ধমান জেলা] ধর্ম পণ্ডিতের নিকট পাইয়াছি। পণ্ডিত মহাশয় জাতিতে ময়রা, উচ্চারণ বড়ো অপরিষ্কার। এ ধর্মঠাকুর পেটের অসুখের ঔষধ দেন। ইনি উচ্চ সিংহাসনের উপরে বসিয়া আছেন। ইঁহার গায়ে পিতলের টোপ। কিন্তু সে টোপ নিতান্ত কাছে না গেলে দেখা যায় না। আর-একটি মন্ত্র, যথা—

“যস্যান্তো নাদিমধ্যো ন চ করচরণৌ নাস্তি কায়ো নো নাদঃ
নাকারো নৈব রূপং ন চ ভয়মরণে নাস্তি জন্মানি যস্য।
যোগীন্দ্রৈর্ধ্যানগম্যং সকলজনময়ং সর্ব্বলোকৈকনাথং
ভক্তানাং কামপূরং সুরনরবরদং চিন্তয়েৎ শূন্যমূর্ত্তিং ॥”[১৪]

এ ধ্যানটি পূর্বোক্ত দুইটির একটি ভালো সংস্করণ মাত্র। ইহা ভাটপাড়ার ন্যায়শাস্ত্রাধ্যায়ী একটি পড়ুয়ার নিকট পাইয়াছি। তাঁহার নিবাস রাজঘাটের সন্নিকট। নিজের মানত থাকিলে পূজা করিতে হয় বলিয়া তিনি এইটি মুখস্থ করিয়াছেন। তাঁহাদের দেশে ধর্মঠাকুরের দুই রকম পুরোহিত থাকে, ছোটোলোক পুরোহিতেরাই প্রায় পূজা করে। ব্রাহ্মণ সময়ে সময়ে এবং সজ্জাতির মানতের জন্য পূজা করিয়া থাকেন। বোধ হয় সেকালের বাংলায় অথবা কোনোরূপ প্রাকৃত ভাষায় এ ধ্যানটি আগে রচিত হইয়াছিল, তাহার পর ক্রমে সংস্কৃত

করিবার চেষ্টা করা হইতেছে. কিন্তু যতই চেষ্টা করিতে চান, ব্যাকরণা-শুদ্ধির দায় এড়ানো যায় না। এ ঠাকুরটি শূন্যমূর্তি। শূন্যমূর্তি হয় কী করিয়া। মাধবাচার্য 'সর্বদর্শন-সংগ্রহে' বৌদ্ধদর্শন প্রস্তাবে লিখিয়াছেন, "অস্তি নাস্তি তদুভয়ানুভয়চতুষ্কোটিবিনির্মুক্তং শূন্যরূপম্।"[১৫] একি সেই শূন্যরূপ নাকি ?

ময়নাগড় হইতে সংবাদ পাইলাম যে বহু পূর্বে তথায় একটি পুষ্করিণীর মধ্য হইতে ধর্ম, শঙ্খ ও একখানি পাথর উঠিয়াছিল। পাথর ও শঙ্খ কেহ কখনো দেখে নাই. ধর্ম সবাই দেখিতেছে। একি ধর্ম, সংঘ ও বুদ্ধের প্রাদুর্ভাব নাকি ? কালক্রমে বুদ্ধ লোপ পাইয়াছেন, সংঘ শঙ্খ হইয়াছেন ও পরে লোপ পাইয়াছেন।

ধর্মঠাকুর বঙ্গ দেশের এক মহোপকার সাধন করিয়াছেন। তিনি যেখানে বর্তমান, সেইখানে অনাচরণীয় জাতির সংখ্যা অধিক এবং মুসলমান কম। রাঢ়ে এই ভাব, দাক্ষিণেও এই ভাব ; কিন্তু পূর্ব ও মধ্য-বাংলায় ভাব স্বতন্ত্র, সেখানে মুসলমান অধিক অনাচরণীয় জাতি কম। সেখানে ধর্মই যবনরূপী হইয়া আছেন নাকি ?

ঘনরামের ধর্মমঙ্গল আগাগোড়াই পড়ো— ব্রহ্মেণসজ্জনের নাম পাইবে না, কোথাও বারুই রাজা, কোথাও বা অন্য ছোটোলোক রাজা। গৌড়ের রাজার কোন্ জাতি তাহা কেহ বলে না। তাঁহার শ্যালীপো লাউসেনেরও কোন্ জাতি, তাহাও কেহ বলে না। ব্রাহ্মণ কায়স্থের কোনো প্রাধান্যই এ পুস্তকে নাই।

ধর্মঠাকুরের আরো অনেক কথা আছে। আমরা ক্রমে বলিব এবং এখনো অনুসন্ধান চলিতেছে, সকল পুস্তকও সংগৃহীত হয় নাই। যতদূর দেখা যাইতেছে, তাহাতে বোধ হইল যে ধর্মপূজা বৌদ্ধধর্মের ভগ্নাবশেষ। বৌদ্ধরা তো আপনাদিগকে কখনো বৌদ্ধ বলিত না, তাহারা আপন ধর্মকে সদ্ধর্ম বা ধর্ম বলিত। সেই ধর্ম নামটাই বজায় রহিয়াছে। বৌদ্ধদিগের উপাস্য বস্তু তিনটি বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘ। সংঘ অর্থে সন্ন্যাসীর দল। কালে বুদ্ধদেব লোপ পাইয়াছেন। ধর্ম বজায় আছেন। পাকা বারোমেসে সন্ন্যাসীর দল লোপ পাইয়াছে। গাজনি সন্ন্যাসীর দল হইয়াছে। ইহারা দশ-পনেরো দিনের জন্য সন্ন্যাসী হয়। সন্ন্যাসী হইলে বারোমেসে সন্ন্যাসীর যেরূপ মান্য ছিল ইহাদেরও

সেইরূপ মান্য হয়। ইহারা হবিষ্য করে ও নিজ হস্তে পূজা পাঠ করে। এ-সকল ব্যাপারই লুপ্ত বৌদ্ধধর্মের কথা মনে করিয়ে দেয়। তার পর ধর্মঠাকুরের সিংহলে খাতির বড়ো অধিক, তিনি যজ্ঞ নিন্দা করেন ; এ দুইটি কথাতেও তাঁহাকে বৌদ্ধদিগের ত্রিরত্নের অন্যতম রত্ন বলিয়া মনে হয়। রমাই পণ্ডিত এক জায়গায় তাঁহাকে ললিত অবতার বলিয়াছেন। বুদ্ধদেবের জীবন-চরিত 'ললিতবিস্তর' নামক গ্রন্থে ললিত শব্দটি কেন প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা এখনো নির্ণীত হয় নাই। 'ললিতবিস্তরে'র ললিত আর ললিত অবতারের ললিত একই অর্থে ব্যবহৃত হয় বলিয়া বোধ হয়। ইহার পর আর-এক কথা আছে, বৌদ্ধদিগের সর্বোচ্চ দর্শনের নাম শূন্যবাদ। প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থগুলি শূন্যতা ও মহাশূন্যতার বিচারেই প্রবৃত্ত। নির্বাণলাভ শব্দের অর্থ শূন্য হইয়া যাওয়া। হিন্দুর সহিত বৌদ্ধের সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রধান মতভেদ এই যে হিন্দুরা বলেন, "সদেব ইদমগ্র আসীৎ" ; বৌদ্ধেরা বলেন, "অসতঃ সৎ জায়তে"। আমাদের ধর্মঠাকুর নিজে শূন্যমূর্তি ও শূন্য হইতেই সৃষ্টি করেন. সুতরাং আমাদের ধর্মপূজার ব্যাপার যেরূপেই পরীক্ষা করিয়া দেখি, ঘুরিয়া ফিরিয়া বৌদ্ধধর্মের ভগ্নাবশেষ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এখনো কিছু নিশ্চয় করিয়া বলিবার সময় হয় নাই।

পরিশিষ্ট

ময়নাগড় ॥

যে লাউসেন হইতে ধর্মঠাকুরের প্রচার সমস্ত ধর্মায়ণ একবাক্যে স্বীকার করেন, সেই লাউসেনের রাজধানী ধর্মের প্রথমোৎপত্তি স্থল ময়নাগড় তমলুক হইতে ১৩/১৪ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। স্থানটি একটি জঙ্গলময় ক্ষুদ্রতম গ্রাম, ভদ্রলোকের বসবাস তো নাই-ই, ইতরলোকের সংখ্যাও খুব কম। তমলুক হইতে যাইবার পথও নাই, কোনো রকমে মাঠ ঘাট দিয়া যাইতে হয়। ময়নাগড়ে অন্য আর কিছুই নাই, থাকিবার মধ্যে একটি সুপ্রশস্ত প্রাচীন গড় আছে। কিংবদন্তি এই গড়ই রাজা লাউসেন কর্তৃক বিনির্মিত। গড়টি এখন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ও শ্বাপদসংকুল, তাহার চারি পাশে পরিখা আছে, তাহারো এখন দুরবস্থা; মধ্যে মধ্যে চর হইয়াছে, কোথাও বা সমভূম হইয়াছে। আসল কথা এখন আর কিছুই নাই, কেবল অতীতের ক্ষীণ স্মৃতি আছে। তাই আজও লোকে ইহাকে ময়না-গড় বলে ও অতীতের সুখ সমৃদ্ধি মনে করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে। সেই পরিখায় পরিবেষ্টিত একটি সুপ্রশস্ত প্রাচীন ইষ্টক নির্মিত বাড়ি আছে (লোকে উহাকেই গড় বলে)। বাড়িটির অবস্থাও অতি শোচনীয়। ময়নাগড়ে রাজবাড়ি ভিন্ন অথবা রাজগড় ভিন্ন আর বাড়ি নাই। এখন এ বাড়ির অধিকারী রাজাদের নাম শ্রীযুক্ত প্রেমানন্দ বাহুবলেন্দ্র, সচ্চিদা-নন্দ বাহুবলেন্দ্র ও পূর্ণানন্দ বাহুবলেন্দ্র, ইঁহারা তিন সহোদর। ইঁহারা লাউসেনের বংশীয় নহেন। ইঁহাদের আদি-পুরুষের নাম গোবর্ধনানন্দ বাহুবলেন্দ্র, আদি নিবাস বালিসিতা, পরে শিলদা, (দুইটিই মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত)। গোবর্ধনানন্দ বাহুবলেন্দ্র ময়নায় আসিয়া কী এক অপরিস্ফুট সূত্রে রাজত্ব করেন। তদবধি তাঁহার বংশীয়েরাই এখানকার রাজা। ইঁহাদের বিস্তৃত ইতিহাস ইঁহাদের কাছে আছে। এবং কতক *Modern History of Rajas & Zemindars*, by Loknath Ghosh part II গ্রন্থের ৩২৮ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে। এই বাড়িতে লাউসেনের একটি আসন আছে, কিংবদন্তি এই আসনে বসিয়া রাজা লাউসেন ইষ্ট-দেবীর পূজাদি করিতেন। আসনটি ইষ্টকনির্মিত চতুষ্কোণ একটি বেদি-

মাত্র, এখন উহা ভগ্ন ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ, কিন্তু পরম পবিত্র স্থান বলিয়া বিশেষরূপে সম্মানিত। রাজবাড়িতে লাউসেন-প্রতিষ্ঠিত এক কালীমূর্তি আছেন। দেবী প্রস্তরময়ী, মাপে তিন পোয়া মাত্র, তাঁহার চারিটি হস্ত। তিনি যে মন্দিরে থাকেন, সে স্থানে একই মন্দিরে একটি মহাদেবের লিঙ্গমূর্তি প্রতিষ্ঠিত, মন্দিরটি এখন ভগ্নপ্রায়, মন্দিরের আকার অনেকটা চাল দেওয়া একচূড়া থেব্ড়া বড়ো রথের মতো। মন্দিরটি বড়ো, দেয়ালে ইটের উপর নানাবিধ খোদিত মূর্তি প্রভৃতি কারুকার্য।— দেবীর নাম রঙ্কিণী। মহাদেবের নাম লৌকেশ্বর (সম্ভবত লোকেশ্বর)। দেবদেবীর নিত্য পূজা হইয়া থাকে। পূজা কিন্তু সাত্ত্বিক, কোনোকালে বলিদান হয় না। গড়ের একদিকে একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে, তথায় ধর্মঠাকুরের পূজা হয়। ধর্মঠাকুর কিন্তু সেখানে থাকিতে পান না, তিনি গড় হইতে প্রায় দুই ক্রোশ উত্তরে বৃন্দাবন-চক নামক স্থানে থাকেন। কেবল বৎসরে একদিন ভাদ্র সংক্রান্তিতে সন্ধ্যার সময় তথা হইতে আনীত হইয়া গড়ের সেই নির্দিষ্ট স্থানে পূজিত হয়েন ও সেই দিবসই পূজার পর তাঁহাকে স্বস্থানে লইয়া যাইতে হয়, কেন যে থাকিতে পান না বা থাকেন না, তাহার কোনো কারণ কেহ জানেন না। বৃন্দাবন-চক একটি ক্ষুদ্র পল্লিগ্রাম, তবে তত জঙ্গলময় নয়, দশ ঘর শ্রমজীবী গৃহস্থের বাস আছে। চারি দিকে বড়ো বড়ো মাঠ ও মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্করিণীও আছে। এই বৃন্দাবন-চকে যেখানে এখন ধর্মঠাকুর থাকেন, তাঁহার মন্দিরের সম্মুখে ও সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্র পুকুর আছে, পুকুরটি দেখিলে একেবারেই প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। তবুও কিংবদন্তি যে সেই পুকুর হইতেই নাকি এই ধর্মঠাকুর, একখানি পাথর ও একটি শঙ্খ এবং এক-খানি ধর্মেরই পূজার পদ্ধতি আবির্ভূত হইয়াছিল। তখন নাকি লাউ-সেনের আধিপত্য, আবার সেই লাউসেনই নাকি ইহার বহুল প্রচার করিয়া যান। এখন কিন্তু আর সে শঙ্খ নাই, পাথরখানিও নাই, আছেন কেবল স্বয়ং ধর্মঠাকুর ও তাঁহার পূজার পদ্ধতি। ঠাকুরের আকার কচ্ছপের মতো, দন্তুর মতো শুঁড় প্রভৃতি কচ্ছপের যাহা যাহা থাকে, সবই আছে, অধিকন্তু তলপেটে একটি সচক্র ছোটো সর্প খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। ঠাকুরের পূজকেরা বলেন, উহা অনন্ত, অনন্তের উপর ভগবান্ অবস্থিত ইত্যাদি ইত্যাদি। পুকুর হইতে উত্তোলিত হইয়া ঠাকুর সেই বৃন্দাবন-

চকেই রহিলেন। যে স্থানে ঠাকুর থাকেন, উহা প্রসিদ্ধ মন্দিরের মতো নহে, উহা একখানি ঘর। ঘরখানির চারি দিকে পাকা দেয়াল, উপরে খড়ের চাল, ঠাকুর ঘরের মধ্যস্থলে একটি বেদির উপর কাঠের দোল-চৌকিতে থাকেন। ঠাকুরের কিছু জমি-জারাৎ আছে, তাহাতে আয় প্রায় বার্ষিক তিন শত টাকা হইবে। উহার উপস্বত্ব হইতে উহার পূজা হয়। এই উপস্বত্ব উহার পূজকেরাই আদায় ও খরচাদি করিয়া থাকে। উহার পূজকেরা জাতিতে কৈবর্ত। ব্রাহ্মণে ইচ্ছা করিলে ধর্মের পূজা করিতে পারেন এইমাত্র, কিন্তু কৈবর্তেরাই পূজার প্রকৃত মালিক। পূজক-দিগকে পণ্ডিত বলে। ইহারা কৈবর্ত হইলেও ধর্মের পূজক বলিয়া ১৫ দিন অশৌচ ভোগ করে। ইহারা আপনাদের অন্যান্য কুটুম্বদের বাড়িতে আহার করে না, এমন-কি শ্বশুর বাড়িতেও খায় না, তবে নূতন হাঁড়িতে রাঁধিয়া দিলে খায়। ইহারা মাছ খায় না, ইহাদের চিহ্ন তর্জনীতে একটি অষ্ট ধাতুর অঙ্গুরীয় থাকে। ইহারা স্বজাতিমহলে বিশেষ সম্মানিত। ইহারা চাষা হইলেও নিজে লাঙল ধরিয়া চাষ করে না, কিন্তু লাঙল ধরা চাষাদের সহিত কুটুম্বিতা করে। ধর্মের পূজা নিত্য হয়। প্রাতঃকালে স্নানাদির পর অনাহারেই পূজা বিহিত ; স্নান না করিয়া হয় না। ধর্মের ঘট স্থাপনা নাই। পূজা করিবার নিয়ম এই— নিত্য তিথি অনুসারে সংকল্প করিতে হয়। নিত্যই ঠাকুরকে স্নান করাইতে হয়। (স্নানের মন্ত্র মূল প্রবন্ধে দেখ)। তারপর শালগ্রাম শিলার মতো উপর নিচে সচন্দন তুলসী দিয়া ধ্যান করিতে হয়।— (ধ্যানের মন্ত্র মূলে দেখ)। পরে যথাক্রমে পুষ্পাদি দিয়া পূজা করিতে হয়। ধাং ধীং ধং ধর্মায় নমঃ ইহাই ইঁহার বীজ, তুলস্যাদি এই মন্ত্রেই দিতে হয়। পূজা পঞ্চোপচারে, ষোড়শোপচারে যখন যেমন ঘটিয়া উঠে করিলেও চলে। কোনো বাঁধা বাঁধি নাই। ধর্মের স্তুতি— "শ্বেতবস্ত্রং শ্বেতমাল্যং শ্বেতযজ্ঞোপবীতকং। শ্বেতাসনং শ্বেতরূপং নিরঞ্জন নমোস্তুতে ॥" ধর্মের প্রণাম— "আকাশাৎ পতিতো তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরং। সর্ব্বদেবনমস্কারং কেশবং প্রতি গচ্ছতি ॥" এই গেল পূজার বিধি।

ধর্মের নিত্য পূজায় /৫ সের করিয়া আতপ চাউলের নৈবেদ্য চাই, কমে হইবে না, বেশি যে যত দিতে পারে। অন্যান্য উপকরণ কলা, বাতাসা, নারিকেল, শশা, মুগ, কাঁচা দুধ, (জল দেওয়া চলিবে না)

ইত্যাদি। প্রত্যহ সায়াহ্নে পঞ্চ প্রদীপ দিয়া আরতি করিতে হয়। এখানে ধর্মের বলি হয় না, তুলসীপত্র দিয়া পূজা করিতে হয়। বিল্বপত্র একেবারে চলে না।

ধর্মকে সকলে বিশেষ মান্য করে। পীড়াদি কোনোরূপ দৈব দুর্বিপাকে ধর্মের মানত করে। শনি বা মঙ্গলবারে মানসিক পূজা দিবার নিয়ম। তবে পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি প্রভৃতি পুণ্যদিনেও দিতে পারা যায়। ধর্মের মানত করিয়া লোকে মাথায় চুল রাখে, দাড়ি কি নখ রাখে না। গৃহস্থেরা বালক বালিকার চুল ধর্মের কাছেই দেয়, দ্বিতীয় পঞ্চানন নাই। ভাদ্র ও বৈশাখে সংক্রান্তিতে ধর্মের গাজন হয়, তাহাতে নানা স্থান হইতে অনেক যাত্রী সমবেত হয়, যাত্রীরা সংক্রান্তির পূর্ব দিনে হবিষ্য অথবা ফল-মূলাদি আহার করিয়া থাকে। পরে গাজনের দিন পূজা দিয়া ধর্মের প্রসাদ পায় ও সারা দিন-রাত ধর্মেরই গান গায়। এ পূজাও প্রাতঃ-কালেই হয়। গাজনের যাত্রীরা রাত্রিতে ধর্মের ঘরে পূজা দেয়। যাত্রীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকল জাতিই আসে। তবে ব্রাহ্মণের পূজা ইচ্ছা করিলে ব্রাহ্মণে করিতে পারে। ধর্মের মানস করিলে কোনো বার করিবার নিয়ম নাই। ধর্মকে লোকে বাড়ি আনিয়াও পূজা দেয়, খুব ধুমধাম করে, ঢাক-ঢোল বাজায়। আমি একটি মানসকারীর বাড়িতে পূজা দেখিয়াছি। মানসকারী একটি ঘরের মধ্যস্থলে ধর্মঠাকুরকে আনিয়াছে, ধর্মপূজক পণ্ডিত পূজা করিতেছে। হাজার পাঁচশ তুলসী দিতেছে। (গৃহস্থের তো মানস-ই সেইরূপ)। তাহার পার্শ্বে দুই ধারে দুই-তিন-জন ব্রাহ্মণ শালগ্রাম শিলা পূজা করিতেছেন ও তুলসী দিতেছেন। পণ্ডিতদের সম্মান ব্রাহ্মণের মতোই। পণ্ডিত শালগ্রাম শিলা পূজা করিতে পারে না। ধর্মের পক্ব অন্ন ভোগ হয় না, নৈবেদ্যাদি আমান্নই দিতে হয়। বলি তো হয়-ই না। শুনিতে পাওয়া যায়, ময়নাগড় পরগনাতেই নাকি বলি নাই। এখানকার লোকে ধর্মকে কূর্মরূপী বিষ্ণু বলে। ধর্ম পূজা করিতে গেলে আসন শুদ্ধ্যাদি দস্তুর মতো সবই করিতে হয়। মোট কথা এখানকার ধর্ম বিশেষ প্রতিষ্ঠিত। মুসলমানেও ইঁহাকে মানে। গাজনের যাত্রীরা যাহা যাহা পূজা দেয়, পণ্ডিত সে সমস্তই নাম ও গোত্র নির্দেশ করিয়া উৎসর্গ করিয়া দেয়। পরে দক্ষিণা পায়। গাজনের যাত্রীরা ধর্মের ঘরে কাদার একটা চাপের উপর একটি কাটি পুঁতিয়া

তাহাকে তুলা জড়াইয়া ঘৃত দিয়া দীপাকার করিয়া জ্বালিয়া দেয়। তাহাও উৎসৃষ্ট হয়। এ দীপ যাত্রীদের দিতেই হইবে। যাহাদের শিত্রী হয়, তাহারা চুন মানস করে অর্থাৎ সারিয়া গেলে চুন দিয়া ধর্মের পূজা দেয়, সেই চুন ঠাকুরের ঘরে দেওয়া হয়।

শ্রীবিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'
প্রথম সংখ্যা, ১৩০৪ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য।

রবিবার, ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩ বঙ্গাব্দ, ৬ জুন ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের ভবনে পরিষৎ-কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে শাস্ত্রীমশায়ের অনুপস্থিতিতে তাঁর লেখা "রমাই পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গল" প্রবন্ধটি পড়া হয়। সভায় সভাপতি ছিলেন রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী। সভার কার্যবিবরণে উল্লেখ আছে—

"অতঃপর শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের রমাই পণ্ডিতের'"ধর্ম্মমঙ্গল" বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। পাঠান্তে প্রবন্ধের বিষয়ে অনেক আলোচনা হইল। সে আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—

"সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধোক্ত অনেক কথার সহিত তাঁহার মতভেদ আছে। ধর্ম্মপূজা যে বৌদ্ধধর্ম্মের রূপান্তর এ মত তিনি স্বীকার করেন না। ধর্ম্মমঙ্গল পুঁথিতে শূন্য শব্দের ব্যবহার দেখিয়াই যে বৌদ্ধ দর্শনের শূন্যতাবাদ বুঝিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। উহা হিন্দু দার্শনিক অভিনবগুপ্তের শূন্যতাবাদ অর্থাৎ (Nothing) হইতে সৃষ্টিপ্রণালীবাদও বুঝাইতে পারে। ফলকথা এরূপ একটী শব্দ হইতে মত বিশেষের অনুমান তাদৃশ যুক্তি সঙ্গত নহে। পরন্তু ধর্ম্মমঙ্গল হইতে উদ্ধৃত অংশগুলি তাদৃশ প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল না। প্রবন্ধের ঐতিহাসিক মূল্য অধিক নহে এবং প্রবন্ধের স্থানে স্থানে ভাষাগত দোষ দৃষ্ট হইল। তাঁহার মতে প্রবন্ধটী বর্ত্তমান আকারে পরিষৎ পত্রিকায় মুদ্রিত হইবার যোগ্য নহে। তবে সমবেত সভ্যবর্গ যেরূপ বিবেচনা করিবেন, সেইরূপ হইবে।

"শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন যে, সভাপতি মহাশয় যে অভিনবগুপ্তের উল্লেখ করিলেন, তিনি প্রথমে শৈব থাকিলেও শেষে বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ধর্ম্মপূজা যে বৌদ্ধধর্ম্মের অপভ্রংশ এরূপ নিশ্চিত করিয়া বলেন নাই। প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া অনুমান করিয়াছেন মাত্র। প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া উচিত।

"সম্পাদক [হীরেন্দ্রনাথ দত্ত] বলিলেন যে তাঁহার বিশ্বাস প্রবন্ধ পাঠে পত্রিকার পাঠক আনন্দ ও উপকার লাভ করিবে। প্রবন্ধে অনেক নূতন কথা

আছে। ঐতিহাসিক হিসাবে প্রবন্ধের মূল্য অল্প নহে। তাঁহার জ্ঞানমতে শূন্যবাদ বৌদ্ধদর্শনের একটি বিশেষত্ব।

"শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিলেন যে, ধর্ম্মপূজার ঐতিহাসিক মূল শূন্যবাদের আলোচনা ঐ সকল পরিষদের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক। তবে যখন কথা উঠিয়াছে, তখন তিনি যাহা জানেন বলা ভাল। তাঁহাদের গ্রামে ধর্ম্মের মন্দির আছে। ধর্ম্মের পূজক জাতিতে কুম্ভকার বটে, কিন্তু উচ্চবর্ণের লোকেরাও ধর্ম্মপূজায় বিশেষভাবে যোগদান করে। তাঁহার বিশ্বাস বৌদ্ধধর্ম্মের এমন কিছুই নাই, যাহা হিন্দুধর্ম্মে নাই, শূন্যতাবাদও হিন্দুদর্শনে পাওয়া যায় না এরূপ নহে।

"শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধোক্ত ধর্ম্মপূজার বিবরণ শুনিয়া বোধ হইল যেন ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের কিছু সম্পর্ক আছে। প্রবন্ধ পত্রিকায় মুদ্রিত হওয়া উচিত। প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যের ভাষার আলোচনায় সাহিত্যের উপকার হইতে পারে। শূন্যতাবাদ হিন্দুদর্শনেও আছে।

"শ্রীযুক্ত শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহার শৈশবে তিনি বীরভূম জেলায় ধর্ম্মপূজা দেখিয়াছেন। ধর্ম্মঠাকুরের নিকট অনেকরূপ বলি দিবার প্রথা আছে। বৌদ্ধধর্ম্মের মূল সূত্র 'অহিংসা', সেইজন্য মনে হয়, ধর্ম্মপূজার সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। যমরাজকে ধর্ম্মরাজ বলে। তাঁহার বোধ হয়, ধর্ম্মপূজা যমের পূজা। ধর্ম্মের নিকট লোকে রোগ শান্তির জন্য মানসিক করে। তাঁহার মতে প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া উচিত।

"শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল রায় মহাশয় বলিলেন যে, বন্দীপুরের শ্যামরায় ঠাকুরের উল্লেখ হইয়াছে, তিনি সেই বন্দীপুরের রায়-বংশধর। বন্দীপুরে উচ্চবর্ণও ধর্ম্মপূজায় যোগদান করেন। বৌদ্ধদিগের মধ্যেও তান্ত্রিক দল আছে। তাহাদের মধ্যে মদ্যপান, শূকর ভোজন প্রভৃতি প্রথা প্রচলিত আছে।

"শ্রীযুক্ত যাদব কিশোর গোস্বামী মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহার মতে প্রবন্ধ পত্রিকায় মুদ্রিত হওয়া উচিত।

"শ্রীযুক্ত হারাধন দত্ত ভক্তনিধি মহাশয় বলিলেন যে, ধর্ম্মপূজা কেন নিম্ন-শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত হইল? ধর্ম্ম কেন নীচগামী হইলেন? তাহার বিবরণ খেলারামের ধর্ম্মমঙ্গল গ্রন্থে লিখিত আছে। সেই পুস্তক তিনি প্রকাশ করিবেন মনস্থ করিয়াছেন।

"শ্রীযুক্ত প্রতুলচন্দ্র বসু বলিলেন যে, প্রবন্ধের ভাষা স্থানে স্থানে সংস্কৃত করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশ করা উচিত।

"সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহার অনেক কথা না বুঝিয়া কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছেন। ধর্ম্মপূজার সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্রব আছে, এ মত শাস্ত্রীমশায় ইতিপূর্বে প্রকাশ করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে সে মত বিশেষ প্রকাশ না করিলেও তাঁহার অভিপ্রায় যে ঐরূপ তাহা বুঝা যায়। যে যুক্তি বলে

শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধ সংস্রব প্রমাণিত করিতে চাহেন, তাহা যুক্তি সিদ্ধ নহে। শূন্যতাবাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে ভাবে বলিয়াছেন, তাহা অনেকে বুঝেন নাই। শূন্যতাবাদীরা Matter ও Mind (জড় ও চিৎ) এই উভয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। অভিনবগুপ্ত বৌদ্ধ ছিলেন, একথা তিনি স্বীকার করেন না, কারণ তিনি নিজ গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে 'শূলীকে' (মহাদেবকে) নমস্কার করিয়াছেন। প্রবন্ধ সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য এই যে, উহার ভাষা গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট। সেইজন্য তিনি উহার পত্রিকায় মুদ্রণ বিষয়ে আপত্তি করিয়াছিলেন। ভাষা সংস্কৃত করিলে তাহার আপত্তি থাকিবে না। মৌলিকতা অথবা গবেষণার পরিচয় প্রভৃতি বিষয়ে তিনি প্রবন্ধের কোন অনাদর করেন নাই।

"শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় প্রস্তাব করিলেন প্রবন্ধ কিভাবে মুদ্রিত হইবে তাহার ভার পত্রিকা-সম্পাদকের উপর অর্পিত হউক। ঐ প্রস্তাব গৃহীত হইল।" (দ্র. সা-প-প, ১৩০৪ ব.)

১৩২১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির অভিভাষণে শাস্ত্রীমশায় বলেছিলেন—

"যখন ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে অনেকগুলি পুথি সংগ্রহ হইল এবং অনেক বৃত্তান্ত পাওয়া গেল তখন ধর্মঠাকুর যে বৌদ্ধ, আমি একটি বাংলা প্রবন্ধে সেইটি লিপিবদ্ধ করিলাম। এইরূপ লিপিবদ্ধ করার প্রধান কারণ এই যে, ঐ সম্বন্ধে বাংলায় যাহা-কিছু পাওয়া গিয়াছে, তাহার একটা ইতিহাস লিখিয়া রাখিয়া নেপালে হিন্দুরাজার অধীনে বৌদ্ধধর্ম কিরূপ চলিতেছে দেখিতে যাইলাম। সে প্রবন্ধ প্রকাশ করিবার আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। প্রবন্ধটি যখন লিখিতেছি, তখন নগেনবাবু আমার নৈহাটির বাড়িতে যান। কথা ছিল, তিনি আমার সঙ্গে যাইবেন ; তাঁহার যাওয়া হইল না, সেই কথা বলিবার জন্য তিনি নৈহাটি যান এবং সেখান হইতে সাহিত্য-পরিষদে দিব বলিয়া প্রবন্ধটি লইয়া আসেন। আসিয়া শুনিলাম, আমার অনুপস্থিতিতে এই প্রবন্ধ পড়া হয়, তখন অনেকে ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিলেন। একজন বলিয়াছিলেন— ছিঃ! জেলে মালারা যে ধর্মঠাকুরের পূজা করে, সে ধর্মঠাকুর কি না বৌদ্ধ! ছিঃ!

"যা হোক, আমি নেপাল হইতে আসিয়া *Discovery of Living Buddhism in Bengal* [১৮৯৭ খৃ.] নামে একটি ইংরাজি প্রবন্ধ ছাপাই। এইবার প্রকাশ্যে বলিয়া দিই, ধর্মঠাকুরের পূজাই বৌদ্ধধর্মের শেষ।" (হ-র-সং-২, পৃ. ৩১৯-২০)।

এই প্রবন্ধের শেষ বাক্য, "কিন্তু এখনো কিছু নিশ্চয় করিয়া বলিবার সময় হয় নাই।" তাঁর রচনা ধারা অনুসরণ করলে দেখা যায় আরো কিছু আগে থেকে তিনি ধর্ম-পূজা সম্পর্কে আগ্রহ পোষণ করে এসেছেন। ১৮৯৪ খৃস্টাব্দের

ডিসেম্বর মাসে এশিয়াটিক সোসাইটিতে তিনি "Discovery of the remnants of Buddhism in Bengal" নামে একটি ছোটো প্রবন্ধ পড়েন। এই প্রবন্ধে দেবতার নাম, মন্দিরের পূর্ব অথবা দক্ষিণ-মুখী গড়ন, 'টোপ' বা পেতলের পেরেক বসানো ধর্মশিলা, পুরোহিত হন ডোম-পোদ-বাগদি জাতীয় মানুষ, নিত্যপূজা প্রচলিত নয়. বৈশাখী পূর্ণিমায় বাৎসরিক সমারোহপূর্ণ পূজা, চড়ক. ধর্মমঙ্গল গাওয়া এবং অদ্ভুত পূজার মন্ত্র— ধর্ম-পূজার এই ৯টি বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে মন্তব্য করেছেন—

"In reviewing the work *Dharma Mangal* published by the Bangavasi press [ঘনরাম চক্রবর্তী রচিত, প্রকাশ ১২৯১ ব.], I wrote in one of the annual reports of the Bengal library that the Dharma cult might either be a remnant of decayed Buddhism or *that it might be same form of non-Aryan worship*. But the discovery of the *mantra* and the fact that the annual festival is held on the birth-day of Buddha leave little doubt of the Buddhistic origin of this cult." (*Proceedings of A-S-B*, 1894, pp. 135-38).

১৮৮৫ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে শাস্ত্রীমশায় "Buddhism in Bengal since the Muhammadan conquest" (এই বইয়ের পরিশিষ্ট দ্র.) নামে আর-একটি প্রবন্ধ পড়েন। আগের প্রবন্ধটিতে একবার "…it might be same form of non-Aryan worship"—অনুমান করেও প্রায় নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করেছিলেন ধর্মপূজার উৎস বৌদ্ধধর্মে। এই প্রবন্ধে আবার ধর্মপূজার ভিন্ন উৎস অনুমান করেছেন দেখা যায়। প্রবন্ধটির ৬ অনুচ্ছেদে লিখেছেন—

"A sort of corrupt Buddhism mixed up with a variety of Aryan and non-Aryan forms of worship, still obtains in Bengal amongst a very large number of lower class people."

আরো বলেছেন, সম্ভবত পাল-রাজত্বের সময়ে আদিম কোনো পূজাপদ্ধতির সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের মিশ্রণে ধর্মপূজার উদ্ভব হয়েছিল এবং লৌকিক প্রবণতার অনুকূল হওয়ায় এখনো টিকে রয়েছে। নেপাল ও তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস থেকে এ তো সুবিদিত যে, নানান্ অপদেবতা ও অন্যান্য পূজা পদ্ধতি আত্মসাৎ করে নেবার আশ্চর্য প্রবণতা বৌদ্ধধর্মে রয়েছে। মনে হয় ধর্মপূজা আদিম সমাজের এই ধরনের কোনো সংস্কারের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের মিশ্রণ।

১৮৯৫ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে শাস্ত্রীমশায় এশিয়াটিক সোসাইটিতে "*Śri-Dharma-Mangala* : A distant echo of the Lalita-Vistara" নামে আর-একটি প্রবন্ধ পড়েন। এই প্রবন্ধে 'শ্রীধর্মমঙ্গল' এবং

বুদ্ধ-জীবনী 'ললিতবিস্তরে'র মধ্যে যে মিল দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন তার ভিত্তি খুব দৃঢ় নয়। প্রবন্ধের মধ্যে নিজেই বলেছেন—

"There are these and other points of resemblances between the two stories, but the points of difference are many, various and striking."

এ সত্ত্বেও ধর্মপূজাকে বৌদ্ধধর্মের অবশেষ প্রতিপন্ন করার প্রবণতা প্রবন্ধটিতে প্রবল। এই প্রবণতা আরো স্পষ্ট ও পরিণত হয়েছে ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত *Discovery of Living Buddhism in Bengal* পুস্তিকায় (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩১)। পুস্তিকাটির What is Dharma ? অনুচ্ছেদে লিখেছেন—

"In the previous paragraphs an attempt, *however imperfect*, has been made to identify Dharma worship with the Bauddha religion. It has been shown that the followers of Dharma equally with the followers of Buddha believe that the world sprang from non-existence. It has been shown that the all-seeing eyes are prominent things both in the images of Dharma and in the Chaityas of the Buddhists. It has been shown that like Buddhism in Nepal the Dharma worshippers have admitted Ganeśa, Mahākāla or Pañcānanda and Śitalā into their pantheon. Many minor identities have also been pointed out. But an objector might now say, all this might be quite true ; but if Dharma worship were really Buddhism why should it have a new name? This may be answered by saying that Dharma is not a name new to the Buddhists. Dharma is the most prominent person or conception in the Buddhist trinity. He used to be represented by the most prominet object in a Buddhist neighbourhood *viz.* the Chaitya, or Stūpa rising from two or three to two hundred or three hundred feet above the level of the ground. The Nepalese perambulate the Chaitya, but worship the various Dhyānī Buddhas who have their places assigned in niches around this huge mass of brick or stone. But there are no niches in the Tibetan Stūpas. There they perambulate and worship this huge object. In Nepal Śākya Muni is regarded as

Vyāsa, one who has simply recorded the Buddhist tradition. His figure is prominent in the Vihāras where monks used to live in ancient time and where the Bāndās or prists now live. But in the greatest places of Buddhist worship, *viz.* the Svyambhū and the Māhābodha he is nowhere. The Sangha is generally represented by Padmapāṇi or Lokeśvara who has his shrines scattered all over Nepal. But he is not to be found in the Stūpa. So out of the three Buddha, and Saṁgha were placed in an inferior position and Dharma held a strikingly prominent position. It is no wonder that the ignorant Buddhist votaries should in the lapse of several centuries stick to Dharma and forgo Buddha and Saṁgha. There is another reason why Buddhism should be known as Dharma worship. The Buddhists called their religion Saddharma or Dharma. They rarely, if ever, called their religion Bauddha Dharma. The Hindus called them Bauddhas and they called the Hindus Pāṣaṇdas. They called themselves Sadharmachintakāh. Under such circumstances, after the massacre of a large number of Buddhist priests and after the affiliation of the literate and wealthy classes among the lay Buddhists into various grades of Hindu castes, it is no wonder that the ignorant masses without intelligent guidance should forget their own traditions and form a new one according to their ignorant fancy." (pp. 26-27).

দেখা যাচ্ছে, নেপালে বৌদ্ধধর্মের পরিণতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতার আলোয় তিনি বাংলা দেশের ধর্মপূজা বৌদ্ধধর্মের অবশেষ— এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন। অনার্য কৌম সংস্কৃতির আদি স্তরের এক বা একাধিক দেবতা-কল্পনা পরবর্তীকালের ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-ইসলামি প্রভাবে রূপান্তরিত হয়ে ধর্মপূজা রূপে নিম্নবর্গের মানুষের জীবনে স্থায়ী হয়ে থাকতে পারে— অনুসন্ধানের এই গুরুত্বপূর্ণ সূত্রটি শাস্ত্রীমশায় আর অনুসরণ করেন নি। অথচ খুব স্পষ্টভাবে এ ইঙ্গিত তাঁর লেখাতেই রয়েছে। ধর্মপূজার উৎস সম্পর্কে পরবর্তী গবেষণা এই সূত্র ধরে এগিয়েছে। বাংলার ধর্মভাবনা ও আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে গবেষণায় প্রতিপন্ন হয়েছে, কোনো দেব-দেবী কল্পনা একক-উৎস-জাত বা monogenetic নয়।

ধর্ম দেবতার স্বরূপ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র রায় (সূর্য ও ধর্ম অভিন্ন), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (মূলত অনার্য অনুষ্ঠান, অস্ট্রিক জাতীয় আদিবাসী সমাজে উদ্ভূত), ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (আদিম পূজা পদ্ধতির সঙ্গে বৌদ্ধ, শৈব উপাদানের মিশ্রণ), শ্রীসুকুমার সেন (হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান ধর্মের অনুষ্ঠান গৃহীত, জন্ম-সূত্রে ধর্ম হলেন বৈদিক দেবতা বরুণ, আদিত্য-যম-সোম প্রভৃতি বৈদিক দেবতার মিশ্রণ আছে), আশুতোষ ভট্টাচার্য (অনার্য দেবতা, পরে পৌরাণিক প্রভাবে ধর্ম) প্রমুখ গবেষকদের বিচার-বিশ্লেষণে ধর্মদেবতার মিশ্র রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ধর্মপূজা বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণতি, শাস্ত্রীমশায়ের এই সিদ্ধান্ত পরিত্যক্ত হলেও তাঁর অন্যতর অনুমানটি পরবর্তী গবেষণায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এবং ধর্মদেবতা কল্পনায় বৌদ্ধ উপাদানও স্বীকৃত। ধর্মপূজা সম্পর্কে আলোচনায় শাস্ত্রীমশায় বাংলার নিম্নবর্গের মানুষের এক বিরাট অংশের সাংস্কৃতিক পরিচয় উন্মোচনের উপায় নির্দেশ করেছিলেন—এ কৃতিত্ব ম্লান হবার নয়। দ্র. Suniti Kumar Chatterji, "Buddhist Survivals in Bengal", *B. C. Law Commemoration Volume*, Part I, Calcutta 1945 ; Sukumar Sen, "Is the cult of Dharma a living relic of Buddhism", *Ibid* ; K. P. Chatterjee, "Dharma Worship", *J-A-S-B*, Vol. VIII 1942 ; Sarat Chandra Roy, *The Kharis*, Ranchi 1937 ; সুকুমার সেন, পঞ্চানন মণ্ডল, সুনন্দা সেন সম্পাদিত 'রূপরামের ধর্মমঙ্গল' প্রথম খণ্ড, বর্ধমান সাহিত্য-সভা, ১৩৬৩ ব. ; অমলেন্দু মিত্র, 'রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর', কলকাতা ১৯৭২ খৃ. এবং হ-র-২, পৃ. ৩৯৯-৪২০।

আমাদের ধর্মভাবনা বা অধ্যাত্মচিন্তা আর্যদের আগমনের পর থেকে এদেশে তিনটি ধারায় চলে এসেছে। এই তিনটি ধারা হল দেব-ধারা, গন্ধর্ব-ধারা, আর যোগ-ধারা। দেব-ধারা ইন্দো-য়ুরোপীয় মূল ধারা থেকে বয়ে এসেছে। গন্ধর্ব-ধারা ইন্দো-ইরানীয় সময়ে উদ্ভূত হয়ে তারপর ভারতবর্ষে এসে শক্তিমান ধারায় পরিণত হয়েছে। আর যোগ-ধারার প্রাক্-ইতিহাস সম্বন্ধে কোনো নির্দিষ্ট তত্ত্ব এখনো ঠিক করতে পারা যায় নি। বৈদিক যুগের অল্পকাল পরে দেব-ধারা গন্ধর্ব-ধারার সঙ্গে মিশে যায়। গন্ধর্ব-ধারার মূল দেবতা কৃষ্ণ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে বিষ্ণুকে আত্মসাৎ করে এবং ভারতবর্ষের প্রধান ধর্মভাবনা ভক্তিরস প্রধান বৈষ্ণবতায় পরিণত হয়। যোগ-ধারা কতক অংশে গন্ধর্ব-ধারার সঙ্গে মিশে গিয়ে জৈন, বৌদ্ধ ও নাথধর্মে পারণিত হয় এবং স্বতন্ত্র শৈবধর্মে ও তান্ত্রিকধর্মে রূপান্তরিত হয়। সব-শেষে তা যোগী বা নাথপন্থে এসে গুহান্তরিত হয়ে যায়।

যোগপন্থের একাধিক শাখা ছিল। একটি শাখার ইঙ্গিত কিছু পরিমাণে পাওয়া যায় বৈদিক যম আর যমীর উপাখ্যানে। এই পন্থার যে

মূল ঐতিহ্য (tradition) ছিল তাতে সৃষ্টিকর্তা তাঁর দেহ থেকে সহ-ধর্মিণীকে সৃষ্টি করেন এবং সেই সহধর্মিণীর গর্ভ সঞ্চার করার পর তাঁর মৃত্যু ঘটে। এই মৃত সৃষ্টিকর্তাকেই পরবর্তীকালে ধর্মঠাকুররূপে মিলছে বঙ্গদেশের কাহিনীতে। এই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা সম্বন্ধে কিছু কিছু সাক্ষ্য ইতিহাসে মেলে। বৈদিক গদ্য সাহিত্যে যে শুনঃশেফ-রোহিতাশ্বের কাহিনী আছে, তা এই ঐতিহ্যেরই সম্পর্কিত ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের রোহিতাশ্ব-শুনঃশেফ আখ্যানটি নানা রকম পরিবর্তন লাভ করে সংস্কৃত সাহিত্যে হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী হয়ে ১৭ শতাব্দীতে বাংলায় ধর্মঠাকুরের প্রধান উপাসক হরিশ্চন্দ্র-লাউসেনের কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। যোগীদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় ছিলেন যাঁরা নারী সহচরী নিতেন অথচ যোগচর্চা করতেন। এঁদের ঈশ্বর ছিল না। এঁরা দোহাই দিতেন নিরীশ্বর ধর্ম-ঠাকুরের— যে ধর্মঠাকুর বিশ্ব সৃষ্টি করে, দেবতা ও মানুষদের জন্ম দিয়ে মারা গিয়েছেন।

বৈদিক কালে এমন একটি কাল্ট ছিল যাতে যম ছিলেন এই ধর্মঠাকুর। তিনি সৃষ্টি করেই মৃত অথচ তিনিই সর্বাধ্যক্ষ। এই ধর্মের যজ্ঞ হত। সম্ভবত সেই যজ্ঞেও পুরুষ বলি দেওয়া হত। এই কাল্টই পরে বাউল-দরবেশ কাল্টের সঙ্গে মিশে গিয়ে এক শ্রেণীর সাধকের বা ভাবকের মধ্যে গোপনে পুষ্ট হতে থাকে। এদের যে প্রকাশ্য অনুষ্ঠান হত, তার মিল পাওয়া যায় শিবের গাজনের সঙ্গে এবং এই ধর্মঠাকুরও শিবের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে যান।

শাস্ত্রীমশায় যে পুথিগুলি পেয়েছিলেন, ধর্ম কাল্ট সম্বন্ধে তাতে এই মিশ্র দেবতা ধর্মের বার্ষিক অনুষ্ঠানের বিবরণ আছে। এই মিশ্রণের ক্ষেত্রে মুসলমানদেরও কিছু দান আছে। হয়তো কোনো এক কালে ধর্মঠাকুরের অনুষ্ঠানের সময়ে মুসলমান শক্তি এসে অত্যাচার করেছিল। সেই থেকে নিরঞ্জনের উষ্মার মতো ছড়া প্রচলিত হয়েছে। ধর্মঠাকুরের শক্তি কেতকা সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর শরীরের বাম অংশ থেকে। এটি বাইবেলের আদম থেকে হবা-র সৃষ্টির অনুকরণ। বাইবেলে যেমন শয়তানকে আমদানি করতে হয়েছে সৃষ্টিকার্যে প্রবৃত্ত করাবার জন্য, এখানেও লজ্জাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং লজ্জায় ধর্ম আত্মহত্যা করেছিলেন। তাই এইভাবে ধর্মঠাকুরের উদ্ভবের উপাখ্যানে সেমেটিক প্রভাবেরও সম্ভাবনা থাকতে পারে। শাস্ত্রীমশায় ধর্মঠাকুরের নিরঞ্জন নাম শুনে এবং ধর্ম কথাটি দেখে মনে করে-ছিলেন এটি বৌদ্ধধর্মের অনুবৃত্তি। কিন্তু সেটি অত্যন্ত ভুল তা আমি দেখিয়েছি *B. C. Law Commemoration Volume*-এ এবং রূপরামের ধর্মমঙ্গলের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায়।

শ্রীসুকুমার সেন।

১. ধর্মমঙ্গলের সব কবি ময়ূরভট্টকে আদি কবির মর্যাদা দিয়ে এসেছেন কিন্তু তাঁর কোনো রচনা পাওয়া যায় নি। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে প্রকাশিত 'ময়ূরভট্ট-বিরচিত শ্রীধর্ম্মপুরাণ' (১৩৩৭ ব.) আসলে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্জের লেখা। সংস্কৃত 'সূর্যশতক' রচয়িতা ময়ূরভট্ট এবং ধর্মমঙ্গলের অজ্ঞাত কোনো আদি রচনার কবি এক ব্যক্তি হতে পারেন। দ্র. বা-সা-ই, প্রথম খণ্ড অপরার্ধ, পৃ. ১৫০-৫৩।

২. সংস্কৃত 'আক্রন্দ' থেকে 'হাকন্দ'। অর্থ 'হাহাকার'। ধর্মঠাকুরের কাহিনীতে 'হাকন্দ' থেকে 'হাকণ্ড'— অর্থ নিজের মাথা কেটে ধর্মঠাকুরকে প্রসন্ন করা। দ্র. পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ. ১৫০।

৩. 'জন্মভূমি' পত্রিকায় ১৩০২ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় হারাধন দত্ত খেলারাম নামে কবির পরিচয় দিয়েছিলেন। রূপরামের ধর্মমঙ্গলে খেলারাম নামে গায়েনের উল্লেখ আছে।' কিন্তু এই নামে কোনো কবির রচনা পাওয়া যায় নি। হারাধন দত্ত যে খেলারামের রচনাই দেখেছিলেন এ বিষয়ে নিশ্চিত প্রমাণ নেই। দ্র. পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ. ১৫৮-৬২।

৪. ধর্মমঙ্গলের পুথি যা পাওয়া গেছে তার মধ্যে রূপরাম চক্রবর্তীর রচনা প্রাচীনতম। রূপরামের জন্ম বর্ধমান জেলার দক্ষিণে শ্রীরামপুর গ্রামে। বাবা শ্রীরাম চক্রবর্তী, মা দৈমন্তী (দময়ন্তী)। কাব্য রচনার তারিখ ১৬৪৯ খৃস্টাব্দ। লাউসেনের কাহিনীর পূর্ণ রূপ দিয়ে তিনিই সম্ভবত প্রথম ধর্মমঙ্গল রচনা করেছিলেন। দ্র. 'রূপরামের ধর্মমঙ্গল' প্রথম খণ্ড, বর্ধমান সাহিত্য-সভা ১৩৬৩ ব.।

৫. ঘনরাম চক্রবর্তীর জন্ম বর্ধমান জেলার কইয়ড় পরগনার কৃষ্ণপুর গ্রামে। বাবা গৌরীকান্ত, মা সীতা। সুশিক্ষিত ও সুলেখক ঘনরামের কাব্যের রচনাকাল ১৭১১ খৃস্টাব্দ। ধর্মমঙ্গল কাব্যের মধ্যে এঁর কাব্যই প্রথম ছাপা হয়েছিল। বঙ্গবাসী কার্যালয় থেকে প্রথমে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করে ১২৮৯ বঙ্গাব্দে বইয়ের আকারে বের করা হয়। ছাপা হওয়ায় তাঁর কাব্যই প্রথম শিক্ষিত সমাজের নজরে আসে। দ্র. বা-সা-ই, প্রথম খণ্ড অপরার্ধ, পৃ. ১৮৮-৯১।

৬. রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্জে বা দ্বিজ রামচন্দ্রের কাব্যের রচনা কাল ১৭৩২-৩৩ খৃস্টাব্দ। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত চামোট গ্রামে রাম-

চন্দ্রের জন্ম। এঁরই আর-একটি রচনা 'ধর্মপুরাণ' বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে 'ময়ূরভট্ট-বিরচিত শ্রীধর্মপুরাণ' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। দ্র. পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ. ১৯২-৯৩।

৭. মানিকরাম গাঙ্গুলীর কাব্যের রচনাকাল ১৭৮১ খৃস্টাব্দ। জন্ম হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার বেলডিহা বা বেলুটে গ্রামে। বাবা গদাধর, মা কাত্যায়নী। এঁরা বংশানুক্রমে শীতল সিংহ নামে পরিচিত ধর্ম-ঠাকুরের সেবক ছিলেন। তাঁর আর-একটি রচনা 'শীতলামঙ্গল'। দ্র. পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ. ২০২-০৭।

৮. শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন "বারমতি" শব্দের অর্থ রাজসভার দ্বার মুক্তি মনে করেন। তাৎপর্য, ধর্মঠাকুরের রাজসভা অধিবেশন। দ্র. পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ. ১৪১।

৯. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে নগেন্দ্রনাথ বসুর সম্পাদনায় 'শূন্যপুরাণ' (১৩১৪ ব.) এবং ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় 'ধর্মপূজা-বিধান' (১৩২৩ ব.) প্রকাশিত হয়েছিল। লেখক রমাই বা রামাই পণ্ডিত। ইনি ধর্মপূজার প্রথম প্রবর্তক ও ধর্মঠাকুরের আদি পুরোহিত রূপে স্বীকৃত, কিন্তু সত্যিই কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিনা জানা যায় না। সাহিত্য-পরিষৎ থেকে প্রকাশিত বই দুটি বা আরো যে-সব পুথি পাওয়া গেছে তার কোনোটিই খুব প্রাচীন নয়। সবচেয়ে পুরানো পুথি অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে লেখা। তবে ভাষা রূপান্তরিত হয়ে গেলেও ছড়ার মধ্যে কোথাও কোথাও প্রাচীনত্বের আভাস আছে। যেমন 'শূন্যপুরাণে'র "নিরঞ্জনের রুষ্মা" অংশ যা গাজনের শেষ দিনের অনুষ্ঠান "ঘরভাঙা"য় গাওয়া "জালালি কালিমা"। ধর্মঠাকুরের পীঠস্থান জাজপুর ওড়িশায় অবস্থিত, হয়তো চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দিল্লির বাদশাহ্ ফিরোজ-শাহ্ তোগলকের ওড়িশা-বাংলা অভিযানের স্মৃতি রয়ে গেছে যবনবেশে ধর্মঠাকুরের উপদ্রবের বিবরণে। দ্র. পূর্বোক্ত সূত্র, পৃ. ১৪০-৪৬।

১০. অনুবাদ : হারতী, ভারতী, গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, সরযু, গণ্ডকী, শ্বেত-গঙ্গা, কৌশিকী, পাতালের ভোগবতী এবং স্বর্গের মন্দাকিনী (এইসব পুণ্য নদী) মনোবলে ঝারির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হোক।

১১. অনুবাদ : এই জগৎ এককালে ছিল তমোময়, অন্ধকারময়, অগোচর এবং নিশ্চিহ্ন।

১২. অনুবাদ : যার নেই অন্ত্য মধ্য আদি, নেই হাত পা, নেই দেহ, নেই ধ্বনি। আকার নেই, বৃহত্তর কোনো রূপ নেই, যিনি সকল দলে আছেন, যাঁর ভয় নেই, মরণ নেই, সেই যোগী, সংকল্পহীন, স্বর্ণকান্তি নিরঞ্জনকে নমস্কার।

১৩. অনুবাদ : যাঁর অন্ত্য নেই, আদি নেই মধ্য নেই, কর নেই, চরণ নেই, দেহ নেই, আকার নেই, আদি রূপ নেই, যাঁর জন্মও নেই, যিনি যোগী-শ্রেষ্ঠ—জ্ঞানে যাঁকে জানা যায়, সকল মানুষের মধ্যে যিনি আছেন, সকল লোকের একমাত্র প্রভু, যিনি তত্ত্বস্বরূপ নিরঞ্জন এবং দেবতাদেরও যিনি বর দান করেন সেই শূন্যমূর্তি তোমাদের রক্ষা করুন।

১৪. অনুবাদ : যাঁর অন্ত্য নেই, আদি নেই মধ্য নেই, হাত পা নেই, দেহ নেই, শব্দ নেই, আকৃতি নেই, রূপ নেই, ভয় নেই, মরণ নেই, যাঁর জন্ম নেই, যোগীন্দ্রদের ধ্যানে যিনি জ্ঞাত হন, সকল মানুষের মধ্যে যিনি আছেন, সকল লোকের যিনি একমাত্র প্রভু, ভক্তদের কামপূরক, মানুষকে এবং দেবতাকে যিনি বর দিয়ে থাকেন— সেই শূন্যমূর্তিকে চিন্তা করবে।

১৫. অনুবাদ : আছে, নেই, না-আছে (একদা ছিল এখন নেই), না-নেই (এখন নেই একদা থাকবে)—এই চার ভাবসীমান্তের বাইরে যে শূন্য রূপ।

বৌদ্ধ-ঘণ্টা ও তাম্রমুকুট

আপনারা জানেন যে, নেপালে অর্ধেক হিন্দু ও অর্ধেক বৌদ্ধ। বৌদ্ধেরা কিন্তু অহিন্দু বলিলে বড়োই চটিয়া যায়। তাহারা বলে আমরাও হিন্দু, কিন্তু বোধমার্গী; নেপালের অন্য লোকেরা হিন্দু, কিন্তু তাহারা শিবমার্গী। সুতরাং বৌদ্ধদিগকে হিন্দু হইতে খারিজ করিবার উপায় নাই।

বৌদ্ধদের মধ্যে তিনটি ভাগ আছে। প্রথম ও সর্বোৎকৃষ্ট ভাগের নাম বান্‌রা। ইহারাই সর্বোৎকৃষ্ট। ইহাদেরই মধ্যে ধর্মযাজক ও পুরোহিত। দ্বিতীয় দল উদাসী, ব্যবসা করে। ইহারাও খাঁটি বৌদ্ধ। তৃতীয় দলে ২৪ জাতি আছে; তাহারা বলে বৌদ্ধ, কিন্তু ব্রাহ্মণ দিয়াও অনেক কর্ম করায় ও হিন্দুদের দেবদেবীরও পূজা করে।[১]

বান্‌রারা নয় জাতি। ইহারা বিহারে বাস করে। কোনো বিহারেই আর এখন অবিবাহিত বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখা যায় না। শুনিয়াছি, শেষ অবিবাহিত ভিক্ষু প্রায় আশি বৎসর হইল মরিয়া গিয়াছেন। সুতরাং বিহারগুলি এখন বান্‌রাদের বাড়ি। এক বিহারে অনেক লোক হইলে তাহারা শাখা-বিহার তৈয়ারি করে, কিন্তু মূল বিহারেই তাহাদের ক্রিয়াকর্ম হয়। নয় জাতি বান্‌রার মধ্যে সাত জাতি ধর্মকর্ম করে না, সেকরার কাজ করে, নকাশির কাজ করে, টাকশালে কাজ করে, বন্দুকের নলি তৈয়ারি করে, ছুতারের কাজ করে ও কাঠের উপরে নকশা করে। অপর দুই জাতির মধ্যে একটির নাম ভিক্ষু ও অপরের নাম গুভাজু। ভিক্ষুরা ধর্মকর্মের যে-সকল কাজ হাতে করিতে হয়, তাহাই করে; তাহারা ঠাকুর ছুঁইতে পারে, ঠাকুরের বেশ করায়, ঠাকুরকে এক ঠাঁই হইতে অন্য ঠাঁই লইয়া যায় ও ধর্মকর্মে গুভাজুদের সহায়তা করে। কিন্তু তাহারা পূজা করিতে পারে না, মন্ত্রপাঠ করিতে পারে না, হোমও করিতে পারে না। অনেক ভিক্ষু অন্য কাজও করিয়া থাকে। গুভাজুরাই পূজা-পাঠ করে, হোম করে, অল্পবিস্তর লেখাপড়া শিখে, দুই-একজন ভালো পণ্ডিতও হয়। কিন্তু বান্‌রারা সবই একজাতি; পরস্পর আহার-ব্যবহারও আছে, বিবাহও আছে। অন্য জাতির ভাত খাইলে ও অন্য জাতিতে বিবাহ করিলে বান্‌রাদিগের জাতি যায়।

বান্‌রাদিগের দীক্ষা আছে। পাঁচ বৎসর বয়সে মা ছেলেটিকে কোলে করিয়া মূল বিহারের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বান্‌রার নিকট লইয়া যায়, তাঁহার উপাধি স্থবির। মায়ের শিক্ষামতো ছেলে বলে— "আমি নির্মল শাক্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আমি ভিক্ষু হইব; আপনি আমাকে দীক্ষা দিন।" স্থবির বলেন, "তুমি অতি ছেলেমানুষ, তুমি সেরূপ কঠোর করিতে পারিবে না। দীক্ষা লইলে তুমি মাছমাংস খাইতে পারিবে না, মদ খাইতে পারিবে না, তোমায় একবারমাত্র হবিষ্য করিয়া থাকিতে হইবে, তুমি পারিবে কি?" ছেলে বলিবে, "পারিব বৈকি! এবংশে জন্মিয়া যদি বংশের ক্রিয়া করিতে না পারিলাম তবে কেনই জন্মিলাম।" এই কথা বলিলে পর ভিক্ষু একখানি রুপার খুর বাহির করিয়া তাহার মস্তকটি সম্পূর্ণরূপে মুড়াইয়া দেয়, টিকিটি পর্যন্ত রাখা হয় না। তাহাদিগকে রীতিমতো ভিক্ষুর দীক্ষা দেওয়া হয়। সে

হবিষ্যান্ন করে, স্থবিরের নিকট থাকে, বাড়ি যায় না, বুদ্ধ-ভগবানের নাম করে। পাঁচ-সাত দিন এইরূপে গেলে, সে একদিন কাঁদিয়া বৃদ্ধ স্থবিরের নিকট উপস্থিত হয় ও বলে, "এত কঠোর আমি জানিতাম না, আমি এত কঠোর করিতে পারিব না, আমাকে আবার সংসারে যাইতে দাও।" তখন স্থবির তাহার মুখে এক ভাঁড় মদ ও একটু শূকরের মাংস দিয়া তাহার মায়ের নিকট পাঠাইয়া দেয়। সকল বান্‌রাকেই এই দীক্ষা লইতে হয়। এই তাহাদের প্রথম দীক্ষা। আগে এই দীক্ষা যাবজ্জীবনের জন্য ছিল, এখন একটি সংস্কারের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু যে-সকল গুভাজু রীতিমতো ধর্মযাজক হইতে চান, তাঁহাদিগকে আর-একবার দীক্ষা লইতে হয়। এই দীক্ষা ১৭/১৮ বৎসরে হইয়া থাকে। নিয়মেই হউক, আর অনিয়মেই হউক, সন্তান হইলে এই দীক্ষা আর দেওয়া হয় না। দীক্ষার পূর্বে সন্তান হইলে, গুভাজু পতিত হয় ও ভিক্ষু হইয়া যায়। সে অথবা তাহার বংশের অপর কেহই আর-কখনো গুভাজু হইতে পারে না। এইজন্য প্রায়ই বিবাহের পূর্বে দীক্ষা দেওয়া হয়। এই দীক্ষায় পাঁচটা অভিষেকের দরকার হয়; প্রথম মুকুটাভিষেক, দ্বিতীয় বজ্রাভিষেক, তৃতীয় পুস্তকাভিষেক বা মন্ত্রাভিষেক, চতুর্থ ঘণ্টাভিষেক ও পঞ্চম সুরাভিষেক। পঞ্চ অভিষেকের পর, যে গুভাজুর এই পাঁচ জিনিস ব্যবহার করিবার অধিকার হয়, তাহাকে বজ্রাচার্য বলে। এই দীক্ষা হইয়া গেলে, গুভাজু ধর্মযাজকের কাজ করিতে পারে, অন্য কাজও করিতে পারে। কিন্তু দীক্ষা চাই, নহিলে সে আর গুভাজু মধ্যে গণ্য হইবে না।

মুকুটাভিষেকের অর্থ, মাথায় মুকুট পরিবার অধিকার। মুকুটটি তামার, উহাতে অতি পাতলা সোনার পাত লাগানো থাকে। মুকুটে পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের মূর্তি আছে ও মুকুটের মাথায় একটি বজ্রের অর্ধেক আছে। পূর্বে বোধ হয়, টুপি ও মুকুট স্বতন্ত্র ছিল। এখন দুই-ই তামার। তামার টুপির পিছনে ঠিক যেন একটি দড়ির ফাঁস দিয়া বাঁধা আছে। যে মুকুটটি প্রদর্শন করা যাইতেছে, উহা নেপালি দশ শত উনিশ সালে তৈয়ারি ও ব্যবহার হইয়াছিল, অর্থাৎ ১৫/১৬ বৎসর পূর্বে।

বজ্রাভিষেক অর্থাৎ হাতে বজ্র ধরিবার অধিকার। বৌদ্ধ-বজ্র সকলেই দেখিয়াছেন; উহা আর বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই।

পুস্তকাভিষেক বা মন্ত্রাভিষেক অর্থাৎ ধর্মগ্রন্থ পড়িবার ও মন্ত্র উচ্চারণ করিবার অধিকার।

ঘণ্টাভিষেক অর্থাৎ বজ্রঘণ্টা ধারণের অধিকার। সম্মুখে যে ঘণ্টাটি রহিয়াছে, তাহার মাথায় অর্ধবজ্র ও গায়ে যে কত বজ্র রহিয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই।

সুরাভিষেক। বজ্রাচার্যেরা বলেন, এই অভিষেকে আগুনে ঘৃত দিবার অধিকার হয়। কিন্তু তাহা হইলে ইহার নাম সুরাভিষেক হইল কেন? ইহার উত্তর তাঁহারা দিতে পারেন না।

বজ্রাচার্যেরা এই পঞ্চালংকারে ভূষিত হইয়া মন্দিরে পূজা-পাঠ করেন, বিবাহাদির সময় পৌরোহিত্য করেন এবং উৎসবাদিতে নেতৃত্ব করেন।

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'
দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩১৭ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

শাস্ত্রীমশায় ১৯০৭ খৃস্টাব্দে তৃতীয়বার নেপালে যান। সম্ভবত এই বারেই ঘণ্টা ও মুকুট সংগ্রহ করে এনেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত সংগ্রহে নেপাল থেকে পাওয়া গণ্ডারের শিঙে তৈরি দশ অবতারের মূর্তি খোদাই করা কোষাকুষি ও কারুকাজ করা সুন্দর খাপে একটি বড়ো ভোজালি আছে। এ দুটি জিনিস তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী চন্দ্র সমসের জঙ।

২৯ শ্রাবণ ১৩১৭ ব., ১৪ আগস্ট ১৯১০ খৃস্টাব্দ রবিবার ৬ টায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে বৌদ্ধঘণ্টা ও তাম্রমুকুট প্রদর্শিত হয় এবং প্রদর্শনী উপলক্ষে শাস্ত্রীমশায়ের লেখা এই বিবরণটি পড়া হয়।

এই প্রবন্ধের পাদটীকায় পত্রিকা-সম্পাদকের মন্তব্য ছিল, "মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই দুই দ্রব্য পরিষৎকে দান করিয়াছেন; পরিষদের ২য় মাসিক অধিবেশনে উহা প্রদর্শিত হয় এবং তদুপলক্ষে শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত এই বিবরণ সম্পাদক কর্তৃক পঠিত হয়।"

১. নেপালের হিন্দু নেওয়ারেরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র— চার বর্ণে বিভক্ত। বৌদ্ধ নেওয়ারদের মধ্যেও স্পষ্ট বর্ণবিভাগ আছে, তবে তিন বর্ণ। ব্রাহ্মণের সঙ্গে তুলনীয় বান্‌রা বা বন্‌হ্রা, বৈশ্যের সঙ্গে তুলনীয় বাণিজ্যজীবী উদাস এবং শূদ্র শ্রেণীর জফ্‌ফু— কৃষিজীবী-কারুজীবী মানুষেরা। বৌদ্ধদের মধ্যে যুদ্ধবৃত্তিধারী ক্ষত্রিয় নেই। বন্‌হ্রা এবং উদাসরাই গোঁড়া বৌদ্ধ। হিন্দু মন্দিরে এঁরা কখনো পুজো দেন না। কিন্তু নিম্নতম বর্ণের লোকেরা শিবমন্দিরেও পুজো দেন আবার বৌদ্ধ মন্দিরেও পুজো দেন। বন্‌হ্রা শব্দটি সংস্কৃত 'বন্দ্য' শব্দজাত, অর্থ মাননীয় ব্যক্তি। দ্র. Henry Ambrose Oldfield, *Sketches From Nipal, Historical and Descriptive*, Vol. II., London 1880.



১. বৌদ্ধ কাহাকে বলে ও তাঁহার গুরু কে ?

বৌদ্ধধর্ম যত লোকে মানে, এত লোকে আর-কোনো ধর্ম মানে না। চীনের প্রায় সমস্ত লোকই বৌদ্ধ। জাপান, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া এবং সাইবিরিয়ার অধিকাংশ লোকই বৌদ্ধ। তিব্বতের সব লোক বৌদ্ধ। ভুটান, সিকিম, রামপুরবুসায়রের[১] সব লোক বৌদ্ধ। নেপালের অর্ধেকেরও বেশি বৌদ্ধ। বর্মা, সায়াম[২] ও আনাম[৩] অবচ্ছেদাবচ্ছেদে বৌদ্ধ। সিংহলদ্বীপে অধিকাংশ বৌদ্ধ।

বৌদ্ধধর্ম না মানিলেও ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দুই বৌদ্ধদিগের অনেক আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতবর্ষের মধ্যে এখনো অনেক জায়গায় বৌদ্ধ মত একটু বিকৃতভাবে চলিতেছে। চাটগাঁ, রাঙামাটির তো কথাই নাই। উহারা বর্মা আরাকানের শিষ্য। উড়িষ্যার গড়জাত মহলের মধ্যে অনেকগুলি রাজ্যে এখনো বৌদ্ধ মত চলে। তাহার মধ্যে বোধ নামক রাজ্য যে বৌদ্ধমতাবলম্বী তাহা নামেই প্রকাশ পাইতেছে। বৌদ্ধেরা এই-সকল মহলে অনেকদিন প্রচ্ছন্নভাবে ছিলেন। সম্প্রতি তাঁহারা মহিমপন্থ[৪] নামে এক নূতন বৌদ্ধ মত চালাইয়াছেন। বাংলায় যাহারা ধর্মঠাকুরের পূজা করে তাহারা যে বৌদ্ধ একথা এখন কেহ অস্বীকার করেন না।[৫] বিঠোবা ও বিল নারায়ণের প্রতিমূর্তি বলিয়া পূজা হয়, কিন্তু এই দুই দেবতার ভক্তেরা আপনাদিগকে বৌদ্ধ বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। বাঙালিদের মধ্যে যে তন্ত্রশাস্ত্র চলিতেছে তাহাতে বৌদ্ধধর্মের গন্ধ ভরভর করে। যাঁহারা বলেন ৫ম মহাশূন্যে তারা ও ৬ষ্ঠ মহাশূন্যে কালিকা, তাঁহারা বৌদ্ধ ভিন্ন আর-কিছুই নহেন, কারণ কোনো হিন্দু কখনো শূন্যবাদী হন নাই, হইবেন না ও ছিলেন না।

এককালে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব আরো বিস্তার হইয়াছিল। তুর্কিস্তান এককালে বৌদ্ধধর্মের আকর ছিল। সেখান হইতে সাময়েদরা[৬] এবং তুর্কিস্তানের পশ্চিমের লোকেরা বৌদ্ধধর্ম পাইয়াছিল। পারস্য এককালে বৌদ্ধধর্মপ্রধান ছিল। আফগানিস্তান ও বেলুচিস্তান পুরাই বৌদ্ধ ছিল। পারস্যের পশ্চিমে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব নিতান্ত কম ছিল না। কারণ রোমান কাথলিকদিগের অনেক আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, পূজা-পদ্ধতি, বৌদ্ধদেরই মতো। রোমান কাথলিকদের মধ্যে দুইজন 'সেন্ট' বা মহাপুরুষ আছেন, তাঁহাদের নাম 'বারলাম' ও 'জোসেফ্‌ট'[৭]। অনেক পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে এই দুইটি শব্দ বৌদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব শব্দের রূপান্তরমাত্র।

অনেকে এই বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস লিখিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কেহই ইহার সম্পূর্ণ ইতিহাস দিতে সক্ষম হন নাই। কারণ বৌদ্ধেরা বড়ো আপনাদের ইতিহাস লিখেন নাই। মুসলমানেরা সাত শত বৎসর ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা ভারতের বৌদ্ধধর্মের নামও

শুনেন নাই। তবকাতিনাশিরি[৮] ওদন্তপুরী বিহার ধ্বংস হইবার ইতিহাস দিয়াছেন। তিনি বলেন, মহম্মদি বক্তিয়ার ঐ বিহারটাকে কেল্লা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন এবং যখন উহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সমস্ত "দুর্গরক্ষী সৈন্য" বধ করিয়া ফেলিলেন, তখন দেখিলেন, সৈন্যদিগের চেহারা আর-এক রকম ; তাহাদের সব মাথা মুড়ানো ও পরনে গেরুয়া কাপড়। তখন তিনি মনে করিলেন, ইহারা "সব মাথা মুড়ানো ব্রাহ্মণ"। আবুল ফাজল এত বড়ো 'আইনি আকবরি'[৯] লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও বৌদ্ধধর্মের নাম গন্ধ পাওয়া যায় না। বৌদ্ধদের ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা হিন্দুতে করে নাই, মুসলমানেরাও করে নাই, বৌদ্ধেরাও বড়ো করে নাই ; করিয়াছেন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা, আর সেই ইউরোপীয়দিগের শিষ্য শিক্ষিত ভারতসন্তান। কিন্তু ইহাদের চেষ্টা কিরূপ হইতেছে ? শুনা যায় এককালে কোনো অন্ধনিবাসের লোকে হাতি দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। সকলেই অন্ধ, সুতরাং তাহাদের জীবন্ত হাতি দেখানো কঠিন। সেইজন্য অধ্যক্ষ অন্ধগুলিকে একটি মরা হাতির কাছে লইয়া গেলেন। কানারা হাত বুলাইয়া হাতি দেখিতে লাগিল। কেহ শুঁড়ে হাত বুলাইল, কেহ কানে হাত বুলাইল, কেহ দাঁতে হাত বুলাইল, কেহ মাথায় হাত বুলাইল, কেহ পিঠে হাত বুলাইল, কেহ পায়ে হাত বুলাইল, কেহ লেজে হাত বুলাইল, সকলেরই হাতি দেখা শেষ হইল। শেষে সকলে বাড়ি ফিরিয়া আসিল। সেখানে সকলে ঝগড়া করিতে লাগিল। কেহ বলিল হাতি কুলার মতো, কেহ বলিল হাতি নলের মতো, কেহ বলিল হাতি উলটা ধামি, কেহ বলিল হাতি বড়ো উঁচু, কেহ বলিল হাতি থামের মতো, কেহ বলিল হাতি চামরের মতো। সকলেই বলিতে লাগিল 'আমার মতই ঠিক'। সুতরাং ঝগড়া চলিতেই লাগিল, কোনোরূপ মীমাংসা হইল না। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সম্বন্ধেও প্রায় সেইরূপই ঘটিয়াছে। ইউরোপীয়েরা সিংহলদ্বীপেই প্রথম বৌদ্ধধর্ম দেখেন ও সেইখানেই পালি শিখিয়া বৌদ্ধদের বই পড়িতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা বলেন বৌদ্ধধর্ম কেবল ধর্মনীতির সমষ্টিমাত্র, উহাতে কেবল বলে 'হিংসা করিও না,' 'মিথ্যা কথা কহিও না,' 'চুরি করিও না', 'পরস্ত্রীগমন করিও না,' 'মদ খাইও না'। হজ্‌সন [Brian Houghton Hodgson] সাহেব নেপালে বৌদ্ধধর্ম পাইলেন। তিনি দেখিলেন, বৌদ্ধদের অনেক

দর্শন গ্রন্থ আছে এবং তাহাদের দর্শন অতি গভীর। কেহ বা শুদ্ধ বিজ্ঞানবাদীমাত্র, কেহ বা তাহাও বলেন না। যে-সকল দর্শনের মত আঠারো ও উনিশ শতে ইউরোপে প্রথম প্রকাশ হইয়াছিল, তিনি সেই-সকল মত নেপালের পুথির মধ্যে পাইলেন এবং বুঝিতে পারিলেন যে, এসকল মত বৌদ্ধদের মধ্যে দুই-তিন শতে চলিতেছিল। বিশপ বিগাণ্ডেট[১০] ব্রহ্মদেশে বৌদ্ধধর্ম দেখিতে পান। তিনি দেখেন, উহার আকার অন্যরূপ। উহাতে পূজাপাঠ ইত্যাদির বেশ ব্যবস্থা আছে। তিনি দেখেন, বৌদ্ধমঠ মাত্রেই এক-একটি পাঠশালা। ছোটো ছোটো ছেলেরা পড়ে। যিনি তিব্বত দেশের বৌদ্ধধর্ম দেখিলেন, তিনি দেখিলেন, সেখানে কালীপূজা হয়, সেখানে মন্ত্রতন্ত্র আছে, হোমজপ হয়, মানুষপূজা হয়। চীন দেশের বৌদ্ধধর্ম আবার আর-এক রূপ। তাহারা সব মাংস খায়, সব জন্তু মারে ; অথচ বৌদ্ধ। জাপানিরা বলে 'আমরা মহাযান অপেক্ষাও দার্শনিকমতে উপরে উঠিয়াছি।' অথচ আবার তাহাদের মধ্যে এক দল বৌদ্ধ আছে, তাহারা নানারূপ দেবদেবীর উপাসনা করে।

এইরূপে বৌদ্ধধর্ম নানা দেশে নানা মূর্তি ধারণ করিয়া রহিয়াছে ; কোথাও বা উহা পূর্বপুরুষের উপাসনার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, কোথাও বা ভূত প্রেত উপাসনার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, কোথাও বা দেহতত্ত্ব উপাসনার সহিত মিশিয়া গিয়াছে। কোথাও কোথাও আবার খাঁটি বুদ্ধের মত চলিতেছে, কোথাও খাঁটি নাগার্জুনের মত চলিতেছে। সুতরাং সমস্ত বৌদ্ধধর্মের একখানি পুরা ইতিহাস লেখা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর আবার ভাষার গোল। বুদ্ধের বচনগুলি তিনি কী ভাষায় বলিয়াছিলেন জানা যায় না। তাঁহার বাড়ি ছিল কোশলের উত্তরাংশে। তিনি ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন কোশলে ও মগধে। এই দুই দেশের লোক বুঝিতে পারে এমন কোনো ভাষাতে তিনি ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। এই দুই দেশেও আবার ভিন্ন অঞ্চলের লোকের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ছিল। তিনি সংস্কৃত ভাষায় বলেন নাই। যে-সকল অতি প্রাচীন বৌদ্ধ পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহা না-সংস্কৃত, না-মাগধী, না-কোশলী ; একরূপ মাঝামাঝি গোছের ভাষা। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা বোধ হয় ইহারই নাম দিয়াছেন 'মিশ্র ভাষা'। একজন

ইউরোপীয় পণ্ডিত ইহারই নাম দিয়াছেন Mixed Sanskrit।[১১] 'বিমলপ্রভা'[১২] নামে নয় শতের এক পুথিতে আমরা দেখিলাম যে, তৎকালে নানা ভাষায় বুদ্ধের বচন লেখা হইয়াছিল; মগধ দেশে মগধ ভাষায়, সিন্ধু দেশে সিন্ধু ভাষায়, বোট দেশে বোট ভাষায়, চীন দেশে চীন ভাষায়, মহাচীনে মহাচীন ভাষায়, পারস্য দেশে পারস্য ভাষায়, বুম্ম দেশে বুম্ম ভাষায়। আমরা জানি পারস্য দেশে মগের ধর্ম চলিত ছিল, অর্থাৎ সেখানকার লোক অগ্নি-উপাসক ও জরথ্রসার[১৩] শিষ্য ছিল। সে দেশে যে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ছিল, একথাই শুনি নাই। তাহাদের ভাষায় যে আবার বৌদ্ধবচনগুলি লিখিত হইয়াছিল সে খবরও এই নূতন। বুম্ম দেশ কাহাকে বলে, জানি না, রোম হইবারই সম্ভাবনা। কারণ, 'বিমলপ্রভা'য় বলে, উহা নীলা নদীর উত্তর। 'বিমলপ্রভা'য় আরো একটি নূতন খবর পাওয়া গিয়াছে। প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায়ও বুদ্ধাদিগের অনেক সংগীত লেখা হইয়াছিল, এ খবর এ পর্যন্ত অতি অল্প লোকেই জানেন।

বৌদ্ধ কাহাকে বলে ?

বৌদ্ধ কাহাকে বলে, একথা লইয়া নানা মুনির নানা মত আছে। যাঁহারা সিংহলের বৌদ্ধধর্ম দেখিয়া এবং পালি পুস্তক পড়িয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া বিহারে বাস করেন, তাঁহারাই যথার্থ বৌদ্ধ। গৃহস্থ বৌদ্ধদের তাঁহারা বৌদ্ধ বলিতে রাজি নহেন। তাঁহারা বলেন, 'ত্রিপিটকে' যাহা-কিছু ব্যবস্থা আছে, সবই বিহারবাসী ভিক্ষুদের জন্য। 'বিনয়পিটকে' যত বিধিব্যবস্থা আছে, সবই ভিক্ষুসংঘের জন্য। গৃহস্থ বৌদ্ধ উপাসক উপাসিকাদের তাহাতে স্থান নাই। আবার কেহ কেহ বলেন, যাহারা "পঞ্চশীল" গ্রহণ করে অর্থাৎ "প্রাণাতিপাত করিব না", "মিথ্যাকথা কহিব না", "চুরি করিব না", "মদ খাইব না", "ব্যভিচার করিব না"— এই পাঁচটি নিয়ম পালন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করে, তাহারাও বৌদ্ধ। কিন্তু তাহা হইলে এক জায়গায় ঠেকিয়া যায়। যে-সকল জাতি দিন-রাত প্রাণীহিংসা করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, যথা জেলে, মালা, কৈবর্ত, শিকারি, ব্যাধ, খেট, খটিক্ প্রভৃতি জাতির বৌদ্ধধর্মে প্রবেশের অধিকার একেবারেই থাকে না।

এদিকে আবার যাঁহারা নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি স্থানের বৌদ্ধধর্ম দেখিয়াছেন, তাঁহারা বলেন পৃথিবীসুদ্ধই বৌদ্ধ ; কারণ, যিনি বোধিসত্ত্ব[১৪] হইবেন, তাঁহাকে জগৎ উদ্ধারের প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। লঙ্কাবাসীর মতো আপনাকে উদ্ধার করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। এইজন্য নেপাল ও তিব্বতবাসীরা লঙ্কাবাসীদিগকে হীনযান বৌদ্ধ বলেন এবং আপনাদিগকে মহাযান বৌদ্ধ বলেন। এখানে 'যান' শব্দের অর্থ লইয়া অনেক বিবাদবিসংবাদ আছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা কেহ কেহ উহার ইংরাজি করেন Vehicle অর্থাৎ গাড়ি ঘোড়া ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবিক বৌদ্ধদিগের মধ্যে 'যান' শব্দের অর্থ পন্থ বা মত। আমরা যেমন এখন বলি নানকপন্থী দাদুপন্থী কবীরপন্থী, সেকালে বৌদ্ধেরা সেইরূপ বলিত শ্রাবকযান, প্রত্যেকযান, বোধিসত্ত্বযান, মন্ত্রযান ইত্যাদি। Vehicle-এর সহিত উহার কোনো সম্পর্ক নাই। মহাযান বৌদ্ধেরা আপনাদের বড়ো দেখাইবার জন্য আগেকার বৌদ্ধদিগকে হীনযানী বলিত, আর আপনাদিগকে বোধিসত্ত্বযান বলিত।

মহাযানী বৌদ্ধেরা যদি জগৎই উদ্ধার করিতে বসিলেন, তবে জগৎসুদ্ধই তো বৌদ্ধ হইয়া উঠিল। তাঁহারা বলেন 'আমরা বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর, গাণপত, পৌত্তলিক, রাজপূজক, ব্রাহ্মণপূজক প্রভৃতি সকলকেই উদ্ধার করিব।' কিন্তু সে উদ্ধারের পথ কী, সেকথা তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া বলেন না ; এইমাত্র বলেন 'যাহার যাহাতে ভক্তি, আমরা সেইরূপ ধারণা করিয়া তাহাকে উদ্ধার করিব'। এ বিষয়ে 'কারণ্ডব্যূহে'[১৫] একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ আছে। বুদ্ধদেব, বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরকে[১৬] জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি কী করিয়া জগৎ উদ্ধার করিবে ? জগতে তো নানা মুনির নানা মত, লোকে তোমার কথা শুনিবে কেন ?" তখন করুণামূর্তি অবলোকিতেশ্বর বলিতেছেন, "আমি বিষ্ণুবিনেয়দিগকে বিষ্ণুরূপে উদ্ধার করিব, শিববিনেয়দিগকে শিবরূপে উদ্ধার করিব, বিনায়কবিনেয়দিগকে বিনায়করূপে উদ্ধার করিব, রাজবিনেয়দিগকে রাজরূপে উদ্ধার করিব, রাজভটবিনেয়দিগকে রাজভটরূপে উদ্ধার করিব।" এরূপে তিনি যে কত দেবতার বিনেয়দিগকে কতরূপে উদ্ধার করিবেন বলিয়াছেন, তাহা লিখিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়, সেইজন্য উপরে তাহার কয়েকটিমাত্র দেওয়া হইল। এ মতে তাহা হইলে সকলেই বৌদ্ধ।

এখন যেমন থিওজফিস্ট মহাশয়েরা বলেন, "তোমরা যে ধর্মেই থাকো, যে দেবতার উপাসনাই করো, ধর্মে এবং চরিত্রে বড়ো হইবার চেষ্টা করিলেই, তোমরা থিওজফিস্ট এবং যে কেহ থিওজফিস্ট হইতে পারে।" এও কতকটা সেইরূপ, তবে ইঁহাদের অপেক্ষা মহাযানী বৌদ্ধদের জগতের প্রতি করুণা কিছু বেশি ছিল। তাঁহারা নিজেই চেষ্টা করিয়া জগৎ উদ্ধার করিতে যাইতেন। তোমার চেষ্টা থাকুক, আর নাই থাকুক, তাঁহারা বলিতেন, "আমরা নিজগুণে তোমায় উদ্ধার করিব"। সেইজন্য মহাযান ধর্মের সারের সার কথা "করুণা"। উঁহাদের প্রধান গ্রন্থের নাম 'প্রজ্ঞাপারমিতা'[১৭]। উহার নানারূপ সংস্করণ আছে ; এক সংস্করণ শত সহস্র শ্লোকে, এক সংস্করণ পঁচিশ হাজার শ্লোকে, আর-এক সংস্করণ দশ হাজার শ্লোকে, এক সংস্করণ আট হাজার শ্লোকে, এক সংস্করণ সাত শত শ্লোকে, আর-এক সংস্করণ, সকলের চেয়ে ছোটো, স্বল্পাক্ষরা— 'স্বল্পাক্ষরা প্রজ্ঞাপারমিতা'— উহার তিনটি পাতা মাত্র। 'প্রজ্ঞাপারমিতা' আরম্ভ করিতে হইলে কতকটা গৌরচন্দ্রিকা চাই— শেষ করিতে গেলেও কতকটা আড়ম্বর চাই। এইসব বাহ্য আড়ম্বর ছাড়িয়া দিলে উহাতে একটিমাত্র কথা সার— "সকল জীবে করুণা করো"।

মহাযানের মর্ম গীতায় একটি শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন। সে শ্লোকটি অনেকেরই অভ্যাস আছে।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তাস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং ॥

গীতায় এ কথাটি ভগবানের মুখে দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু মহাযানে এই ভাবের কথা প্রত্যেক বোধিসত্ত্বের মুখে। বোধিসত্ত্বেরা নির্বাণের অভিলাষী, তাঁহারা মানুষ। ভগবানের মুখে যেকথা শোভা পায়, মানুষের মুখে সেকথা আরো অধিক শোভা পায়। ইহাতে বুঝা যায়, তাঁহাদের করুণা কত গভীর।

মহাযান মতে তাহা হইলে জীবমাত্রেই বৌদ্ধ, কিন্তু একথায় তো কাজ চলে না। ভারতবর্ষে তখন নানারূপ ধর্ম ছিল, মত ছিল, দর্শন ছিল, পন্থ ছিল, যান ছিল। মহাযান যেন বলিলেন, সকলেই বৌদ্ধ ; কিন্তু তাঁহাদের বিরুদ্ধবাদীরা সেকথা মানিবে কেন ? সুতরাং বৌদ্ধ কাহাকে বলে, এ বিচারের প্রয়োজন চিরদিন ছিল, এখনো আছে।

ইহার মীমাংসা কী ? বৌদ্ধেরা জাতি মানে না যে, ব্রাহ্মণাদির মতো জন্মিবামাত্রই ব্রাহ্মণ হইবে বা ক্ষত্রিয় হইবে বা শূদ্র হইবে, বৈষ্ণব হইবে বা শৈব হইবে। একে তো বৌদ্ধ গৃহস্থেরা বৌদ্ধ কিনা তাহাতেই সন্দেহ, তারপর তাহাদের ছেলে হইলে, সে ছেলে বৌদ্ধ হইবে কিনা তাহাতে আরো সন্দেহ। এখনো এ বিষয়ে কোনো ইউরোপীয় বা এদেশীয় পণ্ডিতেরা কোনো মীমাংসা করেন নাই, কিন্তু শুভাকরগুপ্তের[১৮] 'আদিকর্ম্ম রচনা' নামক বৌদ্ধদের স্মৃতিতে ইহার এক চূড়ান্ত নিষ্পত্তি দেওয়া আছে। তিনি বলেন, যে কেহ ত্রিশরণ গমন করিয়াছে সেই বৌদ্ধ।

ত্রিশরণ শব্দের অর্থ—

"বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি"
"ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি"
"সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি"
"দ্বিতীয়মপি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি"
"দ্বিতীয়মপি ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি"
"দ্বিতীয়মপি সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি"
"তৃতীয়মপি বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি"
"তৃতীয়মপি ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি"
"তৃতীয়মপি সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি"

বোধ হয় অতি প্রাচীন কালে ত্রিশরণ গমনের জন্য কোনো পুরোহিতের প্রয়োজন হইত না, লোকে আপনারাই ত্রিশরণ গ্রহণ করিত। কিন্তু পরে পুরোহিতের নিকট ত্রিশরণ লইবার ব্যবস্থা হয়। 'হস্তসার' গ্রন্থে ভিক্ষুর নিকট ত্রিশরণ লইবার ব্যবস্থা আছে। যেমন খৃস্টানের পুত্র হইলেই সে খৃস্টান হয় না, তাহাকে বাপ্টাইজ করিলে তবে সে খৃস্টান হয়, সেইরূপ বৌদ্ধ পিতামাতার পুত্র হইলেও, যতক্ষণ সে ত্রিশরণ গমন না করে, ততক্ষণ তাহাকে বৌদ্ধ বলা যায় না। বৌদ্ধদের যতগুলি ধর্মকর্ম আছে, তাহার মধ্যে যে গুলিকে তাহারা অত্যন্ত সহজ বলিয়া মনে করিত এবং সকলের আগে সম্পন্ন করিত, সেই গুলিকে আদিকর্ম বলিত। সেইসকল আদিকর্মের মধ্যেও আবার ত্রিশরণ গমন সকলের

আদি। 'বিমলপ্রভা'য়ও লেখা আছে, আগে ত্রিশরণ গমন, পরে এই জন্মেই বুদ্ধ হইবার জন্য কালচক্র মতে লৌকিক ও লোকোত্তর সিদ্ধির চেষ্টা করিতে হইবে। রত্নত্রয়ের শরণ লইলেই যদি বৌদ্ধ হয় এবং সেরূপ শরণ লইবার জন্য যদি পুরোহিতের প্রয়োজন না থাকে, তাহা হইলে জেলে, মালা, কৈবর্তদের বৌদ্ধধর্মে প্রবেশের আর বাধা রহিল না। 'বিনয়পিটকে' লেখা আছে যে, যে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, তাহাকে ভিক্ষু করিতে পারিবে না ও তাহাকে সংঘে লইতে পারিবে না ; কিন্তু তাই বলিয়া কি সে বেচারি বৌদ্ধ হইতে পারিবে না ? শুভাকরগুপ্তের ব্যবস্থায় সে অনায়াসে বৌদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে।

বৌদ্ধধর্মের গুরু কে ?

প্রথম অবস্থায় বৌদ্ধধর্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম ছিল। যে সন্ন্যাস লইবে তাহাকে একজন সন্ন্যাসীকে মুরুব্বি করিয়া সন্ন্যাসীর আখড়ায় যাইতে হইত। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের নাম ভিক্ষু। সন্ন্যাসীর দলের নাম সংঘ। যেখানে সন্ন্যাসীরা বাস করিত তাহার নাম সংঘারাম। সংঘারামের মধ্যে প্রায়ই একটি মন্দির থাকিত, তাহার নাম বিহার। সেই মন্দিরের নাম হইতেই বৌদ্ধভিক্ষুদের আখড়াগুলিকে বিহারই বলিয়া থাকে।

শ্রাবকযানের গুরু

শিক্ষানবিশ একজন ভিক্ষুকে মুরুব্বি করিয়া সংঘে উপস্থিত হন। সেখানে গেলে সর্বাপেক্ষা বুড়া ভিক্ষু, যাঁহাকে স্থবির বা থেরা বলে, তিনি নবিশকে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করেন। জিজ্ঞাসার সময় সঙ্গে আর পাঁচ জন ভিক্ষুও থাকা চাই। স্থবির নবিশের নামধাম জিজ্ঞাসা করিয়া লইতেন। তাহার কোনো উৎকট রোগ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিতেন, সে রাজদণ্ডে দণ্ডিত কিনা, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেন, সে রাজার কোনো চাকরি করে কিনা তাহাও জিজ্ঞাসা করিতেন। তিনি আরো জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহার ভিক্ষাপাত্র আছে কিনা, তাহার চীবর আছে কিনা, অর্থাৎ, ভিক্ষু হইতে গেলে যে-সকল জিনিস দরকার, তাহা তাহার আছে কিনা। সে এসব জিনিস আছে বলিলে, তিনি সংঘকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "আপনারা বলুন, এই লোককে সংঘে লওয়া যাইতে পারে কিনা। যদি আপনাদের ইহাতে কোনো আপত্তি থাকে, স্পষ্ট করিয়া বলুন, যদি না থাকে তবে চুপ করিয়া থাকুন।" তিনি এইরূপ তিন বার বলিলে, যদি কোনো

আপত্তি না উঠিত, তবে তিনি নবিশকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "তোমার উপাধ্যায় কে ?" সে উপাধ্যায়ের নাম বলিলে, তাঁহার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া দেওয়া হইত। সে উপাধ্যায়ের নিকট সন্ন্যাসীর কী কী কাজ, সব শিখিত। এখনকার ছেলেরা যেমন মাস্টার মহাশয়দের মান্য করিয়া চলে, শিক্ষানবিশ, শ্রমণেরা, সেইরূপে আপনার উপাধ্যায়কে মান্য করিয়া চলিত। ক্রমে সে সব শিখিয়া লইলে, তাহাতে ও উপাধ্যায়ে কোনো প্রভেদ থাকিত না। সংঘে বসিলে, দু জনের সমান ভোট হইত।

বুদ্ধদেব যখন নন্দকে "প্রব্রজ্যা" দিয়াছিলেন, তখন তিনি উঁহাকে বৈদেহ মুনির হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। বৈদেহ মুনি নন্দকে আপনার বন্ধুর মতো দেখিতেন, বন্ধুর মতো তাহাকে পরামর্শ দিতেন ও শিক্ষা দিতেন। বুদ্ধদেব মধ্যে মধ্যে বৈদেহ মুনিকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "কেমন, নন্দ বেশ শিখিতেছে তো ?" বৈদেহ মুনি যেমন জানিতেন, সমস্ত খুলিয়া বলিতেন। যেখানে বৈদেহ মুনি নন্দকে কোনো বিষয় বুঝাইতে অক্ষম হইতেন, বুদ্ধদেব নিজে গিয়া তাঁহাকে উহা বুঝাইয়া দিতেন। মহাকবি অশ্বঘোষের[১৯] 'সৌন্দরনন্দ' কাব্যে বৈদেহ মুনি ও নন্দের অনেক কথা লেখা আছে। তাহাতে বেশ দেখা যায়, বৈদেহ মুনি নন্দের উপাধ্যায় হইলেও দু জনে পরস্পর বন্ধু-ভাবেই বাস করিতেন, তাঁহারা পরস্পর আপনাদিগকে সমান বলিয়া মনে করিতেন।

উদাহরণ

মহাযান বৌদ্ধেরা উপাধ্যায়কে "কল্যাণমিত্র" বলিত। কল্যাণমিত্র শব্দ হইতেই বেশ বুঝা যাইতেছে যে, উভয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল, সে গুরুশিষ্যের সম্পর্ক নয়, পরলোকের কল্যাণ-কামনায় গুরুশিষ্যের মিত্র মাত্র। মহাযান-মতাবলম্বীরা দর্শনশাস্ত্রের খুব চর্চা করিতেন। এখানে গুরুশিষ্যে অত্যন্ত প্রভেদ হইবারই কথা, কিন্তু তাহা হইত না। সংঘে অধিকার দু জনেরই সমান থাকিত এবং উভয়ে পরস্পরের মিত্র হইতেন।

মহাযানের গুরু

ক্রমে যখন এত দর্শনশাস্ত্র পড়া, এত যোগ ধ্যান করা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া মনে হইতে লাগিল, যখন ভিক্ষুরা বিবাহ করিতে লাগিলেন, প্রকাণ্ড একদল গৃহস্থ-ভিক্ষু হইয়া দাঁড়াইল, তখন মন্ত্রযানের উৎপত্তি হইল।

মন্ত্রযানের গুরু

তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "মন্ত্র জপ করিলেই, পাঠ, স্বাধ্যায়, তপ প্রভৃতি সকল ধর্মকর্মেরই ফল পাওয়া যাইবে। 'প্রজ্ঞাপারমিতা' পড়িতে অনেক বৎসর লাগে, বুঝিতে আরো বেশি দিন লাগে এবং 'প্রজ্ঞা-পারমিতা'র ক্রিয়াকর্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে আরো বেশি দিন লাগে। এত তো তুমি পারিবে না বাপু, তুমি এই মন্ত্রটি জপ করো, তাহা হইলে সব ফল পাইবে।" যখন বৌদ্ধধর্মের এই মত দাঁড়াইল, তখন গুরুশিষ্যের সম্পর্কটা খুব আঁটাআঁটি হইয়া গেল। তখন তিনটি কথা উঠিল—'গুরুপ্রসাদ', 'শিষ্যপ্রসাদ', 'মন্ত্রপ্রসাদ', অর্থাৎ গুরুকে ভক্তি করিতে হইবে, শিষ্যকে স্নেহ করিতে হইবে, এবং মন্ত্রের প্রতি আস্থা থাকিবে। যে সময় বৌদ্ধধর্মের মধ্যে মন্ত্রযান প্রবেশ করে, সে সময় ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে গুরুশিষ্যের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল জানা যায় না। ব্রাহ্মণদের মধ্যে আচার্য ও শিষ্যের সম্পর্ক পিতাপুত্রের সম্পর্কের মতো। বাস্তবিকও যিনি শিক্ষা দিবেন, তিনি পিতার কার্যই করিবেন। সন্তানের শিক্ষার ভার তো পিতারই, তবে তিনি যদি না পারেন, তবে একজন প্রতিনিধির হস্তে সন্তানকে সমর্পণ করিয়া দিবেন। শিক্ষক বা আচার্য পিতার প্রতিনিধিমাত্র। আচার্যের মৃত্যুতে শিষ্যের ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণ করিতে হইত। এখনো যিনি গায়ত্রী উপদেশ দেন, সেই আচার্য-গুরু মরিলে, ব্রাহ্মণকে ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু শিষ্য গুরুর দাস, তাঁহার যথাসর্বস্ব গুরুর, এই যে একটা উৎকট মত ভারতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে চলিতেছে, এ মতের মূলই মন্ত্রযান। মন্ত্রযানের গুরু ও শিষ্যের মধ্যে আর সেরূপ সমান ভাবটি রহিল না, একজন বড়ো ও একজন ছোটো হইয়া গেল।

বজ্রযানের গুরু

বজ্রযানে গুরু আরো বড়ো হইয়া উঠিলেন। তিনি স্বয়ং বজ্রধারী। এই যানের প্রধান কথা এই যে, দেবতাদিগের এবং বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদিগের বজ্রধর নামে একজন পুরোহিত হইলেন। পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের উপর বজ্রসত্ত্ব নামে আর-একজন বুদ্ধ হইলেন। তাঁহাকে উহারা বুদ্ধগণের পুরোহিত বলিয়া মানিয়া থাকে। বজ্রসত্ত্ব কতকটা আদিবুদ্ধ বা ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়া বসিলেন। এই মতের গুরুদিগকে বজ্রাচার্য বলিত। বজ্রাচার্যের পাঁচটি অভিষেক হইত, মুকুটাভিষেক, ঘণ্টাভিষেক,

মন্ত্রাভিষেক, সুরাভিষেক ও পট্টাভিষেক। তাঁহার দেশীয় নাম গুভাজু, অর্থাৎ, তিনি গুরু, তাঁহাকে সকলে ভজনা করিবে। সুতরাং শিষ্য হইতে তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন। মন্ত্রযানে গুরুকে শিষ্যের "প্রসাদ" খুঁজিতে হইত, বজ্রযানে তাহার কোনোই দরকার নাই।

সহজযানের গুরু

সহজযানের গুরুর উপদেশই সব। গুরুর উপদেশ লইয়া মহাপাপ কার্য করিলেও তাহাতে মহাপুণ্য হইবে। সহজযানের একজন গ্রন্থকার বলিতেছেন যে, যে পঞ্চকাম উপভোগের দ্বারা মূর্খলোক বদ্ধ হয়, গুরুর উপদেশ লইয়া সেই পঞ্চকাম উপভোগ করিয়াই সে মুক্ত হইয়া যায়।

গুরু উবএসো অমিঅরসু হবহিঁ ণ পীঅউ জেহি।
বহু সত্থত্থ মরুত্থলিহিং তিসিএ মরিথউ তেহি॥

[বৌ-গা-দো, পৃ. ১০২]

"গুরুর উপদেশই অমৃতরস। যে-সকল হাবারা উহা পান না করে তাহারা বহু শাস্ত্রার্থরূপ মরুস্থলীতে তৃষ্ণায় মরিয়া যায়।" গুরুর উপদেশ ভিন্ন সহজপন্থীদের কোনো জ্ঞানই হয় না : আগম, বেদ, পুরাণ, তপ, জপ সমস্তই বৃথা ; গুরুর উপদেশমাত্রই সত্য।

আগমবেঅপুরাণে পংডিত্ত মাণ বহংতি।
পক্ক সিরিফল অলিঅ জিম বাহেরিত ভুময়ন্তি॥

[বৌ-গা-দো, পৃ. ১২৩]

"যাহারা আগম, বেদ ও পুরাণ পড়িয়া আপনাদের পণ্ডিত মনে করিয়া গর্ব করে তাহারা পক্ক শ্রীফলে অলির ন্যায় বাহিরে বাহিরেই ঘুরিয়া বেড়ায়।"

এইরূপে যতই বৌদ্ধধর্মের পরিবর্তন হইতে লাগিল, গুরুর সম্মানও বাড়িয়া যাইতে লাগিল।

কালচক্রযান

কালচক্রযানে যে গুরুর মান্য কত অধিক তাহা একটি কথাতেই প্রমাণ হইয়া যাইবে। 'লঘুকালচক্রতন্ত্রে'র টীকা 'বিমলপ্রভা' যিনি লিখিয়াছেন, সেই পুণ্ডরীক, আপনাকে অবলোকিতেশ্বরের নির্মাণকায় বা অবতার বলিয়া মনে করিতেন। সুতরাং তিনি স্বয়ং অবলোকিতেশ্বর, আর-কেহ নহেন। কালচক্রযানের পর লামাযানের উৎপত্তি। সকল লামাই কোনো-না-

কোনো বড়ো বোধিসত্ত্বের অবতার। সুতরাং তিনি সাক্ষাৎ বোধিসত্ত্ব, সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী। লামাযান ক্রমে উঠিয়া দলাইলামাযানে পরিণত হইয়াছে। দলাইলামা অবলোকিতেশ্বরের অবতার। তিনি মরেন না, তাঁহার কায় মধ্যে মধ্যে নূতন করিয়া নির্মাণ হয়। তিনি এক কায় ত্যাগ করিয়া কায়ান্তর ধারণ করেন।

বৌদ্ধধর্মে প্রথমে যে উপাধ্যায় মিত্রমাত্র ছিলেন, এক্ষণে তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্, বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের অবতার।

বৌদ্ধধর্মের এই দৃষ্টান্ত হিন্দুর সংসারেও প্রবেশ করিয়াছে। তন্ত্রমতে গুরুই পরমেশ্বর, গুরুর পাদপূজা করিতে হয়, যাহা ব্রাহ্মণের একেবারে নিষেধ, সেই গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করিতে হয়, গুরু শিষ্যের সর্বস্বের অধিকারী, যে শিষ্য ধনজন, আপন স্ত্রীপুত্র ও দেহ পর্যন্ত গুরুসেবায় নিয়োগ করিতে পারে সেই পরম ভক্ত। বৈষ্ণবের মতেও তাই। তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া অনেকে এখন কর্তাভজা হইতেছেন।[২০] তাঁহারা বলেন, "গুরু সত্য, জগন্মিথ্যা, যা করাও তাই করি, যা খাওয়াও তাই খাই, যা বলাও তাই বলি।"

'নারায়ণ'
অগ্রহায়ণ, ১৩২১ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য।

১. রামপুরবুসায়র, পূর্বতন বুশহর-রিয়াসত দেশীয় রাজ্য ছিল, রাজধানী রামপুব। বর্তমানে হিমাচল প্রদেশের অন্তর্গত।

২. থাইল্যাণ্ডের নামান্তর সায়াম।

৩. ভিয়েৎনামের নামান্তর আনাম।

৪. ওড়িশার কেওনঝর অঞ্চলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে মহিমা গোঁসাই প্রচারিত ধর্ম মহিমাপন্থ বা অলেখ্‌পন্থ। বলা হয়, এক পাহাড়ের চূড়ায় দীর্ঘ তপস্যা করে ইনি সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁর মতে ঈশ্বর নিরাকার, কোনো পটে বা মূর্তিতে তাঁর মহিমা প্রকাশ করা যায় না। মহিমাপন্থীরা জাতিভেদ মানেন না। ধর্মের জন্য কৃচ্ছ্রসাধন অপ্রয়োজনীয় মনে করেন। কয়েকটি সরল সদাচারবিধি মেনে সংসারধর্ম পালন এই ধর্মের মূল উপদেশ। ব্যক্তিগত ঈশ্বরে বিশ্বাস ভিন্ন অন্য বহু বিষয়ে মহিমাপন্থের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের মিলের জন্য অনেকে একে বৌদ্ধধর্মেরই প্রকারভেদ বিবেচনা করেন। দ্র. *H-O-L*, p. 151; Nagendra Nath Vasu, *The Modern Buddhism and its Followers in Orissa*, Calcutta 1911.

৫. এই বইয়ে "রমাই পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল" প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক তথ্য দ্র

৬. উত্তর-পশ্চিম এশিয়ার তাইগা ও তুন্দ্রা অঞ্চলের আদিতম অধিবাসীদের অন্যতম সামোয়েদ্‌রা মঙ্গোল প্রবংশ থেকে উদ্ভূত। এদের জীবিকার উপায় ছিল শিকার, পশুপালন এবং কিছু চাষ-আবাদ।

৭. ভারতের খৃস্টধর্ম বিরোধী শক্তিমান রাজা আবেন্‌নের। ছেলে নেই বলে রাজার খুব দুঃখ। অনেক দিন পরে একটি ছেলে হল, নাম রাখা

হল যোসাফাট। জ্যোতিষিরা বললেন, বড়ো হয়ে যোসাফাট পার্থিব ঐশ্বর্যের মোহ কাটিয়ে অলৌকিক শক্তির অধিকারী হবে। শুনে রাজার খুব ভাবনা হল। তিনি একটা আলাদা শহর তৈরি করিয়ে ছেলেকে সেখানে রাখলেন। মানুষের দুঃখকষ্টের কথা সে শহরে পৌঁছয় না। যোসাফাট এইভাবে বড়ো হলেন। বাবার অনুমতি নিয়ে এই নিঃসঙ্গ জীবন থেকে একবার বাইরে এলেন। তাঁর নজরে পড়ল একজন খঞ্জ এবং একজন অন্ধ। আর-একবার তিনি একজন মুমূর্ষু মানুষ দেখলেন। উপলব্ধি করলেন, সব মানুষই জরা এবং মৃত্যুর কবলে পড়ে। যোসাফাটের মনে শান্তি নেই। এমন সময়ে অরণ্যবাসী তাপস বারলায়াম বণিকের ছদ্মবেশে রাজধানীতে এলেন। দামি রত্ন দেখাবেন বলে যোসাফাটের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পেলেন। বারলায়াম যোসাফাটকে জগতের অনিত্যতা, মানবদেহের অপবিত্রতা, মানব জীবনের দুঃখময় স্বরূপ, পার্থিব মহিমা সুখ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার অর্থহীনতা বিষয়ে উপদেশ দিয়ে তাঁকে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করলেন। খবর পেয়ে রাজা আবেন্নের বারলায়ামকে বন্দি করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। অনেক চেষ্টা কবেও রাজা যোসাফাটের মত পরিবর্তন করতে পারলেন না। রাজ্য দু ভাগ করে এক ভাগ ছেলেকে দিলেন। খৃস্টান যোসাফাটের রাজ্য ক্রমেই সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, আবেন্নের-এর রাজ্য শ্রীহীন হয়ে যায়। এতে আবেন্নের খৃস্টধর্মের মহিমা উপলব্ধি করতে পারলেন। সভাসদদের সঙ্গে তখন রাজা নিজেও খৃস্টধর্মে দীক্ষা নিলেন। আবেন্নের-এর মৃত্যুর পরে যোসাফাট গোটা রাজ্যের ভার বারাখিয়াস নামে একজন খৃস্টানের হাতে তুলে দিয়ে অরণ্যে প্রবেশ করলেন। গুরু বারলায়ামের সঙ্গে তাঁর মিলন হল।

রোমান ক্যাথলিক খৃস্টানদের মান্য এই দুই মহাপুরুষের চরিত্র নিয়ে গড়ে ওঠা লোককাহিনীর ভিত্তি বুদ্ধদেবের জীবনকথা। এশিয়া এবং ইউরোপে কাহিনীটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। আরবি সাহিত্যে অষ্টম শতাব্দী থেকে বিলাওয়াহার-য়ূদাসাফ নামে কাহিনীটির বিভিন্ন রূপ পাওয়া যায়। চীনের অন্তর্গত তুর্কিস্তান অঞ্চলে এর একটি খণ্ডিত ছন্দোবদ্ধ রূপ আবিষ্কৃত হয়েছে, দশম শতাব্দীর গোড়ায় লেখা। খৃস্টান জগতে কাহিনীটি সম্ভবত প্রথম গৃহীত হয়েছিল ককেসাস অঞ্চলে, ৯০০ খৃস্টাব্দে। আইসল্যাণ্ড থেকে ফিলিপাইনস্ পর্যন্ত সব খৃস্টান দেশেই এই কাহিনী নিয়ে কাব্য, নাটক লেখা হয়ে এসেছে।

৮. মৌলানা মিন্হাজুদ্দিন আবু উমর-ই-উস্মান্ রচিত ইতিহাস গ্রন্থ 'তবকাৎ-ই-নাসিরি'-তে ওদন্তপুরী মহাবিহার ধ্বংসের বিবরণ পাওয়া

যায়। মিন্‌হাজুদ্দিন দিল্লির সুলতানদের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। ১২৪২-৪৩ খৃস্টাব্দে তিনি লক্ষণাবতী বা গৌড়ে ছিলেন। ১২৬০-৬১ খৃস্টাব্দে তাঁর গ্রন্থ রচনা করেন। বর্তমান বিহার রাজ্যের বিহার-শরিফে ওদন্তপুরী মহাবিহার ছিল। ওদন্তপুর বা ওদন্তপুরী মহাবিহার ধর্মপাল (আ. ৭৭০/৭৭৫-৮১০ খৃ.) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মনে করা হয়। দীপংকরশ্রী জ্ঞান এখানে ছাত্র ছিলেন, পরে প্রধান আচার্য হন। আনুমানিক ১১৯৩ খৃস্টাব্দে বা এর কাছাকাছি সময়ে বখ্‌তিয়ার খলজি এই বিহারের সমস্ত ভিক্ষুদের হত্যা করেন। বিহারটি তাঁর সৈন্য শিবিরে পরিণত হয়।

৯. সম্রাট আকবরের সচিব ও প্রধনমন্ত্রী আবুল ফজল রচিত পাঁচ অধ্যায়ে বিভক্ত 'আইন-ই-আকবরি' সমকালীন মুঘল শাসনব্যবস্থা, ভূগোল, অর্থনীতি ও সামাজিক রীতিনীতির বিস্তৃত বিবরণ সংবলিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

১০. *Rev*. P. Bigandet, *The Life or Legend of Gautama, the Buddha of the Burmese,* 3rd. ed. 2 vols, London 1880.

১১. বৌদ্ধ সংস্কৃত বা বৌদ্ধ লেখকদের সংস্কৃত ভাষার তিন শ্রেণী। ১. অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত', 'সৌন্দরনন্দ' প্রভৃতি রচনার ভাষা। ২. 'ললিতবিস্তর', 'দিব্যাবদান', 'অবদানশতক', 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক' প্রভৃতি রচনার গদ্য অংশের ভাষা। ৩. 'মহাবস্তু' এবং 'ললিতবিস্তর' ও 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক'-এর কাব্যাংশের ভাষা। প্রথম শ্রেণীর রচনার ভাষার সঙ্গে পাণিনীয় সংস্কৃতের অমিল সামান্য। বেশি অমিল দ্বিতীয় শ্রেণীর রচনার ভাষায়। অল্পসল্প ব্যাকরণ-দুষ্ট ও উপভাষাগত প্রয়োগ এবং মধ্যভারতীয় আর্যভাষার রীতি অনুযায়ী পদ প্রয়োগ আছে। তৃতীয় শ্রেণীর রচনার ভাষাকেই যথার্থ বৌদ্ধ-সংস্কৃত বলা যায়। সাধারণভাবে একে একদা বলা হত 'গাথা-ভাষা', এখন বলা হয় 'মিশ্র-সংস্কৃত'। ভাষা-তত্ত্বের দিক থেকে এ ভাষার গুরুত্ব আছে, কারণ, সংস্কৃতে অপ্রচলিত হয়ে যাওয়া আদি-ভারতীয় আর্যভাষার বাক্‌রীতির অনেক ছাঁটছোঁট ও নব্য-ভারতীয় আর্যভাষার বাগ্‌ধারার অনেক নবাঙ্কুর এতে স্বীকৃত হয়েছে। দ্র. Sukumar Sen, "An outline Syntax of Buddhistic Sanskrit", *Journal of the Department of Letters,* Vol. xvii, Calcutta University 1928 ; এবং এই বইয়ে

সংকলিত "হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ' ও "বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করিতেন" প্রবন্ধ। শ্রীসুকুমার সেন।

১২. 'লঘুকালচক্রতন্ত্ররাজটীকা'র অন্য নাম 'বিমলপ্রভা'। এই পুথি নেপালে পাওয়া গেছে। লেখক পুণ্ডরীক, নামান্তর জ্ঞানবজ্র।

১৩. ইরান দেশের প্রাচীন আর্যদের ধর্মগুরু অশো (ঋষি) জরথুশ্ত্র। বাবা রাজবংশীয় পণ্ডিত পোউরুশস্প, মা দোগ্দো (দুগ্ধোবা)। জন্মকালে নবজাতকের নাম রাখা হয় স্পিতম্। স্পিতম্ পনেরো বছর বয়সে বনবাসী হন, প্রায় পনেরো বছর মহাতপস্যায় নিবিষ্ট থাকেন। তপস্যার অন্তে তিনি জরথুশ্ত্র নামে পরিচিত হন। জরথ = সোনালি, উশ্ত্র = প্রকাশ। জরথুশ্ত্র অর্থ সুবর্ণকান্তি। ঐশী কান্তিতে শরীর পূর্ণ হওয়ায় তাঁর এই নাম হয়েছিল। তিরিশ বছর বয়সের সত্যদ্রষ্টা এই ঋষি ইরান দেশে ধর্মপ্রচার শুরু করেন। প্রথম শিষ্য হন তাঁর কাকা মইধ্যোমাহ্। ইরানের পূর্ব-প্রদেশ-বল্খ বা ব্যাক্ট্রিয়ার বাদশাহ্ বীশতাস্প গুশ্সস্প তাঁর ধর্ম গ্রহণ করায় জরথোশতি ধর্মের প্রচার বাধাহীন হয়। জরথুশ্ত্র খৃস্ট জন্মের প্রায় চার হাজার বছর আগে তাঁর ধর্মমত প্রচার করেছিলেন মনে করা হয়। ভিন্ন মতে জরথুশ্ত্র ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়। প্রাচীন ইরানে প্রত্যেক যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু বা দস্তুরান্ দস্তুর জরথুশ্ত্র-তেম রূপে পরিচিত হতেন।

আধুনিক গবেষকেরা মনে করেন শিরদরিয়া ও আমুদরিয়া নদী বিধৌত বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে বসবাসকারী আর্যরা দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে ১৫০০ খৃস্টপূর্বাব্দের মধ্যে উত্তরভারত ও ইরানে প্রবেশ করেছিল (দ্র. E. Herzfeld, *Iran in Ancient East*, Oxford 1941)। ইরানের প্রাচীন ভাষা আবেস্তা এবং বৈদিক ভাষার মধ্যে প্রচুর সাদৃশ্য আছে। কোনো কোনো শব্দ আবেস্তা ও বৈদিকভাষায় বিপরীত অর্থে প্রযুক্ত। যেমন আবেস্তায় রাক্ষস বা দুষ্ট শক্তি বোঝাতে 'দেব' শব্দ ব্যবহৃত হয়। এর ফলে কোনো কোনো দেবতার স্বরূপও বদলে যায়। যেমন ইন্দ্র, নাসত্য, বিধাতা প্রভৃতি দেবতা দানবরূপে পরিগণিত। অবশ্য সোম বা হওম, সূর্য বা হ্বরে, মিত্র বা মিথ্র প্রভৃতির উভয় ঐতিহ্যে একই স্বরূপ রয়ে গেছে। আবেস্তায় ধৃত সাহিত্যের অন্যতম প্রধান রচনা জরথুশ্ত্রের 'গাথা' বা স্বর্গীয় সংগীত। জরথুশ্ত্র তাঁর পাঁচটি গাথায় সূর্য, চন্দ্র, জল, আগুন, বাতাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতারূপে উপাসনার রীতির পরিবর্তে একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। তাঁর মতে একমাত্র অহুর-মজদ্ (অসুর + মেধস্) বা জ্ঞানময় পরমেশ্বরই সত্য।

অহুর-মজদ্ নিরাকার। তাঁর ছয়টি প্রধান গুণ : ১. বোহুমোনো (বহুমনস্ বা শ্রেষ্ঠ মনন), ২. অষ (ঋত বা সৎ, সততা), ৩. খ্‌ষত্র (ক্ষত্র বা দৈবশক্তি), ৪. আর্মইতি (ভক্তি, ঈশ্বরে অনুরাগ), ৫. হউর্বতাৎ (সর্বতাৎ বা পরিপূর্ণতা), ৬. অমেরেতাৎ (অমৃতাৎ বা অমৃতত্ত্ব)। এই মহৎ গুণগুলি মনন-চিন্তনই অহুর-মজদের আরাধনার উপায়।

ঋষি জরথুশ্‌ত্রের প্রয়াণের পরে তাঁর ছেলে প্রধান আথ্‌বান্ (অর্থবান্) বা ধর্মনেতা হন। যে পুরোহিতেরা এই ধর্ম জনসমাজে প্রচার করতেন তাঁদের বলা হত মগ। এ'দের সামাজিক প্রতিপত্তি ছিল ভারতের ব্রাহ্মণদের মতো। এ'রা জরথুশ্‌ত্রের মতবাদ ঈষৎ পরিবর্তিত করে প্রাচীন দেবদেবীদের ফ্‌জত বা দেবদূত রূপে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করেন। অবশ্য কোনো মূর্তি পূজা বা বলি দেওয়ার রীতি ফিরিয়ে আনা হয় নি। গ্রীস ও ইতালিতে এই পুরোহিতেরা তাঁদের জ্ঞানের জন্য মাগোই (Magoi) বা মাগি (Magi) নামে সমাদৃত হন।

১৪. বোধিসত্ত্ব, পালি বোধিসত্ত। বোধি বা জ্ঞানলাভে উন্মুখ সাধক, যিনি বুদ্ধত্ব অর্জনের আগের পর্যায়ে রয়েছেন। বুদ্ধদেবের চরিত্র আশ্রয় করে বোধিসত্ত্ব তত্ত্বের বিকাশ ঘটেছে। লোকশিক্ষক, সাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষী, ধর্মপ্রচারক বুদ্ধদেবের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বে কালক্রমে নানা অলৌকিক মহিমা আরোপ করা হয়। কল্পনা করা হয় সিদ্ধার্থ রূপে জন্মের আগে তিনি মানুষ ও পশু রূপে ৫৫০ বার জন্মগ্রহণ করেন ('পঞ্‌ঞেসত পঞ্‌ঞাস জাতক')। সমস্ত জন্মেই ইনি সৎকর্ম করেন। বিভিন্ন জন্মে তাঁর দ্বারা অনুষ্ঠিত দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য, প্রজ্ঞা, বীর্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষা— এই দশটি সৎকর্মকে দশ পারমিতা বলা হয়। দশ পারমিতায় নৈপুণ্যের জন্য তাঁর নামান্তর দশভূমিশ্বর। এই সুকৃতির অধিকারী দেবকল্প পুরুষকে বৌদ্ধশাস্ত্রে বোধিসত্ত্ব বলে উল্লেখ করা রীতি দাঁড়িয়েছিল। হীনযান মতে বুদ্ধত্বলাভের জন্য সিদ্ধার্থরূপে জন্মগ্রহণের পূর্ব পূর্ব জন্মে তিনি ছিলেন বোধিসত্ত্ব। বোধিসত্ত্বরূপে তিনি সাধারণ মানুষের মতোই জীবন যাপন করেন এবং পারমিতা লাভের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেন, জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেন। মহাযানীরা বললেন, সিদ্ধার্থ যদি পূর্ব পূর্ব জন্মে সাধারণ মানুষ হয়েও বোধিসত্ত্বত্ব অর্জন করে থাকেন তাহলে অন্য সাধারণ মানুষও বোধিসত্ত্ব হতে পারেন এবং কালক্রমে বুদ্ধত্ব অর্জন করতে পারেন। মহাযান মতে সিদ্ধার্থ ছাড়াও আরো বহু বোধিসত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকৃত। এই বোধিসত্ত্বরা ব্যক্তিগত নির্বাণ-মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন না। বোধিসত্ত্ব স্তরে রয়ে

গিয়ে সাধারণের মুক্তির উপায় নির্দেশ করেন। 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক', 'কারণ্ডব্যূহ', এবং 'নিষ্পন্নযোগাবলী' প্রভৃতি মহাযানশাস্ত্রে অগণিত বোধিসত্ত্বের মধ্যে সমন্তভদ্র, অক্ষয়মতি, ক্ষিতিগর্ভ, আকাশগর্ভ, গগনগঞ্জ, রত্নপানি, সাগরমতি, বজ্রগর্ভ, অবলোকিতেশ্বর, মহাস্থামপ্রাপ্ত, চন্দ্রপ্রভ, জালিনীপ্রভ. অমিতপ্রভ, প্রতিভানকূট, সর্বশোকতমোনির্ঘাতমতি, সর্বানিবরণ-বিষ্কম্ভী, মৈত্রেয়, মঞ্জুশ্রী. গন্ধহস্তি, জ্ঞানকেতু, ভদ্রপাল, সর্বাপায়ঞ্জহ, অমোঘদর্শী, সুরঙ্গম, বজ্রপাণি— এই ২৫ জনকে নিয়ে বোধিসত্ত্বমণ্ডলের বিবরণ পাওয়া যায়। বোধিসত্ত্বদের বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা এবং মূর্তিরূপ কল্পনা করা হয়েছিল। এঁরা শুভফলদায়ী দেবতা রূপে পূজিত হন।

১৫. মহাযান সূত্র গ্রন্থাবলীর অন্যতম 'কারণ্ডব্যূহ' গদ্যে লেখা। একই বিষয়ে শ্লোকবদ্ধ আর-একটি বই পাওয়া গেছে 'অবলোকিতেশ্বর-গুণকারণ্ডব্যূহ' নামে। বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘ এই ত্রিরত্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা এবং বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের জীবন ও শিক্ষা 'কারণ্ডব্যূহে'র বিষয়।

১৬. অবলোকিত এবং ঈশ্বর পদ দুটি সন্ধি করে অবলোকিতেশ্বর শব্দ গঠিত। অবলোকিত অর্থ দৃষ্ট, নিরীক্ষিত। কিন্তু ঈশ্বর পদযোগে গঠিত অবলোকিতেশ্বর-এর শব্দার্থ স্পষ্ট নয়। বৌদ্ধবিদ্যার প্রখ্যাত পণ্ডিতেরা যেসব অর্থ করেছেন তাতে অসঙ্গতি আছে। ব্যাকরণ সম্মত অর্থ ধরে সমস্ত ধারণা বা তত্ত্বের মূল তাৎপর্য সব সময়ে উন্মোচন করাও যায় না। বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর মহাযান অধিবিদ্যার একটি বিশিষ্ট তত্ত্ব। নির্বাণ অর্জন করেও জগতের দুঃখে অভিভূত অবলোকিতেশ্বর জগতের সমস্ত প্রাণীর দুঃখ মোচন না হওয়া পর্যন্ত নির্বাণ পরিত্যাগ করেন। তাঁর প্রতিজ্ঞা, যে জীব যেভাবে যাঁকে পূজা করে তিনি সেই রূপ ধারণ করে উপদেশ দেবেন। যারা তথাগতকে মানে তাদের তথাগত রূপে, মহেশ্বর বা বিষ্ণু বা বায়ু ইত্যাদির উপাসকদের মহেশ্বর বিষ্ণু বা বায়ু ইত্যাদি রূপ ধারণ করে ধর্মদেশনা করবেন। মহাযান মতের একটি মূল তত্ত্ব মহাকরুণা। অবলোকিতেশ্বর মহাকরুণা-বিগ্রহ। বহু বোধিসত্ত্বের মধ্যে প্রজ্ঞা-বিগ্রহ মঞ্জুশ্রী এবং করুণা-বিগ্রহ অবলোকিতেশ্বর প্রধান। মহাযান ধর্মে ক্রমে 'করুণা' তত্ত্বের গুরুত্ব বাড়ায় অবলোকিতেশ্বর প্রধানতম বোধিসত্ত্বের মর্যাদা পান। অন্য সব বোধিসত্ত্বের গুণ অবলোকিতেশ্বরে আরোপ করা হয়। এমন-কি হিন্দু দেবতা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের চারিত্র বৈশিষ্ট্যও মিশে যায় অবলোকিতেশ্বরে। কোথাও কোথাও অবলোকিতেশ্বরকে বুদ্ধের উপরে স্থান দেওয়া হয়েছে।

অবলোকিতেশ্বর ধ্যানীবুদ্ধ অমিতাভ ও পাণ্ডরা থেকে উৎপন্ন। অমিতাভ কুলের নাম পদ্মকুল। প্রতীক চিহ্ন পদ্ম। শাক্যসিংহের নির্বাণের পর থেকে ভবিষ্যতে মৈত্রেয় বুদ্ধ আবির্ভূত না হওয়া পর্যন্ত অবলোকিতেশ্বরই সৃষ্টিরক্ষা এবং ধর্মপ্রচারের অধিকারী। অবলোকিতেশ্বরের শক্তি তারা। তন্ত্রের প্রভাবে অবলোকিতেশ্বর কল্পনায় বিচিত্র বিবর্তন ঘটেছিল। অবলোকিতেশ্বর মূর্তিতে মাথা ও হাতের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মূর্তির রঙ, প্রতীক চিহ্ন, অস্ত্র ও যান কল্পনায় বৈচিত্র্য দেখা দেয়। শক্তির সংখ্যাও বাড়ে। নেপালের মছন্দর বাহালের দেওয়ালে অবলোকিতেশ্বরের একশো আট রূপ আঁকা আছে। অবলোকিতেশ্বরের ধ্যানমন্ত্রগুলিতে কল্পিত রূপের মধ্যে প্রধান ষড়ক্ষরী লোকেশ্বর, সিংহনাদ, খসর্প-লোকনাথ, হালাহল, পদ্মনর্তেশ্বর, হরিহরিহরিবাহনোদ্ভব, ত্রৈলোক্যবশংকর, রক্তলোকেশ্বর, মায়াজালক্রম, নীলকণ্ঠ, সুগতিসন্দর্শন, প্রেত-সন্তর্পিত, সুখাবতী, বজ্রধর্ম। 'ওঁ মণিপদ্মে হুং' এই ছয় অক্ষরের মন্ত্রটি অবলোকিতেশ্বরের সবচেয়ে শক্তিশালী সিদ্ধ-মন্ত্র। ভারত ও নেপাল ভিন্ন তিব্বত সহ, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে অবলোকিতেশ্বরের বহু মূর্তি পাওয়া গেছে। জাপানের কিয়োতো-য় রেন্‌গেও-ইন্ মন্দিরে ১২৫৪ খৃস্টাব্দে তৈরি সোনার তবকে মোড়া কাঠখোদাই সেন্‌জু-কান্‌নো বা অবলোকিতেশ্বরের মূর্তির হাতের সংখ্যা এক হাজার। দ্র. *I-B-I.*

১৭. মহাযান বৌদ্ধদর্শনের ঐতিহ্যে 'প্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্র' আদি গ্রন্থ। এই নামে প্রচলিত বহু গ্রন্থের মধ্যে 'অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্র'কে মূল সূত্রগ্রন্থ মনে করা হয়। ১৭৯ খৃস্টাব্দে একখানি প্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্র চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। মহাযান মতে দান, শীল, ক্ষান্তি, বীর্য, ধ্যান ও প্রজ্ঞা— এই ছয়টি বোধিসত্ত্বের সাধনীয়। এর মধ্যে প্রজ্ঞা শ্রেষ্ঠতম। প্রজ্ঞা অর্থ শূন্যতার জ্ঞান। শত সাহস্রিকা, পঞ্চবিংশতি সাহস্রিকা, দশ সাহস্রিকা, অষ্ট সাহস্রিকা প্রভৃতি নানা আয়তনের প্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্র পাওয়া গেছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র এশিয়াটিক সোসাইটির বিব্‌লিওথেকা ইণ্ডিকা সিরিজে 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' প্রকাশ করেন (১৮৮৭-৮৮ খৃ.)।

১৮. শুভাকরগুপ্ত বিক্রমশীল মহাবিহারে মহাচার্য অভয়াকরগুপ্তের ছাত্র ছিলেন। রামপালের রাজত্বকালে (আ. ১০৭২/৭৭-১১২০/২৭ খৃ.) ইনি পাণ্ডিত্যে খ্যাতি অর্জন করেন। রামপালের রানীর তৈরি এটপুরী বিহারে শুভাকর কিছুদিন বাস করেন। জৈন নৈয়ায়িক হরিভদ্র সূরি শুভাকরের মতামত উদ্ধৃত করে সমালোচনা করেছেন।

১৯. সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি অশ্বঘোষ কুষাণ রাজা কনিষ্কের সভাকবি এবং তাঁর গুরু ছিলেন। আনুমানিক খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে কনিষ্ক রাজত্ব করেন। অশ্বঘোষের জন্মস্থান সাকেত (অযোধ্যা)। তাঁর মায়ের নাম সুবর্ণাক্ষী। তারনাথ বলেন, তিনি সংঘগুহ্য নামে এক ধনী ব্রাহ্মণের ছেলে, পরে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। স্থবির পার্শ্ব, মতান্তরে পার্শ্বের শিষ্য পুণ্যযশা অশ্বঘোষের গুরু। অশ্বঘোষ চীন দেশে পুণ্যাদিত্য, পুণ্যশ্রীক এবং তিব্বতে কাল, দুর্দর্শ, মাতৃচেট, পিতৃচেট প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত। অশ্বঘোষের রচনাবলীর মধ্যে প্রসিদ্ধ 'বুদ্ধ-চরিত' এবং 'সৌন্দরনন্দ'। দুটিই সর্গবদ্ধ মহাকাব্য, 'রঘুবংশ'-'কুমারসম্ভব'-এর সঙ্গে তুলনীয়। 'বুদ্ধচরিতে'র বিষয় বুদ্ধের জীবন-কথা। মূল রচনা তেরো সর্গ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। চীনা ও তিব্বতি অনুবাদে আছে আটাশ সর্গ। 'সৌন্দরনন্দ' কাব্যে বুদ্ধের বৈমাত্র ভাই নন্দর বিলাসী গৃহজীবন থেকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ পর্যন্ত আঠারো সর্গে বর্ণিত। 'সৌন্দরনন্দ' আবিষ্কার করেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। চীনের অন্তর্গত তুরফানে প্রাচীন বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসস্তূপ থেকে হাইনরিখ ল্যূডার্স Heinrich Lüders অশ্বঘোষের লেখা নাটক 'শারদ্বতীপুত্রপ্রকরণ', সংক্ষিপ্ত নাম 'শারিপুত্রপ্রকরণ'-এর খণ্ডিত তালপাতার পুথি আবিষ্কার করে প্রকাশ করেন। নাটকের বিষয় শারিপুত্র ও মৌদ্‌গলায়নের প্রব্রজ্যা গ্রহণ। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে নাটকের দশ প্রকারভেদের অন্যতম প্রকরণ-এর আঙ্গিক এই নাটকে অনুসৃত। অশ্বঘোষের রচনাই সংস্কৃত কাব্য-নাটকের প্রাচীনতম নিদর্শন। পণ্ডিত-কবি অশ্বঘোষ দার্শনিক প্রজ্ঞা ও কবিত্বের সমন্বয়ে এক উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। সে ঐতিহ্য অনুসরণ করেন পরবর্তী কালের কবি কালিদাস। কালিদাসের রচনায় অশ্বঘোষের প্রভাব আছে। অশ্বঘোষের নামে প্রচলিত অন্যান্য রচনা 'বজ্রসূচী', 'সূত্রালংকার', 'মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র', 'মহাযান-ভূমিগুহ্যবাচামূলাশাস্ত্র', 'দশদুষ্টকর্মমার্গসূত্র', 'গণ্ডীস্তোত্র'। তিব্বতে 'অষ্টবিঘ্নকথা', 'দশকুশলকর্মপথনির্দেশ' প্রভৃতি আরো কয়েকটি বই অশ্বঘোষের রচনা মনে করা হয়।

অশ্বঘোষকে মহাযানপন্থী মনে করা হলেও নিশ্চিতভাবে তাঁর রচনা বলে জানা যায় যেসব বই, তাতে মহাযান দর্শনের অস্তিত্ব সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। শাস্ত্রীমশায় অশ্বঘোষ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন—

"...He was born at Sāketa in Oudh, his mother's name was Suvarṇākṣī. He was a *bhadanta*, he was a philosopher, a poet, a musician and a great preacher. His voice was so loud that he was called

Aśvaghoṣa (or neighing like a horse). Suzuki calls him a Mahāyānist and has translated his philosophical work, *Mahāyāna-Śraddhotpāda-Sūtra*, or awakening of faith in Mahāyāna [Daisetz Teitaro Suzuki, *Aśvaghoṣa's Discourse on the Awakening of Faith in the Mahāyāna*, Chicago, 1900]. But Mahāyāna was not yet. It came two generationts after Aśvaghoṣa. The *Awakening* is a wonderful work. Its original has not been yet found. Suzuki translated the Chinese translation, which treats of all the great problems of Mahāyāna. But there is nothing of Mahāyāna in Aśvaghoṣa's great epics. The *Buddhacarita* has been edited from very inferior materials by the late E. B. Cowell who was for some years the Principal of the Calcutta Sanskrit College. Better materials are now available as I have shown in one of my papers in the *J-A-S-B* ["A new manuscript of Buddha-Carita", NS : V, 1909, pp 47-49]. But Cowell had done another thing. The Sanskrit *Buddhacarita* is only half the work, the other half is yet unavailable. But Cowell has translated the Chinese translation of *Buddhacarita* also which is complete in 28 cantos. His other epic the *Saundarānanda* was discovered by me and has been edited by me from old and good materials. [*Saundarānanda Kāvya of Ārya Bhadanta Aśvaghoṣa*, ed. by Haraprasad Sastri. Rev. and ed. by Chintaharana Chakravarti, *The Bibliotheca Indica Series*, Asiatic Society, Calcutta 1939]. Both are epics of great merit written in Classical Sanskrit in which the majority of Buddhist works are written. The *Buddhacarita* deals with the epic life of Buddha and the *Saundarānanda* with that of his step-brother Nanda. The doctrines are those of N. Buddhism and not yet of Mahāyāna. Buddha speaks to Nanda, 'You have

done your duty, you are emancipated, now go and preach and save others', exactly what the *Mahāvastu* speaks of. It is not S. Buddhism for no emphasis is laid on discipline and the regulation of conduct. The poetry of both these works is of a very high order. The characters are distinct and very well-drawn. The images, the descriptions and the similes are all that can be desired. Subsequent Sanskrit poets, even Kālidāsa is indebted to Aśvaghoṣa for many of his most admired similes. But I need not expatiate on them here as I have done so in the preface to my edition of the *Saundarānanda*.

"It is said that emperor Kaniṣka invested Pataliputra. The King was not prepared to defend his capital and sued for peace but Kaniṣka demanded nine crores of rupees which the king had not. It was afterwards settled that the king should send Aśvaghoṣa to Kaṇiska and the Emperor would value him at three crores of rupees. Buddha's alms-bowl was valued at three crores of rupees and some other relic at the same price. From this it will be seen how greatly Aśvaghoṣa was appreciated by his contemporaries. Aśvaghoṣa seems to have been originally a brāhmaṇa. His knowledge of the *Vedas* and the brahmaṇic law was deep and profound, he distinctly lays down that Buddha's religion was an outcome of the Sāṃkhya doctrines of Kapila. Sāṃkhya's aim was to become Kevala or absolute but Buddha saw that no entity can be absolute and unconditioned, and he so modified Kapila's doctrine as to destroy the entity of the soul." ("The Northern Buddhism", *I-H-Q*, June 1925, pp. 209-11).

২০. আউলে চাঁদ (১৬৯৪/৯৫-১৭৬৯/৭০ খৃ.) প্রতিষ্ঠিত ধর্ম সম্প্রদায়।

উলা গ্রামের মহাদেব বারুই এ'কে কুড়িয়ে পেয়ে মানুষ করেন। সংসারে উদাসীন আউলে চাঁদ ২৭ বছর বয়সে ধর্মগুরু রূপে স্বীকৃতি পান। তাঁর অনুরাগীদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই ছিলেন। বৈষ্ণব অধ্যাত্মসাধনার সঙ্গে সম্পর্কিত অথচ স্বতন্ত্র কর্তাভজা সম্প্রদায়ে ঈশ্বর বা মূল গুরুকে বলা হয় কর্তা। অধ্যাত্ম-সংগীত এ'দের সাধনার অঙ্গ। পীঠস্থান নদীয়া জেলার ঘোষপাড়া (কল্যাণী)। দোল-পূর্ণিমায় ঘোষপাড়ায় আজও মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

২. নির্বাণ

বৌদ্ধধর্মের নির্বাণ বুঝিতে গেলে অনেকগুলি কথা বুঝিতে হয় ; এবং সেই-সকল কথা বুঝিয়া উঠাও অতি কঠিন। মোটামুটি ধরিতে গেলে নির্বাণ শব্দে নিবিয়া যাওয়া বুঝায়। প্রদীপ যেমন নিবিয়া যায়, তেমনই মানুষ নিবিয়া গেল। প্রদীপ নিবিয়া গেলে কিছু থাকে না ; মানুষ নিবিয়া গেলেও কিছুই থাকে না। এ কথাটা, শুনিতে যত সোজা, ভালো করিয়া বুঝিতে গেলে তত সোজা নয়। প্রদীপ নিবিয়া গেল, আর-কিছু নাই, একেবারে শেষ হইয়া গেল ; কিন্তু মানুষ নিবিয়া গেলে কি সেইরূপ একেবারে শেষ হইয়া যায় ? একেবারে 'নিহিল' হইয়া যায় ? একেবারে 'এনিহিলেশন' হইয়া যায় ? একেবারে 'নাস্তি' হইয়া যায় ? এইখানেই গোল বাধিল। আমি একেবারে থাকিব না, এবং সেইটিই আমার জীবনের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হইবে ? আমি তপ জপ, ধ্যান ধারণা করিব, শুদ্ধ আমার অস্তিত্বটি বিলোপ করিবার জন্য ? এ তো বড়ো শক্ত কথা।

অনেকে মনে করেন, বুদ্ধ এইরূপ আত্মার বিনাশই নির্বাণ শব্দের অর্থ করিয়াছিলেন। এইজন্য অনেক পাদরি সাহেবেরা বলেন বৌদ্ধেরা নিহিলবাদী বা বিনাশবাদী। বুদ্ধ নিজে কী বলিয়াছিলেন, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। তাঁহার নির্বাণের পাঁচ শত বৎসর পরে লোকে তাঁহার বক্তৃতার যেরূপ রিপোর্ট দিয়াছে, তাহাই আমরা দেখিতে পাই। তাহাও, আবার তিনি ঠিক যে ভাষায় বলিয়াছিলেন, সে ভাষার তো কিছুই পাওয়া যায় না। পালি ভাষায় তাহার যে রিপোর্ট তৈয়ারি হইয়াছিল, সেই রিপোর্টমাত্র পাওয়া যায়। তাহাতেও ঐরূপ প্রদীপ নিবিয়া যাওয়ার সহিতই নির্বাণের তুলনা করে। কিন্তু লোকে বুদ্ধদেবকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে নির্বাণের পর কী থাকে। সুতরাং নির্বাণে যে একেবারে সব শেষ হইয়া যায়, তাঁহার শিষ্যেরা সেটা ভাবিতেও যেন ভয় পাইত। বুদ্ধদেব সে কথার কী জবাব দিলেন, আমরা পরে তাহা বিবেচনা করিব।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর অন্তত পাঁচ-ছয় শত বৎসরের পর, কনিষ্ক রাজার

গুরু অশ্বঘোষ[১] সাধারণ লোকের মধ্যে ধর্ম প্রচার করিবার জন্য একখানি কাব্য রচনা করেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, যেমন তিক্ত ঔষধ খাওয়াইবার জন্য কবিরাজেরা মধু দিয়া মাড়িয়া খাওয়ায়, সেইরূপ আমি এই কঠিন বৌদ্ধধর্মের মতগুলি কাব্যের আকারে লিখিয়া লোকের মধ্যে প্রচার করিতেছি। তিনি নির্বাণ সম্বন্ধে যাহা বলেন, সেটা বুদ্ধের কথার রিপোর্ট নহে, তাঁহার নিজেরই কথা। তিনি বৌদ্ধধর্মের একজন প্রধান প্রচারক, প্রধান গুরু এবং প্রধান কর্তা ছিলেন। তাঁহার কথা আমাদের মন দিয়া শুনা উচিত। তিনি বলিয়াছেন—

দীপো যথা নির্বৃতিমভ্যুপেতো
নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরিক্ষম্।
দিশং ন কাঞ্চিৎ বিদিশং ন কাঞ্চিৎ
স্নেহক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্॥
এবং কৃতী নির্বৃতিমভ্যুপেতো
নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরিক্ষম্।
দিশং ন কাঞ্চিদ্বিদিশং ন কাঞ্চিৎ
ক্লেশক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্॥

"প্রদীপ যেমন নির্বাণ হওয়ার পর পৃথিবীতে যায় না, আকাশেও যায় না, কোনো দিক্‌বিদিকেও যায় না; তৈলেরও শেষ, প্রদীপটিরও শেষ; সাধকও তেমনই ভাবে. নির্বাণ হওয়ার পর, পৃথিবীতেও যান না, আকাশেও যান না, কোনো দিক্‌বিদিকেও যান না। তাঁহার সকল ক্লেশ ফুরাইয়া গেল। তাঁহারো সব ফুরাইয়া গেল, সব শান্ত হইল।"

এখানে কথা হইতেছে "উপৈতি শান্তিম্"—"সব শেষ হইয়া গেল"—ইহার অর্থ কি নিহিল? ইহার অর্থ কি আত্মার বিনাশ? অস্তিত্বের লোপ? অশ্বঘোষও নির্বাণের পর আর-কিছু থাকিল কিনা, কিছুই বলিলেন না। এই দুইটি কবিতার পরই তিনি অন্য কথা পাড়িলেন। কিন্তু এই কবিতা দুইটির পূর্বে যে তিনটি কবিতা আছে, তাহা পড়িলে, নির্বাণ যে অস্তিত্বের লোপ, এরূপ বোধ হয় না। সে তিনটি কবিতা এই—

তজ্জন্মনো নৈকবিধস্য সৌম্য
তৃষ্ণাদয়ো হেতব ইত্যবেত্য।

তাংশ্ছিন্ধি দুঃখাদ্‌যদি নির্মুমুক্ষা
কার্য্যক্ষয়ঃ কারণসংক্ষয়াদ্ধি ॥
দুঃখক্ষয়ো হেতু-পরিক্ষয়াচ্চ
শান্তং শিবং সাক্ষিকুরুষ ধর্ম্মম্‌ ।
তৃষ্ণাবিরাগং লয়নং নিরোধং
সনাতনং ত্রাণমহার্য্যমার্য্যম্‌ ॥
যস্মিন্নজাতির্নজরা ন মৃত্যুঃ
ন ব্যাধয়ো নাপ্রিয়সম্প্রযোগঃ ।
নেচ্ছাবিপন্ন প্রিয়বিপ্রযোগঃ
ক্ষমং পদং নৈষ্ঠিকমচ্যুতং তৎ ॥

"অতএব তৃষ্ণা প্রভৃতিই নানাবিধ জন্মের হেতু এইটি মনে মনে বুঝিয়া, তোমার যদি মুক্ত হইবার ইচ্ছা থাকে, তবে সেই তৃষ্ণাকে ছেদ করো। যেহেতু, কারণের ক্ষয় হইলে, কার্যেরও ক্ষয় হইবে।

"এখানে তৃষ্ণাদি হেতুর ক্ষয় হইলে, তোমার দুঃখেরও ক্ষয় হইবে। অতএব তুমি 'ধর্ম'কে প্রত্যক্ষ করো। এ 'ধর্ম' শান্তিময়, মঙ্গলময়, ইহাতে তৃষ্ণার উপর বিরাগ হয়, ইহা তাঁহার মত, ইহাতে সর্বধর্মের নিরোধ হয়, ইহাই সনাতন ধর্ম, ইহাতেই পরিত্রাণ, ইহা কেহ হরণ করিতে পারে না, ইহাই সর্বশ্রেষ্ঠ।

"ইহাই চরম ও অচ্যুত পদ। ইহাতে জন্ম নাই, জরা নাই, মৃত্যু নাই, ব্যাধি নাই, শত্রুসমাগম নাই, নৈরাশ্য নাই, প্রিয়-বিরহ নাই, ইহাই পাইবার মতন জিনিস।"

যখন অশ্বঘোষ এই তিনটি কবিতার পর নির্বাণের ঐ দুইটি কবিতা লিখিয়াছেন, তখন তিনি নির্বাণ শব্দে অস্তিত্বের লোপ বুঝেন নাই। তিনি বুঝিয়াছেন যে, নির্বাণের পর আর কোনোরূপ পরিবর্তন হইবে না, অথচ অস্তিত্বেরও লোপ হইবে না।

পালি ভাষার পুস্তকে বুদ্ধদেবকে নির্বাণের পর কী থাকিবে এই কথা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি কী উত্তর দিয়াছেন দেখা যাক। "নির্বাণের পর কিছু থাকিবে কি ?" বুদ্ধদেব বলিলেন, "না"। "থাকিবে না কি ?" উত্তর হইল, "না"। "থাকা-না-থাকার মাঝামাঝি কোনো অবস্থা হইবে

কি ?" বুদ্ধদেব বলিলেন, "না"। "কিছু থাকা-না-থাকা এদুয়েরই বাহিরে কোনো বিশেষ অবস্থা হইবে কি ?" আবার উত্তর হইল, "না"।

তবে দাঁড়াইল কী ? এমন একটা অবস্থা দাঁড়াইল, যে অবস্থায় "অস্তি"ও বলিতে পারি না, "নাস্তি"ও বলিতে পারি না। এ দুয়ে জড়াইয়া কোনো অবস্থা নয়, এ দুয়ের অতিরিক্ত কোনো অবস্থাও নয়। ইহাতে পাওয়া গেল কোনো অনির্বচনীয় অবস্থা, যাহা কথায় প্রকাশ করা যায় না, মানুষের জ্ঞানের বাহিরে।

এই অবস্থাকেই মহাযানে "শূন্য" বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকে। "শূন্য" বলিতে কিছুই নয় বুঝায়, অর্থাৎ অস্তিত্ব নাই এই কথাই বুঝায়। কিন্তু বৌদ্ধ-পণ্ডিতেরা বলেন, "আমরা করি কী ? আমরা যে ভাষায় শব্দ পাই না। নির্বাণের পর যে অবস্থা হয়, তাহা যে বাক্যের অতীত। ঠিক কথাটি পাই না বলিয়াই আমরা উহাকে "শূন্য" বলি। কিন্তু শূন্য শব্দে আমরা ফাঁকা বুঝাই না, আমরা এমন অবস্থা বুঝাইতে চাই যাহা অস্তিনাস্তি প্রভৃতি চারি প্রকার অবস্থার অতীত। "অস্তিনাস্তি-তদুভয়ানুভয়চতুষ্কোটিবিনির্মুক্তং শূন্যম্"।

শংকরাচার্য তাঁহার তর্কপাদে শূন্যবাদীদের নানারকমে ঠাট্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "যাহাদের মতে সবই শূন্য, তাহাদের সঙ্গে আর বিচার কী করিব ?" তিনি বৌদ্ধদের "বিনাশবাদী" বলেন। তাঁহার মতে নৈয়ায়িকেরা "অর্দ্ধবিনশন" অর্থাৎ আধখানা বিনাশবাদী। কেন-না, নৈয়ায়িকেরাও বলেন, "অত্যন্ত সুখদুঃখ-নিবৃত্তির"র নামই "অপবর্গ"। সুখদুঃখ যদি একেবারেই না রহিল, তবে আত্মা তো পাথর হইয়া গেল। তাই শংকরের পর মহাকবি শ্রীহর্ষ[২] গোতম ঋষিকে ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন—

মুক্তয়ে যঃ শিলাত্বায় শাস্ত্রমূচে সচেতসাম্।
গোতমং তমবেত্যৈব যথা বিত্থ তথৈব সঃ ॥

অর্থাৎ যে গোতম জীবন্ত প্রাণীকে পাথর করিয়া দিবার জন্য শাস্ত্র লিখিয়াছেন, তাঁহার নামটি সার্থক হইয়াছে, তিনি গোতমই বটেন—তাঁহার মতো গরু আর দ্বিতীয় নাই।

সাধারণ লোকে বলিবে পাথর হওয়াও বরং ভালো। কেন-না, কিছু আছে দেখিতে পাইব। শূন্য হইলে তো কিছুই থাকিবে না।

যাহা হোক অশ্বঘোষ যে নির্বাণের অর্থ করিয়াছেন, বুদ্ধদেব পালি ভাষার পুস্তকে উহার যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাতে নির্বাণ একটি অনির্বচনীয় অবস্থা। শুধু বাক্যের অতীত নয়, মানুষের ধারণারও অতীত। এইরূপ অবস্থাকেই কি কাণ্ট [Immanuel Kant] ট্রান্সেণ্ডেন্টাল বলিয়া গিয়াছেন ? কেন-না, ইহা মানুষের বুদ্ধি ছাড়াইয়া যায়, মানুষে ইহা ধারণা করিতে পারে না।

এরূপ অনির্বচনীয় না বলিয়া, অশ্বঘোষের মতে যে চরম ও অচ্যুতপদ আছে, তাহাকে অস্তি বলিয়া স্বীকার করো-না কেন ? কিন্তু অস্তি বলিলে, একটা বিষম দোষ হয়। যতক্ষণ আত্মা থাকিবে, ততক্ষণ "অহং" এই বুদ্ধিটি থাকিবে। অহংজ্ঞান থাকিলেই অহংকার হইল। অহংকার থাকিলেই সকল অনর্থের যা মূল, তাই রহিয়া গেল। সুতরাং সে যে আবার জন্মিবে, তাহার সম্ভাবনা রহিয়া গেল। আরো কথা, আত্মা যখন রহিলই, তখন তাহার তো গুণগুলাও রহিল। অগ্নি কিছু রূপ ও উষ্ণতা ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। আত্মা থাকিলে তাহার একত্ব-সংখ্যা থাকিবে। একত্ব-সংখ্যাও তো একটি গুণ। সে আত্মার জ্ঞান থাকিবে ? না, থাকিবে না ? যদি জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে জ্ঞেয় পদার্থও থাকিবে, জ্ঞেয় পদার্থ থাকিলেও আত্মার মুক্তি হইল না। আর, আত্মার যদি জ্ঞান না থাকে, তবে সে আত্মা আত্মাই নয়। সেইজন্যই অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিতে' বুদ্ধদেব বলিতেছেন, "আত্মার যতক্ষণ অস্তিত্ব স্বীকার করিবে, ততক্ষণ উহার কিছুতেই মুক্তি হইবে না।" তাঁহার প্রথম গুরু অরাড় কালামের[৩] সহিত বিচার করিয়া যখন তিনি দেখিলেন যে ইহারা বলে আত্মা দেহনির্মুক্ত অর্থাৎ লিঙ্গ-দেহ-নির্মুক্ত হইলেই, মুক্ত হয়, তখন সে মুক্তি তাঁহার পছন্দ হইল না। তিনি আত্মার অস্তিত্ব নষ্ট করিয়া আত্মাকে "চতুষ্কোটির্বিনির্মুক্ত" করিয়া, তবে তৃপ্ত হইলেন।

তাঁহার শিষ্যেরা, আত্মাকে শূন্যরূপ, অনির্বচনীয়রূপ, চতুষ্কোটি-বিনির্মুক্তরূপ, মনে করিলেও ক্রমে তাঁহাদের শিষ্যেরা আবার নির্বাণকে অভাব বলিয়া মনে করিত। তাহাদের মতে সংসার হইল ভাব পদার্থ এবং নির্বাণ অভাব। ভাবাভাব বলিতে তাহারা ভব ও নির্বাণ বুঝিত। তাহারো পরে আবার যখন তাহারা দেখিল যে, প্রকৃত পক্ষে ভব বা সংসার সেও বাস্তবিক নাই, আমরা ব্যবহারত তাহাদিগকে "অস্তি"

বলিয়া মনে করিলেও বাস্তবিক সেটি অভাব পদার্থ, তখন তাহাদের ধর্ম অতি সহজ হইয়া আসিল। তখন তাহারা বলিল—

অপণে রচি রচি ভব নির্বাণা।
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপনা॥ [সরহপাদ]

অর্থাৎ ভবও শূন্যরূপ, নির্বাণও শূন্যরূপ। ভব ও নির্বাণে কিছুই ভেদ নাই। মানুষে আপন মনে ভব রচনা করে, নির্বাণও রচনা করে। এইরূপে তাহারা আপনাদের বদ্ধ করে। কিন্তু পরমার্থত দেখিতে গেলে কিছুই কিছু নয়। সবই শূন্যময়।

তাহা হইলে তো বেশ হইল। ভবও শূন্য, ভাবও শূন্য, আত্মাও শূন্য, সুতরাং আত্মা সর্বদাই মুক্ত, স্বভাবতই মুক্ত, "শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ"। তবে আর ধর্মেই কাজ কী? যোগেই কাজ কী? কঠোরেই বা কাজ কী? ধ্যানেই বা কাজ কী? সমাধিতেই বা কাজ কী? ধর্ম অধর্মেই বা কাজ কী? যার যা খুশি করো। তোমরা স্বভাবতই মুক্ত, কিছুতেই তোমাদিগকে বদ্ধ করিতে পারিবে না। পরম যোগীও যেমন মুক্ত, অতি পাপিষ্ঠও তেমনই মুক্ত।

এই জায়গায় সহজিয়া বৌদ্ধ বলিল যে, মূঢ় লোক ও পণ্ডিত লোকের মধ্যে একটি ভেদ আছে। সকলেই স্বভাবত মুক্ত বটে, কিন্তু মূঢ় লোকে পঞ্চকামোপভোগাদি দ্বারা আপনাদের বদ্ধ করিয়া ফেলে, পণ্ডিতেরা গুরুর উপদেশ পাইয়া, তাহার পর পঞ্চকামোপভোগ করিলে, কিছুতেই বদ্ধ হয় না।

"যেনৈব বধ্যতে বালো বুধস্তেনৈব মুচ্যতে।" যে পঞ্চকামোপ-ভোগাদি দ্বারা বালজাতীয় অর্থাৎ মূর্খ লোকে বদ্ধ হয়, পণ্ডিতেরা গুরুর উপদেশ পাইয়া তাহাতেই মুক্ত হয়।

আর-এক উপায়ে নির্বাণ ব্যাখ্যা করা যায়। মানুষের চিত্ত যখন বোধিলাভের জন্য অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তখন তাহাকে বোধিচিত্ত বলে। বোধিচিত্ত ক্রমে সৎপথে বা ধর্মপথে বা সদ্ধর্মপথে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে যেমন তাহার পুনঃ পুনঃ জন্ম হইতে লাগিল, তেমনই সে উচ্চ হইতে অধিক উচ্চ উচ্চ লোকে উঠিতে লাগিল। যদি তাহার উদ্যম অত্যন্ত উৎকট হইয়া উঠে, তবে সে এই জন্মেই অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারে। কাহারো কাহারো

মতে সে এই জন্মেই বোধি লাভ করিতে পারে। বৌদ্ধদের বিহারে যে-সকল স্তূপ দেখা যায়, সেই স্তূপগুলিতে এই উন্নতির পথ মানুষের চোখের উপর ধরিয়া দিয়াছে। স্তূপগুলি প্রথমে একটি গোল নলের উপর খানিক দূর উঠিয়াছে। তাহার উপর একটি গোলের অর্ধেক। তাহার উপর একটি নিরেট চার কোণা জিনিস। তাহার উপর একটি ছাতা। তাহার উপর আর-একটি ছাতা, এটি প্রথম ছাতা হইতে একটু বড়ো। তাহার উপর আর-একটি ছাতা, দ্বিতীয় ছাতার চেয়ে আর-একটু বড়ো। চতুর্থটি তৃতীয় ছাতার অপেক্ষা একটু ছোটো, পঞ্চমটি আরো ছোটো। এইখানে এক সেট ছাতা শেষ হইয়া গেল। তাহারো উপর ছাতার খানিকটা বাঁট মাত্র। এই বাঁটের পর আবার আর-এক সেট ছাতা, কোনো মতে ১৩টি, কোনো মতে ১৬টি, কোনো মতে ২১টি, কোনো মতে ২৩টিও দেখা যায়। ছাতাগুলি ক্রমে ছোটো হইয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর আবার খানিকটা ছাতার বাঁট। ইহার উপর আবার মোচার আগার মতো আর-একটা জিনিস। মোচার আগাটি বেড়িয়া উপরি উপরি চার পাঁচটি বৃত্ত আছে। মোচার আগাটি একেবারে ছুঁচের মতো।

বোধিচিত্ত প্রণিধিবলে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তিনি এই স্তূপে উঠিতে লাগিলেন। স্তূপের নিচের দিকটা ভূত-প্রেত-পিশাচ-লোক ও নরক। তাহার উপর যে গোলের আধখানা আছে, সেটি মনুষ্যলোক। বোধিচিত্ত মানুষেরই হয়। সুতরাং সে চিত্ত এইখান হইতেই উঠিতে থাকে। প্রথমে দান, শীল, সমাধি ইত্যাদি দ্বারা সে ঐ নিরেট চারি কোণায় উঠিল। এটি চারি জন মহারাজার স্থান, তাঁহারা চারি দিকের অধিপতি। তাঁহাদের নাম ধৃতরাষ্ট্র, বিরূঢ়ক, বৈশ্রবণ ও বিরূপাক্ষ। তাহার উপর ত্রয়স্ত্রিংশ ভুবন। এখানকার রাজা ইন্দ্র এবং ৩৩ জন দেবতা এখানে বসবাস করেন। ইহার উপর তুষিত ভুবন। বোধিসত্ত্বেরা এইখান হইতে একবারমাত্র পৃথিবীতে গমন করেন এবং সেখানে গিয়া সম্যক্ সংবোধি লাভ করিয়া বুদ্ধ হন। ইহার পর যামলোক। ইহার পর নির্মাণরতিলোক, অর্থাৎ, ইঁহারা ইচ্ছামতো নানারূপে নানা ভোগ্যবস্তু নির্মাণ করিয়া উপভোগ করিতে পারেন। ইঁহাদের পরে যে লোক, তাহার নাম পরনির্মিতবশবর্তী,

অর্থাৎ, তাঁহারা নিজে কিছুই নির্মাণ করেন না, পরে নির্মাণ করিয়া দিলে, তাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন। এই পর্যন্ত আসিয়া কামধাতু শেষ হইয়া গেল, অর্থাৎ, এইখানে আসিয়া বোধিচিত্তের আর-কোনো ভোগের আকাঙ্ক্ষা রহিল না।

এইখান হইতে রূপলোকের আরম্ভ। কাম নাই, রূপ আছে, আর আছে উৎসাহ। সে উৎসাহে ধ্যান, প্রণিধি ও সমাধিবলে বোধিচিত্ত ক্রমশই উঠিতে লাগিলেন। রূপধাতুতে, প্রধানত, চারিটি লোক; অবশিষ্ট লোকগুলি এই চারিটিরই অধীন। এই চারিটি লোক লাভ করিতে হইলে, বৌদ্ধদের চারিটি ধ্যান অভ্যাস করিতে হয়। প্রথম ধ্যানে বিতর্ক ও বিবেক থাকে। দ্বিতীয় ধ্যানে বিতর্কের লোপ হইয়া যায়, প্রীতি ও সুখে মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তৃতীয় ধ্যানে প্রীতি লোপ হইয়া যায়, কেবল মাত্র সুখ থাকে। চতুর্থ ধ্যানে সুখও লোপ হইয়া যায়, তখন বোধিচিত্ত রূপ অর্থাৎ শরীরের সম্পর্ক ত্যাগ করিতে চান।

রূপ ও শরীরের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া বোধিচিত্ত আরো অগ্রসর হইতে থাকেন। এবার তিনি রূপলোক ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন। রূপলোক ছাড়াইয়া অরূপলোকে উঠিয়াছেন। তখন তিনি আপনাকে, সমস্ত বস্তু, এমন-কি নিরেট জিনিসটি পর্যন্ত তিনি আকাশ মাত্র দেখেন, অর্থাৎ সকলই তাঁহার নিকট অনন্ত ও উন্মুক্ত বলিয়া বোধ হয়। তাহার পর আত্মচিন্তা করিতে করিতে তাঁহার সম্পূর্ণ ধারণা হয় যে কিছুই কিছু নয়। এই যে অনন্ত দেখিতেছি, ইহা কিছুই নয়। ইহারো উপর বোধিসত্ত্ব অগ্রসর হইলে তখন তাঁহার চিন্তা হইল এই যে কিছুই নয়, ইহার কোনো সংজ্ঞা আছে কিনা। যদি সংজ্ঞা থাকে তবে সংজ্ঞীও আছে। কিন্তু সংজ্ঞী তো নাই, সে তো অকিঞ্চন। সুতরাং সংজ্ঞাও নাই, সংজ্ঞীও নাই। ইহার পর বোধিচিত্ত সেই মোচার আগায় উঠিলেন। এই যে স্তূপ ইহাই "ত্রৈধাতুক লোক", তিনি এখন ইহার মাথার উপর। তাঁহার চারি দিকে অনন্তশূন্য, আর তাঁহার উঠিবার জায়গা নাই। তিনি সেইখান হইতে অনন্তশূন্যে ঝাঁপ দিলেন। যেমন নুনের কণা জলে মিশিয়া যায়, তাহার কিছুই থাকে না। সেইরূপ বোধিচিত্তও আপনাকে হারাইয়া অনন্তশূন্যে মিশিয়া গেলেন। যেমন

সমুদ্রের জলে একটু লোনা আস্বাদ রহিয়া গেল, তেমনি অনন্তশূন্যে বুদ্ধের একটু প্রভাব রহিয়া গেল। তাঁহার প্রণীত ধর্ম ও বিনয় অনন্তকালের জন্য ত্রৈধাতুকলোকের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল।

নির্বাণ বলিতে 'নাই' 'নাই-ই বুঝায়। প্রথম প্রথম বৌদ্ধেরা এই 'নাই' 'নাই' লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত। নির্বাণ হইয়া গেল, একটা অনির্বচনীয় অবস্থা উদয় হইল। ইহাতেই প্রথম প্রথম বৌদ্ধেরা সন্তুষ্ট থাকিত। কিন্তু পরে অনেকে ইহাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তাঁহারা কেবল শূন্য হওয়াই চরম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না। তাঁহারা উহার সঙ্গে আর-একটা জিনিস আনিয়া ফেলিলেন; উহার নাম 'করুণা'। ইহা যেমন তেমন করুণা নয়, সর্বজীবে করুণা, সর্বভূতে করুণা। রূপ ধাতু ত্যাগ করিয়া অরূপধাতুতে আসিয়া যেমন সকল পদার্থকেই আকাশের ন্যায় অনন্ত দেখিয়াছিলেন, এখন সেইরূপ করুণাকেও অনন্ত দেখিতে লাগিলেন। শুদ্ধ 'শূন্যতা' লইয়া যে নির্বাণ, প্রাণশূন্য, নিশ্চল, নিস্পন্দ, কতকটা পাথরের মতো, কতকটা শুকনা কাঠের মতো হইয়াছিল; করুণার স্পর্শে, তাহাতে যেন জীবন সঞ্চার হইল; নির্জীবে জীবন আসিল, উদ্দেশ্যশূন্যে উদ্দেশ্য আসিল, সত্য সত্যই শুষ্কতরু যেন মুঞ্জরিয়া উঠিল। যাঁহারা অর্হৎ[4] হওয়াই, অর্থাৎ কোনোরূপে আপনাদের মুক্ত করাই, জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়াছিলেন, সমস্ত জগৎ যাঁহাদের চক্ষে থাকিলেও হইত, না থাকিলেও হইত, জগতের পক্ষে যাঁহারা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন, সেই বৌদ্ধরা এখন হইতে আপনার উদ্ধারটা আর তত বড়ো বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না, জগৎ উদ্ধার তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য হইল। আমার আমিত্বটুকু লোপ করিব, আমি মুক্ত হইব, আর আমার চারি দিকে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত-কোটি জীব বদ্ধ থাকিবে, একি আমার সহ্য হয়। বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর সংসারের সকল গণ্ডি পার হইয়া ধ্যান-ধারণাদি বোধিসত্ত্বের যা-কিছু কাজ, সব সাঙ্গ করিয়া, এমন-কি ধর্মস্তূপের আগায় উঠিয়া শূন্যতা ও করুণাসাগরে ঝাঁপ দিতে যান, এমন সময় তিনি চারি দিকে কোলাহল শুনিতে পাইলেন। তখন তাঁহার আমিত্ব চলিয়া গিয়াছে, তাঁহার আয়তন আকাশের মতো অনন্ত হইয়াছে, তাঁহার করুণাও আকাশের মতো অনন্ত হইয়াছে। তিনি দেখিলেন ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত

জীব দুঃখে আর্তনাদ করিতেছে ; জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের কোলাহল"। তাহারা উত্তর করিল, "আপনি করুণার অবতার আপনি যদি নির্বাণ লাভ করেন, তবে আমাদের কে উদ্ধার করিবে ?" তখন অবলোকিতেশ্বর প্রতিজ্ঞা করিলেন, "যতক্ষণ জগতের একটিমাত্র প্রাণী বদ্ধ থাকিবে, ততক্ষণ আমি নির্বাণ লইব না।"

খৃস্টের দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতে বৌদ্ধেরা ভারতবর্ষে এই মত লইয়াই চলিত। ইহাকেই তখনকার লোকে মহাযান বলিত। তাহারা মনে করিত এত বড়ো মত আর হইতে পারে না। যখন বোধিসত্ত্বেরা করুণায় অভিভূত হইয়া পড়িতেন, তখন তাঁহারা জীবের উদ্ধারের জন্য পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। বুদ্ধদেব যে পঞ্চশীল দিয়া গিয়াছেন, তাহা ভাঙিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। আর্যদেব[৫] 'চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণে' বলিয়া গিয়াছেন, "যে জগৎ উদ্ধারের জন্য কোমর বাঁধিয়াছে, তাহার যদি কোনো দোষ হয়, সে দোষ একেবারে ধর্তব্যই নয়।"

এই বৌদ্ধধর্মের চরম উন্নতি। মহাযানের দর্শন যেমন গভীর, ধর্মমত যেমন বিশুদ্ধ, করুণা যেমন প্রবল, এমন আর-কোনো ধর্মে দেখা যায় না। বুদ্ধদেবের সময় হইতে প্রায় হাজার বৎসর অনেক লোকে অনেক তপস্যা ও সাধনা করিয়া এই মতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে তখন বড়ো বড়ো রাজ্য ছিল, নানারূপ ধনাগমের পথ ছিল, কৃষি-বাণিজ্য ও শিল্পের যথেষ্ট বিস্তার হইতেছিল, বিদ্যার যথেষ্ট আদর ছিল, ধর্মেরও যথেষ্ট আদর ছিল। তাই এত লোকে এত শত বৎসর ধরিয়া একই বিষয়ে চিন্তা করিয়া এতদূর উন্নতি করিতে পারিয়াছিলেন।

চাণক্য শ্লোকে বলে, "ধন উপায় করা বড়ো সহজ, কিন্তু ধন রাখা বড়ো কঠিন।" জ্ঞানেরও তাই, জ্ঞান উপার্জন সহজ, কিন্তু জ্ঞানটি রক্ষা করা বড়ো কঠিন। মহাযানেরও এই জ্ঞান বেশি দিন রক্ষা হয় নাই। দেশ ক্রমে ছোটো ছোটো রাজ্যে ভাগ হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য লোপ হইয়া আসিল, লোকেও দেখিল যে বহুকাল চিন্তা করিয়া বহুকাল যোগসাধনা করিয়া মহাযান হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব, সুতরাং একটা সহজ-মত বাহির করিতে হইবে। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা রাজার দত্ত বৃত্তিতে বঞ্চিত

হইয়া যজমানদিগের উপর নির্ভর করিতে লাগিলেন ; তাঁহাদের আর চিন্তা করিবার সময়ও রহিল না, সে স্বাধীনতাও রহিল না।

কিন্তু নির্বাণের কথা বলিতে গিয়া আমরা অনেক বাহিরের কথা বলিয়া ফেলিলাম। বোধ হয় এগুলি না বলিলে হইত না। মহাযানের নির্বাণ 'শূন্যতা' ও 'করুণা'য় মিশামিশি। এ নির্বাণের একদিকে 'করুণা' আর-একদিকে 'শূন্যতা', করুণা সকলেই বুঝিতে পারে। কিন্তু যে-সকল যজমানের উপর বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বেশি নির্ভর করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগকে শূন্যতা বুঝানো বড়োই কঠিন। তাঁহারা শূন্যতার বদলে আর-একটি শব্দ ব্যবহার করিতেন— সেটি "নিরাত্মা"। নিরাত্মা শব্দটি সংস্কৃত ব্যাকরণে ঠিক সাধা যায় না, কিন্তু এসময় বৌদ্ধেরা সংস্কৃত ব্যাকরণের গণ্ডির মধ্যে থাকিতে চাহিতেন না। তাঁহারা যজমানদিগকে বুঝাইলেন যে, বোধিসত্ত্ব যখন স্তূপের মাথায় দাঁড়াইয়া আছেন, তখন তাঁহারা চারি দিকে অনন্ত শূন্য দেখিতেছেন। এই শূন্যকে তাঁহারা বলিলেন 'নিরাত্মা', শুধু নিরাত্মা বলিয়া তৃপ্ত হইলেন না, বলিলেন "নিরাত্মাদেবী", অর্থাৎ নিরাত্মা শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ। বোধিসত্ত্ব নিরাত্মাদেবীর কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। পুরুষ মেয়ের কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলে যাহা হয়, যজমানেরা সেকথা অনায়াসেই বুঝিতে পারিল; কেন-না সেটা বুঝিতে তো কাহাকেও বিশেষ প্রয়াস করিতে হয় না। এখন নির্বাণের অর্থ কী দাঁড়াইল, তাহা আর প্রকাশ করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। আর ঠিক ঐ সময়েই, যজমানেরা বেশ বুঝিল, মানুষের মন কত নরম হয়, কত করুণায় অভিভূত হয়। সে কথাও তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে হইল না। সুতরাং নির্বাণ যে শূন্যতা ও করুণার মিশামিশি, তাহাই রহিয়া গেল, অথচ বুঝিতে কত সহজ হইল। এ নির্বাণেও সেই অনির্বচনীয় ভাব ও সেই অনন্ত ভাব, দিকেও অনন্ত, দেশেও অনন্ত, কালেও অনন্ত।

'নারায়ণ'
পৌষ, ১৩২১ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. এই বইয়ের পৃ. ২৫৯ সূত্র ১৯ দ্র.

২. 'নৈষধচরিত' মহাকাব্যের কবি শ্রীহর্ষ শ্রীহীর পণ্ডিত ও মামল্লদেবীর ছেলে। 'নৈষধচরিতে' তাঁর আরো কয়েকটি রচনার উল্লেখ আছে : 'স্থৈর্য্যবিচারপ্রকরণ', 'শ্রীবিজয়প্রশস্তি', 'গৌড়োর্বীশকুলপ্রশস্তি', 'অর্ণববিবরণ', 'ছিন্দপ্রশস্তি', 'শিবশক্তিসিদ্ধি' এবং 'নবসাহসাংকচরিতচম্পূ'। এসব বই পাওয়া যায় নি। শংকর-বেদান্তের প্রামাণ্য প্রতিপন্ন করে লেখা তাঁর 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' একটি প্রসিদ্ধ রচনা। শ্রীহর্ষের সময় নিয়ে মতভেদ আছে। কোনো মতে নবম-দশম শতাব্দী, কোনো মতে দ্বাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধ।

৩. সংসার ছেড়ে যাবার পরে সিদ্ধার্থ বৈশালী নগরে অড়ার কালাম বা অণ্ড কালামের কাছে প্রথম দীক্ষা নেন। বুদ্ধঘোষ বলেন, অড়ার ব্যক্তি নাম, কালাম তাঁর পদবি। অড়ার কালাম পরম যোগী ছিলেন, যোগ নিবিষ্ট অবস্থায় তিনি বাহ্য জগৎকে অতিক্রম করতে পারতেন। এই অবস্থায় বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না বলে এর নাম আকিঞ্চন্য-আয়তন। সিদ্ধার্থ অল্পদিনেই আকিঞ্চন্য-আয়তন আয়ত্ত করেন এবং গুরুর সমকক্ষ হয়ে ওঠেন। কিন্তু অনুভব করেন এই অবস্থা শূন্যময়ত্বের উপলব্ধি এনে দিলেও এ পথে নির্বেদ-বৈরাগ্য-নিরোধ-উপশম-অভিজ্ঞা এবং নির্বাণ লাভ করা যায় না। তাই তিনি অড়ার কালামকে ত্যাগ করে যান। সিদ্ধার্থ অড়ার কালামের কাছেই দীক্ষা নিয়েছিলেন কিনা এ বিষয়ে ভিন্ন মতও আছে। 'মিলিন্দ পঞ্হ' অনুসারে ইনি সিদ্ধার্থের চতুর্থ গুরু। 'থেরীগাথা-অট্ঠকথা' অনুসারে অড়ার কালামের কাছে যাবার আগে তিনি ভগ্গবের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন।

৪. অর্হৎ, অর্হন্ত। অর্হ অর্থ উপযুক্ত বা যোগ্য। বৌদ্ধশাস্ত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত এই শব্দটির প্রাচীনতর ব্যবহার পাওয়া যায় 'ঋগ্বেদ' ও

'শতপথ ব্রাহ্মণ'-এ। বৌদ্ধমতে নির্বাণমুখী সাধনার চারটি স্তর। আধ্যাত্মিক প্রবাহের অন্তর্বর্তী যিনি হয়েছেন তিনি স্রোতাপন্ন, নির্বাণ লাভের আগে যাঁকে আর-একবার মাত্র জন্মাতে হয় তিনি সকৃদাগামী, যাঁকে আর-একবারও জন্মাতে হয় না তিনি অনাগামী, যিনি নির্বাণ লাভ করেছেন তিনি অর্হৎ। প্রথম অর্হৎ গৌতম বুদ্ধ। কৌণ্ডিন্য, ভদ্রজিৎ, বাষ্প, মহানাম ও অশ্বজিৎ— ভদ্রবর্গীয় পঞ্চক নামে পরিচিত এই পাঁচ জন ব্রাহ্মণকে বুদ্ধদেব প্রথম ধর্মান্তরিত করেন। এ'দেরও অর্হৎ মনে করা হত। ক্রমে বুদ্ধদেবের জন্ম-জন্মান্তর বাহিত প্রবাহ মূর্তি কল্পনা করে তাঁর উপরে অতিলৌকিক মহিমা আরোপ করা হয়। মনে করা হয়, তিনি এমন বহু বিদ্যা এবং বলের অধিকারী যা আর-কারো পক্ষে অর্জন করা সম্ভব নয়। যেমন 'তিস্‌সো বিজ্‌জা' অর্থাৎ পূর্বনিবাসানুস্মৃতি-জ্ঞান বা নিজের পূর্ব পূর্ব জন্ম সম্পর্কে জ্ঞান, চ্যুত্যুপপাদ-জ্ঞান বা অপরের জন্মান্তর সম্পর্কিত জ্ঞান, আশ্রবক্ষ্য-জ্ঞান বা পূর্ণ বাসনা নিবৃত্তির জ্ঞান— এই তিন বিদ্যা তাঁর আয়ত্তগত। তিনি অসীম দৈহিক শক্তি, দিব্য-শ্রুতি ও পরচিত্ত-বিদিত হবার ক্ষমতার অধিকারী। তিনি স্থানাস্থান-জ্ঞান, কর্ম-বিপাক-জ্ঞান প্রভৃতি দশ বলের অধিকারী। চতু-বেসারজ্‌জে বা চার বৈশারদ্য তাঁর বিশেষ গুণ। অর্থাৎ সম্যক্ বোধি, পূর্ণ বাসনা-ক্ষয়, অকুশলের সংজ্ঞার্থ নির্ণয় এবং প্রদর্শিত মার্গের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তাঁর আত্মপ্রত্যয় প্রশ্নাতীত। অর্হৎদের আর-সব গুণ থাকতে পারে কিন্তু চার-বৈশারদ্য একমাত্র বুদ্ধেরই গুণ। চতু-বেসারজ্‌জ-বিসারদো বুদ্ধ তাই অর্হৎ থেকে শ্রেষ্ঠ। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান— এই পঞ্চস্কন্ধ বা পাঁচটি উপাদান যোগে ব্যক্তি বা জীব গঠিত হয়। কাম, অস্তিত্বের বাসনা ও অজ্ঞান এই আসবের দ্বারা পঞ্চস্কন্ধ একত্র হয়। আসব সমূহের বিনাশ-সাধন করে যাঁরা ধর্মপথে আসেন, স্রোতাপন্ন হন, তাঁদের সাধনার সর্বোচ্চ পর্যায় অর্হতত্ব। অর্হৎ জীবন্মুক্ত দশায় জগতে অবস্থান করেন। অর্হৎরা নির্লিপ্তভাবে সমাজে বাস করতেন। ধর্মদেশনা দ্বারা মানুষের হিতসাধন করতেন। বুদ্ধদেব সাধনায় নারী-পুরুষের অধিকারভেদ মানতেন না। কোনো নারীও অর্হৎ হতে পারতেন। পরবর্তী বৌদ্ধ সাহিত্যে অর্হৎ-এর পরিবর্তে শ্রাবক শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

মহাযান মতে অর্হৎ বা শ্রাবকের চেয়ে বোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠ। অর্হৎরা কেবল নিজের মুক্তির উপায় খোঁজেন, সকল সত্তার মুক্তি তাঁদের কাম্য নয়। 'শতসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'য় বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি শ্রাবকত্ব অর্জনের পরামর্শ দেয় সে পাপমিত্র। বোধিসত্ত্বরা অর্হৎদের মতো ব্যক্তিগত মুক্তি আকাঙ্ক্ষা করেন না, সর্বসাধারণের মুক্তির পথ নির্দেশ

করেন। অর্হৎ-এর আদর্শ নির্বাণ, বোধিসত্ত্বের আদর্শ অনুত্তর-সম্যক্-সম্বোধি। দ্র. এই বইয়ের পৃ. ২৫৬, সূত্র ১৪ (বোধিসত্ত্ব)।

৫. 'চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণ'-এর লেখক আর্যদেব খৃস্টীয় সপ্তম অথবা অষ্টম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। সরহপাদের এক শিষ্য নাগার্জুন, নাগার্জুনের শিষ্য আর্যদেব। মাধ্যমিক দর্শনের প্রবক্তা নাগার্জুন এবং তাঁর শিষ্য আর্যদেব ভিন্ন ব্যক্তি, তাঁদের আবির্ভাব কাল খৃস্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দী। নাম সাদৃশ্যে দুই আর্যদেবের রচনা অনেক সময়ে এক তালিকাভুক্ত করা হয়ে এসেছে। 'চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণ' শাস্ত্রীমশায় আবিষ্কার ও প্রকাশ করেন। (দ্র. "The discovery of a work by Āryadeva in Sanskrit", *J-A-S-B*, Lxvi (I) 1898). শাস্ত্রীমশায়ের ধারণা 'চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণ' প্রথম আর্যদেবেরই রচনা, দ্বিতীয় আর্যদেব পরিমার্জনা করেছিলেন।

"· His *Cittaviśuddhi-prakaraṇa* advocates Mahayana and says that when a man girds up his loins to save the world his petty faults should be overlooked by his contemporaries. He is very bitter against brāhmaṇas. He says if salvation can be gained by a dip into the Ganges then the fishermen are all saved, not to speak of the fish which are day and night immersed in it. The book has been revised by another Āryadeva in later times, for at the end are mentioned images not known in the great Āryadeva's time and there was one Āryadeva in Bengal who wrote also in Bengali." ("The Northern Buddhism", *I-H-Q*, Sept. 1925, p. 464).

বিনয়তোষ ভট্টাচার্য দ্বিতীয় আর্যদেবকেই 'চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণ'-এর লেখক মনে করেন। এই আর্যদেব একজন বৌদ্ধ তান্ত্রিক। "It was written by the Tantric Buddhist writer Āyadeva or Āryadeva, but was wrongly attributed to the earlier Āryadeva, the pupil of Nāgārjuna." (*S-M-II*, p. cxxxiv, FN). পি. বি. প্যাটেলের মতে বাংলা দেশে বজ্রযানের প্রতিপত্তির সময়ে খৃস্টীয় অষ্টম শতকের কিছু আগে আর্যদেব নামে একজন লেখক ছিলেন। ইনি সরহপাদের শিষ্য নাগার্জুন, ওড়িশার রাজা ইন্দ্রভূতি প্রভৃতির সমকালীন। 'চিত্তবিশুদ্ধিপ্রকরণ' এ'রই রচনা। দ্র. P. B. Patel ed. *Cittaviśuddhiprakaraṇa*, Visva Bharati 1949, Introduction.

৩. নির্বাণ কয় রকম ?

থেরাবাদী[১] বুদ্ধেরা ও প্রত্যেক-বুদ্ধেরা[২] মনে করিতেন, মানুষ যদি সদুপদেশ পাইয়া, অথবা, নিজে মনে মনে গড়িয়া লইয়া চারিটি আর্যসত্যে[৩] বিশ্বাস করে, আট রকম নিয়ম[৪] মানিয়া চলে, তাহা হইলে বহুকাল অভ্যাসের পর, তাহারা স্রোতে পড়িয়া যায়। এইরূপ যাহারা স্রোতে পড়িয়া যায়, তাহাদের সোতাপন্ন বলে। স্রোতে পড়িলে যেমন সে আর উজান যাইতে পারে না, ভাটিয়াই যায়, সেইরূপ সোতাপন্ন নির্বাণের দিকেই যাইতে থাকেন, সংসারের দিকে তিনি আর-কখনো ফিরিয়া আসেন না। তাঁহার পুনঃ পুনঃ জন্ম হইলেও তিনি আর উজান বহেন না।

সোতাপন্ন আরো কিছুদিন নিয়ম পালন্ করিলে, তিনি "সকৃদাগামী" হয়েন, অর্থাৎ, তিনি আর-একবার মাত্র জন্ম গ্রহণ করেন। বুদ্ধদেব এই "সকৃদাগামী" অবস্থাতে তুষিভবনে [তুষিত ভবনে] বাস করিতে-ছিলেন। তিনি আর-একবার মাত্র পৃথিবীতে আসিলেন ও নির্বাণ পাইয়া গেলেন।

সকৃদাগামী আরো কিছুদিন নিয়ম পালন করিলে, তিনি যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়ান, তাহাকে "অনাগামী" অবস্থা বলে। এ অবস্থায় আসিলে আর ফিরিতে হয় না। ইহার পরের অবস্থার নাম অর্হৎ। অর্হৎ যদিও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকেন, তবুও তিনি মুক্ত পুরুষ। তিনি যে নির্বাণ পাইয়া থাকেন, তাহার নাম "স্বউপাদী সেস নিব্বাণ" বা স্ব-উপাধি শেষ নিব্বাণ। ইহা নির্বাণ তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে পুনর্জন্মের কিছু কিছু "উপাদান" এখনো শেষ আছে ; অথবা সকল কর্ম এখনো ক্ষয় হয় নাই। আরো সূক্ষ্ম করিয়া বলিতে গেলে— কর্ম হইতে যে সংস্কার জন্মে, তাহার কিছু কিছু এখনো রহিয়া গিয়াছে।

এইরূপ জীবন্মুক্ত অবস্থায় অর্হৎ কিছুদিন থাকিলে, তাঁহার কর্মের ক্ষয়ই হয়, সঞ্চয় আর হয় না। ক্রমে সব কর্ম ক্ষয় হইয়া গেলে তাঁহার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়। মৃত্যু হইলেই তিনি "নিরুপাদি সেস নিব্বাণ ধাতু"তে প্রবেশ করেন— অর্থাৎ তখন তাঁহার কর্মও থাকে না,

কর্ম হইতে উৎপন্ন সংস্কারও থাকে না। তিনি নির্বাণে প্রবেশ করেন, সব ফুরাইয়া যায়।

মহাযানীরা বলেন, এই যে হীনযানীদের নির্বাণ, ইহা নীরস, নিষ্ঠুর, স্বার্থপর, এবং ইহাতে অতি সংকীর্ণ মনের পরিচয় দেয়। হীনযানীরা ও প্রত্যেকযানীরা জগতের জন্য একেবারে 'কেয়ার' করেন না। তাঁহাদের কাছে জগৎ থাকা না-থাকা দুই-ই সমান। নির্বাণ পাইয়াও তাঁহারা কাঠের বা পাথরের মতো হইয়া যান। ও নির্বাণ, যাঁহারা বুদ্ধিমান, যাঁহাদের শরীরে দয়ামায়া আছে, যাঁহাদের হৃদয় আছে, যাঁহারা শুধু আপনার সুখের জন্য বাস করে না, যাঁহারা পরের জন্য ভাবিতে শিখিয়াছে, তাঁহাদের কিছুতেই ভালো লাগিবে না। তাঁহারা নির্বাণের অন্যরূপ অর্থ করিয়া লইবে।

মহাযানীরা মনে করেন যে, নির্বাণকে নিষেধমুখে অর্থাৎ 'না' 'না' করিয়া দেখিলে চলিবে না। উহাকে বিধিমুখে অর্থাৎ 'হাঁ'র দিক হইতেই দেখিতে হইবে। আত্মার নাশের নাম নির্বাণ, জ্ঞানের নাশের নাম নির্বাণ, বুদ্ধির নাশের নাম নির্বাণ— এই যে হীনযানীরা 'না'র দিক হইতে উহাকে দেখিয়া থাকেন, উহা বুদ্ধের মনের কথা হইতে পারে না। তিনি 'চতুরার্য্যসত্য' ও আর্য অষ্টাঙ্গ মার্গ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে আর্য অষ্টাঙ্গ মার্গ বা আটটি সুপথ ধরিয়া চলার নামই নির্বাণ। তাঁহার মতে মনুষ্য হৃদয়ের যত আশা আকাঙ্ক্ষা, সব শান্তি করিয়া দেওয়ার নাম নির্বাণ নহে : সেই-সকল আশা আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইতে দেওয়ার নামই নির্বাণ। কিন্তু সে আশা বা আকাঙ্ক্ষায় লিপ্ত থাকিলে চলিবে না, তাহার ঊর্ধ্বে অবস্থিতি করিতে হইবে।

দেখান গেল যে, মহাযান নির্বাণ 'না'র দিক হইতে নয়, 'হাঁ'র দিক হইতে বুঝিতে হইবে। নিরালম্ব নির্বাণে বোধিচিত্ত যে কেবল ক্লেশ-পরম্পরা হইতে মুক্ত হন, এরূপ নয়, কুদৃষ্টি হইতেও মুক্ত হন। তখন বোধিচিত্ত ধর্মকায়ের পবিত্র মূর্তি দেখিতে পাইবেন। দুটি জিনিস তখন তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে— ১. সর্বভূতে করুণা, ও ২. সর্বব্যাপী জ্ঞান। যিনি এইরূপে "সম্যক্ সম্বোধি" লাভ করিয়াছেন, তিনি সংসারের উপরে উঠিয়াছেন, নির্বাণেও তখন তাঁহার একান্ত আস্থা নাই। তখন তাঁহার উদ্দেশ্য হইয়াছে সর্বজীবের পরিত্রাণ

ও তাহার জন্য তিনি আপনাকে বারংবার বদ্ধ করিতেও কাতর হন না। তাঁহার সর্বব্যাপী-প্রজ্ঞাবলে তিনি পদার্থের সত্যাসত্য দেখিতে পান। তাঁহার জীবন তখন উৎসাহে পরিপূর্ণ, উহা সম্পূর্ণরূপে কর্মময় হইয়া গিয়াছে। কারণ, তাঁহার হৃদয় তাঁহাকে বলিতেছে, "সমস্ত প্রাণীকে মুক্ত করো ও চরমানন্দে ভাসাইয়া দাও।" তিনি নির্বাণেও তৃপ্তি লাভ করেন না, নির্বাণেও তিনি বসতি করিতে পারেন না, তাঁহার কী ভব, কী নির্বাণ কোনোই আলম্বন নাই, এইজন্য তাঁহার নির্বাণের নাম নিরালম্ব নির্বাণ।

মহাযানীদের আর-একরকম মুক্তি আছে। এ মুক্তি ভব ও নির্বাণের অতীত। ইহা সম্পূর্ণরূপে ধর্মকায়ের সহিত এক। আমরা যাহাকে তত্ত্ব বলি, সাধারণ লোকে যাহাকে তথ্য বলে, মহাযানীরা তাহাকে তথতা বলে। ধর্মের যে তথতা তাহার নাম ধর্মকায়। যিনি মুক্তি লাভ করিয়াছেন, তিনি তথাগত হইয়াছেন, অর্থাৎ পরমসত্যে আগত হইয়াছেন।

সে পরম সত্যটি কী ? জগতে আমরা যাহা-কিছু দেখিতে পাই, তাহার তলায় যে নিগূঢ় সত্যটুকু রহিয়াছে, তাহারই নাম ধর্মকায়। ধর্মকায় হইতেই নানাবিধ বিচিত্র সৃষ্টি সম্ভব হইয়াছে। ইহা হইতেই সৃষ্টিতত্ত্ব বুঝা যায়। ধর্মকায় মহাযানীদের নিজস্ব, কারণ হীনযানীরা জগতের আদিকারণ নির্ণয় করিতেই যান নাই। তাঁহাদের মতে ধর্মকায় বলিতে বুদ্ধের ধর্ম ও তাঁহার শরীর বুঝাইত। অনেকে মনে করেন, ধর্মকায় বলিতে বেদান্তের পরমাত্মা বুঝায়, কিন্তু সেকথা সত্য নয়। নির্গুণ পরমাত্মা অস্তিত্ব মাত্র। ধর্মকায়ের ইচ্ছা আছে, বিবেকশক্তি আছে, অর্থাৎ, ইঁহার করুণা আছে ও বোধি আছে। সকল সজীব পদার্থই এই ধর্মকায়ের প্রকাশমাত্র।

নির্বাণ বলিতে চৈতন্যের নাশ বুঝায় না, চিন্তার নিরোধও বুঝায় না। নির্বাণে নিরোধ করে কী ? কেবল অহংভাবেরই ইহাতে নিরোধ করে। ইহাতে বলিয়া দেয় যে, অহং বলিয়া যে একটা পদার্থ কল্পনা করা হয়, তাহা অলীক ও এই অলীক কল্পনা হইতে আরো যত ভাব উঠে, সে সবও অলীক। এতটুকু তো গেল কেবল 'নিষেধমুখে' অর্থাৎ 'না'র দিক হইতে। বিধিমুখে অর্থাৎ 'হাঁ'র দিক হইতেও ইহার

একটা অর্থ আছে। সেটি করুণা— সর্বভূতে দয়া। এই দুইটা জিনিস লইয়াই নির্বাণ সম্পূর্ণ হয়। হৃদয় যখন অহংভাব হইতে মুক্ত হইল, অমনি, যে হৃদয় এতক্ষণ সংকীর্ণ ও অলস ছিল, তাহা আনন্দে উৎফুল্ল হইল, নূতন জীবনের ভাব দেখাইতে লাগিল, যেন কারাগার ছাড়িয়া বন্দি বাহির হইয়া পড়িল। এখন সমস্ত জগৎই তাহার, এবং সেও সমস্ত জগতেরই। সুতরাং একটি প্রাণীও যতক্ষণ নির্বাণ পাইতে বাকি থাকিবে, ততক্ষণ তাঁহার নির্বাণ পাইয়া লাভ কী? নিজের জন্যই হউক বা পরের জন্যই হউক, সমস্ত জগৎ তাঁহাকে উদ্ধার করিতেই হইবে।

একজন বোধিসত্ত্ব বলিতেছেন, "অবিদ্যা হইতে বাসনার উৎপত্তি এবং সেই বাসনা হইতে আমার পীড়ার উৎপত্তি। সমস্ত সজীব পদার্থ পীড়িত সুতরাং আমিও পীড়িত। যখন সমস্ত সজীব পদার্থ আরোগ্য লাভ করিবে, তখন আমিও আরোগ্য লাভ করিব। কিসের জন্য বোধিসত্ত্ব জন্ম ও মৃত্যু যন্ত্রণা স্বীকার করেন? কেবল জীবের জন্য। জন্ম ও মৃত্যু থাকিলেই পীড়া থাকে। যখন জীবের পীড়ার উপশম হয়, বোধিসত্ত্ব রোগযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হন। যখন পিতামাতার একমাত্র সন্তান পীড়িত হয়, তখন পিতামাতারও পীড়া উপস্থিত হয়। সে সন্তান নীরোগ হইলে পিতামাতাও নীরোগ হন। বোধিসত্ত্বেরও ঠিক সেইরূপ। তিনি সমস্ত জীবগণকে সন্তানের মতো ভালোবাসেন। তাহারা পীড়িত হইলেই তিনি পীড়িত হন, তাহারা নীরোগ হইলেই তিনি নীরোগ হন। তুমি কি শুনিতে চাও কেন বোধিসত্ত্ব এরূপ পীড়িত হন? তিনি মহাকরুণায় আচ্ছন্ন, তাই তিনি পীড়িত হন।"

'নারায়ণ'
মাঘ, ১৩২১ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য।

১. থেরাবাদ, থেরবাদ, স্থবিরবাদ। বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের প্রায় একশো বছর পরে বৈশালীতে দ্বিতীয় বৌদ্ধ-সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। বজ্‌জি বা বৃজি-বংশীয় ভিক্ষুদের আচরণে শিথিলতা দেখা দেওয়ায় বিনয়বিধি বিচারের জন্য স্থবির যশ কাকন্দপুত্রের উদ্যোগে এই সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছিল। 'বিনয়পিটকে'র 'চুল্লবগ্‌গ'-এর বিবরণ অনুসারে সর্বকামী, সাঢ়, কুজ্জশোভিত, বাসবগামী, রেবত, সম্ভূত, যশ ও সুমন— এই আট জন স্থবির বৃজি-বংশীয় ভিক্ষুদের 'দসবথ্‌থুনী' বা দশ অনাচার সম্পর্কে বিচার করেন। বিচারে পরিবর্তন বিরোধী নিষ্ঠাবান্ ভিক্ষুদেরই জয় হয়। বিরুদ্ধবাদীরা এ সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করে আর-একটি সংগীতি আহ্বান করেন। এই বিরাট সম্মেলনে দশ হাজার ভিক্ষু উপস্থিত হয়েছিলেন— তাই একে মহাসংগীতি বলা হয় এবং এ'রা মহাসাংঘিক নামে নিজেদের পরিচয় দেন। বৌদ্ধ সংঘ দুই ভাগ হয়ে গেল। রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের নাম হয় স্থবিরবাদী বা থেরবাদী।

২. পালি বৌদ্ধ শাস্ত্রে শ্রাবকযান এবং প্রত্যেক-বুদ্ধযানের উল্লেখ আছে। শ্রাবকযানের সাধক বা শ্রাবকের অন্বিষ্ট অর্হত্ব। এ'রা নির্বাণ আকাঙ্ক্ষা করেন না। অন্যপক্ষে প্রত্যেক-বুদ্ধযানের সাধক বা প্রত্যেক-বুদ্ধের লক্ষ্য ব্যক্তিগত নির্বাণ। এ'রা প্রত্যেকে নিজে বোধি লাভ করেন কিন্তু শাস্তা বা লোকসাধারণের মুক্তির পথপ্রদর্শক হন না। 'মহাবস্তু অবদান'-এর মালিনী উপাখ্যানে বলা হয়েছে— প্রত্যেক-বুদ্ধরা মৌন অবলম্বনেই শোভন হন, তাঁরা মহান্ প্রভাববিশিষ্ট, তাঁরা গণ্ডারের মতো একাকী বিচরণ করেন, তাঁরা কেবল নিজেকেই দমিত করেন এবং পরিনির্বাণ লাভ করেন। মহাযান মতে বুদ্ধদেবকে প্রত্যেক-বুদ্ধদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়, কারণ, তিনি বুদ্ধত্ব অর্জনের পরে লোকসাধারণের শাস্তা হয়েছিলেন।

শাস্ত্রীমশায় অন্যত্র লিখেছেন, "Two Yānas are well-known, the Mahā- and the Hīna-yāna. Of course,

the Mahā-yānists arrogate upon themselves the title of 'great' and relegate all others as Hīna-, or, 'low'. The latter however, do not take this opprobrious epithet lying, they call themselves as belonging to either Śrāvaka-yāna or Pratyeka-yāna and return the abuse on the Mahā-yānists by calling them Kāpālikas. The Śrāvakas hear from Buddha his *upadeśa*, act according to his directions and strictly follow his instructions. They cannot get Nirvāṇa (even the lowest form of Nirvāṇa, which they aspire to) without a Buddha The Pratyeka Buddhas are those who by their own exertions at times, when there were no Buddhas in the world, attain to Nirvāṇa. They call the Mahā-yānists not Maha- but Bodhi-sattva-yāna. That also, I believe, in derision, because according to them there can be but one or two Bodhi-sattvas in the world at a time ; but every votary of Mahāyāna is a Bodhisattva." (*Advayavajrasaṁgraha*, G-O-S No. XL, Introduction, p. xxvi).

৩. জীবন দুঃখময়, দুঃখের উপযুক্ত কারণ আছে, কারণ দূর হলে দুঃখ নিরোধ হতে পারে এবং দুঃখ নিবারণের উপায় উদ্ভাবন— এই চারটি আর্যসত্য বৌদ্ধ মতবাদের ভিত্তি।

৪. দুঃখ নিবারণের উপায় বা মার্গ আটটি, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। ১. সম্যক্ দৃষ্টি বা দুঃখের স্বরূপ, দুঃখ উৎপত্তির কারণ, দুঃখ নিরোধের অর্থ ও দুঃখ নিরোধের উপায় সম্পর্কে জ্ঞান। ২. সম্যক্ সংকল্প বা নৈষ্কাম্য, অবিদ্বেষ ও অহিংসা সংকল্প। ৩. সম্যক্ বাক্ বা অসত্য বলা, কুৎসা করা, পরুষ বাক্য বলা ও গুজব (সম্ফপ্পলাপ) রটানো থেকে নিবৃত্ত হওয়া। ৪. সম্যক্ কর্মান্ত বা প্রাণ বিনাশ, চুরি (অদিন্না-দান) ও কামভোগ থেকে নিবৃত্ত হওয়া। ৫. সম্যক্ আজীব বা অন্যায় জীবিকা বর্জন। ৬. সম্যক্ ব্যায়াম বা চেষ্টা। প্রাণে অকুশল ভাবের উদয় যাতে না হয়, প্রাণে উদিত অকুশল ভাব যাতে দূর হয়, কুশল ধর্ম যাতে প্রাণে উদিত হয় এবং উদিত কুশল ধর্ম যাতে স্থায়ী হয়,

বিপুলতা ও পূর্ণতা লাভ করে— তার চেষ্টাই সম্যক্ ব্যায়াম। ৭. সম্যক্ স্মৃতি। শারীরিক ক্রিয়া, সুখদুঃখ মূলক অবস্থা, চিত্ত-বিষয়ক অবস্থা এবং দেহমনের জড়তা, ঔদ্ধত্য ; রূপ-বেদনা-সংজ্ঞা-সংস্কার-বিজ্ঞান এই পঞ্চ স্কন্ধ : চোখ-কান-ঘ্রাণ-জিব-কায়-মন এই ছয় আয়তন ; স্মৃতি-ধর্মানুসন্ধান-বীর্য-প্রীতি-প্রশান্তি-সমাধি-উপেক্ষা এই সাত বোধ্যঙ্গ ; চার আর্যসত্য সম্পর্কে স্মৃতিমান্ থাকাই সম্যক্ স্মৃতি। ৮ সম্যক্ সমাধি। কাম ও অকুশল-ধর্ম ত্যাগ করে বিচার-বিতর্কময় বিবেকজাত প্রীতিসুখপূর্ণ প্রথম ধ্যান ; অধ্যাত্ম স্তরে একাগ্র চিত্তে বিচার-বিতর্ক অতিক্রান্ত সমাধি-জাত দ্বিতীয় ধ্যান ; প্রীতির অতীত, উপেক্ষা-ভাবময় স্মৃতিমান্ ও সম্প্রজ্ঞ তৃতীয় ধ্যান ; সৌমনস্য-দৌর্মনস্য বা সুখদুঃখ অতিক্রান্ত উপেক্ষা ও স্মৃতি-পরিশুদ্ধ চতুর্থ ধ্যান— এই চার রকম ধ্যানকে সম্যক্ সমাধি বলা হয়।

৪. কোথা হইতে আসিল ?

১ বৌদ্ধধর্মের আদি কী ? একথা লইয়া বহুকাল হইতে বাদ-বিসংবাদ চলিয়া আসিতেছে। এ বিষয়েও নানা মুনির নানা মত ; এখনো কিছুই ঠিক হয় নাই। যাঁহার যেমন পড়াশুনা, যাঁহার যে শাস্ত্রে কৃতিত্ব, যিনি যে শাস্ত্র লইয়া আলোচনা করেন, তিনিই আপনার মনের মতো একটা আদি ঠিক করিয়া লন এবং সেই মতই প্রচার করেন। অনেকে আবার দুই-চারি জনের মত লইয়া একটা সামঞ্জস্য করিতে গিয়াছেন। এইরূপে মত বহু-সংখ্যক হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের মতো লোকে কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারে না, যতই আলোচনা করে ততই ধাঁধাঁর মধ্যে পড়িয়া ঘুরিতে থাকে। তাই সেই মতগুলির একবার চর্চা করা আবশ্যক হইয়াছে।

বৌদ্ধধর্মের আদি কী ?

প্রথম মত এই যে, বুদ্ধদেব যজ্ঞে হাজার হাজার পশুবধ হয় দেখিয়া দয়ায় গলিয়া যান, ও যাহাতে পশুবধ নিবারণ হয়, তাহারই জন্য অহিংসা পরমধর্ম— এই মত প্রচার করেন। বাস্তবিক তখন যজ্ঞে যে বিস্তর পশু বধ হইত সে বিষয়ে তো সন্দেহ নাই। 'ঋগ্বেদে' অশ্বমেধ যজ্ঞের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে একটি ঘোড়া ও একটি ভেড়া মারার কথা আছে। কিন্তু 'যজুর্বেদে'র ব্রাহ্মণে ঐ একটি ভেড়ার জায়গায় একটি হাজার ভেড়া বধের কথা আছে। তাহার পর সোমযাগ তো পশুবধ ভিন্ন হইতেই পারিত না। সোমযাগ যে কত রকম ছিল তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সুতরাং কত পশু যে মারা হইত তাহারো ইয়ত্তা নাই। তাই দেখিয়া পশুবধ নিবারণের জন্য বুদ্ধদেব এই ধর্ম প্রচার করেন। এ মত বহুকাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, এবং এখনো আছে। রামচন্দ্র কবিভারতী[১]— যিনি বঙ্গ দেশ হইতে লঙ্কাদ্বীপে গিয়া তথাকার রাজার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন হন এবং বৌদ্ধাগম চক্রবর্তী এই উপাধি পান— তিনি নিজে প্রথমে ব্রাহ্মণ ছিলেন। বুদ্ধদেব যে বেদনিন্দা করিতেন একথা তিনি সহ্য করিতে না পারিয়া বলিয়াছেন— বুদ্ধদেব শুদ্ধ সেই-সকল শ্রুতির নিন্দা করিয়াছেন

যজ্ঞে পশুবধ নিবারণ।

যাহাতে পশুবধের কথা আছে। সমস্ত বেদের নিন্দা তিনি একেবারেই করেন নাই।

জয়দেবও বুদ্ধ অবতারের স্তব করিতে গিয়া বলিলেন—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্।
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্ ॥" [শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দম্ ১।১৩]

অর্থাৎ তিনি মাত্র যজ্ঞবিধির শ্রুতিগুলির নিন্দা করিয়াছেন, অন্য শ্রুতির নিন্দা করেন নাই।

দ্বিতীয় মত এই যে, বুদ্ধদেবের পূর্বে উপনিষদের অদ্বৈত মত চলিয়া আসিতেছিল, বুদ্ধদেব সেই মতই আশ্রয় করিয়া ধর্ম প্রচার করেন।

উপনিষদ্-ধর্মের পরিণাম।

তাঁহার একটি নামই অদ্বয়বাদী। তাঁহার নির্বাণ ও উপনিষদের অদ্বয়বাদে বিশেষ কিছু তফাত নাই। তবে 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী'র গ্রন্থকার চিরঞ্জীব শর্মা[২] যেমন বলিয়াছেন, "তুমি বল, আছে আছে আমি বলি নাই।" তোমার আমার এই কথার ভেদমাত্র, বাস্তবিক ভেদ কিছুই নাই। এই জন্যই শংকরাচার্যের[৩] অদ্বৈতবাদকে রামানুজের[৪] দল—

"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং
প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেবতৎ।"

বলিয়া গালি দিয়াছেন। তবে এ গালিতেও ঐ মতে একটু তফাত আছে। রামানুজীরা বলেন, শংকর বৌদ্ধমত গ্রহণ করিয়া অদ্বৈতবাদী হইয়াছেন, আর ও মতে বলে, উপনিষদের প্রাচীন অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিয়া বুদ্ধদেব অদ্বয়বাদী হইয়াছেন।

তৃতীয় মত এই যে, বৌদ্ধধর্ম সাংখ্যমতের পরিণাম। সাংখ্যমত বুদ্ধদেবের অনেক পূর্ব হইতে চলিয়া আসিতেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সাংখ্যমতের পরিণাম।

সাংখ্যমতে যেমন দর্শন সম্বন্ধীয় তত্ত্বগুলি গণিয়া সংখ্যা করিয়া রাখে, বুদ্ধমতেও তাই। সাংখ্যের অষ্ট বিকৃতি, তিন প্রমাণ, পঞ্চ ভূত, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র, অষ্ট সিদ্ধি ইত্যাদি, বুদ্ধেরও সেইরূপ পঞ্চ স্কন্ধ, চতুরার্য সত্য, আর্য অষ্টাঙ্গমার্গ প্রভৃতি। সাংখ্যদর্শন যেমন ত্রিতাপনাশের জন্যই রচিত হইয়াছিল, বুদ্ধদর্শনও তেমনি ত্রিতাপনাশের জন্যই রচিত

হইয়াছিল। সেই ত্রিতাপ নাশ করিতে গিয়া সাংখ্যগণ বলিয়াছিল, আত্মাকে কেবল, অর্থাৎ অন্য বস্তুর সহিত সম্পর্কশূন্য করিয়া দিতে পারিলেই ত্রিতাপ নাশ হয়। বুদ্ধ বলিলেন, না, সে হইতেই পারে না, কারণ আত্মা থাকিলেই তাহা 'কেবল' হইয়া থাকিতে পারে না, অতএব আত্মাই নাই বলিতে হইবে।

অনেকে মনে করেন, ব্রাহ্মণেরা সে সময়ে বড়ো অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা আপনাদিগকে ভূদেব বলিয়া মনে করিতেন।

ব্রাহ্মণদের অত্যাচার ও প্রাধান্য দমনের জন্যই বৌদ্ধ-মত।

অন্য যে কেহই হউক না, তাঁহাকে ব্রাহ্মণের পদানত হইয়াই থাকিতে হইবে। বুদ্ধদেব এত অত্যাচার সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি আপামর সকলকেই মুক্তির উপদেশ দিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের উপর তাঁহার দ্বেষই ধর্মপ্রচারের কারণ। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত এ-কথা একেবারেই স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্মে কিছুমাত্র দ্বেষভাব ছিল না। কিন্তু সম্প্রতি চন্দ্রকীর্তির টীকার সহিত আর্যদেবের[৫] চতুঃশতিকা'র কিয়দংশ ছাপা হইয়াছে, তাহাতে আচার্য সংঘসেন একজন বালকের সেবায় অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া তাহাকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা লইবার জন্য জিদ করিতে লাগিলেন। তখন সে বলিল, "আর কিছুদিন যাউক, আমি দীক্ষা লইব।" মাস খানেক পরে সে আসিয়া বলিল, "আচার্য, আমি এখন 'দীক্ষিত'।" আচার্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসে তোমার দীক্ষা হইল ?" সে বলিল, "এখন ব্রাহ্মণ দেখিলেই আমার ইচ্ছা হয় যে আমি তাহাকে মারিয়া ফেলি, সুতরাং আমি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত।"

আবার একদল আছেন তাঁহারা বলেন, বুদ্ধদেব শাক্যবংশে জন্মিয়াছিলেন। শাক্য শব্দ শক শব্দ হইতে উৎপন্ন। সুতরাং তিনিও শক ছিলেন। শকেদেরই ধর্ম তিনি প্রচার করেন।

বুদ্ধদেব শকজাতীয়, তাঁহার ধর্ম শক-জাতীয় ধর্ম।

শকেরা কোনো কালে হিমালয়ের উচ্চ শিখর উত্তীর্ণ হইয়া কপিলবাস্তুতে বাস করিয়াছিল, তাহারা স্বগোত্রে বিবাহ করিত, সুতরাং তাহারা কিছুতেই আর্য হইতে পারে না। অনেক শকজাতীয় রাজারাও আপনাদিগকে শাক্যবংশের লোক বলিয়া পরিচয় দিতেন এবং বুদ্ধদেবের জ্ঞাতি বলিয়া গৌরব করিতেন।

কোনো কোনো ইউরোপীয় পণ্ডিত মনে করেন যে, বুদ্ধদেবের গল্পটি সত্য নহে। উহা ইতিহাস নহে, উহা সূর্যসম্বন্ধীয় একটি প্রাচীন কল্পিত আখ্যায়িকা মাত্র। শাল গাছে ভর করিয়া মা দাঁড়াইলেন ও মায়ের দক্ষিণ কুক্ষি ভেদ করিয়া বুদ্ধদেব জন্মাইলেন, ইহা পূর্বদিকে সূর্য উদয় ভিন্ন আর-কিছুই নহে। আবার দুইটি শালগাছের মাঝখানে গালে হাত দিয়া বুদ্ধদেব নির্বাণ প্রাপ্ত হইলেন, ইহাও সূর্যের অস্তগমন ভিন্ন আর-কিছুই নহে। যাঁহারা এই আখ্যায়িকা সাজাইয়াছেন. তাঁহাদের সুবিধিরচনায় বাহাদুরি খুব আছে।

সূর্যদেবের গল্প।

যাঁহারা ভারতবর্ষের যাহা-কিছু সবই গ্রীকদিগের কাছ হইতে লওয়া মনে করেন, তাঁহারাও বুদ্ধদেব গ্রীকদিগের কাছ হইতে কিছু লইয়াছেন, একথা বলিতে পারেন না। কেন-না যখন তাঁহার জন্ম হয়, অথবা যখন তাঁহার মৃত্যু হয়, তখন পর্যন্ত গ্রীকজাতি ভারতবর্ষের দিকে কেহ আসেনই নাই। কিন্তু ভারতবর্ষের নিজস্ব কিছু থাকিতে পারে. একথা তাঁহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন, বুদ্ধদেব ও মার আর-কেহই নহে, জোরোয়াস্টারের[৬] মতের অহুরমজদা ও আহরিমান মাত্র। জোরোয়াস্টারের মতে যেমন ভালো ও মন্দের লড়াইয়ে শেষ ভালোরই জয় হইল, মন্দ হারিয়া গেল, এমতেও তেমনি বুদ্ধ জিতিলেন ও মার হারিয়া গেলেন। জিহোবা ও শয়তান যদি ভালো ও মন্দের লড়াই হয়, তবে বুদ্ধ ও মার না হইবেন কেন?

জোরোয়াস্টারের গল্প।

যেখানে প্রায় ২৫০০ বৎসর পূর্বে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়, এখন সেইখানে থাড়ু নামে এক জাতি বাস করে। উহারা বিশেষ সভ্য নহে। পূর্বে উহাদিগকে চেরো বলিত এখন থেড়ো হইয়া গিয়াছে। ছোটোনাগপুরের অনেক অসভ্য জাতিই বলে যে তাহারা চেরোদের সন্তান, রোটাস্‌গড়ের দিক হইতে অথবা তাহারো উত্তর হইতে তাহারা ছোটোনাগপুরে আসিয়াছে। অতি প্রাচীনকালে বঙ্গ, বগধ ও চের নামে তিন জাতি আর্যদিগের শত্রু ছিল। উহাদের মধ্যে চেররাই এখনকার থেড়ো, উহাদের ধর্মই বুদ্ধদেব সংস্কার করিয়া উত্তর ভারতের অনেক সুসভ্য দেশে প্রচার করেন। এও একটা মত আছে।[৭]

থাড়ু জাতির ধর্ম।

এই-সকল মতের প্রতিবাদ করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কেবল কত রকমের ভিন্ন ভিন্ন মত আছে তাহা দেখানোই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু এ বিষয়ে বিচার করিতে গেলে প্রথম দেখিতে হইবে বুদ্ধদেব আর্য কিনা। তিনি যে আর্য নন একথা বলিবে কিরূপে ? তিনি ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মান। ইক্ষ্বাকুবংশ বেদেও প্রসিদ্ধ। তাঁহারো গোত্র আছে. গোতম গোত্রের কপিলমুনি শাক্যবংশের আদিগুরু। গোতমের নাম হইতেই শাক্যসিংহকে গৌতম বলিয়া ডাকা হয়। তখন গুরুর গোত্র লইয়া ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর্য জাতির গোত্র হইত, প্রমাণ অশ্বঘোষের উক্তি—

বুদ্ধদেব আর্য কিনা।

"একপিত্রোর্যথাভ্রাত্রোঃ পৃথক্ গুরুপরিগ্রহাৎ।
রামএবাভবৎ গার্গো বাসুভদ্রোপি গৌতমঃ ॥"

এক বাপের দুই ছেলে ; রাম ও বাসুভদ্র। পৃথক্ পৃথক্ গুরু স্বীকার করায় রাম হইলেন গার্গ্য এবং বাসুভদ্র হইলেন গৌতম। সুতরাং বুদ্ধদেবের পূর্বপুরুষগণ অন্য জাতীয় লোক হইয়া গুরুর গোত্র গ্রহণ করিয়া গৌতম হওয়া বিচিত্র নহে। শাক্যগণ ইক্ষ্বাকু বলিয়া গর্ব করিতেন। কিন্তু এটা তো ঠিক তাঁহাদিগকে ইক্ষ্বাকুরাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং বৈমাত্র ভাইয়ের উপকারের জন্যই তাড়ানো হয়। পাটরানীর ছেলেকে তো তাড়ানো শক্ত, সুতরাং তাঁহারা অন্য রানীর ছেলেই হইবেন। রাজারা তখন অনেক বিবাহ করিতেন এবং বিবাহে জাতি-বিচার বড়ো একটা করিতেন না। সুতরাং ভরতবংশ যেমন পাকা আর্য, শাক্য যে তেমন পাকা এরূপ বোধ হয় না। আর্যাবর্তও সে সময়ে যে উভয় সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহাও বোধ হয় না। আর্য ও বঙ্গ-বগধ জাতির সন্ধিস্থলে শাক্যবংশীয় রাজধানী ছিল। এইরূপ নানা কারণে শাক্যেরা যে পাকা আর্য ছিলেন, সে বিষয়ে যেন একটু সন্দেহ হয়।

তারপর যাগযজ্ঞে পশুহিংসা দেখিয়া বুদ্ধদেবের অহিংসা ধর্মের উদ্রেক হয়, এটা তো বুদ্ধের কোনো জীবন-চরিতে বলে না। 'ললিত-বিস্তরে' বলে না, 'মহাবস্তু-অবদানে' বলে না, 'বুদ্ধচরিতে' বলে না। পালি গ্রন্থেও বলে না। তবে সেটার উপর বিশেষ ভরও দেওয়া যায় না। ঐটাই যদি প্রধান কারণ হইত, তাহা হইলে তাঁহার এত জীবনী, এক-খানি-না-একখানিতে একথাটা থাকিত যে বুদ্ধ পশুহত্যা দেখিলেন, তিনি

করুণায় গলিয়া গেলেন ও যাহাতে পশুহত্যা নিবারণ হয়, তাহারই জন্য ধর্ম প্রচার করিতে বসিলেন। অহিংসা যে পরম ধর্ম, তাঁহার পূর্বেও লোকে জানিত। যাঁহারা সৌভাগ্যক্রমে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত পঁহুছিতেন ও ভিক্ষু-আশ্রম গ্রহণ করিতেন, তাঁহারা তো হিংসা করিতেন না। জৈনেরা বুদ্ধদেবের বহু পূর্ব হইতে অহিংসাধর্ম পালন করিয়া আসিতেছিল। অতএব ওকথাটা ঠিক বলিয়া বোধ হয় না।

উপনিষদের অদ্বৈতবাদ হইতে বুদ্ধদেবের ধর্মের উৎপত্তি, একথা স্বীকার করা কঠিন। কারণ উপনিষদ্, বিশেষ তাহার অদ্বৈতবাদ, বুদ্ধদেবের সময়ে হইয়াছিল কি ? ব্রাহ্মণগুলি যজ্ঞ করিবার জন্য লেখা হয়। প্রাচীন উপনিষদ্গুলি, যথা 'ছান্দোগ্য', 'বৃহদারণ্যক', ব্রাহ্মণের অংশ, যজ্ঞেই উহার ব্যবহার হইত। যাজ্ঞিকেরা এখনো উহা যজ্ঞের অংশ বলিয়াই ব্যবহার করেন। শংকরাচার্যের মত ব্যাখ্যা তাঁহারা করেন না। সেকালে যে-কোনো সার কথা গুরুর কাছ হইতে শিখিতে হইত, তাহারই নাম উপনিষদ্ ছিল। অর্থশাস্ত্রের উপনিষদ্ ছিল, কামশাস্ত্রের উপনিষদ্ ছিল। বৌদ্ধেরাও উপনিষদ্ শব্দ বেশ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

মোক্ষস্যোপনিষৎ সৌম্য বৈরাগ্যমিতিগৃহ্যতাম্।
বৈরাগ্যস্যাপি সংবেগঃ সংবিদো জ্ঞানদর্শনম্ ॥
জ্ঞানস্যোপনিষচ্চৈব সমাধিরুপধার্য্যতাম্।
সমাধেরপ্যুপনিষৎ সুখং শারীরমানসম্ ॥
প্রস্রব্ধিঃ কায়মনসোঃ সুখোস্যোপনিষৎ পরা।
প্রস্রব্ধেরপ্যুপনিষৎ প্রীতিরপ্যবগম্যতাম্ ॥
তথা প্রীতেরুপনিষৎ প্রামোদ্যং পরমং মতম্।
প্রামোদ্যস্যাপ্যহৃল্লেখঃ কুকৃতেষ্বকৃতেষু চ ॥
অবিলেখস্য মনসঃ শীলন্ত্বুপানিষচ্ছুচি।

মোক্ষের মূল বৈরাগ্য ; বৈরাগ্যের মূল আগ্রহ ; আগ্রহের মূল জ্ঞান-দর্শন ; জ্ঞানের মূল সমাধি ; সমাধির মূল শরীর ও মনের সুখ ; সুখের মূল শরীর ও মনের শান্তি ; শান্তির মূল প্রীতি ; প্রীতির মূল স্ফূর্তি ; স্ফূর্তির মূল কুকার্য করিয়া অথবা কর্তব্য কর্ম না করিয়া হৃদয়ে ব্যথা না থাকা। ব্যথা না থাকার মূল বিশুদ্ধ শীল।

আর উপনিষৎ বলিয়া একটি দর্শনের মত আমরা সর্ব প্রথম 'হর্ষ-

চরিতে'[৮] দেখিতে পাই। 'হর্ষচরিতে' হর্ষ যখন দিবাকরের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তথায় নানা সম্প্রদায়ের ছাত্র পাঠ করিতেছে দেখিতে পাইলেন ; তাহার এক সম্প্রদায় ঔপনিষদ। কালিদাসও তাঁহার 'বিক্রমোর্ব্বশী'তে বলিয়াছেন, "বেদান্তেষু যমাহুরেক পুরুষম্" —এখানেও বেদান্ত শব্দের অর্থ উপনিষৎ। সুতরাং কালিদাস ও হর্ষরাজার সময়েই উপনিষদ্ একটা দার্শনিক মতের মধ্যে গণ্য হইয়াছিল, কিন্তু সে তো বুদ্ধের বহুকাল পরে। উপনিষদের যে এত প্রাদুর্ভাব এখন দেখা যাইতেছে, ইহা তো শংকরাচার্যের পর হইতেই হইয়াছে। তাই বলিতেছিলাম, উপনিষদের অদ্বৈতবাদ হইতে বৌদ্ধধর্ম, এটা বিশ্বাস করা কঠিন। আরো কথা, বৌদ্ধধর্মটাই কি গোড়ায় অদ্বৈতবাদ ছিল ? সেটা মহাযানীরাই না ফুটাইয়া তুলিয়াছে ?

শকজাতি হইতে শাক্যজাতির উদ্ভব, একথাটাও ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। কারণ শকেরা তো শুঙ্গরাজাদের সময় খৃ. পূ. দ্বিতীয় শতে ভারতবর্ষে আসে।[৯] তাহাও আবার সুদূর পশ্চিমে পঞ্জাবের কোলে। হিমালয় অতিক্রম করিয়া শকেদের আসা কোথাও দেখা যায় না। ইহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসই নাই, তবে কোনো কথা শুনা যায় নাই বলিয়া তাহা একেবারে মিথ্যা, এরূপ জোর করিয়া বলা যাইবে কিরূপে ? কিন্তু আমরা শাক্য শব্দের আর-এক প্রকার ব্যুৎপত্তি পাইয়াছি। তাহাতে সকল কথার সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। অশ্বঘোষ বলিয়াছেন, শাক নামে এক রকম গাছ আছে। সেই গাছে ঘেরা জায়গায় বাস করেন বলিয়া বুদ্ধদেবের পূর্বপুরুষদের শাক্য বলিত। এ কথাটা বেশ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। নেপালের তরায়ে এখনো শকিয়া শালের গাছই অধিক। শাক গাছ শাকিয়া শাল হইলে, শাক্য শব্দের ব্যুৎপত্তির জন্য হিমালয় ও তিব্বত পার হইয়া শকজাতির দেশে যাইবার প্রয়োজন নাই।

বৌদ্ধধর্ম সাংখ্যমত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, একথা অশ্বঘোষ এক প্রকার বলিয়াই গিয়াছেন। বুদ্ধদেবের গুরু অড়ার কালাম[১০] ও উদ্রক[১১] দু জনেই সাংখ্যমতাবলম্বী ছিলেন। দু জনেই বলিয়াছিলেন, 'কেবল' অর্থাৎ জগতের সহিত সম্পর্কশূন্য হইতে পারিলেই মুক্তি হয়। বুদ্ধ তাঁহাদের মত না মানিয়া বলিয়াছিলেন, 'কেবল' হইলেও অস্তিত্ব তো

রহিল ; অস্তিত্ব রহিলে নিঃসম্পর্ক হইবার জো নাই। একথা পূর্বেই বলিয়াছি।

যদি বৌদ্ধধর্ম সাংখ্য হইতেই উৎপন্ন হয়, তবে তো উহা আর্য-ধর্ম হইতেই উৎপন্ন হইল। আমার সেই কথাতেই সন্দেহ। সাংখ্যমত কি বৈদিক আর্যগণের মত ? শংকরাচার্য তো উহাকে বৌদ্ধাদি মতের ন্যায় অবৈদিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন । তবে তিনি এত যত্ন করিয়া ও মত খণ্ডন করেন কেন ? মন্বাদিভিঃ কৈশ্চিৎ শিষ্টৈঃ পরিগৃহীতত্ত্বাৎ। মনু প্রভৃতি কয়েকজন শিষ্ট উহাকে গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া। সাংখ্যমত কপিলের মত চিরকাল প্রবাদ। কপিলের বাড়ি পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ বঙ্গ-বগধ-চেরদিগের দেশে। গঙ্গাসাগর যাইতে কপিল-আশ্রম আছে, কবতক্ষের ধারে কপিল মুনির গ্রাম। কপিলবাস্তুও কপিল মুনির বাস্তু। কারণ অশ্বঘোষ বলিয়াছেন, গোতমঃ কপিলো নাম মুনির্ধর্ম্মভৃতাং বরঃ। তাঁহারই বাস্তুতে কপিলবাস্তু নগর। বাস্তবিকও কপিলকে কেহ ঋষি বলে না। তাঁহার নাম করিতে গেলেই বলে আদিবিদ্বান্। বাল্মীকি যেমন আদিকবি, তিনিও তেমনি আদিবিদ্বান্। 'শ্বেতাশ্বতরে' তাঁহাকে 'পরমর্ষি' বলা হইয়াছে। কিন্তু ভাব ভাষা ও মত দেখিলে এখানিকে নিতান্ত অল্পদিনের পুস্তক বলিয়া বোধ হয়।

কৌটিল্য তিনটি মাত্র দর্শনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত ; কৌটিল্য ২৩০০ বৎসর পূর্বের লোক। তাঁহার সময় অন্য দর্শন হয়ই নাই, হইলে তাঁহার মতো সার্বভৌম পণ্ডিতের তাহা অবিদিত থাকিত না। সেই তিনটির মধ্যে লোকায়ত মত, লোকে আয়ত অর্থাৎ ছড়াইয়া পড়িয়াছে বলিয়া ঐ নাম পাইয়াছে, উহার আদি নাই, ও মত সর্বত্র সকলেরই মত। খাও দাও সুখে থাকো— এ মত আবার কে প্রচার করিতে যাইবে ? সকলেই জানে, সকলেই বুঝে ও সকলেই সেই মতে কার্য করে, সুতরাং উহার কথা ছাড়িয়া দিলে আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই। যোগমত সাংখ্য-দর্শনেরই রূপান্তর মাত্র। দুই-ই দ্বৈতবাদী।

সাংখ্য ও যোগের যে-সকল পুস্তক আছে সকলগুলিই নূতন। ঈশ্বর-কৃষ্ণের কারিকাই তাহাদের মধ্যে পুরানো। ঈশ্বরকৃষ্ণ খৃস্টীয় পাঁচ শতের লোক। কিন্তু তাঁহার পূর্বেও সাংখ্যমতের পুস্তক ছিল ; মাঠর ভাষ্যের কথা অনেক জায়গায় শুনিতে পাওয়া যায়। পঞ্চশিখের দু-চারিটি বচন

যোগভাষ্যকার ধরিয়াছেন। আসুরির একটি কবিতা একজন জৈন টীকাকার তুলিয়াছেন। মহাভারতে আসুরির নাম নাই, পঞ্চশিখের নাম আছে। তিনি জনক রাজার সভায় মিথিলায় উপস্থিত ছিলেন। কপিলের নিজের কোনো বচন এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই। যে ২২টি সূত্র কপিলসূত্র বলিয়া চলিতেছে, তাহাও বিশেষ প্রাচীন নহে, ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকা দেখিয়া লেখা বোধ হয়। কিন্তু অশ্বঘোষের লেখা ও কৌটিল্যের উক্তি দেখিয়া সাংখ্য যে খুব প্রাচীন তাহা বেশ অনুভব হয়।

সংহিতায় ও ব্রাহ্মণে আদিবিদ্বান্ কপিলের নামও নাই গন্ধও নাই। আমাদের এখনকার ব্যবহারেও সাংখ্যমতের বড়ো বড়ো লোকগুলি মানুষ। ঋষিও নন মুনিও নন। আমরা যে নিত্য তর্পণ করিয়া থাকি তাহাতে—

সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢুঃ পঞ্চশিখস্তথা।[১২]

বলিয়া যাহাদের তর্পণ করি, রঘুনন্দন[১৩] বলেন তাঁহারা মনুষ্য। এই কবিতায় যাঁহাদের নাম আছে, তাঁহারা সকলেই সাংখ্যমতের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য।

উপরের লেখা হইতে তিনটি কথা বুঝা যায়, যে সাংখ্যমত সকলের চেয়ে পুরানো, উহা মানুষের করা এবং পূর্ব-দেশের মানুষের করা। উহা বৈদিক আর্যদের মত নহে, বঙ্গ, বগধ বা চেরজাতির কোনো আদিবিদ্বানের মত। যাঁহারা পুত্র পশু প্রভৃতি লাভের জন্য, পুষ্টি-তুষ্টির জন্য বড়ো জোর স্বর্গকামনায়, যাগযজ্ঞ করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে ত্রিতাপনাশের জন্য "আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন নির্লেপ নির্বিকার" ইত্যাদি মত উদ্ভব হওয়া কঠিন। ইহা অনায়াসেই মনে হইতে পারে যে এই মত অন্যত্র উদ্ভূত হইয়া ক্রমে কোনো কোনো আর্য পণ্ডিত কর্তৃক পরিগৃহীত হওয়ায় আর্যগণের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। হেমাদ্রি[১৪] বেশিদিনের লোক নহেন, তাঁহার সময় খৃস্টীয় তেরো শতে, তিনি বলিতেছেন যে, যে ব্রাহ্মণ সাংখ্য মত ভালো জানেন, তিনি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের ন্যায় পংক্তি-পাবন, কিন্তু যে ব্রাহ্মণ কাপিল সে পংক্তিবাহ্য। ইহাতেও অনুমান হয়, কপিলের কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মত ব্রাহ্মণগণ আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর কোনো কোনো সম্প্রদায়ের মত একেবারেই গ্রহণ করেন নাই।

যদি সাংখ্য হইতেই বুদ্ধমতের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে বৈদিক আর্যমত হইতে উহার উৎপত্তি বলা যাইতে পারে না। বৌদ্ধধর্মে আরো অনেক জিনিস আছে যাহা আর্যধর্মের খুব বিরোধী।

আশ্রম পালন।

আর্যগণ তিন আশ্রম পালন না করিয়া ভিক্ষু আশ্রম গ্রহণ করিতেন না। আপস্তম্ব[১৫] প্রভৃতি সকল সূত্রকারেরই মত এই যে, ব্রহ্মচারী হইয়া গৃহস্থ, তাহার পর বানপ্রস্থ ও তাহার পর ভিক্ষু হইবে। কিন্তু বুদ্ধ উপদেশ দিতেন যে, যখনই সংসারে বিরাগ উপস্থিত হইবে, তখনই সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইতে পারিবে। এমন-কি অতি শিশুকেও ভিক্ষু করিতে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। কয়েকটি নাবালগকে ভিক্ষু করায় কপিলবাস্তুতে বড়ো গোলমাল উপস্থিত হয়। তাহাতে বুদ্ধদেবের পিতা বুদ্ধকে বুঝাইয়া বন্দোবস্ত করিয়া দেন যে, নাবালগকে শিষ্য করিতে হইলে তাহার পিতামাতার অনুমতি লইতে হইবে। ক্রমে বৌদ্ধ কর্মবাচায় দেখিতে পাওয়া যায়, একুশ বৎসরের পূর্বে কাহাকেও দীক্ষা দেওয়া হইত না। যে-কেহ দীক্ষা লইতে আসিত, তাহাকেই জিজ্ঞাসা করা হইত, তোমার বয়স একুশ বৎসর হইয়াছে তো? বহুকাল পরে শংকরাচার্য এই মত প্রকাশ করেন যে, "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ"[১৬]। এটি 'জাবালোপনিষদে'র বচন। সম্ভবত শংকরাচার্যের পূর্বেই এই উপনিষদ্ রচিত হইয়াছিল। উহা কোনো ব্রাহ্মণের অন্তর্ভুক্ত নহে, সুতরাং বুদ্ধদেবের পূর্ববর্তী হওয়া সম্ভব নহে।

বৌদ্ধভিক্ষুর বেশ হইতেও দেখা যায় উহা আর্যবিরোধী বেশ।

বেশ।

আর্যগণ উষ্ণীষ ও উপানহ ভিন্ন চলিতেন না। মাথায় পাগড়ি ও পায়ে জুতা সবারই থাকিত। কিন্তু বৌদ্ধগণ বাঙালির মতো খালি মাথায় থাকিতেন এবং উপানহ ব্যবহার করিতেন না।

এই-সকল নানা কারণে বোধ হয় যে, পূর্বাঞ্চলে বঙ্গ, বগধ ও চের নামে যে তিনটি সভ্য জাতি বাস করিতেন, তাহাদের সঙ্গে আর্যগণের মেলামেশায় বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে। যে জায়গায় আর্যগণের পশ্চিমসীমা ও ঐ জাতিসকলের পূর্বসীমা, সেইখানেই বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি। উহা পূর্বাঞ্চলে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, পশ্চিমাঞ্চলে উহার প্রাদুর্ভাব কখনোই এত অধিক হয় নাই। পাঞ্চাল, কুরুক্ষেত্র ও মৎস্য-

দেশে যে বৌদ্ধধর্ম প্রবল ছিল, ইহার প্রমাণ বড়ো একটা পাওয়া যায় না।

২

পূর্বের 'নারায়ণে' বৌদ্ধধর্ম কোথা হইতে আসিল তাহার কতকটা আভাস দিয়াছি। বঙ্গ-বগধ-চের জাতির আচার-ব্যবহার ও ধর্ম লইয়া বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি ঠিক হউক আর নাই হউক, বৌদ্ধধর্মের মতামত আচার-ব্যবহার অনেকটা পূর্ব দিক হইতে আসিয়াছে। কিন্তু অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে বঙ্গ-বগধ-চের জাতির কথা অল্প লোকেই জানে। অতি অল্পদিন হইল 'ঐতরেয় আরণ্যকে'র একটি ব্রাহ্মণে উহাদের নাম পাওয়া গিয়াছে। এখনো অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিতেছেন, ওখানটার অর্থবোধই হয় না। সায়ন বঙ্গ-বগধ-চের শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। তবে ওকথার উপর জোর দেওয়া যায় কি ? সায়নের কথা ধরি না ; সায়ন বেদ রচনার দুই-তিন হাজার বৎসর পরে উহার অর্থ করিতে বসিয়াছিলেন। দু-চারটা মানুষের নাম ও দেশের নামের তিনি যে অন্য অর্থ করিয়া দিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এস্থলে তাঁহার অর্থ গ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহারা নিজেও ইহার অর্থ কী স্থির নিশ্চয় করিতে পারেন নাই। কিন্তু আমরা ইহাতে বেশ দেখিতে পাইতেছি যে বঙ্গ শব্দের মানেতে কোনো গোল নাই। সায়নের অর্থ বনংগতা, এ অর্থ আমরা লইতে পারি না। বগধ যে মগধ তাহাতেও আমাদের সন্দেহ হওয়া উচিত নহে। তামিল জাতির একটা শাখাকে যে চের বলিত তাহারো সন্দেহ নাই। এখনো দক্ষিণ দেশে তামিল বা দ্রাবিড়ীয় জাতির মধ্যে কেরল নামে একটি প্রবল জাতি আছে। কেরলদিগের প্রাচীন নাম চের। চেরো বলিয়া একটি জাতিকে ছোটনাগপুরের সমস্ত জাতিই আপনাদের পূর্বপুরুষ বলিয়া মনে করেন। কপিলবাস্তুর নিকটে এখনো যে থাড়ু জাতি আছে তাহারাও চেরো বা চের জাতির একটা ধারা।

ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ, বগধ ও চের জাতি।

এই-সকলের সঙ্গে যদি আর- একটা কথা ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে আরো একটু সুবিধা হয়। সকলেই জানেন যে আরণ্যকগুলি

ব্রাহ্মণগুলিরই শেষ অংশ। ব্রাহ্মণ যে প্রকারের বই, আরণ্যকও সেই প্রকারেরই বই। ব্রাহ্মণে যাহা বলা হয় নাই, আরণ্যকে তাহাই বলা হইয়াছে। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে'র শেষ অংশে ইন্দ্র-দেবতার মন্ত্রে অভিষেক হওয়ায় যে-সকল রাজা বড়ো হইয়াছিলেন, বিশেষ অশ্বমেধ যাগ করিয়াছিলেন, তাহাদের একটি সুদীর্ঘ তালিকা আছে, যে ঋষি অভিষেকের পুরোহিত ছিলেন তাঁহার প্রশংসা আছে, আর যে রাজা অভিষেক লইয়াছিলেন তিনি কতবার অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন তাহারো উল্লেখ আছে। এই তালিকার শেষ ভাগে লেখা আছে যে ভরতরাজা ইন্দ্র অভিষেক লইয়া ১৩৩টা অশ্বমেধ করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে ৭৮টা যমুনার পশ্চিমে মরুষ্ণ দেশে, আর ৫৫টা গঙ্গার পূর্বে জলবৃষ্টির দেশে। যমুনার পশ্চিমে যতদূর যাইবে মরু দেশ আর উষ্ণ দেশ। কতদূর ভরতের অধিকার ছিল বলা যায় না। ৭৮ অশ্বমেধের জন্য কতখানি দেশ লওয়া আবশ্যক আমরা জানি না। তবে এ পর্যন্ত বলিতে পারি যে বেলুচিস্তান উহার মধ্যে ছিল না। থাকিলে ভরতের নাম অনুসারে উহাও ভারতবর্ষ বলিয়া গণ্য হইত ; তবেই যমুনার পশ্চিম হইতে সিন্ধু দেশের পশ্চিম-সীমা পর্যন্ত ভূভাগ জয় করিয়া তিনি ৭৮টা অশ্বমেধ করিয়াছিলেন। তাই যদি হইল তবে ৫৫টা অশ্বমেধের জন্য গঙ্গার পূর্বে কতটা জমি তাঁহাকে অধিকার করিতে হইয়াছিল? 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' অন্তর্বেদির নাম একেবারেই করে না, বলে যমুনার পশ্চিমে ও গঙ্গার পূর্বে। এখন ৫৫ অশ্বমেধের জন্য কতটা দেশের দরকার। আমার বোধ হয়, এলাহাবাদ হইতে ঠিক উত্তরমুখে রেখা টানিলে ঐ রেখা ও গঙ্গার পূর্ব-পারের মধ্যে যত দেশ পড়ে তাহাই ৫৫টা অশ্বমেধের পক্ষে যথেষ্ট।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ভরতের রাজত্ব।

'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' ভারতবর্ষ অথবা আর্যভূমির অথবা আর্যজাতির বসতি বিস্তারের এই সীমা নির্ধারণ করিয়া দিলে, তাহার পরই 'ঐতরেয় আরণ্যক' বলিলেন যে বঙ্গ-বগধ-চেরজাতি পক্ষীবিশেষ ; উহাদের ধর্ম নাই, উহারা নরকগামী হইবে। ইহার মোটামোটি অর্থ এই হইল যে আর্যগণ এলাহাবাদ পর্যন্ত আসিয়াছিলেন, তাহার ওদিকেই বঙ্গ-বগধ-চেরজাতি। ইহারা আর্যগণের শত্রু। আর্যগণের বসতি বিস্তারে বাধা দিতেন তাই

বঙ্গ, বগধ ও চেরগণ পাখি।

আর্যগণ ইঁহাদিগকে দেখিতে পারিতেন না। যাহাদিগকে তাঁহারা দেখিতে পারিতেন না, তাহাদিগকে মানুষ না বলিয়া পশু পক্ষী রাক্ষস বলা তাঁহাদের রোগ ছিল। তামিলগণ তাঁহাদের কাছে বানর। কর্ণাটগণ হয়তো ভালুক, লঙ্কার লোক রাক্ষস। সেইরূপ বাংলার লোক পাখি।

বুদ্ধ পূর্বাঞ্চলের লোক।

বুদ্ধদেব কিন্তু সেই পাখির দেশেই জন্মান। তাঁহারো পূর্বে কনকমুনি কপিলবাস্তুরই নিকটে জন্মাইয়া বোধি লাভ করেন। এই অঞ্চলেই জৈনধর্ম প্রচারক মহাবীর[১৭] জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মস্থান বৈশালী, পাটনার উত্তর-পশ্চিম, গঙ্গার উত্তর-পারে। ইনি আবার জৈনযতি হইয়া বারো বৎসর কাল পূর্বাঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া আসেন। বৈশালীর লোক মনে করিল, মহাবীর নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। বারো বৎসর পরে তিনি পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিয়া কেবলী হইয়া ফিরিলেন। তাঁহারো পূর্বে পার্শ্বনাথ[১৮] কাশীতে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসার পরিত্যাগের পর পূর্ব অঞ্চলে নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া সমেতগিরি অর্থাৎ পরেশনাথ পাহাড়ে বাস করিয়া তথায়ই দেহরক্ষা করেন। আর আর তীর্থংকরদের অনেকেই পূর্ব অঞ্চলের লোক। ২৪জন বুদ্ধ ও ২৪জন তীর্থংকরের বৃত্তান্ত পড়িলে একথা আরো প্রমাণ বলিয়া বোধ হইবে।[১৯]

পূর্ব ও পশ্চিমে ভেদ।

পশ্চিমাঞ্চলে যখন আর্যগণ যাগযজ্ঞ লইয়া ব্যস্ত, দেশ দখল করিতে ব্যস্ত, শ্রৌতসূত্র রচনায় ব্যস্ত, শূদ্রগণকে আয়ত্ত করিয়া তাহাদিগকে দাস করিয়া রাখার বন্দোবস্ত লইয়া ব্যস্ত, তখন পূর্বাঞ্চলে বঙ্গ-বগধ-চেরগণ পরকাল লইয়া ব্যস্ত, কিসে জন্মজরামরণের হাত এড়ানো যায় তাহাই লইয়া ব্যস্ত। পশ্চিমাঞ্চলে যেমন ঋষির পর ঋষি শ্রৌতসূত্র রচনা করিতেছিলেন ; পূর্ব অঞ্চলে তেমনি তীর্থংকরের পর তীর্থংকর, বুদ্ধের পর বুদ্ধ পরকালে কিসে সুখে থাকা যায় তাহারই উপায় দেখিতেছিলেন।

২৪জন বুদ্ধ ও ২৪জন তীর্থংকর।

শাক্যমুনি শেষ বুদ্ধ, মহাবীর শেষ তীর্থংকর। দু জনেই এক সময়ের লোক। দু জনেই খৃস্টের পূর্বে ছয় শতের লোক। সুতরাং দীপংকর প্রভৃতি ২৪জন বুদ্ধ আর ঋষভদেবাদি ২৪জন তীর্থংকর তাঁহাদের অনেক পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন। অনেকে বলেন যে শাক্যসিংহের পূর্বে যে

২৩জন বুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহারা মানুষ নন— বৌদ্ধেরা আপনাদের ধর্মটা পুরানো, তাই দেখাইবার জন্যই ২৪টা নাম করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু শাক্যসিংহের পূর্ববর্তী কনকমুনির খাম্বা[২০] পাওয়া গিয়াছে, যেখানে তাঁহার নির্বাণ লাভ হয় তাহা স্থির হইয়াছে ; তাঁহাকে মানুষ নয় বলা এখন কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখনকার নেপালি বৌদ্ধেরা বলে চারি যুগে আট জন মানুষ-বুদ্ধ। বিপশ্যী ও শিখী সত্যযুগে, কাশ্যপ ও বিশ্বভূ ত্রেতাযুগে, ক্রকুচ্ছন্দ ও কনকমুনি দ্বাপরে, এবং শাক্যসিংহ ও মৈত্রেয় কলিযুগে। অপর ১৭জনকে তাঁহারা মানুষ বলুন আর নাই বলুন, শাক্যমুনি ও তাঁহার পূর্বেকার ছয় জনকে তাঁহারা মানুষ বলেন। তীর্থংকরদের মধ্যেও, অনেকে মনে করেন যে শেষ দুই জন মাত্র সত্যসত্য মানুষ, বাকিগুলি মনগড়া মাত্র। তাহা হইলেও আমাদিগকে বুঝিতে হইবে যে, বুদ্ধ ও মহাবীরের পূর্ব হইতেই ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলে পরকাল লইয়া অনেক দিন হইতে নাড়াচাড়া হইতেছিল।

বুদ্ধদেবের সময়ে ছয়টি ধর্ম প্রচার হইয়াছিল, তাহাদের নাম যথা, আজীবক— ইহা গোশালা মংখালি পুত্রের ধর্ম, নিগ্রন্থ— ইহা মহাবীরের ধর্ম, পূর্ণ কাশ্যপ একজন ধর্মপ্রবর্তক, অজিত কেশকম্বল একজন, সঞ্জয় একজন ও পোকুদ কত্যায়ন একজন।[২১]

পূর্বাঞ্চলেই বহু ধর্মের প্রসার।

এগুলিও ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলেই উৎপন্ন হইয়াছিল এবং সেইখানেই ইহাদের শ্রীবৃদ্ধিও হইয়াছিল। ভারতবর্ষের পূর্বাংশে লোক যে কেবল ধর্ম লইয়াই থাকিত, এরূপ নহে ; এখানে অন্যান্য বিষয়েও বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। ডাক্তার হর্নলি [A. F. R. Hoernle] বলেন যে অস্ত্রচিকিৎসা পূর্বাঞ্চলেই আরম্ভ হইয়াছিল। হস্তিশাস্ত্র এই দেশেই রচনা হয়। ন্যায়শাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, সাংখ্যশাস্ত্র, ইহাদের উৎপত্তিও পূর্ব-ভারতে ; সুতরাং পূর্ব-ভারত যে এককালে একটি সুসভ্য দেশ ছিল, ইহা অনায়াসেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। আর্যগণ যখন সেই সুসভ্য দেশ আক্রমণ করিয়া তাহার রাজ্য সমাজ আচার ব্যবহার রীতিনীতি সব ভাঙিয়া তাহাদিগকে আর্য সভ্যতা দান করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে তাহাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় উঠিতে লাগিল এবং সেই-সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে তাহাদের পূর্ব-সমাজ, পূর্ব-আচার ও পূর্ব-ব্যবহার বজায়

রাখিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাই এত ধর্ম হইল, শেষ সব ধর্ম উঠিয়া গিয়া এক বৌদ্ধধর্মই পূর্ব-ভারতে থাকিয়া পূর্ব-ভারতের অতীত গৌরবের সাক্ষী দিতে লাগিল।

বৌদ্ধ ও আর্য আচার-ব্যবহার ভেদ।

বৌদ্ধদিগের অনেক আচার-ব্যবহার আর্যগণের মধ্যে নাই। বৌদ্ধেরা সব মাথা কামায়— কোথাও এক গাছি কেশ রাখে না। কিন্তু হিন্দুর পক্ষে মাথার মাঝখানে একটা শিখা রাখা নিতান্ত দরকার। একথা যে আমরাই বলিতেছি এমন নহে, যে-সকল মুসলমানেরা প্রথম বেহার দখল করেন তাঁহাদেরও আশ্চর্য বোধ হইয়াছিল। তাঁহারা বৌদ্ধ বলিয়া একটা ধর্ম আছে জানিতেন না। একটা বৌদ্ধ-বিহার জয় করিয়া তাঁহারা দেখিলেন সেখানে বহু-সংখ্যক ব্রাহ্মণ রহিয়াছে, তাহাদের সব মাথা কামানো। সব মাথা কামানো হিন্দুর হইতেই পারে না; তবে ইদানীং কোনো কোনো সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী শিখা ত্যাগ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের শিখাচ্ছেদের ন্যায় অবমাননা আর নাই। সেইজন্য ধর্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা, ব্রাহ্মণ কোনো গুরুতর দুষ্কর্ম করিলে তাহাকে দেশ হইতে দূর করিয়া দিবে। তাহার সম্পত্তি তাহার সঙ্গে দিবে, কেবল তাহার শিখাটি ছেদন করিয়া লইবে। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে সকলেরই শিখাচ্ছেদ করিতেই হইত।

মাথা কামানো।

আহারের নিয়ম।

আহার বৌদ্ধেরা বারোটার আগে করিবে। বারোটার এক মিনিট পরে আহার করিতে পারিবে না। আহার তাহাদের কিছুই অখাদ্য নহে। যদি তাহাদের আহারের উদ্দেশে মারা না হয়, অন্য কারণে কোনো জন্তু মারা হয়, তাহারা সে জন্তুর মাংস অনায়াসে খাইতে পারে। রাত্রে তাহারা রস খাইতে পারে, জল খাইতে পারে, কিন্তু শক্ত জিনিস খাইতে পারে না। তাহারা পেয় খাইতে পারে কিন্তু চর্ব চোষ্য লেহ্য খাইতে পারে না। এই তো তাহাদের নিয়ম। এটি কিন্তু আর্য নিয়মের বিরোধী। আর্যগণ এক সূর্যে দুইবার খাইতেন না। সুতরাং দিনে একবার ও রাত্রে একবার। তাঁহাদের কল্যবর্ত বা প্রাতরাশের কথা আমরা সর্বদা শুনিতে পাই। একবার খাইয়া আর্যগণ চব্বিশ ঘণ্টা থাকিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। তাঁহাদের ক্ষুধা সতেজ ছিল।

বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সোনা রুপা ছুঁইতে পারিতেন না। পূর্ব-ভারতে উহাদের ছোঁয়ার দরকার ছিল না। কারণ সোনা রুপার টাকা এদেশে অতি কমই ব্যবহার হইত। এদেশে কড়ির ব্যবহার অধিক ছিল, সোনা রুপা ব্যবহার না করিলেও চলিত।

স্বর্ণ রৌপ্য ত্যাগ।

বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ উচ্চাসন মহাসন ত্যাগ করিতেন। হিন্দুস্থানে পঞ্জাবে এমন-কি ভারতবর্ষের সব দেশেই খাটিয়ার উপর শোয়। মাটিতে শুইতে তাহাদের বড়োই কষ্ট হয়, পারতপক্ষে তাহারা মাটিতে শোয় না। কিন্তু বাংলায় তাহার বিপরীত। অধিকাংশ লোকই ভূমিতে শয্যা পাতিয়া শোয়। অবস্থাপন্ন ব্যক্তি হইলে খাট চৌকি তক্তাপোষ ব্যবহার করে।

উচ্চাসন মহাসন ত্যাগ।

বৌদ্ধমতে মদ খাওয়া একেবারে নিষেধ। গৃহস্থ যাহারা পঞ্চশীল মাত্র গ্রহণ করিবে তাহারাও মদ খাইতে পারিবে না, একথা আর্যগণের পক্ষে খাটে না। তাঁহারা সোম পান করিতেন। সৌত্রামণিযাগে তাঁহারা সুরাপান করিতেন। পুরাণে বলে, পূর্বে সকলেই সুরাপান করিতেন, কিন্তু শুক্রাচার্য শাপ দেওয়ায় মদ খাওয়া মহাপাতকের মধ্যে গণ্য হয়। কিন্তু বৈধ মদ্য সকল সময়েই চলিত, যথা পশুযাগে সোম, সৌত্রামণিতে সুরা।

মদ্য-ত্যাগ।

এইরূপে দেখা যায় যে বৌদ্ধধর্ম ও আর্যধর্মে অনেক কাজের কথায়ই প্রভেদ। তখন বৌদ্ধধর্ম কোথা হইতে আসিল বলিতে গেলে, আর্য-ধর্ম হইতে আসিল একথা বলা যায় না, আর-কোনো দিক হইতে আসিয়াছে। এত প্রাচীনকালে আর কোন্ দিক হইতে আসিবে, সুতরাং পূর্ব দিক হইতেই আসিয়াছে। আচ্ছা যদি তাহাই হইল, তবে বুদ্ধদেব কী নূতন কথা বাহির করিয়াছেন? তাঁহার ধর্মের স্থূল কথাগুলি, বিষয়গুলি যদি প্রাচীন ধর্ম বা প্রাচীন সমাজ হইতে লওয়া, তবে তাঁহার নূতনত্ব কী? বুদ্ধদেবের পূর্বেও লোকে সংসার ত্যাগ করিত, ভিক্ষু হইত; যেমন পার্শ্বনাথের দল, কনকমুনির দল। সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইয়া থাকিতে গেলেই অহিংসা, অস্তেয় প্রভৃতি শীল গ্রহণ করিতে হয়, খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে খুব সাবধান হইতে হয়। প্রাচীন ভিক্ষুরাও

তাহাই করিত। কিন্তু বুদ্ধদেব যে বিহার ও সংঘারামের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজের। ভিক্ষুদিগের শাসনের জন্য যে-সকল নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের। এক জায়গায় অনেক ভিক্ষু থাকার ব্যবস্থা তাঁহার নিজের। এইরূপ অনেকগুলি ভিক্ষু একত্র থাকিলে তাহাদের মধ্যে কোনোরূপ গোলযোগ যাহাতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা তাঁহার নিজের। যে-সকল সুন্দর সুন্দর গল্প করিয়া তিনি সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিতেন, সেগুলি প্রাচীন ভারতে চলিত থাকিলেও, যে আকারে তাহাদিগকে এখন দেখিতে পাওয়া যায় সে আকারটি তাঁহার দেওয়া। তিনি রাজার ছেলে, রাজা হইবার সবশিক্ষা তাঁহার হইয়াছিল। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াও রাজার প্রধান যে গুণ, দশ জনকে লইয়া সুন্দররূপে কাজ চালানো, তাহা ছাড়েন নাই। ভিক্ষুসংঘের পরম উন্নতির জন্য, তাঁহার যেসব রাজগুণ ছিল, সব প্রয়োগ করিয়াছেন। বাস্তবিকও তাঁহার সংঘ যেমন প্রবল হইয়াছিল এমন আর-কাহারো হয় নাই। তিনি যে শুদ্ধ ভিক্ষুদের বন্দোবস্ত করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন তাহা নহে। তিনি গৃহস্থ বৌদ্ধদিগের জন্যও বেশ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের পঞ্চশীল ও অষ্টশীল দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।[২২]

কিন্তু যাহাতে বুদ্ধের ধর্ম এত বড়ো, যাহাতে বুদ্ধের নাম এত বড়ো, যাহার জন্য বুদ্ধের সংসারে এত সম্মান, যাহার জন্য সকল ধর্ম অপেক্ষা তাঁহার ধর্ম এত উদার, সেটি তাঁহার মধ্যমা প্রতিপৎ অর্থাৎ "মাঝামাঝি চলো, বাড়াবাড়ি করিও না।"[২৩] তিনি নৈরঞ্জনার ধারে ছয় বৎসর তপস্যা করিয়া যে জ্ঞান প্রাপ্ত হন, যাহা পাইয়া তিনি আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া প্রচার করেন, যে জ্ঞান পাওয়ায় ইন্দ্র ব্রহ্মা আসিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন, যাহা পাওয়ায় মার একেবারে হতাশ হইয়া পড়ে, সে এই মধ্যমা প্রতিপৎ। মাঝামাঝি চলো। অহিংসা ধর্ম পালন করিতে হইবে বলিয়া, একেবারে মুখে কাপড় বাঁধিয়া চলো যেন কোনো কীট মুখে না ঢুকিতে পারে। রাত্রে প্রদীপ জ্বালিও না, পাছে তাহাতে কীট পতঙ্গ পড়ে। মলত্যাগ করিয়া তাহা কাঠি দিয়া নাড়িয়া দিও যেন পোকামাকড় তাহার মধ্যে লুকাইয়া না যায়। রাস্তায় চলিবার সময় এক গাছ ঝাঁটা হাতে করিয়া যাইও যেন তোমার পায়ের চাপনে

কোনো পোকামাকড় মারা না যায়। এ-সকল বাড়াবাড়ি নয় কি ? বুদ্ধদেব এতদূর বাড়াবাড়ি করিতে বলেন না। তিনি বলেন ইচ্ছা করিয়া কোনো জীবহত্যা করিও না। তাহা হইলেই অহিংসা ধর্ম পালন হইবে। তিনি বলেন অত্যন্ত ভোগাসক্তি ভালো নয় ; কেবল ভালো খাব, ভালো পরব, তারি চেষ্টা করা, সেটা ভালো নয়, আবার ক্রমাগত উপবাস করিব, পঞ্চতপা করিব, চারি দিকে আগুন জ্বালিয়া সূর্যের দিকে চাহিয়া দিন কাটাইয়া দিব, ইহাও ভালো নয়। তিনি নিজে যথেষ্ট কঠোর ব্রত করিয়াছিলেন, যথেষ্ট উপবাস করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে বুঝিয়াছিলেন যে উহাতে কোনো লাভ নাই, শরীরের কষ্টই সার ; তখন তাঁহার জ্ঞান হইল যে এগুলা করা ভালো নয়। ভোগও করিবে না, কঠোরও করিবে না, তবে করিবে কী ? অশ্বঘোষ বুদ্ধের মুখে বলাইয়াছেন, "আহারঃ প্রাণযাত্রায়ৈ ন ভোগায় নদৃপ্তয়ে।" এই যে মধ্যমা প্রতিপৎ 'এইটিই :বৌদ্ধধর্মের মজ্জা, সার, নিগূঢ় কথা, উপনিষৎ। বুদ্ধদেব যতদিন জীবিত ছিলেন, সর্ব বিষয়ে মধ্যমা প্রতিপৎ অবলম্বন করিয়াই চলিতেন, শিষ্যদিগকে শিখাইতেন। দুটা বিরোধী জিনিস উপস্থিত হইলে, সে দুটার বিরোধ মিটাইয়া দিতে তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

'নারায়ণ'
ফাল্গুন এবং চৈত্র, ১৩২১ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. সূত্র

১. এই বইয়ে "ভারতের ভক্তি সাধনায় বৌদ্ধ প্রভাব" প্রবন্ধ দ্র.

২. এই বইয়ে "চিরঞ্জীব শর্মা" প্রবন্ধ দ্র.

৩. এই বইয়ে "শংকরাচার্য্য কী ছিলেন" প্রবন্ধ দ্র.

৪. বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠতম ব্যাখ্যাতা রামানুজের জন্ম মাদ্রাজের কাছে শ্রীপেরাম্বুদুর গ্রামে। একাদশ শতাব্দীর শেষ ও দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বর্তমান ছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ সমসাময়িক অনন্তাচার্যের উল্লেখ অনুসারে জন্ম ১০১৭ খৃস্টাব্দে। রামানুজের শিক্ষাগুরু খ্যাতিমান্ বৈদান্তিক যাদবপ্রকাশ। প্রচলিত কাহিনীতে গুরুর সঙ্গে তাঁর তীব্র মতবিরোধের উল্লেখ পাওয়া যায়। ৩০/৩২ বছর বয়সে রামানুজ সন্ন্যাসী হয়ে যান। তাঁর বহু শিষ্যের মধ্যে কুরেশ-এর নাম উল্লেখযোগ্য। কুরেশ রামানুজের গ্রন্থাদির লিপিকর ছিলেন। রামানুজের রচনাবলীর মধ্যে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মসূত্রের টীকা 'শ্রীভাষ্য', 'বেদান্তদীপ', 'বেদান্তসার', 'বেদান্তসংগ্রহ'। আনুমানিক ১১১৭-২৭ খৃস্টাব্দের মধ্যে 'শ্রীভাষ্য' রচনা সম্পূর্ণ হয়েছিল। শংকরাচার্যের জ্ঞানমার্গী বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদের প্রভাব প্রতিরোধের জন্যে জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ে বেদান্ত দর্শনকে দ্বৈতবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেন। রামানুজের মতাবলম্বী বৈষ্ণব সম্প্রদায় শ্রী-সম্প্রদায় নামে পরিচিত।

আনুমানিক ১১৩৭ খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। দ্র. *H-I-P* Vol. III, pp. 100-05.

৫. নাগার্জুনের কনিষ্ঠ সমসাময়িক এবং শিষ্য, 'চতুঃশতিকা' গ্রন্থের লেখক আর্যদেব খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ ও তৃতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন। বোধিসত্ত্বদেব, কাণদেব, নীলনেত্র, পিঙ্গলনেত্র তাঁর নামান্তর। আর্যদেবের জন্ম সিংহলে, পরে দক্ষিণ ভারতে এসে

নাগার্জুনের শিষ্য হন। ভিন্ন মতে তিনি দক্ষিণ ভারতেরই মানুষ। হিউয়েন-ৎসাঙের বিবরণ অনুসারে আর্যদেব নাগার্জুনের সঙ্গে দেখা করতে এলে নাগার্জুন ভৃত্যের হাতে একটি জল ভরা পাত্র পাঠিয়ে দর্শনপ্রার্থীর সামনে ধরতে বলেন। আর্যদেব কোনো কথা না বলে একটি সুচ জলপাত্রে ফেলে দিলেন। ভৃত্য একথা নাগার্জুনকে জানালে তিনি উল্লসিত হয়ে বলে ওঠেন, এই দর্শনপ্রার্থী নিশ্চয়ই একজন প্রাজ্ঞ মানুষ। তাঁকে ভেতরে নিয়ে আসতে আদেশ করলেন। ভরা জলপাত্রটি নাগার্জুনের নিজের জ্ঞানের প্রতীক। জলপাত্রে সুচ ফেলে আর্যদেব বুঝিয়েছিলেন, তিনি নাগার্জুনের জ্ঞানের তল অবধি যেতে সক্ষম। নাগার্জুন তাঁকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করলেন। নাগার্জুনের শিক্ষায় আর্যদেব বৌদ্ধবিদ্যায় পারঙ্গম হয়ে ওঠেন। বৈশালীতে, উত্তর ভারতের শ্রুঘ্ন দেশে, চোলভূমিতে তিনি ভিন্ন মতাবলম্বীদের বিতর্কে পরাভূত করে ব্যাপক প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। প্রয়াগে একটি সংঘারামে আর্যদেব তাঁর 'শতশাস্ত্রবিপুল্য' গ্রন্থখানি রচনা করেছিলেন। 'শত(ক)শাস্ত্র', 'অক্ষরশতক', 'মহাপুরুষশাস্ত্র', 'শাস্ত্র' প্রভৃতি গ্রন্থ আর্যদেবের রচনা মনে করা হয়। গুরু নাগার্জুনের সঙ্গে যৌথভাবে তিনি রচনা করেন 'মাধ্যমিকশাস্ত্র'। আর্যদেবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'চতুঃশতিকা'। চন্দ্রকীর্তির টীকা সমেত সমগ্র 'চতুঃশতিকা' তিব্বতি অনুবাদে পাওয়া গেছে। ১৬ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ 'চতুঃশতিকা'র প্রথম ৮ অধ্যায়ে আর্যদেব মাধ্যমিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করেছেন. পরের ৮ অধ্যায়ে আছে অন্যান্য বৌদ্ধ দর্শন এবং সাংখ্য ও বৈশেষিক দর্শনের বিচার। মাধ্যমিক দর্শনের ধারায় নাগার্জুনের 'মাধ্যমিক-কারিকা'র পরেই 'চতুঃশতিকা'র স্থান।

মূল 'চতুঃশতিকা' সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে একটি খণ্ডিত পুথি সংগ্রহ করেছিলেন। এই আবিষ্কারের গুরুত্ব সম্পর্কে রুশ ভারতবিদ্যাবিদ্ ফিদর ইপ্পোলিতোভিচ শ্চেরবাট্স্কোই-এর মন্তব্য শাস্ত্রীমশায় উল্লেখ করেছেন, "On the last day of his stay in Calcutta, I showed this MS. to Professor Schervetsky [Stcherbatskoi], and he was convinced of the genuineness of the work. He pronounced it to be a great discovery. He said that European scholars would be anxious to get it, and asked me to go to press at once. ···Dr. Ross tells me that Professor Schervetsky regarded the finding of this work as the greatest sensation during his stay in

India." ("Notes on the newly found Manuscript of Chatuhsatika by Aryadeva", *J-A-S B*, July 1911, p. 436). এই বইয়ের পৃ. ২৭৬ সূত্র ৫ দ্র.

৬. এই বইয়ের পৃ. ২৫৫ সূত্র ১৩ দ্র.

৭. "প্রজা হ তিস্র অত্যায়মায়ন্" ঋগ্‌বেদীয় এই শ্লোকাংশের ব্যাখ্যায় 'ঐতরেয় আরণ্যকে' (২-১-১-৫) বলা হয়েছে, "যা বৈ তা ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায়মায়ংস্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গা বগধাশ্চেরপাদাঃ", এই যে তিনটি সৃষ্ট জীবজাতি নষ্ট হয়েছিল, তারা এইসব পাখি— বঙ্গেরা, বগধেরা, চেরপাদেরা (অথবা / এবং ইরপাদেরা)।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় "Bengal, Bengalees. Their manners, customs and literature" নামে শাস্ত্রীমশায়ের একটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধের তথ্য ব্যবহার করেছিলেন। রাখালদাসের লেখা থেকে বোঝা যায় এই প্রবন্ধে বঙ্গ-বগধ-চের প্রসঙ্গ ছিল। দ্র. বাঙ্গা-ই-১, পৃ. ২৬।

শাস্ত্রীমশায়ের ইঙ্গিত অনুসরণ করে এ বিষয়ে ব্যাপক বিচার-বিবেচনা করেন অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর "চেরোজাতি" (পৌষ ১৩২৮ ব.), "বগধজাতি" (অগ্রহায়ণ, ১৩২৯ ব.) প্রবন্ধে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রাহুল সাংকৃত্যায়ন পিপরিয়া-রামপুরা-ঠোরী অঞ্চলে ভ্রমণের বিবরণে লিখেছেন, "এখানে এক বিচিত্র জাতিগোষ্ঠীর মানুষের সঙ্গে পরিচয় হলো। এরা থারু নামে পরিচিত। বিভিন্ন সময়ে পণ্ডিতেরা এদের নিয়ে গবেষণা করেছেন। এদের বৈশিষ্ট্য— এরা আকৃতিতে মঙ্গোলীয় কিন্তু এদের ভাষার সঙ্গে বিহারের গয়া অঞ্চলের মগহী ভাষার অদ্ভুত মিল দেখা যায়। দক্ষিণ দেশের অ-থারু জাতিগোষ্ঠীকে এরা বাজি (বৃজি-লিচ্ছবী) এবং নিজেদের দেশকে বাজিয়ান বলে থাকে। এরা মুরগী এবং শুয়োর দুই-ই আহার্য হিসেবে গ্রহণ করে; যদিও স্থানীয় হিন্দুদের কাছে মুরগী খাওয়াটা একটা গর্হিত কাজ। এদের মধ্যে আবার একটা সম্প্রদায় আছে যাদের নাম চিতবনিয়া থারু। এরা বলে, এদের পূর্বপুরুষেরা রাজস্থানের চিতোর থেকে এসেছিলেন। আর লুম্বিনীর কাছাকাছি বাস করা থারুরা নিজেদের অযোধ্যার বনবাসী রাজার বংশধর বলে পরিচয় দেয়।" (রাহুল সাংকৃত্যায়ন, 'তিব্বতে সওয়া বছর', অনুবাদ : মলয় চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা ১৯৮২, পৃ. ৩৯)।

৮. রাজা হর্ষবর্ধনের (রাজত্বকাল ৬০৬-৪৭ খৃ.), সভাকবি বাণভট্ট রচিত আখ্যায়িকা কাব্য 'হর্ষচরিত'। বাণের অপর প্রসিদ্ধ রচনা 'কাদম্বরীকথা'।

৯. গান্ধার অঞ্চলে প্রথম শক আধিপত্য বিস্তার করেন মোয়েস আনুমানিক ৮০ খৃস্টপূর্বাব্দে। আ. ৫৮ খৃস্টপূর্বাব্দে দ্বিতীয় শক রাজা আজেস উত্তর ভারতে প্রভাব বিস্তৃত করেন।

১০. এই বইয়ের পৃ. ২৭৪ সূত্র ৩ দ্র.

১১. রামপুত্র উদ্রক, উদ্দক, রুদ্রক বুদ্ধদেবের দ্বিতীয় গুরু। অড়ার কালামের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বুদ্ধদেব রাজগৃহে যান। রুদ্রক রাজগৃহে অধ্যাপনা করতেন। বুদ্ধদেব তাঁর কাছে কিছুদিন শিক্ষা নিয়েছিলেন। রুদ্রক বলতেন— শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা অবলম্বন করে মোক্ষপথের পথিক হওয়া উচিত। এই পথেই জ্ঞান ও অজ্ঞান দুই-ই অতিক্রম করা যায়। এ শিক্ষায় বুদ্ধদেবের তৃপ্তি হল না, কারণ, সংজ্ঞা ও অসংজ্ঞার অতীত অবস্থায় উপনীত হওয়া সম্ভব হলেও এই পথে নির্বেদ, বৈরাগ্য, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা ও নির্বাণ লাভ করা যায় না। তাই তিনি রামপুত্র উদ্রকের আশ্রয় ছেড়ে গেলেন।

"Chronology of the Sāṃkhya Literature" প্রবন্ধে শাস্ত্রীমশায় সাংখ্য মতের সঙ্গে বৌদ্ধ মতের সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করেছেন। অনুষঙ্গ দ্র.

১২. অনুবাদ : সনক ও সনন্দ এবং সনাতন (এই) তিন জন, কপিল ও আসুরি এবং পঞ্চশিখ যিনি মাতুলালয়ে পরিবর্ধিত।

১৩. এই বইয়ের পৃ. ৭৬ সূত্র ২০ দ্র.

১৪. এই বইয়ের পৃ. ১০৯ সূত্র ১৩ দ্র.

১৫. 'আপস্তম্বীয় কল্পসূত্র' প্রণেতা প্রসিদ্ধ ধর্মসূত্রকার আপস্তম্ব। তিরিশটি প্রশ্নে বিভক্ত কল্পসূত্রের বিভিন্ন অংশের নাম শ্রৌতসূত্র, পরিভাষা, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র ও শুল্বসূত্র। পঞ্চম বা চতুর্থ খৃস্টপূর্বাব্দের আগে এই গ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল। কল্পসূত্র সংকলন সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায় মন্তব্য করেছেন—

"The Smṛiti had its origin in the Vaidika Schools, Śākhās or Parṣads, each Śākhā, to preserve the integrity of the Vedic traditions prevailing among its followers, wrote works on the six Vedāṅgas, namely (1) Phonetics; (2) Sacrificial and other Laws; (3) Grammar; (4) Philology; (5) Prosody, and (6) Astronomy. Of the six Vedāṅgas the second called *Kalpa* is broadly divided into two Sections, Śrauta and Smārta. Śrauta deals with sacrificial rules and serves as a commentary and supplement to the Brāhmaṇas, while the Smārta deals with domestic and social regulations which derive their authority from the memory of and tradition among the sages. There are many schools which have preserved their *Kalpas* intact, but the majority have left only fragments of their *Kalpas*; of the former class are the schools of Āpastamba, Baudhyāyana, Hiraṇya-keśin, Āśvalāyana and Kātyāyana; of the later, *i.e.*, those whose *Kalpas* we get only in a fragmentary and incomplete condition are Bharadvāja, Maśaka, Gautama, Vaśiṣṭha and so forth." (*Shastri. Cat.*, Vol. III, Smṛiti Manuscripts, preface, pp. vi-vii).

১৬. অনুবাদ : যে দিনে মনে বৈরাগ্য জাগবে সেইদিনই সংসার ত্যাগ করা উচিত।

১৭. মহাবীরের জন্ম আনুমানিক ৫৯৯ খৃস্টপূর্বাব্দে। বাবা সিদ্ধার্থ। মা বৈশালীর লিচ্ছবিরাজার মেয়ে ত্রিশলা। জন্মনাম বর্ধমান। জ্ঞাতৃ-বংশীয় ক্ষত্রিয় বলে অন্য নাম জ্ঞাতৃপুত্র। দিগম্বর সম্প্রদায়ের মতে বর্ধমান অবিবাহিত ছিলেন। শ্বেতাম্বর মতে তাঁর স্ত্রীর নাম যশোদা এবং একমাত্র সন্তান অনুজা বা প্রিয়দর্শনা। তিরিশ বছর বয়সে বর্ধমান সন্ন্যাসী হয়ে যান। বারো বছর তপস্যার পরে পরেশনাথ পাহাড়ের কাছে নদীতীরে এক শালগাছের নিচে কেবল-জ্ঞান অর্জন করেন। সিদ্ধিলাভের পর তাঁর নাম হয় মহাবীর, কেবলী, জিন্ অর্থাৎ

যিনি জয়লাভ করেছেন (জৈন শব্দটি জিন্ থেকে উদ্ভূত)। উত্তর ও দক্ষিণ বিহারে এবং পশ্চিমে কৌশাম্বী অবধি ভ্রমণ করে মহাবীর নিজের ধর্মমত প্রচার করেন। তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল রাজগৃহ-নালন্দা অঞ্চল। মহাবীরের ঘনিষ্ঠ এগারো জন শিষ্য গণধর নামে পরিচিত ছিলেন। এ'রা তাঁর অনুগামী শ্রমণদের নিয়ন্ত্রণ করতেন। সংঘের সকলকে কঠোর নিয়ম-সংযম মানতে হত। মহিলাদেরও সংঘে নেওয়া হত। গৃহস্থ নারীপুরুষ শ্রাবক নামে সংঘের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। ক্রমিক বিকাশের পথে আত্মার মুক্তি মহাবীরের জৈনধর্মের মূল কথা। আত্মাকে কর্মের আবরণ মুক্ত করাই মোক্ষ। মোক্ষ-পথে অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের ভিত্তি জীব (আত্মা), অজীব, আস্রব, বন্ধ, পুণ্য, পাপ, সংবর, নির্জরা ও মোক্ষ— এই নয়টি তত্ত্ব। নয়টি তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ চারিত্র— রত্নত্রয় যুক্ত হলে ব্যক্তি মুক্তিমার্গে অগ্রসর হতে পারে। জৈন মতে সাক্ষাৎ মুক্তি দেবতাদের অনায়ত্ত, মুক্তিলাভের জন্য দেবতাদেরও মানুষ হয়ে জন্মাতে হয়। মানবজীবন শ্রেষ্ঠতম, কারণ, একমাত্র মানুষই মুক্তির জন্য যোগ সাধনায় সমর্থ। জৈনধর্মে ঈশ্বর উপাসনার স্থান নেই, সৃষ্টি এ'দের দৃষ্টিতে অনাদি এবং অনন্ত।

আনুমানিক ৫২৭ খৃস্টপূর্বাব্দে মহাবীরের মৃত্যু হয়।

১৮. জৈন তীর্থংকর পরম্পরায় ২৩তম পার্শ্বনাথ কাশীর এক রাজপরিবারের ছেলে। জন্ম মহাবীরের প্রায় আড়াই শো বছর আগে, অষ্টম খৃ. পূর্বাব্দে। বাবা অশ্বসেন, মা বামা। কুশস্থল-রাজ প্রসেনজিতের মেয়ে প্রভাবতীকে পার্শ্বনাথ বিয়ে করেন। তিরিশ বছর বয়সে সংসার ছেড়ে যান এবং চুরাশি দিন তপস্যার পরে কেবল-জ্ঞান অর্জন করেন। প্রচলিত বিশ্বাস, সিদ্ধিলাভের পরে সত্তর বছর ধরে তিনি ধর্মপ্রচার করেছিলেন। পার্শ্বনাথের মূল শিক্ষা চারটি, মতান্তরে পাঁচটি—১. অহিংসা, ২. সত্য, ৩. অচৌর্য, ৪. বিষয়ে অনাসক্তি, ৫. ব্রহ্মচর্য। পার্শ্বনাথের অ-বৈদিক ধর্মমত ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাঁর অনুগামী শ্রমণ-সংঘ সুসংগঠিত ছিল। একশো বছর বয়সে পরেশনাথ পাহাড়ে পার্শ্বনাথের মৃত্যু হয়।

১৯. স্থবিরবাদী সম্প্রদায়ের পালি 'সুত্তপিটক'-এর অন্তর্গত "দীঘনিকায়ে"র আটানাটিয় সুত্রান্তে গোতমবুদ্ধকে নিয়ে সাত জন বুদ্ধের নাম আছে— ১. বিপস্সি, ২. সিখি, ৩. বেস্সভু, ৪. ককুসন্ধ, ৫. কোনাগমন, ৬. কস্সপ এবং ৭. অঙ্গীরস বা গোতম। পরবর্তী

বৌদ্ধশাস্ত্রে এই তালিকায় আরো নাম যুক্ত হয়েছে। যেমন, ১. দীপংকর, ২. কোণ্ডঞ্‌ঞ বা কৌণ্ডিন্য, ৩. মঙ্গল, ৪. সুমন, ৫. রেবত, ৬. শোভিত, ৭. অনোমদস্‌সি বা অনোমদর্শী, ৮. পদুম, ৯. নারদ, ১০. পদুমুত্তর, ১১. সুমেধ, ১২. সুজাত, ১৩. পিয়দস্‌সী বা প্রিয়দর্শী, ১৪. অত্থদস্‌সী বা অর্থদর্শী, ১৫. ধম্মদস্‌সী বা ধর্মদর্শী, ১৬. সিদ্ধার্থ, ১৭. তিস্‌স বা তিষ্য, ১৮. ফুস্‌স এবং আগে গৌতম ভিন্ন আর যে ছয় জন বুদ্ধের নাম করা হয়েছে তাঁদের নিয়ে ২৪ জন। 'বুদ্ধবংস' গ্রন্থে "বুদ্ধপ্রকীর্ণক কাণ্ড" অধ্যায়ে বলা হয়েছে দীপংকরের আগে তণহংকর, মেধংকর ও সরণংকর নামে আরো তিন জন বুদ্ধ আবির্ভূত হয়েছিলেন। 'ললিতবিস্তরে' ৫৪ জন বুদ্ধের উল্লেখ আছে। 'মহাবস্তু অবদানে' বলা হয়েছে বুদ্ধ অগণিত। ঐতিহাসিক ব্যক্তি গৌতমবুদ্ধের অলৌকিক মহিমা প্রতিপন্ন করার আগ্রহে এইভাবে কোটি কোটি পূর্বগামী বুদ্ধের অস্তিত্ব কল্পিত হয়েছে। বহু বুদ্ধ কল্পনার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শাস্ত্রীমশায় লিখেছেন—

"There, however, came a split in the Buddhist camp, in the second century after Buddhas Nirvāṇa. The *Mahā-vaṃśa* ascribes this split to ten points of conduct, such as storing a bit of salt in a horn, taking some refreshment before going to an invitation to a distant village, continuing to take cooked food some minutes after twelve, and so on. The *Maha-vaṃśa* says, the younger generation of monks wanted relaxation of the food, conduct and moral regulations so rigidly enforced by Buddha himself and his elderly disciples. But the Elders would not yield an inch and there was a split. Modern thinkers consider these points of difference to be too trivial to warrant an abiding and everlasting separation. A perusal of the *Mahā-vastu-Avadāna* will convince the reader that there were deeper causes of separation. The Primitive Buddhism thought Buddha to be a human being who by exertion sustained through innumerable births attained to Buddhahood, or the position of the teacher and guide of the world. He was, they thought, *Laukika* or

human but the new school thought him to be *Lokottara*, super-human. It may be noted here that from the colophons of the *Mahā-vastu* some people thought it to be a work on the Vinaya of the Lokottaravādins among the Mahā-sāṅghikas, or the new school. But this seems to be hardly convincing ; the word *Lokottara-vādinām* in these colophons is a permanent adjective or *Uddeśya-viśeṣaṇa* and not a predicative adjective or *Vidheya-viśeṣaṇa*, and among the various schools which arose in the new school, there is hardly any sect named Lokottara-vādin. According to this school Buddha was exerting through innumerable Kalpas. (Their idea of time and space is more spacious and of longer duration than that of primitive Buddhism). In one Kalpa it was pronounced by the Buddha of the time that this disciple of his would be a great man. In another Kalpa the Buddha of the time pronounced that he should be a Buddha, another Buddha of another Kalpa declared that his time was coming. Kaśyapa of this Kalpa, appointed him yuva-raja and so he was born at Kapila-vāstu and became Buddha. This is certainly, more than human. Primitive Buddhism thought that there were six Buddhas before him and one would follow him. These are called *Mānuṣī* Buddhas. But the new school enumerates at least three hundred Buddhas (though by counting I got only 297), and says that the number is infinite. In the *Mahā-vastu* which is the gospel of the new school, Buddha is given the miraculous power of sending emanations from him exactly like him and calling them *Nirmitas* which were perhaps in later times called *Nirmāṇa-Kāyas*. (*Advayavajra-saṁgraha*, *G-O-S*, No. XL, 1927, Introduction, pp. xvii-xix.

জৈন মতে কালের দুই ভাগ, উৎসর্পিনী বা ক্রমোন্নতির যুগ এবং অবসর্পিনী বা ক্রমিক অবনতির যুগ। যুগ দুটি ছয়টি 'অর' বা ভাগে বিভক্ত। ক্রমোন্নতি ও ক্রমিক অবনতির তৃতীয় ও চতুর্থ অরে ২৪ জন করে তীর্থংকর আবির্ভূত হন। চলতি অবসর্পিনীর ২৪ জন তীর্থংকরের নাম— ১. ঋষভ বা আদিনাথ, ২. অজিত, ৩. সম্ভব, ৪. অভিনন্দন, ৫. সুমতি, ৬. পদ্মপ্রভ বা সুপ্রভ, ৭. সুপার্শ্ব, ৮. চন্দ্রপ্রভ বা শশি, ৯. সুবিধি বা পুষ্পদন্ত, ১০. শীতল, ১১. শ্রেয়াংশ, ১২. বাসুপূজ্য, ১৩. বিমল, ১৪. অনন্ত, ১৫ ধর্ম, ১৬. শান্তি, ১৭. কুন্থু, ১৮. অর, ১৯. মল্লি, ২০. মুনি-সুব্রত, ২১. নমি, ২২. নেমি বা অরিষ্টনেমি, ২৩. পার্শ্বনাথ এবং ২৪. মহাবীর। পার্শ্বনাথ এবং মহাবীর ভিন্ন আর-সব তীর্থংকর কাল্পনিক চরিত্র।

২০. এখনকার নেপালের ভৈরহাওয়া জেলার রুম্মিনদেই বুদ্ধদেবের জন্মস্থান লুম্বিনী। রুম্মিনদেই-এর প্রায় ২৩ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে নিগলি-সাগর নামে জলাশয়ের তীরে একটি থাম্বা বা স্তম্ভের গায়ে লেখা আছে—

> দেবানংপিয়েন পিয়দসিন লাজিন চোদস-বসা [ভিসিতেন]
> বুধস কোনাকমনস থুবে দুতিয়ং বঢিতে [। *]
> [বীসতি-ব *] সাভিসিতেন চ অতন আগাচ মহীয়িতে
> [সিলা-থম *] [চ *] [উস- *] পাপিতে [॥ *]

থাম্বাটির নিচের অংশ নেই। নিগলিসাগরের ১১ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত গোটিহাওয়াতে ভাঙা স্তূপের পাশে একটি থাম্বার নিচের অংশ আছে। নিগলিসাগরের ধারে পাওয়া থাম্বা এবং এটি একই পাথরে তৈরি। মাপ থেকে অনুমিত হয় এটি নিগলিসাগর-থাম্বার নিচের অংশ। কোনো সময়ে ভাঙা উপরের অংশ এখান থেকে নিগলিসাগরের ধারে নিয়ে যাওয়া হয়ে থাকবে। হিউয়েন্-ৎসাঙ থাম্বার পাশে স্তূপ দেখেছিলেন। নিগলিসাগরের ধারে কোনো স্তূপ নেই, রয়েছে গোটিহাওয়ায়। অশোক সম্ভবত এই স্তূপই সংস্কার করে দ্বিগুণ বাড়িয়েছিলেন। কনকমুনির নির্বাণ স্থান গোটিহাওয়ায় হওয়াই সম্ভব। থাম্বাটির লিপি থেকে বোঝা যাচ্ছে খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে পূর্ব পূর্ব বুদ্ধের অস্তিত্ব সম্পর্কে ধারণা প্রচলিত ছিল। দ্র. *S-I-1*, p. 71 ; *B-M*. pp. 250-53.

২১. এই বইয়ের পৃ. ১৮৩ সূত্র ১৩ দ্র.

২২. যে কুশলধর্মে প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষ আত্মমুক্তির দিকে অগ্রসর হতে সমর্থ হয় তাকে বলা হয় শীল। শীল শব্দের অর্থ সুনীতি অবলম্বনে কায়িক, বাচনিক, মানসিক সংযম অভ্যাস। গাছ, পাহাড় যেমন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বৃদ্ধি ও বিপুলতা লাভ করে তেমনি মুক্তিকামী যোগী শীলকে আশ্রয় করে শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শ্রদ্ধা, বীর্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা— এই পাঁচ ইন্দ্রিয় ও পাঁচ বল ভাবনা করেন ('মিলিন্দপঞ্‌হো')। সাধারণ গৃহস্থের নিত্য পালনীয় পঞ্চশীল। আগ্রহী গৃহস্থ অষ্টশীল, এমন-কি দশশীল পর্যন্ত পালন করতে পারেন। দশশীল যথাক্রমে— ১. প্রাণীবধ থেকে বিরত, শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি (পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্‌খাংপদং সমাদিযামি), ২. অদত্ত বস্তু নেওয়া থেকে বিরত, শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি (অদিন্নাদানা…), ৩. ব্যভিচার থেকে বিরত, শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি (কামেসু মিচ্ছাচারা…), ৪. মিথ্যাবাদ থেকে বিরত, শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি (মুসাবাদা…), ৫. প্রমাদ স্থান, সুরা মৈরেয়— মদ্য থেকে বিরত, শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি (সুরা মেরেয়-মজ্জ-পমাদট্‌ঠানা…), ৬. বিকালে আহার থেকে বিরত, শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি (বিকাল ভোজনা…), ৭. নাচ-গান-বাজনা-বিধর্মীদের পুতুলনাচ দেখা থেকে বিরত, শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি (নচ্চ-গীত-বাদিত-বিসূকদস্‌সন…), ৮. বিভূষণের জন্য মালা পরা, সুগন্ধি মাখা থেকে বিরত, শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি (মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডন-বিভূসনট্‌ঠানা…), ৯. উঁচু শয্যা মহাশয্যা ব্যবহার থেকে বিরত, শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি (উচ্চসযনা মহাসযনা…), ১০. সোনা-রুপা প্রতিগ্রহ থেকে বিরত. শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি (জাতরূপ-রজত পাটিগ্‌গহণা…)। পালি 'বিনয়পিটকে' এই দশশীলের উল্লেখ আছে। মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্র 'মহাবস্তু অবদান', 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' প্রভৃতিতে দশশীল কিছুটা পৃথক।

২৩. সিদ্ধিলাভের পর অষ্টম সপ্তাহে বুদ্ধদেব অপ্রতিহত ধর্মচক্র প্রবর্তনের উদ্দেশে বারাণসীর মৃগদাবে (সারনাথ) উপস্থিত হয়ে ভদ্রবর্গীয় পঞ্চক নামে পরিচিত কৌণ্ডিন্য, ভদ্রজিৎ, বাষ্প, মহানাম ও অশ্বজিৎ— এই পাঁচ জন ব্রাহ্মণের সঙ্গে মিলিত হন। এঁরা উপদেশ চাইলে বুদ্ধদেব বলেন, প্রব্রজিতেরা সচরাচর দুটি পদ্ধতি আশ্রয় করেন। ১. একদল গ্রাম্য ও সাধারণ লোকের মতো সব সময় কাম সুখে নিরত থাকেন, ব্রহ্মচর্য পালনের বা ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযমের চেষ্টা করেন না। ২. অন্যদল সর্বদা নিজেকে পীড়ন করেন, সর্বদা নিজের ক্লেশজনক অনুষ্ঠানে নিরত থাকেন। এই দুই পদ্ধতিই হেয় এবং আর্যজনের পরিত্যাজ্য। দুই

চরম পথ ত্যাগ করে মধ্যম পথ অবলম্বনই শ্রেয়। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই মধ্যম পথ (পৃ. ২৮২, সূত্র ৪ দ্র.)। প্রথম ধর্মদেশনায় এইভাবে বুদ্ধদেব চরমভোগ এবং চরম কৃচ্ছ্র দুয়েরই নিন্দা করেন। সংসারে যখন ছিলেন তখন রাজার ছেলে হিসাবে চরম ভোগসুখের স্বাদ তিনি জানতেন। সাধনার পথে এসে চরম কৃচ্ছ্রসাধন করেছিলেন। সমকালে প্রচলিত যোগসাধনার সমস্ত পদ্ধতি তিনি এই সময়ে অনুসরণ করেন। 'মজ্‌ঝিম নিকায়' প্রথম খণ্ডে বুদ্ধের উক্তিতে তাঁর দুশ্চর তপস্যার বিস্তৃত বিবরণ আছে। আস্ফানক ধ্যানের অনুষ্ঠানে তিনি বলবান্ লোক যেভাবে দুর্বলকে পর্যুদস্ত করে তেমনি দাঁতে দাঁত চেপে, তালুতে জিব প্রচণ্ড জোরে চেপে নিজেকে নিগ্রহ করতেন। কুম্ভকে প্রবৃত্ত হয়ে শ্বাসরোধ করতেন, হাপরের মতো শব্দে কান দিয়ে বাতাস বেরোত। শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করতেন। মনে হত যেন কোনো কসাই তাঁর শরীর খণ্ড খণ্ড করছে বা তাঁকে কয়লার আগুনে পোড়ানো হচ্ছে। নিরন্তর উপবাসে শরীর এত শীর্ণ হয়ে গিয়েছিল যে কোথাও বসলে উটের খুরের দাগের মতো একটুখানি দাগ পড়ত। পুরানো চালার কড়ি বরগার মতো বুকের পাঁজর সব বেরিয়ে পড়েছিল। চোখ দেখাত যেন গভীর কুয়োর মধ্যে জলের আভাস। পেটের চামড়া শিরদাঁড়ার সঙ্গে এমনভাবে লেগে থাকত যে শিরদাঁড়া ছুঁলে পেটের চামড়ায় হাত লাগত, পেটের চামড়া ছুঁলে হাত লাগত শিরদাঁড়ায়। এই আত্ম-নিগ্রহের পথে বুদ্ধদেব সত্যের সন্ধান পান নি। উপলব্ধি করেছিলেন, উন্নত মানস-চর্চার জন্য শরীর সুস্থ রাখা প্রয়োজন। 'দীঘ নিকায়ে'র পাটিক সূত্রান্তে বুদ্ধদেব কুক্কুরব্রতী চতুকুণ্ডিক (চতুষ্পদের মতো হাত পায়ের সাহায্যে ভ্রমণশীল) নগ্ন কোরক্ষত্তিয়র সাধন-পদ্ধতির নিন্দা করে বলেছেন, মাটিতে ফেলে দেওয়া খাবার খেয়ে বেড়ানো ওই কুকুরব্রতীর অলসক রোগে মৃত্যু অবধারিত। মৃত্যুর পরে সে কালকঞ্জ নামে সর্বনিকৃষ্ট অসুরদের মধ্যে জন্মাবে। 'দীঘ নিকায়ে'র উদুম্বরিক-সীহনাদ সূত্রান্তে নিগ্রোধ ও সমবেত ভিন্নপন্থী পরিব্রাজকদের বুদ্ধদেব কৃচ্ছ্রসাধন সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছেন। উপদেশের মর্ম এই যে, কৃচ্ছ্রসাধনরূপ তপে তপস্বীর অহংকার, আত্মশ্রেয়ত্বের অহমিকাই প্রকাশ পায়। সংযমের দ্বারা সুরক্ষিত, সর্বপ্রাণীর হিতাকাঙ্ক্ষা দ্বারা পরিশুদ্ধ-চিত্ত, মৈত্রীসহগত-চিত্ত, অনেকবিধ পূর্বজন্ম স্মরণক্ষম যিনি, তাঁর ব্রহ্মচর্য ও কৃচ্ছ্র-সাধন শ্রেষ্ঠত্বে ও সারত্বে উপনীত হয়। চিত্তের শুদ্ধি ও অগ্রগতির সঙ্গে সম্পর্কহীন উৎকট কৃচ্ছ্র বুদ্ধদেব অনুমোদন করেন নি।

২. অনুষঙ্গ

শাস্ত্রীমশায়ের লেখা CHRONOLOGY OF THE SĀṂKHYA LITERATURE প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক অংশ।

Patañjali in his *Mahābhāṣya* mentions the Sāṃkhyas. The *Laṅkāvatārasūtra*, one of the Pre-Mahāyāna sūtras of the Buddhists, mentions the Sāṃkhya by name, and Aśvaghoṣa, one of the precursors of Mahāyāna, bases the whole Buddhist system of thought on the influence of the Sāṃkhya. He says that both the teachers to whom Buddha applied for the solution of the problem of life, were followers of Kapila. The first teacher, Āḍāra Kālāma, explained to him the system of Kapila and pointed out to him how the human soul in its upward march can reach Infinity of space without losing individuality. The second teacher, Uddaka Rāmaputra, led him still further. But Buddha was not satisfied. He contended that if Individuality remained, one cannot attain absolute Nirvāṇa. So he studied and meditated for six years under the Bo-tree at Gayā and at last succeeded in destroying Individuality. He came to a state in which there would be no Saṃjña and no Saṃjñī. Thus he supplied, as it were, the coping-stone to the arch of the Sāṃkhya system, and brought it to a transcendental hight never contemplated by the founder of the system, Kapila himself. It may be argued that this is the idea of Aśvaghoṣa. But Aśvaghoṣa was one of the patriarchs of Buddhism. He was the Guru of Kaṇiṣka and as such flourished in the first or second century A. D. His opinion on a matter like this carry a good deal of weight.

... ...

It is a well-known fact that the original sūtras of Kapila are lost with their bhāṣyas, commentaries, nay the whole literature based on them. What authentic literature remains, is confined to the seventy kārikās of Iśvara-

kṛṣṇa, called in the Chinese *Tripiṭaka*, the Golden Seventy. The Chinese Tripiṭaka is mainly, nay exclusively, Buddhistic. But it contains a few important Hindu works too, one of them is the 'Golden Seventy'. Gauḍapāda, the precursor of Śaṅkara, writes a commentary on them, and to these Śaṅkara is indebted for all his ideas and quotations of the Sāṃkhya system of philosophy. Śaṅkara belonged to the early years of the ninth century and Gauḍapāda one generation earlier. But what is the age of Īśvarakṛṣṇa ?

The question has been solved in a Chinese work entitled the life of Vasubandhu written by an Indian monk named Paramārtha, who migrated to China at the end of the fifth century A. D. and there wrote the book. He informs us that Īśvarakṛṣṇa was a contemporary and rival of Vasubandhu, a Buddhist monk born in Peshawar and lived at the city of Oudh. He and his brother Asaṅga were the two pillars of the Mahāyāna faith in that century. They found a tough antagonist in Īśvarakṛṣṇa and it is said that Īśvarakṛṣṇa gained a reward of three lakhs of rupees by refuting the Buddhists, from the then reigning king, Bālāditya.

So the work, entitled *Īśvarakṛṣṇa-Kārikā* is the sheet anchor of the chronology of the Sāṃkhya Literature. Īśvarakṛṣṇa belonged to the fifth century A. D. and we have to go backwards and forwards in our quest of the dates of the Sāṃkhya works. At the end of his work he gives us some information about the previous history of his system. The history is very meagre. But still it is authentic as coming from a man of Īśvarkṛṣṇa's stamp. He says this system of philosophy was taught by the founder, Paramarṣi to Āsuri and he gave it to Pañcaśikha who wrote many works. The names of Āsuri and Pañcaśikha are well known to every Brahmin, who cares to perform his daily ablutions, for he has to pour water

everyday for the benefit of certain Ṛṣis and these are,—Sanaka, Sananda, Sanātana, Kapila, Āsuri, Boḍhu and Pañcaśikha. But are they really historical persons? Sanaka, Sananda and Sanātana are mythical. Are the rest also mythical? The historicity of Kapila is never doubted. He is the founder of the Sāṃkhya system and is called Paramarṣi. Āsuri and Pāñcaśikha are both mentioned in the *Mahābhārata* and in that part of it which is really historical, commencing with such expressions as—

Tatrāpyudāharantīmaṃ itihāsaṃ purātanaṃ

There is a dialogue in the Śāntiparvan between Janaka and Pañcaśikha. Āsuri also is mentioned there. But we have more tangible proofs of their existence as authors. Guṇaratna, in his commentary, page 104, gives a quotation from Āsuri on a vital question of the system and Pañcaśikha has been several times quoted in the Vyāsa Bhāṣya on the Yogasūtras.

Īśvarakṛṣṇa gives us another piece of information that with the exception of the stories (in support of the Sāṁkhya Theory) and with the exception of the refutation of other systems his seventy Kārikās will give all that is to be found in the *Ṣaṣṭitantra*. So there was a work entitled *Ṣaṣṭitantra*, in which, not only were the Sāṃkhya doctrines elaborated, but stories were given and refutations of other systems. But we know nothing more about the *Ṣaṣṭitantra* except a quotation in Gauḍapāda's commentary from that work and a summary of its contents in the Pañcatantra work entitled *Ahirbudhna-saṃhita*. There is however a body of sūtras divided into six chapters entitled *Sāṁkhya-Pravacana* and commented upon by a scholar named Vijñāna Bhikṣu in the eleventh century, which contains a chapter of Ākhyāyikās (stories) and another on refutations. Cannot this *Sāṃkhya-Pravacana* be the *Ṣaṣṭitantra*? But we know nothing of the *Ṣaṣṭitantra* beyond the only quotation and the enumeration of

topics just referred to and the name which means 'sixty topics' differently explained by different commentators. Was the *Şaştitantra* in a sūtra form ? We do not know. But the *Pravacana* is in sūtras. That the *Pravacana* is not the original *Şaştitantra* is proved by its inclusion of a good many modern ideas. For instance, it calls the Advaita System by the name of Advaita, so it is not *Şaşti-tantra.* It quotes the opinion of Pañcaśikha, so it cannot be the original sūtras of Kapila. All that can be said about its authenticity is that it is based upon Şaştitantra, but has been altered and interpolated beyond recognition. But what is the authority of Īśvarakṛṣṇa ? Does he follow an old tradition or does he give new interpretation to the Sāṃkhya doctrine prevailing in his time ? He simply says that all that is to be found in ,the *Şaştitantra* is also to be found in his seventy Kārikās. This shows that he does not introduce any novelty but only follows an old tradition, and from whom does that tradition derive its anthority ? The question is rather difficult to be solved for want of materials. I found, however, after a good deal of search, a manuscript of the Kārikās at the Jaina Upāśraya named Śripūjya in the city of Bikāner in which the Kārikās are described as Māṭhara Bhāşya. From that I inferred that there was a body of Saṃkhya sūtras on which Māṭhara wrote a Bhaşya and that Īśvarakṛṣṇa simply followed him. Curiously enough, Guṇaratna in enumerating the works of Sāṃkhya literature says—

Sāṃkhyānāṃ tarkagranthāḥ Şaştitantroddhārarūpaṃ Māṭhara bhāşyaṃ Sāṃkhyasaptatināmakaṃ,—which accords perfectly with the ideas I imbibed at Bikāner. But before that I several times read that passage but could not understand it, as the Italian editor of Guṇa-ratna has put commas after 'Şaştitantroddhārapṃ' and after Māṭhara-bhāşya. I was led to think that Guṇaratna speaks of three works. But *Māṭharabhāşya* is not the

seventy Kārikās. It has a separate existence, as Guṇaratna quotes in page 96.

तदुक्तं माठरप्रान्ते— (प्रान्ते being a misprint for ग्रन्थे)

हस पिव लल खाद पिव नित्यं
भुंक्ष्य च भोगान् यथाभिकामं ।
यदि विदितं ते कपिलमतं
तत् प्राप्स्यसि मोक्षसौख्यमचिरेण ॥

Professor Sylvain Levi tells us from Chinese sources that there were three learned men at the court of Kaṇiṣka at the end of the first century A.D., (1) Aśvaghoṣa was his Guru, (2) Māṭhara, his prime-minister and (3) Caraka his chief physician. I am tempted to identify the Bhāṣyakāra Māṭhara with the prime-minister, because the other two of his contemporaries were both experts in the Sāṃkhya. He also presumably was an expert too, and prime-ministers in ancient days were not averse to writing exhausitive and comprehensive works. But the great difficulty is to fix the individuality of the authors because Maṭhara and Caraka are Gotra names.

The question of the derivation of the word 'Sāṁkhya' was a difficult one. I did not understand why the system of Kapila should be named Sāṃkhya. When asked, the pandits generally give a couplet in explanation which runs thus—

संख्यां प्रकुर्वते यस्मात् प्रकृतिञ्च प्रचक्षते ।
तत्वानि च चतुर्विंशत् तस्मात् सांख्याः प्रकीर्त्तिताः ।

Evidently the word 'Saṃkhyā' means number, enumeration. But the pandits invariably explain it by Vivekakhyāti, the differentiation between the spirit and the matter, Prakṛti and Puruṣa. But Professor Garbe boldly translated the word as Enumeration and called the Sāṃkhya System as the Enumerative System and not the Hylotheistic System as translated by Hall. That gave me some food for thought. It occured to me that Kaplila

tried to fix philosophical ideas by numbers and my readings in the later Vedic literature confirmed me in my idea. I found that the Vedic writers were not very definite at their numbers. In enumerating the organs of sense they were not very definite about the number five. They would often say, Cakṣu, Śrotra, Ghrāṇa, Prāṇa, Vāk, etc. So also in the case of vital airs. They would sometimes say Prāṇa and Apāna ; sometimes they would include Vyāna but rarely they would speak of the five vital airs. So I began to think that Kapila did a great service to Indian thought by fixing philosophical ideas by numbers. I found Buddha also did the same. He also fixes his ideas by numbers, Four Noble Truths, Eightfold Path to Arhatship and so on, and Buddha was a follower of Kapila. Mahāvīra also did the same and I am inclined to think that all the six heretical schools also followed the same method. All the ancient writers of India were, in this matter at least, the disciples of Kapila till Kaṇada introduced a higher method of philosophizing, namely that of finding Sādharmya and Vaidharma, similarity and dissimilarity, and it took several centuries to rise from enumeration to comparison. Comparison led to classification in which the earlier writers were very deficient.

... ...

The chronology of the original works is very difficult to settle. I now give my own ideas for whatever they are worth. I think that Kapila wrote his sūtras, 22 in number, for the benefit, earlier of Āsuri, his brother and disciple, or for an unknown Brahmin in the latter part of the Vedic period, before the *Śvetāśvataropaniṣad* or the *Kaṭhopaniṣad* were composed. That the Enumerative School was adopted by all schools of thought, orthodox Brahmins, Buddhists, Jainas, Ājīvakas, Lokāyatas and others. As the sūtras were perfectly unsectarian, the different schools put their own interpretations on them and made them to

serve their own purpose. The Brahmins wrote a comprehensive body of the sūtras based on these, not only one body of sūtras, but I believe, there were many such bodies of sūtras ; for, Gauḍapāda in his commentary quotes a sūtra which is not to be found in the *Sāṃkhya-Pravacana,* which consists of 553 sūtras, but he says it belonged to the *Ṣaṣṭitantra.* Buddhism and Jainism are simply expansions of Kapila's ideas but it is wonder of wonders that we still get manuscripts of the original sūtras of Kāpila, though often in a modified and mutilated form.

... ...

I believe that Kapila wrote the 22 sūtras, giving the bare outline of his system of primitive philosophy. He wrote before the *Śvetāśvatara,* the *Kaṭha Upaṇisad* and other later Vedic works embodying Sāṃkhya ideas, were composed. His ideas were accepted in the seventh and sixth centuries B. C., a century or two later than the end of the Vedic period by all classes of thinkers. But they modified his system according to their own ideas and carried them to their logical conclusion by discarding Individuality. The Jainas kept to his last conclusion by making 'Kaivalya' or 'individuality' absolute. The orthodox Brahmins on the other hand, wrote a body of sūtras embodying his ideas but incorporating in it such peculiar ideas of their own as the authenticity of the Vedas, efficacy of sacrifices and so on. This body of the sūtras is lost. One single sūtra only is to be found in Gauḍapāda's commentary of the Golden Seventy. Māṭhara wrote a commentary on this body of the sūtras and some one perhaps elaborated it into the form of *Ṣaṣṭitantra* or Sixty Topics. Īśvarakṛṣṇa epitomized *Ṣaṣṭitantra* and followed *Māṭharabhaāṣya* in the fifth century, Gauḍapāda wrote a commentary on the seventy Kārikās of Īśvarakṛṣṇa, but he knew of the existence of the work in the

Brāhmaṇa form, for he says, in the beginning of his work, that Kapila was the son of Brahmā ; with him were born jñāna, Dharma, Vairagya and Aiśvarya ; and he imparted his knowledge to a Brahmin of Āsurigotra ; (So Āsuri was not his brother, because Kapila belonged to Gautama gotra which contained many eminent men known in the Vedas). The *Saṃkhya-Pravacana* was based on the previous literature on the subject but modified by Śaṅkara's ideas for Vijñānabhikṣu, the earlier and Seśvara commentator, was a downright follower of Śaṅkara. His disciple, Bhāvā Gaṇeśa however comments on the 22 sūtras and there were many commentaries on the same later on. (*J-B-O-R-S*, Vol. IX, part II, 1923, pp. 151-62).

৫. হীনযান ও মহাযান

অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, হীনযান ও মহাযানে প্রভেদ কী ? হীনযান কাহাকে বলে, মহাযানই বা কাহাকে বলে ? কেনই বা হীনযানকে 'হীন' বলে, আর মহাযানকে 'মহা' বলে ? আগে যাহা যাহা লিখিয়াছি তাহাতে অনেক জায়গায়ই এই তফাত দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এবার যতদূর পারি পরিষ্কার করিয়া সেই তফাতই দেখাইব।

হীনযান বলিয়া কোনো যান নাই। মহাযানেরা আগেকার বৌদ্ধদের হীনযান বলিত। যেহেতু তাহারা 'মহা', সুতরাং তাহাদের আগেকার যাহারা, তাহারা 'হীন' অর্থাৎ ছোটো। আগে কিন্তু দুটি যান ছিল— ১. প্রত্যেকবুদ্ধযান বা প্রত্যেকযান আর ২. শ্রাবকযান। বুদ্ধদেবও প্রত্যেকবুদ্ধযান স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, যখন পৃথিবীতে কোনো বুদ্ধ উপস্থিত নাই, তাঁহার মুখ হইতে ধর্মকথা শুনিবার কোনো সুবিধা নাই, তখনো লোকে আপনার চেষ্টায়, আপনার যত্নে ও আপনার উদ্যমে জন্মজরামরণাদির হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে। হিন্দুদের ঋষিরা এইরূপে মুক্তিলাভ করিয়াছেন। এইরূপে যাহারা নিজের যত্নে, বুদ্ধের সাহায্য না পাইয়া, উদ্ধার হয়, তাহাদিগকে প্রত্যেকবুদ্ধ বলে ; তাহাদের যে যান তাহার নাম প্রত্যেকবুদ্ধযান। এই প্রত্যেকবুদ্ধেরা আপনিই উদ্ধার হইতে পারে, আর-কাহাকেও উদ্ধার করিবার শক্তি ইহাদের নাই।

বুদ্ধের মুখে ধর্মকথা শুনিয়া যাহারা ধর্মজ্ঞান লাভ করে, তাহাদের নাম 'শ্রাবক'। বুদ্ধের পরামর্শ লইয়া অনেক শ্রাবক উদ্ধার হইয়াছেন। তাঁহারা প্রথমে 'শ্রাবক' হন, তাহার পর 'ভিক্ষু' হন, বিহারে বাস করেন। অনেক দিন বিহারে থাকিতে থাকিতে 'স্রোতাপন্ন' হন, 'সকৃতাগামী' হন, 'অনাগামী' হন, পরে 'অর্হৎ' হইয়া যান।[১] ইঁহারাও জন্মজরামরণাদি হইতে অব্যাহতি পান, কিন্তু ইঁহারাও কাহাকেও উদ্ধার করিতে পারেন না। ইঁহাদের যে যান, তাহার নাম 'শ্রাবকযান'। বুদ্ধ নির্বাণ পাইলে তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য হইতে যাঁহারা ধর্মকথা শোনেন, তাঁহারা পর-পর জন্মে ধার্মিক বৌদ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু আবার না

যতদিন বুদ্ধদেবের প্রাদুর্ভাব হয়, ততদিন তাঁহাদের মুক্তি পাইবার উপায় নাই। এমনও অনেক জায়গায় শোনা যায় যে, একজন বুদ্ধের শ্রাবক অনেক জন্মের পর আর-একজন বুদ্ধের কাছে উদ্ধার হইলেন।

মহাযানের লোকেরা বলিত 'প্রত্যেক' ও 'শ্রাবক' এই দুই যানই হীন, কারণ ইহারা প্রত্যেকেই অত্যন্ত স্বার্থপর। আপনার উদ্ধার হইলেই হইল, ইহারা জগতের কথা ভাবে না, ইহাদের কাছে যেন জগৎ নাই, তাই মহাযানেরা ইহাদিগকে 'হীন' বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকে। আপনাদিগকে মহাযান বলে, যেহেতু তাহারা আপনার উদ্ধারের জন্য তত ভাবে না, জগৎ উদ্ধারই তাহাদের মহাব্রত। পূর্বেই বলিয়াছি 'অবলোকিতেশ্বর'[২] উদ্ধার হন-হন, মহাশূন্যে বিলীন হন-হন, এমন সময়ে জগতের সমস্ত প্রাণী তাঁহাকে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল, আপনি নির্বাণ প্রাপ্ত হইলে কে আমাদের উদ্ধার করিবে ? তাই শুনিয়া 'অবলোকিতেশ্বর' প্রতিজ্ঞা করিলেন, একটিও প্রাণী যতক্ষণ বদ্ধ থাকিবে, ততক্ষণ আমি নির্বাণে প্রবেশ করিব না। এই যে করুণা, সর্বভূতে দয়া, ইহাই মহাযানকে 'মহা' করিয়া তুলিয়াছে, আর ইহারই তুলনায় অপর দুই যানই হীন হইয়া গিয়াছে।

হীনযান অর্হত্ব পাইলেই খুশি, মহাযান তাহাতে খুশি নয়— তাহারা বুদ্ধত্ব চায়। এ দুয়ে তফাত কী ? অর্হৎও নির্বাণ পাইলেন, বুদ্ধও নির্বাণ পাইলেন। উভয়েই জন্মজরামরণের হাত হইতে উদ্ধার পাইলেন। উভয়েরই বোধিজ্ঞান লাভ হইল। তবে ইঁহাদের মধ্যে প্রভেদ কী ? অর্হতেরা হীনযান হইলেন, আর বুদ্ধ মহাযান হইলেন কেন ? বুদ্ধ যখন বোধগয়ায় অশ্বত্থ গাছের তলায় সম্যক্ সম্বোধি লাভ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ নির্বাণ লাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন, সেই সময় ব্রহ্মা ও ইন্দ্র আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, আপনি এখন নির্বাণ লাভ করিলে মগধের গতি কী হইবে ? মগধ যে অধর্মের ভারে ডুবিতে বসিয়াছে। তাঁহাদের কথায় বুদ্ধ স্বীকার করিলেন যে তিনি মগধের উদ্ধারের জন্য বহুকাল বাঁচিয়া থাকিবেন। তাই তিনি কাহারো মতে পঁয়তাল্লিশ, কাহারো মতে একচল্লিশ বৎসর ধর্মপ্রচার করেন ও আশি বৎসর বয়সে নির্বাণ লাভ করেন। তিনি পরের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন—

তাই তিনি 'বুদ্ধ', আর তাঁহার শিষ্যেরা নিজেরাই উদ্ধার হইতেন— তাই তাঁহারা 'অর্হৎ'।

যখন মহাযান প্রচার হইতে লাগিল, তখন শ্রাবকযানেরা বলিল, এ কী ? বুদ্ধ তো এ ধর্ম প্রচার করেন নাই, এরূপ ব্যাখ্যাও তিনি করেন নাই। পালিতে তাঁহার যে-সকল উপদেশ আছে, তাহাতেও তো এ-সকল কথা বলে না। এ একটা নূতন মত প্রচার হইতেছে, ইহা বুদ্ধের মত নহে। তখন মহাযানেরা বলিল, বুদ্ধ ঠিকই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তোমরা বুঝ নাই। বুদ্ধদেব নিজে কী করিয়াছিলেন ? তিনি তো মগধের উদ্ধারের জন্য অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। তোমরা তো তাহা কর নাই, সুতরাং তোমরা তাঁহার কথার মর্ম বুঝ নাই। তোমরা বুদ্ধের অক্ষরার্থ গ্রহণ করিয়াছ, তাঁহার কথার সোজাসুজি মানে করিয়া লইয়াছ, তাহার ভাবার্থ গ্রহণ করিতে পার নাই। তাই তিনি পরের উদ্ধারের জন্য যে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহাই তোমরা আপনার উদ্ধারের পথ বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছ। ইহাতে শ্রাবকযান উত্তর করিল, বা! তা কি কখনো হয়— 'পরার্থে' কি উপদেশ হয় ? উপদেশটা 'স্বার্থে'ই হয়, সেটা 'পরার্থে' গিয়াই দাঁড়ায়। আমি তোমার উদ্ধারের জন্য উপদেশ দিলাম, তুমি উদ্ধার হইলে। আমার এ উপদেশটা কি 'স্বার্থে' উপদেশ হইল ? আমি তো তোমায় উদ্ধার করিয়া দিলাম, 'পরার্থে'ই উপদেশ দিলাম। এইরূপে রামের 'স্বার্থ', হরির 'স্বার্থ', শ্যামের 'স্বার্থ' হইতে হইতে সেই 'স্বার্থ'ই তো 'পরার্থ' হইয়া দাঁড়াইল। তবে তুমি আর 'পরার্থ' 'পরার্থ' বলিয়া একটা কী জাঁক করিতেছ ? মহাযান বলিলেন, আমরা উহাকে 'পরার্থ' বলিতেছি না। তোমার উপদেশ যদি তোমার শিষ্যের স্বার্থের জন্যই হয়, সেটা 'স্বার্থো-পদেশ'ই হইল। তুমি তো আর তোমার শিষ্যকে পরের উদ্ধারের জন্য উপদেশ দিতেছ না। তুমি সকলকেই উপদেশ দিতেছ, বাপু আপনার আপনার পথ দেখো। তুমি তো আর তাহাকে বলিয়া দিতেছ না, বাপু জগৎ উদ্ধার করো। তুমি সম্বোধি পাইলে বটে, কিন্তু 'অনুত্তরসম্বোধি'[৩] তুমি কী করিয়া পাইলে ? যাহার চেয়ে আর বড়ো সম্বোধি নাই, সেই সর্বোচ্চ সম্বোধি তুমি পাইলে কই ?

আর-এক কথা— তুমি তো বাপু আপনার লইয়াই ব্যস্ত ; তোমার

শিষ্যেরাও আপনার লইয়া ব্যস্ত ; তাহার শিষ্যেরাও আপন লইয়াই ব্যস্ত। তোমরা তো সকলেই অর্হৎ হইতে চলিলে, তোমাদের ভিতর বুদ্ধ হইবে কে ? তোমাদের শ্রাবকযান তো কিছুতেই বুদ্ধ হইবার উপায় হইতে পারে না। কারণ তোমরা চাহ অর্হৎ হইতে ; তোমরা বুদ্ধ হইবার উপায় জান না ; তোমরা দুগ্ধ খাইতে চাও কিন্তু গোরুর বাঁট চেন না। শুনিয়াছ গোরু দুহিলেই দুধ হয়, তাই শিং ধরিয়া টানিতেছ— তাহাতে দুধ পাইবে কিরূপে ? তোমরা 'স্বার্থোপদেশ' দিতেছ, তোমরা 'পরার্থোপদেশ' জান না— কেমন করিয়া বুদ্ধ হইবে ? তোমরা মহাযানের মর্ম জান না, তোমরা হীনযানই থাকিবে।

তোমরা অর্হৎ হইতে চাও, 'বোধিসত্ত্ব' কাহাকে বলে তাহা তোমরা জান না। তোমরা জান বুদ্ধ এককালে বোধিসত্ত্ব ছিলেন, আর মৈত্রেয় একজন বোধিসত্ত্ব আছেন, তিনি একদিন বুদ্ধ হইবেন। তোমরা বোধি-সত্ত্ব হইতে চাও না। বোধিসত্ত্ব হইতে গেলে, তাহাকে বুদ্ধ কী উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহা তোমরা জান না, পড় না, হয় তো কেয়ারও কর না। কিন্তু বোধিসত্ত্ব হইবার উপদেশও তো বুদ্ধদেব দিয়া গিয়াছেন। কারণ বোধিসত্ত্ব না হইলে তো একেবারে বুদ্ধ হইবার জো নাই। একথা তো তিনিও বলিয়া গিয়াছেন। সে উপদেশের 'আশয়' অতি উচ্চ ; অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষা অতি উচ্চ ; তাহার উপদেশও অতি উচ্চ ; তাহার জন্য শিক্ষা অতি উচ্চ ; তাহার জন্য সাধনা অতি উচ্চ ; তাহার জন্য যে-সকল সামগ্রী আবশ্যক, তাহা অতি দুর্লভ ; তাহার জন্য কত জন্ম যে সাধনা করিতে হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। তোমাদের কী ? তোমাদের আকাঙ্ক্ষা অতি অল্প, উপদেশ সহজ, সাধনা সহজ, সামগ্রী অল্প ও সুলভ। আর কালের কথা বলিতে চাও— তোমরা তো তিন জন্মেই আপনার কার্যসিদ্ধি করিয়া লইতে পার। এই-সকল কারণেই আমরা তোমাদের 'হীন' বলি। এখন বুঝিয়া দেখো দেখি, তোমরা 'হীন' কিনা ? আর আমাদের আকাঙ্ক্ষা কত বড়ো, আমরা বুদ্ধ হইব ; আমাদের উপদেশ কত বড়ো, আমরা জগৎ উদ্ধার করিবার উপদেশ দিই ; আমাদের সাধনা কত উচ্চ, আমরা একাই জগৎ উদ্ধার করিব, এই আমাদের সাধনা ; আমাদের সামগ্রী ব্রহ্মাণ্ডময়, আর আমরা যত জন্মই যাউক না, আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হইলে

কিছুতেই বিরত হইব না। দেখো দেখি, আমাদের যান মহাযান কিনা ? দেখো দেখি, তোমাতে আমাতে কত তফাত ?

শ্রাবকযান বলিতেছেন— তোমার বুদ্ধবচনের উপর বড়োই আদর দেখিতেছি, কিন্তু বুদ্ধবচন হইতে গেলে 'সূত্রে' তো থাকা চাই, 'বিনয়ে' তো থাকা চাই, 'অভিধর্মে'ও তো থাকা চাই। এই লইয়াই তো 'ত্রিপিটক'।[৪] ত্রিপিটকের বাহিরে তো বুদ্ধবচন নাই। তোমাদের এসব কোথায় ? তোমরা তো বলিয়া বেড়াও কোনো ধর্মেরই 'সত্তা' নাই— 'স্বভাব' নাই। তোমাদের মতে তো সবই অভাব— সবই শূন্য। এ-সকল বুদ্ধবচন হইল কিরূপে ? তাহার উত্তরে মহাযান বলিতেছেন— কেন আমাদের তো শত শত সূত্র রহিয়াছে। এক প্রজ্ঞাপারমিতাই[৫] তো সকল সূত্রের রাজা, তাহার পর আরো কত সূত্র আছে। বিনয়ের কথা বলিতে চাও— বোধিসত্ত্বের বিনয়— সে অতি বড়ো। বিনয়ের উদ্দেশ্য তো ক্লেশনাশ, সমস্ত বিকল্পই ক্লেশ। এই যা-কিছু চারি দিকে দেখিতে পাইতেছি— সমস্তই 'বিকল্প'। যখন 'পরমার্থ সত্য' জানিতে পারিব, সমস্ত বিকল্প নাশ হইয়া যাইবে। যখন নির্বিকল্প হইয়া যাইব, তখনই আমাদের বিনয়ের চূড়ান্ত হইবে। আমাদের 'বিনয়' ছোটোখাটো কথা লইয়া ব্যস্ত থাকে না ; আমাদের বিনয়ের উদারতা ও গম্ভীরতা তোমাদের বিদ্যাবুদ্ধির অতীত। আর অভিধর্মের কথা বলিতেছ— অভিধর্ম তো ধর্ম লইয়া। আমাদের ধর্ম 'অনুত্তরসম্যক্‌সম্বোধি' প্রাপ্তি। সুতরাং আমাদেরও 'সূত্র'ও আছে, 'বিনয়'ও আছে, 'অভিধর্ম'ও আছে।

শ্রাবকযানে সর্বপ্রথম 'ত্রিশরণ'গমন,[৬] তাহার পর 'পঞ্চশীল'গ্রহণ[৭]। এ দুটি জিনিস গৃহস্থরাও করিত, ভিক্ষুরাও করিত। ইহার পর 'অষ্ট-শীল'গ্রহণ অর্থাৎ ঐ পাঁচের উপর আরো তিন, স্রক্‌চন্দনাদি ত্যাগ, রূঢ়বাক্যপ্রয়োগ ত্যাগ, গীতবাদিত্রাদি ত্যাগ। অর্থাৎ ফুলের মালা গলায় দিবে না, চন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্রব্য মাখিবে না, মোটামুটি বিলাসদ্রব্য সব ত্যাগ করিবে। কাহাকেও রূঢ় কথা কহিবে না, কাহাকেও গালাগালি দিবে না, অর্থাৎ জিহ্বা সংযম করিবে এবং গান বাজনা প্রভৃতি করিয়া সময়ক্ষেপ করিবে না। এই যে তিনটি শীল, ইহা খুব উচ্চ ভক্ত গৃহস্থের জন্য। গৃহস্থ ইহার উপর আর যাইতে পারিবে না। ইহার উপর

আর দুটি শীল দিলে দশ শীল হয়। সে দুটি উচ্চাসন-মহাসন-ত্যাগ ও কাঞ্চনত্যাগ অর্থাৎ পয়সা কড়ি হাতে করিবে না। এ দুটি শীল শুধু ভিক্ষুদিগের জন্য, গৃহস্থের ইহাতে অধিকার নাই। এ দশ শীল ছাড়া শ্রাবকযানের আর-একটা বড়ো জিনিস 'পোষধ'ব্রত, অর্থাৎ উপোস করা। দুই অষ্টমীতে, দুই চতুর্দশীতে, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় উপোস করিয়া কেবল ধর্মকথা শুনিবে। সেইদিন গৃহস্থ ও ভিক্ষু সবাই বিহারে আসিয়া ধর্মচর্চা করিবে।

মহাযানে আমরা ত্রিশরণগমনের কথা খুব পাই। শীলরক্ষার কথাও পাই। কিন্তু 'পোষধ'ব্রতের কথা বড়ো একটা পাই না। শীলরক্ষাটা শ্রাবকেরা যত বড়ো বলিয়া মনে করেন, বোধিসত্ত্বেরা তত বড়ো বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের ধর্ম আর-একরূপ ; তাঁহারা 'শরণ'-গমনের পরই কিসে বোধিলাভের জন্য একান্ত আগ্রহ জন্মে, তাহারই চেষ্টা করেন— ইহারই নাম 'চিত্তোৎপাদ' বা 'বোধিচিত্তোৎপাদ'। 'বোধি-চিত্তোৎপাদে'র পর আর-দুইটি কথা শুনিতে পাই— 'পাপদেশনা' ও 'পুণ্যানুমোদনা', অর্থাৎ পাপ কাহাকে বলে তাহার উপদেশ ও পুণ্যের প্রতি আসক্তি। ইহার পর তাঁদের 'ষট্‌পারমিতা'। পারমিতা শব্দের অর্থ লইয়া বড়ো গোলযোগ আছে ; অনেকে ইহার অর্থ করেন 'পারং ইতা' অর্থাৎ যে পারে গিয়াছে অর্থাৎ যে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু আমার মনে হয়, এরূপ ব্যাখ্যা করিলে ব্যাকরণ থাকে না। 'প্রজ্ঞাপার-মিতা' ব্যাকরণদুষ্ট নহে, যেহেতু 'পারমিতা'ও স্ত্রীলিঙ্গ, 'প্রজ্ঞা'ও স্ত্রীলিঙ্গ। কিন্তু 'শীলপারমিতা' কী করিয়া হইবে ? 'শীল' ক্লীবলিঙ্গ, 'পারমিতা' স্ত্রীলিঙ্গ। শীলপারমিতা শব্দটি ব্যাকরণদুষ্ট হইল। যদি বলো বৌদ্ধ-পণ্ডিতেরা ব্যাকরণের বন্ধনের মধ্যে যাইতে চাহেন না, তাহা হইলে এ ব্যাখ্যা চলিতে পারে। কিন্তু আর-এক ব্যাখ্যাও আছে— মিশ্রভাষায় পরমস্য ভাবঃ— 'পারম্যং' শব্দটি 'পারমি' হইয়া যায়। বৌদ্ধ-সংস্কৃতেও 'পারমি' শব্দের অনেক প্রয়োগ আছে। তাহার উপর ভাবে 'তা' করিলে, পারমিতা হয়। অর্থ হয়— পরমের ভাব, সর্বোৎকৃষ্টের ভাব। তাহা হইলে দানপারমিতা, শীলপারমিতা, প্রজ্ঞাপারমিতার অর্থ হয়— সর্বোৎ-কৃষ্ট দানের ভাব, সর্বোৎকৃষ্ট শীলের ভাব ইত্যাদি। ইহাতেও একটু দোষ হয়, উপরি উপরি দু বার ভাব প্রত্যয় হয়— তাহা রীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু

এরূপ প্রয়োগ দু-চারটা দেখা যায়। বোধিসত্ত্বগণ শীলরক্ষার জন্য বড়ো ব্যস্ত হইতেন না, অথবা সেটা তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধই হইয়া যাইত। তাঁহারা শীলের চরম উৎকর্ষ লাভ করিবার চেষ্টা করিতেন। এই জায়গায় মহাযান ও হীনযানে বড়োই তফাত দেখা যায়। হীনযানে 'বিরত' হইবার জন্য প্রতিজ্ঞা হইত, "আমি প্রাণাতিপাত হইতে বিরত হইব, মিথ্যা কথা হইতে বিরত হইব।" বোধিসত্ত্বেরা যেন আপনা আপনিই তাহাতে বিরত ছিলেন— তাঁহারা সেই শীলের কিরূপে চরম উৎকর্ষ লাভ করিতে পারা যায় তাহারই চেষ্টা করিতেন। হীনযানের শিক্ষা নিষেধ-মুখে, মহাযানের উপদেশ বিধিমুখে। হীনযানের যেন জীবনীশক্তি কম, নাই বলিলেই যেন হয়। এটা করিও না, ওটা করিও না— চুপ করিয়া থাকো। মহাযানের এই জীবনীশক্তি বড়ো বেশি। তাঁহাদের একটি পারমিতার নামই 'বীর্য', অর্থাৎ বীরত্ব অর্থাৎ উৎসাহ। শীলরক্ষা করিয়া যাইব, ক্রমে এমন হইয়া উঠিবে যে আমি শীলরক্ষায় সকলের উপর উঠিব এবং অন্যে যাহাতে শীলরক্ষা করিতে বা জিতেন্দ্রিয় হইতে পারে, তাহার উপায় করিয়া দিব। হীনযানে 'বীর্য' শব্দটিই নাই। মহাযানে উহা একটি পারমিতার মধ্যে। শুধু সামান্য উৎসাহ নহে ; এমন উৎসাহ যে উহা হইতে আর বেশি কল্পনা করা যায় না।

শ্রাবকযানে চারিটি ধ্যানের কথা খুব শুনা যায়। চারিটি ধ্যানের নাম পাওয়া যায় না। একটিতে বিতর্ক থাকে, আর-একটিতে থাকে না। একটিতে প্রীতি থাকে আর-একটিতে থাকে না। একটিতে সুখ থাকে আর-একটিতে থাকে না। যাহাতে সুখও থাকে না সেইটিই চরম ধ্যান। তাহার পর ভিক্ষু ক্রমে 'স্রোতাপন্ন', 'সকৃতা-গামী' ও 'অনাগামী' হইয়া পরে অর্হৎ হন। মহাযানে ধ্যানের কথা আছে, এ চারিটি ধ্যানের কথাও আছে, কিন্তু ইহা ছাড়াও অসংখ্য ধ্যান ও সমাধির কথাও আছে। ধ্যান ও সমাধি লইয়া তাঁহাদের অনেক পুস্তক আছে। স্রোতাপন্ন, সকৃতাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ এ-সকল শব্দ মহা-যানে পাওয়া যায় না। ইহার বদলে পাওয়া যায় 'দশ বোধিসত্ত্ব ভূমি'[৮] অর্থাৎ বোধিসত্ত্ব যেমন ধ্যান, ধারণা, দান, শীল, ক্ষান্তি ইত্যাদিতে ক্রমে দক্ষ হইতে থাকেন, তাঁহার মনোবৃত্তি সকলও সেইরূপ ক্রমে উচ্চে উঠিতে থাকে। মানুষের মনোবৃত্তি অনন্ত। প্রথম ভূমিতে কতকগুলি থাকে,

কতকগুলি ত্যাগ করা হয় এবং কতকগুলি প্রবল হইয়া উঠে। দ্বিতীয় ভূমিতে আবার কতকগুলি আসে, প্রথমের কতকগুলি, হয় একেবারে চলিয়া যায়, নয় তো হীনবীর্য হইয়া পড়ে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বোধি-সত্ত্ব দশটি ভূমি অতিক্রম করিলে তবে তিনি নির্বাণপথের যথার্থ পথিক হইতে পারেন। যে করুণার নাম পর্যন্ত শ্রাবকযানে দেখা যায় না, সেটি বোধিসত্ত্বের চিরসহচর, যতই উচ্চ ভূমিতে উঠিবেন ততই করুণা প্রবল হইতে থাকিবে।

পাঁচটি পারমিতায় দক্ষতালাভ করিলে তাহার পর 'প্রজ্ঞাপারমিতা'। 'প্রজ্ঞাপারমিতা'ই আসল পারমিতা। একজন গ্রন্থকার বলিয়াছেন, প্রজ্ঞাপারমিতা ছাড়িয়া দিলে অন্যান্য পারমিতা-সকল পারমিতা নামই লাভ করিতে পারে না। কিন্তু শুধু প্রজ্ঞাপারমিতাও ঠিক নহে। অপর পাঁচের সহিত প্রজ্ঞাপারমিতা মিলিত হইলে পূর্ণ পারমিতা হয়। প্রজ্ঞা-পারমিতার মোট কথা এই যে, সত্য দুই প্রকার— সাংবৃত সত্য ও পরমার্থ সত্য। সাংবৃত সত্য— ব্যাবহারিক সত্য। আমরা চারি দিকে যে-সকল জিনিস দেখিতে পাই সেগুলিকে সত্য বলিয়া ধরিয়া না লইলে ব্যবহার চলে না ; তাই সেগুলিকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়। কিন্তু বিশেষ রূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই যে তাহার একটিও সত্য নহে। পরমার্থ সত্য কখনোই অন্যথা হয় না, সে চিরকালই সত্য থাকে, সেটিকে মহাযানেরা শূন্য বলেন।

হীনযান ত্রিশরণগমনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মহাযানেরও ত্রিশরণ-গমণের ব্যবস্থা আছে। ত্রিশরণগমণের মন্ত্র দুই যানেই এক, তবে মহা-যানে ত্রিরত্ন, বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘ নহে, ধর্ম বুদ্ধ ও সংঘ। বুদ্ধকে প্রথম স্থান হইতে নামাইয়া দ্বিতীয় স্থানে দিবার অর্থ এই যে, মহাযান বুদ্ধ হইতে ধর্মকে প্রধান বলিয়া মনে করেন। মহাযানে শাক্যমুনির অবস্থা একটু শোচনীয়— তিনি একটি 'মানুষী'বুদ্ধ। মানুষীবুদ্ধদের মধ্যেও তাঁহার স্থান সাতের দাগে।[৯] এখনকার মহাযানেরা বলেন যে, হিন্দুদের ব্যাস যেমন সব জিনিস কলমবন্দি করিয়া গিয়াছেন, আমাদের শাক্যসিংহও তেমনি মাত্র কলমবন্দি করিয়া গিয়াছেন। আমাদের মত, আমাদের ধর্ম আদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যাঁহারা মত চালাইয়াছেন, তাঁহারা 'ধ্যানীবুদ্ধ'[১০]। 'অমিতাভ' একজন 'ধ্যানীবুদ্ধ'। মহাযানে

তাঁহার প্রভাব খুব অধিক। জাপানে তাঁহার খুব উপাসনা হয়। বৈরোচন আর-একজন বড়ো 'ধ্যানীবুদ্ধ'। ক্রমে মহাযানেরা শেষ অবস্থায় পাঁচ জন ধ্যানীবুদ্ধ মানিত। নেপালের স্বয়ম্ভুক্ষেত্রে স্বয়ম্ভূচৈত্যের চারি দিকে এই পাঁচ জন ধ্যানীবুদ্ধের মন্দির আছে। সেখানে শাক্যসিংহের স্থান নাই দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তিনি কোথায় ?" আমার সঙ্গে যে বজ্রাচার্য ছিলেন তিনি আমাকে চৈত্য হইতে কিছু দূরে লইয়া গিয়া, পূর্বে নিচু হইতে পাহাড়ে উঠিবার যে পথ ছিল, তাহারই উপরে শাক্যসিংহের প্রতিমা দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, "তিনি এইখানে আছেন, তিনি পঞ্চধ্যানীবুদ্ধের একপ্রকার দ্বারপাল। আমরা তাঁহাকে মানি, যেহেতু তিনি আমাদের সব জিনিস কলমবন্দি করিয়া দিয়াছেন।"

বুদ্ধ অপেক্ষা ধর্ম মহাযানে বড়ো। স্তূপ বা চৈত্যই ধর্ম। সেই চৈত্যের গায়ে পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের মন্দির, সুতরাং ধর্মের সঙ্গে বুদ্ধের কী সম্পর্ক তাহা এইখানেই বুঝা গেল। নেপালের মহাযানদিগের মধ্যে সংঘ বলিতে গেলে এক বিহারে যতগুলি ভিক্ষু থাকে তাহাদিগকে বুঝায় ; কিন্তু উহারা বলে সংঘ ক্রমে বোধিসত্ত্বে পরিণত হইয়াছে।

পূর্বে যাহা ধর্ম বুদ্ধ ও সংঘ ছিল, মহাযান খুব বাড়িয়া উঠিলে তাহাই হইল প্রজ্ঞা উপায় ও বোধিসত্ত্ব। ধর্ম হইলেন প্রজ্ঞা, একথা বুঝানো কঠিন নহে। কারণ বৌদ্ধেরা, বিশেষ মহাযানেরা, ঘোর জ্ঞানবাদী। তাহারা ভাবে জ্ঞানই মুক্তি। ধর্ম যদি জ্ঞান হইলেন, তবে বুদ্ধ কী হইলেন ? তিনি হইলেন— উপায়। তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখিয়া, তাঁহার উপদেশ লইয়া, বাস্তবিক তাঁহাকে উপায় করিয়া, আমরা জ্ঞান পাইতে পারি। প্রজ্ঞা ও উপায় যখন ধর্ম ও বুদ্ধের স্থান অধিকার করিলেন, তখন বিহারবাসী ভিক্ষুরা তো আর সংঘ হইতে পারেন না, তখন সংঘ আর-একটা কিছু উঁচু জিনিস হওয়া চাই। তখন সংঘ হইলেন— বোধিসত্ত্ব।

এইরূপে আমরা হীনযান ও মহাযান যতই তুলনা করি, ততই দেখিতে পাই, ততই আমাদের মনে হয়, যে হীনযান ধর্মনীতি ও সমাজনীতি লইয়া ব্যস্ত, আর মহাযান দার্শনিক মত লইয়া ব্যস্ত ও পারমিতা লইয়া ব্যস্ত। স্বভাবচরিত্র বিশুদ্ধ হইলে, মানুষ পৃথিবীর বস্তু ছাড়িয়া কোনো উচ্চতর বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করিলে নিশ্চয়ই বড়ো হয়। হীনযান

মানুষকে সেইরূপ বড়ো করিবার চেষ্টা করিতেন। কিন্তু মহাযান তাহাতে তৃপ্ত হইতেন না। তাঁহারা মানুষকে সর্বময় সর্বনিয়ন্তা করিবার চেষ্টা করিতেন। দর্শনে তাঁহারা শূন্যবাদী, নীতিতে তাঁহারা করুণাবাদী। তাই তাঁহারা আপনাদিগকে বড়ো বা 'মহা' মনে করিতেন ও শ্রাবক ও প্রত্যেকযানকে 'হীন' বা ছোটো মনে করিতেন।

'নারায়ণ'
আষাঢ়, ১৩২২ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. এই বইয়ের পৃ ২৭৪ সূত্র ৪ দ্র.

২. এই বইয়ের পৃ ২৫৭ সূত্র ১৬ দ্র.

৩. সম্বোধি, সম্যক্‌ বোধি। সম্যক্‌ জ্ঞান। দুঃখ উৎপত্তির কারণ এবং দুঃখ নিরোধের উপায় জানাই বোধি। বোধি লাভের পর বুদ্ধদেব এই উদান গেয়েছিলেন—

অনেকজাতিসংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বসং।
গহকারকং গবেসন্তো দুক্‌খা জাতি পুনপ্পুনং ॥
গহকারক দিট্‌ঠোসি পুন গেহং ন কাহসি।
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসংখিতং।
বিসংখারগতং চিত্তং তণ্‌হানং খয়মজ্‌ঝগা ॥

অনুবাদ: জন্মজন্মান্তর-পথে ফিরিয়াছি, পাইনি সন্ধান
সে কোথা গোপনে আছে, এ গৃহ যে করেছে নির্মাণ।
পুনঃপুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার,
হে গৃহকারক, গৃহ না পারিবি রচিবারে আর;
ভেঙেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহভিত্তিচয়,—
সংস্কারবিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয় ॥

(সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

গৃহ = দেহ; গৃহকারক = তৃষ্ণা; সংসার = বারবার জন্মগ্রহণ; সংস্কার = প্রবৃত্তি; বিসংস্কারগত = প্রবৃত্তিহীন।

প্রাচীন বৌদ্ধ শাস্ত্রে বুদ্ধদেবের বোধি এবং অন্যদের বোধির মধ্যে কোনো প্রভেদ দেখানো হয় নি। সব্বাসবক্‌খয়-ঞাণ, সর্বাস্রবক্ষয় জ্ঞান বা সব দুঃখ-ক্লেশ ক্ষয়ের জ্ঞান যিনিই অর্জন করেন তিনিই অর্হৎ। বুদ্ধদেব প্রথম অর্হৎ। তিনি প্রথম সম্বোধি লাভ করেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে বুদ্ধদেব এবং অন্য অর্হৎদের মধ্যে গুণগত প্রভেদ দেখানো শুরু হয়। মহাযান মতে বোধিসত্ত্ব ধারণা বিকাশের ধারায় আধ্যাত্মিক অগ্রগতির

তিনটি পৃথক স্তর নির্দিষ্ট হয়েছে। ১. অনুত্তর-সম্যক্-সম্বোধি (অনুত্তর অর্থ যার উত্তর বা পর আর কিছু নেই, সর্বোৎকৃষ্ট); ২. প্রত্যেক-বোধি; ৩. শ্রাবক-বোধি। মহাযানে অনুত্তর-সম্যক্-সম্বোধি শ্রেষ্ঠ, কারণ, অনুত্তর-সম্যক্-সম্বোধির অধিকারী অপরের মুক্তির দায়িত্ব মানেন, অপরকে মুক্তিলাভে সহায়তা করেন। প্রত্যেক-বোধি ও শ্রাবক-বোধি শুধুই ব্যক্তিগত মুক্তির জ্ঞান। দ্র. প্রবোধচন্দ্র সেন, 'ধম্মপদ-পরিচয়', বিশ্বভারতী ১৩৬০, পৃ. ৫৮-৫৯।

৪. পিটক অর্থ ভাণ্ড বা ঝুড়ি। বৌদ্ধ পারিভাষিক অর্থ 'পর্যাপ্তভাজন' বা গ্রন্থাধার। সুত্ত, বিনয় ও অভিধম্ম নিয়ে ত্রিপিটক। ত্রিপিটক শব্দে গ্রন্থসমূহ এবং গ্রন্থনিবদ্ধ বিষয় দুই-ই বোঝায়। তিন মূল গ্রন্থাধার অর্থে ত্রিপিটক শব্দের প্রথম ব্যবহার পাওয়া যায় চুলূল বগ্‌গের একটি গাথায়।

আনন্দকে বুদ্ধদেব বলেছিলেন, তোমাদের এমন মনে হতে পারে, শাস্তার প্রবচন বা প্রকৃষ্ট বাণী অতীত হয়ে গেছে, অতএব আমাদের আর শাস্তা নাই। কিন্তু, বিষয়টি এভাবে দেখলে চলবে না। কেননা আমার দ্বারা উপদিষ্ট ও প্রজ্ঞাত ধর্ম ও বিনয়ই আমার অবর্তমানে তোমাদের শাস্তা হবে। বুদ্ধদেবের উক্তি বলে মানা হয় এমন আরো অনেক বিবরণে ধর্ম ও বিনয় কথা দুটি পাওয়া যায়। শব্দ দুটি বুদ্ধের শাসন বা শিক্ষা পদ্ধতি বোঝায়, ক্রমে সেই শিক্ষা সূত্রবদ্ধ যে হয়ে উঠছিল এমন ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। যেমন ভোগ নগরে বুদ্ধদেব ভিক্ষুদের উদ্দেশে বলেছিলেন, কোনো ভিক্ষু যদি এসে এমন বলেন যে এসব কথা স্বয়ং বুদ্ধদেবের মুখ থেকে শুনেছি তাহলে আগ্রহ বা বিরক্তি প্রকাশ না করে তাঁর কথা সূত্র ও বিনয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা উচিত হবে। মিললে ভগবানের বচন বলে মানবে, না মিললে অগ্রাহ্য করবে। ('দীঘ নিকায়' মহাপরিনির্বাণ সূত্রান্ত)। এই উক্তি থেকে মনে হয় বুদ্ধদেব বর্তমান থাকতেই সূত্র ও বিনয় সুসংবদ্ধ হয়ে উঠছিল।

বুদ্ধ-পরিনির্বাণের চতুর্থ মাসে রাজগৃহে বৈভার পাহাড়ের সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান উদ্যোগী মহাকাশ্যপের আহ্বানে ৫০০ অথবা ৫০১ জন ভিক্ষু সমবেত হন। সভাপতি রূপে মহাকাশ্যপ উপালিকে বিনয়-বিষয়ে প্রশ্ন করেন, উপালি যে উত্তর দেন সেইগুলি 'বিনয়-পিটকে' সংকলিত হয়। 'বিনয়-পিটকে'র তিন ভাগ : ১. সুত্তবিভঙ্গ, যার প্রধান অঙ্গ পাটিমোক্‌খ বা প্রাতিমোক্ষ, ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ২২৭টি অনুশাসন; ২. খন্দক, খন্দকের দুই ভাগ— মহাবগ্‌গ ও চুলূলবগ্‌গ; মহাবগ্‌গে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের বিনয় সম্পর্কিত প্রধান বিষয়ের এবং চুলূলবগ্‌গে

গৌণ বিষয়ের বর্ণনা ; ৩. পরিবার পাঠ, বিনয় সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর, সূচি, পরিশিষ্ট ইত্যাদি।

মহাকাশ্যপ আনন্দকে ধর্ম বিষয়ে প্রশ্ন করেন, আনন্দের উত্তরগুলি সংকলিত হয় 'সুত্তপিটক' বা 'সূত্রপিটকে'। 'সুত্তপিটকে'র পাঁচ ভাগ : ১. দীঘ নিকায় বা দীর্ঘ নিকায়, ২. মজ্‌ঝিম নিকায় বা মধ্যম নিকায়, ৩. সংযুত্ত নিকায় বা সংযুক্ত নিকায়, ৪. অঙ্গুত্তর নিকায়, ৫. খুদ্দক নিকায় বা ক্ষুদ্রক নিকায়।

ত্রিপিটকের তৃতীয় অংশ 'অভিধম্মপিটক' মূলত 'সুত্তপিটক' অনুসরণে রচিত। ধর্ম বিষয়ে উপদেশ উপমায়, রূপকে, উপাখ্যানে বিস্তারিতভাবে 'সুত্তপিটকে' বিবৃত হয়েছিল। 'অভিধম্মে' মূল বক্তব্য সংহত ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে এবং পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করে সাজানো হয়েছে। সম্ভবত প্রাচীন বৌদ্ধদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর পৃথক পৃথক 'অভিধম্ম' ছিল। কিন্তু শুধু চীনা ও তিব্বতি অনুবাদে সর্বাস্তিবাদীদের এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার থেরবাদীদের মূল 'অভিধম্ম' পাওয়া গেছে। থেরবাদীরা মনে করেন, বৌদ্ধদর্শনের শ্রেয়তম অংশ 'অভিধর্মপিটকে' সংকলিত আছে। প্রকৃতপক্ষে 'অভিধম্মে' সুশৃঙ্খল ধারাবাহিক দার্শনিক আলোচনা নেই। পারমার্থিক ও নৈতিক উপদেশই প্রধান বিষয়। 'অভিধম্মপিটক' বা অভিধর্মপিটকের অন্তর্গত গ্রন্থ সাত খানি : ১. 'ধম্মসংগণি', ২. 'বিভঙ্গ', ৩. 'কথাবত্থু' বা কথাবস্তু, ৪. 'পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি' বা পুদ্গল প্রশস্তি, ৫. 'ধাতুকথা', ৬. 'যমক', ৭. 'পঠ্‌ঠান' বা প্রস্থান।

৫. এই বইয়ের পৃ. ২৫৮ সূত্র ১৭ দ্র.

৬. বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের আশ্রয় নিচ্ছি— তিনবার এই সংকল্প উচ্চারণ করাকে ত্রিশরণ গ্রহণ বলা হয়। বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সংঘং সরণং গচ্ছামি— বৌদ্ধধর্মের মূল মন্ত্র। বুদ্ধত্ব লাভের পর বুদ্ধদেব বারাণসীর কাছে মৃগদাবে (সারনাথ) প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন। এখানে বুদ্ধদেবের উপদেশ শুনে ৬১ জন অর্হৎ পদ লাভ করেন। বুদ্ধদেব স্থির করলেন এই অর্হতেরা বিভিন্ন দেশে গিয়ে তাঁর ধর্ম প্রচার করবেন। ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে এঁদের উদ্দেশে যে নির্দেশ দিলেন সেখানেই ত্রিশরণের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়।

৭. এই বইয়ের পৃ. ৩১২ সূত্র ২২ দ্র.

৮. প্রথম 'ভূমি' বা দশার নাম 'দুরারোহা', দ্বিতীয় 'বর্ধমানা', তৃতীয়

'পুষ্পমণ্ডিতা', চতুর্থ 'রুচিরা', পঞ্চম 'চিত্তবিস্তরা', ষষ্ঠ 'রূপবতী', সপ্তম 'দুর্জয়া', অষ্টম 'জন্মনিদেশ', নবম 'যৌবরাজ্য', দশম 'অভিষেক'। বোধিসত্ত্বদের ভূমিসমূহ অপরিমেয়, অনেক ও অনন্ত কল্প ব্যাপ্ত। সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞায় বোধিসত্ত্বদের সব সংসার বা প্রত্যেক জন্মকেই ভূমি বা পৃথিবীতুল্য বলে কল্পনা করা হয়। সেইজন্য এর নাম 'ভূমি'। প্রথম ভূমিতে স্থিত বোধিসত্ত্বের আচরণবিধি আটটি : ১. ত্যাগ বা দানশীলতা, ২. করুণা, ৩. অপরিখেদ, ৪. অমান বা অভিমানের অভাব, নম্রতা, ৫. সবশাস্ত্রের অধ্যয়ন, ৬. বিক্রম, ৭. লোকের অনুজ্ঞা বা অনুমতি গ্রহণ, ৮. ধৃতি অর্থাৎ ধৈর্য। ক্রমে নবম ভূমি অতিক্রম করে বোধিসত্ত্ব দশম ভূমিতে উত্তীর্ণ ও পূর্ণসম্পাদন করে মানব জন্ম আকাঙ্ক্ষা করেন এবং অপুনরাবর্তনের জন্য অর্থাৎ এই-ই শেষ জন্ম জেনে মাতৃগর্ভে অবতীর্ণ হন। (মহাবস্তু অবদান)।

৯. 'দীঘ নিকায়'-এর মহাপদান সুত্রান্তে শ্রাবস্তীর জেতবন আরামের করেরি-কুটিরে সমবেত ভিক্ষুদের উদ্দেশে বুদ্ধদেবের মুখে বুদ্ধদেবের আগে আবির্ভূত আরো ছয় জন বুদ্ধের উল্লেখ এবং বিস্তৃত পরিচয় বর্ণনা করা হয়েছে। ভিক্ষুদের উদ্দেশে বুদ্ধদেব বলছেন, এখন থেকে আগের একানব্বই কল্পে বিপস্সী, (বিপশ্যী) একত্রিশ কল্পে শিখী ও বেস্সভূ (বিশ্বভূ) এবং বর্তমান কল্পেককুসন্ধ (ক্রকুচ্ছন্দ), কোণাগমন ও কস্সপ (কশ্যপ) এই ছয় জন বুদ্ধ আবির্ভূত হয়েছিলেন। বুদ্ধদেব এবং পূর্বগামী ছয় বুদ্ধকে নিয়ে সাত জন মানুষীবুদ্ধের কল্পনা বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রচলিত। এ'দের মধ্যে ককুসন্ধ ও কোণাগমন ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মান, অন্য পাঁচ জন ক্ষত্রিয় সন্তান। বুদ্ধদেব প্রচারিত বৌদ্ধধর্মের প্রাচীনতর ঐতিহ্য প্রতিপন্ন করাই পূর্বগামী বুদ্ধদের অস্তিত্ব কল্পনার কারণ। সাত মানুষীবুদ্ধের শক্তি যথাক্রমে বিপশ্যন্তী, শিখিমালিনী, বিশ্বধরা, ককুদ্বতী, কণ্ঠমালিনী, মহীধরা ও যশোধরা এবং এ'দের বোধিসত্ত্ব যথাক্রমে মহামতি, রত্নধর, আকাশগঞ্জ, শকমঙ্গল, কনকরাজ, ধর্মধর এবং আনন্দ।

১০. বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি ও অক্ষোভ্য— এই পাঁচ জন ধ্যানীবুদ্ধ পঞ্চ স্কন্ধের অধিষ্ঠাতা। ধ্যানীবুদ্ধ থেকে বুদ্ধ শক্তির উৎপত্তি এবং বুদ্ধ শক্তি থেকে বোধিসত্ত্বদের উৎপত্তি। পাঁচ ধ্যানীবুদ্ধের শক্তি যথাক্রমে লোচনা বা রোচনা, বজ্রধাত্বীশ্বরী, পাণ্ডরা, তারা ও মামকী। বোধিসত্ত্বেরা কোনো-না-কোনো ধ্যানীবুদ্ধ-কুলের অন্তর্গত। বোধিসত্ত্ব মূর্তির মাথার উপরে কুল-জ্ঞাপক ধ্যানীবুদ্ধের একটি ছোটো মূর্তি দেওয়া হত। বৌদ্ধ মতে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পাঁচটি

উপাদান পুঞ্জ বা স্কন্ধের সমবায়ে পুদ্গল বা ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। ধ্যানীবুদ্ধ কল্পনার ভিত্তি এই পঞ্চস্কন্ধ। ধ্যানীবুদ্ধ কল্পনার উদ্ভব প্রসঙ্গে শাস্ত্রীমশায় লিখেছেন—

"So Buddha taught that man is simply an aggregate of five Skandhas or bunches ; (i) Rūpa, matter ; (ii) Vedana, feeling ; (iii) Saṁjña, conception ; (iv) Saṁskāra, activity and (v) Vijñāna, consciousness. They come together by force of their previous *karma* and form a human being. At death the five separate and go their own way as directed by their *karma.* So there is no Ātmā or soul. The five Skandhas enjoy or suffer according to their *karma*···

"After the full development of the Mahāyānic ideas of Tri-Kāya [ধর্মকায়, সম্ভোগকায়, নির্মাণকায়], of Prajñā, of Karuṇā, and of others there was in the seventh century A.D. a craving among the Buddhists for the representation of these subjective, etherial and metaphysical ideas on canvas and in stones for the edification of those who are not fit for such a hard study as the Mahāyāna required, and so the five Skandhas were represented as the five Dhyānī Buddhas. The phrase Dhyānī Buddha is a misnomer given to those representations by people who did not understand their import. They were neither Buddhas nor were engaged in *Dhyāna* or meditation. They are simply the representations of the absolute form of the five Skandhas." *ADVAYAVAJRASAṀGRAHA,* G-O-S, No. XL, 1927, Introduction pp. xxvii-xxviii.

জাপানে অমিতাভ নামটির সংক্ষেপিত রূপান্তর অমিদ। ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে জাপানে বৌদ্ধধর্ম গৃহীত হয়। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যকালে প্রথম অমিদ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তার পর থেকে ক্রমে সমগ্র জাপানে অমিদর উপাসনা প্রচলিত হয়।

৬. মহাযান কোথা হইতে আসিল

অনেকেই মনে করেন যে নাগার্জুনই[১] মহাযান মত চালাইয়া দেন। তাঁহার 'মাধ্যমকবৃত্তি' মহাযানের প্রথম গ্রন্থ। তিনিই পাতাল হইতে 'প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্র' উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাঁহারই শিষ্য আর্যদেব[২] এই মত চারি দিকে ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। চীনেরা বলে, "আর্যদেব অধ্যাত্ম-বিদ্যার চূড়ান্ত করিয়া গিয়াছেন।" এই দুই জনই মহাযানের আদি-গুরু। কিন্তু বিশেষ করিয়া দেখিলে বোধ হইবে নাগার্জুনের পূর্ব হইতেই মহাযান মত চলিতেছিল। নাগার্জুনের দুই পুরুষ পূর্বে অশ্বঘোষ[৩] 'মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদসূত্র' নামে এক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' ও 'সৌন্দরানন্দ' মহাযান মতে ভরপুর। 'শ্রদ্ধোৎপাদসূত্র' তর্জমা করিতে করিতে জাপানি পণ্ডিত সুজুকি[৪] বলিয়াছেন অশ্বঘোষেরও পূর্বে মহাযান মত চলিত। 'লঙ্কাবতার' প্রভৃতি তিনখানি মহাযানসূত্র অশ্বঘোষের পূর্বেও চলিত ছিল; সুতরাং মহাযানের আদি ঠিক বলিয়া উঠা কঠিন। বৌদ্ধেরা বলে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর প্রায় একশত বৎসর পরে বৌদ্ধ সংঘের মধ্যে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হয়। স্থবিরেরা, বুদ্ধদেব যেরূপ বিনয়ের বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা হইতে একচুল তফাত হইতে চাহিত না, কিন্তু যাহাদের বয়স অল্প, তাহারা অনেক বিষয়ে স্থবিরদিগের মতে চলিত না। বুদ্ধদেবের কঠিন শাসন ছিল। বারোটার পর কেহ আহার করিবে না। তাহারা বলিত এক-আধ ঘণ্টা পরে খাইলে দোষ কী? বুদ্ধদেব ভিক্ষুদিগকে কিছুই সঞ্চয় করিতে দিতেন না। তাহারা বলিত শিংয়ের ভিতর যদি একটু লুন সঞ্চয় করিয়া রাখা হয়, তাহাতে কী দোষ হইতে পারে। এইরূপে দশটি বিষয় লইয়া স্থবিরদিগের সহিত তাহাদের মতের অনৈক্য হয়। এইরূপ অনৈক্য হওয়াতে যাঁহারা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাঁহারা একটি সভা করিয়া এ-সকল বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে চান। বৈশালীতে এক মহাসভা হয়। এই সভায় কিছুই মীমাংসা হইল না, কিন্তু অধিকাংশ বৌদ্ধ স্থবিরের দল হইতে পৃথক হইয়া পড়িল। বৌদ্ধদিগের মধ্যে দুই দল হইল, স্থবিরবাদ বা থেরাবাদ ও মহাসাংঘিক।[৫] একে তো মহা-

সাংঘিকদিগের দলে লোক অধিক ছিল, তার পর আবার তাহাদের বয়স অল্প, উহারা মহা-উৎসাহে আপনাদের মত প্রচার করিতে লাগিল। উহারা প্রথম হইতেই লোকোত্তরবাদী হইল। অর্থাৎ বুদ্ধদেব সামান্য মানুষ ছিলেন না, তিনি অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, তিনি নির্বাণ প্রাপ্ত হইলেও জগৎব্যাপ্ত হইয়া আছেন, যখন তাঁহার মত চলিতেছে, যখন তাঁহার মতে লক্ষ লক্ষ লোক পৃথিবীতে আপনার জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতেছে, আপনাদিগের আচার-ব্যবহার স্থির করিয়া লইতেছে, তখন তিনি শুধু মরিলে কী হইল ? তাঁহার একটা অলৌকিক অনির্বচনীয় অস্তিত্ব আছেই। লোকোত্তরবাদীরা যতই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দার্শনিক মত বাহির করিতে লাগিল, স্থবিরবাদীরা ততই বিনয় সম্বন্ধে বেশি কড়া হইতে লাগিল। দুই দলে যে আর-কখনো মিল হইবে, তাহার আর সম্ভাবনা রহিল না। অশোকরাজার সময়ে পাটলিপুত্রে যে মহাসভা হয়, তাহাতে মহাসাংঘিকেরা কেহই স্থান পায় নাই।[৬] সকল বৌদ্ধেরা সে সভাকে সভা বলিতেই প্রস্তুত নহে। মহাসাংঘিক ও মহাযানদিগের মতে সে সভার কোনো অস্তিত্বই নাই। অশোকরাজা স্থবিরবাদীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সময়ে এই মতই অনেক স্থানে চলিয়া গিয়াছিল। তিনি সিংহলে বৌদ্ধধর্মের অধিক পরিমাণে প্রচার করেন, সুতরাং সিংহলে স্থবিরবাদ চলিয়া যায় ও এখনো চলিতেছে। মগধ ও বাংলায় এই মতেরই লোক অধিক ছিল, কিন্তু ভারতবর্ষের মধ্যভাগে অযোধ্যা, মথুরা প্রভৃতি স্থানে এবং পঞ্জাবে মহাসাংঘিকেরাই প্রবল হইয়া উঠে। ক্রমে এই দুই দলই নানা শাখায় ভাগ হইয়া যায়। স্থবিরবাদের প্রধানত দুই শাখা হয়—'মহীশাসক' ও 'বজ্জিপুত্তক'। মহীশাসকেরা আবার দুই ভাগ হয়—'সর্বত্থবাদী' ও 'ধর্মগুপ্তিক'। সর্বত্থবাদ ক্রমে 'কশ্যপীয়', 'সংকান্তিক' ও 'সুত্তবাদ' হইয়া যায়। 'বজ্জিপুত্তক'দের চারি শাখা হয়— 'ধম্মথানীয়', 'ছন্দাগারিক', 'ভদ্দজানিক' ও 'সম্মতীয়'।

মহাসাংঘিকদিগের দুই দল হয়—'গোকুলিক' ও 'একব্যোহারিক'। গোকুলিকদিগের আবার তিন শাখা হয়—'পণ্ণত্থিবাদ', 'বাহুলিক' ও 'চৌতিয়বাদ'। এতদ্ভিন্ন দেশভেদেও অনেকগুলি শাখা হয়—'হেমবন্ত', 'রাজগিরীয়', 'সিদ্ধথক', 'পূর্বশৈলিয়', 'অপরশৈলিয়', 'বাজিরীয়'। কিন্তু

কী লইয়া যে এই-সকল শাখাভেদ হয় তাহা আমরা এখনো জানিতে পারি নাই।

এই-সকল ভিন্ন শাখার মধ্যেও পরস্পর বিবাদ বিসংবাদ ছিল। বিবাদ বিসংবাদ হইলেই লোকে দুর্বল হইয়া পড়ে। এইরূপ দুর্বল অবস্থাতেই সামবেদী সুঙ্গগোত্রের ব্রাহ্মণেরা অশোকের রাজ্য ধ্বংস করিয়া নূতন রাজ্যস্থাপন করিলেন। তাঁহারা বৈদিক আচারের পক্ষপাতী ছিলেন। প্রথমেই পাটলিপুত্রে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া অশোকের উপর তাঁহাদের যে রাগ ছিল, সে রাগ তুলিলেন। এই বংশের প্রথম রাজা পুষ্যমিত্র, ঘোর বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। তিনি তিন-চারি বার বৌদ্ধদিগকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এখনো অনেক বৌদ্ধ পুষ্যমিত্রের নাম মুখে আনে না, এবং তাঁহার নাম শুনিলে গালি দেয়। অশোকরাজা ব্রাহ্মণবিরোধী ছিলেন। তিনি তাঁহার রাজ্যময় পশুবধ করিয়া যজ্ঞ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, এবং ব্রাহ্মণদিগের ক্ষমতার হ্রাস করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন ; সুতরাং অশোকের দলের উপরই পুষ্যমিত্রের রাগ যে বেশি ছিল, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যায়।[৭] তাহা হইলেই বুঝা যায় স্থবিরবাদীরাই পুষ্যমিত্রের কোপে পড়িয়াছিলেন এবং তাহাদেরই উপর তাঁহার অত্যাচার অধিক হইয়াছিল। বিশেষ আবার তাঁহারাই পুষ্যমিত্রের রাজধানীর নিকট বাস করিতেন। মহাসাংঘিকেরা অনেকে তাঁহার রাজ্যে বাস করিতেন, কিন্তু অধিকাংশই তাঁহার রাজ্যের বাহিরে পঞ্জাব প্রভৃতি যবনদিগের রাজ্যে পড়িয়াছিলেন। একে তো নানা শাখা হওয়ায় বৌদ্ধেরা আপনা-আপনিই দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল, পুষ্যমিত্রের নির্যাতনে তাহাদের দুর্বলতা আরো বাড়িয়া গেল।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে পশ্চিমাঞ্চলে শক, যবন ও পহ্লব প্রভৃতি জাতির রাজত্ব হইল। মহাসাংঘিকেরা সেখানে যাইয়া বিদেশীয় রাজগণকে আপনাদের মতে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল, ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্যও হইল। কিন্তু এরূপ কৃতকার্য হইতে প্রায় দুই শত বৎসর লাগিয়াছিল। নির্যাতন হইলেই আপনার ঘর একটু বাঁধিয়া উঠে। অনেক বৌদ্ধগণ আপনার শাখার অস্তিত্ব ভুলিয়া বৌদ্ধধর্মেরই যাহাতে রক্ষা হয় তাহারই চেষ্টা করিতে থাকে। মহাসাংঘিকেরা

কনিষ্ক রাজার সময় জলন্দরে একটি মহাসভা করে।[৮] সে সভায় স্থবিরবাদীরা বড়ো স্থান পায় নাই। ঐ সভায় তাহারা আপনাদের ধর্মপুস্তক ও তাহার টীকা ও আপনাদের ধর্মমত স্থির করিয়া লন। অনেকে বলেন, এইখানে মহাযান-মতাবলম্বীরা উপস্থিত ছিল, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অল্প ছিল বলিয়া তাহারা বড়ো একটা মাথা তুলিতে পারে নাই। কিন্তু একথা বিশ্বাস হয় না, কারণ কনিষ্করাজার গুরু অশ্বঘোষ নিজেই মহাযানমতের পোষক ছিলেন। আমার বোধ হয় এই সভারই মহাসাংঘিকেরা মহাযানরূপে পরিণত হয়, কারণ মহাসাংঘিক ও মহাযানে অনেক বিষয়ে মতের ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। মহাসাংঘিকেরাও বুদ্ধত্ব লাভের প্রয়াসী ছিল, মহাযানেরাও তাহাই ছিল। মহাসাংঘিকেরা দশভূমি মানিত, ইহারাও দশভূমি মানিত। মহাসাংঘিকেরা উচ্চ দার্শনিক মতের পক্ষপাতী ছিল, মহাযানেরাও তাহাই ছিল। তবে মহাসাংঘিকদিগের মধ্যে বোধিসত্ত্ববাদ তত প্রবল হয় নাই, করুণাবাদের তো নামও শুনিতে পাওয়া যায় না।

আমার মনে হয় মহাসাংঘিকেরাই ক্রমে ক্রমে মহাযান হইয়া দাঁড়ান, কিন্তু 'মহাসাংঘিক' হইতে মহাযান মতে উপস্থিত হইতে তিন শত বৎসর লাগিয়াছিল। এ সম্বন্ধে ঠিক কথা বলিবার জো নাই, কারণ মহাসাংঘিকদিগের একখানি মাত্র পুস্তক পাওয়া গিয়াছে ও প্রকাশিত হইয়াছে ; সেখানি 'মহাবস্তু অবদান'। বইখানিতে লেখা আছে—"আর্য্যমহাসাঙ্ঘিকানাং লোকোত্তরবাদিনাং পাঠেন"— অর্থাৎ লোকোত্তরবাদী মহাসাংঘিকদিগের এই পুস্তক। এইখানি যে কী ভাষায় লেখা, তাহা ঠিক বলিতে পারা যায় না। যে ভাষায় 'ললিতবিস্তরে'র অধ্যায়ের শেষের গাথাগুলি লেখা, এও সেই ভাষায়। যে ভাষায় 'সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকে'র গাথাগুলি লেখা, এও সেই ভাষায়। যে ভাষায় 'শতসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা গুণরত্নসঞ্চয় গাথা' লেখা, এও সেই ভাষায়। মথুরার ছোটো ছোটো শিলালেখগুলি যে ভাষায় লেখা, এও সেই ভাষায়। যে ভাষায় নাসিক, কার্লি প্রভৃতি গুহায় সাতকর্ণি রাজাদের শিলালেখগুলি লেখা, এও সেই ভাষায়। ইহা কতক কতক সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ অনুসারে চলে, কতক কতক সে ব্যাকরণ একেবারে মানে না। রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার নাম দিয়াছেন গাথাভাষা। সিনার সাহেব [E. Senart] এ ভাষার নাম

দিয়াছেন মিক্সড্ সংস্কৃত (mixed Sanskrit)। কেহ কেহ ইহার নাম দিয়াছেন ভারনাকুলারইজড্ সংস্কৃত (vernacularised Sanskrit)। কেহ কেহ ইহার নাম দিয়াছেন স্যানৃস্কৃটাইজড্ ভারনাকুলার Sanskritized vernacular)— যেমন আমাদের পাণ্ডিত বাংলা[৯]। 'কাব্যাদর্শ'কার[১০] ভারতবর্ষে চারি ভাষার উল্লেখ করিয়াছেন— সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও মিশ্র ; কিন্তু তিনি মিশ্র ভাষার উদাহরণ দিয়াছেন— "মিশ্রন্তু নাটকাদিকং"। তাঁহার এ উদাহরণটি ঠিক হয় নাই, কারণ তিনি ভাষার উদাহরণ দিতে গিয়া সাহিত্যের উদাহরণ দিয়াছেন। আমার বোধ হয়, তিনি যখন লিখিয়াছিলেন, তখন একটি প্রাচীন কারিকায় ভাষাগুলির নাম পাইয়াছিলেন, সেই কারিকাটি তুলিয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সময় মিশ্রভাষা চলিত না, তাই "মিশ্রন্তু নাটকাদিকং" বলিয়া একটা যা তা উদাহরণ দিয়া গিয়াছেন। 'মহাবস্তু অবদানে'র ভাষা বাস্তবিকই মিশ্রভাষা। এ ভাষায় "বাস্তু" "বস্তু" হইয়া যায়, তাই যেখানে অশ্বঘোষ কপিলবাস্তু লিখিয়াছেন, সেখানে 'মহাবস্তু অবদানে' "কপিলবস্তু" লেখা আছে। এরূপ সংস্কৃতকে বাঁকাইয়া ফেলা বাংলায় বিরল নহে, যেমন আমাদের বাংলা ভাষায় "সমভিব্যাহার" শব্দ "সমিভ্যার" হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা আমাদের ইতিহাস অনুসন্ধান করেন, তাঁহাদের বিশেষ করিয়া এই ভাষাটির আলোচনা করা উচিত।

মহাসাংঘিক হইতে কেমন করিয়া মহাযান হইল, তাহা জানার এই একখানি বৈ আর পুস্তক নাই। কনিষ্কের সময় যে-সকল পুস্তক লেখা হইয়াছিল, তাহার একখানিও এখনো পাওয়া যায় নাই। চীনে তাহার কয়েকখানা পুস্তকের তর্জমা আছে। শুনিয়াছি সকৃডিয়ানায়[১১] মহা-সাংঘিকদিগের এক শাখা চলিত, শুনিয়াছি মধ্য-এশিয়ায় মহাসাংঘিক-দিগের আর-এক শাখার মত চলিত, কিন্তু তাহারো কোনো পুস্তক এ পর্যন্ত চক্ষে পড়ে নাই। 'মহাবস্তু অবদানে'র পর এবং নাগার্জুনের পূর্বে যত পুস্তক রচনা হইয়াছিল তাহার মধ্যে আমরা 'লঙ্কাবতার সূত্র' দেখিতে পাই, আর অশ্বঘোষের তিন-চারিখানি পুস্তক দেখিতে পাই। ইহাতেই দেখা যায় যে মহাযানের মূল মতগুলি ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে। 'মহাবস্তু অবদানে' দশভূমির কথা আছে, বুদ্ধত্ব লাভেরও কথা আছে, কিন্তু বোধিসত্ত্ববাদ নাই। 'লঙ্কাবতারে' বোধিসত্ত্ববাদ

সামান্যভাবে আছে। অশ্বঘোষের 'সৌন্দরানন্দে' আছে, "তোমার নিজের উদ্ধার হইলেই নিশ্চিন্ত থাকিও না, পরকেও উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিবে। তোমার কৃত্য সমাপ্ত হইয়াছে, তুমি অপরকে উদ্ধার করো" ইত্যাদি। এ-সকলেই আমরা মহাযান মতের মূল দেখিতে পাইতেছি। 'লঙ্কাবতারে' কথা তুলিয়াছে "তথাগত" কি অবিনশ্বর?

অনেকে মনে করেন, হিন্দু ও বৌদ্ধদিগকে মিলাইবার জন্য নাগার্জুন মহাযানমতের সৃষ্টি করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, বুদ্ধদেবের পর কোনো মহাপ্রতিভাশালী ব্যক্তি 'ভগবদ্গীতা' রচনা করেন। 'ভগবদ্গীতা'র মত মহাসাংঘিকদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মহাযান হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এরূপ মনে করিবার কোনো কারণ নাই, বরং ইহার বিরুদ্ধ মতের অনেক প্রমাণ আছে। একথাটি বুঝাইতে গেলে একটু বাজে কথার দরকার এবং সে বাজে কথা কহার দরুণ কেহ যেন কিছু মনে না করেন।

নেপালিরা বলে ধর্ম দুই প্রকার হইতে পারে। খাঁটি ধর্ম দু রকম ছাড়া তিন রকম হইতে পারে না। সেই দুই প্রকার ধর্ম— ১. দেবভাজু ২. গুভাজু। হয় দেবতাকে ভজনা করো, না হয় গুরুকে ভজনা করো। ব্রাহ্মণেরা দেবভাজু, বৌদ্ধেরা গুভাজু, সুতরাং বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম কিছুতেই মিশিতে পারে না। বৌদ্ধধর্মের শ্রাবকযান ও প্রত্যেকযান দুই-ই গুভাজু, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। মহাযানও সম্পূর্ণরূপে গুভাজু, তাহারা বুদ্ধকেই মানে, বুদ্ধই তাহাদের গুরু, বুদ্ধকেই তাহারা মুক্তির উপায় বলিয়া মনে করে, কোনো দেবতাকেই তাহারা উপাসনা করে না, তবে তাহাদিগকে হিন্দু ও বৌদ্ধের সামঞ্জস্য বলিয়া কেমন করিয়া মনে করিব? বরঞ্চ হীনযানে সময়ে সময়ে ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি করিতে বলে, কিন্তু মহাযানে সেটুকু বড়ো দেখা যায় না। একজন আচার্য তাঁহার এক সেবককে ভিক্ষু করিবার জন্য বড়োই চেষ্টা করিতেন। সেবক বলিত, "মহাশয়, আমার এখনো সময় হয় নাই।" কিছুদিন পরে সে আসিয়া বলিল, "আচার্য মহাশয়, আমার আর ভিক্ষু হইবার দরকার নাই, আমি একেবারে বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছি।" আচার্য বলিলেন, "কিসে এমন হইল?" সে বলিল, "এখন ব্রাহ্মণ দেখিলেই ইচ্ছা হয় ইহাকে খুন করিয়া ফেলি।" আচার্য বলিলেন, "তবে ঠিকই হইয়াছে।" ইহার উপরেও কি বলিব, যে মহাযান হিন্দু ও বৌদ্ধের সামঞ্জস্য মাত্র। তবে এক কথা— একদেশে

যদি দুই-তিন ধর্মের লোক থাকে, তবে তাহাদের আচার ব্যবহার ক্রমে কতকটা এক হইয়া যায়। আমাদের দেখাদেখি ভদ্রঘরের মুসলমানের মেয়েরা বিধবা হইলে আর বিবাহ করিতে চায় না, মুসলমানের দেখাদেখি আমরাও পীরের শিরনি দিই। ফিরিঙ্গিরা কালীর কাছে মানত করে। এই মানতের দৌলতে কলিকাতার বহুবাজার স্ট্রিটে ফিরিঙ্গি-কালীর মন্দিরে মার্বেলের মেজে হইয়া গিয়াছে। এ-সকল গৃহস্থের মধ্যে চলিতে পারে ; কিন্তু যাহারা ধর্মের কর্তা তাদের ভিতর এসব করিলে চলে না। তাহাদের আপন আপন ধর্মের মত ঠিক মানিয়া চলিতে হয়, নহিলে গৃহস্থেরা তাহাকে মানিবে কেন ?— তাহার কথাই বা শুনিবে কেন ?

মহাযানের কিন্তু বাহাদুরি আছে। যতদিন মহাসাংঘিক ছিল, ততদিন তাহাদের মধ্যে নানারূপ মতভেদ ছিল, আর পরস্পর বেশ রেষারেষিও ছিল, কিন্তু মহাযানের পর সেটা আর বড়ো দেখা যায় না। সবাই আপনাকে মহাযান বলিয়া পরিচয় দিতেই ব্যগ্র হয়। শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ মহাযানের দুইটা প্রকাণ্ড দার্শনিক মত, কিন্তু উভয়ই মহাযান এবং মহাযান বলিয়া উভয়েই স্পর্ধা করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে যে অন্য কোনো বিষয় লইয়া দলাদলি আছে তাহা বোধ হয় না। আর মহাযান হইতে এই যে মন্ত্রযান, বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান প্রভৃতি নানা যানের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারাও সকলে আপনাদিগকে মহাযান বলিয়াই স্পর্ধা করিয়া থাকে। এরূপ হইবার কারণ কী ? আমার বোধ হয় মহাযানধর্মের উদারতাই ইহার কারণ। জগৎ উদ্ধারই আমাদের উদ্দেশ্য। যে যে-প্রকারই করুক না কেন, তাহাতে আমাদের বৃদ্ধি বৈ ক্ষতি নাই। সুতরাং আমাদের পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ কেন ? জগৎ একটা প্রকাণ্ড বস্তু, একা কিছু উদ্ধার করা যায় না। সুতরাং তুমি যাহা করিলে, সেও আমার কার্য, আমি যাহা করিলাম, সেও তোমার কার্য। তাহা লইয়া তোমায় আমায় ঝগড়া হইবে কেন ?

মহাযান কোথা হইতে আসিল ইহার উত্তর এই যে, মহাসাংঘিকেরাই ক্রমে মহাযান হইয়া গিয়াছে ; ব্রাহ্মণ্যধর্মের সহিত উহার কোনো বিশেষ সম্বন্ধ নাই ; ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধের সামঞ্জস্য করিবার জন্য মহাযানের সৃষ্টি

হয় নাই ; মহাযানের উদ্দেশ্য মহৎ, উহা সকল ধর্মকেই আপনার ক্রোড়ে টানিয়া লইতে পারে ।

'নারায়ণ'
শ্রাবণ, ১৩২২ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. মাধ্যমিক দর্শনের প্রবর্তক নাগার্জুন খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতকে বর্তমান ছিলেন। বিদর্ভের (বেরার) কোনো ব্রাহ্মণ বংশে তাঁর জন্ম। অন্ধ্র দেশের রাজা সাতবাহনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। নাগার্জুনের রচনায় ব্রাহ্মণ্য চিন্তার সঙ্গে গভীর পরিচয়ের নিদর্শন থেকে বোঝা যায়, বৌদ্ধ মতবাদ আশ্রয় করার আগে তিনি চতুর্বেদ ও আনুষঙ্গিক শাস্ত্রে পারংগম হয়েছিলেন।[১] চীনা ভাষায় কুমারজীব অনূদিত নাগার্জুনের জীবনচরিতে বলা হয়েছে, মাত্র ৯০ দিনে তিনি সমগ্র 'ত্রিপিটক' আয়ত্ত করেছিলেন। ঐ জীবনীগ্রন্থে এবং তিব্বতি বিবরণে তাঁকে একজন অসাধারণ জাদুকর বলা হয়েছে। তাঁকে নানা অলৌকিক শক্তির অধিকারী মনে করার মূলে আছে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বিস্ময় বোধ। নাগার্জুনের প্রধান রচনা, মাধ্যমিক দর্শনের মূল গ্রন্থ 'মাধ্যমিক-কারিকা' ৪০০ শ্লোকে সম্পূর্ণ। 'অকুতোভয়া' নামে তিনি এর একখানি টীকা লিখেছিলেন। অন্যান্য রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'শূন্যতাসপ্ততি', 'যুক্তিষষ্টিকা', 'বিগ্রহব্যাবর্তনী', 'বৈদল্যসূত্র' ও 'ব্যবহারসিদ্ধি'। নাগা-র্জুনের মূল রচনা পাওয়া যায় নি, চীনা ও তিব্বতি অনুবাদ থেকে তাঁর দার্শনিক মতবাদ সংগ্রহ করা হয়েছে।

নাগার্জুনের আগে বৌদ্ধ দর্শনে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক মতবাদের উদ্ভব হয়েছিল। বৈভাষিক দর্শনের ভিত্তি 'বিভাষা' নামে 'অভিধম্মে'র টীকা। সৌত্রান্তিক দর্শনের ভিত্তি সূত্রগ্রন্থ। বৈভাষিকেরা "ধর্ম" অর্থাৎ স্বলক্ষণযুক্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। সৌত্রান্তিক মতে "ধর্ম" শূন্য-স্বভাব, অলীক। নাগার্জুন এই দুই চরম মতবাদের কোনোটিই গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। তাঁর মতে অস্তি ও নাস্তির চরম অবস্থান থেকে পরমার্থ সত্যের ব্যাখ্যা করা যায় না। তিনি বুদ্ধদেবের মধ্যমা প্রতিপদ বা মধ্যপথ অবলম্বনের উপদেশ আশ্রয় করে নিজের তত্ত্বপ্রস্থান গঠন করেন। মাধ্যমিক দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য শূন্যতা। নাগার্জুন প্রতিপন্ন করেছেন, "ধর্ম" বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশ কিছুই প্রমাণ করা যায় না। "ধর্মের" উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশ যেমন নেই,

তেমনি ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ ব্যাপী কালপ্রবাহও নেই। হীনযান মতে বলা হয় পুদ্‌গল বা ব্যক্তিত্ব না থাকলেও ধর্ম আছে। বেদান্ত মতে আত্মা আছে কিন্তু কর্মজগৎ নেই। কর্তা নেই অথচ কর্ম আছে, কর্ম নেই অথচ কর্তা আছে— নাগার্জুনের মতে দুটি ধারণাই অযৌক্তিক। তিনি বলেন— কর্তা বা কর্ম, পুদ্‌গল বা ধর্ম কিছুরই অস্তিত্ব নেই, আছে শুধু তার আভাস। আভাসের উৎপত্তির হেতু প্রতীত্যসমুৎপাদ বা "অবিদ্যা" থেকে "সংস্কার", সংস্কার থেকে "বিজ্ঞান", বিজ্ঞান থেকে "নামরূপ", নামরূপ (পুদ্‌গল) থেকে "ষড়ায়তন" (চোখ-কান-শ্রোত্র-ঘ্রাণ-জিব-কায়-মন— এই ৬ ইন্দ্রিয়), ষড়ায়তন থেকে "স্পর্শ", স্পর্শ থেকে "বেদনা" (অনুভূতি), বেদনা থেকে "তৃষ্ণা" (কাম- রূপ- অরূপ তৃষ্ণা), তৃষ্ণা থেকে "উপাদান", উপাদান থেকে "ভব" (জন্মাকাঙ্ক্ষার কারণ), ভব থেকে "জাতি" (জন্মান্তর) এবং জাতি থেকে "জরামরণ"— এই এক কারণ থেকে অন্য কারণ উৎপত্তির নিয়ম। আভাস সর্বদাই ব্যাবহারিক, অন্যসাপেক্ষ। সাপেক্ষ পদার্থমাত্রেই মিথ্যা। শূন্যতা একমাত্র পারমার্থিক সত্য। প্রশ্ন উঠতে পারে, উৎপত্তি-বিলয় যদি না থাকে তাহলে এমন-কি বুদ্ধদেব প্রচারিত ধর্ম, সংঘ বা স্বয়ং বুদ্ধও মিথ্যা। নাগার্জুন ব্যাবহারিক সত্য এবং পারমার্থিক সত্য— দুই তত্ত্বের সাহায্যে এই সংশয় নিরসন করেছেন। দেখিয়েছেন, বুদ্ধ-বচনের মধ্যেই ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক সত্যের ইঙ্গিত আছে। ব্যাবহারিক দিক থেকে জন্ম-জরা-মৃত্যু, দুঃখ, সংসার, কর্ম, কর্মফল সবই আছে। কিন্তু পারমার্থিক দিক থেকে এর কিছুই নেই। স্বভাব-শূন্যতা একমাত্র সত্য।

নাগার্জুন অসাধারণ নৈয়ায়িক। তাঁর বিচার-পদ্ধতি দ্বন্দ্ব মূলক। অস্তি এবং নাস্তি— এই দুই চরম অবস্থানের সঙ্গে নাগার্জুন আরো দুটি বিকল্প অবস্থান যোগ করেছেন : আছে এবং নেই, আছে এমনও নয় আবার নেই এমনও নয়। এই চারটি বিকল্পকে তিনি বলেন "চতুষ্কোটি"। কোনো সমস্যা বিবেচনায় যত দৃষ্টিকোণ ভাবা সম্ভব, সবই এই চতুষ্কোটির মধ্যে পড়বে। নাগার্জুন পারমার্থিক সত্য প্রমাণের জন্য দ্বন্দ্বময় বিকল্পগুলির সমন্বয়ের চেষ্টা করেন নি। প্রত্যেক মত বা দৃষ্টিকে তারই বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে সেই মতের অসংগতি উদ্‌ঘাটন করেছেন। দেখিয়েছেন, পারমার্থিক সত্য স্বভাব-শূন্যতা "চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত"। সমস্ত বিতর্কের ঊর্ধ্বে।

২. এই বইয়ের পৃ. ৩০৩ সূত্র ৫ দ্র.

৩. এই বইয়ের পৃ. ২৫৯ সূত্র ১৯ দ্র.

৪. Daisetz Teitaro Suzuki, *Asvaghosha's discourse on the Awakening of Faith in the Mahayana*, 1900.

৫. এই বইয়ের পৃ. ২৮১ সূত্র ১ দ্র.

৬. 'দীপবংস', 'মহাবংস', 'মহাবোধিবংস', 'সাসনবংস', 'সদ্ধম্মসঙ্গহ' প্রভৃতি স্থবিরবাদী শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, অশোকের রাজত্বের (খৃ. পূ. আ. ২৭৩-৩২) অষ্টাদশ বর্ষে এক সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এটি তৃতীয় বৌদ্ধ-সংগীতি। এই সময়ে বৌদ্ধ-সংঘে প্রবেশ করলে রাজ-পোষকতা পাওয়া সহজ হওয়ায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন মতাবলম্বীরাও সংঘে যোগ দেয়। ফলে সংঘের নীতি-নিয়ম বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সংঘনায়ক মোগ্‌গলীপুত্ত তিস্‌স, মৌদ্‌গলীপুত্র তিষ্য বিরক্ত হয়ে পাটলিপুত্রের অশোকারাম ছেড়ে গিয়ে অহোগঙ্গ পর্বতে আশ্রয় নেন। সাত বছর পরে অশোক তাঁকে আবার ফিরিয়ে এনে তাঁর সাহায্যে সংঘে শৃঙ্খলা এবং বিনয়-বিধি প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। স্থবিরবাদের শুদ্ধতা ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে একটি বিচার সভার আয়োজন হয়। পরে ১000 নির্বাচিত ভিক্ষু-প্রতিনিধিদের নিয়ে তিস্‌সর সভাপতিত্বে সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। এই সংগীতির কাজ চলে নয় মাস ধরে। সারনাথে পাওয়া একটি স্তম্ভ লিপিতে সংঘ-ভেদ রোধে অশোকের উদ্যোগের উল্লেখ আছে। বিচারসভায় পাঁচ শো বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করা হয়েছিল। বিচারের বিবরণ 'কথাবথ্‌থু', 'কথাবস্তু' নামক অভিধর্ম-প্রকরণে সংকলিত আছে। সূত্র এবং বিনয় সংশোধন তৃতীয় সংগীতির উদ্দেশ্য ছিল। এই সময়ে 'ত্রিপিটক' পূর্ণাঙ্গ করে তোলা হয়েছিল মনে করা হয়। তৃতীয় সংগীতির পরে মোগ্‌গলীপুত্ত তিস্‌স কাশ্মীর-গান্ধার, মহিষমণ্ডল, বনবাসী, অপরান্ত, যবনলোক, হিমালয় প্রদেশ, সুবর্ণভূমি, লঙ্কাদ্বীপ—এই প্রত্যন্ত জনপদগুলিতে স্থবিরবাদী বৌদ্ধমত প্রচারের জন্য নয় জন স্থবিরকে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। লঙ্কায় গিয়েছিলেন অশোকের ভাই, মতান্তরে ছেলে মহেন্দ্র। দ্র. Haraprasad Shastri, "Chips from a Buddhist Workshop", *The Buddhistic Studies*, Chapter xxxiv, pp. 818-58.

৭. অশোক ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী ছিলেন এবং ব্রাহ্মণদের অসন্তোষ ও বৌদ্ধ-বিরোধী মনোভাব মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণ, "Causes of the Dismemberment of the Maurya Empire" প্রবন্ধে শাস্ত্রী-মশায় এই মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, পশুবলি নিষেধ, জাতিধর্ম

নির্বিশেষে দণ্ড-সমতা ও ব্যবহার-সমতা নীতি প্রয়োগ, ধর্মমহামাত্র নিয়োগের ফলে কর্তৃত্ব লোপ— প্রভৃতি কারণে ব্রাহ্মণরা অশোকের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করতেন। অশোকের কঠোর শাসন যতদিন ছিল ততদিন তাঁরা অসম্মান সহ্য করেন, কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকারী সম্রাটদের বিরুদ্ধে মাথা তোলেন। "They began to cast their eyes for a military man to fight for them. And they found such a man in Puṣya Mittra, the Commander-in-Chief of the Maurya empire....He was a Brahminist to the core and hated the Buddhists. At first he led the Maurya armies against the Greeks, who advanced year after year to the very heart of the Maurya empire. After a successful campaign, he returned to Pāṭaliputra with his victorious army, and the feeble representative of Aśoka on the throne accorded him a fitting reception. A camp was formed outside the city and a review was held of a large army. In the midst of the festivities an arrow struck the king on the forehead. The king expired instantly. The Maurya empire was gone and Puṣya Mittra became the master of the situation, and we read in the *Mālavikāgnimittra* that he remained with his army at Pāṭaliputra and made his son king of Vidiśā. We clearly see the hands of Brāhmaṇas in this great revolution. For, shortly after the revolution, Puṣya Mittra planned a horse sacrifice at Pāṭaliputra, the very capital of Aśoka, who prohibited the slaughter of animals throughout his empire. Does not this show the Brāhmaṇas triumphant? Vasumittra, his grandson, was appointed to guard the horse in its unrestrained career through his empire. His mother, the queen of Agnimittra, invoked the blessings of Brāhmaṇas for her son, and she arranged for the distribution of 800 gold money a month to विद्याचार्येभ्यो ब्राह्मणेभ्यः। Eight hundred gold money a month is a very respectable educational

grant. In some Buddhist books Puṣya Mittra is regarded as a persecutor of Buddhism. In fact, he was entirely in the hands of Brāhmaṇas, and in two generations, the Brāhmaṇas not ony made themselves actual masters of the Maurya empire as it then stood, but spread their influence far and wide, gave a new turn to Buddhist and Jaina religions, compiled and codified all branches of knowledge then known, and gave a turn to Brahmanism which it has not lost ever since." (*J-A-S-B*, N-S, Vol. vi, May 1910, pp. 260-61).

দু বছর পরে "Who were the Suṅgas" নিবন্ধে শাস্ত্রীমশায় আবার লেখেন, "In,a paper contributed by me on the *Dismemberment of the Maurya Empire* I advanced a theory that they were of Pėrsian origin from the fact that the names of the kings of this dynasty ended with the word 'Mitra', a favourite deity of the Persians. I have now got some facts for the identification of the family. In page 312 of the *Lātyāyana Śrauta Sūtra* there is a sūtra in which the opinion of the Śungas are cited in support of the author. A commentator, in explaining the word 'Śuṅga', says 'Śuṅgāḥ Acāryya', that is, the Śuṅgas were Ācāryyas or teachers of the *Sāma Veda*. (*J-A-S-B*, N-S, Vol. viii, July 1912, pp. 287).

"Causes of the Dismemberment of the Maurya Empire" প্রবন্ধটি থেকে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণ সম্পর্কে ধারাবাহিক গবেষণার সূত্রপাত হয়। পরবর্তী গবেষকেরা শিলালিপির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও অন্যান্য সূত্র থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে শাস্ত্রী-মশায়ের যুক্তি ও সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। অশোক তাঁর সাম্রাজ্যের সর্বত্র সব ধরনের পশুহত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন এমন প্রমাণ নেই। বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিচারের নীতি অভিন্ন হওয়া কাম্য বিবেচনা করে অশোক "জনপদ হিতসুখায়ে" নিযুক্ত "রাজুক" স্তরের প্রশাসকদের উদ্দেশে "ব্যবহার-সমতা" ও "দণ্ড-সমতা" নীতি মেনে চলার

নির্দেশ দেন। ব্রাহ্মণদের মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পাবার অধিকার হরণ এ নির্দেশের উদ্দেশ্য ছিল না। বিশেষত, প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণরা যে এমন কোনো বিশেষ অধিকার ভোগ করতেন না— তার প্রমাণ পাওয়া যায়। কোনো কোনো শিলালিপিতে বিশেষভাবে ব্রাহ্মণদের প্রতি দুর্ব্যবহার নিষেধ করা হয়েছে, ব্রাহ্মণদের স্বার্থ দেখবার জন্য ধর্মমহামাত্র নিয়োগের উল্লেখও পাওয়া যায়।

শেষ মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথ নিহত হলে তাঁর প্রধান সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গবংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন এবং আনুমানিক ১৮৭-১৫১ খৃস্ট-পূর্বাব্দ পর্যন্ত ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন। শুঙ্গরা পশ্চিম ভারতের উজ্জয়িনী অঞ্চলের সামবেদী ব্রাহ্মণ।

বৌদ্ধ সাহিত্যে পুষ্যমিত্রকে বৌদ্ধ-বিদ্বেষী বলা হয়েছে। বলা হয়েছে অশোক ৮৪,০০০ স্তূপ নির্মাণ করে বিখ্যাত হয়েছিলেন, পুষ্যমিত্র এই ৮৪,০০০ স্তূপ ধ্বংস করে বিখ্যাত হতে চেয়েছিলেন। এইসব উক্তির সত্যতা বিষয়ে সংশয়ের কারণ আছে। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ থেকে জানা যায় শুঙ্গ রাজত্বে স্তূপ সংস্কার এবং উপযুক্ত রক্ষণা-বেক্ষণের ব্যবস্থা করা হত। যেমন, এই সময়েই সাঁচি স্তূপটি বড়ো করা হয় এবং ঘিরে রাখার ব্যবস্থা হয়। পুষ্যমিত্রের নাতি, অগ্নিমিত্রের ছেলে বসুমিত্র গ্রীক আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। এইজন্য পুষ্যমিত্র দু বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। অশোকের উপরে রাগ অশ্বমেধ যজ্ঞের কারণ নয়। দ্র. Romila Thapar, *Aśoka and the Decline of the Mauryas*, OUP Paper Back 1973, pp. 197-212; Debala Mitra, *Buddhist Monuments*, Calcutta 1971, pp. 24-26.

৮. কুষাণ রাজা কনিষ্কের রাজত্বকাল সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা একমত নন। ৭৮ থেকে ১৪৪ খৃস্টাব্দের মধ্যে কোনো সময়ে তাঁর রাজত্ব শুরু হয়েছিল। তাঁর রাজধানী ছিল পুরুষপুরে (পেশোয়ার)। বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক কনিষ্ক ১৮টি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশে চতুর্থ বৌদ্ধ-মহাসংগীতি আহ্বান করেন। তিব্বতের ঐতিহাসিক বু-তোন, Bu-Ston-এর বিবরণ অনুযায়ী ১৮টি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের পূর্বশৈল, অপরশৈল, হৈমবত, লোকোত্তরবাদী ও প্রজ্ঞপ্তিবাদী— মহাসাংঘিক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত; মূল সর্বাস্তিবাদী, কাশ্যপীয়, মহীশাসক, ধর্মগুপ্ত, বাহুশ্রুতীয়, তাম্রচৈতীয় ও বিভজ্যবাদী— সর্বাস্তিবাদী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত; জেতবনীয়, অভয়গিরিবাসী ও মহাস্থবির— স্থবির সম্প্রদায়ের অন্তর্গত; কুরুকুল্লক, অবন্তক ও বাৎসীয়পুত্রীয়— সম্মিতীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্গত;

বিভিন্ন গ্রন্থে সম্প্রদায়গুলির নাম এবং শ্রেণীবিভাগে ভিন্নতা দেখা যায়। আনুমানিক ১০০ খৃস্টাব্দে জালন্ধরে, মতান্তরে কাশ্মীরের কুণ্ডল-বন-বিহারে চতুর্থ মহাসংগীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সভাপতিত্ব করেন আচার্য বসুবন্ধু। চীনা ও তিব্বতি বিবরণ অনুযায়ী 'ত্রিপিটক' বিষয়ে পারঙ্গম ৫০০ নির্বাচিত স্থবির এই সংগীতিতে যোগ দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন মহাসাংঘিক। থেরবাদীরা সম্ভবত চতুর্থ সংগীতিতে যোগ দেন নি। কোনো থেরবাদী গ্রন্থে চতুর্থ সংগীতির উল্লেখ পাওয়া যায় না। হিউয়েন্-ৎসাঙ লিখেছেন, তিনটি পিটকের প্রত্যেকটির উপরে এক লক্ষ শ্লোকে টীকা রচিত হলে অশ্বঘোষ সংশোধন করে এই 'অট্‌ঠকথা', অর্থকথার চূড়ান্ত রূপ দেন। 'অট্‌ঠকথা' সংগ্রহকে বিভাষা-শাস্ত্র বলা হয়। তামার পাতে 'ত্রিপিটক' এবং প্রস্তুত 'অট্‌ঠকথা' খোদাই করিয়ে পাথরের আধারে মাটির নিচে পুতে রাখা হয়। কনিষ্ক তার উপরে একটি স্তূপ প্রতিষ্ঠা করেন। শাস্ত্র এবং শাস্ত্রের গৃহীত ব্যাখ্যায় বিকৃতি রোধ করার জন্য এই ব্যবস্থা হয়েছিল। তামার পাতে খোদাই করা লেখা অবশ্য এখনো পাওয়া যায় নি। সম্ভবত সংস্কৃতে বিভাষা-শাস্ত্র রচিত হয়েছিল এবং এই সময় থেকে সংস্কৃত ভাষা বৌদ্ধ-বিদ্যার বাহন হয়ে ওঠে।

৯. এই বইয়ের পৃ. ২৫৪ সূত্র ১১ দ্র.

১০. দণ্ডী রচিত অলংকারশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'কাব্যাদর্শ'। দণ্ডী আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীর শেষ দিকে বর্তমান ছিলেন। 'কাব্যাদর্শ' তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। আলোচিত বিষয় কাব্যলক্ষণ, বৈদর্ভী ও গৌড়ী রীতি এবং শ্লেষ-প্রসাদ-সমতা ইত্যাদি দশটি গুণ। 'দশকুমারচরিত' গদ্যকাব্য দণ্ডীর রচনা রূপে পরিচিত, কিন্তু আলংকারিক দণ্ডীই 'দশকুমারচরিতে'র লেখক কিনা এ বিষয়ে সংশয় আছে।

১১. মধ্য-এশিয়ায় প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্যের অংশ সোগ্‌ডিয়ানা (Sogdiana)- বক্ষু (Oxus) এবং জাক্‌সারটেস (Jaxartes) নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল। প্রধান শহর সমরকন্দ।

৭. সহজযান

মহাযানমতে নির্বাণ লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। কত জন্মজন্মান্তর ধরিয়া ধ্যান, ধারণা, সমাধি করিয়া "দশভূমি" অতিক্রম পূর্বক শূন্যের উপর শূন্য, তার উপর শূন্য পার হইয়া, তবে নির্বাণ-পদ লাভ হয়। এত তো লোকে করিয়া উঠিতে পারে না। সুতরাং একটা সহজ পথ চাই। সে সহজ পথ কোথা হইতে আসে?

মহাযানে তো "সাংবৃত সত্য" বা সংসারকে একেবারে উড়াইয়া দিয়াছে এবং "পরমার্থ সত্য"কে শূন্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। নির্বাণ ও শূন্য একই। মাধ্যমিকেরা[১], শূন্যকে "চতুষ্কোটি-বিনির্মুক্ত" বলিয়াছে— অতএব উহা "অস্তি"ও নয়, "নাস্তি"ও নয়, "তদুভয়"ও নয়, "অনুভয়"ও নয়। তবে উহা কী?— অনির্বচনীয় রূপ। কিন্তু উহার ধারণা ভাব-রূপে হয়, অভাবরূপে নয়— ইংরাজিতে বলিতে গেলে Positive, Negative রূপে নয়। যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদীরা[২] বলেন যে ঐ অবস্থায় শূন্য বিজ্ঞানমাত্র। ইহাও "ভাব"। সহজবাদীরা বলিলেন, তোমাদের সংসারও যেমন মিথ্যা, নির্বাণও তেমনই মিথ্যা। মানুষ সকলেই নিত্যমুক্ত, পাপ পুণ্য বলিয়া কোনো জিনিসই নাই।

সহজধর্মের অনেক বই বাংলায় লেখা। হওয়াই উচিত। যদি নির্বাণটাকে সহজই করিতে হয়, তবে উহাকে সংস্কৃত দিয়া কঠিন করা কেন? বাংলায় বলিলে উহা তো আরো সহজ হইবে। তাই তাঁহারা বাংলাতেই সহজধর্ম প্রচার করেন। সরহপাদ[৩] বাংলায় বলিলেন—

> অপণে রচি রচি ভব নির্বাণা
> মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপনা।
> অম্হে ন জাণহূ অচিন্ত জোই
> জাম মরণ ভব কইসণ হোই ॥
> জইসো জাম মরণ বি তইসো
> জীবন্তে মঅলেঁ ণাহি বিশেসো ॥
> জাএথু জাম মরণে বিসঙ্কা।
> সো করউ রস রসানেরে কখা ॥ [বৌ-গা-দো, পৃ. ৩৮]

লোকে বৃথা আপনা-আপনি সংসার ও নির্বাণ মনে মনে রচনা করিয়া আপনাকে বদ্ধ করিয়া ফেলে। আমি অচিন্ত্যযোগী— আমি জানি না জন্ম মরণ ও ভব কিরূপ ? জন্মও যেরূপ, মরণও সেইরূপ ; জীয়ন্তে ও মরণে কোনোই বিশেষ নাই। জন্ম ও মরণে যাহার শঙ্কা, সেই রস ও রসায়নের আকাঙ্ক্ষা করুক।

ভাদেপাদের[৪] কথা এই—

এতকাল হাঁউ অচ্ছিলেঁ স্বমোহেঁ।
এবেঁ মই বুঝিল সদ্‌গুরুবোহেঁ ॥
এবেঁ চিঅরাঅ মকুঁ ণঠা।
গণসমুদে টলিআ পইঠা ॥
পেখমি দহদিহ সর্ব্বই শূন।
চিঅ বিহুন্নে পাপ না পুন্ন ॥
বাজুলে দিল মোহকখু ভণিআ
মই অহারিল গঅণত পণিআঁ ॥
ভাদে ভণই অভাগে লইআ
চিঅরাঅ মই অহার কএলা ॥ [পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪]

এতকাল আমি আমার মোহেতেই ছিলাম। এখন আমি সদ্‌গুরুর নিকট উপদেশ পাইয়া ঠিক বুঝিতে পারিলাম। এখন বুঝিলাম আমার চিত্তরাজ একেবারেই নাই। তিনি টলিয়া গগন-সমুদ্রে পড়িয়া গিয়াছেন। আমি দেখিতেছি দশ দিক সকলই শূন্য। চিত্তই যখন নাই, তখন পাপও নাই, পুণ্যও নাই। আমার বজ্রগুরু আমার মোহের কুঠারি ভাঙিয়া দিয়াছেন। আমি গগনে পড়িয়া হারাইয়া গিয়াছি। ভাদেপাদ বলিতেছেন, ভাগ তো নাই, আমি আমার চিত্তরাজকে আহার করিয়া ফেলিয়াছি, অর্থাৎ, তাহাকে "নিঃস্বভাব" করিয়াছি।

এই দুইটি গান হইতে আমরা কী বুঝিতে পারিতেছি ? যখন সবই শূন্য— তখন উৎপত্তিও নাই, নিবৃত্তিও নাই, ভঙ্গও নাই ; জন্মও নাই, মরণও নাই, সংসারও নাই। "চিত্ত" "চিত্ত" বলিয়া যে পদার্থ আছে বল, তাহাও তো শূন্যসমুদ্রে পড়িয়া মিশাইয়া গিয়াছে। তাহা হইলে পাপও নাই, পুণ্যও নাই। সকল জিনিসই যখন নিঃস্বভাব,

তখন আমার চিত্তেরই যে স্বভাব থাকিবে, তাহারই বা অর্থ কী ? আমি যতদিন নিজে জন্ম-মরণ-সংসারের ভাবনা ভাবিতেছিলাম, ততদিন আমি মোহে বা ধোকায় পড়িয়াছিলাম। ঠিক গুরুর কাছে ঠিক উপদেশ পাইয়া, আমি বুঝিলাম আমার চিত্তরাজ নাই। আমি চিত্তরাজকে "আহার" করিয়া ফেলিলাম।

যোগাচারমতে যেমন— কিছুই থাকে না, বিজ্ঞানমাত্র থাকে; সহজ-মতে তেমনই কিছুই থাকে না, আনন্দমাত্র থাকে। এই আনন্দকে তাঁহারা সুখ বলেন, কখনো বা মহাসুখ বলেন। সে সুখ স্ত্রীপুরুষ-সংযোগজনিত সুখ। ইঁহাদের মতে চারিটি শূন্য আছে— নিচের শূন্য কয়টি কিছুই নয়, আলোকমাত্র ; চতুর্থ শূন্যের নাম প্রভাস্বর। সে শূন্য আপনি উজ্জ্বল। সেই শূন্যে চিত্তরাজ গিয়া উঠিলেন, তাহার পর নিরাত্মাদেবীর সহিত মহাসুখে মগ্ন হইয়া "নিঃস্বভাব" হইয়া গেলেন।

সহজযানের মূল কথা— সদ্‌গুরুর উপদেশ।

এই যানের কথা--

> ন বিনা বজ্রগুরুণা সর্ব্বক্লেশপ্রহাণকম্।
> নির্ব্বাণঞ্চ পদং শান্তমবৈবর্ত্তিকমাপ্নুয়াৎ ॥ ('শ্রীসমাজতন্ত্র')[৫]

বজ্রগুরু ব্যতিরেকে নির্বাণপদ পাওয়া যায় না। যে নির্বাণে সকল ক্লেশের নাশ হয়, শান্তি যে নির্বাণের চরম ফল, যে নির্বাণে আর "বিবর্ত" থাকে না, অর্থাৎ, কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না, সে পদ গুরুর কৃপা ভিন্ন পাওয়া যায় না।

গুরুর কথা শুনিলে, তাঁহার হিত উপদেশ পাইলে, তুমি ইচ্ছা করো আর না-ই করো, তুমি নিশ্চয়ই মোক্ষলাভ করিবে। ('বজ্রজাপ')

গুরুর প্রসাদেই পরম সুখলাভ হয়, সে সুখ নিজেই বুঝিতে পারা যায়, পরেও আমাকে বুঝাইতে পারে না, আমিও পরকে বুঝাইতে পারি না। সে সুখে তন্ময়তা লাভ হয়, অর্থাৎ সুখ ভিন্ন জগতের অন্য কোনো পদার্থের অস্তিত্ব থাকে না, সে সুখ গুরু হইতেই উদয় হয়। অনেক পুণ্য থাকিলে, গুরুর অনেক উপাসনা করিলে, সে সুখ লাভ হইয়া থাকে। ('সরহপাদপ্রবন্ধ')

সে গুরুকে আমরা বজ্রগুরু বলি কেন ? বজ্র বলিতে শূন্যতা বুঝায়। 'যোগরত্নমালা'য়[৬] লিখে—

দৃঢ়ং সারমশৌষীর্য্যমচ্ছেদ্যাভেদ্যলক্ষণম্ ।
অদাহী অবিনাশী চ শূন্যতা বজ্র উচ্যতে ॥

শূন্যতাই বজ্র। উহা ছেদ করা যায় না, ভেদ করা যায় না, দগ্ধ করা যায় না, বিনাশ করা যায় না, উহাতে ছেঁদা করা যায় না— উহা অতি দৃঢ় ও সারবান্। যে গুরু এই শূন্যতাবজ্রের উপদেশ দেন, তিনিই বজ্রগুরু।

গুরুর উপদেশে যাহা লাভ হয়, সে লাভ শতসহস্র সমাধিতে হয় না। আমাদের এই যে সহজযান ইহাতে গুরুর উপদেশই লইতে হয়, ইন্দ্রিয় নিরোধের চেষ্টা করা বৃথা, পাপ পরিহারের চেষ্টা বৃথা, কঠোর ব্রত ধারণের চেষ্টা বৃথা, কঠিন কঠিন নিয়মপালন করাও বৃথা।

'শ্রীসমাজতন্ত্রে' বলিতেছেন—

দুষ্করৈর্নিয়মৈস্তীব্রৈর্মূর্ত্তিঃ শুষ্যতি দুঃখিতা ।
দুঃখাদ্বি ক্ষিপ্যতে চিত্তং বিক্ষেপাৎ সিদ্ধিরন্যথা ॥

যদি তুমি কঠোর নিয়ম পালন কর, তাহা হইলে তোমার শরীর শুষ্ক হইবে, ও তোমার নানারূপ দুঃখ উপস্থিত হইবে। দুঃখ উপস্থিত হইলে মন স্থির থাকিবে না, মনস্থির না থাকিলে কখনোই সিদ্ধিলাভ হয় না।

'হেবজ্রতন্ত্রে'ও[৭] বলিতেছে—

রাগেণ বধ্যতে লোকো রাগেণৈব বিমুচ্যতে ।
বিপরীতভাবনা হ্যেষা ন জ্ঞাতা বুদ্ধতীর্থিকৈঃ ॥

বিষয়ের আসক্তিতেই লোকে বদ্ধ হয়, আবার সেই আসক্তিতেই লোকে মুক্ত হয়। আসক্তির এই যে বিপরীত ফলদানের ক্ষমতা বুদ্ধতীর্থিকেরা এটা জানিত না, অর্থাৎ, অন্য বৌদ্ধসম্প্রদায়ের লোকেরা ইহা জানে না, আমরা, সহজপন্থীরাই, কেবল জানি।

আবার 'শ্রীসমাজ' বলিতেছেন—

পঞ্চকামান্ পরিত্যজ্য তপোভির্নৈব পীড়য়েৎ ।
সুখেন সাধয়েদ্বোধিং যোগতন্ত্রানুসারতঃ ॥

পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়, বিষয়কেই ভোগ বলে, বিষয়কেই কাম

বলে। সেই পাঁচটি ভোগ ত্যাগ করিয়া তপস্যার দ্বারা আপনাকে পীড়া দিবে না। যোগতন্ত্রানুসারে সুখভোগ করিতে করিতে বোধির সাধনা করিবে।

সরহপাদ বলিতেছেন—

তনুতরচিত্তাঙ্কুরকো বিষয়রসৈর্যদি ন সিচ্যতে শুদ্ধৈঃ।
গগনব্যাপী ফলদঃ কল্পতরুত্বং কথং লভতে ॥

যখন চিত্ত অল্পে অল্পে বোধির দিকে যায়, তখন সেই চিত্তরূপ ছোটো অঙ্কুরটির গোড়ায় বিষয়রস যদি না সেক কর, কেমন করিয়া সেই অঙ্কুর কল্পতরু হইবে, কেমন করিয়া সে আকাশ ছাইয়া ফেলিবে, কেমন করিয়া সে সকলের বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিবে ?

এই-সকল সহজপন্থীর শাস্ত্র স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছে যে, যদি তোমার বোধিলাভের ইচ্ছা থাকে, তবে পঞ্চকাম উপভোগ করো।

পঞ্চকাম উপভোগ তো সকলেই করে। তাহার জন্য আবার শাস্ত্র কেন, তাহার জন্য আবার ধর্ম কেন ? সে তো সকলে আপনা হইতেই করে ? তাহার জন্য আবার গুরু কেন ? একটু আছে। মানুষমাত্রেই পঞ্চকামোপভোগ করে। কিন্তু তাহাতে তাহারা পাপপুণ্যে লিপ্ত হয়। কিন্তু যখন বজ্রগুরু বুঝাইয়া দেন যে, সবই শূন্য, কিছুরই স্বভাব নাই, তখনই সহজিয়ারা পঞ্চকামোপভোগ করে ও পাপপুণ্যে লিপ্ত হয় না। তাই দারিকপাদ[৮] বলিলেন—

কিন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে কিন্তো রে ঝাণবখানে।
অপইঠানমহাসুহলীণে দুলখ পরমনিবাণে ॥
দুঃখেঁ সুখেঁ একু করিআ ভুঞ্জই ইন্দিজানী
স্বপরাপর ন চেবই দারিক সঅলানুত্তরমাণী ॥ [পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩]

অরে বালযোগি, তোর মন্ত্রেই বা কী ? তন্ত্রেই বা কী ? ধ্যানেই বা কী ? ব্যাখ্যানেই বা কী ? তোমার যখন মহাসুখলীলায় প্রতিষ্ঠা নাই, তখন নির্বাণ তোমার পক্ষে দুর্লভ। তুমি গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া পরমার্থ সত্যের সহিত মহাসুখলীলাকে এক করিয়া পঞ্চকাম উপভোগ করো। দারিক এই উপায়েই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া সংসারে বিচরণ করিতেছেন। তাঁহার আত্মপর বোধ নাই।

তিনি এই সঙ্গেই আবার বলিতেছেন—

রাআ রাআ রাআরে অবর রাঅ মোহেরা বাধা

লুইপাঅপএ দারিক দ্বাদশভুঅণে' লধা ॥ [পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩]

আর যত রাজা আছেন, তাঁহারা সকলেই বিষয়ের মোহে বদ্ধ। কিন্তু নিজগুরু লুইপাদের প্রসাদে দ্বাদশভুবন অতিক্রম করিয়া দারিক পরমসুখ লাভ করিয়াছেন।

মহাসুখ লাভ করিলে সহজিয়াদের কী অনির্বচনীয় অবস্থা হয়, সে সম্বন্ধে আগমে এই কথা বলে—

ইন্দ্রিয়াণি স্বপন্তীব মনোঽন্তর্বিশতীব চ।

নষ্টচেষ্ট ইবাভাতি কায়ঃ সৎসুখমূর্চ্ছিতঃ ॥

শরীর যখন সৎসুখে মূর্ছিত হয়, তখন ইন্দ্রিয়সকল যেন ঘুমাইয়াই পড়ে, মন মনের ভিতর ঢুকিয়া যায়। শরীরের কোনোরূপ চেষ্টা থাকে না।

এই যে পঞ্চকামোপভোগ— ইহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্‌টি? সে বিষয়ে 'অনুত্তরসন্ধি'তে এই কথাটি দেখা যায়—

সর্বাসাং খলু মায়ানাং স্ত্রীমায়ৈব বিশিষ্যতে।

জ্ঞানত্রয়প্রভেদোঽয়ং স্ফুটমত্রৈব লক্ষ্যতে ॥

সকল মায়ার মধ্যে স্ত্রীমায়াই বড়ো। ইহাতেই তিনটি জ্ঞানের যে প্রভেদ, তাহা স্পষ্ট দেখা যায়। তিনটি জ্ঞান— প্রথম তিনটি শূন্য। সে তিনটি যে কিছুই নয়, তাহা পরিষ্কার করিয়া বুঝা যায় এবং বিরমানন্দ রূপ যে চতুর্থ শূন্য তাহা পাইতে পারা যায়। এই চতুর্থ শূন্যের নাম প্রভাস্বর। ইহাতেই নিরাত্মাদেবীকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া চিত্ত মহাসুখে লীন হয়।

সবরপাদ[১] বলিতেছেন—

তইলা বাড়ির পাসেঁর জোহ্না বাড়ী তাএলা ॥

ফিটেলি অন্ধারি রে অকাশ ফুলিআ ॥

কঙ্গুরি না পাকেলা রে শবরাশবরি মাতেলা

অণুদিণ শবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুহেঁ ভেলা ॥

[পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫]

তৃতীয় বাড়ির (সন্ধ্যাভাষায় বাড়ি বলিতে শূন্য বুঝাইল) পাশে জ্যোৎস্না বাড়ি বা জ্যোৎস্না শূন্য। সেখানে জ্ঞানচন্দ্র সর্বদা উদিত। সেখান

হইতে সকল অন্ধকার, সকল দুঃখ পলাইয়াছে। সেখানে আকাশপুষ্প সত্যসত্যই ফুটিয়া আছে। সেখানে কাঁকুড় পাকিল না (সন্ধ্যাভাষায় কাঁকুড় শব্দের অর্থ সর্বব্যাপী সুখ ; পাকিল না, অর্থাৎ শেষ হইল না। অর্থাৎ, সুখই রহিল)। শবর ও শবরী (বোধিচিত্ত ও নিরাত্মা দেবী) উন্মত্ত হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন। শবরের জ্ঞান-চৈতন্য কিছুই রহিল না। তিনি অনুক্ষণ মহাসুখে ডুবিয়া রহিলেন।

এই যে মত ইহা সাধারণ লোককে যে একেবারে মাতাইয়া তুলিয়াছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। লোকে যাহা চায়, সহজিয়ারা তাহাই দিল ; কেবল বলিল গুরুর কাছে উপদেশ লও। শুধু কথায় বলিয়াই নিশ্চিন্ত রহিল না। তাহারা নানা রাগ-রাগিণীতে এই-সকল গান গাহিয়া বেড়াইত, এবং দেশের লোককে একেবারে মাতাইয়া তুলিত। তাহারা কী কী যন্ত্র ব্যবহার করিত, জানা যায় না। তাহাদের খোল করতাল ছিল কি না, বলিতে পারা যায় না। তবে একতারা ছিল বলিয়া জানা যায়— প্রমাণ— বীণাপাদ[১০] বলিতেছেন—

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী
অণহা দাণ্ডী বাকি কিঅত অবধূতী ॥
বাজই অলো সহি হেরুঅবীণা
সুন তান্তি ধনি বিলসই রুণা ॥ [পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০]

সূর্য হইলেন লাউয়ের বস্— অর্থাৎ পাকা লাউয়ের শক্ত খোলা, তাহাতে চাঁদ, তাঁত বা তন্ত্রী লাগিল, অণহা অর্থাৎ অনাহতকে দণ্ড করা হইল ও অবধূতী বাকি অর্থাৎ বাজনাওয়ালা হইল। হে সখি ঐ শুন হেরুকের বীণা বাজিতেছে। আর সেই তন্ত্রীধ্বনিতে শুনিয়া [শূন্যতা] ও করুণা বিলাস করিতেছে।

এই যে বীণাধ্বনি ইহা একরকম music of the sphere-এর মতো, অথবা বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির মতো। মিউসিকে যে বীণা ধ্বনিতে, স্বর্গ-মর্ত-পাতাল ভরিয়া যায়, হেরুকের বীণা ধ্বনিতেও ত্রৈধাতুকময় সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া গেল।

তাহারা পটহ বা ঢোল বাজাইত—

বেটিল হাক পড়অ চৌদীশ (ভুসুকুর গান)[১১]

[পূর্বোক্ত, পৃ. ১২]

তাহারা ডমরু ব্যবহার করিত, মাদলও বাজাইত—

অনহা ডমরু বাজএ বীরনাদে (কৃষ্ণাচার্য) [পূর্বোক্ত, পৃ. ২১]
ভবনির্ব্বাণে পড়হ মাদলা
মণ পবণ বেণি করণ্ড কশালা (কৃষ্ণাচার্য) [পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩]

তাহাদের দুন্দুভি ছিল।

জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআঁ
কাহ্নু ডোম্বী বিবাহে চলিআ (কৃষ্ণাচার্য) [পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩]

তাঁহারা যে-সকল রাগে গান গাহিতেন, তাহার অনেকগুলি রাগ এখনও সংকীর্তনে চলিতেছে।

যথা—রাগ পটমঞ্জরী, রাগ বরাড়ী, রাগ গুঞ্জরী, রাগ শীবরী, রাগ কামোদ, রাগ মল্লারি, রাগ দেশাখ, রাগ ভৈরবী, রাগ মালসী, রাগ গবুড়া, রাগ রামক্রী, রাগ বঙ্গাল ইত্যাদি।

পদকর্তারা সন্ধ্যাভাষায়[১২] গান করিতেন। সন্ধ্যাভাষা অর্থাৎ আলোআঁধারে ভাষা। উপরে কথায় কথায় একরূপ মানে হয়, অথচ ভিতরে অন্যরূপ গূঢ় অর্থ থাকে। ইহাকে রূপক বলিতে চাও, বলো। কিন্তু রূপকে দুই অর্থই প্রকাশ থাকে। বোধিচিত্ত ও নিরাত্মা দেবীর মিলনকে কখনো বিবাহ বলিতেছেন, কখনো তরুলতা সাজাইতেছেন, কখনো হরিণ-হরিণীর ক্রীড়া বলিতেছেন, কখনো দুধ-দোহা বলিতেছেন, কখনো বা শুঁড়িনীর মদ বেচার সহিত তুলনা করিতেছেন, কখনো বা নদীর উপর সাঁকো গড়ার সহিত তুলনা করিতেছেন, কখনো শূন্য ও করুণার মিলন দেখাইতেছেন, কখনো গঙ্গা-যমুনার মাঝে নৌকার সহিত তুলনা করিতেছেন, কখনো ইঁদুরের সহিত তুলনা করিতেছেন। এইরূপ নানা রসে, নানা ভাবে, নানা ছন্দে, নানা অলংকারে তাঁহারা সহজ মত নানা দিকে প্রচার করিয়া বেড়াইতেন।

বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে যাঁহারা গান লিখেন, তাঁহাদের নাম পদকর্তা এবং তাঁহাদের গানের নাম পদ। বৌদ্ধ-সংকীর্তনে যাঁহারা গান লিখিতেন, তাঁহাদিগকেও পদকর্তা বলিব। তাঁহারা যে গান লিখিতেন, তাহার নাম চর্যাপদ বা গীতিকা। তাঁহারা চর্যাপদ ছাড়া আরো পদ লিখিতেন—যেমন বজ্রপদ বা বজ্রগীতিকা, উপদেশপদ বা উপদেশগীতিকা।

তখন অনেক বড়ো বড়ো লোকেও গীতিকা লিখিতেন। যিনি

বঙ্গ দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া, তিব্বতে গিয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন, সেই দীপংকর শ্রীজ্ঞান বা অতিশাও[১৩] বাংলায় গীতিকা লিখিতেন। যে রত্নাকর শান্তির[১৪] নামে আর্যাবর্তের দার্শনিকেরা ভয় পাইতেন, তিনিও গীতিকা লিখিতেন। অনেক বাঙালি বৌদ্ধ তো গীতিকা লিখিতেনই, এতদ্ভিন্ন আসামি, উড়িয়া ও মৈথিলেরাও গীতিকা লিখিতেন। সহজধর্মের গুরুদিগকে সংস্কৃতে বজ্রগুরু বলিত, বাংলায় বাজিল, বজুল ও বজগু বলিত। লোকে মনে করিত ইহাদের নানারূপ অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। ইঁহারা দাড়িগোঁপ কামাইতেন, মাথায় বড়ো বড়ো চুল রাখিতেন, আলখেল্লা পরিতেন। এখন যেমন আউলেরা,[১৫] তাঁহারাও কতকটা তেমনই গান করিয়া বেড়াইতেন। ইঁহাদিগকে সময়ে সময়ে সিদ্ধাচার্য বলিত। তিব্বত দেশে এখনো সিদ্ধাচার্যের পূজা হইয়া থাকে। অনেক সিদ্ধাচার্যের মূর্তি তাঁহাদের দেশে আছে। লুইপাদ[১৬] সিদ্ধাচার্যদের আদি, তাঁহাকে লোকে সিদ্ধাচার্য বলে। লোকে বলে সর্বসুদ্ধ চুরাশি জন সিদ্ধাচার্য ছিলেন। লুইয়ের বাড়ি বাংলা দেশে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহই নাই। তিব্বত দেশের সাহিত্যে তাঁহাকে বাঙালি বলিয়া উল্লেখ করা আছে। তিনি মৎস্যের অন্ত্র বা মাছের পোঁটা খাইতে ভালোবাসিতেন, সেইজন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল, মৎস্যান্ত্রাদ। রাঢ় দেশে যাহারা ধর্মঠাকুর মানে, তাহারা অনেকেই লুইকেও মানে এবং লুইয়ের উদ্দেশে পাঁটা ছাড়িয়া দেয়। লুইয়ের পূজার দিন তাহারা সেই পাঁটা বলি দেয়। যদি কেহ সেই পাঁটা চুরি করিয়া খায়, তবে তাহার অত্যন্ত অমঙ্গল হয়। নগেনবাবু [নগেন্দ্রনাথ বসু] বলেন, ময়ূরভঞ্জের যে অংশটুকু রাঢ় বলে, সেখানেও লুইয়ের পূজা হইয়া থাকে। লুইয়ের বংশে আরো কেহ কেহ সিদ্ধাচার্য ছিলেন, এবং বাংলায় গান লিখিয়াছিলেন।

এখন বৈষ্ণবদের যেমন আখড়াধারী আছে, সিদ্ধাচার্যেরা যদি তেমনই আখড়াধারী ছিলেন বলিয়া মনে করা যায়, এবং এখন আখড়াধারীদের যেমন অনেক চেলা থাকে সেইরূপ সিদ্ধাচার্যদেরও অনেক চেলা ছিল যদি মনে করা যায়, তাহা হইলে তখন বাংলার কিরূপ অবস্থা ছিল, ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তখন ব্রাহ্মণদিগের এত প্রাদুর্ভাব হয় নাই। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণে তখন হাজার ঘরও ছিল কিনা খুব সন্দেহ। সুতরাং ব্রাহ্মণধর্মের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল বলিয়া বোধ হয়

না। সিদ্ধাচার্যগণ ও তাঁহাদের চেলারা দেশের একরূপ কর্তা ছিলেন। একে তো তাঁহাদের ধর্ম অতি সহজ, মানুষে যাহা চায়, তাই তাঁহারা দিতেন। তাহাও আবার বক্তৃতার ছটায় নয়, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নয়, সংস্কৃতের ব্যাখ্যায় নয়, উপদেশ দিয়া নয়। গানে, নানা সুরে, নানা বাদ্যের সঙ্গে, গান করিয়া তাঁহারা লোকদের বলিয়া দিতেন, "বাপুহে সবই তো শূন্য— সংসারও শূন্য, নির্বাণও শূন্য— তবে যে আমি আমি বলিয়া বেড়াই, এটা কেবল ধোকা মাত্র।

"এই ধোকার পশরা নামাইয়া ফেলো। তখন দেখিবে কিছুই কিছু নয়। সুতরাং আনন্দ করো। আনন্দই শেষ থাকিবে। আদিতেও আনন্দ, মধ্যেও আনন্দ, শেষেও আনন্দ।"

এই যে আনন্দময় উপদেশ, ইহার ফলে দেশের লোক মাতিয়া উঠিয়াছিল। সে মাতার ফল যে ভালো হয় নাই, তাহা তো আমরা দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু যাঁহারা মাতাইয়াছিলেন, তাঁহারা খুব ক্ষমতা-শালী পুরুষ ছিলেন, মানুষের মনের উপর কিরূপে প্রভুত্ব করিতে হয়, তাহা তাঁহারা বেশ জানিতেন। তাঁহারা গুরুগিরি করিয়া বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু চেলাদের যে কী পরিণাম হইবে, তাহা তাঁহারা একেবারেই ভাবেন নাই। তবে তাঁহারা আমাদের একটা বড়ো উপকার করিয়া গিয়াছেন— তাঁহারা বাংলা ভাষাটিকে সজীব, সতেজ, সরল ও মধুর করিয়া গিয়াছেন এবং বৌদ্ধজগতে তাহাকে একটি উচ্চস্থান দিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্য বঙ্গবাসী মাত্রেরই ইঁহাদের উপর কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

ইঁহারা যে সহজধর্মের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, সে ধর্ম এখনো চলিতেছে, তবে ইহার রূপ বদলাইয়া গিয়াছে। তখন সহজিয়ারা আপনারাই সহজভাবে মত্ত থাকিতেন, এখন সহজিয়ারা দেবতাদের সহজভাবে ভোর হইয়া থাকেন। তখন তাঁহারা নিজেই যুগনদ্ধ ক্রীড়া করিতেন, এখন তাঁহারা দেবতাদের যুগনদ্ধ ক্রীড়া দেখিয়াই আনন্দ উপভোগ করেন।

'নারায়ণ'
ভাদ্র, ১৩২২ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. এই বইয়ের পৃ. ৩৪৭ সূত্র ১ দ্র.

২. যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ মহাযানের অন্যতম প্রধান সম্প্রদায়। এই মতবাদের প্রবক্তা অসঙ্গ এবং বসুবন্ধু দুই ভাই। জন্ম গান্ধারের রাজধানী পুরুষপুর, আধুনিক পেশোয়ারে (পাকিস্তানের অন্তর্গত)। খৃস্টীয় চতুর্থ শতকে' এ'রা অযোধ্যায় নতুন মত প্রবর্তক শাস্ত্র রচনা করেন। এই সম্প্রদায়ের সাধনমার্গকে যোগাচার এবং দর্শনকে বিজ্ঞানবাদ বলা হয়। অসঙ্গ প্রধানত সাধনমার্গের কথা আলোচনা করেছেন, দার্শনিক প্রস্থান সংগঠন করেছেন বসুবন্ধু। অসঙ্গের প্রসিদ্ধ রচনা 'মহাযান সূত্রালঙ্কার' এবং 'মহাযান সম্পরিগ্রহশাস্ত্র'। বসুবন্ধুর প্রধান রচনা 'বিংশক-কারিকা-প্রকরণ', 'ত্রিংশিকা-প্রকরণ' এবং 'মধ্যান্ত-বিভঙ্গ-শাস্ত্র'। যোগাচার সম্প্রদায়ের অন্য পণ্ডিতদের মধ্যে প্রসিদ্ধ পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের দিঙ্‌নাগ স্থিরমতি এবং নালন্দার অধ্যাপক, শীলভদ্রের গুরু ধর্মপাল। হিউয়েন্‌-ৎসাঙ নালন্দায় শীলভদ্রের কাছে যোগাচার দর্শন চর্চা করেন। চীনা ভাষায় লেখা তাঁর 'বিজ্ঞপ্তি-মাত্রতা-সিদ্ধি' গ্রন্থে ভারতীয় যোগাচার সম্প্রদায়ের আচার্যদের মতামত ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করেছেন।

বিজ্ঞানবাদ মাধ্যমিক দর্শনেরই পরিণতি। মাধ্যমিকদের মতো বিজ্ঞানবাদীরাও মানেন, পারমার্থিক সত্য অদ্বয়। পরমার্থের সৎ, অসৎ বা অন্য কোনো অভিধা নেই। তার উৎপত্তি, বিনাশ, ক্ষয়বৃদ্ধি নেই। কিন্তু শূন্যতাই পরমার্থ— মাধ্যমিকদের এই তত্ত্বের পরিবর্তে বিজ্ঞানবাদীরা বলেন, বস্তুর অস্তিত্ব নেই এ জ্ঞান যাঁদের হয় তাঁরা চিত্তমাত্রে বা বিজ্ঞানে অবস্থান করেন। চিত্ত ভিন্ন কিছুরই অস্তিত্ব নেই— এই জ্ঞান হলে জানা যায় চিত্তেরও অস্তিত্ব নেই। বিকল্পজ্ঞান নষ্ট হলে ধীমান্‌ ধর্মধাতুতে স্থিত হন। শূন্যতার পরিবর্তে এ'রা ধর্মধাতুর ধারণা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ধর্মধাতু প্রত্যক্ষ হলে অদ্বয়জ্ঞান লাভ হয়। বসুবন্ধুর দার্শনিক-প্রস্থানে বিজ্ঞানমাত্রতা পারমার্থিক সত্য

এবং বিজ্ঞানের পরিণতি ত্রিবিধ, ১. আলয়বিজ্ঞান, ২. আলম্বন, ৩. বিষয়বিজ্ঞপ্তি। যেসব ধর্ম থেকে জগতের উৎপত্তি, তার বীজস্থান আলয় বিজ্ঞান। স্পর্শ, মনস্কার বা চিত্তের বিষয়মুখী ক্রিয়া, বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা— আলয় বিজ্ঞানের পরিণতি। এরই ফলে জলের ধারার মতো অনবচ্ছিন্ন কার্যকারণ-প্রবাহ বয়ে চলেছে। সংসারের সৃষ্টি হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, আলয়-বিজ্ঞানকে আশ্রয় করে মননাত্মক আলম্বনের উদ্ভব হয়। আলম্বনের পরিণতি— আত্মদৃষ্টি, আত্মমোহ, আত্মমান, আত্মস্নেহ— এই চার রকমের ক্লেশ। বিজ্ঞানের তৃতীয় পরিণতি বিষয়-বিজ্ঞপ্তি। বিষয় ছয়টি— রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শনীয় ও ধর্মাত্মক। চরাচরে যা-কিছু প্রতিভাত সবই বিষয়-বিজ্ঞপ্তিমাত্র। "সর্ব্বং বিজ্ঞপ্তিমাত্রকম্।" বিজ্ঞানবাদের সার কথা— জ্ঞেয় নিরপেক্ষভাবে বিজ্ঞান বা জ্ঞানের অস্তিত্ব সম্ভব। জ্ঞান বিকার প্রাপ্ত হলে বিষয় সম্পর্কে ধারণার উৎপত্তি হয়। দ্বৈততা এসে পড়ে। বিজ্ঞানের পরিণাম স্বরূপ জগৎ চরাচর সত্য নয়। এই আরোপিত দ্বৈততা থেকে মুক্ত জ্ঞানই বিশুদ্ধ সৎ বস্তু। বিজ্ঞানমাত্রতাই পারমার্থিক সত্য।

৩. সরহ নামে একাধিক বৌদ্ধ তান্ত্রিক-সাধক ছিলেন। চুরাশি সিদ্ধাচার্যের তালিকায় সরহ ওরফে রাহুলভদ্রের নাম আছে। অন্যত্র তাঁর নামান্তর সরোজবজ্র, সরোরুহবজ্র, পদ্মবজ্র। শাস্ত্রীমশায় 'বৌদ্ধগান ও দোহা'য় সরোজবজ্রের 'দোহাকোষ' প্রকাশ করেছেন। তেঙ্গুরের তালিকায় সরহের নামে দোহাকোষ, গীতিকা ও বজ্রযান-সাধনা বিষয়ক ২১ খানি বইয়ের নাম আছে। যেমন 'দোহাকোষগীতি', 'দোহাকোষনামচর্যাগীতি', 'দোহাকোষনামমহামুদ্রা-উপদেশ', 'বসন্ততিলকদোহাকোষগীতিকা', 'বাক্‌কোষরুচিরস্বরবজ্রগীতিকা', 'ত্রৈলোক্যবশংকর-অবলোকিতেশ্বরসাধন' ইত্যাদি। সব বই একজনের লেখা নয়। তিব্বতি লেখক সুম্‌পা তাঁর 'পাগ্-সাম্-জোন্-জাং' বইয়ে একজন সরহের পরিচয় দিয়েছেন। প্রাচ্য দেশের রজ্ঞী শহরে এঁর জন্ম। কোনো ব্রাহ্মণ ও ডাকিনীর ছেলে। চন্দনপাল নামে কোনো রাজার আমলের এই সরহ ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধবিদ্যায় পারংগম ছিলেন। ইনি রাজা রত্নপাল ও তাঁর মন্ত্রীদের ধর্মান্তরিত করেন। নালন্দায় মহাচার্য হন। ওড়িশায় মন্ত্রযান শেখেন এবং মহারাষ্ট্রে গিয়ে এক যোগিনীর সঙ্গে সাধনা করে 'সিদ্ধ' হয়ে সরহ নামে পরিচিত হন। তিব্বতি ঐতিহাসিক তারনাথ দু জন সরহকে চিহ্নিত করেছেন। বয়সে যিনি বড়ো তিনি রাহুলভদ্র এবং যিনি ছোটো তিনি শাবরি। নেপালে নকল করা 'দোহাকোষ'-এর

প্রাচীনতম পুথির তারিখের হিসাবে দোহাকার সরহ একাদশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধে বর্তমান ছিলেন অনুমান করা যায়। 'বৌদ্ধগান ও দোহা'য় ২২, ৩২, ৩৮, ৩৯ সংখ্যক পদ সরহের রচনা। উদ্ধৃত অংশ ২২ সংখ্যক পদের প্রথম আট চরণ। দ্র. *S-M*-II, pp. xliv, cxvi ; *H-B*-I, pp. 339-42, 348-49 ; বৌ-গা-দো, পৃ. ২৬-২৭ ; চ-গী-প, পৃ. ১৯-২০।

৪. 'বৌদ্ধগান ও দোহা'র ৩৫ সংখ্যক এই পদটির রচয়িতা ভাদে। তিব্বতি ঐতিহ্যে ইনি একজন আচার্য, নামান্তর ভাণ্ডারিন্। তিব্বতে ভদ্রচন্দ্র, ভদ্রদত্ত, ভদ্রবোধি নাম পাওয়া গেছে। এ'দের কোনো একজন ভাদে হওয়া সম্ভব। ভাদের রচনা 'সহজানন্দ-দোহাকোষ-গীতিদৃষ্টি'র তিব্বতি অনুবাদ আছে। তারনাথ ভাদেপাদকে জালন্ধরি এবং কৃষ্ণাচার্যের শিষ্য বলেছেন। দ্র. চ-গী-প, পৃ. ২৩-২৪।

৫. এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত 'শ্রীসমাজতন্ত্র', 'হেবজ্রতন্ত্র', নাগার্জুনপাদের 'বজ্রজাপ', 'সরহপাদপ্রবন্ধ', 'যোগরত্নমালা' প্রভৃতি বইয়ের শ্লোকগুলি 'বৌদ্ধগান ও দোহা'র অন্তর্গত মুনিদত্তর 'চর্য্যাচর্য্য-টীকা'য় উদ্ধৃত আছে।

'শ্রীগুহ্যসমাজতন্ত্রম্' বা 'তথাগতগুহ্যক'। সংক্ষেপে 'শ্রীসমাজতন্ত্র'। বৌদ্ধ-তন্ত্রের অন্যতম আদি শাস্ত্র। চীনা ভাষায় অনূদিত হয়ে চীনা ত্রিপিটকের অন্তর্গত হয় দশম শতকে। এর তিব্বতি অনুবাদ কেঙ্গুর সংগ্রহের অন্তর্গত। তেঙ্গুরের তালিকায় 'শ্রীসমাজতন্ত্রে'র উপরে লেখা ৫২ খানি টীকার উল্লেখ আছে। টীকাকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাগার্জুন, কৃষ্ণাচার্য, লীলাবজ্র, রত্নাকরশান্তি, শান্তিদেব প্রভৃতি। টীকার সংখ্যা এবং পরবর্তী বৌদ্ধতান্ত্রিক গ্রন্থে ধারাবাহিকভাবে 'শ্রীসমাজতন্ত্র'কে প্রামাণিক শাস্ত্র হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য অনুমান করেছেন, যোগাচার দর্শনের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত অসঙ্গ খৃস্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতকে 'শ্রীগুহ্যসমাজতন্ত্র' রচনা করেছিলেন। ভিন্‌ট্যারনিট্জ এই অনুমান ভিত্তিহীন মনে করেন। দ্র. Benoytosh Bhattacharyya ed. *Guhyasamāja Tantra or Tathāgataguhyaka*, G-O-S, No. LIII ; M. Winternitz, "Notes on the Guhyasamaj-Tantra and the Age of the Tantras", *I-H-Q*, March 1933 (Mm. Haraprasad Shastri Memorial Vol.).

৬. 'যোগরত্নমালা-নাম হেবজ্র-পঞ্জিকা' 'হেবজ্রতন্ত্রে'র টীকা। লেখক কৃষ্ণাচার্যপাদ। তেঙ্গুরের তালিকায় কৃষ্ণাচার্যের নামে অনেক বইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। সব বই একজনের লেখা হতে পারে না। সব গবেষকই একাধিক কৃষ্ণাচার্যের অস্তিত্ব মানেন। 'যোগরত্নমালা' স্নেল্‌গ্রোভ তাঁর 'হেবজ্রতন্ত্রে'র সংস্করণের সঙ্গে ছেপেছেন। তাঁর ধারণা বইটি খৃস্টীয় নবম শতাব্দীতে রচিত। 'বৌদ্ধগান ও দোহা'য় কৃষ্ণাচার্যের নামে ১২টি পদ আছে। এই প্রবন্ধে পরে কৃষ্ণাচার্যের ১১ এবং ১৯ সংখ্যক পদ থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়েছে। দ্র. D. L. Snellgrove, *The Hevajra Tantra*, Part I and II, London Oriental Series : Vol. 6, London 1959 ; *I-B-I*, pp. 157-59.

৭. 'হেবজ্রতন্ত্র' বজ্রযানের অন্যতম মূল শাস্ত্র। প্রচলিত পাঠ খৃস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ দিকে রচিত। বইটি ২ কল্পে বিভক্ত, ৭৫০ শ্লোকে সম্পূর্ণ। ভাষা সংস্কৃত, কিন্তু মাঝে মাঝে অপভ্রংশ আছে। মূলত এটি অপভ্রংশে রচিত এবং পরে সংস্কৃতে রূপান্তরিত হয়ে থাকতে পারে। 'হেবজ্র-পিণ্ডারথ-টীকা' নামে এই শাস্ত্রের একটি টীকার লেখক বজ্রগর্ভ ৫ লক্ষ শ্লোকে সম্পূর্ণ আদি 'হেবজ্রতন্ত্রে'র উল্লেখ করেছেন। সে পূর্ণতর পাঠ অবশ্য পাওয়া যায় নি। স্নেল্‌গ্রোভ অনুমান করেছেন, প্রচলিত পাঠ বজ্রগর্ভেরই রচনা। 'হেবজ্রতন্ত্র' প্রচার করেন সরোরুহবজ্র। তেঙ্গুরের তালিকায় তাঁর লেখা 'হেবজ্রসাধন', 'হেবজ্র-মণ্ডল-বিধি', 'হেবজ্র-তন্ত্র-পঞ্জিকা-পদ্মিনী-নাম' প্রভৃতি ৭ খানি টীকার উল্লেখ আছে।

হেবজ্র, নামান্তরে হেরুক মূর্তির পূজা প্রচলিত ছিল। অভয়াকর গুপ্তের 'নিষ্পন্নযোগাবলী'তে হেরুকের সঙ্গে তার শক্তির মূর্তি থাকলে হেবজ্র নামে উল্লেখ করা হয়েছে। এই বইয়ে হেবজ্রের চার রকম রূপ বর্ণিত ; দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ, ষড়্‌ভুজ এবং ষোড়শ ভুজ। সবই শক্তি সমেত যুগনদ্ধ মূর্তি। দ্র. পূর্বোক্ত সূত্র।

৮. চর্যাগীতির ৩৪ সংখ্যক পদ "সুনকরুণরি অভি ন-চারেঁ কাঅবাক্‌চিঅ" দারিকের রচনা। শাস্ত্রীমশায় নেপালে এক লামার কাছ থেকে এঁ'র আর-একটি পদ "ফোইরে বংশা বাজিরে বীণা" সংগ্রহ করেছিলেন। দারিক নিজেকে লুইপাদের "পাঅপএ"— শ্রীচরণের অনুগ্রহে দ্বাদশ ভুবনে লব্ধ— বা সিদ্ধ বলেছেন। তেঙ্গুরের তালিকায় তাঁর লেখা 'কালচক্রতন্ত্র-রাজস্য-সেকপ্রক্রিয়াবৃত্তি বজ্রপাদউদ্‌ঘাটিনীনাম', 'চক্রসম্বরসাধনতত্ত্ব-

সংগ্রহনাম', 'চক্রসম্বরমণ্ডলবিধিতত্ত্ব-অবতারনাম', 'চক্রসম্বরস্তোত্র-সর্বার্থ-সিদ্ধিবিশুদ্ধচূড়ামণিনাম', 'যোগানুসারিণীনাম-বজ্রযোগিনীটীকা', 'বজ্র-যোগিনীপূজাবিধি', 'কংকালতারণসাধন', 'ওড্ডিয়ানবিনির্গত-মহাগুহ্যতত্ত্ব-উপদেশ', 'সপ্তমসিদ্ধান্ত', 'তথতাদৃষ্টি', 'প্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয়সাধন',—এই এগারোখানি বইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'ওড্ডিয়ানবিনির্গত-মহাগুহ্যতত্ত্ব-উপদেশ' বইয়ের নামের সঙ্গে দারিককে লীলাবজ্রের শিষ্য বলে উল্লেখ করা আছে। লীলাবজ্র বজ্রযোগিণী-সাধনের অন্যতম প্রবর্তক, 'অদ্বয়সিদ্ধি'র লেখিকা লক্ষ্মীংকরার শিষ্য।

৯. সবরপাদ, শবরীপাদ বা শবরীশ্বর চুরাশি সিদ্ধাচার্যের অন্যতম। সাধনমালায় এঁর 'সিতকুরুকুল্লাসাধন' এবং 'বজ্রযোগিন্যারাধনবিধি'—এই দুটি নিবন্ধ আছে। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য মনে করেন, সবরপাদ বজ্রযোগিনী উপাসনার প্রবর্তক। তেঙ্গুরের তালিকায় এঁর 'বজ্রযোগিনী-সাধন', 'কূর্মপাদসিদ্ধি-সাধন', 'বজ্রযোগিনী-গণচক্র-বিধি' প্রভৃতি ১৬ খানি বইয়ের উল্লেখ আছে। 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'য় সংকলিত ২৮ ও ৫০ সংখ্যক পদ সবরপাদের রচনা। উদ্ধৃত অংশ ৫০ সংখ্যক পদ থেকে তোলা হয়েছে। দ্র. *S-M*-II, p. cxiv ; চ-গী-প, পৃ. ২১-২২।

১০. তেঙ্গুরের তালিকায় 'গুহ্য-অভিষেক-প্রক্রিয়া' নামে বীণাপাদের একখানি বইয়ের নাম আছে। টীকাকার মুনিদত্ত 'বৌদ্ধগান ও দোহা'য় সংকলিত এই ১৭ সংখ্যক পদটি বীণাপাদের রচনা বলেছেন, কিন্তু তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে 'বীণা' শব্দ যেভাবে আছে তা কবির ভণিতা মনে হয় না। পদটিতে বীণা যন্ত্রের গড়নের ও নাচগানের রূপক ব্যবহার করা হয়েছে। দ্র. চ-গী-প, পৃ. ১৯।

১১. 'বৌদ্ধগান ও দোহা'য় ভুসুকুর লেখা ৮টি পদ আছে। এই চরণটি ৬ সংখ্যক পদ থেকে উদ্ধৃত।

১২. "শব্দটিতে 'ধ্যৈ' (বা 'ধা') ধাতুর অর্থ প্রকট আছে। যে ভাষায় বা যে শব্দে অভীষ্ট অর্থ অনুধ্যান করিয়া অর্থাৎ মর্মজ্ঞ হইয়া বুঝিতে হয় (সম্ + ধ্যৈ), অথবা যে ভাষায় বা শব্দে অর্থ বিশেষভাবে নিহিত (সম্ + ধা) তাহাই 'সন্ধ্যা' (অথবা 'সন্ধা') ভাষা। একটি চর্যার (১২) ব্যাখ্যার প্রারম্ভে মুনিদত্তের উক্তিতে এই কথারই সমর্থন আছে। — 'পুনরপি তমেবার্থং দ্যূতক্রীড়াধ্যানেন প্রকথয়ন্তি কৃষ্ণাচার্যপাদাঃ।'

"সন্ধ্যাভাষা যে বৌদ্ধ যোগীদের রচনারই বৈশিষ্ট্য ছিল এ দাবি তাঁহারা করেন নাই। অদ্বয়বজ্র এমনও বলিয়াছেন যে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা বৈদিক মন্ত্রের সন্ধ্যা-ভাষার্থ না জানিয়া পশু আলম্ভন করায় তাহাদের পাপ সঞ্চিত হয়। 'তয়া শ্বেতচ্ছাগনিপাতনয়া নরকাদিদুঃখমনুভবন্তি। সন্ধাভাষমজ্ঞা নানস্বাৎ চ।" (চ-গী-প, পৃ. ৩০-৩১)। প্রবোধচন্দ্র বাগচী দেখিয়েছেন 'সন্ধাভাষা'ই ঠিক প্রয়োগ, 'সন্ধ্যাভাষা' নয়। দ্র. "The Sandhābhāṣā and Sandhāvacana", *Studies In The Tantras*, pt. I, Calcutta University 1975.

১৩. বাংলার বৌদ্ধ ঐতিহ্যে দশম-একাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম মনীষী দীপংকরশ্রী জ্ঞান অতিশ-এর জন্ম ৯২৮ খৃস্টাব্দে। বিক্রমণিপুর বা বিক্রমপুরের, মতান্তরে বজ্রাসনের পুবে জাহোর বা সাহোরের রাজা কল্যাণশ্রী ও প্রভাবতীর মেজো ছেলে। ছেলেবেলার নাম চন্দ্রগর্ভ। অল্প বয়সে তিনি আচার্য জেতারির সংস্পর্শে আসেন। তাঁর সময়ে ভারতে বৌদ্ধদর্শনের মাধ্যমিক ও যোগাচার শাখার প্রতিপত্তি অম্লান ছিল, অন্যদিকে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠা সূচিত হয়েছিল। চন্দ্রগর্ভ কৃষ্ণগিরি বিহারে রাহুল গুপ্তর কাছে তান্ত্রিক তত্ত্ব শেখেন, তাঁর নাম হয় গুহ্যজ্ঞানবজ্র। কিন্তু তান্ত্রিক আচারে আবদ্ধ না থেকে তিনি হীনযান ও মহাযান ধারার এবং ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য ও যোগ দর্শনের পূর্ণ জ্ঞান আয়ত্ত করেন। ওদন্তপুরী বিহারের মহাসাংঘিক আচার্য তাঁর নাম দেন দীপংকরশ্রী জ্ঞান; কল্যাণশ্রীর নামের সাদৃশ্যে দীপংকরশ্রী নামই স্বাভাবিক, জ্ঞান সেকালের পণ্ডিতদের প্রচলিত উপাধি। মহিলা পণ্ডিতের উপাধি হত জ্ঞান-ডাকিনী। দীপংকরশ্রীর উদ্দেশে রচিত স্তোত্রে তাঁর প্রধান তিব্বতি শিষ্য হ্রোম্-স্তোন-পা (Ḥbrom-ston-pa) তাঁকে দীপংকরশ্রী নামেই উল্লেখ করেছেন (দ্র. *A-T*, pp. 371-76)। তিব্বতে এবং মঙ্গোলিয়ায় তাঁর অতিশ বা অতীশ নাম প্রচলিত। তিব্বতে বলা হয় জো-বো-র্জে (Jo-bo-rje)-অতিশ, মহাপ্রভু অতিশ। অতিশ সংস্কৃতমূলক শব্দ, সম্ভবত 'অতিশয়' অর্থে প্রযুক্ত। তিব্বতি প্রতিশব্দ ফুল-হ্ব্যুঙ্, (phul-ḥbyuṅ), তুরীয় দশাপ্রাপ্ত। ভারতে থাকতেই দীপংকরশ্রী অতিশ নামে পরিচিত ছিলেন। নগ্-ছো লো-চা-বা (Nag-tsho lo-tsā-ba) বিক্রমশীল মহাবিহারে ভিখারি বালকদের 'ভালা হো ও নাথ অতিশ' সম্বোধন শুনে তাঁকে চিনতে পেরেছিলেন (দ্র. *I-P-L-S*, p 65)। অতিশ ১২ বৎসর বিক্রমশীল মহাবিহারে দ্বার-পণ্ডিত নারো-পার এবং ২ বৎসর বজ্রাসনে মহাবিনয়ধর শীলরক্ষিতের ছাত্র ছিলেন। তারপরে সুবর্ণদ্বীপে (আধুনিক সুমাত্রা) যান

সমকালীন বৌদ্ধজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ধর্মকীর্তি বা ধর্মপালের কাছে পাঠ নিতে। মহাযান বৌদ্ধদর্শনের বিভিন্ন শাখায় গভীরতর জ্ঞান উপার্জন করে ১২ বৎসর পরে দেশে ফেরেন। তখন তাঁর বয়স ৪৪ বৎসর। দেশে ফেরার কিছুদিনের মধ্যে রাজা মহীপালের আহ্বানে ১০২৫/২৬ খৃস্টাব্দে বিক্রমশীল মহাবিহারে মহাচার্য পদে যোগ দেন। ধর্ম সংস্কারের জন্য তিব্বতের রাজা য়ে-শেস্‌হওদ্ (Ye-śes-ḥod)-এর প্রতিনিধি অতিশকে তিব্বতে নিয়ে যাবার চেষ্টায় ব্যর্থ হন। য়ে-শেস্-এর মৃত্যুর পরে তাঁর ভাইপো ব্যঙ্‌-ছুব্‌-হওদ্ (Byaṅ-chub ḥod) রাজা হয়ে নগ্‌-ছো লো-চা-বা-কে পাঠালেন। তাঁর চেষ্টায় অতিশ তিব্বতে যেতে রাজি হলেন। অতিশ দেশ ছেড়ে যাবেন জেনে মহাবিহারের স্থবির রত্নাকরশান্তি বলেছিলেন, "ভারতীয়দের পক্ষে অতিশ চোখের মতো। সে চলে গেলে আমরা অন্ধ হয়ে যাব।" ১০৪০ খৃস্টাব্দে অতিশ নেপালের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন, তখন নয়-পালের রাজত্বকাল। এক বৎসর নেপালে থেকে ১০৪২য়ে তিব্বতে পৌঁছলেন। জীবনের শেষ ১৩ বৎসর কঠোর পরিশ্রম করে তিনি তিব্বতের ধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের পত্তন করেন। তিব্বতে তাঁর মূল কাজ 'বুদ্ধ-শিক্ষা' বা ব্‌কহ্‌-গ্‌দমস্-পা (Bkaḥ-gdams-pa) নামে নতুন ধর্ম-সম্প্রদায় গঠন এবং এই সম্প্রদায়ের শাস্ত্র-গ্রন্থ 'বোধিপথ-প্রদীপ' রচনা। এই গ্রন্থে তিনি হীনযান, মহাযান ও তান্ত্রিক দর্শন এবং সাধন পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করেন। "By systematizing the vital principles of all Buddhist Scriptures into a whole, by combining the ways of cultivation of the two main schools, the one known for its profundity (the school of the Noumenal) and the other for its extensiveness (the School of the Phenomenal), and by synthesizing the teachings of Nāgārjuna, Asaṅga and Śāntideva, this *Śāstra* provides a unique broad path for obtaining good births and emancipation ; and it is the key to the essentials of all sūtras and *Śāstras*." (*E-B*, Vol. III, p. 216)। অতিশ এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ শিষ্যমণ্ডলীর প্রভাবে সমগ্র তিব্বতে ক্রমে শুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম গৃহীত হয় এবং তিনি পূজ্য দেবতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন।

তেঙ্গুরের তালিকায় লেখক ও অনুবাদক রূপে একাধিক দীপংকরের নাম মিশে আছে। যেমন দীপংকর-ভদ্র, ইনি একজন তান্ত্রিক লেখক। দীপংকর-রাজ বা দীপংকর-চন্দ্রও ভিন্ন লেখকের নাম। অতিশের রচনা

বলে চিহ্নিত করা যায় ১৭৪খানি বই। এর মধ্যে ৩৮খানিতে তাঁর নাম আছে শুধু লেখক রূপে, তিনি লিখেছেন এবং অনুবাদও করেছেন ৭৯খানি বই। আর অন্য লেখকের বই অনুবাদ করেছেন ৭৭খানি। ভারতে লুপ্ত হয়ে যাওয়া অনেক বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ তিনি তিব্বতে আবিষ্কার করেন। বৌদ্ধবিদ্যা-চর্চার ইতিহাসে এই সমন্বয়পন্থী মনীষীর মূল রচনা, অনুবাদ ও টীকা বিশিষ্ট সম্পদ।

১০৫৪ খৃস্টাব্দে নবম চান্দ্র মাসের ১৮ তারিখে লাসার কাছে সৃঞে-থঙ্-এ (Sñe-thaṅ) তাঁর মৃত্যু হয়।

অতিশের উদ্দেশে নিবেদিত একটি তিব্বতি প্রশস্তি-শ্লোক—

মান্যবর আসেন নি যতদিন
তিব্বতের মানুষ বাস করত আঁধারে, দৃষ্টিহীনের মতো;
যে-ক্ষণে এলেন তিনি, সেই প্রজ্ঞাবান্ মহাজ্ঞানী,
জ্ঞানসূর্যের উদয় হল এদেশে।

১৪. এই বইয়ে "রত্নাকর শান্তি" প্রবন্ধ দ্র.

১৫. এই বইয়ের পৃ. ২৬১ পৃষ্ঠায় সূত্র ২০ দ্র.

১৬. আদি সিদ্ধাচার্য লুই বাংলা সাহিত্যের প্রথম কবি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কার চর্যাগীতির প্রথম পদ 'কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল' লুইয়ের রচনা। তাঁর লেখা আর-একটি পদ 'ভাব ন হোই অভাব ণ জাই' (২৯ সংখ্যক)। লুইপাদ, লূয়ীপাদ লূয়ীচরণ— এইভাবেও তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলা দেশে মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিবর্তিত শাখা সহজযানের সাধকদের মধ্যে লুইয়ের নাম অগ্রগণ্য, ইনি তিব্বতে আদি সিদ্ধাচার্যরূপে স্বীকৃত। এঁর জীবৎকাল সম্পর্কে মতান্তর আছে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন, সিদ্ধাচার্যদের আবির্ভাবকাল সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। তিব্বতি ভাষায় অনূদিত লুইয়ের পাঁচখানি বইয়ের নাম পাওয়া যায়: ১. 'বজ্রসত্ত্বসাধন', ২. 'বুদ্ধোদয়', ৩. 'ভগবদভিসময়', ৪. 'অভিসময়বিভঙ্গ', ৫. 'তত্ত্বস্বভাবদোহাকোষগীতিকাদৃষ্টি'। 'অভিসময়বিভঙ্গ' বইটির সহ-রচয়িতা এবং তিব্বতি ভাষায় অনুবাদক রূপে দীপংকরশ্রী জ্ঞানের নাম থাকায় লুইকে তাঁর বর্ষীয়ান্ সমকালীন মনে করা যায়। দীপংকরশ্রীর জন্ম ৯৮২ খৃস্টাব্দে। এই সূত্র অনুসারে লুই একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন ধরে নেওয়া যায়। লুই নামটির তিব্বতি রূপান্তর মৎস্যান্ত্রাদ, মৎস্যোদর, মচ্ছঘ্ননাথ, মচ্ছেন্দ্র। পূর্ণতর তথ্যের জন্য দ্র. *H-B*-I, pp. 337-51; *O-R-C*, pp. 41-45, 444-45; *S-M*-II, pp. xxxviii-ix; *B-E*, p. 69; *বা-ই*, পৃ. ৭২০; *চ-গী-প*, ভূমিকা।

৮. বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত

সহজযানের কথা গত মাসে বলিয়াছি। সহজযানের ফল যে অতি বিষময় হইয়াছিল তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। যে পঞ্চকামোপভোগ নিবারণের জন্য বুদ্ধদেব প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে চরিত্র-বিশুদ্ধি বৌদ্ধধর্মের প্রাণ, যে চরিত্র-বিশুদ্ধির জন্য হীনযান হইতেও মহাযানের মহত্ত্ব, যে চরিত্র-বিশুদ্ধির জন্য আর্যদেব[১] 'চরিত্র-বিশুদ্ধি-প্রকরণ' নামে গ্রন্থই রচনা করিয়া গিয়াছেন, সহজযানে সেই চরিত্র-বিশুদ্ধি একেবারেই পরিত্যাগ করিয়া দিল। বৌদ্ধধর্ম সহজ করিতে গিয়া, নির্বাণ সহজ করিতে গিয়া, অদ্বয়বাদ সহজ করিতে গিয়া, সহজযানীরা যে মত প্রচার করিলেন, তাহাতে ব্যভিচারের স্রোত ভয়ানক বাড়িয়া উঠিল। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম 'নেড়ানেড়ি'র দলে গিয়া দাঁড়াইল। সহজযানীরা সন্ধ্যাভাষায়[২] গান লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সন্ধ্যাভাষার অর্থ আলোআঁধারি ভাষা। কানে শুনিবামাত্র একরকম অর্থ বোধ হয়, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলে তাহার গূঢ় অর্থ অতি ভয়ানক। তাঁহারা দেহতত্ত্বের গান লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সমস্ত জগৎব্রহ্মাণ্ড এই দেহের মধ্যেই আছে, তাহাই দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। সুতরাং দেহে আকাশ, কামধাতু, রূপধাতু, অরূপধাতু, সুমেরু সবই রহিল। যে বোধিচিত্ত মহাযান মতে নির্বাণ পাইবার আশায় ক্রমেই আপনার উন্নতি করিতেছিলেন, দেহতত্ত্বের মধ্যে আসিয়া তাহার যে কী দশা হইল তাহা আর লিখিয়া জানাইব না। জানাইতে গেলে সভ্যতার সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। দেশের লোকে এই ইন্দ্রিয়াসক্ত বৌদ্ধদিগকে কী চক্ষে দেখিত তাহা যদি জানিবার ইচ্ছা থাকে, 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'র[৩] তৃতীয় অঙ্কটি একবার মন দিয়া পড়িয়া দেখিবেন। ঐ নাটকখানি ১০৯০ হইতে ১১০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে লেখা হয়। উহাতে বৌদ্ধ ও জৈন যতিদের যে 'কেচ্ছা' দেওয়া আছে, তাহা পড়িলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। বৌদ্ধ-ভিক্ষুরা তখনো খুব বড়োমানুষ, কাষায় বস্ত্র অথবা ছোবানো কাপড় পরেন; কিন্তু সে রেশমের কাপড়। পুঁথি পড়েন—সে পুঁথির পাটায় সোনালি কাজ করা; যে কাপড়ে পুঁথি বাঁধা থাকে,

তাহা রেশমের, তাহার উপর নানা রকম কাজ করা। ভিক্ষুরা তখনো খুব বাবু, বিলাসী ও তাহার উপর অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত।

এই অধঃপাতের একটা দিক। আর-একটা দিক হইতে অধঃপাতের কারণ দেখাই। মহাযান-ধর্ম খুব উঁচু ধর্ম— সেকথা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু মহাযান বুঝিতে, আয়ত্ত করিতে ও মহাযানের মতো কর্ম করিতে বহুকাল লাগে, অনেক পরিশ্রম করিতে হয়— অনেক পড়িতে হয়— অনেক ভাবনাচিন্তা করিতে হয়। ততটা সকলে পারিয়া উঠিত না। মহাযানের আচার্যেরা ইহার জন্য একটা সহজ পন্থা বাহির করিয়া দিয়াছিলেন— তাঁহারা বলিয়া দিয়াছিলেন, তোমরা 'ধারণী' মুখস্থ করো— 'ধারণী' জপ করো— ধারণীর পুঁথি পূজা করো।[৪] তাহা হইলেই তোমাদের মহাযানের পাঠ, স্বাধ্যায়— যোগ— সকলের ফল হইবে। মনে করো 'প্রজ্ঞাপারমিতা' একখানি বৃহৎ গ্রন্থ— পড়িতে অনেক দিন লাগে— আয়ত্ত করিতে আরো দিন লাগে— তাহার মতো কাজ করিতে আরো দিন লাগে। আচার্য বলিয়া দিলেন, 'প্রজ্ঞাপারমিতা হৃদয়-ধারণী'— মুখস্থ করো— তাহা হইলেই তোমার প্রজ্ঞাপারমিতা পাঠের সমস্ত ফল হইবে। এইরূপ যদি "ওঁ নমঃ সমস্তবুদ্ধানাং অপ্রতিহত-শাসনানাং, ওঁ কীলে কীলে তথাগতোঽধ্যবসান্তে বরদে উত্তমোত্তম-তথাগতে ভব ক্রীং ফট্ স্বাহা"[৫]—এইটি কণ্ঠস্থ করো, তাহা হইলে 'গণ্ডব্যূহসূত্র'[৬] পাঠের ফল হইবে।

"ওঁ নমঃ সমস্তবুদ্ধানাং অপ্রতিহতশাসনানাং, ওঁ ধুণু ধুণু ক্রীং ফট্ স্বাহা"[৭]—এই ধারণী পাঠ করিলে 'সমাধিরাজসূত্র'[৮] পাঠের ফল হইবে।

"ওঁ নমঃ সমস্তবুদ্ধানাং অপ্রতিহতশাসনানাং, ওঁ মণিধরি বাজ্রিণি মহাপ্রতিসরে ক্রীং ক্রীং ফট্ ফট্ স্বাহা"[৯]— এই মন্ত্র পাঠ করিলে 'মহা-প্রতিসরা'[১০] পাঠের ফল হইবে।

এইরূপে যে কত ধারণী তৈয়ার হইয়াছিল তাহার সংখ্যা করা যায় না। এক 'বৃহদ্ধারণী সংগ্রহে' আমরা চারি শত এগারোটি ধারণী পাইয়াছি। ক্রমে ধারণী মুখস্থ করাও কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। তখন এক অক্ষর—দুই অক্ষর— মন্ত্র হইতে লাগিল। মন্ত্রপাঠ, মন্ত্রজপ, বৌদ্ধ-ধর্মের শেষ অবস্থা হইয়া দাঁড়াইল। তখন 'হুং' 'ফট্' 'ক্রীং' 'স্বাহা' এই-সকল শব্দের প্রচুর ব্যবহার হইতে লাগিল। বৌদ্ধেরা ইহাতেই

আপনাদের কৃতার্থ মনে করিতে লাগিলেন। যে মহাযান-ধর্ম চিন্তাশক্তির চরম সীমায় উঠিয়াছিল মন্ত্রযানে তাহা ক্রমে 'হুং' 'ফট্' 'স্বাহা'য়— দাঁড়াইল। ইহা কি অধঃপাত নহে।

বৌদ্ধধর্মে দেবতার সংস্রব নাই— দেবতার পূজা-অর্চা হীনযানে ছিলই না। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর কতদিন পরে বুদ্ধদেবের মূর্তি বিহারে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, তাহা লইয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের এখনো মতভেদ আছে—কেহ বলেন, চারি শত বৎসর পরে, কেহ বলেন, পাঁচ শত বৎসর পরে। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে গেলে গান্ধার-শিল্পের কুঠরিতে প্রথম বুদ্ধদেবের মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি বুদ্ধের পাঁচ-ছয় শত বৎসর পরে নির্মিত হয়। মহাযানেও শাক্যসিংহের মূর্তি বিহারে বিহারে থাকিত। তাঁহারা উহাকে নির্বাণ লাভের উপায় বলিয়া মনে করিতেন। ক্রমে একটি-একটি করিয়া ধ্যানীবুদ্ধ[১১] আসিতে লাগিলেন। প্রথম 'অমিতাভ', তারপর 'অক্ষোভ্য', তারপর 'বৈরোচন', তারপর 'রত্নসম্ভব', তারপর 'অমোঘসিদ্ধি' আসিয়া জমিলেন। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের মগধ-কুঠরিতে অনেকগুলি চৈত্য বা স্তূপ আছে। তাহার চারি দিকে চারিটি 'তথাগতের' মূর্তি আছে। প্রথম তথাগত 'বৈরোচন' স্তূপের মধ্যেই থাকিতেন। তাঁহার জন্য স্তূপের গায়ে কুলুঙ্গি কাটা হইত না। ক্রমে তিনিও আসিয়া অগ্নিকোণে জমিলেন। শাক্যসিংহ তখন একেবারে উপায় হইয়া গিয়াছেন— স্তূপে তাঁহার স্থান নাই— তাঁহার স্থান বিহারের মধ্যস্থলে যে মন্দির—তাহাতে। তখনকার বৌদ্ধেরা বলিতেন, তিনি 'পঞ্চ তথাগতে'র অথবা পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের কলম মাত্র—তিনি পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের মত কলমবন্দি করিয়া গিয়াছেন। ক্রমে এই পঞ্চ তথাগতের পাঁচটি শক্তি দাঁড়াইল। শক্তিগণের নাম— 'লোচনা', 'মামকী', 'তারা', 'পাণ্ডরা', 'আর্যতারিকা'। বহুকাল অবধি তাঁহারা যন্ত্রে[১২] থাকিতেন, তাঁহাদের মূর্তি ছিল না—ক্রমে তাঁহাদেরও মূর্তি হইল। পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের পঞ্চ শক্তিতে পাঁচ জন 'বোধিসত্ত্ব'[১৩] হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে 'মঞ্জুশ্রী' ও 'অবলোকিতেশ্বর' প্রধান। বর্তমান কল্পে অর্থাৎ ভদ্রকল্পে 'অমিতাভ' প্রধান ধ্যানীবুদ্ধ। তাঁহার বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর—প্রধান বোধিসত্ত্ব। অবলোকিতেশ্বর করুণার মূর্তি। তিনি মহোৎসাহে জীব উদ্ধার করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার পূজা খুব আরম্ভ হইল। সেবকের

উৎসাহ অনুসারে তাঁহার অনেক হস্ত হইতে লাগিল—অনেক পদ হইতে লাগিল—অনেক মস্তক হইতে লাগিল ; তাঁহার পূজা একটা প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া উঠিল। তারাদেবীও নানা রূপ ধারণ করিয়া বৌদ্ধদের পূজা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইহার পর অনেক ডাকিনী, যোগিনী, পিশাচী, যক্ষিণী, ভৈরব, বুদ্ধগণের উপাস্য হইয়া দাঁড়াইল। এক 'অভিধ্যানাত্তর তন্ত্রে' 'সম্বরবজ্র' 'পীঠপর্ব' 'বজ্রসত্ত্ব' 'পীঠদেবতা' 'ভেরুক' [হেরুক ?] 'যোগবীর' 'পীঠমালা' 'বজ্রবীর-ষড়্‌যোগসম্বর' 'অমৃতসঞ্জীবনী' 'যোগিনী' 'কুলডাক' 'যোগিনী যোগ-হৃদয়' 'বুদ্ধকাপালিকযোগ' 'মঞ্জুবজ্র' 'নবাক্ষরালীডাক' 'বজ্রডাক' 'চোমক' প্রভৃতি অনেক ভৈরব ও যোগিনীর পূজাপদ্ধতি আছে। বোধিসত্ত্ব ও যোগিনীগণের ধ্যানকে সাধন বলে। যে পুস্তকে অনেক ধ্যান লেখা আছে তাহাকে 'সাধনমালা'[১৪] বলে। একখানি 'সাধনমালা'য় দুই শত ছাপ্পান্নটি সাধন আছে। 'বজ্রবারাহী', 'বজ্রযোগিনী', 'কুরুকুল্লা', 'মহাপ্রতিসরা', 'মহামায়ূরী', 'মহাসাহস্র প্রমর্দ্দিনী' প্রভৃতি অনেক যোগিনীর ধ্যান ইহাতে আছে। এই-সকল সাধন লইয়া মূর্তি নির্মাণে বৌদ্ধকারিগরেরা এক সময়ে যথেষ্ট বাহাদুরি দেখাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু যখন যোগিনী, ডাকিনী, ভৈরবীর পূজা লইয়া ও তাঁহাদের মূর্তি লইয়া বৌদ্ধধর্ম চলিতে লাগিল, তখন আর অধঃপতনের বাকি কী রহিল ?

বৌদ্ধধর্মের মধ্যে 'গুহ্যপূজা' আরম্ভ হইল। লুকাইয়া লুকাইয়া পূজা করিব—কাহাকেও দেখিতে দিব না ; এ পূজার অর্থ কী ? অর্থ এই যে, সে-সকল দেবমূর্তি লোকের সম্মুখে বাহির করা যায় না। ঐ-সকল মূর্তির নাম—উহারা বলিত শম্বর। একে তো অশ্লীল মূর্তি—তাহাতে ভালো কারিগরের হাতের তৈয়ারি—তাহাতে অশ্লীলতার মাত্রা চড়িয়া গিয়াছে। সেই-সকল মূর্তি যখন বুদ্ধদের প্রধান উপাস্য হইয়া দাঁড়াইল—তখন আর অধঃপাতের বাকি রহিল কী ? সে-সকল উপাসনার প্রকার আরো অশ্লীল—সভ্যসমাজে বর্ণনা করা যায় না। একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন, বৌদ্ধদের এই-সকল পুঁথি 'ঘোমটা দেওয়া কাম-শাস্ত্র'। আমি বলি, তিনি ইহা ঠিক বর্ণনা করিতে পারেন নাই। যেখানে কামশাস্ত্রের শেষ হয়, সেইখানে বুদ্ধাদিগের গুহ্যপূজা আরম্ভ। অধিক পুঁথির নাম করিব না। 'গুহ্যসমাজ'[১৫] বা 'তথাগত গুহ্যক' নামে

বৌদ্ধদের একখানি পুথি আছে। এই পুস্তক সম্বন্ধে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলিয়াছেন—

"... but in working it out, theories are indulged in, and practices enjoined which are at once the most revolting and horrible that human depravity could think of, and compared to which the worst specimens of Holiwell Street literature of the last Century would appear absolutely pure." [*S-B-I-M*, p. 261]

অর্থাৎ এই বড়ো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইঁহারা যে-সকল মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং যে-সকল ক্রিয়াকর্মের উপদেশ দিয়াছেন, যত জঘন্য স্বভাবেরই মানুষ হউক না কেন, তাহা অপেক্ষা ভয়ানক ও ঘৃণিত মত বা ক্রিয়াকর্মের কল্পনাও করিতে পারে না। ইহার সহিত তুলনা করিলে গত শতকে হোলিওয়েল স্ট্রিটে[১৬] যে-সকল পুথি-পাঁজি বাহির হইত তাহা অতি পবিত্র বলিয়া মনে হয়। বুদ্ধদেব প্রাণীহিংসার একান্ত বিরোধী ছিলেন, কিন্তু 'তথাগত গুহ্যকে' বলিতেছে—

"হস্তিমাংসং হয়মাংসং শ্বানমাংসং তথোত্তমম্।
ভক্ষয়েদাহারকৃত্যর্থন্ন চান্নন্তু বিভক্ষয়েৎ ॥"
"অন্নং বা অথ বা পানং যৎকিঞ্চিৎ ভক্ষয়েৎ ব্রতী।
বিণ্মূত্রমাংসযোগেন বিধিবৎ পরিকল্পয়েৎ ॥"
"সময়চতুষ্টয়ং রক্ষ বুদ্ধজ্ঞানোদধিপ্রভোঃ।
বিণ্মূত্রং তু সদা ভক্ষ্যমিদং গুহ্যং মহাদ্ভূতং ॥"[১৭]

এই তো গেল আহারের কথা। গুহ্যসিদ্ধি লাভ করিতে গেলে বিষ্ঠা, মূত্র নিশ্চয়ই খাওয়া চাই— নহিলে কিছুতেই সিদ্ধিলাভ হইবে না। অন্যকথা খুলিয়া বলিতে গেলে সভ্যতার সীমা অতিক্রম করা হয়, হয় তো পিনাল কোডের ধারায়ও পড়িতে হয়। তবে একটা কিছু না বলিলে নয়— তাই একটি নমুনা দিতেছি—

"দ্বাদশাব্দিকাং কন্যাং চণ্ডালস্য মহাত্মনঃ।
সেবয়েৎ সাধকো নিত্যং বিজনেষু বিশেষতঃ ॥"[১৮]

মোটকথা এই যে—

"দুষ্করৈর্নিয়মৈস্তীব্রৈঃ সেব্যমানো ন সিদ্ধ্যতি।
সর্বকামোপভোগৈশ্চ সেবয়ংশ্চাশু সিদ্ধ্যতি ॥"

অর্থাৎ দুষ্কর কঠোর নিয়ম করিয়া সেবা করিলে কিছুতেই সিদ্ধি লাভ হয় না— সর্বপ্রকার কামোপভোগ করিয়া যদি সেবা করো— তাহা হইলে নিশ্চয় শীঘ্র সিদ্ধি লাভ হইবে।

বুদ্ধদেবের শীলরক্ষা, উচ্চাসন ও মহাসন ত্যাগ, মালাগন্ধবিলেপনাদি ত্যাগ, নৃত্যগীতবাদিত্রাদি ত্যাগ, প্রভৃতি কঠোর নিয়ম কোনো কাজেরই নয়, কেবল যথেচ্ছাচার করো— যথেচ্ছাচার করো— যথেচ্ছাচার করো। অধঃপাতের আর বাকি কী ?

'তথাগত গুহ্যকে'র ন্যায় আরো অনেক পুস্তক আছে। 'চণ্ড-মহারোষণ তন্ত্র', 'চক্রসম্বর তন্ত্র', 'চতুষ্পীঠ তন্ত্র', উষ্ণীষ তন্ত্র', 'সেকোদ্দেশ', 'পরমাদিবুদ্ধোদ্ধৃত কালচক্র', 'কালচক্রগর্ভতন্ত্র', 'সর্ববুদ্ধসমাযোগ ডাকিনী-জাল সম্বরতন্ত্র'. 'হেবজ্রতন্ত্ররাজ'. 'আর্য্যডাকিনীবজ্রপঞ্জরমহাতন্ত্ররাজকল্প', 'মহামুদ্রাতিলক', 'জ্ঞানগর্ভ', 'জ্ঞানতিলক' নামে 'যোগিনীতন্ত্ররাগপরম-মহাদ্ভুত','তত্ত্বপ্রদীপ', 'বজ্রডাক', 'ডাকার্ণব', 'মহাসম্বরোদয়', 'হেরুকাভ্যুদয়', 'যোগিনীসঞ্চার্য্য', 'সম্পুট-তন্ত্র'. 'চতুর্যোগিনী সম্পুট', 'গুহ্যবজ্র', ইত্যাদি। আর কত নাম করিব— কত নাম করিয়া পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি করিব ? এ-সকল তন্ত্র 'তথাগত গুহ্যক' হইতে একবিন্দুও ভালো নয়। যখন এইরূপ শত শত পুস্তক আছে— সে-সকল পুস্তক পড়া হইত— সেইরূপ ক্রিয়াকর্ম হইত— তখন আর অধঃপাতের বাকি কী ?

এ-সকল গুহ্যতন্ত্র— মূলতন্ত্র— সংগীতি আকারে লেখা। সংগীতির গোড়াতে এইরূপ থাকে, "এবং ময়া শ্রুতমেকস্মিন সময়ে ভগবান শ্রাবস্ত্যাং জেতবনে বিহরতি স্ম, অথবা রাজগৃহে বেণুবন্যে, বিহরতি স্ম, অথবা এইরূপ আর কোনো স্থানে বিহরতি স্ম।" অর্থাৎ আমি শুনিয়াছি একদিন ভগবান্ শ্রাবস্তী নগরে অথবা রাজগৃহে বেণুবনে অথবা আরো এইরূপ কোথাও বেড়াইতেছেন। এই-সকল গুহ্য উপাসনার গ্রন্থগুলিও এই ভাবে লেখা, তবে শ্রাবস্ত্যাং বিহরতি স্ম নাই— তাহার বদলে যাহা আছে তাহা কলমের মুখে আসে না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে— এই-সকল গুহ্যবিদ্যার পুস্তকের আবার টীকা,

টিপ্পনী, পঞ্জিকা, ব্যাখ্যা, বিবরণ, উহার প্রয়োগপদ্ধতিপ্রকরণ আছে। মূল যদি বিশখানি থাকে— টীকা-টিপ্পনীতে তাহা পাঁচ শত হইয়া দাঁড়ায়। একজন ইউরোপীয় লেখক বলিয়া গিয়াছেন— ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণ খুঁজিতে গেলে এই-সকল জঘন্য বই ঘাঁটিতে হইবে। ভবিষ্যতে কোন্ হতভাগ্য পণ্ডিতের অদৃষ্টে যে সে দুর্ভোগ আছে তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু সে দুর্ভোগ না ভুগিলেও এত বড়ো জাতিটা— এত বড়ো ধর্মটা— কেন যে অধঃপাতে গেল, তাহা তো বুঝা যায় না। তাই কাহাকেও-না-কাহাকে একদিন সে দুর্ভোগ ভুগিতেই হইবে। কিন্তু যে ভুগিবে সে সত্য সত্যই ভারতের একটা মহা-উপকার সাধন করিয়া যাইবে। সে অন্তত বলিবে— "বাপু! এ পথে আর আসিও না— এ পথে আসিলে অধঃপতন অবধারিত।"

বুদ্ধদেব দেবতা মানিতেন না। মানুষ আপনা হইতেই চরিত্রশুদ্ধি করিয়া ক্রমে লোকে যাহাদের দেবতা বলে, তাহাদের অপেক্ষাও উচ্চ যে পরমপদ— যে পদে গেলে জন্ম-জরা-মরণের আর ভয় থাকিবে না— যে পদে গেলে সংসারের কোনো চিন্তা থাকে না— যে পদে গেলে মহাশান্তি লাভ করা যায়— সেই পদে উঠিতে পারিবে। তাঁহার শিষ্যেরা শেষ ডাক, ডাকিনী, যোগিনী, প্রেত, প্রেতিনী, পিশাচ, পিশাচিনী, কটপূতনা, কঙ্কালিনী, ভৈরব, ভৈরবী প্রভৃতির উপাসনা করিয়া আপনারাও অধঃপাতে গেল— সঙ্গে সঙ্গে দেশটাসুদ্ধ অধঃপাতে দিল।

বৌদ্ধধর্মে অনেক দিন হইতেই ঘুণ ধরিয়াছিল। বুদ্ধদেব নিজে যেদিন স্ত্রীলোকদিগকে দীক্ষা দিয়া ভিক্ষুণী করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন — সেইদিন হইতেই তাঁহাকে সংঘের বিশুদ্ধি রক্ষার জন্য অনেক কঠোর নিয়ম করিতে হইয়াছিল। তিনি ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের এক বিহারে থাকিতে দিতেন না। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পাঁচ-ছয় শত বৎসর পর হইতে ভিক্ষুরা ক্রমে বিবাহ করিতে লাগিল— ক্রমে একদল গৃহস্থ ভিক্ষু হইল। এইখান হইতেই ঘুণ ধরা আরম্ভ হইল। সমাজে আসল ভিক্ষুদের খাতির অধিক ছিল। গৃহস্থ ভিক্ষুদের আদর তত ছিল না। কিন্তু গৃহস্থ ভিক্ষুদের নাম ছিল 'আর্য'। আসল ভিক্ষুরা আর্যদের নমস্কার করিতেন না, কিন্তু আর্যরা অনার্য হইলেও আসল ভিক্ষুদের নমস্কার করিতেন। এই গৃহস্থাশ্রমের ভিক্ষুরাই ক্রমে দলে পুরু হইতে লাগিল।

কারণ তাহাদের সন্তান-সন্ততি হইত— তাহারা আপনা-আপনি ভিক্ষু হইয়া যাইত। একজন গৃহস্থ গৃহস্থাশ্রম ছাড়িয়া যদি ভিক্ষু হইতে যাইত— তাহাকে প্রথম 'ত্রিশরণ' গ্রহণ করিতে হইত— তাহার পর 'পুণ্যানুমোদনা'[১৯] শিখিতে হইত, 'পাপদেশনা'[২০] শিখিতে হইত, 'পঞ্চশীল' গ্রহণ করিতে হইত, 'অষ্টশীল' গ্রহণ করিতে হইত, 'দশ-শীল'[২১] গ্রহণ করিতে হইত, 'পোষধব্রত'[২২] ধারণ করিতে হইত— আরো কত কী করিতে হইত— অনেক সময় যাইত। কিন্তু গৃহস্থ ভিক্ষুর ছেলে— সে একেবারেই ভিক্ষু হইত। যে-সকল জিনিস অন্যকে বহু-কালে শিখিতে হইত, সে সে-সকল বাড়িতেই শিখিত— তবে আমাদের যেমন এখন পইতা হয়— একটা সংস্কার মাত্র— উহাদেরও ঐ রকম 'ত্রিশরণ গমন', 'পঞ্চশীল গ্রহণ', এক-একটা সংস্কারের মতো হইয়া যাইত। আমাদের দেশে যেমন 'জাত-বৈষ্ণব' বলিয়া একটা জাতি হইয়াছে— সেকালেও তেমনি 'জাত-ভিক্ষু' বলিয়া একটি জাতির মতো হইয়াছিল। উহাদের যত দলপুষ্টি হইতে লাগিল, আসল ভিক্ষুদের অবস্থা তত হীন হইতে লাগিল। গৃহস্থ ভিক্ষুরা কারিগরি করিয়া জীবন নির্বাহ করিত— ভিক্ষাও করিত— কেহ বা রাজমজুর হইত, কেহ বা রাজমিস্ত্রি হইত, কেহ বা চিত্রকর হইত, কেহ বা ভাস্কর হইত, কেহ বা স্যাকরা হইত, কেহ বা ছুতার হইত— অথচ ভিক্ষাও করিত, ধর্মও করিত, পূজা-পাঠও করিত। বৌদ্ধধর্মের পৌরোহিত্যটা ক্রমে নামিয়া আসিয়া কারিগরদের হাতে পড়িল। যে কাজে পরিশ্রম কম— ঘরে বসিয়া করা যায় একটু হাত পাকিলে কাজও ভালো হয়— দু পয়সা আসেও বেশি, গৃহস্থ-ভিক্ষু সেই-সকল কাজ করিত। সুতরাং তাহাদের ধর্ম করিবার সময়ও থাকিত— বড়ো বড়ো উৎসবে দু-চার পয়সা খরচও করিতে পারিত। কিন্তু বেশি লেখাপড়া শেখা, ধ্যানধারণা করা, ভাবনাচিন্তা করার সময়ও থাকিত না— প্রবৃত্তিও থাকিত না। তাহা হইলেই মোট দাঁড়াইল এই যে, বৌদ্ধধর্মের পৌরোহিত্যটা মূর্খ কারিগরদের হাতে পড়িয়া গেল। আসল ভিক্ষুরা বিহারে থাকিতেন। বিহারের জমিজমার আয় হইতে কোনোরূপে দিন গুজরান করিতেন। ক্রমে রাজারা প্রায় বিধর্মী হইয়া উঠিল। বৌদ্ধ-পণ্ডিত হইলে যে রাজসম্মান পাইবেন তাহার উপায় রহিল না। রাজারাও ছোটো ছোটো রাজা— আপনাদের পণ্ডিত

পোষণ করিয়া আবার যে বিধর্মী বৌদ্ধ-পণ্ডিত প্রতিপালন করিবেন, তাঁহাদের সে সাধ্য ছিল না—থাকিলেও তাঁহাদের পণ্ডিতেরা তাহা করিতে দিত না। সুতরাং আসল ভিক্ষুদের এবং তাহাদের বিহারের অবস্থা ক্রমে শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইল। এমন সময়ে আফ্‌গানিস্তানের উপত্যকা হইতে পাঠানেরা মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইয়া এবং মুসলমান ধর্ম প্রচারের জন্য কোমর বাঁধিয়া অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাফের বলিয়া তাহাদের উচ্ছেদ সাধনের জন্য বঙ্গ দেশে আসিয়া পড়িলেন। যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের বংশধরেরা এখনো আসিতেছেন। ইঁহাদের পূর্বপুরুষেরা ইঁহাদের অপেক্ষা যে বেশি জ্ঞানী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তখন বাংলায় তো সেনবংশ রাজা—কিছু বড়ো রাজা মাত্র। আশে পাশে চারি দিকে অনেক ছোটো ছোটো রাজা ছিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ বৌদ্ধও ছিলেন। বল্লালের সময় ব্রাহ্মণদের একটা আদমসুমারি লওয়া হয়। সে সময়ে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র আট শত ঘর ব্রাহ্মণ ছিল। আট শত ঘর ব্রাহ্মণে যতটুকু হিন্দু করিয়া লইতে পারে, দেশের ততটুকু হিন্দু ছিল—অবশিষ্ট সবই বৌদ্ধ। বৌদ্ধেরা পুতুল পূজা খুব করিত। সুতরাং মুসলমান আক্রমণের রোকটা বৌদ্ধদের উপরই পড়িয়া গেল। তাঁহারা বৌদ্ধদের বিহারগুলি সব ভাঙিয়া ফেলিলেন। এক ওদন্তপুরী[২৩] বিহারেই দুই হাজার আসল ভিক্ষু বধ হইল। বিহারটি ভাঙিয়া ফেলা হইল পাথরের মূর্তিগুলি ভাঙিয়া-চুরিয়া ফেলা হইল; সোনা রুপা তামা পিতল কাঁসার মূর্তিগুলি গালাইয়া ফেলা হইল; পুথিগুলি পোড়াইয়া দেওয়া হইল। বিক্রমশীল[২৪] বিহারেরও এই দশাই হইয়াছিল। নালন্দা[২৫] জগদ্দল[২৬] প্রভৃতি বড়ো বড়ো বিহারের এই দশা হইল। ওদন্তপুরী বিহারের ঢিবি খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে—নালন্দা বিহারেরও ঢিবি খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে। বিক্রমশীল ও জগদ্দলের এখনো কোনো খোঁজ হয় নাই। আসল ভিক্ষু এই সময় হইতেই একরূপ লোপ হইয়াছে। যাহারা পলাইয়াছিল তাহারা নেপাল, তিব্বত, মঙ্গোলিয়ায় চলিয়া গিয়াছিল, কতক বর্মায় ও সিংহলে গিয়াছিল। সুতরাং বাংলায় বৌদ্ধদের বিদ্যাবুদ্ধি, পুথি-পাঁজির এই পর্যন্ত শেষ।

এক-একবার মনে হয় তিন-চারি শত বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধেরা ইন্দ্রিয়াসক্ত, কুকর্মান্বিত ও ভূতপ্রেতের উপাসক হইয়া যে নিজেও অধঃ-

পাতে গিয়াছিল এবং দেশটাকে সুদ্ধ অধঃপাতে দিয়াছিল, মুসলমানদের আক্রমণ তাহারই প্রায়শ্চিত্ত। বিধাতা যেন তাহাদের পাপের ভরা সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য মুসলমান-দের এদেশে পাঠাইয়াছিলেন। তাহাদের সেই ঘৃণিত উপাসনা, বিষ্ঠা-মূত্র ভক্ষণ করিয়া সিদ্ধিলাভের চেষ্টা, ভূতপ্রেত পূজা করিয়া বুজরুক হইবার চেষ্টা এবং উৎকট ইন্দ্রিয়াসক্তিকেই ধর্ম বলিয়া মনে করা ও তাহাই শিখানো— এই-সকলের পরিণামে তাহাদিগকে বঙ্গ দেশ চির-কালের জন্য ছাড়িতে হইল।[২৭] দেশে রহিল— কারিগর পুরোহিত ও তাহাদেরই যজমান। লেখাপড়া বুদ্ধিবিদ্যার নামগন্ধ পর্যন্ত বৌদ্ধদের মধ্যে লোপ পাইল। ইহার পর কী হইল পরে বলা যাইবে।

'নারায়ণ'
আশ্বিন, ১৩২২ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. এই বইয়ের পৃ. ২৭৬ সূত্র ৫ দ্র.

২. এই বইয়ের পৃ ৩৬৯ সূত্র ১২ দ্র.

৩. এই বইয়ের পৃ. ১৮২ সূত্র ৮ দ্র.

৪. ধারণী দীর্ঘ মন্ত্র। ৫০ থেকে ১০০ অক্ষরে রচিত। হৃদয়-ধারণী এর চেয়ে দীর্ঘ মন্ত্র।

"Just at this point it is necessary··· to explain what the ardent Mahā-yānist philosopher did for the benefit of those who were either unable or incapable of so much study and meditation as is required to understand the subtle theories of Mahā-yāna. They invented *Dhāraṇīs* for them. They are rather long Mantras and a philosopher said to his disciples, 'Read, recite and repeat' this *Dhāraṇī* and you will get all the benefit of studying such and such work and practising such and such Dhyāna. The Mantras will hold you fast to your creed and so they are called *Dhāraṇīs*. The *Dhāraṇīs* generally range from fifty to hundred-syllables. In the fifth or sixth century A.D. all Indians, Hindus and Buddhists alike, had *Hṛdaya Mantras* rather longish, certainly longer than *Dhāraṇīs*, giving the essence of certain creeds. Thus Prabhakara-Vardhana repeated the Āditya Hṛdaya Mantra, his elder son, Rājya-Vardhana, repeated the Prajñā-Pāramitā Hṛdaya Mantra and his younger son, Harṣa-Vardhana, repeated the Maheśvara

Hṛdaya Mantra. These Mantras are simply symbolic; they symbolised particular creeds, particular schools and particular works. If so, if it is all symbol, why not make the symbol as short as possible. So they began to take the initial letter as the symbol of the idea in the case of Buddhists, and of the deity in the case of the Hindus. But after a certain time they gave up taking the initial letters. They evolved out of the shapes of different characters of the alphabet, the form of different deities. Thus অ is Viṣṇu, আ written with a hook below is Ananta, the serpent God who often remains coiled Kuṇḍalita, ই used to be written with three dots and so that letter represented Tri-vikrama, and so on, to the end of the alphabet. These were called the Bījas and the Yogīs used to evolve out of these Bījas the form of the deities whom they worshipped." Shastri, *Advayavajra-Saṁgraha*, G-O-S, No. XL, pp. xxviii-xxix.

৫. অনুবাদ : ওঁ নমস্কার সকল বুদ্ধকে যাঁদের ক্ষমতার সীমা নেই। ওঁ কীলে কীলে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত তথাগত, বরদানকারী পরে পরে উত্তম তথাগত হও ক্লীং ফট্‌ স্বাহা।

৬. মহাযানের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নয়খানি শাস্ত্র গ্রন্থ 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞা-পারমিতা', 'সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক', 'ললিতবিস্তর', 'লঙ্কাবতার', 'সুবর্ণ-প্রভাস', 'গণ্ডব্যূহ', 'তথাগতগুহ্যক', 'সমাধিরাজ' এবং 'দশভূমীশ্বর'; এই ধর্ম-পর্যায়কে বলা হয় বৈপুল্য-সূত্র। এখানে 'ধর্ম' শব্দটি 'শাস্ত্র' অর্থে প্রযুক্ত।

'গণ্ডব্যূহ' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে বোধি লাভের জন্য সুধন নামে এক যুবকের আয়াসের বিবরণ। মঞ্জুশ্রী সুধনকে ভগবান বুদ্ধের অলৌকিক ক্ষমতার কথা শোনালে সে মঞ্জুশ্রীর প্রশস্তি করে এবং বোধি লাভের আকাঙ্ক্ষা জানায়। মঞ্জুশ্রী তাকে মেঘশ্রীর কাছে যেতে বলেন। মেঘশ্রী সাগরমেঘের কাছে যেতে বলেন। এমনি করে বহু জনের কাছে ঘুরে ঘুরে অতৃপ্ত সুধন বুদ্ধের স্ত্রী গোপা এবং মা মায়ার কাছে উপস্থিত হল। এঁদের কাছে আংশিক জ্ঞান অর্জন করে সে গেল সুরেন্দ্রাভার কাছে,

সেখান থেকে কপিলবাস্তুর বিশ্বামিত্রর কাছে। প্রতিবার গুরু বদলের সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞানও বাড়ল। মৈত্রেয় তাকে বললেন, মঞ্জুশ্রী ভিন্ন আর কেউ পূর্ণজ্ঞান অর্জনে সাহায্য করতে পারবেন না। শেষ পর্যন্ত সুধন আবার মঞ্জুশ্রীরই শরণ নিল এবং তাঁর আনুকূল্যে সমন্তভদ্রর কাছ থেকে পূর্ণজ্ঞান অর্জন করল। দ্র. *S-B-L-N*, p. 90 ; Daisetz Teitaro Suzuki and Hokei Idzumi ed. *The Gaṇḍavyūha Sūtra*, Tokyo 1949.

৭. অনুবাদ : ওঁ নমস্কার সকল বুদ্ধকে যাঁদের ক্ষমতার সীমা নেই। ওঁ ধুনে ফেলো ধুনে ফেলো (সমস্ত কর্মফল) ক্রীং ফট্ স্বাহা।

৮. 'সমাধিরাজ' গ্রন্থের বিষয় বিভিন্ন ধরনের সমাধির বিবরণ, যার মধ্যে সমাধির রাজা বা শ্রেষ্ঠ সমাধি হল সর্বধর্মস্বভাবসমতাবিপশ্চিত সমাধি। ৪২ পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ এই গ্রন্থে কোনো সাধক কিভাবে ধাপে ধাপে সাধনার পথে এগিয়ে চরম সিদ্ধি অর্জন করতে পারে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কথোপকথনের ঢঙে লেখা। চন্দ্রপ্রভ প্রশ্ন করছেন, উত্তর দিচ্ছেন বুদ্ধদেব। উত্তর দিতে গিয়ে বুদ্ধদেব নিজের পূর্ব পূর্ব জন্মের অভিজ্ঞতার কথা বলছেন। এই আলাপচারি অনুষ্ঠিত হচ্ছে রাজগিরের গৃধ্রকূট পাহাড়ে। দ্র. *S-B-L-N*, p. 207.

৯. অনুবাদ : ওঁ নমস্কার সকল বুদ্ধকে যাঁদের ক্ষমতার সীমা নেই। ওঁ মণি ধারণকারিণী, বজ্র ধারণকারিণী (=বজ্রেশ্বরী ?) মহান্ রক্ষয়িত্রী ক্রীং ক্রীং ফট্ ফট্ স্বাহা।

১০. 'মহাপ্রতিসরা', 'মহাসহস্রপ্রমর্দিনী', 'মহামায়ূরী', 'মহারক্ষামন্ত্রানুসারিণী' এবং 'মহাশিতবতী' এই পাঁচখানি বই 'পঞ্চরক্ষা' নামে উল্লেখ করা হয়। 'পঞ্চরক্ষা' জাদুমন্ত্রের সংকলন। বলা হয়— গ্রহের ফের ; হিংস্র প্রাণী, বিষাক্ত কীট ও রোগের আক্রমণ রোধের জন্য বুদ্ধদেব এইসব মন্ত্র প্রকাশ করেছিলেন। মহাপ্রতিসরা মন্ত্রটি এই রকম—"ওঁ বিপুল-গর্ভে বিপুল-বিমলে বিমল-গর্ভে বিপুল-বিমল-বিমল-গর্ভে বিমলে জয়-গর্ভে বজ্রজ্বাল-গর্ভে গতিগহনে গগন-বিশোধনে সর্বপাপ-বিশোধনে।"— ইত্যাদি। এই মন্ত্র-শক্তির প্রমাণস্বরূপ অনেক গল্পের অবতারণা করা হয়েছে।

পঞ্চরক্ষার প্রতিটি বইয়ের পুথির প্রথম পাতায় এক-একটি দেবীরূপ আঁকা আছে। মহাপ্রতিসরার চার মুখ, আট হাত ; দুটি সিংহের উপরে বসা মূর্তি। দেবীর এবং সিংহের গায়ের রঙ সাদা।

কিন্তু মুখ চারটি চার রঙের— সবুজ, সাদা, লাল এবং হলুদ। এইসব দেবীর মূর্তি গড়ে পুজো করা হত। রাজসাহি চিত্রশালায় একটি মহাপ্রতিসরা মূর্তি আছে। এশিয়াটিক সোসাইটি সংগ্রহে পুথি সংখ্যা 4078 (বাংলা কুটিল অক্ষরে লেখা) এবং 9970 (নেওয়ারি অক্ষরে লেখা)। দ্র. *S-B-L-N*, p. 168.

১১. এই বইয়ের পৃ. ৩৩৬ সূত্র ১০ দ্র.

১২. যন্ত্র দেবতার প্রতীক। মূর্তি পূজার মতো যন্ত্র পূজার বিধান আছে। সোনা, রূপা, তামার পাতে কিংবা ভূর্জপাতায় যন্ত্র আঁকা হয়ে থাকে।
বজ্রযানের দেবতা বৈরোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, অমোঘসিদ্ধি, অক্ষোভ্য— এই পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের মূর্তির বাঁ পাশে একটি ত্রিকোণ যন্ত্রে এঁদের শক্তির প্রতীক আঁকা হত।

১৩. এই বইয়ের পৃ. ২৫৬ সূত্র ১৪ দ্র.

১৪. Benoytosh Bhattacharya ed. *SĀDHANAMĀLĀ*, Vol. I and II, G-O-S 1968, pp. 26,41.

১৫. এই বইয়ের পৃ. ৩৬৭ সূত্র ৫ দ্র.

১৬. Holy Well street লন্ডনের বই পাড়া ছিল। এটি strand-এর সমান্তরাল রাস্তা। অনেক আগে এখানে কতগুলি ঝরনা ছিল, যার একটির নাম ছিল হোলি ওয়েল। সেই ঝরনার নামে রাস্তাটির নাম হয় হোলি ওয়েল স্ট্রিট। Charing Cross Road-এ নতুন বই পাড়া পত্তন হবার আগে লন্ডনবাসীরা হোলি ওয়েল স্ট্রিটকে Book Sellers' Row বলত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এখান থেকে বইয়ের দোকান ক্রমে উঠে যায়। হোলি ওয়েল স্ট্রিট লিটারেচর বলতে সেকালে অশ্লীল সাহিত্য বোঝানো হত। এখন আর এ অর্থে কথাটির প্রচলন নেই।

১৭. অনুবাদ : হাতির মাংস, ঘোড়ার মাংস, কুকুরের মাংস সেই রকম উত্তম। (এ মাংস) ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই খাওয়া উচিত। তা না হলে অন্নই ভক্ষণ করবে।
খাদ্যই হোক বা পেয়ই হোক অল্প মাত্রায় আহার করা উচিত

ব্রতধারীর। বিষ্ঠা, মূত্র ও মাংস যোগ করে নিয়ম মতো তা প্রস্তুত করবে।

বুদ্ধ-জ্ঞান-সমুদ্রের যিনি প্রভু, তাঁর চারটি নিয়ম রক্ষা করো। বিষ্ঠা এবং মূত্র সর্বদাই গ্রহণ করতে হবে— এই হল অদ্ভুত গোপনীয় (গুহ্য) তত্ত্ব।

১৮. অনুবাদ : কোনো সদাশয় চণ্ডালের বারো বছরের কন্যাকে সাধক বিশেষভাবে প্রত্যহ নির্জনে সেবা (অর্থাৎ পরিচর্যা) করবে।

১৯. পাপ ও দুঃখ থেকে বিশ্রাম পাবার জন্য শুভ কাজ যাঁরা করেছেন, তাঁদের কাজ অনুমোদন করি। এখন যারা দুঃখ ভোগ করছে তারা সুখী হোক। সংসার ও দুঃখ থেকে যারা মুক্তি পেয়েছে আমি তাদের জন্য আহ্লাদ প্রকাশ করছি। সম্প্রতি যেসব তাপিত জীব বোধিসত্ত্বত্ব ও বুদ্ধত্ব লাভ করেছেন তাঁদের শান্তিতে আমি আনন্দ প্রকাশ করছি। সব জীবের সুখকর ও হিতকর বুদ্ধজ্ঞান বিতরণ করছেন যেসব ধর্মপ্রচারক তাঁদের কাজে আমি আনন্দ প্রকাশ করছি। এইভাবে পুণ্য কাজ অনুমোদন করাকে পুণ্যানুমোদনা বলা হয়।

২০. আমি মহাপাপী ও দরিদ্র, পূজার উপকরণ আমার কিছুই নেই। একান্ত মনে আমার দেহ বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বদের উদ্দেশে অর্পণ করছি। আমি আপনাদের ভৃত্য। আপনারা আমাকে গ্রহণ করেছেন, তাই আমি নির্ভয়ে হিতকর কাজের ব্রত নিলাম। যা-কিছু পাপ করেছিলাম তা থেকে আমি উত্তীর্ণ হলাম। আর পাপ করব না।— এই প্রার্থনাকে পাপদেশনা বলা হয়।

২১. এই বইয়ের পৃ. ৩১২ সূত্র ২২ দ্র.

২২. পোষধব্রত, উপোসথ। 'বিনয় পিটকে'র অন্তর্গত 'মহাবগ্‌গ' গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উপসোথ-বিধি বিবৃত হয়েছে। দুই পক্ষের অষ্টমী এবং পূর্ণিমা ও অমাবস্যা এই চারটি উপোসথ তিথি। এই তিথিতে অষ্টশীল বা দশশীল পালনীয়। উপোসথ-ব্রতী ভোগসুখের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করেন। প্রাণী হিংসা করেন না। মিথ্যা বলেন না। নাচ-গান-বাজনা, মালা, সুগন্ধ জিনিস বর্জন করেন। বিকালে আহার করেন না। উঁচু বিছানা ও দামি আসবাব ব্যবহার করেন না। উপোসথ ব্রত নেওয়া উপলক্ষে ভিক্ষুদের পাতিমোক্‌খ পাঠ করতে হয়। 'বিনয়

পিটকে' ভিক্ষুদের জন্য ২২৭টি বিধিনিষেধের উল্লেখ আছে— এইগুলিকে পাতিমোক্‌খ বলে। পাতিমোক্‌খ সভায় ভিক্ষুদের উপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক ছিল। প্রকৃতপক্ষে ভিক্ষুদের উপরে সংঘের নিয়ন্ত্রণ এবং শাসন উপোসথ তিথিতে অনুষ্ঠিত পাতিমোক্‌খ সভার মাধ্যমেই কার্যকর করা হত।

২৩. এই বইয়ের পৃ. ২৫৩ সূত্র ৮ দ্র.

২৪. এই বইয়ের পৃ. ৮৮ সূত্র ৬ দ্র.

২৫. এই বইয়ের পৃ. ৮৫ সূত্র ২ দ্র.

২৬. এই বইয়ের পৃ. ১১৬ সূত্র ২৩ দ্র.

২৭. বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায়ের আর-একটি মন্তব্য— "The other discovery I have made is not so much from books and MSS. as from actual observation in Nepal. It was always a puzzle to me that the pure metaphysical religion of Buddha could be made the medium of practising immoral and obscene rites. The Buddhist Trinity Dharma (Religion) Buddha and Sangha (Buddhist monastic congregation) are merely abstract ideas personified. All the three words are in masculine gender. How can there be the introduction of female divinities and subsequent obscene rites? But on entering the Holiest of the Great places of Pilgrimage in Nepal, the Svayambhū Kṣetra, I was struck with a female figure labelled or inscribed as *Namo dharmaya.* I at once enquired from the Residency Pandit, a Buddhist high-priest himself and the descendant of the most learned of Buddhist Pandits ever met with by the English in Nepal. He coolly said *Dharma* is nothing else but *Prajñā.* I had often read in Buddhist worksthe phrase Prajñopāyasvarūpinīm

or svarūpāya. I know that Buddha is never an object of worship. His image is kept in monasteries simply for the purpose of keeping his noble example always present before the aspirers to Nirvāṇa, and so he is the Upāya or means to Nirvāṇa. I also knew that *Prajñā* or true knowledge is the great goal of those who aspire to Nirvāṇa. But none ever suspected that Dharma and Prajñā are identical. This identification introduced a female deity into the Buddhist Trinity and she at once became the mother of all Bodhisattvas, beings representing the Saṇgha or the Buddhist congregation. In a MS. in the Durbar library belonging to the Kālacakra School I subsequently saw illustrations of *Buddha* and *Prajñā* in the unspeakable situation begetting Bodhisattvas. This information led to the explanation of many facts and symbolisms unexplained before. Buddhism subsequently became closely allied to Śakti worship and its latter development ran in parallel lines that of Śakti cult."—"Antiquities of the Tantras and the Introduction of Tantric rites in Buddhism", *Proceedings of Asiatic Society of Bengal*, August 1900, pp. 101-02.

৯. বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল

মুসলমানের আক্রমণে বৌদ্ধধর্ম বাংলা হইতে লোপ হইয়াছে একথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু যেখানে মুসলমান যাইতে পারেন নাই, সেখানে বৌদ্ধধর্ম কিছু কিছু ছিল। ইংরাজেরা যেরূপ সমস্ত দেশ একেবারে দখল করেন, মুসলমানেরা সেরূপ পারেন নাই। অনেক স্থানেই যুদ্ধ করিয়া তাঁহাদের ছোটো ছোটো রাজ্য দখল করিতে হইয়াছিল। গিয়াসুদ্দিন বোলবন্[১] যখন তুগ্রলের বিদ্রোহ দমনের জন্য বাংলায় আসিয়াছিলেন, তখন তিনি ১২৮০ খৃ. অব্দে সোনারগাঁওয়ের রাজার সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন। সকলেই জানেন নবদ্বীপ ও গৌড়জয়ের পর পূর্ব-বাংলা জয় করিতে মুসলমানদের প্রায় একশত কুড়ি বৎসর লাগে। সোনারগাঁওয়ের রাজারা যে সব হিন্দু ছিলেন এরূপ বোধ হয় না। কারণ পূর্ব-বাংলায় অনেক বৌদ্ধ ছিল। আমরা বাংলা অক্ষরে লেখা একখানি 'পঞ্চরক্ষা'র[২] পুথি পাইয়াছি। পুথিখানি ১২১১ শকাব্দায় বা ১২৮৯ খৃ. অব্দে লেখা। 'পঞ্চরক্ষা'র পুথিখানি বৌদ্ধ, উহাতে পাঁচখানি পুথি আছে। পাঁচখানিই আরম্ভ হয়—

"এবং ময়া শ্রুতমেকস্মিন সময়ে ভগবান্" ইত্যাদি। লেখক বলিতেছেন এ সময়ে পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমসৌগত মধুসেন[৩] আমাদের রাজা। মধুসেন যে পূর্ব-বাংলারই রাজা ছিলেন একথা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি না, তবে কুলগ্রন্থে বল্লালের পর মধুসেন বলিয়া একজন রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। অন্য প্রমাণ না পাইলে আমরা মধুসেনকে বল্লালসেনের বংশধর বলিতে চাহি না। তবে ১২৮৯ খৃস্টাব্দে বাংলা দেশে একজন স্বাধীন বৌদ্ধরাজা ছিলেন একথা বেশ বলা যায়। এবং তাঁহার দেশে যে অনেক বৌদ্ধ বাস করিত সেকথাও বলা যায়।

মহামহোপাধ্যায় শূলপাণি[৪] চৌদ্দ শতকের শেষকালে তাঁহার প্রসিদ্ধ স্মৃতির গ্রন্থ-সকল রচনা করেন। এই-সকল গ্রন্থের মধ্যে 'প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ' খুব চলিত। তিনি একটি বচন তুলিয়াছেন যে নগ্ন দেখিলেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। নগ্ন শব্দের অর্থ করিয়াছেন— "নগ্নাঃ বৌদ্ধা-

দয়ঃ”। বৌদ্ধ না থাকিলে তিনি এরূপ অর্থ করিতে পারিতেন না। আমি একখানি বাংলা অক্ষরে তালপাতায় লেখা ‘বোধিচর্য্যাবতারে’র[৫] পুথি পাইয়াছি। সেখানি বিক্রম সংবতের ১৪৯২ অব্দে লেখা অর্থাৎ ইংরাজি ১৪৩৬ সালে। ‘বোধিচর্য্যাবতার’খানি মহাযানের পুথি—বৌদ্ধদিগের গভীর দর্শনের পুথি। পুথিখানি সোহিনচরী প্রদেশে বেণু-গ্রামে মহত্তর মাধবমিত্রের পুত্রের জন্য নকল করা হয়। একজন বৌদ্ধ-ভিক্ষু উহা লেখেন আর-একজন উহার পাঠ মিলাইয়া দেন। সুতরাং বাংলার অনেক কায়স্থ যে তখনো বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন একথা বেশ বোধ হয়। কেম্ব্রিজে একখানি বাংলা হাতে তালপাতায় লেখা বৌদ্ধ-ধর্মের পুথি আছে। সেখানি ইংরাজি ১৪৪৬ সালে লেখা। সেখানি মূল কালচক্রতন্ত্রের পুথি। পুথিখানি শাক্যভিক্ষু জ্ঞানশ্রী কোনো বিহারে দান করিয়াছিলেন। লেখক মগধদেশীয় ঝাড়গ্রামনিবাসী করণকায়স্থ শ্রীজয়রাম দত্ত। উহাতে লেখা আছে “পরম ভট্টারক ইত্যাদি রাজাবলী পূর্ব্ববৎ” অর্থাৎ জয়রাম দত্ত পূর্বে আরো অনেক পুথি নকল করিয়াছিলেন। ব্রিটিশ মিউজিয়মে ঐরূপ আর-একখানি তালপাতার পুথি আছে, সেখানি ১৪৭৯ বিক্রম সংবৎ বা ১৪২৩ খৃ. অব্দে লেখা। এখানি কাতন্ত্রের উণাদিবৃত্তি[৬]। বৌদ্ধ-স্থবির শ্রীবররত্ন মহাশয় আপনার পাঠের জন্য লিখাইয়াছিলেন। লিখিয়াছিলেন কপালিয়া গ্রামের কায়স্থ শ্রীবাগীশ্বর। ব্রিটিশ মিউজিয়মে শ্রীবররত্নের জন্য লেখা আরো অনেকগুলি কাতন্ত্র ব্যাকরণের পুথি আছে। তাহার মধ্যে দুই-একখানি বাংলা ভাষায়ও লেখা আছে। সুতরাং প্রমাণ হইতেছে তৎকালে বাংলা দেশে বৌদ্ধ-বিহার ছিল বৌদ্ধ-স্থবির ছিলেন। তাঁহারা ব্যাকরণশাস্ত্র বিশেষ যত্ন করিয়া পড়িতেন। শ্রীবররত্নের যে-সকল বিশেষণ দেওয়া আছে তাহাতে তিনি যে মহাযানমতাবলম্বী ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। একটি বিশেষণ এই “শূনত্যসর্ব্বকারবরোপেত মহাকরুণী” “সর্ব্বালম্বনবিবর্জ্জিতা-দ্বয়বোধিচিত্তচিন্তামণিপ্রতিরূপক”। সুতরাং পনেরো শতকেও বাংলায় অনেক জায়গায় বৌদ্ধ ছিল এবং বৌদ্ধধর্মের পুথি-পাঁজিও লেখা হইত। এই শতকে রাঢ়ীশ্রেণী মহিন্তা গাঁই বৃহস্পতি[৭] নামে একজন বড়ো পণ্ডিত গৌড়ের সুলতান, রাজা গণেশও তাঁহার মুসলমান উত্তরাধিকারী-গণের নিকট “রায়মুকুট” এই উপাধি পাইয়াছিলেন এবং তিনি একখানি

স্মৃতি, অনেকগুলি কাব্যের টীকা ও 'অমরকোষে'র একখানি টীকা লিখিয়া বাংলা দেশে সংস্কৃতশিক্ষার বিশেষ উপকার করিয়া যান। তাঁহার 'অমরকোষে'র টীকা একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। তিনি ঐ টীকায় চৌদ্দ-পনেরোখানি বৌদ্ধ-পুস্তক হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার 'অমরকোষে'র টীকার তারিখ ইংরাজি ১৪৩১ সাল। তাহা হইলে তখনো বৌদ্ধ-শাস্ত্রের পঠন-পাঠন ছিল এবং ব্রাহ্মণেরাও অন্তত শব্দশাস্ত্রের প্রমাণ সংগ্রহের জন্য বৌদ্ধ পুথি পড়িতে বাধ্য হইতেন—একথা বেশ বুঝা যায়।

চৈতন্যদেবের তিরোভাব হয় ইংরাজি ১৫৩৩ সালে। তাহার পর তাঁহার অনেকগুলি জীবনচরিত লেখা হয়। চূড়ামণি দাস[৮] একখানি চৈতন্যচরিত লেখেন। তাহাতে লেখা আছে চৈতন্যের জন্ম হইলে সকলেই আনন্দিত হয়, তাহার মধ্যে বৌদ্ধেরাও আনন্দিত হয়। জয়ানন্দ[৯] আর-একখানি চৈতন্যচরিত লিখিয়াছেন। তিনি পুরীর জগন্নাথদেবকে বৌদ্ধমূর্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং ১৬ শতকেও বৌদ্ধেরা বাংলা হইতে একেবারে লোপ পায় নাই।

১৭ শতকে মঙ্গোলিয়া দেশে উর্গা নামক নগরে এক মহাবিহারে তারনাথ[১০] নামে একজন প্রসিদ্ধ লামা ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা কিরূপ আছে জানিবার জন্য ১৬০৮ সালে বুদ্ধগুপ্ত নাথ[১১] নামে একজন লামাকে পাঠাইয়াছিলেন। তিনি জগন্নাথ ও তৈলঙ্গ ঘুরিয়া বাংলা দেশে আসেন। তিনি কাশ্রমগ্রাম ও দেবীকোট, হরিভঞ্জ, ফুকবাদ, ফলগ্রু প্রভৃতি নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। এই-সকল স্থানেই অনেক বৌদ্ধ-পণ্ডিত ছিলেন, অনেক বৌদ্ধ পুথি-পাঁজি ছিল, বৌদ্ধধর্মও খুব প্রবল ছিল। হরিভঞ্জ বিহারের ধর্ম-পণ্ডিতের নিকট তিনি বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে নানারূপ শিক্ষালাভ করেন। হেতুগর্ভধন নামে একজন পণ্ডিত উপাসিকা তাঁহাকে নানারূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন। এই-খানে তিনি অনেক সূত্রের মূলগ্রন্থ দেখিতে পাইয়াছিলেন। বাংলার বাহিরেও তিনি অনেক স্থানে বৌদ্ধধর্মের উন্নতি দেখিতে পান। কিন্তু সে-সকল কথায় আমাদের কাজ নাই। তাঁহার সময়ে রাঢ়ে ও ত্রিপুরায় বৌদ্ধধর্ম বেশ প্রবল ছিল। তিনি বোধগয়ায় মহাবোধি মন্দিরে ও বজ্রাসনের নিকটে অনেক বৎসর বাস করিয়াছিলেন। তিনি এই অঞ্চলে

কোনো বিহারে জনকায় সিদ্ধনায়ক ডাক প্রভৃতি অনেক মণ্ডলের চিত্র দেখিয়াছিলেন। তিনি তৈলঙ্গ, বিদ্যানগর, কর্ণাট, প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক ঘুরিয়াছিলেন। তিনি শান্তিগুপ্ত নামে একজন সিদ্ধের নিকট দীক্ষিত হইয়া "নাথ" উপাধি পাইয়াছিলেন। সেই অবধি তাঁহার নাম হইয়াছিল "বুদ্ধগুপ্ত নাথ"। যোগিনী দিনকরা ও মহাগুরু গম্ভীরমতির নিকট তিনি অনেক অলৌকিক ক্ষমতা পাইয়াছিলেন। তিনি মহোত্তর সুধীগর্ভের নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। রাজগৃহের গৃধ্রকূট গিরি-গুহায় ও প্রয়াগে অনেক বড়ো বড়ো তীর্থস্থান দেখিয়াছিলেন। তিনি খগেন্দ্রির পাহাড়ের উপর যোগীদের থাকিবার জন্য এক প্রকাণ্ড বাড়ি নির্মাণ করিয়াছিলেন।

নেপালে ললিতপত্তন নামে এক নগর আছে। উহাকে এখন "পাটন" বলে। এখানকার একজন বজ্রাচার্য ১৬৬৫ খৃ. অব্দে তীর্থ করিতে আসিয়া কিছুদিন মহাবোধিমন্দিরের নিকট বাস করেন। তখন তাঁহাকে স্বপ্ন হয়, তিনি যেন মহাবোধি স্তূপের মতো একটি স্তূপ নিজের দেশে নির্মাণ করেন। তিনি তিন বৎসর মহাবোধিতে থাকিয়া উহার একটি চিত্র আঁকিয়া লইয়া যান এবং পাটনে মহাবোধি নামে এক বিহার নির্মাণ করেন। উহার ঠিক মধ্যস্থলে মহাবোধি স্তূপ নির্মাণ করেন। পাটনের সে বিহার ও সে স্তূপ আজও আছে। নিচের দিকে একটু একটু লোনা ধরিয়াছে কিন্তু উপরের অংশ ঠিক আছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বোধিগয়ার মন্দির ইংরাজেরা মেরামত করিয়া দিলে যেরূপ হইয়াছে সেটিও ঠিক সেইরূপ! মহাবোধি বিহারের বজ্রাচার্যেরা নেপালের বৌদ্ধদিগের মধ্যে আজিও অতি উচ্চস্থান লাভ করিয়া আসিতেছেন।

আঠারো শতকের প্রথমে কাশীতে নাথুরাম নামে একজন ব্রহ্মচারী ছিলেন। তাঁহাকে লোকে নথমল ব্রহ্মচারী বলিত। বদরিকাশ্রমের সহিত তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। তিনি নামে বৌদ্ধ ছিলেন কিন্তু বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বড়ো কিছু জানিতেন না। তাঁহার সংস্কার ছিল সংবৎ ১৭৫৫, ৮ই মাঘ বুদ্ধদেব বদরিকাশ্রমে অবতীর্ণ হইবেন। ৫ই মাঘ বিষ্ণু শিব গণপতি শক্তি এবং সূর্য নথমলের নিকট আসিয়া তাঁহাকে মুখভাষাগ্রন্থ লিখিতে বলেন। সেই গ্রন্থে বুদ্ধের অবতার হওয়া, বৌদ্ধধর্মের প্রভাব প্রভৃতি অনেক কথা লেখা থাকিবে। তিনিও সেইমতো কাশীর রামাপুরায়

থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় চারি-পাঁচ জন বিদ্যার্থীর সাহায্যে সাড়ে-বারো লক্ষ শ্লোকে এক প্রকাণ্ড পুস্তক লেখেন। ঐ পুস্তকের খানিক খানিক কাশীর পুথিওয়ালাদের নিকট দেখিতে পাওয়া যায়। খানিকটা এশিয়াটিক সোসাইটিতেও আছে। কিন্তু সেটা মূল পুথি নয়— নকল করা। পুথির নাম এখন হইয়াছে 'বুদ্ধচরিত'। বুদ্ধদেব অবতীর্ণ হইয়া শূরসেন দেশে বুদ্ধনামক এক দৈত্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাস্ত করিলেন।

মুসলমানেরা যখন ভারতবর্ষ অধিকার করেন তখন ভারতবর্ষে যে একটা বৌদ্ধ বলিয়া প্রবল ধর্ম ছিল তাহা তাঁহারা জানিতেন না। তাঁহারা ভারতবাসী সভ্যজাতিমাত্রকেই হিন্দু বলিতেন। সুতরাং বৌদ্ধ-ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম দুই-ই তাঁহাদের কাছে হিন্দুধর্ম ছিল। মিন্‌হাজ ওদন্তপুরী বিহার বিনাশের যে ইতিহাস দিয়াছেন তাহাতে তিনি বলেন যে, মুসলমানেরা দুই হাজার সব মাথা কামানো ব্রাহ্মণকে বধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা "ওদন্তপুরী" বিহারকে "ওদনন" বিহার বলিতেন। সব মাথা কামানো ব্রাহ্মণ হইতে পারে না একথা বোধ হয় বাঙালি পাঠককে বুঝাইতে হইবে না। সন্ন্যাসীরাই সব মাথা কামায়। বিহারের ভিক্ষুরা সব মাথা কামাইতেন যেহেতু তাঁহারাও সন্ন্যাসী ছিলেন। আকবরের সময় নানা দেশের ও নানা ধর্মের পণ্ডিত-গণ তাঁহার সভায় উপস্থিত থাকিতেন, কিন্তু তাঁহার সভায় কোনো বৌদ্ধ-পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন না। ইংরাজেরা যখন প্রথম বাংলা হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকার করেন, তখনো তাঁহারা ইংরাজ-অধিকৃত দেশে কোনো বৌদ্ধ দেখিতে পান নাই। কিরূপে বৌদ্ধদের নাম পর্যন্ত এদেশে লোপ হইয়া গেল, তাহা জানিতে হইলে প্রথম বৌদ্ধদের ইতিহাস জানা চাই। পূর্বে পূর্বে অনেক বার লেখা হইয়াছে যে, শেষ অবস্থায় বৌদ্ধেরা বড়ো কদাচারী হইয়াছিল— অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়াছিল এবং তাহারা শেষ অবস্থায় ধর্মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছিল সে অতি কদাকার। সেইজন্য ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে প্রথম বিদ্রূপ করিতেন, পরে ঘৃণা করিতেন। বিদ্রূপের একটা উদাহরণ 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' নাটকের তৃতীয় অঙ্কে দেখা যায়। হিন্দুরাজারাও বৌদ্ধদের বিরক্ত করিতে ত্রুটি করিতেন না। আমাদের শাস্ত্রে লেখা আছে, যেখানে দেবোত্তর ভূমি আছে তাহার নিকটে ব্রাহ্মণকে "ব্রহ্মোত্তর" দিবে না।

কিন্তু সেন রাজাদের ব্রহ্মোত্তর দানে দেখা যায় যে উহার একসীমা "বুদ্ধ-বিহারী দেবমঠঃ"। কিন্তু বৌদ্ধদের প্রধান শত্রু রাজারাও ছিলেন না—ব্রাহ্মণরাও ছিলেন না—শৈব-যোগীরাই উহাদের প্রধান শত্রু ছিল। শেষ কালের বৌদ্ধগ্রন্থ-সকলে দেখিতে পাওয়া যায় শৈব-যোগীদের উপর উহাদের বড়োই রাগ। 'স্বয়ম্ভূপুরাণ'[১২] নেপালের রাজা যক্ষমল্লের সময়ে লেখা হয়। তিনি ইংরাজি চৌদ্দ শতকের শেষে রাজত্ব করিতেন। 'স্বয়ম্ভূপুরাণে'র শেষে শৈবদিগকে বিস্তর গালি দেওয়া আছে। বাংলাতেও বোধ হয় শৈব-যোগীরাই ক্রমে প্রবল হইয়া বৌদ্ধদের নাম পর্যন্ত লোপ করিয়াছে। চৈতন্যদেব অনেক নীচ অস্পৃশ্য জাতির উদ্ধার করিয়াছেন। অনেক সময় মনে হয়, এই-সকল নীচ অস্পৃশ্য জাতিরা পূর্বে বৌদ্ধ ছিল, এখন বৈষ্ণব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাতেও বৌদ্ধধর্মের নাম ক্রমে লোপ পাইয়াছে।

কিন্তু বাঙালির আশেপাশে বিশেষ উত্তর ও পূর্ব অঞ্চলে অনেক বৌদ্ধ ছিল। দার্জিলিং, শিলিগুড়ি প্রভৃতি স্থানে অনেক বৌদ্ধ বাস করিত; নেপালে অনেক বৌদ্ধ ছিল; চাটগাঁয়ে অনেক বৌদ্ধ ছিল। চাটগাঁ ও ত্রিপুরার পাহাড়ে বরাবরই বৌদ্ধ ছিল। ইহাদের মধ্যে নেপালি বৌদ্ধেরাই সেকালের ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধদের উত্তরাধিকারী। দার্জিলিঙের বৌদ্ধেরা প্রায়ই তিব্বত হইতে তাহাদের বৌদ্ধধর্ম লাভ করিয়াছে। সিকিম ও দার্জিলিঙে কিরূপে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করে তাহার কতক ইতিহাস পাওয়া গিয়াছে। সেটা সমস্ত তিব্বত হইতে আসা। নেপালেও তিব্বতিরা আপনাদের প্রভাব কিছু কিছু বিস্তার করিয়াছে, কিন্তু নেপালের অধিকাংশ বৌদ্ধই পুরানো ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ।

চট্টগ্রামে যে বৌদ্ধেরা আছেন তাঁহারা প্রাচীন ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ নহেন। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে তাঁহারা আরাকান হইতে বৌদ্ধধর্ম লাভ করেন, সে ধর্মও বর্মা ও সিংহল হইতে আসিয়াছে। রাঙামাটিতে যে-সকল বৌদ্ধ আছেন তাঁহারা যদিও এখন চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের শিষ্য, তথাপি তাঁহাদের মধ্যে এমন অনেক আচার-ব্যবহার আছে, তাহাতে বোধ হয় তাঁহারা প্রাচীন ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ, কিন্তু নিকটবর্তী চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের সংস্রবে আসিয়া তাঁহারা অনেক পরিমাণে হীনযান মত গ্রহণ করিয়াছেন।

উড়িষ্যার জঙ্গলে বৌদ্ধধর্ম একেবারে লোপ পায় নাই। বোধ নামে যে একটি করদ মহল আছে, তাহার নামেই প্রকাশ যে, উহাতে এখনো বৌদ্ধধর্ম বর্তমান আছে। কয়েক বৎসর পূর্বে মহামান্য শ্রীযুক্ত সার এডওয়ার্ড গেট সাহেব [Edward Albert Gait] আমাকে কয়েকখানি উড়িয়া পুঁথি ও কতকগুলি কাগজপত্র দিয়াছিলেন। তাহাতে বেশ বোধ হয় যে উড়িষ্যার সরাকি তাঁতিরা এখনো বৌদ্ধ। তাহাদের বিবাহের সময় বুদ্ধদেবের পূজা হইয়া থাকে। এই সরাকি তাঁতি যে কেবল জঙ্গল মহলেই আছে এমন নহে। পুরী জেলার দুই-একটি থানায় এবং কটকের কয়েকটি থানায় সরাকি তাঁতি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারাও স্পষ্ট বুদ্ধদেবের পূজা করিয়া থাকে। আমাদের বাঁকুড়া ও বর্ধমান জেলায়ও সরাকি তাঁতি আছে। তাহারা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে হিন্দু হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধধর্মের সহিত তাহাদের কোনো সম্পর্ক নাই।[১৩]

কাজে বৌদ্ধ, নামেও বৌদ্ধ, এরূপ লোক অনেক খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। কিন্তু খাঁটি বৌদ্ধ আছে, অথচ নাম পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে, এরূপও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। কিরূপে এই-সকল বৌদ্ধকে খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে, তাহার বৃত্তান্ত আগামী বারে দেওয়া যাইবে।

'নারায়ণ'
পৌষ, ১৩২২ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. এই বইয়ের পৃ. ১০৫ সূত্র ১ দ্র.

২. এই বইয়ের পৃ ৩৮৫ সূত্র ১০ দ্র.

৩. "পরমেশ্বর পরমসৌগত পরমরাজাধিরাজ শ্রীমদ্ গৌড়েশ্বর মধুসেন-দেবকানাং প্রবর্দ্ধমানবিজয়রাজ্যে যত্রাঙ্কেনাপি শকনরপতে শকাব্দাঃ ১২১১ ভাদ্র দি ৩ ॥" 'পঞ্চরক্ষা'র পুঁথিতে এইভাবে মধুসেনের উল্লেখ আছে। নগেন্দ্রনাথ বসু বৈদ্য কুলগ্রন্থ থেকে লক্ষ্মণসেনের বংশধারার পরিচয় দিয়ে মধুসেনকেও এই বংশীয় এবং পূর্ববঙ্গের অধিপতি বলেছিলেন। কুলগ্রন্থের তথ্য নির্ভরযোগ্য নয়। বিশেষত ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ মুসলমান অধিকারভুক্ত এবং পূর্ববঙ্গ দেববংশীয় রাজাদের অধিকারভুক্ত ছিল। এমন হতে পারে যে, এই মধুসেন দশরথদেব বা তাঁর কোনো উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে পূর্ববঙ্গ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। ইনিই সেন পদবিধারী শেষ রাজা যিনি হয়তো একদা বিখ্যাত সেন রাজবংশের ঠাট বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন। দ্র. *H-B*-I, p. 228.

৪. বাংলার নব্য-স্মৃতির প্রবর্তক মহামহোপাধ্যায় শূলপাণির জন্ম যশোহর জেলায়, আনুমানিক ১৩৭৫-৮০ খৃস্টাব্দের মধ্যে কোনো সময়ে। বিবাহ সূত্রে নবদ্বীপে বসবাস করেন। তাঁর 'অনুসরণবিবেকঃ', 'একাদশী-বিবেকঃ', 'কালবিবেকঃ', 'চতুরঙ্গদীপিকা', 'তিথিবিবেকঃ', 'তিথিদ্বৈত-প্রকরণম', 'শ্রাদ্ধবিবেকঃ', 'প্রায়শ্চিত্তবিবেকঃ' প্রভৃতি ২৩খানি মূল রচনা এবং ৪খানি টীকার নাম জানা যায়। এইসব বই লেখা হয়েছিল ১৪১৫-৬৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে। এর মধ্যে 'শ্রাদ্ধবিবেকঃ' এবং 'প্রায়শ্চিত্ত বিবেকঃ' বই দুটির প্রভাব এবং চর্চা ধারাবাহিক ভাবে চলে এসেছে। শূলপাণি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির মাতামহ।

শাস্ত্রীমশায় শূলপাণি সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন, "He belongs

to Rāḍhīya class of Brāhmaṇas of Bengal, and belongs to Śāhaḍī Gāin and Baradvāja gotra. His works are extensively studied in Bengal. He has twelve works, with names ending with the word Viveka. His *Durgotsava-vivek* seems to be the earliest work on the subject." *Shastri-Cat*, Vol. III, pp. xxxiii-iv.

৫. শান্তিদেবের শ্রেষ্ঠ রচনা 'বোধিচর্যাবতার' সম্পূর্ণ শ্লোকে রচিত, দশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। তিব্বতি সূত্র অনুসারে শান্তিদেবের সময় খৃস্টীয় অষ্টম শতাব্দী। বোধিচিত্ত-ভাবনার মহিমা বর্ণনায় শুরু, তারপরে অধ্যায়ে অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে প্রজ্ঞাপারমিতা অর্জনে বোধিসত্ত্বের সাধনার বিভিন্ন স্তর। নাগার্জুনের সময়ে (খৃস্টীয় দ্বিতীয় শতক) মহাযান মতবাদ বিরুদ্ধবাদী দর্শনের সঙ্গে বিচার-বিতর্কে সীমিত ছিল। মহাসাংঘিকরা এই গণ্ডি পেরিয়ে মহাযানকে ব্যাপক জনজীবনে প্রতিষ্ঠিত করেন, একটা নতুন ধর্মান্দোলন জাগিয়ে তোলেন। এই আন্দোলনে 'বোধিচর্যাবতার' অন্যতম প্রধান শাস্ত্রগ্রন্থের মর্যাদা পেয়েছিল। এশিয়াটিক সোসাইটি সংগ্রহে পুথি সংখ্যা 8067। দ্র. Shastri, "SANTIDEVA", *I-A*, Feb. 1913, pp. 49-52 ; Shastri, *Bodhicharyāvatāram*, *J-B-T-S* 1894, pt. I ; Vidhusekhar Bhattacharyya ed. *Bodhicharyāvatāra of Santidev*, Asiatic Society, Calcutta 1960, সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার', বিশ্বভারতী ১৩৫৪ ব.।

৬. সর্ব-বর্মা রচিত সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ কাতন্ত্র। 'উণ' দিয়ে শুরু হয় এমনসব কৃৎ প্রত্যয়কে 'উণাদি' বলা হয়। এই শ্রেণীর প্রত্যয় সংক্রান্ত সূত্রের ব্যাখ্যাকে বলা হয় উনাদিবৃত্তি।

"The Kalāpa Vyākaraṇa had its origin in Southern India in the 1st century A.D. One of the kings of the Sāta-Vāhana dynasty took a wife from Northern India ; she spoke Sanskrit which he did not understand, and often made curious, and ludicrous mistakes. At last unable to bear the jeering of his wife, he made up his mind to study Sanskrit, and asked his Paṇḍita Sarva-Varmā to

write a treatise on grammar, that would give him a workable knowledge of Sanskrit. Sarva-Varmā produced a grammar which in six months gave the king what he wanted.... The work is called *Katantra* or a short work. It is in fact a Sanskrit grammar for beginners." *Shastri-Cat*. Vol. VI, p. xxxviii.

৭. এই বইয়ে "বৃহস্পতি রায়মুকুট" প্রবন্ধ দ্র.

৮. নিত্যানন্দের অনুচর ধনঞ্জয় পণ্ডিতের শিষ্য চূড়ামণি দাসের চৈতন্যচরিত কাব্যের নাম 'গৌরাঙ্গবিজয়'। রচনাকাল আনুমানিক ১৫৪২-৫০ খৃস্টাব্দের মধ্যে। এশিয়াটিক সোসাইটি সংগ্রহে পুথি সংখ্যা 3736, পৃ. ২৮-২৯এ চৈতন্যের জন্মে সাধারণ মানুষের উল্লাস বর্ণনা—

> বৌদ্ধ তার্কিক মৈমাংসিক বৈদান্তিক।
> সভাকার স্নাটে কহে ইবে দেখি ধিক ॥
> সবলোক নাচে কান্দে করে কিবা কাজ।
> ভাল লোক নাচে কান্দে না বাসএ লাজ ॥
> হোর দেখ অধ্যাপক অদ্বৈত আচার্য্য।
> নাচিয়া কাঁদিয়া ওবা সাধে কোন কার্য্য ॥
> তর্কবাদীন্দ্র সিদ্ধানন্দ ভট্টাচার্য্য।
> এ দিগবিজয়ী কবি পূজে সর্ব্বরাজ্য ॥

দ্র. সুকুমার সেন সম্পাদিত, 'গৌরাঙ্গবিজয়', এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা ১৯৫৭, পৃ. ১৪-১৫।

৯. মধ্য-রাঢ়ে আমাইপুরা গ্রামে জয়ানন্দের জন্ম। বাবা চৈতন্যভক্ত সুবুদ্ধি মিশ্র, মা রোদনী। জন্মকালে নাম রাখা হয়েছিল গুহিয়া, গুয়ে। চৈতন্যদেব তাঁর এই কুৎসিত নাম পরিবর্তন করে নাম দেন জয়ানন্দ। "জয়ানন্দ নাম হৈল চৈতন্য প্রসাদে।" এই বিবরণে মনে হয় জয়ানন্দ শৈশবে চৈতন্যের করুণাদৃষ্টি লাভ করেছিলেন। নিত্যানন্দের অনুচর অভিরামদাস এবং নিত্যানন্দের ছেলে বীরভদ্রের সঙ্গে জয়ানন্দের ঘনিষ্ঠতা ছিল। এ'দের প্রেরণায় এবং পণ্ডিত গদাধরের আজ্ঞায় তিনি 'চৈতন্য-মঙ্গল' রচনা করেন। রচনাকাল সম্ভবত ১৫৫০-৬০ খৃস্টাব্দের মধ্যে। 'চৈতন্যভাগবত' এবং "চৈতন্যচরিতামৃতে'র মতো সমাদৃত না হলেও তথ্যের বৈচিত্র্যে জয়ানন্দের বই মূল্যবান।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ সংগ্রহের 'চৈতন্যমঙ্গল' পুঁথিতে (২০৩ সংখ্যক, প্রকাশ খণ্ড) আছে—

"তবে ত্রিজগৎনাথ বোদ্ধরূপ ধরি।
প্রবেশ করিল কৃষ্ণ দেউল ভিতরি॥" ৫৯

১০. তিব্বতি ভাষায় 'ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' 'গ্যাগার ছোন্‌জুঙ্‌' প্রণেতা তারনাথের জন্ম মঙ্গোলিয়ার ৎচাঙ্‌-এ, ১৫৭৫ খৃস্টাব্দে (মতান্তরে ১৫৭৩ খৃ.)। পারিবারিক নাম কুন্‌গা ঞিঙ্‌পো, আনন্দগর্ভ। বাবার নাম নামগ্যাল ফুন্‌ৎছোগ্‌। শিক্ষার জন্য সাক্যা-র উত্তরে অবস্থিত জোনাঙ্‌ মঠে প্রবেশের সময়ে তাঁর দীক্ষা-নাম হয় তারনাথ। ৪১ বৎসর বয়সে এই মঠের কাছে তাগ্‌তেন ফুনৎছোগ্‌ নামে নিজে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তর জীবনে তারনাথ মঙ্গোলিয়ায় ফিরে যান এবং চীন সম্রাটের আনুকূল্যে অনেকগুলি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। মঙ্গোলিয়ায় তাঁকে দেবতার মর্যাদা দেওয়া হয়। লব্‌-নরের পুবে কাল্‌খা প্রদেশের উর্গায় তাঁর অনুগামী লামারা পরম্পরাক্রমে তারনাথের অবতার রূপে মান্যতা পেয়ে এসেছেন। তিব্বতি ঐতিহ্যে তাঁকে জেৎচুন তারনাথ— ভট্টারক তারনাথ বলে উল্লেখ করা হয়। তারনাথ 'ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' লেখেন ১৬০৮ খৃস্টাব্দে। এই বইয়ে অজাতশত্রুর সময় থেকে সেন রাজাদের আমল পর্যন্ত ভারতে বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও মতবাদের বিকাশ সম্পর্কে তথ্য সংকলন করা হয়েছে। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-পণ্ডিতদের সম্পর্কে বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন রাজাদের উল্লেখ থাকায় আধুনিক ঐতিহাসিকেরা বৌদ্ধধর্মের কালানুক্রমিক ইতিহাস রচনায় এই বইয়ের তথ্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। অবশ্য সর্বত্র তারনাথের দেওয়া বিবরণ নির্ভরযোগ্য নয়। বইয়ের শেষ অধ্যায়ে তারনাথ সংক্ষেপে বৌদ্ধযুগের শিল্পকলার পরিচয় দিয়েছেন। এই বিবরণে বিম্বিসার, ধীমান, বিটপালো, হসুরাজ, জয়, পরোজয়, বিজয়— ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের এইসব শিল্পীর নাম উল্লেখ করেছেন। সেন্ট পিটার্সবুর্গ থেকে ১৮৬৯ খৃস্টাব্দে তারনাথের বইয়ের জর্মান এবং রুশ অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অনুবাদ করেন শিয়েফ্‌নার এবং ভ্যাসিলিয়েভ। হরিনাথ দে-র করা আংশিক অনুবাদ ১৯১১ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি সংখ্যা *The Herald* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এনুগা তেরামোতোর জাপানি অনুবাদ তোকিয়ো থেকে প্রকাশিত হয় ১৯২৮ খৃস্টাব্দে। দ্র. *H-B-I-I*; L. Austine Waddell, *Buddhism and Lamaism of Tibet*, New Delhi 1974.

১১. তিব্বতে সাঙ্‌স্যে বেপা নামে পরিচিত ভারতীয় ভিক্ষু বুদ্ধগুপ্ত ষোড়শ

শতাব্দীর মানুষ। ইনি তারনাথের শিক্ষক ছিলেন। দক্ষিণ ভারতে রামেশ্বরমের কাছে ইন্দ্রলিঙ্গয় কৃষ্ণ নামে এক বণিকের পরিবারে এ'র জন্ম। অল্প বয়সে বুদ্ধগুপ্ত তীর্থনাথ নামে একজন যোগীর কাছে যোগ শিক্ষা করেন এবং হটযোগে সিদ্ধ হয়ে ওঠেন। তীর্থনাথ রাজা রামরাজার সমসাময়িক। ইনি যদি বিজয়গড়ের রাজা হন তাহলে এ'র রাজত্বকাল ১৫৪২-৬৫ খৃস্টাব্দ। বুদ্ধগুপ্তর শিক্ষা ও সাধনা তান্ত্রিক ধারায়। দক্ষিণে সিংহল থেকে উত্তরে তিব্বত অবধি বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বুদ্ধগুপ্ত ভ্রমণ করেন। তিব্বত ভ্রমণের সময়ে তারনাথ এ'র সংস্পর্শে আসেন এবং এই ভারতীয় গুরুর শিক্ষায় ভারতে মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনের ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত হন। তারনাথ 'ডুপ্‌ছেন বুদ্ধগুপ্তেহি' নামে গুরুর জীবনীর একটি খসড়া রচনা করেন। দ্র. Guiseppe Tucci, 'The Sea and Land Travels of a Buddhist Sādhu in the Sixteenth Century', *I-H-Q*, Vol., VII, No. 4, Dec. 1931.

১২. Haraprasad Śastṛi ed., *BṚHAT- SVAYAMBHŪ-PURĀṆA*— Containing the traditions of the Svayambhū Kṣetra in Nepal, Bibliotheca Indica, Asiatic Society, Calcutta 1894-1900.

১৩. শাস্ত্রীমশায়ের ধারণা ছিল 'সরাক' 'শ্রাবক' শব্দের অপভ্রংশ। 'শ্রাবক' থেকে 'সরাক' সিদ্ধ করা যায়, তবে ভাষাতত্ত্বের সহজ পন্থায় নয়। ভাষাতত্ত্বের নিয়ম মতো 'ক' লুপ্ত হয়ে যাবার কথা।

১৯১১ খৃস্টাব্দের আদমশুমার-প্রতিবেদনে বিহার, ওড়িশা এবং অন্যান্য অঞ্চলের অধিবাসী ১৮,৭০৭ জন সরাক জাতীয় মানুষের হিসাব আছে। এ'দের মধ্যে ১৬,৬৫৯ জন হিন্দু, ২১৫ জন জৈন এবং ১,৮৩৩ জন বৌদ্ধ। (E. A. Gait, *Census of India*, 1911, Vol. I, part II— Tables, p. 222)। ছোটোনাগপুর এবং মানভূমের সরাক বা সারাকদের সম্পর্কে রিজলি বলেন, এ'দের পূর্বপুরুষ জৈন ছিলেন, পরে হিন্দু সমাজভুক্ত হয়েছেন। জৈন ঐতিহ্যের স্মৃতি লালন করলেও এ'রা হিন্দু রীতিনীতি মানেন এবং ব্রাহ্মণ দিয়ে হিন্দু দেবদেবীর পুজো করান। লোহারদাগার সরাকদের প্রধান উপাস্য ২৩তম জৈন তীর্থংকর পার্শ্বনাথ, আবার এ'রা শ্যামচাঁদ, রাধামোহন ও জগন্নাথের পুজো করেন। সরাকরা প্রধানত কৃষিজীবী। (H. H. Risley, *The Tribes and Castes of Bengal*, Ethnographic Glossary, Vol. II, Calcutta 1891)। বীরভূমের সরকরা কৃষি এবং তাঁতের কাজ করেন। এ'রা জৈন। (স্মারকগ্রন্থ, পৃ. ১২০)।

১০. এখনো একটু আছে

পাঠানেরা তিন-চারি শত বৎসর ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা জানিতেন না যে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ বলিয়া একটা ধর্ম ছিল। মোগলেরা দুশো আড়াইশো বৎসর ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারাও জানিতেন না যে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ বলিয়া একটা ধর্ম ছিল। ইংরাজ রাজত্বের প্রথমেও সেকথা জানা ছিল না। ইউরোপীয়েরা জানিতেন যে সিংহল, বর্মা, শ্যাম প্রভৃতি দেশেই বৌদ্ধধর্ম চলিত— সে ধর্মের ভাষা পালি, ধর্মযাজকেরা ভিক্ষু, বিবাহ করেন না— ইত্যাদি ইত্যাদি। ১৮১৬ সালে নেপালের সঙ্গে ইংরাজের সন্ধি হয়; সেই সন্ধির বলে ইংরাজরা নেপালের রাজধানীতে একজন রেসিডেন্ট রাখেন। হজ্‌সন[১] সাহেব বহুদিন সেই রেসিডেন্সির ডাক্তার থাকেন, পরে তিনি রেসিডেন্টও হন। তিনিই সর্বপ্রথম ভারতবর্ষে এক নূতন রকমের বৌদ্ধধর্ম দেখিতে পান। ১৮২৬ সালে তাঁহার পণ্ডিত অমৃতানন্দ[২] 'ধর্ম্মকোষ সংগ্রহ' নামে একখানি বৌদ্ধ-গ্রন্থ সংস্কৃতে লিখিয়া হজ্‌সন সাহেবের হস্তে অর্পণ করেন। হজ্‌সন সাহেব বৌদ্ধধর্ম ও নেপাল সম্বন্ধে যে-সকল পুস্তক লিখিয়াছেন তাহার অনেক মালমসলা এই সংস্কৃত পুস্তক হইতে সংগ্রহ করা।

হজ্‌সনের পুস্তক পড়িয়া লোকের বিশ্বাস হয় যে, মহাযান নামে একপ্রকার বৌদ্ধধর্ম বহুকাল ধরিয়া ভারতবর্ষে চলিতেছিল এবং ভারতবর্ষ হইতেই সেই ধর্ম চীন, জাপান, কোরিয়া, মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশে ছড়াইয়া পড়ে— ক্রমে চীন ও তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত অনেক সংস্কৃত পুস্তকের তর্জমা দেখিতে পাওয়া যায়; তাহাতে লোকের আগ্রহ আরো বাড়িয়া ওঠে। হজ্‌সন সাহেব বৌদ্ধধর্মের অনেক সংস্কৃত পুথি নকল করাইয়া কলিকাতা, পারিস ও লণ্ডন নগরে পাঠাইয়া দেন। নেপাল রেসিডেন্সির আর-একজন ডাক্তার, রাইট সাহেব [Daniel Wrights] অনেকগুলি তালপাতার ও কাগজের বৌদ্ধ-পুথি সংগ্রহ করিয়া কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটিকে দেন।

হজ্‌সন সাহেব কলিকাতায় যে-সকল পুথি দেন, রাজা রাজেন্দ্রলাল

মিত্র ১৮৭৮ সালে তাহার ক্যাটালগ লিখিতে আরম্ভ করেন। এই সময় তাঁহার পীড়া হয়; তিনি আমাকে তাঁহার সাহায্য করিতে বলেন। আমিও সাধ্যানুসারে তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলাম। ১৮৮২ সালে তাঁহার ক্যাটালগ বাহির হয়। উহার নাম *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* [১৮৮২ খৃ.]। ঠিক এই সময় বেন্ডল সাহেব [Cecil Bendall], রাইট সাহেব কেম্ব্রিজে যে পুথিগুলি দিয়াছিলেন, তাহার ক্যাটালগ করিতেছিলেন। তাঁহার ক্যাটালগ [*Catalogue of Buddhist Sanskrit Mss. in the University Library of Cambridge*] ১৮৮৩ সালে বাহির হয়। ক্যাটালগ বাহির করার পরই তিনি একবার ভারতবর্ষে আসেন এবং নেপাল বেড়াইয়া যান। তিনি কলিকাতা আসিলে আমার সহিত তাঁহার আলাপ হয়।

আমরা অনেক সময় আশ্চর্য হইয়া যাইতাম যে, এই যে এত বড়ো বৌদ্ধধর্ম, যাহা বাংলা বেহার হইতেই চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, বাংলায় তাহার কোনো চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি চলিয়া গেলে আমি মনে মনে স্থির করি, বৌদ্ধধর্ম বাংলায় কী রাখিয়া গিয়াছে খোঁজ করিতে হইবে। এমনি দেখিলে তো বোধ হয় কিছুই রাখিয়া যায় নাই। বেহারে তবু ভাঙা বাড়িগুলি আছে, বাংলায় তাও নাই। এই সময় 'বঙ্গবাসী'র যোগেনবাবু [যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু] ঘনরামের ধর্ম-মঙ্গল প্রকাশ করেন। সে বইখানা পড়িয়া মনে হয় যে ধর্মপূজাই হয় তো বৌদ্ধধর্মের শেষ অবস্থা। ধর্মঠাকুর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের উপর, তাঁর পুরোহিত ডোম, ব্রাহ্মণের সঙ্গে ধর্মমঙ্গলের সম্বন্ধ বড়ো বেশি নাই। তখন ধর্মঠাকুরের পূজা দেখিতে বড়ো ইচ্ছা হয়।

পাটুলির নিকট সুঁয়াগাছি গ্রামে এক ময়রার বাড়ি ধর্মঠাকুর আছেন শুনিয়া দেখিতে যাই। ঠাকুর খুব জাগ্রত, তাঁর কাছে মানত করিলে সব রকম পেটের অসুখ আরাম হয়। রথের মতন থাক্‌-থাক্‌ করা এক সিংহাসন, তাহার উপর ঠাকুর আছেন। ঠাকুর একখানি কালো পাথর বলিয়া মনে হইল, পাথরে যেন পিতলের paper-fastener বসানো আছে, সেগুলি ঠাকুরের চোখ। ভক্তিভাবে ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া কিছু পূজা দিয়া ময়রাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বাপু, তুমি কী মন্ত্রে ঠাকুর পূজা

করিয়া থাক ও ঠাকুরের ধ্যান কী ?" অনেক পীড়াপীড়ির পর সে ধ্যানের মন্ত্রটি বলিল ; মন্ত্রটি এই—

যস্যান্তো নাদিমধ্যো নচ করচরণং নাস্তি কায়নিদানং
নাকারং নাদিরূপং নাস্তি জন্ম ঝ [চ] যস্য ।
যোগীন্দ্রো জ্ঞানগম্যো সকলজনহিতং সর্বলোকৈকনাথং
তত্ত্বং তণ্ড নিরঞ্জনং [ম] মরবরদ পাতু বঃ শূন্যমূর্ত্তিঃ ॥[৩]

আবার শুনিলাম মুর্কিসমপাড়ার কাছে জামালপুরে এক ধর্মঠাকুর আছেন। তিনি বড়ো জাগ্রত, যে যা মানত করে, সে তাহা পায়। ঠাকুর বড়ো রাগি, কোনোরূপ ত্রুটি হইলে হঠাৎ মন্দ করিয়া বসেন। তিনি চালাঘরে থাকিতে ভালোবাসেন, কেহ কোঠাঘর করিয়া দিতে চাহিলে তাহার সর্বনাশ হইয়া যায়। তিনি যেখানে বসিয়া আছেন, তাহার মাথার উপর চালে খড় কখনই থাকে না। বৈশাখ মাসে পূর্ণিমার দিন তাঁহার ওখানে মেলা হয়, সে মেলায় ১০০০/১২০০ পাঁঠা পড়ে, অনেক শুয়ার ও মুরগিও পড়ে। আগে সামনেই শুয়ার মুরগি বলি হইত, এখন মন্দিরের পিছন দিকে হয়। এই-সকল শুনিয়া জামালপুরের ধর্মঠাকুর দেখিবার জন্য বড়োই আগ্রহ হইল। জামালপুর গেলাম ; গিয়া দেখি সামনে দাওয়ার চালে অসংখ্য ঢিল ঝুলিতেছে ; ন্যাকরার ফালি, কাপড়ের পাড়, পাটের দড়ি, শণের দড়ি, নারিকেল দড়ি প্রভৃতিতে ঢিল ঝোলানো আছে। কেহ কিছু মানত করিলে, একটি ঢিল ঝুলাইয়া আসে এবং মনোরথ পূর্ণ হইলে ঢিলটি খুলিয়া লয়। আমি অনেকক্ষণ মন্দিরের চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াইলাম ; আমার বোধ হইল মন্দিরের পিছনে একটা স্তূপ ছিল— তাহার গোল তলাটা মাত্র পড়িয়া আছে। তলা একেবারে মাটির সমান। মন্দিরের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে একটা প্রকাণ্ড মনসাসিজের গাছ, গাছের দুটা ডালের মধ্যে একখানা একটু পালিশ করা পাথর। সিজগাছের দুটা ডালের মাঝখানে পাথরখানা অনেক দিন আগে রাখা হইয়াছিল— তার পর ডাল বাড়িয়া উঠিয়াছে— দু দিক হইতে পাথরখানাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। অনেক টানিয়া পাথরখানা বাহির করিলাম— দেখিলাম উহাতে একটি বড়ো কারিকুরি করা W লেখা আছে। এইরূপ W-ই প্রায় ১০০০ বৎসর পূর্বে বৌদ্ধ ত্রিরত্নের চিহ্ন ছিল। মন্দিরের দক্ষিণ-

পূর্বে একটা প্রকাণ্ড গাছ, অশ্বত্থ কি বট মনে নাই— গাছের তলায় বিস্তর আস্‌শেওড়ার গাছ। আস্‌শেওড়ার বনের মধ্যে একখানা পাথর পড়িয়া আছে। পাথরখানা তুলিয়া লইয়া দেখিলাম উহাতে একটি নাগকন্যার মূর্তি। কন্যার মাথার উপরে কয়েকটি নাগ ফণা ধরিয়া রহিয়াছে। ইহাকে মনসার মূর্তি বলা যাইতে পারে।

আমি থাকিতে থাকিতেই একজন জীর্ণ শীর্ণ ব্রাহ্মণ আসিয়া মন্দিরের দ্বার খুলিলেন। আমি দেখিলাম একটি মাটির বেদির উপর একখানি পাথর বসানো। উল্কার পাথরের মতো উহা চক্‌চক্ করিতেছে। ব্রাহ্মণের অনুমতি লইয়া আমি ঠাকুরের কাছে কোষাকুষি লইয়া সন্ধ্যা করিতে বসিলাম এবং এই সুযোগে ঘরের সব জিনিস দেখিয়া লইলাম। ব্রাহ্মণ শিকা হইতে একটি বড়ো হাঁড়ি পাড়িলেন, তাহা হইতে প্রায় সেরখানেক চাল বাহির করিলেন এবং ধুইয়া একখানা বড়ো থালে রাখিলেন। এটি তাঁর নৈবেদ্য। নৈবেদ্যের চারি দিকে কিছু কিছু উপকরণ রাখিলেন। পরে আঙুল দিয়া নৈবেদ্যটি দুই ভাগ করিয়া কাটিলেন ; এইরূপ কাটায় নৈবেদ্যের মাথাটিও দুই ভাগে কাটিয়া গেল— তখন তিনি সেই দুই মাথায় দুটি সন্দেশ বসাইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, ও কী করিলেন ? নৈবেদ্য দু ভাগে কাটিলেন কেন ?" ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, "ইনি ধর্মঠাকুরও বটেন শিবও বটেন। তাই এক নৈবেদ্য দুই করা হয়।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কী মন্ত্রে নৈবেদ্য উৎসর্গ করেন ?" তিনি বলিলেন, "শিবায় ধর্মরাজায় নমঃ।" আমি তাঁহাকে ধর্মঠাকুরের ধ্যান পড়িতে বলিলে তিনি বলিলেন, "আমি জানি না, যাঁর ঠাকুর তিনি জানেন, তিনি এখন এখানে নাই, আমার উপর ভার দিয়া গিয়াছেন, আমি যাহা জানি তাহাতেই পূজা করি।"

শুনিলাম ঠাকুর একজন গোয়ালার ছিলেন। সেই পূজা-অর্চা করিত, কিন্তু ঠাকুর যখন খুব জাগ্রত হইয়া উঠিলেন তখন ব্রাহ্মণেরাও মানত করিতে লাগিল। চারি দিকেই বড়ো বড়ো ব্রাহ্মণের গ্রাম ; ব্রাহ্মণেরা গোয়ালার হাতে ঠাকুরের পূজা দিতে ইতস্তত করে দেখিয়া, গোয়ালা একজন দুর্দশাপন্ন ব্রাহ্মণকে পূজারি নিযুক্ত করিলেন। সে প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণেরই পূজা দিত, পরে অন্য জাতেরও পূজা দিতে লাগিল। কিন্তু শুয়ার ও মুরগি বলির সময় সে আসিত না, মানতওয়ালারা ছোটো

জাতের পণ্ডিত লইয়া আসিত। ক্রমে গোয়ালার বংশ লোপ হইয়া গেল। ব্রাহ্মণেরা প্রবল হইয়া উঠিল, এখন ঠাকুর তাঁদেরই— তাঁহারা সব হিন্দুর আচার-ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন। আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি উহা ইংরাজি [১৮] ৯৩ কি ৯৪ সালে। [১৮] ৯৮ কি ৯৯ সালে আমি আর-একবার যাই। সেবার দেখি ধর্মঠাকুর মাটির বেদিতে আর নাই। তাঁহার নিচে বেশ একটি পরিষ্কার বড়ো গৌরীপট্ট হইয়াছে।

ক্রমে অনুসন্ধান করিতে করিতে শুনিলাম কলিকাতা শহরের মধ্যেই অনেক স্থানে ধর্মঠাকুরের মন্দির আছে। তাহার মধ্যে ৪৫নং জানবাজার রোডের ধর্মঠাকুর খুব প্রবল। তাঁহার একটি একতলা মন্দির আছে, মন্দিরের সামনে বারান্দা আছে; বারান্দার নিচে উঠান আছে; উঠানের পর রেলিং আছে। সিংহাসনখানি অনেক থাকের উপর। ধর্মঠাকুরের আসন সকলের উপর। তাঁহার নিচের থাকে গণেশ ও পঞ্চানন্দ। গণেশ ও পঞ্চানন্দের নিচে তিনখানি পাথর, মাঝেরখানি একটু ছোটো, বোধ হয় ত্রিরত্নের মূর্তি। এই তিনখানির নিচের থাকে শীতলা ও ষষ্ঠী, আর ঘরের কোণে জ্বরাসুর— প্রকাণ্ড মূর্তি, ত্রিপদ ও ত্রিশির। ধর্মঠাকুরের চোখ আছে, এবং সেই তিনখানি পাথরেরও চোখ আছে। ধর্মঠাকুরের মানত করিলে অনেকে পাঁঠাও দেয়, কিন্তু পাঁঠা বলির সময় ধর্মঠাকুরের সামনের কপাটখানি বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়, কারণ ধর্মঠাকুর পরম বৈষ্ণব, মাংস খানও না প্রাণী-হিংসাও চান না। কিন্তু পঞ্চানন্দ বড়ো মাংসাশী— তিনি যেমন মাংস খান তেমনি মদও খান। তালতলা লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন দে এই ধর্মঠাকুরের মানত করিয়া আপন সংসারের শ্রীবৃদ্ধি-সাধন করিয়াছিলেন। তিনিই ধর্মঠাকুরের মন্দিরের মেরামত করিয়া দিয়াছেন, সৌষ্ঠব করিয়া দিয়াছেন। পূজা আদির ব্যবস্থাও তিনিই করেন। ধর্মঠাকুরের পূজারি একজন বর্ণ-ব্রাহ্মণ। বসন্তের চিকিৎসা ও শীতলার পূজা করিয়া তিনি বেশ সঙ্গতি-পন্ন হইয়াছেন। হরিমোহনবাবুই আমাকে তন্ন তন্ন করিয়া মন্দিরটি দেখাইয়াছিলেন। পঞ্চানন্দের মদ্য পান ও মাংস আহারের সম্বন্ধে তিনি বলিলেন, ধর্মঠাকুর যে কেন এ মাতালটিকে সঙ্গে রাখেন জানি না। ওটার কিন্তু ক্ষমতা খুব-- যে যা ধরে সে তাই পায়। কিন্তু ওটা মাতালের একশেষ। একদিন একটু মদ কম দেওয়া হইয়াছিল। সেইদিন হতে

আর ওকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নিকটস্থ সকল স্থান তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা গেল, কিছুতেই পাওয়া গেল না। অনেকে পঞ্চানন্দের পূজা না হওয়ায়, নিজের আহারাদি বন্ধ করিয়া দিল। শেষ একদিন একজনকে স্বপ্ন দিলেন, "আমি জানবাজারের চৌমাথায় শুঁড়ির দোকানের একটা মদের জালার ভিতরে পড়ে আছি।" তখন ঢাকঢোল বাজাইয়া জালার ভিতর হইতে তাঁহাকে বাহির করা হইল। মহাসমারোহে তাঁহাকে আবার ধর্ম মন্দিরে স্থান দেওয়া হইল। হরিমোহনবাবু গদ্‌গদ ভাবে বলিলেন, "সেইদিন হইতে মহাশয়, আমি ওঁর জন্য রোজ এক বোতল মদের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি, যেন আর না পালায়।" হরিমোহনবাবুর গদ্‌গদ ভাব দেখিয়া আমি বাস্তবিক বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম।

বলরাম দে-র স্ট্রিটেও একটি ধর্মঠাকুর আছেন। কিন্তু সেখানে শীতলাই প্রবল। একটু বিশেষ মন দিয়া না খুঁজিলে ধর্মঠাকুরকে দেখিতেই পাওয়া যায় না।'

এইরূপ নানা জায়গায় ধর্মঠাকুরের নানা মন্দির দেখিয়া ধর্মঠাকুর যে বৌদ্ধধর্মেরই অবশেষ তাহা আমার বেশ বিশ্বাস হইল। কিন্তু আমার বিশ্বাস হইলে তো হয় না। অন্যকে তো বোঝানো চাই। সুতরাং আমি আমার সুযোগ্য ভ্রমণকারী পণ্ডিত রাখালচন্দ্র কাব্যতীর্থ ও বিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ দুই জনকেই যে যে স্থানে ধর্মঠাকুরের বড়ো বড়ো মন্দির আছে, সেই সেই স্থানে পুথি খোঁজার জন্য পাঠাইয়া দিই। তাঁহাদিগকে বলিয়া দিই, "যদি 'হাকন্দ পুরাণ' পাও বা ময়ূরভট্টের 'ধর্মমঙ্গল' পাও, অতি অবশ্য করিয়া লইয়া আসিবে; এবং কোনো প্রসিদ্ধ মন্দির দেখিলে মন্দিরের ও মন্দিরের দেবতার বিবরণ লিখিয়া আনিবে।" রাখালচন্দ্র বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত শলপ নামক স্থানে গিয়া দেখেন যে ধর্মের মন্দিরে রীতিমতো ধ্যানস্থ বুদ্ধের মূর্তি রহিয়াছে। বিনোদবিহারী ময়নায় যাইয়া খবর দেন যে ধর্মের মন্দিরে পূর্বে তিনটি জিনিস ছিল। একখানি পাথর, একটি শঙ্খ ও ধর্মঠাকুর। পাথরটি আর পাওয়া যায় না, শঙ্খটিও আর দেখা যায় না— কেবল ধর্মঠাকুরই আছেন; ধর্মঠাকুর দেখিতে কচ্ছপের মতো। ইহার পর শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র একখানি পুথি সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসেন— উহার নাম 'ধর্ম্মপূজাবিধি'। আমার এখনকার সুযোগ্য সহকারী শ্রীযুক্ত বাবু ননীগোপাল

বন্দ্যোপাধ্যায় এ পুস্তকখানি ছাপাইতেছেন। পুস্তকখানি পড়িলেই বেশ বুঝা যাইবে ধর্মঠাকুর শিবও নন, বিষ্ণুও নন, ব্রহ্মাও নয়, কারণ ইঁহারা সকলেই ধর্মঠাকুরের আবরণ দেবতা। ইঁহাদের ধ্যান, পূজা ও নমস্কারাদির ব্যবস্থা স্বতন্ত্র আছে। ধর্মঠাকুর ইঁহাদের ছাড়া ; ইঁহাদের চেয়ে বড়ো। ধর্মঠাকুরের শক্তির নাম কামিন্যা। বল্লুকানদীর তীরে ইঁহার প্রথম আবির্ভাব হয়। আমি বল্লুকানদীর তীরে বড়ওয়ান গ্রামে এই ধর্মঠাকুরের মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। এককালে ধর্মঠাকুরের খুব বড়ো মন্দির ছিল। ভাঙা মন্দিরের চিহ্ন এখনো অনেক জায়গায় আছে। এখনকার মন্দিরটি একটি প্রকাণ্ড একতলা ঘর ; সামনে একটি বড়ো নাটমন্দির। মন্দিরের অধিকারী একজন স্ত্রীলোক, মুখী পণ্ডিত, সাধুভাষায় নাম মোক্ষদা। তিনি জাতিতে ডোম— নিজেই পূজা করেন ; তবে পাল-পার্বণে একজন ব্যাকরণ-জানা ডোমের পণ্ডিত লইয়া আসেন। তিনিও "যস্যান্তো নাদিমধ্যো" ইত্যাদি মন্ত্রে ধর্মঠাকুরের পূজা করিয়া থাকেন।

ধর্মঠাকুরের মূর্তি কচ্ছপের ন্যায়। এইটি বুঝিতে হইলে বৌদ্ধধর্মের অনেক কথা বুঝিতে হয়। বৌদ্ধদের তিনটি রত্ন ছিল। তিনটিই উপাসনার বস্তু-- বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ। বুদ্ধ বলিতে শাক্যসিংহ বুঝাইত, ধর্ম বলিতে গ্রন্থাবলী বুঝাইত এবং সংঘ বলিতে ভিক্ষুমণ্ডলী বুঝাইত। কোনো কোনো সম্প্রদায় বুদ্ধকে প্রথম স্থান না দিয়া ধর্মকেই প্রথম স্থান দিতেন। তাঁহাদের মতে ত্রিরত্ন হইত "ধর্ম, বুদ্ধ ও সংঘ"। ক্রমে ধর্ম বলিতে স্তূপ বুঝাইত। পূর্ব পূর্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে মহাযান মতে শাক্যসিংহ কেবলমাত্র লেখক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন— ত্রিরত্নের মধ্যে তাঁহার স্থান নাই। সেখানে ধ্যানীবুদ্ধেরা[৪] আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই-সকল ধ্যানীবুদ্ধ অনাদি ও অনন্ত। ধ্যানীবুদ্ধগণের মন্দির ক্রমে স্তূপের গায়েই আসিয়া উপস্থিত হইল। অর্থাৎ ধর্ম ও তথাগত এক হইয়া গেল। স্তূপের গায়ে কুলুঙ্গি কাটা হইতে লাগিল। পূর্বের কুলুঙ্গিতে অক্ষোভ্য বসিলেন, পশ্চিমে অমিতাভ, দক্ষিণে রত্নসম্ভব, এবং উত্তরে অমোঘসিদ্ধি। প্রথম ধ্যানীবুদ্ধ যে বৈরোচন তিনি স্তূপের ঠিক মধ্যস্থলে থাকিতেন। এইরূপ চারিটি কুলুঙ্গিওয়ালা স্তূপই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কিছুকাল পরে প্রধান ধ্যানীবুদ্ধকে এরূপে লুকাইয়া রাখা লোকে পছন্দ করিল না। দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আর-একটি কুলুঙ্গি

করিয়া সেইখানে তাঁহার স্থান করিয়া দিল। পাঁচটি কুলুঙ্গিওয়ালা স্তূপ দেখিতে ঠিক কচ্ছপের মতো হইল। আমাদের ধর্মঠাকুর কচ্ছপাকৃতি। সুতরাং তিনি এই শেষকালের স্তূপেরই অনুকরণ। স্তূপ আবার ধর্মের প্রতিমূর্তি। সুতরাং স্তূপ, ধর্ম এবং কচ্ছপাকৃতি তিনই এক হইয়া গেল। ইহাতেই মনে হয় কচ্ছপাকৃতি ধর্মঠাকুর পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের মূর্তির সহিত ধর্মমূর্তির স্তূপ— আর-কেহ নহে।

এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে— সংঘ কোথায় গেল। মহাযানে সংঘ বোধিসত্ত্ব[৫] রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। অনেক বোধিসত্ত্বের স্বতন্ত্র পূজা হইত। এখন ভদ্রকল্প[৬] চলিতেছে। এ কল্পে অমিতাভের পালা। অমিতাভের বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর, তিনিই কর্তা, তিনিই জগৎ উদ্ধার করিতেছেন, তাঁর সহস্র সহস্র নাম, তাঁর সহস্র স্বতন্ত্র মন্দির আছে। স্তূপ হইতে তাঁহাকে এখন পৃথক করিয়া লওয়া হইয়াছে— ত্রিরত্ন এখন আর নাই। মাত্র ধর্মঠাকুর আছেন। ঐ যে বিনোদবিহারী বলিয়াছেন যে, ময়নায় পূর্বে একখানি পাথর, ধর্মঠাকুর ও শঙ্খ পাওয়া গিয়াছিল। পাথর লোপ পাইয়াছে অর্থাৎ ত্রিরত্নের বুদ্ধ লোপ পাইয়াছেন। শঙ্খও নাই অর্থাৎ সংঘও নাই। আছেন কেবল ধর্মঠাকুর— কচ্ছপাকৃতি।

নেপালে প্রত্যেক বিহারে ফটকের কাছে দেখিবে, এক-একটি হারীতির মন্দির। হারীতিই বসন্তের দেবতা, আমাদের দেশের শীতলা। বিহারবাসী বৌদ্ধ-ভিক্ষুরা শীতলাকে বড়ো ভয় করিতেন, সেইজন্য তাঁহারা হারীতিকে পূজা না দিয়া, বিহারে প্রবেশ করিতেন না। আমাদের এখানেও ধর্মঠাকুরের সহিত শীতলার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে ধর্মঠাকুরের মন্দির সেইখানেই প্রায় শীতলা।

গণেশ ও মহাকাল নেপালে বুদ্ধমন্দিরের দ্বার-দেবতা। যেখানে বুদ্ধের মন্দির, মন্দিরের মধ্যে ছোটো চৈত্যই থাকুক বা শাক্যসিংহের মূর্তিই থাকুক— দ্বারের একদিকে গণেশ, একদিকে মহাকাল। নেপালে দু জনেই মাংসাশী, দু জনেই মাতাল। বাংলায় মহাকালের জায়গায় পঞ্চানন্দ হইয়াছেন। বাংলায় গণেশ মাংস খান না, কিন্তু পঞ্চানন্দ বড়ো মাংসাশী। হরিমোহনবাবু পঞ্চানন্দের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা পূর্বেই বলিয়াছি।

তার পর ধর্মঠাকুরের চোখ। এখন তো লোকে Paper-fastener

দিয়া ধর্মঠাকুর ও শীতলার চোখ তৈয়ার করিয়া থাকে। কিন্তু চোখ স্তূপের একটা অঙ্গ। স্তূপের গোল শেষ হইয়া গেলে তাহার উপর একটা চৌকা জিনিস থাকে। তাহার চারি দিকেই দুইটা করিয়া চোখ থাকে। তথাগত প্রাতঃকালে উঠিয়াই একবার চারিটি দিক অবলোকন করিতেন। তিনি চক্ষু হইতে শ্বেত, নীল, পীত, লোহিত প্রভৃতি নানা বর্ণের রশ্মি বাহির করিয়া ত্রিসাহস্র মহাসাহস্র লোকধাতুর[৭] অন্ত পর্যন্ত অবলোকন করিতেন। সেইজন্য এই ত্রিসাহস্র মহাসাহস্র লোকধাতুর নাম অবলোকিত। সুতরাং স্তূপের গোলার্ধের উপর চারি দিকে চার জোড়া চোখ থাকাই উচিত। এখনকার ধর্মঠাকুরেরও সেইজন্য অনেক চক্ষু। ইহাতেও ধর্মঠাকুরকে পুরানো বৌদ্ধধর্মের শেষ বলিয়া মনে হয়।

আমরা শাক্যসিংহের মতাবলম্বীদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া থাকি, কিন্তু তাহারা আপনাদিগকে কী বলিত? তাহারা আপনাদিগকে সদ্ধর্মী বলিত এবং আপনাদের ধর্মকে সদ্ধর্ম বলিত।[*] অনেক জায়গায় দ ও ধ-য়ের যে সংযুক্ত বর্ণ তাহার পরিবর্তে শুধু ধ বলিত। অশোকের শিলালিপিতে বৌদ্ধধর্মের নাম সধর্ম। অনেক সংস্কৃত পুস্তকেও উহার নাম সধর্ম। রামাই পণ্ডিত ধর্মঠাকুরের পূজার পদ্ধতি লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি নিরঞ্জনের উষ্মা নামে যে ছড়া লিখিয়াছেন তাহাতেও ধর্মঠাকুরের পূজকদিগকে সধর্মী বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং রামাই পণ্ডিতও মনে করিতেন যে, ধর্মঠাকুরের পূজা ও বৌদ্ধধর্ম এক। ছড়াটি পরে দেওয়া গেল। এ ছড়া পড়িলে আরো বোধ হইবে যে ধর্মঠাকুরের পূজা বৌদ্ধধর্মের ন্যায় ব্রাহ্মণবিরোধী ধর্ম। কারণ ছড়ায় বলিতেছে, "ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত অত্যাচার করাতেই সধর্মীরা ধর্মঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করে—আপনি আমাদের আপদ উদ্ধার করুন। ধর্মঠাকুর অমনি মুসলমান মূর্তি ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে জব্দ করিয়া দিলেন।"

শ্রীনিরঞ্জনের উষ্মা।

জাজপুর পুরবাদি সোলসয় ঘর বেদি
বেদি লয় কর লয় দুন।
দক্ষিণা মাগিতে যায় যার ঘরে নাহি পায়
শাপ দিয়া পোড়ায় ভুবন॥

মালদহে লাগে কর　　না চিনে আপন পর
জালের নাইর দিশ পাস ।
বোলিষ্ঠ হইল বড়　　দশবিশ হইয়া জোড়
সধর্ম্মীকে করএ বিনাশ ॥
বেদে করে উচ্চারণ　　বেরায় অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিয়া সভাই কম্ফমান ।
মনেতে পাইয়া মর্ম্ম　　সবে বলে রাখ ধর্ম্ম
তোমা বিনে কে করে পরিত্রাণ ॥
এইরূপে দ্বিজগণ　　করে ছিষ্টি সংহারণ
এ বড় হইল অবিচার ।
বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম্ম　　মনেতে পাইয়া মর্ম্ম
মায়াতে হইল অন্ধকার ॥
ধর্ম্ম হইল যবনরূপী　　মাথায়েতে কাল টুপি
হাতে শোভে তীরুচ কামান ।
চাপিয়া উত্তম হয়　　ত্রিভুবনে লাগে ভয়
খোদার বলিয়া এক নাম ॥
নিরঞ্জন নিরাকার　　হইল্য ভেস্ত অবতার
মুখেতে বলেন দম্মাদার ।
যতেক দেবতাগণ　　সবে হয়্যা একমন
আনন্দে পরিল ইজার ॥
ব্রহ্মা হইলা মহাম্মদ　　বিষ্ণু হইলা পেগাম্বর
আদম্ফ হইল শূলপাণি ।
গণেশ হইল গাজি　　কার্ত্তিক হইল কাজী
ফাকির হইল যত মুনি ॥
তেজিয়া আপন ভেক　　নারদা হইল্য সেক
পুরন্দর হইলা মৌলানা ।
চন্দ্র সূর্য্য আদি দেবে　　পদাতিক হয়্যা সবে
সবে মেলি বাজায় বাজনা ॥
আপুনি চণ্ডিকাদেবী　　তিঁহ হইল্যা হায়া বিবি
পদ্মাবতী হইল বিবিনূর ।

যতেক দেবতাগণ হয়্যা সবে একমন
প্রবেশ করিল জাজপুর ॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা কিড়্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় বলে বোল।
ধরিয়া ধর্ম্মের পায় রামাই পণ্ডিত গায়
ই বড় বিষম গণ্ডগোল ॥

'নারায়ণ'
মাঘ, ১৩২২ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

এই প্রবন্ধে ধর্ম-পূজা বিষয়ে উল্লেখগুলি সম্পর্কে তথ্যের জন্য "রমাই পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল" প্রবন্ধের প্রাসঙ্গিক তথ্য অংশ দ্রষ্টব্য। পৃ. ২২২-৩২।

১. এই বইয়ের পৃ. ১৯৯ সূত্র ৩ দ্র.

২. নেপালে রেসিডেন্সির হেড-পণ্ডিত অমৃতানন্দর সঙ্গে হজ্‌সনের প্রগাঢ় বন্ধুতার সম্পর্ক ছিল। তথ্য সংগ্রহে তিনিই ছিলেন হজ্‌সনের প্রধান সহায়। হজ্‌সনের জীবনী লেখক হান্টার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী, বিনয়ী এবং মর্যাদাময় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অমৃতানন্দের কথা সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করেছেন। হান্টার বলেন, বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন এবং বুদ্ধদেব সম্পর্কে হজ্‌সন অমৃতানন্দকে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। অমৃতানন্দ যে উত্তর দিয়েছিলেন তারই ভাষ্য রচনা করে হজ্‌সন গবেষণার এক অজ্ঞাত এলাকা পাশ্চাত্ত্য গবেষকদের গোচরে এনে দেন। অমৃতানন্দ সংকলিত ২৫ স্তবকে সম্পূর্ণ 'নৈপালীয়-দেবতা-কল্যাণ পঞ্চ-বিংশতিকা'য় নেপালে পূজিত বিভিন্ন বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব ও হিন্দু দেবতার এবং তীর্থ ও চৈত্যের বিবরণ পাওয়া যায়। অমৃতানন্দের অনুলিপির উপরে নির্ভর করে ই. বি. কাওয়েল অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' প্রকাশ করেন। 'বুদ্ধচরিত'-এর কোনো পূর্ণাঙ্গ পুথি না পাওয়ায় অমৃতানন্দ নিজেই অংশত রচনা করে দিয়েছিলেন। দ্র. William Wilson Hunter, *Life of Brian Houghton Hodgson*, London 1896; Shastri 'A new MS. of Buddha Carita', *J-A-S-B*, N.S., Vol. V. 1909, p. 47; *H-I-L*, Vol. II, p. 378; হ-র-সং-২, পৃ. ৪৭০।

৩. অনুবাদ: যাঁর অন্ত্য নেই, আদি নেই মধ্য নেই, কর নেই, চরণ নেই, দেহ নেই, আকার নেই, আদি নেই, যাঁর জন্মও নেই,

যিনি যোগীশ্রেষ্ঠ— জ্ঞানে যাঁকে জানা যায়, সকলের যিনি হিতকারী, সকল লোকের একমাত্র প্রভু, যিনি তত্ত্বস্বরূপ নিরঞ্জন এবং দেবতাদেরও যিনি বর দান করেন, সেই শূন্যমূর্তি তোমাদের রক্ষা করুন।

৪. এই বইয়ের পৃ. ৩৩৬ সূত্র ১০ দ্র.

৫. এই বইয়ের পৃ. ২৫৬ সূত্র ১৪ দ্র.

৬. কল্প, পালি কপ্‌প। কাল পরিধি। শূন্য-কল্প এবং অশূন্য-কল্প বা বুদ্ধ-কল্প কল্পের দুই প্রকারভেদ। শূন্য-কল্পে কোনো বুদ্ধ বর্তমান থাকেন না। অশূন্য বা বুদ্ধ-কল্পে এক বা একাধিক বুদ্ধ বর্তমান থাকেন। আবির্ভূত বুদ্ধের সংখ্যার হিসাব অনুযায়ী অশূন্য-কল্পের পাঁচ প্রকারভেদ কল্পনা করা হয়। সারকপ্‌পো-য় একজন বুদ্ধ আবির্ভূত হন। মণ্ডকপ্‌পো-য় দু জন, বরকপ্‌পো-য় তিন জন, সারমণ্ডকপ্‌পো-য় চার জন এবং ভদ্দকপ্‌প— ভদ্রকল্প বা মহাভদ্রকল্পে পাঁচ জন বুদ্ধ আবির্ভূত হন। বর্তমানে চলতি কল্পকে ভদ্রকল্প ধরা হয়। এই কল্পে ককুসন্ধ, কোণাগমন কস্‌সপ এবং গোতম— চার জন বুদ্ধ আবির্ভূত হয়েছেন। মেত্তেয়— মৈত্রেয় বুদ্ধ আবির্ভূত হবেন। বৌদ্ধধর্মে জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত। বিশেষত মহাযানে অগণিত বুদ্ধের অস্তিত্ব কল্পিত হয়েছে।

৭. লোকধাতু অর্থ চক্রবাল। মহাবিশ্বলোকের উপাদান। মহাবিশ্বলোক বহু লোকধাতুর সমবায়।

১১. উড়িষ্যার জঙ্গলে

বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল খুঁজিতে খুঁজিতে বাংলায় ধর্মপূজা বৌদ্ধধর্মের শেষ বলিয়া বোধ হইল, তখন উড়িষ্যার জঙ্গলে আবার খোঁজ আরম্ভ হইল ; যদি সেখানে পাওয়া যায়। সেখানে যে বৌদ্ধধর্মের কিছু কিছু আছে এরূপ প্রত্যাশা করিবার একটা কারণ এই যে, উড়িষ্যার গড়জাত মহলের মধ্যে একটি মহলের নাম বোধ অর্থাৎ বৌদ্ধ। সেখানে এখনো বৌদ্ধধর্মের কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। আর-একটা কারণ এই যে, গড়জাত ও কিল্লাজাত মহলের অনেক জায়গায়— এমন-কি মোগলবন্দিতেও পুরী ও কটক জেলার অনেক থানায় সরাকি নামে এক জাত তাঁতি বাস করে। তাহাদের বিবাহাদি শুভকার্যে এখনো বুদ্ধদেবের পূজা হইয়া থাকে। সরাকি তাঁতি বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া জেলাতেও আছে, কিন্তু তাহারা একেবারে হিন্দু হইয়া গিয়াছে— তাহাদের ক্রিয়াকর্মে এখন বৌদ্ধধর্মের গন্ধও নাই। "সরাকি" শব্দের ব্যুৎপত্তি করিলে দেখা যায় যে উহা "শ্রাবক" শব্দের অপভ্রংশ। সুতরাং সরাকিরা যে এককালে বৌদ্ধ ছিল ইহাতে আর সন্দেহ নাই। উড়িষ্যায় উহারা এখনো অনেকটা বৌদ্ধ।[১]

মুসলমানদের হাতে বাংলার বৌদ্ধধর্ম নষ্ট হয়। উড়িষ্যাতে তো সে সময় মুসলমানেরা যাইতে পারে নাই। উড়িয়ারা আর চারি শত বৎসর পর্যন্ত স্বাধীন ছিল। সুতরাং বাংলায় যেভাবে বৌদ্ধধর্ম লোপ হইয়াছিল উড়িষ্যায় সেভাবে হয় নাই। বিশেষ উড়িষ্যার জগন্নাথদেব নিজেই বুদ্ধমূর্তি। এখন তিনি নারায়ণের অবতার হইলেও নবম অবতার অর্থাৎ বুদ্ধ অবতার। চূড়ামণি দাস চৈতন্যচরিত লিখিতে গিয়া জগন্নাথদেবকে বুদ্ধ অবতারই বলিয়া গিয়াছেন।[২] কিন্তু উড়িষ্যার জঙ্গলে বৌদ্ধধর্ম বাহির করিয়াছেন শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু।[৩] তিনি দিনকতক বিনা বেতনে ময়ূরভঞ্জের আর্কিওলজিকেল সর্ভেয়র হইয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহাকে ময়ূরভঞ্জের জঙ্গলে অনেক ঘুরিতে হইয়াছিল, অনেক লোকের সহিত মিলিতে মিশিতে হইয়াছিল। তাহাতেই তিনি বুঝিতে পারেন যে সেখানে এখনো বৌদ্ধধর্ম অনেক

স্থানে চলে। তিনি এই ধর্মের অনেক উড়িয়া পুস্তকও সংগ্রহ করিয়াছেন। এ প্রবন্ধে আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

কিন্তু নগেনবাবুর সব কথা বুঝিতে হইলে, উড়িষ্যায় বৌদ্ধধর্ম কতদিন হইতে চলিতেছিল ও ঐ ধর্ম সেখানে কিরূপ গোড়া গাড়িয়া বসিয়াছিল, তাহার কতক কতক জানা আবশ্যক। তাই আরো একটু পুরানো কথা আলোচনা করিব, পরে নগেন্দ্রবাবুর কথা বলিব।

অশোকেরও পূর্বে উড়িষ্যা দেশে বিশেষ ভুবনেশ্বরের চারি পাশে বৌদ্ধধর্ম বেশ প্রবল হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। স্পুনর [D. Brained Spooner] সাহেব একবার আমাকে কয়েকখানি উড়িয়া লেখা তালপাতা দেখিতে দিয়াছিলেন, তাহা পড়িয়া এবং উদয়গিরির দু-একখানি লেখ পড়িয়া মনে হয় ঐর[৪] নামে একজন রাজা অশোকের অনেক পূর্বে মগধের হস্ত হইতে উড়িষ্যার উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন এবং অনেক মঠ ও গুহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। অশোকরাজা উড়িষ্যা জয় করেন এবং তথায় বৌদ্ধধর্মের খুব শ্রীবৃদ্ধি করেন। এখানে বলিয়া রাখি যে, উড়িষ্যা ও কলিঙ্গ প্রায় একই দেশ। কটক ও পুরী জেলা কলিঙ্গও বটে উড়িষ্যাও বটে। কিন্তু বালেশ্বরকে কখনো কলিঙ্গ বলে কিনা জানি না। অশোকের সময় কলিঙ্গর রাজধানী ছিল তোষলি। তোষলি জায়গাটা অনেক দিন খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, কিন্তু এখন পাওয়া গিয়াছে— উহার এখনকার নাম ধৌলি, তোষলি শব্দেরই অপভ্রংশ। অশোকের তোষলি হইতে এখনকার ধৌলি এক মাইলের মধ্যে, দেখা যায়। অশোকের তোষলিতে একটি পাহাড়ের মাথা ছাঁটিয়া তথায় একটি হাতির মূর্তি বাহির করা হইয়াছে। হাতির মাথা আছে, শুঁড় আছে, সামনের দুটি পা আছে এবং ধড়ের অর্ধেকটা আছে। বাকিটা খুদিয়া বাহির করা হয় নাই। হাতির সামনে অনেকটা জায়গায় বেশ খাঁজ কাটা আছে। বেশ করিয়া নিপুণ হইয়া সে খাঁজগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বোধ হয় পূর্বে সেখানে একটি কাঠের মন্দির ছিল। হাতিটি তাহার ভিতরে থাকিত। এই মন্দিরের নিচে পাহাড়ের গা বেশ পরিষ্কার করিয়া তাহাতে অশোকের একটি শিলালেখ আছে। অশোকের অন্যান্য শিলালেখেও যতগুলি আজ্ঞা (Edict) থাকে এখানেও সেইগুলি আছে। অধিকের মধ্যে একটি নূতন আজ্ঞা আছে— সেটি এই

যে, শ্রাবণমাসের কোন্ কোন্ তিথিতে তোষলির লোকদিগকে এই আজ্ঞাগুলি শুনাইয়া দিতে হইবে। সুতরাং অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য যে বিশেষ যত্ন করা হইয়াছিল তাহা বেশ বুঝা যায়।[৫] অশোকের পরে উড়িষ্যায় বোধ হয় জৈনধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়। কারণ উদয়গিরির হাতিগুম্ফায় যে প্রকাণ্ড শিলালেখ পাওয়া যায় সেটি জৈন-লেখ। খণ্ডগিরিতেও জৈনধর্মের অনেক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া বৌদ্ধধর্ম সেখানে লোপ হয় নাই। হিয়েন-সাং যখন নালন্দায় পড়িতেছিলেন তখন উড়িষ্যার হীনযানীরা মহাযানীদিগকে কাপালিক বলিয়া গালি দিয়াছিল। হর্ষবর্ধন ইহাতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া হিয়েন-সাংকে বিচার করিবার জন্য উড়িষ্যায় পাঠাইয়াছিলেন।

মহাযান ধর্মে যখন নানা দেবদেবীর উপাসনা আরম্ভ হইল— অর্থাৎ বজ্রযান ধর্ম যখন প্রবল হইয়া উঠিল— তখন উড়িষ্যা বজ্রযানের একটি প্রধান কেল্লা হইয়া দাঁড়াইল। উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রভূতি বজ্রবারাহীর পূজা প্রকাশ করেন, তিনি বজ্রযানের অনেক পুস্তক লিখিয়া যান। উড়িষ্যা, বাংলা, মগধ, নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি দেশে তাঁহার মতের খুব আদর ছিল। তাঁহার এক মেয়ে ছিলেন, নাম লক্ষ্মীঙ্করা।[৬] তিনিও বজ্রযান মতের অনেক পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। উড়িষ্যার তেলি, কায়স্থ প্রভৃতি জাতের লোকেও অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন। এই-সকল পুস্তকেরই তিব্বতি ভাষায় তর্জমা আছে এবং তিব্বতি লোকে আদর করিয়া পড়ে।

ইন্দ্রভূতির পর সোমবংশ, কেশরীবংশ, গঙ্গবংশ, গজপতিবংশ ও সর্বশেষে তেলেঙ্গা মুকুন্দদেব উড়িষ্যায় রাজত্ব করেন।[৭] ইঁহাদের সময়ে উড়িষ্যায় বৌদ্ধও ছিল, হিন্দুও ছিল। ব্রাহ্মণেরও প্রতিপত্তি ছিল, বিহার-বাসী ভিক্ষুদেরও প্রতিপত্তি ছিল ; কিন্তু রাজা হিন্দু হওয়ায় এবং রাজ-সভায় ব্রাহ্মণদিগের প্রতিপত্তি অধিক হওয়ায়, এবং মুসলমান ইতিহাস লেখকেরা হিন্দু ও বৌদ্ধের ভেদ করিতে না পারায়, উড়িষ্যা হিন্দুর দেশ বলিয়াই পরিচিত হইত। মগধ ও বাংলার বৌদ্ধ-পণ্ডিতেরা লোপ হইয়া যাওয়ায় উড়িষ্যার বৌদ্ধেরা অতি হীন ভাবে বাস করিত। নগেন্দ্রবাবু যে-সকল পুস্তক আনিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যায়, প্রতাপ রুদ্রের সময় ১৫০০ হইতে ১৫৩৩ পর্যন্ত বৌদ্ধদিগের উপর উড়িষ্যায় অত্যন্ত উৎপাত

হইয়াছিল। বড়ো বড়ো বৌদ্ধগণ বাহিরে বৈষ্ণব সাজিয়া থাকিতেন কিন্তু তাঁহাদের মত চলিত বৈষ্ণবধর্ম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁহারা শূন্য-পুরুষ মানিতেন। শূন্যপুরুষকেই বিষ্ণু মনে করিয়া পূজা করিতেন। তাঁহারা অলেখ শব্দ সর্বদাই ব্যবহার করিতেন। অলেখ অর্থাৎ অরেখ অর্থাৎ কোনো দাগ নাই। নিরঞ্জন শব্দও এই অর্থে ব্যবহার হইয়া থাকে—

"জয় ধর্ম্ম শ্রী পুরুষোত্তম। অনাদি স্তুতি পরমব্রহ্ম ॥১
অব্যক্ত পুরুষ নিরাকার হরি। সর্ব্ব ঘটে অচ্ছু ব্রহ্মরূপ ধরি ॥২
নাহি রেখ রূপ তোর শ্রীবিজ্ঞপুরুষ। বিষ্ণুর গোচর হইছু প্রকাশ ॥৩
মন-নয়ন-চিত-চেতন নাহি তোর। কর্ম্ম ধর্ম্ম সর্ব ঠারে সিদ্ধ ন কর ॥৪
মহামূল্য তোর নাম। ওঁকার শব্দ এ যে বেদান্ত আগম ॥"

(Modern Buddhism—P. 41)

[বলরাম দাস, 'ব্রহ্মাণ্ড-ভূগোল-গীতা']

আবার—

"তোহর রূপ রেখ নাহী। শূন্য পুরুষ শূন্যদেহী ॥
বোইলে শূন্য তোর দেহো। আবর নাম থিব কাহোঁ ॥
শূন্য রে ব্রহ্মাসিনা থাহি। সেঠারে নাম থিব রহি ॥"

(Modern Buddhism— P. 40)

[বলরাম দাস, 'বিরাট-গীতা']

শূন্যবাদ ও ব্রহ্মবাদের কেমন অদ্ভুত মিলন। যিনি শূন্য, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই পুরুষোত্তম।[৮]

অচ্যুতানন্দ দাস, বলরাম দাস, জগন্নাথ দাস, অনন্ত দাস, যশোবন্ত দাস ও চৈতন্য দাস— ইঁহারাই এই বৈষ্ণবধর্মের প্রধান কবি।[৯] অচ্যুতানন্দ দাস প্রতাপরুদ্রের সময় নীলাচলে বাস করিতেন। বলরাম দাস 'প্রণব গীতা' লেখেন এবং মুক্তিমণ্ডপে বসিয়া বেদান্তমতে 'প্রণব গীতা'র ব্যাখ্যা করেন— তাহাতে ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অনবরত গালি দিতে থাকে। মহারাজ প্রতাপরুদ্রও রাগান্বিত হইয়া বলেন, "তুই শূদ্র, প্রণব উচ্চারণে ও বেদের ব্যাখ্যায় তোর কী অধিকার আছে?" তাহাতে বলরাম হাসিয়া বলেন, "শ্রীপতি কাহারো নিজস্ব নন্। যে ভক্ত, যে ধার্মিক, তাঁরই তিনি। জগন্নাথে কাহারো একচেটিয়া অধিকার নাই। ব্রাহ্মণেরা কেবল দাম্ভিকতা করিয়া বলিতেছেন জগন্নাথ তাঁহাদেরই।

আমি বেদের বচন উদ্ধার করিয়া এ-সকল কথা প্রমাণ করিতে পারি।" ব্রাহ্মণেরা শুনিয়া আরো রাগিয়া উঠিলেন এবং চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "করুক্, করুক্, এখনই করুক্, এখনই করুক্।" রাজাও তাহাতে সায় দিলেন। স্থির হইল, সকলে পরদিন প্রভাতে বলরামের আখড়ায় যাইবে এবং তথায় বিচার হইবে। বলরাম সেদিন ভয়ে আর বাড়ি গেলেন না — বটমূলে আশ্রয় লইলেন। গভীর নিশায় নরহরি আসিয়া বলরামকে দেখা দিলেন এবং তাঁহাকে ভরসা দিয়া গেলেন। পরদিন রাজা আসিয়া উপস্থিত হইলে বলরাম বলিলেন, "আপনি নিজে শূদ্রের মুখে বেদের ব্যাখ্যা শুনিতে চাহিয়াছেন, তাই আমি ব্যাখ্যা করিতেছি। আমি জড়, মূঢ়মতি, এখানে ভিক্ষা করিয়া খাই। আমি বেদ ব্যাখ্যা করিলে আপনি রাগত হইবেন না।" ব্রাহ্মণেরা বলিল, "ও যদি বেদ ব্যাখ্যা করিতে পারে আমরা পরাজয় স্বীকার করিব।" বলরাম বলিলেন, "তবে শুনুন। নিত্য হইতে শূন্যের উৎপত্তি ; শূন্য হইতে প্রণবের উৎপত্তি ; প্রণব হইতে শব্দের উৎপত্তি; শব্দ হইতে বেদের উৎপত্তি ; বেদ হইতে সমস্ত জগতের উৎপত্তি।" এই কথা শুনিয়া রাজা ও ব্রাহ্মণেরা সকলেই আশ্চর্য হইয়া গেলেন এবং বলরামের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

একবার প্রতাপরুদ্র রাজার বাড়িতে চুরি হইয়া গিয়াছিল। রাজা ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ-পণ্ডিতদিগকে আনাইয়া চুরির ঠিকানা করিতে বলিলেন। ব্রাহ্মণেরা পারিল না, বৌদ্ধেরা পারিল। সুতরাং রাজা বৌদ্ধদিগকে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু রানী তাহাতে ভারি চটিয়া গেলেন। তখন ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধের মধ্যে কে বড়ো আবার পরীক্ষা হইল। একটা মুখঢাকা হাঁড়ি সভায় আনা হইল এবং জিজ্ঞাসা করা হইল এ হাঁড়িতে কী আছে ? তাহার ভিতরে ছিল সাপ। ব্রাহ্মণেরা বলিল, "মাটি আছে।" ঢাকা খুলিলে মাটিই দেখা গেল। ব্রাহ্মণদের উপর রাজার ভক্তি বাড়িয়া গেল। তিনি বৌদ্ধদিগকে তাড়াইয়া দিলেন এবং তাহাদের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিতে লাগিলেন। এই সময় বোধ হয় বলরাম দাসকেও পলাইয়া যাইতে হয়। প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর বাইশ বৎসর পরে তেলেঙ্গা মুকুন্দদেব রাজা হইলে বলরাম আবার ফিরিয়া আসিলেন— কারণ মুকুন্দদেব বৌদ্ধ ছিলেন এবং বৌদ্ধদিগকে যথেষ্ট আদর করিতেন। মঙ্গোলিয়ার অন্তর্গত উর্গা নগরের প্রধান লামা তারনাথ

এই সময় ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা জানিবার জন্য যে লোক পাঠাইয়াছিলেন[১০] তিনি বলিয়া গিয়াছেন, উড়িষ্যার রাজা তেলেঙ্গা মুকুন্দদেব বৌদ্ধ এবং তাঁহার রাজত্বে বৌদ্ধধর্মের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল।

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল গড়জাত মহলে মহিমাধর্ম[১১] নামে এক নূতন ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছে। এ ধর্ম নীচ জাতির মধ্যেই চলে। প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের সঙ্গের ইহার যথেষ্ট মিল আছে। এ ধর্মেও অলেখ পুরুষ, শূন্য পুরুষের পূজা আছে। ইহাতেও জাতিভেদ নাই। ইহাও সন্ন্যাসীর ধর্ম। এ ধর্মেও ভিক্ষা করিয়া খাইতে হয়। এ ধর্মের প্রধান গুরু ভীমভোই— ইঁহার পুরা নাম ভীমসেন ভোই অরক্ষিতদাস।[১২] ধেকানল রাজ্যে জুরন্দাগ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি জন্মান্ধ ছিলেন এবং অতি নীচ কন্ধ জাতিতে ইঁহার জন্ম। ইনি ধান ভানিয়া খাইতেন। কিন্তু ভগবানের প্রতি ইঁহার অত্যন্ত ভক্তি ছিল। একুশ বৎসর বয়সে ইনি মনের দুঃখে ঘরবাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যান, এবং আত্মহত্যা করিবার উদ্যোগে থাকেন। একদিন যাইতে যাইতে তিনি এক কুয়ার মধ্যে পড়িয়া যান। কুয়ার মধ্যে তিন দিন তিন রাত্রি কাটিয়া গেল। নিকটের লোকে তাঁহাকে উঠাইবার অনেক চেষ্টা করিল কিন্তু তিনি উঠিতে চাহিলেন না। তিন দিনের দিন রাত্রিশেষে ভগবান্ নিজ মূর্তি ধরিয়া কুয়ার উপর দাঁড়াইলেন এবং ভীমভোইকে ডাকিতে লাগিলেন, "ভীম, তুমি উপর দিকে চাহ— দেখ আমি আসিয়াছি।" ভীম অন্ধ ছিলেন, হঠাৎ তাঁহার চক্ষু খুলিয়া গেল। তিনি ভগবান্‌কে দেখিলেন। ভগবান্‌ও হাত বাড়াইয়া তাঁহাকে কুয়া হইতে উঠাইয়া দিলেন। বলিলেন, "যাও, অলেখ ধর্ম প্রচার করো।" ভগবান্ তাঁহাকে একখানি কৌপীন দিলেন এবং বলিয়া দিলেন, "রান্না ভাত ছাড়া তুমি আর-কোনো জিনিস ভিক্ষা করিও না, গ্রহণও করিও না।" কৌপীন পরিয়া ভীমভোই যখন ভিক্ষা করিতে গেলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "একটা পেটের মতো চারটিখানি ভাত দাও," তখন গাঁয়ের লোক সব হাসিয়া উঠিল। কিন্তু ভীম যখন ভাত ছাড়া আর-কিছু লইবেন না জানিল, তখন "এ লোকটা আমাদের জাত খাইতে আসিয়াছে" এই বলিয়া তাঁহাকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিল। তিনিও কৌপীন ফেলিয়া কপিলাশের দিকে যাইতে লাগিলেন। কিছুদূর গেলে শূন্য পুরুষ তাঁহাকে দেখা দিলেন এবং রাগত হইয়া

বলিলেন, "তোমার এখনো সিদ্ধি হয় নাই। নহিলে তুমি মার খাইয়া পলাইয়া আসিবে কেন?" এই বলিয়া তিনি ভীমভোইর হাত পা বাঁধিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহাকে একটা মন্দিরের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং সে মন্দিরের অন্ধি সন্ধি সব বুজাইয়া দিলেন এবং বলিলেন, "আমি বাহিরে বসিয়া তিন বার হাততালি দিব, তোমার যদি সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, তো, তুমি বাহিরে আসিতে পারিবে।" তিন তালির পর ভীম যখন বাহিরে আসিলেন, তখন ভগবান্ বলিলেন, "ভীম, তোমার সিদ্ধি হইয়াছে। তুমি জুরন্দাতেই থাকো। তোমায় আর কোথাও যাইতে হইবে না। তুমি এখানে বসিয়াই অলেখ ধর্মের কবিতা লেখো।" ইহার পর ভীমভোই ভগবানের আজ্ঞায় বিবাহ করিলেন। তাঁহার সন্তানাদিও হইল। দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার শিষ্য হইতে লাগিল। তিনি অনেক কবিতা লিখিলেন। তাঁহার প্রধান পুস্তকের নাম 'কলি ভাগবত'। তাঁহার বহুতর ভজন ও পদাবলী আছে। দশ-বারো বৎসর হইল তিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ভীমভোই একবার সদলবলে জগন্নাথের মন্দির দখল করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু সেখানে মার খাইয়া পলাইয়া আসিয়াছিলেন। 'বশোমতী মালিকা' নামক গ্রন্থে এই ধর্মের সমস্ত ইতিহাস পাওয়া যায়।

তাঁহার মতে যে গৃহত্যাগ করিবে সে—

সুজাতি যে কুলধর্ম্ম সমস্ত ছাড়িবে।
হোমকর্ম্ম যাগক্রিয়া সকল ত্যজিবে॥
দারাসুত বিত্তব্রত ক্রিয়া ত্যাজ্য করি।
কুম্ভিপট পিন্ধি শিরে থিবে জটাধরি॥
জম্বুদ্বীপে মহিমাঙ্ক বীজ সে বুনিবে।
নিজ ব্রহ্ম গুরু পাই আনন্দ লভিবে॥
অনাকার মহিমা নামকু করি শিক্ষা।
নব শূদ্র ঘরে মাগি খেলুথিবে ভিক্ষা॥
তেলি তন্ত্রী ভাট কেরা রজক কুলারক।
ব্রহ্ম ক্ষেত্রী চণ্ডাল যে আবুরিলা পিক॥
এহি নব জাতি ঘরে ভিক্ষা ন ঘেনিবে।
অশুদ্ধ এ মানে শাস্ত্রে লেখিয়াছি পূর্ব্বে॥

এ মানে অটন্তি অধা জন্মরু জাতকি ।
তেনু করি নব শূদ্রে বাছি রখিছন্তি ॥
নব শূদ্র অটন্তি প্রভুঙ্ক নিজ দাস ।
তাঙ্ক ঘরে অন্নভিক্ষা ন লগাই দোষ ॥
মহাব্রহ্মতেজরে যে হই যাই ভস্ম ।
শূদ্র ঘরে ভিক্ষা কলে নাহি তাঙ্কু দুষ্য ॥
নব শূদ্র ঘরে অন্ন ভিক্ষাকু ভুজিবে ।
নগর বাহারে কাল নিদ্রাকু কাটিবে ॥
দিবসরে নিদ্রা কলে কাল করে বাস ।
রাত্রে অন্নভোজন আহারে হয় দোষ ॥
প্রভুঙ্কর ভক্ত যে দিবসে ভুঞ্জিবে ।
রাত্রে উপবাস যমকালুকু জগিবে ॥
নিশি উজাগরে রহি ধুনিকি জগিবু ।
পঞ্চিশ প্রকৃতি তেবে পশি করিবু ॥
জপ নাহি তপ নাহি উদাসী ভাবরে ।
একা মহিমাকু নাম জপিবু হৃদরে ॥

বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের 'বিনয়পিটকে'র নিয়মের সহিত এই-সকল নিয়মের অনেক মিল আছে। ভেকধারী বৈষ্ণবরা এ-সকল নিয়ম পালন করে না। বিশেষত বৈষ্ণবেরা নীচ জাতির অন্ন গ্রহণ করে না। নীচ জাতির অন্ন মহিমা-ধর্মীর পক্ষে শুদ্ধ। ইহারা কুম্ভ নামক গাছের বাকল পরে, সেইজন্য ইহাদিগকে কুম্ভপাটিয়া বলে।

ইহাদের মতে বুদ্ধদেব অলেখ ব্রহ্মের উপাসনা প্রচারের জন্য এবং জগৎ উদ্ধারের জন্য বোধ মহলের গোলাসিংহা নামক স্থানে বাস করেন। জগন্নাথদেব লীলাচল ছাড়িয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি কাহার আজ্ঞায় এখানে আসিয়াছেন?" বুদ্ধদেব বলেন, "আমি অলেখের আজ্ঞায় আসিয়াছি। অলেখই পরাৎপর গুরু।" বুদ্ধদেব জগন্নাথকে সমাধিস্থ হইয়া কপিলাশে থাকিতে বলেন। তিনিও বারো বৎসর দুধ ও জল খাইয়া কপিলাশে থাকেন। সমাধির অন্তে জগন্নাথ ভীমভোইয়ের জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া দিয়া অন্তর্ধান হন।

ভীমভোই বুদ্ধস্বামীর উদ্দেশে এই গানটি লিখিয়াছিলেন—

অনাকার অরূপ ব্রহ্ম-মূরতি হে।
এবে বিজে করিছন্তি ধরিতী হে ॥ (পদ)
অরূপ পুরুষ রূপবন্ত হোইলে
ব্রহ্মাণ্ডঙ্কু আইলে,
ভকত হিতকারী করুণা কৃপাধারী,
মায়াসিন্ধুসাগরু এবে উধার করি,
পিণ্ডপ্রাণকু দেই কর ভকতি হে ॥ ১

অগমিকা পুরুষ নামকু বহি,
রক্ষা নিমন্তে মহি
নির্ব্বেদরু প্রকাশ মহিমা দীক্ষা রস,
ভজি যেবে পারিব জীব পূর্ব্ব কল্মষ,
তেবে পাইব সদগতি মুকতি হে ॥ ২

অচিহ্ন পুরুষ সে যে চিহ্নিবা দেলে,
আপে অতিথি হেলে,
অলেখ পদ যেহু লেখি ন হোই সেহু,
গুরু পণে শকতা অটন্তি মহাবাহু,
একুইশ ভুবনে সেহু নৃপতি হে ॥ ৩

অকম্পন পুরুষ সে কম্পন কলে,
অঙ্গু সর্ব্বে জনমিলে,
আজ সে করতাঙ্ক নেত্র রে দেখু দেখু,
নিন্দিত করু অচ্ছ ভজু অচ্ছ কাহাকু,
এবে মহিমা-ধর্ম্ম অচ্ছি পিরিথি হে ॥ ৪

অক্ষয় পুরুষ ক্ষয় হেবাকু নাহি,
একু নাহি দুই ব্রহ্মাণ্ডে গুরুবীজে
শিষ্য নাহান্তি কেহি
বড়্‌হি মা পণে সর্ব্বে দিন যাউছি হি,
গুরুদর্শনে খণ্ড কাল বিপতি হে ॥ ৫

দেহধারী হইছন্তি মহীমণ্ডলে,
এ ঘোর কলিকালে,
এবনা একাক্ষর বানাহি বীরবর
বচন সুধাধার মুক্তিদানী পয়র
ভণে ভীম অরক্ষিত করি বিনতি হে ॥ ৬

'নারায়ণ'
চৈত্র, ১৩২২ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. এই বইয়ের পৃ. ৪০২ সূত্র ১৩ দ্র.

২. এই বইয়ের পৃ. ৪০০ সূত্র ৭ এবং ৮ দ্র.

৩. নগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন—

"In November 1908, I was required to accompany the Feudatory Chief of Mayūrabhañja on an Archæological tour in the interior of his territories. We paid a visit to Khiching, which was once an important seat of the Bhañja Rājās. I mixed with the humble people of the neighbouring villages, and from this close contact with them observed some curious customs and manners amongst them which bear little affinity to those of the Hindus. At this stage a band of merry lads of the Pān caste entartained me with their songs, which were all upon the texts of the *Dharmagītā*. The songs interested me very much, as in the texts I found distinct indications of the tenents of Mahāyāna Buddhism. Shortly after this I met some old men, who recited the songs of the Pāla kings of Bengal. These also belong to the period of the Buddhistic ascendancy. I was now convinced that Buddhism was not altogether a lost religion in Orissa. My curiosity being thus roused, I hunted after and soon laid my hands upon some old Oriyā MSS. which proved that Buddhism flourished in this part of the century so late as the 16th and

17th centuries. I now studied with care the sacred books of the Mahimā-dharmists and some other sects, who inhabit Khiching and various parts of Keonjhar, Dhenkanal and other gaḍajāts, and found that these people unmistakably profess Buddhistic tenents inspite of their not being recognised as Buddhists by the people. In comparatively recent times there has been a revival of this school of Buddhism." *The Modern Buddhism and its followers in Orissa,* Calcutta 1911, Preface.

৪. ঐর নামে এক রাজা মগধের অধিকার থেকে উড়িষ্যা উদ্ধার করেছিলেন এই ধারণার কোনো ভিত্তি নেই। ভুবনেশ্বর থেকে ৬ কিলোমিটার পশ্চিমে উদয়গিরি পাহাড়ের ১৪ সংখ্যক গুহা হাথিগুম্ফায় মহামেঘবাহন বংশের তৃতীয় রাজা খারবেলের পরিচয় সূচক ১৭ পঙ্‌ক্তির একটি লেখ উৎকীর্ণ আছে। লেখটির অনুবাদ : "অর্হৎদের নমস্কার, সর্ব-সিদ্ধকে নমস্কার। ঐর, মহারাজ, গজপতি, চেদিরাজবংশবর্ধন, প্রশস্ত-শুভলক্ষণসম্পন্ন, চতুর্দিগাহৃতগুণসমূহযুক্ত, কলিঙ্গাধিপতি শ্রীখারবেল পনেরো বৎসর যাবৎ শ্রীকড়ার (কিশোর কৃষ্ণ?) শরীর ধারণ করে বাল-ক্রীড়া করলেন। তারপর লেখ-রূপ-গণনা-ব্যবহারবিধি-বিশারদ এবং সর্ববিদ্যাভূষিত হয়ে নয় বৎসর ধরে যৌবরাজ্য শাসন করলেন।" ওড়িশা এবং অন্ধ্র প্রদেশের সমুদ্রের তীরবর্তী অঞ্চলে বৈতরণী থেকে গোদাবরী, পরে কৃষ্ণা থেকে মহানদী পর্যন্ত ভূভাগ কলিঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের প্রথম দিকে নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্ম নন্দ কলিঙ্গ জয় করেন। পরে খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে অশোক (আ. খৃ. পূ. ২৭৩-২৩৬) তাঁর রাজত্বের নবম রাজ্যাঙ্কে কলিঙ্গ অধিকার করেন। মগধ সাম্রাজ্যের পতনের পরে খৃস্টপূর্ব প্রথম শতকে কলিঙ্গে চেদিকুলের একটি শাখা মহামেঘবাহন রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। হাথিগুম্ফার লেখ থেকে জানা যায় এই বংশের রাজা খারবেল খৃস্টপূর্ব প্রথম শতকে কয়েকবার মগধ আক্রমণ করেছিলেন। নন্দরাজা একটি জিনমূর্তি কলিঙ্গ থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন, খারবেল সেটি ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। উদয়গিরি-খণ্ডগিরি একটি অতি প্রাচীন জৈন কেন্দ্র। খারবেল বৌদ্ধ নয়, জৈনধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে তিনি কুমারী-পর্বতে (উদয়গিরি-খণ্ডগিরি) জৈন সন্ন্যাসীদের জন্য গুম্ফা তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। ধর্মমতে জৈন হলেও খারবেল অন্য

ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। খারবেল-লেখের ভাষা কতকটা দক্ষিণ পশ্চিমার মতো। অশোকের গির্ণার অনুশাসনের, বিশেষ করে পালি ভাষার সঙ্গে এর মিল আছে। গুরুগম্ভীর সংস্কৃত গদ্যরীতির অনুকরণের চেষ্টা আছে— যা প্রাকৃতের উপরে সংস্কৃতের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের নিদর্শন। দ্র. দীনেশচন্দ্র সরকার, "ওড়িশা", "খারবেল", 'ভারতকোষ', Debala Mitra, *UDAYAGIRI and KHANDAGIRI*, Archaeological Survey of India, New Delhi 1975.

৫. ধৌলি এবং জৌগড়ায় ১১, ১২, ১৩ সংখ্যক মুখ্য গিরিশাসনের পরিবর্তে দুটি নতুন গিরিশাসন পাওয়া গেছে। এ দুটিকে কলিঙ্গের স্বতন্ত্র গিরিশাসন বলা হয়ে থাকে। দীনেশচন্দ্র সরকার ১৫ এবং ১৬ সংখ্যক মুখ্য গিরিশাসন বলেন। এই অনুশাসন দুটির লক্ষ্য কলিঙ্গে নিযুক্ত রাজ কর্মচারী এবং কলিঙ্গবাসী ও সাম্রাজ্যের প্রত্যন্তবাসীদের উদ্দেশে সম্রাট অশোকের মনোভাব এবং প্রত্যাশা বিশেষভাবে জানানো। নবম রাজ্যাঙ্কে অশোক কলিঙ্গ জয় করেন। এই যুদ্ধের ভীষণতায় তাঁর মনে গ্লানি দেখা দেয়। ১৩ সংখ্যক অনুশাসনে তিনি যুদ্ধে নিহত, নির্বাসিত, বন্দি লক্ষ লক্ষ মানুষের কথা ভেবে অনুতাপ প্রকাশ করে জানান, যুদ্ধে বিজয় নয় 'ধর্মবিজয়ই' তাঁর কাম্য। ১৫ এবং ১৬ সংখ্যক অনুশাসনে তিনি জানিয়েছেন, 'সবে মুনিসে পজা মম', সমস্ত মানুষই আমার সন্তান। নিজের সন্তানদের জন্য যেমন তিনি ইহলোক ও পরলোকে সব রকমের হিত ও সুখ কামনা করেন, সব মানুষ সম্পর্কেও তাঁর সেই একই কামনা। অবিজিত দেশের অধিবাসীরাও তাঁর এই মনোভাব জেনে যেন অনুদ্বিগ্ন ও আশ্বস্ত হয়। ১৬ সংখ্যক অনুশাসনে বিশেষভাবে ধৌলির নগর-ব্যবহারক— যাঁরা বিচারের কাজে নিযুক্ত— তাঁদের অপক্ষপাত বিচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁদের শাসন যেন এমন হয় যাতে সম্রাট মানুষের প্রীতি অর্জন করতে পারবেন। বিচারকেরা ঈর্ষা, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, ক্ষিপ্রতা, অনভ্যাস, আলস্য ও ক্লান্তি পরিহার করে পক্ষপাতহীন সুবিচার করবেন। সম্রাটের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা হচ্ছে কিনা দেখার জন্য পাঁচ বছর অন্তর পর্যবেক্ষক পাঠাবার কথা এই অনুশাসনে উল্লেখ করা হয়েছে। অস্ত্রের শক্তিতে যে দেশ জয় করেছেন, সেখানকার অধিবাসীদের মনের বিরূপতা দূর করে আনুগত্য জাগিয়ে তোলার জন্যই অশোক উদার, পক্ষপাতহীন সমদর্শী শাসন-নীতির কথা বিশেষভাবে ঘোষণা করেছিলেন বোঝা যায়। ঠিক বৌদ্ধ-ধর্ম প্রচার এইসব আজ্ঞার উদ্দেশ্য নয় সম্ভবত।

১৫ সংখ্যক অনুশাসনে বলা হয়েছে, চাতুর্মাসীর দিনে এবং তিষ্য-নক্ষত্রে লিপিটি সকলকে শুনতে হবে। চাতুর্মাসী ও তিষ্যনক্ষত্রের মাঝে সুযোগ হলে একা-একাও শুনবে। ১৬ সংখ্যক অনুশাসনেও উল্লেখ করা হয়েছে, প্রতি তিষ্যনক্ষত্রে এই আজ্ঞা সকলকে শুনতে হবে এবং দুই তিষ্যনক্ষত্রযুক্ত দিনের মধ্যে সুযোগ হলে মাঝে মাঝে একা-একাও লিপিটি শুনবে। দ্র. দীনেশচন্দ্র সরকার, 'অশোকের বাণী', কলকাতা ১৯৮১ ; Romila Thapar, *Aśoka And The Decline Of The Mauryas*, Delhi 1973, pp. 169-71.

৬. তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের অন্যতম উদ্ভবস্থান 'মহাযোগ পীঠ' উড্ডীয়ানের রাজা ইন্দ্রভূতি এবং তাঁর মেয়ে লক্ষ্মীঙ্করা। হরপ্রসাদের মতে উড্ডীয়ান ওড়িশার কোনো জায়গায়। ওয়াডেল বলেন, আফগানিস্তান ও কাশ্মীরের মাঝে স্বাত-উপত্যকায়। বিনয়তোষ বাংলা দেশে হওয়াও সম্ভব মনে করেন। ইন্দ্রভূতি ও লক্ষ্মীঙ্করা সম্ভবত অষ্টম (বিনয়তোষ) মতান্তরে নবম (Shendge) শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তেঙ্গুরের তালিকায় ইন্দ্রভূতির লেখা 'সিদ্ধবজ্রযোগিনীসাধন', 'জ্ঞানসিদ্ধিনামসাধনোপায়িকা', 'সহজসিদ্ধি', প্রভৃতি ২৩ খানি বইয়ের নাম পাওয়া যায়। ইন্দ্রভূতি ও লক্ষ্মীঙ্করা বজ্রযোগিনী-সাধন প্রবর্তন বা প্রচার করেন। বজ্রযান-সাধনার ধারায় অসংকোচে এক অভিনব মতবাদ প্রবর্তনের দিক থেকে লক্ষ্মীঙ্করার 'অদ্বয়সিদ্ধি' গুরুত্বপূর্ণ বই। উপবাস, ধর্মকর্ম, স্নান-শৌচ বর্জনীয়। কাঠ-পাথর-মাটির দেবতা বন্দনা করার প্রয়োজন নেই। নিত্য সমাহিত হয়ে দেহেরই পুজো করবে। লক্ষ্মীংকরার এই মতবাদ সম্পর্কে বিনয়তোষ বলেন, "...What Lakṣmīṁkarā advocates was quite out of the way and strange, even though since her time this new teaching has gradually won for it many adherents who are styled Sahajayānists, and who are still to be met with among Nāḍhā Nāḍhis of Bengal and especially among Bāuls. *S-M-II*, p. lv.

Shendge লিখেছেন, "This short work ['অদ্বয়সিদ্ধি'] has one unique feature *i.e.*, it is written by a woman who practised and preached Tantraism. From this point of view I expected some unique doctrines but in reality all her teachings in no way differ from those

preached by the male practicants of the doctrine *e.g.*, those preached by Indrabhūti or Anaṅgavajra ['প্রজ্ঞোপায়বিনিশ্চয়সিদ্ধি', রচয়িতা ইন্দ্রভূতির গুরু]. So naturally the question poses itself— whether there can at all be any such difference in the Sādhana prescribed for man and for woman ?" (Miss. Malati J. Shendge ed. *ADVAYASIDDHI*, Oriental Institute, Baroda, 1964, p. 11). দ্র. *B-L-T*, p. 197 ; *S-M-II*, pp. xxxvii-xxxix, xlii.

৭. সোম বংশীয় রাজা তৃতীয় মহাশিবগুপ্ত যযাতি একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মেদিনীপুর থেকে গঞ্জাম অঞ্চলের শাসন কর্তৃত্ব অধিকার করেন। 'মাদলাপাঞ্জী'তে (জগন্নাথ মন্দিরে সংরক্ষিত মাদলের মতো দেখতে পুথি, রাজবৃত্তের এবং মন্দিরের পূজা-বিধির বিবরণ) ইনি যযাতি কেশরী নামে উল্লিখিত। ১১১২ খৃস্টাব্দের কিছু আগে গঙ্গবংশীয় অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ (১০৭৮-১১৪৭ খৃ.') পুরী-কটক অঞ্চল অধিকার করেন এবং ভাগীরথী থেকে গোদাবরী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। কুলধর্মে শৈব চোড়গঙ্গ পুরী অধিকার করার পরে ক্রমে জগন্নাথরূপী বিষ্ণুর ভক্ত হয়ে ওঠেন। পুরীর জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ এ'র অন্যতম কীর্তি। গঙ্গবংশের শেষ রাজা চতুর্থ ভানুকে তাঁরই অমাত্য কপিলেশ্বর ১৪৩৫ খৃস্টাব্দে ক্ষমতাচ্যুত করে রাজ্য অধিকার করেন। কপিলের বংশ গজপতিবংশ নামে পরিচিত। বিজয়নগর রাজ কৃষ্ণদেবরায়ের কাছে এই বংশের শেষ রাজা প্রতাপরুদ্রের (১৪৯৭-১৫৩৯ খৃ.) পরাজয়ে গজপতিবংশের শাসনের অবসান হয়। এর কিছু পরে অন্ধ্রদেশের মুকুন্দ হরিচন্দন (১৫৫৯-৬৮ খৃ.) ওড়িশা অধিকার করেন। ইনিই ওড়িশার শেষ স্বাধীন হিন্দু রাজা। দ্র. দীনেশচন্দ্র সরকার. 'সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ' দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা ১৩৮৯ ব., পৃ. ১৮-২৮ এবং "ওড়িশা১", 'ভারতকোষ'।

৮. ওড়িশার সংস্কৃতিতে বৌদ্ধ এবং হিন্দু ভাবনা, বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠানের বিমিশ্রিত প্রভাব সম্পর্কে গবেষকদের মধ্যে বিশেষ মতভেদ নেই। ওড়িশার মানুষের জীবনে পুরীর জগন্নাথদেবের প্রভাব অপরিসীম। 'স্কন্দপুরাণে'র উৎকল-খণ্ডের একটি কাহিনীর বিবরণে পুরুষোত্তমদেব-জগন্নাথকে আদিম শবরজাতীয় মানুষের দেবতা বলা হয়েছে। এই বিগ্রহ বিষ্ণুরূপে স্বীকৃত, কিন্তুপূ জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামকে বৌদ্ধ ত্রিরত্ন— বুদ্ধ-

ধর্ম-সংঘের প্রতীক মনে করার কারণ আছে। ওড়িয়া লোকগীতিতে জগন্নাথ এবং বুদ্ধ অভিন্ন। কোনো কোনো মন্দিরে বিষ্ণুর নবম অবতাররূপে বুদ্ধের পরিবর্তে জগন্নাথ মূর্তি দেখা যায়। কানিংহাম এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামকে বৌদ্ধ ত্রিরত্নের প্রতীক বলেছিলেন। অনেকে মনে করেন, পুরীর জগন্নাথ মন্দির মূলত বৌদ্ধ-মঠ এবং মহাযান বৌদ্ধধর্মের একটি কেন্দ্র ছিল। ১২ বছর পর পর নিম কাঠে তৈরি জগন্নাথ মূর্তি যখন নতুন করে গড়া হয় সেই সময়ে একজন ব্রাহ্মণ চোখ বাঁধা অবস্থায় পুরানো মূর্তির ভিতর থেকে রেশমের কাপড়ে মোড়া কোনো বস্তু নতুন মূর্তিতে স্থানান্তর করেন। অনেকের ধারণা এই বস্তু বুদ্ধের কোনো প্রাচীন স্মারক। মূর্তি তিনটি প্রকৃতপক্ষে তিন খণ্ড কাঠ, কোনো রূপায়িত প্রতিমা নয়। ওড়িয়া ধর্মীয় সাহিত্যে প্রায়ই জগন্নাথ মূর্তিকে শূন্য এবং অলেখ অর্থাৎ অরূপ বলা হয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর কবি চৈতন্য দাস তাঁর 'নিগুর্ণ মাহাত্ম্য' বইয়ের ১৬ অধ্যায়ে বিষ্ণুর দুই অবতার কৃষ্ণ এবং বুদ্ধের চরিত্র তুলনা করে বুদ্ধকেই শ্রেষ্ঠ অবতার বলেছেন। হিন্দু বৌদ্ধ ভাবনার এই বিরোধ কালক্রমে নিশ্চয়ই একটা সামঞ্জস্যে পৌঁছেছিল। অনার্য ঐতিহ্যের জগন্নাথ, আর্য ঐতিহ্যের বিষ্ণু বা কৃষ্ণ এবং বুদ্ধ জগন্নাথদেবে সম্মিলিত হওয়ায় সমস্ত জনস্তরের সাধারণ দেবতার মর্যাদা পায়। এই দিক থেকে জগন্নাথদেব ওড়িশার সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের প্রতিভূ। মূল শবর দেবতাকে হিন্দু অথবা বৌদ্ধ কারা প্রথম গ্রহণ করেছিলেন, নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। প্রচলিত কাহিনীগুলিতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই দেবতাকে নিজের করে নেবার প্রতিযোগিতার এবং শেষ পর্যন্ত আপসে পৌঁছুবার আভাস পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর জনপ্রিয় কবি বিপ্র নীলাম্বর রচিত 'দেউল-তোলা-সুয়াঙ্গ' কাব্যের গল্পে এই সমন্বয়ের কথা রূপ পেয়েছিল।

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নর নির্দেশে ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতি পূর্ব-উপকূলের নিবিড় অরণ্যে শবর বিশ্ববসুর নীলমাধব বিগ্রহের সন্ধান পেল। বিশ্ববসু সুদর্শন বিদ্যাপতির সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিল। সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে ফিরে গিয়ে বিদ্যাপতি রাজাকে বিগ্রহের খবর জানাল। সৈন্যসামন্ত নিয়ে গিয়েও রাজা কিন্তু বিগ্রহের সন্ধান পেল না। দৈববাণী হল, মন্দির তৈরি শেষ হলে রাজা নীলমাধব বিগ্রহের সন্ধান পাবে। ইন্দ্রদ্যুম্ন মন্দির তৈরি করিয়ে ব্রহ্মাকে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্যে আমন্ত্রণ জানাতে স্বর্গে গেল। এদিকে মন্দিরটি বালির মধ্যে তলিয়ে গেল। নীলমাধব নামে আর-এক রাজা সেই মন্দির উদ্ধার করল। ইন্দ্রদ্যুম্ন ফিরে এলে মন্দিরের স্বত্ব নিয়ে দুই রাজায় শুরু হল বিবাদ। শেষ পর্যন্ত

ইন্দ্রদ্যুম্নর অধিকার প্রমাণ হল। দৈববাণী শোনা গেল, বিগ্রহ কাছের এক নদীর মুখে গাছের গুঁড়ি রূপে দেখা দেবে। রাজার গোটা সৈন্য-বাহিনী সেই গুঁড়ি তুলতে পারল না। দৈববাণী অনুযায়ী সেই গুঁড়ি তুলে আনল শবর বিশ্ববসু এবং ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতি। রানী গুণ্ডিচার ইচ্ছায় কাঠ থেকে মূর্তি গড়ার জন্য এক বুড়ো ছুতোরকে নিয়োগ করা হল। তার শর্ত ছিল, মূর্তি গড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেউ মন্দিরের দরজা খুলবে না। দিন কয়েক পর ছুতোরের সাড়া না পেয়ে দরজা খুলতে আধ-গড়া মূর্তি ফেলে ছুতোর কোথায় মিলিয়ে গেল। একটি নয়, মূর্তি গড়া হচ্ছিল তিনটি— কৃষ্ণ, বলরাম আর সুভদ্রা। ব্রহ্মা সেই আধ-গড়া বিগ্রহই প্রতিষ্ঠা করল। নতুন দেবতা জগন্নাথের ইচ্ছায় ব্যবস্থা হল শবর বিশ্ববসুর বংশধরেরাই মন্দিরের প্রধান পূজারি হবে, বিদ্যাপতির ব্রাহ্মণ স্ত্রীর সন্তানের বংশধরেরা পুরোহিত হবে, আর বিদ্যাপতির শবর স্ত্রীর সন্তানের বংশধরেরা হবে মন্দিরের পাচক।

আজও পুরীর জগন্নাথ মন্দিরেব তিন স্তরের সেবকেরা এই তিন বংশধারার মানুষ বলে নিজেদের পরিচয় দেন। পরে তিন বিগ্রহের সঙ্গে একটি ছোটো বিগ্রহ যুক্ত হয়েছে— নাম সুদর্শন চক্র। অনেকের ধারণা এটি বৌদ্ধ সদ্ধর্ম চক্রের প্রতীক বিগ্রহ। বিগ্রহের বিবর্তন, মন্দির নিয়ে দুই রাজার বিবাদ এবং বিগ্রহ সেবায় জাতপাতের বিচার না মানা- এইসব লোককথা ও বিধিব্যবস্থায় অনার্য, আর্য-ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতির সংঘাত ও সমন্বয়ের ইতিহাস প্রচ্ছন্ন আছে।

খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দী অবধি জগন্নাথ সম্ভবত পুরীর স্থানীয় দেবতা ছিল, তারপরে কয়েক শতাব্দীর মধ্যে তার প্রভাব বিস্তৃত হয়। গঙ্গসম্রাট্ অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গের (১০৭৮-১১৪৭ খৃ.) প্রপৌত্র তৃতীয় অনঙ্গভীম (আ. ১২১১-৩৯ খৃ.) জগন্নাথকে সর্বভারতীয় হিন্দু দেবতার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেন।

৯. ষোড়শ শতাব্দীর ওড়িয়া সাহিত্যের প্রসিদ্ধ পাঁচ জন দার্শনিক-কবি বলরাম দাস, জগন্নাথ দাস, অচ্যুতানন্দ দাস, অনন্ত দাস, যশোবন্ত দাস পঞ্চসখা নামে পরিচিত। আধুনিক কবি নন্দকিশোর বল লিখেছেন—

উৎকল গরভুঁ কেতে সাধুভক্তসুত,
জনমি করিলে প্রিয় মাতৃকোল পূত।
পঞ্চসখা আদিভক্ত
ঘোষি 'ব্রহ্মজ্ঞান' কলে দেশ সুপবিত্র।

এই পাঁচ জন কবি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক এবং তাঁর সঙ্গে এঁদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। চৈতন্যের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ওড়িশায় ভক্তি আন্দোলনের

ব্যাপক প্রসার প্রত্যক্ষভাবে পঞ্চসখা কবিদের জনপ্রিয়তা বাড়িয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু এ'দের রচনায় কোথাও কোথাও চৈতন্যের উল্লেখ থাকলেও তাঁর ধর্ম-দর্শন এ'রা গ্রহণ করেন নি। কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী বলেন, "গৌড়ীয় শুদ্ধা-ভক্তি ইঁহারা মানিতেন না। যোগ ও জ্ঞানকে তাঁহারা ভক্তির সোপানরূপে অবলম্বন করিয়াছিলেন; অর্থাৎ তাঁহারা ছিলেন, জ্ঞান-মিশ্রা-ভক্তির প্রচারক।" ওড়িয়া সাহিত্য বিষয়ে আধুনিক গবেষণাতে পঞ্চসখার দার্শনিক মতবাদ ওড়িশার বিশিষ্ট বৌদ্ধ-বৈষ্ণবীয় মতবাদরূপে স্বীকৃত।

পঞ্চসখার মধ্যে বয়সে বড়ো ব ল রা ম দা স। জন্ম ১৪৭২ খৃস্টাব্দে। বাবা সোমনাথ মহাপাত্র, মা মনোমায়া। প্রায় মাঝ বয়সে চৈতন্যদেবের সঙ্গে এ'র পরিচয় হয়। তার আগেই বলরামের প্রধান রচনাগুলি লেখা হয়ে গিয়েছিল। 'বেদান্তসার গীতা', 'গুপ্ত গীতা', 'বিরাট গীতা' এবং 'সপ্তাঙ্গ যোগসার' গ্রন্থে বলরাম হঠযোগ, রাজযোগ এবং বেদান্ত-দর্শন ব্যাখ্যা করেছেন। সারলা দাস ওড়িয়া মহাভারত লিখেছিলেন, বলরাম লেখেন ওড়িয়া রামায়ণ। তাঁর রামায়ণের নাম 'জগমোহন রামায়ণ', নামান্তর 'দাণ্ডি রামায়ণ'। তরুণ বয়সে একবার রথযাত্রার সময়ে জগন্নাথের রথে উঠতে গিয়ে কবি লাঞ্ছিত হন। মনের দুঃখে বিজন সমুদ্রতীরে বসে 'ভাব-সমুদ্র' নামে ৭৫০ স্তবকের একটি দীর্ঘ গীতিকবিতা রচনা করেন। বলরামের আর-দুটি উল্লেখযোগ্য রচনা 'কমললোচন চউতিশা' এবং 'মৃগুণী স্তুতি'। বলরাম দাসের শ্রেষ্ঠ কীর্তি একলক্ষ পদে সম্পূর্ণ 'জগমোহন রামায়ণ'। ওড়িয়া জাতি-সত্তার আবহমান অবলম্বন তিন খানি গ্রন্থ, সারলা দাসের মহাভারত, বলরাম দাসের রামায়ণ এবং জগন্নাথ দাসের ভাগবত। এই মহাগ্রন্থ বলরাম রচনা করেন ৩২ বৎসর বয়সে। শেষ বয়সে সর্বদাই ইনি চৈতন্যদেবের মতো ভাবগ্রস্ত থাকতেন, তাই সকলে তাঁকে মত্ত বলরাম বলত।

পঞ্চসখার দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ কবি, ওড়িয়া ভাগবত লেখক জ গ ন্না থ দা স বলরাম দাসের চেয়ে বয়সে অনেক ছোটো, চৈতন্যদেবের প্রায় সমবয়সী ছিলেন। বাড়ি ছিল পুরী জেলার কপিলেশ্বর শাসনে। ছোটো বেলায় সংস্কৃত শেখেন, ব্যাকরণ ও সাহিত্যে দখল আসার পরে ভাগবত পড়েন। ১৮/১৯ বছর বয়সে সংসার ছেড়ে বৈষ্ণব-দীক্ষা নেন এবং পুরীর ওড়িয়া মঠের মোহান্ত হন। পরে সমুদ্রের তীরে সাতলহরিতে বাস করেন। চৈতন্যদেব এ'কে প্রথম দেখেন পুরীর মন্দিরের কল্প-বটের তলায়। জগন্নাথ সদ্য রচিত ভাগবত অশিক্ষিত গ্রামের লোকদের আবৃত্তি করে শোনাচ্ছিলেন। চৈতন্য জগন্নাথের কবিত্বে মুগ্ধ হন এবং

তাঁকে অতিবাদী অর্থাৎ মহামহিম বলে সম্বোধন করেন। ক্রমে দু জনের মধ্যে গভীর বন্ধুতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। চৈতন্যের 'অতিবাদী' সম্বোধনটি জগন্নাথের জীবনে স্থায়ী হয়েছিল। তাঁর শিষ্য পরম্পরা অতিবাদী নামে পরিচিত। মায়ের ইচ্ছা পূরণ করতে জগন্নাথ ওড়িয়া ভাষায় ভাগবত লেখেন। বৃদ্ধা মা জানতেন না, তাঁর ছেলের এই রচনা ক্রমে লক্ষ লক্ষ ওড়িশাবাসীর ভাবগত সংহতির, নৈতিক জীবনের অবলম্বন হয়ে উঠবে। এই ভাগবত ওড়িশার গ্রামে-গ্রামান্তরে মাতৃভাষায় জনশিক্ষার উপায়রূপে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। প্রতি গ্রামেই একটি ভাগবত-ঘর থাকত, এই ভাগবত-ঘর একাধারে গ্রামের পাঠশালা, গ্রন্থাগার ও ধর্মচর্চার কেন্দ্র ছিল। প্রত্যেক পরিবারে জগন্নাথের ভাগবতের পুথি রাখার রীতি ছিল। ওড়িশার বাইরে যাঁরা বসবাস করতেন, তাঁরাও আপন জাতি-সত্তার প্রতীক হিসাবে এই ভাগবত কাছে রাখতেন। সাহিত্যের বিচারে জগন্নাথের ভাগবত কোনো মৌলিক, অসাধারণ সৃষ্টি নয়। কিন্তু সংস্কৃত শব্দ ও খাঁটি ওড়িয়া শব্দ ব্যবহারের নৈপুণ্যে সহজে মানুষের হৃদয় ছোঁয় এমন এক রচনা-শৈলী জগন্নাথ উদ্ভাবন করেছিলেন। এই রচনায় তিনি ৯ অক্ষরের লালিত্যময় এক নতুন ছন্দ ব্যবহার করেছেন, একে বলা হয় নবাক্ষরী বৃত্ত। জগন্নাথ মূল ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নি। মূলের কোনো কোনো অংশের বদলে 'বিষ্ণুপুরাণ', 'পদ্মপুরাণ', 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে আকর্ষণীয় উপাদান ব্যবহার করেছেন। উল্লেখযোগ্য, রাস বর্ণনায় জগন্নাথ রাধার পরিবর্তে বৃন্দাবতীর কথা বলেছেন—

গোপীবৃন্দাবতী নামে।
থিলা সে কৃষ্ণসন্নিধানে॥

জগন্নাথের অন্যান্য স্মরণীয় রচনা, 'অর্থ কোইলি', 'মৃগুণী স্তুতি', শুক-পরীক্ষিৎ সংবাদ রূপে রচিত 'গুপ্তভাগবত' এবং হর-পার্বতী সংবাদ 'তুলাভিণা'।

অ চ্যু তা ন ন্দ দা স পঞ্চসখার মধ্যে বয়সে সবার ছোটো। বাবা দীনবন্ধু পদস্থ রাজ কর্মচারী ছিলেন। অচ্যুতানন্দ অল্প বয়সে সংসার ছেড়ে পুরীতে যান। চৈতন্যদেবের আজ্ঞায় তাঁর দীক্ষা হয়। পুরীর বাঁকি নদীর ধারের গোপাল-মঠ অচ্যুতানন্দ প্রতিষ্ঠিত। অচ্যুতানন্দ শূদ্র বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন, "জাত হেলঃ ওড্ররাষ্ট্রে শূদ্রকুলে পুনি।" সম্ভ্রান্ত করণ পরিবারে জন্ম হলেও নিম্নতর জাতির উন্নতির উদ্দেশ্যে তিনি মৎস্যজীবী কেউট এবং গৌড়দের মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন। এঁদের বোধগম্যভাবে 'কৈবর্ত গীতা' এবং 'গোপালঙ্ক ওগালা' লিখেছেন। এই দুই জাতির মানুষ আজও তাঁকে মহাপুরুষ

বলে শ্রদ্ধা করে। অচ্যুতানন্দের নামে আরো বহু রচনার সন্ধান পাওয়া যায়। সম্ভবত সব এই অচ্যুতানন্দের লেখা নয়। নিশ্চিতভাবে এ'র লেখা বলে জানা রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'শূন্যসংহিতা', 'অণাকার সংহিতা', 'ব্রহ্মশেঙ্কুলি,' 'ব্যাল্লিশ চৌপদি', 'হরিবংশ' প্রভৃতি। চৈতন্যের ঘনিষ্ঠ শিষ্য হওয়া সত্ত্বেও অচ্যুতানন্দের রচনায় চৈতন্যের মতবাদের প্রভাব নেই। শূন্য ও অলেখ-এর উপাসনার কথাই তিনি বলেছেন, আর মানুষের নিজের মধ্যে জগৎগুরুকে খুঁজে নেবার উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর মতাদর্শে বৌদ্ধপ্রভাব অত্যন্ত প্রকট। দুই শতাব্দী পরে ওড়িশায় মহিমাধর্মের অভ্যুদয় হয়েছিল— যার সঙ্গে মহাযান বৌদ্ধধর্মের খুব মিল। আধুনিক গবেষকেরা এই মহিমাধর্মের পূর্বসূত্র নির্দেশ করেন অচ্যুতানন্দের রচনায়।

অ ন ন্ত দা স, শিশু অনন্তদাস নামে পরিচিত। এ'রও জন্ম করণ পরিবারে। কিছু মালিকা বা ভবিষ্যদ্বাণী এ'র নামে প্রচলিত আছে।

য শো ব ন্ত দা সে র জন্ম ক্ষত্রিয়কুলে। চুরির দায়ে তাঁর একবার শূলদণ্ড হয়। জগন্নাথের স্তব করে বিপদ থেকে উদ্ধার পান এবং ধর্মপথে আসেন। বাংলায় প্রচলিত নাথ সম্প্রদায়ের গোপীচন্দ্রের গান ইনি ওড়িয়া ভাষায় লিখেছেন। দ্র. কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, "ওড়িয়া সাহিত্য", 'ভারতকোষ'; প্রিয়রঞ্জন সেন, 'ওড়িয়া সাহিত্য', বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ; Suniti Kumar Chatterjee, *Languages and Literature of Modern India*, Calcutta 1963; Mayadhar Mansinha, *History of Oriya Literature*, Sahitya Akademi, New Delhi 1962.

১০. এই বইয়ের পৃ. ৪০১ সূত্র ১০ এবং ১ দ্র.

১১. এই বইয়ের পৃ. ২৫২ সূত্র ৪ দ্র.

১২. ভীমভোই এবং অরক্ষিত দাস দু জন পৃথক্ ব্যক্তি।

ভী ম ভো ই-এর জন্ম ১৮৫২ খৃস্টাব্দে, জন্ম দ্রাবিড় গোষ্ঠীর অন্তর্গত 'কুই' ভাষাভাষী কন্ধ উপজাতির কোনো পরিবারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এই উপজাতির মধ্যে এ'দের ধরিত্রী দেবতা তাড়ু পেন্নুর উদ্দেশে নরবলি দেবার প্রথা ছিল। ধান এবং হলুদ চাষ প্রধান জীবিকা। ভীম ভোইয়ের সময়ে এই পাহাড়-জঙ্গলের অধিবাসীদের মধ্যে আধুনিকতার আলো-হাওয়া কিছুমাত্র প্রবেশ করে নি।

অথচ ভীম ভোই যুক্তিবুদ্ধি পরিশীলিত আধুনিক রুচির পক্ষে সমাদরের যোগ্য ভজন রচনা করে ওড়িয়া বাঙ্ময়কে সমৃদ্ধ করে গেছেন। ভীম ভোই বসন্ত রোগের আক্রমণে ছেলেবেলায় অন্ধ হয়ে যান, সম্ভবত জন্মান্ধ ছিলেন না। নিরক্ষর ছিলেন এবং ভিক্ষা করে বেড়াতেন। মহিমা গোসাঁইয়ের সংস্পর্শে এসে ভীম ভোইয়ের আধ্যাত্মিক জীবনের এবং কবি জীবনের উদ্বোধন হয়। জাতপাত বিরোধী, মূর্তি পুজো বিরোধী ধর্ম প্রচারের জন্য ভীম ভোই জীবনে অনেক দুঃখ-লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন। তাঁর গানে অনেক জায়গায় এইসব অভিজ্ঞতার ছায়া আছে। যেমন একটি ভজনে বলছেন, "প্রভু, আমি যখন তোমার মহিমার কথা বলি সবাই আমায় খৃস্টান বলে ঠাট্টা করে। বাতাস যেমন আবৃত করে রাখে তেমনি এরা পাপে আবৃত। কিন্তু আমি সত্যধর্মের কথা বললে আমায় ধিক্কার দেয়। আমি বলি সকল মানুষ সমান, আর এরা আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করে— যেন আমি এক কুকুর।" এমন দিন থাকবে না, পৃথিবীতে স্বর্গ নেমে আসবে— অনেক ভজনে ভীম ভোই এই আশা প্রকাশ করেছেন। মানুষের অমর্যাদা তাঁর অসহ্য মনে হত। মূর্তি পূজা অর্থহীন মনে করতেন। একটি ভজনে বলেছেন, "অজ্ঞানতার বশে মানুষ মূর্তির সামনে পুজো দিয়ে করুণা ভিক্ষা করে। জড় মূর্তি কী করে প্রার্থনা পূরণ করবে? মায়ার বিভ্রমে মানুষ একথা বুঝতে পারে না। দেহ এবং আত্মার স্রষ্টা যিনি, তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ না করে কাঠের প্রতিমার কাছে পরিত্রাণ চায়।" নিরক্ষর, অন্ধ এই কবির রচনায় কোনো প্রাজ্ঞতার ভান নেই। নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় যা উপলব্ধি করেছেন, গুরুর কাছে যা উপদেশ পেয়েছেন, সহজ সরল ভাষায় তা-ই প্রকাশ করেছেন। ক্রমে বহু মানুষ তাঁর অনুগামী হন। পরিণত বয়সে মানুষের ভক্তি ভালোবাসায় তাঁর নির্যাতনময় জীবনের দুঃখ ঘোচে। ভীম ভোইয়ের গানের অলেখ ধর্ম যে মূলত মহাযান বৌদ্ধ-ধর্মেরই সারবস্তু এ বিষয়ে খুব একটা মতভেদ নেই। 'স্তুতি-চিন্তামণি' (১৯৫০ খৃ.), 'অষ্টক-বিহারী গীতা' (১৯৩৩ খৃ.), 'ব্রহ্মানিরূপণ গীতা', 'চৌতিশা-মধুচক্র' (১৯৪৮ খৃ.) এবং 'শ্রুতি নিষেধ গীতা'য় তাঁর রচনা সংকলিত হয়েছে। ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে ভীম ভোইয়ের মৃত্যু হয়।

অরক্ষিত দাস-ও ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষ। দক্ষিণ ওড়িশার গঞ্জাম জেলার এক রাজপরিবারে এঁর জন্ম। রাজ-ঐশ্বর্যের মধ্যে মানুষ হয়েও তাঁর মনে বৈরাগ্য দেখা দেয়। ১৮ বছর বয়সে ঘর ছেড়ে যান এবং ১৮ বছর ধরে বনে-পাহাড়ে গ্রামে-গ্রামে এবং নানা তীর্থে ঘুরে সত্যোপলব্ধির সাধনা করেন। শেষ পর্যন্ত প্রচলিত ধর্মের রীতিনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে মূর্তি পুজোর বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেন।

সমাজের নানা স্তরের মানুষের সঙ্গে মেশার অভিজ্ঞতায় অরক্ষিত দাস হিন্দু জাতিভেদ প্রথার অর্থহীনতা উপলব্ধি করেছিলেন। নারী-পুরুষের সমান মর্যাদা স্বীকার করতেন। তাঁর কথা, "সব রঙের গোরুর দুধই সাদা। সব মানুষেরই রক্ত লাল।" ১৮ বছর ভ্রাম্যমান সন্ন্যাসীর কঠোর জীবনের পর কটক জেলার ওলাসুনি পাহাড়ে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এখানেই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধের শেষ দিকে তাঁর মৃত্যু হয়। ভীম ভোই-এর সঙ্গে অরক্ষিত দাসের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না, কিন্তু দু জনেই একই ধরনের ধর্মমত প্রচার করেছিলেন। 'মহিমণ্ডল গীতা' অরক্ষিত দাসের রচনা। দ্র. Dr. Mayadhar Mansinha, *History of Oriya Literature*, Sahitya Akademi, New Delhi 1962

১২. জাতক ও অবদান

মানুষ যখন বুদ্ধ হন, যখন তাঁহার দিব্যজ্ঞান হয়, তখন তাঁহার অনেকগুলি অলৌকিক শক্তির উদয় হয়। তাহার মধ্যে পূর্বনিবাসের অনুস্মৃতি একটি। তিনি তখন দিব্যচক্ষে দেখিতে পান যে, সৃষ্টির প্রথম হইতে তিনি কতবার জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কী কী কর্ম করিয়াছিলেন, এবং সেই-সকল কর্ম দ্বারা তিনি বুদ্ধ হইবার পথে কখন কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। আমাদের ভাষায় আমরা বলি তিনি জাতিস্মর হন। যাঁহারা পুনর্জন্ম মানেন না তাঁহাদের মতে জাতিস্মর হওয়ার কথাই উঠিতে পারে না। কিন্তু যাঁহারা মানেন, তাঁহারা পূর্বজন্মে "কী ছিলাম, কী করিয়াছিলাম" জানিবার জন্য বড়োই ব্যগ্র হন। তাঁহারা মনে করেন, ধ্যান ধারণা যোগ প্রভৃতি উপায় দ্বারা তাঁহারা পূর্বজন্মের কথা জানিতে পারেন। কেহ এক জন্ম, কেহ দুই জন্ম, কেহ বা দশ জন্ম বিশ জন্ম পর্যন্ত স্মরণ করিতে পারেন। পুণ্য কর্ম, তীর্থ পর্যটন, যোগযাগ সৎকর্ম করিলে হিন্দুরা মনে করেন দশ জন্মার্জিত পাপক্ষয় হয়, কোটি জন্মার্জিত পাপক্ষয় হয়। তাই যাঁহারা পুনর্জন্ম মানেন তাঁহারা এই-সকল সৎকর্ম করার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়া উঠেন।

বুদ্ধ ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান তিনই দেখিতে পাইতেন। সুতরাং তিনি আপনার পূর্ব পূর্ব জন্ম যে স্মরণ করিতে পারিতেন, তাহা আশ্চর্য নহে। শাক্যসিংহ বুদ্ধ হইয়া অনেক উপদেশ দিয়াছেন ; সেই-সকল উপদেশ লোকে যাহাতে সহজে বুঝিতে পারে, তাহার জন্য অনেক সময়ে তিনি আপনার পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা দিয়া সেগুলি ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন। এই যে পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা, ইহার নাম জাতক।

জাতকের প্রাদুর্ভাব হীনযানে, পালি ভাষায়, অত্যন্ত অধিক। পালি ভাষার গ্রন্থে ৫৫৫টি জাতক আছে ; অর্থাৎ বুদ্ধদেব আপনার ৫৫৫টি পূর্বজন্মের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। এই যে নম্বর ৫৫৫, ইহা কিন্তু সর্ববাদীসম্মত নহে ; কেহ বলেন ৫৫০, কেহ বলেন ৫২৫, কেহ বলেন ৫৩৫, কেহ বলেন ৫১৫। ব্রহ্মদেশে ৫১৫ নম্বরই চলিত, তাহার মধ্যে ১০ খানি বড়ো— আর ৫০৫ খানি ছোটো। সংস্কৃতে একখানি 'জাতক-

মালা' আছে। সেখানি আর্যশূরের প্রণীত ; ইহাতে ৩৪টি মাত্র 'জাতক' আছে।[১] এই সংস্কৃত পুস্তক হীনযানের কি মহাযানের বলিতে পারা যায় না। কেন-না, হীনযানের লোকেও সংস্কৃতে লিখিত। বসুবন্ধু[২] যখন হীনযান ছিলেন, তখন তিনি 'অভিধর্ম্ম কোষ' নামে একখানি পুস্তক লিখেন, সেখানি সংস্কৃতে। প্রোফেসর কর্ণ অথবা ভট্টকর্ণ সংস্কৃত 'জাতকমালা' ছাপাইয়াছেন। এই-সকল জাতকের মধ্যে কোন্ কোন্‌টি পালির কোন্ কোন্ নম্বরে পাওয়া যায়, তাহাও তিনি দেখাইয়া দিয়াছেন। ডেনমার্কের প্রোফেসর ফোস্‌বোল পালি জাতকগুলি ছাপাইয়াছেন। রায় শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র ঘোষ সাহেব এই পালি জাতক-গুলি বাংলা করিতেছেন। বুদ্ধদেব কোন্ সময়ে, কোন্ শিষ্যের কথায়, কী উদ্দেশ্যে, এক-একটি জাতক বলিয়াছিলেন তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়া তাহার পর তিনি সেই জাতকটির বাংলা তর্জমা করিতেছেন।

বুদ্ধদেব যখন নিজে এই গল্পগুলি বলিতেছেন, তখন মনে করিতে হইবে, এই গল্পগুলি তাঁহার পূর্বেও প্রচলিত ছিল ; তিনি গল্পগুলি আপনার পূর্বজন্মের গল্প বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং এগুলি ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন সম্পত্তি, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। ইহা হইতে খৃ.পূ. ছয় শতকের পূর্বে ভারতবর্ষের রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার, মনের ভাব, ধর্মের ভাব, জানিতে পারা যায়।

মহাযানের লোকের কিন্তু, জাতকের উপর তত আস্থা ছিল বলিয়া মনে হয় না। কারণ, এক 'জাতকমালা' ছাড়িয়া দিলে, উহাদের আর জাতকের বই নাই। এই 'জাতকমালা' আবার যখন মহাযানীরা পড়ে, তখন উহার নাম হয় 'বোধিসত্ত্বাবদানমালা'। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় 'জাতকমালা'র বা 'বোধিসত্ত্বাবদানমালা'র যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা দেখিলে বোধ হয় যে, আর্যশূরের লেখা এই পুথিখানি মহাযানীরা সংগীতির ছাঁচে ঢালিয়া লইয়াছেন এবং মঙ্গলাচরণের পর উহাতে "এবং ময়া শ্রুতমেকাস্মিন্ সময়ে ভগবান্ শ্রাবস্ত্যাং বিজহার" বলিয়া মুখপাত করিয়াছেন ; অর্থাৎ আর্যশূরের বহিখানিকে তাঁহারা বুদ্ধের বচন করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা প্রথমত একটি নূতন জাতক দিয়া আর্যশূরের ৩৪টি জাতকের স্থানে ৩৫টি করিয়া লইয়াছেন। আর্যশূরের বহির

নাম 'জাতকমালা'; মহাযানের বহির নাম 'বোধিসত্ত্বাবদান', বা 'বোধিসত্ত্বাবদানমালা'। ইহা দেখিলেই বোধ হইবে যে মহাযানীরা জাতক শব্দটা পছন্দ করিতেন না। উঁহারা জাতকের স্থানে অবদান শব্দ ব্যবহার করিতেন। উঁহাদেরও পূর্ববর্তী মহাসাংঘিকের দল, তাঁহারাও জাতকের পরিবর্তে অবদান বলিতেন। মহাসাংঘিক হইতেই যে মহাযানের উৎপত্তি হইয়াছে, একথা পূর্বেই বলিয়াছি, আরো অনেকেরই এই বিশ্বাস। মহাসাংঘিকের যে একখানিমাত্র পুস্তক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অনেকগুলি জাতকের গল্প আছে, কিন্তু সেগুলির নামও অবদান। অবদান শব্দে সংস্কৃত ভাষায় মহৎকার্য বুঝায়। মহাযানের অবদানে শুধু বুদ্ধদেবের পূর্বজন্মের কথা নয়, আরো অনেক মহাপুরুষেরই পূর্বজন্মের কথা আছে। যেমন, অশোকরাজা পূর্বজন্মে কোনো বুদ্ধকে একমুষ্টি ধুলা দিয়া তৃপ্ত করিয়াছেন, তাই আর-একজন্মে তিনি চক্রবর্তী রাজা হইয়াছিলেন। সুতরাং অবদান শব্দ যতটা ব্যাপক, জাতক শব্দ ততটা নয়। মহাযানে অবদানের অনেক পুস্তক আছে। আর্যশূরের 'অবদানশতকে' এইরূপ ১০০টি অবদান আছে। 'দিব্যাবদানমালা'য় ৩৭টি অবদান আছে। 'ভদ্রকল্পাবদানে' ৩৫টি জাতক আছে। 'অশোকাবদান' 'দিব্যাবদানমালা'র একটি অবদান, গদ্যে লেখা; কিন্তু 'অশোকাবদান' নামে পদ্যে লেখা আরো একটি বৃহৎ অবদান আছে। 'সুগতজন্মাবদান' নামে আমরা আরো একখানি অবদান পাইয়াছি। অবদানের শেষ এবং উৎকৃষ্ট পুস্তক 'বোধিসত্ত্বাবদানকল্পলতা'— এখানি খৃ ১১ শতকে কাশ্মীরে ক্ষেমেন্দ্রব্যাসদাস[৩] নামে একজন কবির লেখা। তিনি হিন্দু, ব্রাহ্মণ ও একজন উৎকৃষ্ট কবি ছিলেন। তাঁহার একজন ন্যক্ক নামে বৌদ্ধ বন্ধু ছিলেন। ক্ষেমেন্দ্র যখন 'রামায়ণ', 'মহাভারত', 'বৃহৎকথা' প্রভৃতি বড়ো বড়ো পুস্তকের বিষয় লইয়া 'রামায়ণমঞ্জরী', 'ভারতমঞ্জরী', 'বৃহৎকথামঞ্জরী' প্রভৃতি কাব্য লিখিয়া খুব প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, তখন ন্যক্ক একদিন আসিয়া বলিলেন, আমাদের অবদানগুলি বড়ো কটমট ভাষায় লেখা, কতক গদ্য, কতক পদ্য, কোনোটাই সুবোধ নয়। তুমি যদি তোমার ভাষায় এইগুলি কাব্যাকারে লিখিয়া দাও, তবে আমাদের ধর্মের বড়ো উপকার হয়। তাই ক্ষেমেন্দ্র 'বোধিসত্ত্বাবদান' রচনা করেন। ইহাতে ১০৮টি অবদান আছে। ইহার পুরা পুথি

বড়োই দুষ্প্রাপ্য। এশিয়াটিক সোসাইটির পুথিতে ৫১-১০৮ পর্যন্ত অবদান আছে; কেম্ব্রিজের পুথিতে ৪১-১০৮ অবদান আছে, শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় তিব্বত হইতে একখানি পুথি আনাইয়াছেন, তাহাতে ১-৪৯টি অবদান আছে। তিনি পুথিখানি ছাপাইতেছেন, ডানপাতে সংস্কৃত বামপাতে ভুটিয়া ভাষায় তাহার তর্জমা। তিনি ইহার বাংলাও করিতেছেন।

আমরা একটি জাতক ও একটি অবদান পাঠকগণকে উপহার দিতেছি। ১. আর্যশূরের 'জাতকমালা'র প্রথম ব্যাঘ্রী জাতক। ২. 'মহাবস্তু অবদানে'র পুণ্যবন্ত ও তাঁহার বন্ধুদিগের অবদান।

১.

এক সময়ে বুদ্ধদেব কোনো ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 'কল্পসূত্র' অনুসারে তাঁহার জাতকর্মাদি সংস্কার হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত মেধাবী, কৌতূহলী ও অনলস ছিলেন। সেইজন্য তিনি অল্পদিনের মধ্যেই অষ্টাদশ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণেরা যেসব কলা শিক্ষা করিতে পারেন, সে-সকল কলাতেও তিনি ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার পসার প্রতিপত্তিও খুব ছিল। কিন্তু গার্হস্থ্যে তাঁহার মন উঠিল না। তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। তিনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন শুনিয়া, যাঁহারা তাঁহাকে ভালোবাসিতেন, তাঁহারাও সন্ন্যাসী হইলেন। অজিত তাঁহার প্রধান শিষ্য হইল। তিনি পাহাড়পর্বত, বনজঙ্গলে ভ্রমণ করিতে বড়োই ভালোবাসিতেন; অজিত সর্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকিত। একদিন তিনি পর্বতের গুহায় এক বাঘিনি দেখিলেন। সে এইমাত্র সন্তান প্রসব করিয়াছে, অত্যন্ত দুর্বল, ক্ষুধায় কাতর, সতৃষ্ণ নয়নে বাচ্ছার দিকে চাহিতেছে। ব্রাহ্মণপুত্র দেখিলেন বাঘিনি ক্ষুধায় এত কাতর যে, সে বাচ্ছাটিও খাইতে চায়। করুণার সাগর সন্ন্যাসী শিষ্যকে বলিলেন, বাঘিনি দেখিতেছি ক্ষুধায় বাচ্ছাটি খাইয়া ফেলিবে, তুমি অনুসন্ধান করিয়া যদি উহাকে কোনো খাবার আনিয়া দাও, তবে বড়োই ভালো হয়। শিষ্য চলিয়া গেলে, সন্ন্যাসী ভাবিলেন— আমার এ ছার দেহে কী কাজ? আমি ইহার আহার হই না কেন? এই ভাবিয়া তিনি এক উচা জায়গা হইতে বাঘিনির সম্মুখে

পড়িয়া দেহত্যাগ করিলেন। বাঘিনিও আনন্দের সহিত তাঁহার দেহ ভক্ষণ করিতে লাগিল। শিষ্য আসিয়া দেখিল, তাঁহার গুরু বাঘিনির জন্য দেহত্যাগ করিয়াছেন। সে আর আর শিষ্যদের এই কথা বলিল। সকলেই মনে করিল, ইনি কোনো-না-কোনো জন্মে বুদ্ধ হইবেন।

২.

কোনো জন্মে ভগবান্ বারাণসীর রাজা অঞ্জনের পুত্র হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল পুণ্যবন্ত। তাঁহার চারি জন বন্ধু ছিল। তাঁহাদের নাম বীর্যবন্ত, শিল্পবন্ত, রূপবন্ত ও প্রজ্ঞাবন্ত। তাঁহাদের কাহার কী গুণ ছিল, তাহা নামেই প্রকাশ। একবার পাঁচ বন্ধুতে মিলিয়া আপনাদের গুণ পরীক্ষার জন্য কাম্পিল্ল যাত্রা করিলেন। পথে তাঁহারা দেখিলেন, গঙ্গায় প্রকাণ্ড এক বাহাদুরি কাঠ ভাসিয়া যাইতেছে, দেখিয়াই বীর্যবন্ত জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন ও কাঠ ডাঙায় তুলিলেন। পরীক্ষায় জানিলেন এটা চন্দনের কাঠ— বিক্রয় করিয়া অনেক টাকাকড়ি পাইলেন ও পাঁচ জনে টাকা ভাগ করিয়া লইয়া অনেক আমোদ আহ্লাদ করিলেন।

শিল্পবন্ত একদিন এক নগরের প্রান্তে বসিয়া বীণা বাজাইতেছিলেন। বীণায় সাতটি তন্ত্রী ছিল। বীণার ঝংকারে সমস্ত লোক মুগ্ধ হইয়া ঝাঁকিয়া পড়িল। এরূপ বীণা তাহারা আর-কখনো শুনে নাই। বাজাইতে বাজাইতে বীণার একটা তার ছিঁড়িয়া গেল। কিন্তু সে এমনি কলাবৎ, ছয় তারেই সাত তারের মতো বাজাইতে লাগিল। ক্রমে আরো একতার ছিঁড়িল। তাহাতেও বাজনার কোনো ব্যতিক্রম হইল না। ক্রমে চার তার, তিন তার, দুই তার, শেষে এক তারে দাঁড়াইল। তখনো সপ্ততন্ত্রী বীণার ঝংকার হইতেছে। নগরের লোক তাঁহাকে অনেক টাকা পুরস্কার দিল।

রূপবন্তের রূপ দেখিয়া নগরের এক বেশ্যা মুগ্ধ হইয়া গেল এবং তাঁহার কথায় তাঁহার বন্ধুগণকে অনেক টাকাকড়ি দিল।

এইবার প্রজ্ঞাবন্তের পালা। তিনি একদিন বাজারে গিয়া দেখিলেন, এক শেঠের ছেলে এক বেশ্যার সহিত ঝগড়া করিতেছে। ঝগড়ার বিষয় একলক্ষ টাকা। শেঠের ছেলে বেশ্যাটিকে আগের রাত্রিতে

ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিল ও একলক্ষ টাকা দিতে স্বীকার হইয়াছিল। বেশ্যার অন্য লোকের বাড়ি যাইবার কড়ার ছিল, সে সে-রাত্রিতে যাইতে পারিল না। সে পরদিন সকালে আসিয়া উপস্থিত হইল। শেঠ বলিল, তোমায় আমার আর কাজ নাই। রাত্রে স্বপ্নে আমি তোমায় পাইয়াছিলাম, আমার কাজ হইয়া গিয়াছে। সে বলিল, যদি স্বপ্নে আমায় পাইয়াছিলে, তবে আমার টাকাটি দাও। এ ঝগড়ার আর মীমাংসা হয় না। দুই দলেই লোক জুটিয়া গেল। শেষে প্রজ্ঞাবন্ত আসিয়া মধ্যস্থ হইলেন। শেঠকে বলিলেন, তুমি এখনই টাকা লইয়া আইস। সে টাকা আনিয়া সম্মুখে রাখিল। প্রজ্ঞাবন্ত বলিলেন, একখানি বড়ো আরশি লইয়া আইস। আরশি আনিলে, তিনি বেশ্যাকে বলিলেন, "তুমি ঐ আরশির ভিতর হইতে টাকা লও। শেঠজী স্বপ্নে তোমার ছায়ামাত্র পাইয়াছিলেন, তুমিও টাকার ছায়া লও, আসল টাকায় তুমি কী করিয়া হাত দিবে?" বেশ্যার মুখ চুন। মহানন্দে শেঠ সমস্ত টাকা প্রজ্ঞাবন্তকে পুরস্কার দিল। পাঁচ বন্ধুতে টাকা ভাগ করিয়া লইয়া খুব আমোদ-প্রমোদ করিলেন।

পুণ্যবন্ত এক রাজবাড়ির সম্মুখে একদিন বসিয়া আছেন। এমন সময় মন্ত্রীপুত্র সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি পুণ্যবন্তের পুণ্যজ্যোতিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে রাজবাড়ির ভিতর লইয়া গেলেন এবং উহারই এক অংশে তাঁহাকে থাকিতে দিলেন। রাত্রিতে পুণ্যবন্ত ঘুমাইয়া আছেন, রাজকন্যা আসিয়া তাঁহার সেবা করিতেছেন। এই ব্যাপার দেখিয়া রক্ষকগণ পুণ্যবন্তকে লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত করিল। রাজা অনুসন্ধানে জানিলেন পুণ্যবন্তের কোনো দোষই নাই। তিনি কাশী-রাজের পুত্র জানিয়া, রাজা মহাশয় তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন ও রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিলেন।

এই পুণ্যবন্তই বুদ্ধদেব, বীর্যবন্ত তাঁহার শিষ্য শোনক, শিল্পবন্ত রাষ্ট্রপাল, রূপবন্ত সুরেন্দ্র ও প্রজ্ঞাবন্ত শারিপুত্র।

'নারায়ণ'
শ্রাবণ, ১৩২৩ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. উত্তর ভারতে কোনো ব্রাহ্মণ পরিবারে আর্যশূরের জন্ম হয়েছিল। পরে বৌদ্ধ হন। রচনার মধ্যে জন্মকাল এবং ব্যক্তিপরিচয় সম্পর্কে কোনো তথ্য না পাওয়ায় ইনি কোন্ সময়ের মানুষ ছিলেন নিশ্চিত-ভাবে জানা যায় নি। আর্যশূরের 'কর্মফলনির্দেশসূত্র' বইখানি ৪৩৪ খৃস্টাব্দে চীনা ভাষায় অনূদিত হয়েছিল, এই সূত্র ধরে তিনি চতুর্থ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন অনুমান করা হয়। তারনাথ অনেকবার আর্যশূরের নাম উল্লেখ করেছেন এবং কাল-দুর্দর্শ, দুর্দর্শকাল, মাতৃচেট, পিতৃচেট, ধার্মিক-সুভূতি প্রভৃতি বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। আর্য-শূরের রচনাবলীর মধ্যে উৎকর্ষে এবং সমাদরের ব্যাপকতায় 'জাতকমালা' শ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থ 'বোধিসত্ত্ব-অবদান-মালা' নামেও উল্লিখিত হয়। 'জাতকমালা'র গল্পের সংখ্যা ৩৪টি। এর কোনো গল্পই আর্যশূরের উদ্ভাবন নয়, প্রচলিত কাহিনী তিনি নতুন করে বর্ণনা করেছেন, ধর্ম প্রচারের সহায়তার জন্যই তিনি কাহিনীগুলি বর্ণনা করেছিলেন, কিন্তু তাঁর কবিত্বের গুণে 'জাতকমালা' সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মর্যাদা পেয়ে এসেছে। বর্ণনার অসীম বিস্তার, পরিমার্জিত ভাষার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য এবং বিশেষ করে করুণ রস নিবিড় করে তোলার দক্ষতায় আর্যশূর সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কবিদের সঙ্গে তুলনীয় ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। বৌদ্ধ লেখক হলেও হিন্দু-বিদ্যার বিভিন্ন শাখায় তাঁর দখল ছিল, প্রয়োজনে এই জ্ঞান ব্যবহার করেছেন। বৌদ্ধধর্মের যেসব নীতি জনপ্রিয় হয়েছিল আর্যশূর সেই নীতিগুলি দৃষ্টান্ত দিয়ে বিশদ করে তুলতে চেয়েছেন মনে হয়। তাই মহাযান বা হীনযান— কোনো একটি দার্শনিক অবস্থান একান্তভাবে আশ্রয় করেন নি। অজন্তায় 'জাতকমালা'র কাহিনীর চিত্ররূপ এবং সঙ্গে 'জাতকমালা' থেকে উদ্ধৃতি তোলা আছে। লিপিকাল ষষ্ঠ খৃস্টাব্দ। 'জাতকমালা' ভিন্ন 'বোধিসত্ত্বজাতকস্য-ধর্মঘণ্টী', 'সুপথাদেশপরিকথা', 'সুভাষিত-রত্ন-করণ্ডককথা', 'পারমিতাসমাস', 'প্রাতিমোক্ষসূত্রপদ্ধতি', 'কর্মফল-নির্দেশসূত্র' বইগুলি আর্যশূরের রচনা বলে চলে। দ্র. Johann

Hendrick Kasper Kern ed., *The Jātaka Mālā, or Bodhisattvāvadāna-Mālā* by Ārya-Cūra, Boston 1891 ; Michael Vigo Fausböll ed., *The Jātaka together with its Commentary*, 7 Vols., London 1877-97 ; ঈশানচন্দ্র ঘোষ, 'জাতক' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা ১৩২৩, ১৩২৭ ব।

২. প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ দার্শনিক বসুবন্ধুর জন্ম গান্ধারে, আধুনিক পেশোয়ারে। খৃস্টীয় সপ্তম শতকে হিউয়েন-ৎসাঙ এখানে বসুবন্ধুর নামে একটি স্মৃতি ফলক দেখেছিলেন। চারটি প্রধান বৌদ্ধ মতাদর্শের মধ্যে বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক মতকে হীনযান এবং মাধ্যমিক ও যোগাচারকে মহাযান বলা যায়। বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক মতের উদ্ভব প্রাচীনতর সর্বাস্তিবাদ থেকে। বসুবন্ধু প্রথম জীবনে বৈভাষিক মতে বিশ্বাসী ছিলেন, পরে বড়ো ভাই অসঙ্গের প্রভাবে যোগাচার মত অবলম্বন করেন। শাকল, কৌশাম্বী ও অযোধ্যায় বসুবন্ধু বহু বছর বসবাস করেছিলেন। ৮০ বছর বয়সে অযোধ্যায় তাঁর মৃত্যু হয়। বৈশেষিক শাস্ত্রের পণ্ডিত মনোরথের সঙ্গে বসুবন্ধুর ঘনিষ্ঠতা ছিল। বসুবন্ধু খৃস্টীয় চতুর্থ শতকে 'অভিধর্ম্ম-কোষ' লেখেন। সংস্কৃতে লেখা মূল 'অভিধর্ম্মকোষ' পাওয়া যায় নি। পাওয়া গেছে 'অভিধর্ম্মকোষে'র চীনা এবং তিব্বতি অনুবাদ এবং 'অভিধর্ম্মকোষ ব্যাখ্যা' নামে যশোমিত্রের টীকা। 'অভিধর্ম্মকোষ' ৫৬৩-৬৭ খৃস্টাব্দে চীনা ভাষায় প্রথম অনুবাদ করেন পরমার্থ, ৬৫১-৫৪ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় অনুবাদ করেন হিউয়েন-ৎসাঙ। 'অভিধর্ম্মকোষে'র কারিকা-সংখ্যা ৬০০, এর সঙ্গে আছে লেখকের নিজের ভাষ্য। হীন-যানের দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হলেও বৌদ্ধ পরমার্থ তত্ত্বের আদিরূপ বিধৃত থাকায় 'অভিধর্ম্মকোষ' বৌদ্ধ ঐতিহ্যে সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমাদর পেয়ে এসেছে। এই বইয়ের পৃ. ৩৬৫ সূত্র ২ দ্র.

৩. এই বইয়ের পৃ. ১৯৭ সূত্র ১ দ্র.

১৩. দলাদলি

ধর্ম হইলেই দলাদলি হয়। সভা হইলেই দলাদলি হয়। পাঁচ জনে মিলিয়া কাজ করিতে গেলে মতান্তর হয়ই হয়, আর মতান্তর হইলেই দলাদলি হয়। দলাদলিটা দোষের কথাও বটে, দোষের কথা নয়ও বটে। দলাদলিতে যখন মূল কাজ পণ্ড হয়, তখন দোষের। যখন মূল কাজের শ্রীবৃদ্ধি হয়, তখন গুণের। যখন দলাদলির মীমাংসা করিয়া দিবার লোক থাকে, তখন দলাদলিতে উপকার হয়। যখন মিটাইয়া দিবার লোক থাকে না, তখন উহাতে অপকার হয়। বৌদ্ধধর্মে যে দলাদলি হইয়াছিল তাহাতে ধর্মের উন্নতিই হইয়াছিল; দুই দলই ধর্মপ্রচারের জন্য কোমর বাঁধিয়া পৃথিবীর চারি দিকেই ঘুরিয়াছিলেন। একদল উত্তরে, একদল দক্ষিণে। তাঁহারা যেসব দেশে গিয়াছিলেন, তাহার অনেক দেশ এখনো বৌদ্ধ আছে। সুতরাং এত বড়ো একটা বড়ো দলাদলির ইতিহাসটা কিছু জানা চাই।

প্রথম কথা কী লইয়া দলাদলি হয়? অতি তুচ্ছ কথা! যাহা লইয়া দলাদলি হয়, পালিতে তাহাকে দশবত্থু বলে, সংস্কৃতে দশবস্তু। অর্থাৎ দশটি জিনিস লইয়া দলাদলির সূত্রপাত। যথা—

১. কপ্পতি, সিঙ্গিলোণ কপ্পো— অনেক ভিক্ষু শিংয়ের পাত্রে একটু লুন সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। তাঁহারা তো ভিক্ষা করিয়া খাইতেন। সব সময়ে তো লুন দেওয়া ব্যঞ্জন পাইতেন না। আবার সেকালে সকলে সকলের লুন খাইতেন না। লুন না দিয়া ব্যঞ্জন রান্না হইত। তাই পরিবেশনও হইত। লোকে লুন মিশাইয়া খাইত। এখনো অনেক খাঁটি হিন্দুর বাড়িতে আলুনি ছক্কার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা বোধ হয় মনে করেন লুন দিলেই "এঁটো" হয়। তাই পরিবেশনের সময় আলুনিই পরিবেশন করেন। পাতে লুন থাকে, সেই লুন মিশাইয়া লোকে "এঁটো" করিয়া খায়। এইরূপ ব্যবহার বোধ হয় সেকালেও ছিল। লোকে ভিক্ষুদের রান্না জিনিস দিত, আলুনিই দিত। ভিক্ষুরা একটু লুন সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন— তাও রাখিতেন শিংয়ে অর্থাৎ যাহার দাম নাই, কুড়াইয়া যথেষ্ট পাওয়া যায়। তখন

তো আর bone-mill-এর এত দরকার হয় নাই ! এই যে সামান্য কথা ইহা লইয়াই ঘোর দলাদলি উপস্থিত হইল। যাঁহারা কড়া ভিক্ষু, তাঁহারা বলিলেন, ভিক্ষুর আবার সঞ্চয় ? তাহা হইলে আর ভিক্ষু রহিল না, গৃহস্থ হইয়া গেল। যাঁহারা তত কড়া ভিক্ষু নন, তাঁহারা বলিলেন, একটু লুন সঞ্চয় করিলাম তাতে বহিয়া গেল কী ? আমরা কি কিছুই সঞ্চয় করি না ! আমাদের পাত্র আছে, চীবর আছে, শয়ন আসন এসব তো আমাদের থাকে, একটু লুন থাকিলেই সর্বনাশ হইয়া গেল ? এই আপত্তির নাম সিঙ্গিলোণ কপ্পো।

২. কপ্পতি দঙ্গুল কপ্পো— বুদ্ধদেব নিয়ম করিয়া গিয়াছিলেন, বেলা ঠিক দুই প্রহরের পর কোনো ভিক্ষু আহার করিতে পারিবে না। ১২টা বাজিবার পূর্বে সকলকেই আহার সারিয়া লইতে হইবে, ১২টা বাজিলে পর আর-কেহই আহার করিতে পারিবে না। তাহার পর যদি খাইতে হয় তো জল ও ফলের রস খাইতে হইবে। কিন্তু ইহারা তো ভিক্ষু, ভিক্ষা করিয়া রান্না ভাত আনিয়া তো খাইতে হইবে ? একালের মতো তো আর স্কুল কালেজ, অফিস ছিল না, যে ৯টার মধ্যে ভাত চাই ! সেকালের লোকে খাইত বেলায়, রাঁধিতও বেলায়। ভিক্ষুরা সেই বেলার রান্না ভিক্ষা করিয়া আনিয়া খাইত। দুপুরের আগে খাইতে হইবে। দুপুরের পর এক গ্রাসও খাইবার হুকুম নাই। সুতরাং অনেকের খাওয়া হইত না, অনেকের আধ-পেটা হইত। তাই তারা মনে করিত, দুই প্রহরের সময় ছায়া যেরূপ থাকে, তাহা হইতে দুই আঙুল ছায়া সরিয়া গেলেও খাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কড়া ভিক্ষুরা বলিলেন, সে কখনো হতে পারে না। মহাপ্রভুর আজ্ঞা দু প্রহরের পূর্বে খাইতে হইবে, সে আজ্ঞা কি আমরা লঙ্ঘন করিতে পারি ! সুতরাং মতান্তর হইল, দলাদলির একটা কারণ হইল।

৩. কপ্পতি গামান্তর কপ্পো— ভিক্ষুরা একই গ্রামে ভিক্ষা করিবে, একদিনে দুই গ্রামে যাইতে পারিবে না, নিয়ম ছিল। কোনো কোনো ভিক্ষু মনে করিতেন, যদি গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ হয়, আগে স্বগ্রামে ভিক্ষা কিছু খাইয়া গেলে দোষ কী ? প্রথমত দু বার খাওয়া দোষ, দ্বিতীয় দোষ

আগে স্বগ্রামে খাইয়া, গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ গেলে, যে বেচারা নিমন্ত্রণ করিয়াছে, তাহার রান্না অন্নব্যঞ্জন সব ফেলা যায়। কারণ ভিক্ষুরা তো একবার খাইয়া গিয়া আবার সব জিনিস খাইয়া উঠিতে পারেন না; সুতরাং বুদ্ধদেব নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন যে, গ্রামান্তরে নিমন্ত্রণ যাইলে ঘরে খাইয়া যাইতে পারিবে না। কড়া ভিক্ষুরা বলিলেন, এ নিয়ম ঠিক। অন্যে বলিলেন. গ্রামান্তরে যাইতে হইলে যদি পেটে কিছু না থাকে তাহা হইলে যাইতে বড়ো কষ্ট হয়। সুতরাং কিছু খাইয়া গেলে দোষ কী? এও একটা বিবাদের কারণ।

৪. কপ্পতি আবাসকপ্পো— এখানে আবাস শব্দের অর্থ লইয়া একটু গোলযোগ আছে। এক-এক মঠে অনেক ভিক্ষু বাস করিতেন। যাঁহারা এক ঘরে বাস করেন তাঁহাদের এক আবাস। আবাস শব্দের অর্থ ঘর। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে আবাস শব্দের অর্থ পরগনা বা ডিহি। বুদ্ধদেব নিয়ম করিয়াছিলেন যে, এক জায়গার যত ভিক্ষু থাকিবে, সব এক জায়গায় আসিয়া উপোষথ করিবে। উপোষথ শব্দের অর্থ উপবাস, বাংলায় যাহাকে উপোস বলে। সংস্কৃতে দুই-এক জায়গায় উপবসথ শব্দ পাওয়া যায়, তাহা হইতে উপোষথ হইয়াছে। বৌদ্ধশাস্ত্রে ক্রমে উ লোপ হইয়া পোষথ বা পোষধ হইয়াছে। জৈন ভাষায় আবার ষ, ধ, লোপ হইয়া শুধু পো হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের ধর্মে একটা পো-শালা আছে, সেখানে সকলে আসিয়া পোষধ ব্রত ধারণ করেন অর্থাৎ উপোস করিয়া ধর্মকথা শ্রবণ করেন। অষ্টমী. পূর্ণিমা ও অমাবস্যা এ কয়দিন পোষধের দিন। বুদ্ধদেব নিয়ম করিয়াছিলেন এক আবাসের লোক এক জায়গায় পোষধ করিবে। কিন্তু কেহ কেহ বলিলেন, এ নিয়ম বড়ো কড়া, যাহার যেখানে ইচ্ছা, সে সেখানে পোষধ করিবে। বৃদ্ধেরা বলিলেন, তাহা হইতে পারে না, তথাগতের আজ্ঞা মানিয়া চলিতেই হইবে। আর-সকলে বলিলেন, পৃথক্ পৃথক্ হইয়া পোষধ করিলে, উপাসকদিগের সুবিধা হয়, তাহাদের ধর্মকথা শুনাইবার সুবিধা হয় এবং তাহাতে ধর্মবৃদ্ধি হয়। বৃদ্ধেরা বলিলেন, সকলে একত্র বসিয়া উপবাস করিলে, লুকাইয়া খাইবার সুবিধা হয় না, পৃথক্ পৃথক্ উপবাস করিলে সেটা হওয়ার সুবিধা হয়। সেজন্য

আবার ভিক্ষুদের দেখিবার দরকার হয়। সুতরাং ইহা একটা বিবাদের কারণ হইল।

৫. কপ্পতি অনুমতি কপ্পো— বৌদ্ধদের সকল কর্মই সংঘে নির্বাহিত হইত, অর্থাৎ এক বিহারের যত ভিক্ষু সকলে একত্র বসিয়া (ভোট লইয়া) বিহারের কার্য নির্বাহ করিতেন। সকল ভিক্ষু উপস্থিত না থাকিলে, কোনো কোনো বিহারের ভিক্ষুরা অনুপস্থিত ভিক্ষুদের অনুমতি পাওয়া যাইবে, এইরূপ মনে করিয়া কার্য নির্বাহ করিয়া লইতেন। এ বিষয়ে যে মতামতি হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। একদল বলিবেন, "অনুপস্থিতেরা যে তোমাদের হইয়া মত দিবেন একথা তোমরা কী করিয়া ভাব।" আর-একদল বলিবেন, "তাহারা তো উপস্থিত ছিলেন না, আমরা কী করি, কাজ তো ফেলিয়া রাখা যায় না।"

৬. কপ্পতি আচিন্ন কপ্পো-- গুরু করিয়া গিয়াছেন আমিও করিব। পূর্বাপর চলিয়া আসিতেছে ইহাতে দোষ কী? বৃদ্ধেরা বলিবেন, তথাগতের যাহা উপদেশ তাহার তো ব্যতিক্রম হইবার জো নাই। তোমার গুরু কোথায় কী করিয়া গিয়াছেন, সেটা তো আর তথাগতের উপদেশের বিরুদ্ধে প্রমাণ হইবে না। অতএব তোমাকে সে কার্যটি ছাড়িতে হইবে। সে বলিল, বাঃ, বরাবর চলিয়া আসিতেছে, আমার গুরুও করিয়া গিয়াছেন, আমি করিলেই দোষ হইবে? সুতরাং ইহা লইয়া বিবাদের একটা কারণ হইল।

৭. কপ্পতি অমথিত কপ্পো— পূর্বেই বলা হইয়াছে দু প্রহরের পর ভিক্ষুরা জল ও ফলরস খাইতে পারিবে। ঘোলটাকে ভিক্ষুরা রস বলিয়াই মনে করিতেন। ঘোল খাওয়ায় তাঁহাদের দোষ ছিল না। দই মওয়া হইলে তবে তো ঘোল হয়! অনেক ভিক্ষু দইয়ে জল দিয়া পাতলা করিয়া তাহাকে ঘোল বলিয়া খাইতেন। এই যে "আমওয়া" দই এটা ভিক্ষুদের পক্ষে নিষিদ্ধ। অনেক ভিক্ষু বলিলেন, এ নিষেধের কোনো মানে নাই। এ জিনিসটা তো দইয়ে জল দিয়া তৈয়ারি হইয়াছে, ঘোলও জল দিয়া তৈয়ারি হয়। একটা "মওয়া", একটা "আমওয়া"।

এতে আর এতই তফাত কী ? বৃদ্ধেরা বলিলেন, বেশ তফাত আছে। একটাতে মাখনটা থাকিয়া যায়, আর-একটাতে থাকে না। মাখন তো ফলের রসও নয়, জলও নয়, সুতরাং সেটা তো খাওয়া উচিত নয়। সুতরাং মাখন খাওয়াও যা, "আমওয়া" দই খাওয়াও তা। এ কার্যটি একেবারেই করা উচিত নয়। সুতরাং এটা একটা বিবাদের কারণ।

৮. কপ্পতি জলোগি কপ্পো— মদ গাঁজিয়া উঠিবার পূর্বে জল বলিয়া সেইটাকে খাওয়া। অর্থাৎ তাড়ি হইবার পূর্বে ঝাঁঝওয়ালা রস খাওয়া। ইহা লইয়াও দলাদলি হইল। বৃদ্ধেরা বলিলেন, "ও তো মদ। মদ খাওয়া ভিক্ষুদের নিষেধ। সুতরাং মদ হওয়ার পূর্বে উহাকে খাইলে পেটে যাইয়া মদ হইবে।" অপরে বলিলেন, "আমরা তো মদ খাইলাম না, তথাগতের আদেশ তো পালন করিলাম, পেটে যাইয়া মদ হইলে আমরা কী করিব।"

৯. কপ্পতি অদসকং নিসীদনং— নিসীদন শব্দের অর্থ আসন। আর দশা শব্দের অর্থ কাপড়ের ছিলে। যে আসনের ছিলে না থাকে, বৌদ্ধদের তাহাতে বসিতে নাই। ছিলেগুলি কাটিয়া ছাঁটিয়া দেখিতে যে সুন্দর আসন হয়, তাহাতে বসা ভিক্ষুদের নিষেধ। ভিক্ষুরা অনেকে চান এইরূপ সুন্দর আসনে বসিতে। বৃদ্ধেরা বলেন, তাহাতে ভগবানের যে আজ্ঞা আছে "উচ্চাসনে বা মহাসনে বসিবে না", সে আজ্ঞা লঙ্ঘন হয়। অতএব ছিলাকাটা আসনে বসিতে নাই। বিরুদ্ধবাদীরা বলিলেন, ছিলা কাটিলাম আর না কাটিলাম তাহাতে কী আসিয়া গেল ? আমরা উচ্চাসনেও বসিতেছি না, মহাসনেও বসিতেছি না। তবে আমরা ভগবানের আজ্ঞা কী করিয়া লঙ্ঘন করিলাম।

১০. কপ্পতি জাতরূপ রজতন্তি— সোনারুপা গ্রহণ করা বুদ্ধদেবের আদেশে ভিক্ষুদের নিষেধ। কিন্তু বৈশালীর ভিক্ষুরা ছলে ও কৌশলে সোনারুপা লইতেন। কিরূপে লইতেন তাহার উদাহরণ দেখুন। তাঁহারা উপোষথ-শালায় একটি জলপূর্ণ পাত্র রাখিতেন এবং

উপাসকদের বলিতেন, তোমরা এই জলে কার্ষাপণ কাহাপন বা কাহন ফেলিয়া দাও। তাহারা ফেলিয়া দিত, ভিক্ষুরা সোনারুপা ছুঁইতেন না, কিন্তু আপনাদের লোক দিয়া সেগুলি তুলিয়া লইয়া খরচ করিতেন। কার্ষাপণ বলিতে সেকালে চৌকা চৌকা তামার পয়সা বুঝাইত। বৃদ্ধেরা বলিলেন, ইহার দ্বারা বুদ্ধের আজ্ঞা লঙ্ঘন হইল। অন্য ভিক্ষুরা বলিলেন, আমরা তো ছুঁইলাম না, কী করিয়া বুদ্ধদেবের আজ্ঞা লঙ্ঘন হইল। সুতরাং এটিও বিবাদের কারণ হইল।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর ঠিক একশো বৎসর অতীত হইয়া গেলে, বৈশালীর ভিক্ষুরা বিশেষত যাহারা বজ্জি বংশে জন্মিয়াছিল, তাহারা এই দশবস্তু চালাইবার চেষ্টা করিতেছিল। এমন সময় যশ নামে একজন ভিক্ষু বৈশালীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাদিগের দশবস্তু চালাইবার চেষ্টা যে ধর্মবিরুদ্ধ এ বিষয়ে তাঁহার কোনো সন্দেহ রহিল না। তিনি প্রথমেই মহাবনবিহারে উপোষথ-শালায় দেখিলেন একটা ধাতুপাত্রে জল রহিয়াছে, উপাসকেরা তাহাতে কাহাপন দিতেছে। তিনি বলিলেন, এটা বড়ো দোষের কথা। তিনি উপাসকদিগকে বারণ করিয়া দিলেন, তোমরা দিও না। বৈশালীর ভিক্ষুরা খুব চটিয়া গেল। তাহারা নানারূপে তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। তিনি পলাইয়া কৌশাম্বী গেলেন। এবং সেখান হতে পাবা ও অবন্তীতে ভিক্ষুদের নিকট লোক পাঠাইয়া দিলেন ও নিজে অহোগঙ্গ পর্বতে গমন করিলেন। সম্ভূত শোনবাসী অহোগঙ্গ পর্বতে বাস করিতেন। যশ তাঁহার নিকট সকল কথা বলিলেন। ক্রমে পাবা হইতে ৬০ জন ও অবন্তি হইতে ৮০ জন ভিক্ষু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির হইল যে রেবত সকলের চেয়ে প্রাচীন ও সকলের চেয়ে বিদ্বান। তাঁহাকে একথা জানানো যাক। তিনি তক্ষশিলার নিকট বাস করিতেন। সহজাতি নামক স্থানে রেবতের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। রেবত শুনিয়া বলিলেন, এ দশটাই ধর্মবিরুদ্ধ এবং এই দশটাই উঠিয়া যাওয়া উচিত। বৈশালীর ভিক্ষুরা তাঁহাকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইতে লাগিলেন এবং তাঁহার এক শিষ্যকে বশ করিয়া ফেলিলেন। রেবত তাঁহাদের কথা শুনিলেন না এবং শিষ্যটিকে বিদায় করিয়া দিলেন। বৈশালীর ভিক্ষুরা পাটলিপুত্রের

রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, কিন্তু তাহাতেও তাঁহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হইল না।

সহজাতিতে ১১৭০ হাজার ভিক্ষু আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; কিন্তু রেবত বলিলেন, যাহারা এ বিবাদ উপস্থিত করিয়াছে তাহাদের সম্মুখেই এ বিবাদের নিষ্পত্তি-হওয়া উচিত। অতএব তোমরা বৈশালী চলো। সেখানে রেবত দেখিলেন যে, লোকে বাজে কথা কহিয়া সময় নষ্ট করিতেছে। সুতরাং তিনি প্রস্তাব করিলেন উব্বাহিকা করিয়া ইহার নিষ্পত্তি করো। অর্থাৎ আট জন লোককে বাছিয়া লইয়া তাহাদের হাতে নিষ্পত্তির ভার দাও। ৮ জন বড়ো বড়ো ভিক্ষু বাছিয়া লওয়া হইল। ইঁহাদের সকলেরই বয়স এক শতের উপর। ইঁহারা সকলেই তথাগতকে দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলেই দশবস্তুর বিরুদ্ধে মত দিলেন। ক্রমেই সে মত প্রচার হইল। যাঁহারা সে মত গ্রহণ করিলেন, তাঁহাদের নাম হইল স্থবিরবাদী অথবা থেরাবাদী। যাঁহারা গ্রহণ করিলেন না, তাঁহাদের নাম হইল মহাসাংঘিক। এইরূপে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর একশত বৎসর পরে দশটি সামান্য কথা লইয়া ঝগড়া হইয়া বৌদ্ধধর্মের দুই দল হইয়া গেল।

'নারায়ণ'
কার্তিক, ১৩২৩॥

বুদ্ধদেব কখন পরিনির্বৃত হন, তাহার দিন তারিখ ঠিক নাই। লঙ্কা-বাসীরা বলেন, তিনি খৃ. পূ. ৫৪৩ সালে নির্বাণ লাভ করেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বরাবর বলিয়া আসিতেছিলেন যে, এই গণনায় ৬৬ বৎসরের ভুল আছে। তাহার পরে কান্টন নগরে চীন দেশে একখানি কাঠের পাটা পাওয়া যায়, উহাতে কতকগুলি ফোঁটা দেখা যায়। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর দিন হইতে বছর বছর ঐ পাটা সিন্দুকের ভিতর হইতে মহাসমারোহে বাহির করিয়া মঠের ভিক্ষুরা উহাতে একটি করিয়া ফোঁটা দিতেন; ফোঁটা গুণিয়া বৎসর ঠিক করিয়া লইতেন। যখন লেখার ব্যবহার অধিক হয় নাই, তখন অনেক লোকেই ফোঁটা দিয়া হিসাব রাখিতেন; আমরাও বালককালে দেখিয়াছি, পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা ফোঁটা দিয়া ধোপার হিসাব, গোয়ালার হিসাব রাখিত। কান্টন নগরে যে পাটা পাওয়া যায়, তাহাতে ৯৭৫টি ফোঁটা ছিল এবং ৪৮৯ খৃ. সালে শেষ ফোঁটা দেওয়া হয়। সুতরাং ৯৭৫—৪৮৯=৪৮৬ খৃ. পূ. সালে বুদ্ধদেব নির্বাণ প্রাপ্ত হন। অনেক বাদানুবাদের পর ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, ৪৮৩ খৃ. পূ. সালেই তাঁহার নির্বাণ হয়।

ইহার পর একশত বৎসর বৌদ্ধদের মধ্যে কোনোরূপ দলাদলি হয় নাই। কিন্তু বৌদ্ধগণ যে বড়ো আনন্দে ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহাদের মধ্যে বিলক্ষণ গোলমাল ছিল। যেদিন বুদ্ধদেব মরেন, সেই দিনই সুভদ্দ নামে এক ভিক্ষু বলিয়া বসেন, "আঃ, বাঁচলাম, কঠোর শাসন হইতে আমাদের উদ্ধার হইল। এখন আমরা যা খুশি করিতে পারিব।" যাহা হউক, স্থবিরেরা একত্র হইয়া রাজগৃহের নিকট সপ্তপর্ণী গুহার সম্মুখে এক সংগীতি করিয়া সব গোলযোগ মিটাইয়া দেন ও বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য মহাকাশ্যপকে[১] সংঘথের করিয়া ধর্মশাসনের বন্দোবস্ত করেন। তদবধি একজন করিয়া সংঘথের থাকিতেন; তিনিই বৌদ্ধদের আপিল-কোর্ট ছিলেন। কোনো গোলযোগ হইলে সকলে তাঁহার নিকট গিয়া পড়িতেন। তিনি যাহা বলিতেন, কাজ সেইরূপ হইত।

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর একশত বৎসর পরে অর্থাৎ খৃস্টের ৩৮৩ বৎসর পূর্বে, সর্বকামী সংঘথের ছিলেন। তাঁহার সময়ে "দশবস্তু" লইয়া বৈশালীর বজ্জিপুত্তদের সঙ্গে যে দলাদলি হয়, সেকথা পূর্বেই বলা হইয়াছে ; তক্ষশিলা হইতে রেবত আসিয়া "উব্বাহিকা" করিয়া যেরূপে দলাদলি মিটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেকথাও বলা হইয়াছে। থেরাবাদীরা বলেন, তাঁহাদের দিকে ১১,৯০,০০০ ভিক্ষু ছিল ; আর বৈশালীওয়ালাদের পক্ষে ১০,০০০ মাত্র। একথা ঠিক বিশ্বাস হয় না। কারণ, বৈশালীওয়ালারা নাম লইল "মহাসাংঘিক"। এত কম হইলে তাহারা কোন্ সাহসে এত বড়ো নাম লইবে ? আর অশোকের পূর্বে এগারো লক্ষ ভিক্ষু থাকাও বড়ো সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের বোধ হয়, সংখ্যায় বিরুদ্ধ দলই বড়ো ছিল ; কিন্তু বয়স, বিজ্ঞতা, বিদ্যা, বুদ্ধি, পসার-প্রতিপত্তিতে থেরাবাদীরা বড়ো ছিল। থেরাবাদীদের ইতিহাস পালিগ্রন্থে পাওয়া যায়, কিন্তু মহাসাংঘিকদের ইতিহাস নাই বলিলেই হয়। চীনদেশে যে ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহা কনিষ্কের সময় হইতেই বিশ্বাসযোগ্য ; কারণ, তাঁহার সময়ই চীনে বৌদ্ধধর্মের প্রথম প্রবেশ হয়। খৃ. পূ. ৩৮৩ হইতে খৃ. ৭৮ পর্যন্ত মহাসাংঘিকদের ইতিহাস অন্ধকার। অশোকের রাজত্বের ১৭ বৎসরে পাটলিপুত্রে যে সংগীতি হয়[২], মহাসাংঘিকেরা তাহার অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। কনিষ্কের সময় জলন্ধরে যে সংগীতি হয়[৩], থেরাবাদীরাও আবার তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। যাহা হউক, দ্বিতীয় সংগীতি ৩৮৩ হইতে অশোকের সংগীতি পর্যন্ত মহাসাংঘিকদের ছয়টা দল হয় ও থেরাবাদীদের ১২টা দল হয়। সর্বসুদ্ধ ১৮টা দল হইয়া বৌদ্ধেরা একপ্রকার লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়। অশোকের অনুগ্রহ পাইয়া থেরাবাদীরা প্রবল হইয়া উঠিল। মহাসাংঘিকদের যে কী দশা হইল, তাহার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। তাহারা বোধ হয় চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল।

ইহার পরই ৪০/৫০ বৎসরের মধ্যে মৌর্যরাজাদের বিশাল সাম্রাজ্য ভাঙিয়া গেল। যিনি ভাঙিলেন, তিনি শুঙ্গ গোত্রের একজন সামবেদী ব্রাহ্মণ। তাঁহার নাম পুষ্যমিত্র।[৪] প্রাচীন পুঁথিতে ষ্য ও ষ্প প্রায়ই সমান, সেইজন্য অনেকে মনে করেন যে, তাঁহার নাম পুষ্পমিত্র। তিনি বৌদ্ধদের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। তিন-চারি

শত বৎসর পরে যেমন রোমান সাম্রাজ্যে খৃশ্চিয়ানদিগের উপর অত্যাচার হইত, পুষ্পমিত্র সেইরূপ আরম্ভ করিলেন ; তিনি বিধর্মী ও সমাজদ্রোহী বলিয়া অনেক বৌদ্ধের প্রাণসংহার করিলেন। বৌদ্ধেরা তাঁহার নাম পর্যন্ত মুখে আনিত না, মুখে আসিলেও গালি দিত। এ অত্যাচার হইতে মহাসাংঘিক দল অনেকটা রক্ষা পাইয়াছিলেন। কারণ— যাহাদের কথায় অশোক যজ্ঞে পশুহত্যা নিষেধ করিয়া সকল ব্রাহ্মণের, বিশেষত সামবেদী ব্রাহ্মণের, মনে দারুণ আঘাত দিয়াছিলেন, তাঁহার রাগটা তাহাদেরই উপর অধিক পড়িয়াছিল। এদিকে আবার থেরাবাদীদের নির্যাতনে মহাসাংঘিকেরা কতকটা হিন্দুদের দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা বুদ্ধদেবকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া মনে করিতেন। বুদ্ধদেব আশি বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন, একথা তাঁহারা মনেও করিতে পারিতেন না। তাঁহারা বলিতেন, তিনি কোনো অনির্বচনীয় ভাবে আছেন। যত দূর দেখা যাইতেছে, তাঁহারাই প্রথমে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করিয়া বিহারে স্থাপিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পুঁথি-পাঁজি সংস্কৃত-মিশ্রিত ভাষায় লেখা হইত। তাঁহারা বুদ্ধদেবকে "মহাবস্তু" বলিয়া মনে করিতেন। থেরাবাদীরা বিনয়ের কঠোর শাসনে বদ্ধ ছিলেন। ইঁহারা তো গোড়া হইতেই সে শাসনের কঠোরতা নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহারা দর্শনশাস্ত্রের দিকে অধিক ঢলিয়া পড়িলেন।

থেরাবাদীরা মনে করিতেন, বিনয়ের নিয়ম রক্ষা করিতে করিতে তাঁহাদিগের চরিত্র বিশুদ্ধ হইবে এবং চরিত্র বিশুদ্ধ হইলে তাঁহারা অনেক জন্মের পর এমন অবস্থায় আসিয়া পড়িবেন যে, মুক্তির পথ হইতে তাঁহাদিগকে আর ফিরিতে হইবে না। এইরূপ অবস্থাকে তাঁহারা স্রোতাপত্তি বলিতেন অর্থাৎ স্রোতে পড়িলে যেমন মানুষ আর ফিরে না, ক্রমেই একদিকে ভাসিয়া যায়, সেইরূপ তাঁহারাও নির্বাণের দিকে ভাসিয়া যাইবেন। আরো কিছুদিন পরে তাঁহারা এমন অবস্থায় আসিয়া পড়িবেন যে, তাঁহাদিগকে আর একবার মাত্র জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। ইহাকে তাঁহারা সকৃদাগামী অবস্থা বলিতেন। আরো অগ্রসর হইলে তাঁহাদের আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না, ইহার নাম অনাগামী অবস্থা ; ইহার পর তাঁহারা অর্হৎ[৫] হইবেন। কিন্তু তাঁহারা মুক্তি পাইবেন-না, অর্হৎ হইয়া বসিয়া থাকিবেন। আবার নূতন বুদ্ধ আসিলে তাঁহারা

সেই বুদ্ধের উপদেশ শুনিয়া নির্বাণ প্রাপ্ত হইবেন অর্থাৎ নিবিয়া যাইবেন। তাঁহারা আর জন্মগ্রহণ করিবেন না। তাঁহারা জন্ম-জরা-মরণের হাত হইতে একেবারে নিষ্কৃতি পাইবেন। তাঁহারা কর্মের দ্বারাই মুক্তি হয় ভাবিতেন। মহাসাংঘিকেরা মনে করিতেন, বিনয় প্রথম প্রথম কতকটা দরকার হয় বটে, কিন্তু যেমন পাটলিপুত্র হইতে কোনো বণিক যদি বাণিজ্য করিতে যায়, সে প্রথম ঘোড়া হাতি উটের পিঠে ও গাড়িতে মাল চাপাইয়া বরাবর গিয়া তাম্রলিপ্তিতে উপস্থিত হয় ; সেখানে গিয়া দেখে যে, আর হাতি ঘোড়া উটও চলিবে না, গাড়িও চলিবে না, এখন নূতন যানবাহনের প্রয়োজন, এখন নৌকা চাই, দাঁড় চাই, হাল চাই, পাল চাই ; তেমনি চরিত্রবলে কর্মবলে কতকদূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা এমন স্থানে উপস্থিত হন যে, কর্ম, চরিত্র, বিনয়ে তাঁহাদের কোনোই সাহায্য হয় না, তখন জ্ঞান চাই ; সেই জ্ঞানলাভের উপায় স্বতন্ত্র— উপকরণ স্বতন্ত্র।

গোড়ায় কথা উঠিয়াছিল, বুদ্ধদেব লৌকিক অপর মানুষের মতো, না অলৌকিক, কেমন দেবতা ? থেরাবাদীরা বলিতেন, তিনি মানুষ, মহাসাংঘিকেরা বলিল, দেব। তিনি অলৌকিক শব্দ ব্যবহার করিতেন না। বলিতেন, লোকোত্তর, তাই মহাসাংঘিকদের আর-এক নাম হইল লোকোত্তরবাদী। 'মহাবস্তু'তে আছে, "অর্য্যমহাসাঙ্ঘিকানাং লোকোত্তর-বাদিনাং পাঠেন" ইত্যাদি। তাঁহারা বলিতেন, বুদ্ধদেবের কোনো আশ্রব ছিল না, অর্থাৎ কোনো দোষ ছিল না। অর্থাৎ তাঁহার অহংবুদ্ধি ছিল না, অজ্ঞান ছিল না, এবং জন্মমৃত্যুর তিনি অতীত ছিলেন। থেরা-বাদীরা বলিত, প্রথম দুইটি কথা ঠিক হইতে পারে, কিন্তু শেষটি ঠিক হইল কেমন করিয়া ? তাহা হইলে তিনি মরিবেন কেন ? তিনি যখন মানুষ হইয়া জন্মিয়াছিলেন, তখন মানুষের মতো তাঁহার সবই ছিল। নহিলে তাঁহাকে দেখিয়া কাহারো রাগ হইত, কাহারো ঈর্ষা হইত, কাহারো দ্বেষ হইত কেন ? সুতরাং তোমার আমার মতো তিনি মানুষ ছিলেন, তাঁহার আশ্রবও ছিল। মহাসাংঘিকেরা বলিতেন, বুদ্ধদেব কখনো একটি বৃথা কথা কহেন নাই, তিনি যাহাই বলিতেন, তাহাতেই উপদেশ পাওয়া যাইত। তিনি নিরন্তরই লোকের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিতেন, লোকের উদ্ধার ছাড়া তাঁহার আর কাজই ছিল না। শোওয়া,

বসা, দাঁড়ানো ও পাইচারি করা এই চারিটিকে ঈর্ষ্যাপথ বলে, বুদ্ধদেব যে কোনো ঈর্ষ্যাপথেই থাকুন, তাঁহার দ্বারা কেবল লোকের উপকারই হইত। থেরাবাদী বলিতেন, একথা আদৌ সত্য নহে, তিনি মানুষ ছিলেন, মানুষের মতো তাঁহাকে খাওয়া দাওয়া করিতে হইত, পাইচারি করিতে হইত, দাঁতন করিতে হইত, স্নান করিতে হইত ; এই-সকলের জন্য লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে হইত, হুকুম করিতে হইত। এ-সকলের দ্বারা লোক উদ্ধার হইবে কিরূপে ? তিনি অযথা কথা কহিতেন না, বাজে কথা কহিতেন না সত্য, কিন্তু তাঁহার সকল কথায়ই যে লোক উদ্ধার হইত, এটা বড়ো বেশি কথা। মহাসাংঘিকেরা বলিতেন, বুদ্ধদেবের ঘুম ছিল না, সুতরাং স্বপ্নও ছিল না। থেরাবাদীরা বলিতেন, স্বপ্ন ছিল কিনা জানি না, কিন্তু তিনি তো মানুষ, ঘুম ছিল না, সে কী কথা ? মহাসাংঘিকেরা বলিতেন, বুদ্ধদেব নিরন্তরই সমাধিমগ্ন থাকিতেন ; সুতরাং কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাকে ভাবিতে হইত না। তিনি একেবারেই তাহার জবাব দিতে পারিতেন ও দিতেন। থেরাবাদীরা বলিতেন, তাঁহাকেও ভাবিয়া জবাব দিতে হইত।

থেরাবাদীরা বলিত, কই, বুদ্ধদেব তো নিজে কখনো বলেন নাই যে, তিনি লোকোত্তর, তবে তোমরা তাঁহাকে "লোকোত্তর" "লোকোত্তর" বলিয়া গোল করো কেন ? তাঁহার মতে, যাহা পরমার্থ, তাহাই তিনি শিখাইতেন, তিনি তো কখনো বলেন নাই যে, তিনি অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়া এই-সকল সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতির ফলে পরমার্থ লাভ করিয়াছিলেন, শিষ্যদিগকেও তাহাই উপদেশ দিতেন। মহাসাংঘিকেরা বলিতেন, সত্য, কিন্তু পড়ো দেখি বুদ্ধের উপদেশ, পড়ো দেখি তাঁহার সূত্রান্ত, দেখো দেখি, তাহাতে কত গভীর ভাব, কত গভীর উপদেশ, কত গূঢ় তত্ত্বকথা আছে। সাধারণ মানুষের সাধ্য কী সেসব কথা কয়, সেসব ভাব মনে ধারণা করে, সেসব গূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কার করে। এই-সকল কথা লইয়া প্রথম দলাদলি হইতেই বৌদ্ধদের মধ্যে ঝগড়া হইত। শেষ এই-সকল কথা হইতেই মহাসাংঘিক ধর্মের উৎপত্তি হয়।

'নারায়ণ'
মাঘ, ১৩২৩ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য।

১. এই বইয়ের পৃ. ১৮১ সূত্র ৪ দ্র.

২. এই বইয়ের পৃ. ৩৪৯ সূত্র ৬ দ্র.

৩. এই বইয়ের পৃ. ৩৫২ সূত্র ৮ দ্র.

৪. এই বইয়ের পৃ. ৩৪৯ সূত্র ৭ দ্র.

৫. এই বইয়ের পৃ. ২৭৪ সূত্র ৪ দ্র.

১৫. থেরাবাদ ও মহাসাংঘিক

সংস্কৃতে নিদান শব্দের অর্থ আদিকারণ, মূলকারণ, একেবারে গোড়া। বৈদ্যেরা রোগের নিদান খোঁজেন অর্থাৎ মূল কারণ খোঁজেন, তাহার পরে চিকিৎসা করেন। আমরাও সংসার-যাত্রায় সকল ব্যাপারেরই আদি কী দেখিতে চাই। বৌদ্ধেরা যখন সংসারের মূল খুঁজিতে যান, তখন অবিদ্যা, সংস্কার-বিজ্ঞান, নাম-রূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরা, মরণ, এই বারোটি সংসারের নিদান বলিয়া দেখেন। যখন বুদ্ধদেবের নিদান খুঁজিতে যান, তখন তিনি পূর্ব পূর্ব জন্মে বুদ্ধ হওয়ার জন্য কী কী করিয়াছিলেন, তাহাই খোঁজেন। এই বুদ্ধনিদান সম্বন্ধে থেরাবাদীদের ও মহাসাংঘিকদের বিশেষ মতান্তর। থেরাবাদীরা চব্বিশটি বৈ বুদ্ধ মানেন না, ইঁহাদিগের প্রথম হইতেছেন দীপংকর ও শেষ হইতেছেন কাশ্যপ। তাঁহাদিগের নামগুলি এই—১. দীপংকর, ২. কৌণ্ডিন্য, ৩. মঙ্গল, ৪. সুমনস, ৫. রেবত, ৬. শোভিত, ৭. অনোমদর্শিন্, ৮. পদ্ম, ৯. নারদ, ১০. পদ্মোত্তর, ১১. সুমেধাঃ, ১২. সুজাত, ১৩. প্রিয়দর্শিন্, ১৪. অর্থদর্শিন্, ১৫. ধর্মদর্শিন্, ১৬. সিদ্ধার্থ, ১৭. তিষ্য, ১৮. পুষ্য, ১৯. বিপশ্যী, ২০. শিখী, ২১. বিশ্বভু, ২২. ক্রকুচ্ছন্দ, ২৩. কনকমুনি, ২৪. কাশ্যপ। ইঁহাদিগের মধ্যে যিনি যিনি শাক্যমুনি বুদ্ধ হইবেন বলিয়া ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়া গিয়াছেন, তিনি তিনিই শাক্যমুনি বুদ্ধের নিদান।[১]

দীপংকর তাঁহার এক শিষ্য মেঘ নামে এক বামনের ছেলেকে বলিয়াছিলেন, অনাগত অধ্বা অর্থাৎ ভবিষ্যকালে তুমি শাক্যমুনি নামে বুদ্ধ হইবে, কপিলবাস্তু তোমার জন্মভূমি হইবে, শুদ্ধোদন তোমার পিতা হইবেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। এই চব্বিশ জনের মধ্যে আরো ২/৪ জন, শাক্যমুনি সম্বন্ধে ২/৪ কথা বলিয়া গিয়াছেন। চব্বিশ জনের শেষ বুদ্ধ কাশ্যপ বলিয়াছিলেন, হে শিষ্য জ্যোতিষ্পাল, আমার পরেই ভবিষ্যতে তুমি শাক্যমুনি বুদ্ধ হইবে।

এই হইল থেরাবাদ মতে শাক্যসিংহের নিদান। এ মতে বুদ্ধ চব্বিশ জন কেন হইলেন, বুঝিতে পারা যায় না। বোধ হয়, সেকালের

লোকে, চব্বিশ সংখ্যাটা বড়ো ভালোবাসিত। থেরাবাদীদের তো চব্বিশ জন বুদ্ধ ছিলেন, জৈনদের চব্বিশ জন তীর্থংকর, সাংখ্যদের চব্বিশটি তত্ত্ব, কোনো কোনো পুরাণেও ভগবানের অবতার চব্বিশটি, আমরা যে-সকল মুনিদের মত লইয়া চলি, তাঁহাদেরও সংখ্যা চব্বিশ। 'চতুর্বিংশতি-মুনিমতম্' নামে একখানি প্রাচীন স্মৃতি-সংগ্রহ আছে।

মহাসাংঘিকদের মতে বুদ্ধনিদান অন্যরূপ। তাঁহাদের মতে বোধি-সত্ত্বগণের চারি প্রকার চর্যা অর্থাৎ আচার আছে। এক-এক চর্যায় কত শত জন্ম-জন্মান্তর চলিয়া যায়। থেরাবাদীরা যাহা বলিতেছেন, তাহা শেষ চর্যার শেষ অংশ মাত্র; পূর্ব তিনটি চর্যার নামও ইহাতে নাই। চর্যা চারিটির নাম— ১. প্রকৃতিচর্যা, ২. প্রণিধানচর্যা, ৩. অনুলোমচর্যা, ৪. অনিবর্তনচর্যা। প্রকৃতিচর্যায় বোধিসত্ত্ব মাতৃভক্ত, পিতৃভক্ত, শ্রমণ ও ব্রাহ্মণে ভক্তিমান্, কুলজ্যেষ্ঠের প্রতি ভক্তিমান্, দশ কুশলকর্মপথের পথিক, লোককে সর্বদাই দান করিতে, পুণ্যকর্ম করিতে উপদেশ দেন, বুদ্ধদিগের পূজা করেন; কিন্তু তাঁহার মন এখনো বোধি লাভের জন্য লালায়িত নয়। ইহার পরে প্রণিধানচর্যা অর্থাৎ আমাকে বুদ্ধ হইতেই হইবে, ইহা বলিয়া প্রতিজ্ঞা করা। এই প্রণিধানচর্যায় পাঁচটি অংশ আছে, এক-একটির নাম প্রণিধি। প্রথম প্রণিধি— আমি বুদ্ধ হইব। দ্বিতীয় প্রণিধি— আমি বুদ্ধকে অনেক বস্তু দান করিলাম। তৃতীয় প্রণিধি— যত কালই যাউক, তাহাতে কিছু ক্ষতি নাই, আমাকে বুদ্ধ হইতেই হইবে। চতুর্থ প্রণিধি— বুদ্ধ ও সংঘের জন্য অনেক গুহা, অনেক বিহার দান করা। পঞ্চম প্রণিধি— জগৎ অনিত্য এইটি বুঝিতেই হইবে।

ইহার পর তৃতীয়, অনুলোমচর্যা। প্রণিধানচর্যার অনুকূল যাহা-কিছু করিতে হয়, তাহা এই চর্যায়ই করিতে হয়। চতুর্থ, অনিবর্তনচর্যা, এই চর্যায় বোধিলাভের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ চিত্ত আর অন্য দিকে ফিরিয়া আসিতে চাহে না, এই চর্যায়ই ব্যাকরণ। এই ব্যাকরণ শব্দের অর্থ গ্রামার নহে, ইহার নাম ব্যাখ্যা অথবা ভবিষ্যদ্‌বাণী। অর্থাৎ কোনো বুদ্ধ তাঁহার শিষ্য বোধিসত্ত্বকে বলিয়া দেন, তুমি ভবিষ্যতে কোনো-না-কোনো সময়ে বুদ্ধ হইবে। থেরাবাদীদের নিদান এই ব্যাকরণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, উহা এক প্রকার শেষ চর্যার নিদান।

তবে মহাসাংঘিকদের নিদান কিরূপ? চারি চর্যায় অসংখ্য নিদান।

শাক্যসিংহের প্রকৃতিচর্যার নিদান অপরিমিতধ্বজ বুদ্ধ। তখন আমাদের শাক্যমুনি একজন চক্রবর্তী রাজা ছিলেন। তিনি ভগবানের নিকটে উপস্থিত হইয়া দশ কুশলকর্মপথের পথিক হন, বৌদ্ধ ভাষায় দশ কুশল-কর্মের গোড়া গাড়েন। প্রণিধানচর্যায় আমাদের শাক্যমুনি বুদ্ধের নিদান একজন অতীত শাক্যমুনি বুদ্ধ। আমাদের শাক্যমুনি তখন বণিকশ্রেষ্ঠী ছিলেন, তিনি বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমিও একদিন শাক্যমুনি নামে বুদ্ধ হইব, আমারো একদিন কপিলবাস্তু নামে নগর হইবে। অনুলোমচর্যায় শাক্যমুনির নিদান সমিতাবী বুদ্ধ। তখন শাক্যমুনি একজন চক্রবর্তী রাজা ছিলেন। অনিবর্তনচর্যায় শাক্যমুনির অনেক নিদান; তন্মধ্যে দীপংকর তাঁহার ব্যাকরণ করিয়াছিলেন। দীপংকরের পরে আরো অনেক বুদ্ধ সেই ব্যাকরণের অনু-ব্যাকরণ করিয়াছিলেন। সর্বাভিভু ভগবান বুদ্ধ অনু-ব্যাকরণ করিয়াছিলেন। বিপশ্যী, ক্রকুচ্ছন্দ, কাশ্যপ শাক্যমুনির ব্যাকরণ করিয়াছিলেন। কাশ্যপ আবার বলিয়াছিলেন, তোমায় আমি যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলাম।

যৌবরাজ্যে অভিষেক থেরাবাদীদের নাই, চব্বিশ জনের অধিক বুদ্ধও নাই, কিন্তু মহাসাংঘিকদের মতে সহস্র সহস্র বুদ্ধ। 'মহাবস্তু অবদানে'র[২] আদিতেই "নিদাননমস্কারাণি সমাপ্তানি" বলিয়া একটি ছোট্ট প্যারাগ্রাফ আছে। প্যারাগ্রাফ বলি কেন? অধ্যায় বলিতে পারি না, অত বড়ো নয়। সেই প্যারাগ্রাফে যে কয়েকটি নিদানের নাম আছে, তাহাই আমরা পূর্বে দিয়াছি। কিন্তু বই পড়িতে পড়িতে অনেক বুদ্ধের নাম পাওয়া যায়। একটু উদাহরণ দিতেছি। মহাবস্তুর মূল গদ্যে, কিন্তু তাহার আবার মূল পদ্যে বা গাথায় আছে, তাহারই কয়েকটি তুলিয়া দিতেছি—

> শাক্যমুনিনামকানামুপস্থিতাস্ত্রিংশ কোটিয়ো জিনানাং।
> অষ্টশতসহস্রাণি দীপঙ্করনামধেয়ানাং ॥ ১ ॥
> ষষ্টিং চ সহস্রাণি প্রদ্যোতনামধেয়ানাং * * *।
> তথ পুষ্পনামকানাং ত্রয়ো কোটিয়ো বাদিসিংহানাং ॥ ২ ॥
> অষ্টাদশ সহস্রাণি মারধ্বজনামকানাং সুগতানাং।
> যত্র চরে ব্রহ্মচর্য্যং সর্বজ্ঞতামভিলাষায় ॥ ৩ ॥

পূজয়ি পঞ্চশতানি পদ্মোত্তরনামকানাং সুগতানাং।
কৌণ্ডিন্যনামকানামপরাণি দ্বি সহস্রাণি ॥ ৪ ॥
অপরিমিতাসংখ্যেয়া প্রত্যেকজিনান কোটিনযুতাং চ।
পূজয়ি বুদ্ধসহস্রং জম্বুধ্বজনামধেয়ানাং ॥ ৫ ॥
চতুরশীতি সহস্রাণি ইন্দ্রধ্বজনাম[কানাং] সুগতানাং।
নবতিং চ সহস্রাণি কাশ্যপসহনামধেয়ানাং ॥ ৬ ॥
পঞ্চদশ বুদ্ধসহস্রাণি প্রতাপনামকানাং সুগতানাং।
পঞ্চদশ চ সহস্রাণি আদিত্যনামধেয়ানাং ॥ ৭ ॥
দ্বাষষ্টিং চ শতানি সুগতানামন্যোন্যনামধেয়ানাং।
চতুঃষষ্টিং চ সহস্রাণি সমিতাবিনামধেয়ানাং ॥ ৮ ॥
এতে চ কোলিতশিরী অন্যে চ দশবলা অপরিমাণা।
সর্বে অনিত্যতায় সমিতা লোকপ্রদ্যোতা ॥ ৯ ॥
যানি চ বলানি কোলিত তেষাং মহাপুরুষলক্ষবরাণাং।
সর্বে অনিত্যতায় কালং ন উপেন্তি সংখ্যাং চ ॥ ১০ ॥
জ্ঞাত্বানানিত্যবলং সুদারুণং সংকৃতস্য অনন্তরং।
বীর্যারম্ভ যোজিতো অনিত্যবলস্য বিঘাতায় ॥ ১১ ॥[৩]

[শুদ্ধাবাসদেবনিকায়ে প্রস্থানং মৌদ্গল্যায়নস্য]

মহাসাংঘিকদের সংখ্যাটা খুব লম্বা লম্বা। কথায় কথায় তিন কোটি, চারি কোটি. নব্বই হাজার, বিশ হাজার, চৌরাশি হাজার বুদ্ধের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। গরিব থেরাবাদীদের অত লম্বা-চৌড়া ছিল না। এদিকে যেমন সংখ্যায় লম্বা-চৌড়া, কালের পরিমাণেও মহাসাংঘিকেরা সেইরূপ লম্বা-চৌড়া। নবনবতিকোটিকল্প মহাযানীরা কথায় কথায় বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের পূর্বপুরুষ মহাসাংঘিকেরাও বড়ো কম যান না। সমিতাবী নামে একজন বুদ্ধ দেখিলেন, আমি নির্বাণ প্রাপ্ত হইলে, এককল্প দু কল্প কোনো বুদ্ধ হইবেন না, সহস্র কল্পের পরে বুদ্ধ হইবেন। কিন্তু এত কাল ধরিয়া তো বুদ্ধ-কার্য হওয়া চাই। বুদ্ধ হইবে না ; তো, কে করিবে ? অতএব আমাকেই থাকিতে হইল। তিনি শত সহস্র কল্প রহিলেন। পূর্বে বলিয়াছিলেন, সহস্র কল্পের পর বুদ্ধ হইবেন,

এখন শত সহস্র কল্প রহিয়া গেলেন ! মাঝের ও শতটা যেন কিছুই নয় !

জাপানদেশী সুজুকি সাহেব যে লিখিয়াছেন, অল্পবয়স্ক ভিক্ষুরা বুদ্ধদেব আশি বৎসরে মরিয়া গেলেন বলিয়া বড়োই দুঃখিত হইয়াছিলেন, বুদ্ধদেব তো মনে করিলেই এককল্প দুই কল্প থাকিতে পারিতেন, থাকিলেন না কেন ? থেরাবাদীরা বলিলেন, তিনি মরিয়াছেন। অনেক বিবুদ্ধবাদীরা বলিলেন, না, তিনি মরেন নাই, মরিবেনও না, তিনি মৃত্যুর ভান করিয়াছেন মাত্র। কোনো কোনো মহাযানের বইয়ে আছে, সমুদ্রের জলবিন্দু বরং গণিয়া উঠা যায়, সুমেরু গুঁড়াইয়া সরিষার মতো করিয়া ফেলিলে সে সরিষাও গণিয়া উঠা যায়, কিন্তু শাক্যমুনির বয়স গণিয়া উঠা যায় না।

যাহা হউক, বুদ্ধ-নিদান লইয়া এই দুই দলে যে মতান্তর ছিল, তাহার ব্যাখ্যা করা গেল। আরো অনেক জিনিস লইয়া মতান্তর আছে, পরে দেখা যাইবে। তবে একটা কথা এখানে বলিয়া রাখি, পালি জাতকে বুদ্ধদেবের নিদানের কথা চারি দিকে ছড়াইয়া আছে, 'মহাবস্তুতে' সেগুলি একত্র করিয়া একটা ধারা বাঁধিয়া লেখা আছে। ধারা এই যে, চারি চর্যায় যতগুলি নিদান আছে, চর্যাক্রমে সেগুলিকে সাজানো হইয়াছে। কালের পরিমাণ যতই লম্বা-চৌড়া হউক, সময়ানুসারে সেগুলিকে সাজানো হইয়াছে। থেরাবাদীরা "বুদ্ধায় নমঃ" বলিলেই যথেষ্ট মনে করেন, কিন্তু ইঁহারা গোড়ায়ই আরম্ভ করিলেন, "ওঁ নমঃ শ্রীমহাবুদ্ধায়াতীতানাগতপ্রত্যুৎপন্নেভ্যঃ সর্ব্ববুদ্ধেভ্যঃ", অর্থাৎ তাঁহারা এক বুদ্ধকে নমস্কার করিয়া সন্তুষ্ট নহেন, তাঁহারা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালে যত বুদ্ধ হইয়া গিয়াছেন, হইবেন ও হইতেছেন, সকল বুদ্ধকে নমস্কার করিতেছেন। থেরাবাদীরা চব্বিশ ও দুই (শাক্যসিংহ ও মৈত্রেয়) এই ছাব্বিশজনেই সন্তুষ্ট, কিন্তু মহাসাংঘিকেরা "ছাব্বিশকোটিনিযুতশতসহস্রে"ও সন্তুষ্ট নহেন !

নিদান-নমস্কারে প্রকৃতিচর্যায় ভগবান্ শাক্যসিংহ একজন মাত্র, অর্থাৎ অপরিমিতধ্বজ বুদ্ধের নিকটে ধর্মের গোড়া গাড়িয়াছিলেন, কিন্তু কেবল সংক্ষেপের জন্য সেখানে একজনের নাম করা হইয়াছে।

বহুতর বুদ্ধের নিকটেই তিনি ধর্মের গোড়া গাড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম বিস্তার করিয়া দেওয়া আছে। যথা—

"এবমুক্তে আয়ুষ্মান্ মহাকাশ্যপ আয়ুষ্মন্তং মহাকাত্যায়নমুবাচ। ভগবতা ভো জিনপুত্র সম্যক্‌সংবুদ্ধেন শাক্যমুনিনা প্রথমা দ্বিতীয়া তৃতীয়া চতুর্থা পঞ্চমা ষষ্ঠা সপ্তমাসু ভূমিষু বর্ত্তমানেন যেষু সম্যক্‌সংবুদ্ধেষু কুশলমবরোপিতং, তেষাং সম্যক্‌সংবুদ্ধানাং, কানি নামানীতি। এবমুক্তে আয়ুষ্মান্ মহাকাত্যায়ন আয়ুষ্মন্তং মহাকাশ্যপমুবাচ॥ যেষু ভো ধৃতধর্ম্মধর সম্যক্‌সংবুদ্ধেষু ভগবতা শাক্যবংশপ্রসৃতেন কুশলমূল-বরোপিতং। তেষাং বিপুলবলবরকীর্ত্তিনাং নামানি শৃণু॥[৪]

"প্রথমতঃ সত্যধর্ম্মবিপুলকীর্ত্তিঃ, ততঃ সুকীর্ত্তিঃ, লোকাভরণঃ, বিদ্যুৎপ্রভঃ, ইন্দ্রতেজঃ, ব্রহ্মকীর্ত্তিঃ, বসুন্ধরঃ, সুপার্শ্বঃ, অনুপবদ্যঃ, সুজ্যেষ্ঠঃ, সৃষ্টরূপঃ, প্রশস্তগুণরাশিঃ, মেঘস্বরঃ, হেমবর্ণঃ, সুন্দরবর্ণঃ, মৃগরাজঘোষঃ, আশুকারী, ধৃতরাষ্ট্রগতিঃ, লোকাভিলাষিতঃ, জিতশত্রুঃ, সুপূজিতঃ, যশোরাশিঃ, অমিততেজঃ, সূর্য্যগুরুঃ, চন্দ্রভানুঃ, নিশ্চিতার্থঃ, কুসুমগুপ্তঃ, পদ্মাভঃ, প্রভংকরঃ, দীপ্ততেজঃ, সপ্তরাজাঃ, গজদেবঃ, কুঞ্জরগতিঃ, সুঘোষঃ, সমবুদ্ধিঃ, হেমবর্ণ-লম্বদামঃ, কুসুমদামঃ, রত্নদামঃ, অলংকৃতঃ, বিমুক্তঃ, ঋষভগামী, ঋষভঃ, দেবসিদ্ধিমাত্রঃ, সুপাত্রঃ, সর্ব্ববন্দ্যঃ, রত্নমকুটঃ, চিত্রমকুটঃ, সুমকুটঃ, বরমকুটঃ, চলমকুটঃ, বিমলমকুটঃ, লোকংধরঃ, বিপুলোজঃ, অপরিভিন্নঃ, পুণ্ডরীকনেত্রঃ, সর্ব্বসহঃ, ব্রহ্মগুপ্তঃ, সুব্রহ্মা, অমরদেবঃ, অরিমর্দ্দনঃ, চন্দ্রপদ্মঃ, চন্দ্রাভঃ, চন্দ্রতেজঃ, সুসোমঃ, সমুদ্রবুদ্ধিঃ, রতনশৃঙ্গঃ, সুচন্দ্রদৃষ্টিঃ, হেমক্রোড়ঃ, অভিন্নরাষ্ট্রঃ, অবিক্ষিপ্তাংশঃ, পুরন্দরঃ, পুণ্যদত্তঃ, হলধরঃ, ঋষভনেত্রঃ, বরবাহুঃ, যশোদত্তঃ, কমলাক্ষঃ, দৃষ্টিশক্তিঃ, নরপ্রবাহঃ, প্রণষ্টদুঃখঃ, সমদৃষ্টিঃ, দৃঢ়দেবঃ, যশকেতুঃ, চিত্রচ্ছদঃ, চারুচ্ছদঃ, লোকপরিত্রাতা, দুঃখমুক্তঃ, রাষ্ট্রদেবঃ, রুদ্রদেবঃ, ভদ্রগুপ্তঃ, উদাগতঃ, অস্খলিতপ্রবরাগ্রঃ, ধনুনাসং, ধর্ম্মগুপ্তঃ, দেবগুপ্তঃ, শুচিগাত্রঃ, প্রহেতিঃ, প্রথমশতমার্য্যপক্ষস্য॥"

যেখানে একটি ছিল, সেখানে এই তো এক নিশ্বাসে সাতানব্বইটি নাম পাইলাম। গ্রন্থকার কিন্তু ইহাকেই একশত বলিয়াছেন, হয় তো লেখকের দোষে তিনটি নাম পড়িয়া গিয়াছে। আর-এক নিশ্বাসে আর-একশত নাম আছে। আরো এক নিশ্বাসে প্রায় আর-একশত

নাম আছে। ইহাতে তো "অষ্টমা ভূমি" শেষ হইল। আবার "নবমা ভূমি"তেও এইরূপ। সুতরাং লম্বা হাতে নাম বাড়াইতে মহাসাংঘিক মহাশয়েরা খুব মজবুত। ইঁহাদের সঙ্গে গরিব থেরাবাদীরা পারিবে কেন? কাজেই ক্রমে তাঁহাদিগকে ভারত ছাড়িতে হইয়াছে!

'নারায়ণ'
চৈত্র, ১৩২৩॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. এই বইয়ের পৃ. ৩০৮ সূত্র ১৯ দ্র.

২. রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* (১৮৮২ খৃ.) গ্রন্থে 'মহাবস্তু অবদান' অধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখা। এই অধ্যায়ের প্রথম বাক্যে শাস্ত্রীমশায় 'মহাবস্তু অবদান'কে বলেছিলেন, "A cyclopaedia of Buddhist legends and doctrines." বুদ্ধের জীবন-কথার সূত্রে 'মহাবস্তু অবদানে' গৌতম বুদ্ধের আগের বুদ্ধদের কথা, জাতক ও অন্যান্য অজস্র কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এরই সঙ্গে মিশে রয়েছে বৌদ্ধশিক্ষার মূল সূত্র এবং বৌদ্ধ আচরণ-বিধির বিশদ বিবরণ। ফলে 'মহাবস্তু অবদান' বৌদ্ধবিদ্যার একটি কোষগ্রন্থের রূপ পেয়েছে। এ কালের পাঠকের মনে হতে পারে গ্রন্থটির বস্তু বিন্যাসে কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই। বিভিন্ন অংশ শিথিল-বদ্ধ। প্রায়ই একই বিবরণ দু বার দেওয়া হয়েছে— গদ্যে এবং গাথায়। ভাষার দিক থেকেও গোটা 'মহাবস্তু'তে সমতা নেই। কোথাও কোথাও ভাষা সংস্কৃতের নিয়মে চলেছে, কোথাও নিয়ম লঙ্ঘন করেছে। শাস্ত্রী-মশায় গ্রন্থটির বিন্যাসে শিথিলতার কারণ ভিন্ন দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেছেন (নিচের উদ্ধৃতি দ্র.)। শাস্ত্রীমশায় মনে করতেন 'মহাবস্তু অবদান' তৃতীয়-দ্বিতীয় খৃস্টপূর্বাব্দের মধ্যে সংকলিত হয়েছিল। Maurice Winternitz বলেন, সম্ভবত দ্বিতীয় খৃস্টপূর্বাব্দেই সংকলনটির মূল কাঠামো প্রস্তুত হয়েছিল, চতুর্থ খৃস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত বা তার পরেও সেই কাঠামোয় নতুন নতুন বস্তু যোগ করা হয়।

বিমলাচরণ লাহার *A Study of the Mahāvastu* (1930) বইটির সমালোচনা-নিবন্ধে শাস্ত্রীমশায় 'মহাবস্তু অবদান' সম্পর্কে লেখেন—

"Of the manuscripts presented by Hodgson to the Asiatic Society of Bengal the biggest one was the *Mahāvastu Avadāna* which occupies in Rajendra

Lala's Nep. Bud. Lit. pp. 116-160. At the end of this abstract Rajendra Lala makes a note that Senart is preparing an edition of this work. That edition appeared in 1888 and in that year Senart came to Calcutta. I invited him to my place at Naihati but at the last moment his wife fell ill and he had to leave Calcutta without going to my place.

"When the edition appeared, it was found to be in a Sanskritic form of language the like of which is not to be found in any other work yet published. The language of the poetical pieces resembled that of the poetical pieces in *Lalitavistara* and also in *Saddharmapuṇḍarik*. But the prose of the *Mahāvastu* is also in a Sanskritic language but a bit different from that of the poetry. The language problem of the *Mahāvastu* is therefore a very important one and it should be carefully studied and analysed and a systematic grammar written about it. Much has been done in this direction by Oldenberg whose judgment and scholarship is admired by all scholars, European and Indian, but much yet remains to be done.

"The poetical pieces are generally a bit more ancient and they are given in support of the prose narration immediately after them; for instance, in the early part of the work *Mahāvastu*, there is a description of the hells in prose put into the mouth of Mahāmaudgalāyana who had the supernatural power of roaming all over the world from the lowest hell to the highest heaven of the Suddhāvāsa devas. After the short description in prose there is similar description in poetry but put into the mouth of the Buddha himself and the latter is quoted as a voucher of the former. This is one of the fruitful sources of repetition complained of by Berriedale Keith in the note

in the form of a foreward to Dr. B. C. Law's study of the *Mahāvastu.* But should we take it as a repetition ? If the poetry is not repeated no one would believe the statements in prose. If these are tedious repetitions, they are not only to be tolarated but also welcomed as an honest attempt to give the tradtiion of the work. There are other repetitions, too, but a scholarly spirit should seek to justify them and not scare away students by decrying them.

"The name *Mahāvastu,* means 'the great thing', 'the great subject' and the great subject is treated from the beginning to the end in a systematic order. The order is indicated in the Nidāna or introductory summary, ...The great thing is the Buddha's spirit which gradually developed in cycles after cycles of years beginning with Aparājitadhvaja to the end of Buddha's ministry and the conversion of his disciples.

"In the Vedic literature especially in the *Yajurveda* the mantras are sometimes separated from the *Brāhamaṇas* as in the white *Yajurveda.* But in the black *Yajurveda* they are so mixed up that some of the Śākhās are likened to a vomit. The *Mahāvastu* when compared with other forms of Buddhist literature appeared to be so mixed up as to resemble a vomit. It has jātakas, sūtras, vinaya narrations, udānas, all mixed up in one work while both in Sanskrit and in Pali they are different subjects and treated of in different works. This mixed *Mahāvastu* is rather a hard subject for study and though Senart's edition appeared in 1888, few have ventured to study in original Sanskrit.

"... I believe there is a fundamental misconception about the import of this work. The general idea is that it is the work of the Lokottaravādins

or those who thought Buddha to be a superhuman and supernatural being, forming a branch of the Mahāsāṅghikas. Not one sect only of the Mahāsāṅghikas thought him to be lokottara or superhuman but all the Mahāsāṅghikas always thought him to be so. The construction of the sentence, 'Āryamahāsāṅghikānāṁ lokottaravādināṁ madhyadeśikānaṁ pāṭhena vinayapiṭakasya mahavastue ādi', does not justify us in thinking that Lokottaravādins are a branch of the Mahāsaṅghikas. It rather leads us to think that all the Mahāsaṅghikas were Lokottaravādins. There is a list of the 18 sects which arose shortly after the split in the 2nd century after Buddha in the *Mahāvaṁsa* but the Lokottaravādins do not appear there. The *Kathavatthu* composed by monks assembled at the 3rd Buddhist Council at Paṭaliputta in the 17th year of the reign of Aśoka contains the doctrines of all the various Buddhist sects which existed at that time but there is no mention of any sect known as the Lokottaravādins. So Lokottaravādināṁ is not the name of a sect but it is an adjective of the Mahāsaṅghikas. If this is true, the attempt of bringing the *Mahāvattu* down to the 3rd century A.D. falls to the ground. The book was written at a period when supporting prose narations by ancient poetical pieces held its ground, i.e., at a time when books like the *Lalitavistara* the *Saddharmapuṇḍarika*, etc., were composed and the name of the Mahāsāṅghikas shows that it is at least earlier than these works, because these are pronounced Mahāyāna works while the *Mahāvastu* is not only not a Mahāyāna work but also a book of the Mahāsaṅghikas, and if we are to believe in Suzuki, the Mahāyāna developed from the Mahāsaṅghikas some centuries after their formation.

"The *Mahāvastu* is a great work not only because it is the history of Buddha for several cycles of kalpas but also for the great ideas of creation, of the origin of government and of other topics of supreme importance in ancient India. In the matter of creation it commences with the Suddhāvāsa Devas who are self-illuminating, self-mobilised, light, whose only food is prīti or love and who do not require the help of the sun or the moon to exhist in the world. This self-illuminating being roamed all over space and all over time at their own will without any let or hindrance. How in several kalpas they became human beings is a wonderful development and those who want to know the steps of development are recommended to read the section commencing with the Rājavaṁsa. The Rājavaṁsa had its origin not in any divine right but in a pure convention. The cultivators chose the strongest man, appointed him to protect their harvest and compensated him with a sixth of their produce. He is often called Gaṇa-dāsa or the servant of the people. The first king is called Mahāsammata or 'the Great Elected'; this is a theory of state built upon a pure convention not to be found in any other Indian literature. The descriptions of cities, gardens, palaces, processions, etc., are not only vivid and life-like but true so far as ancient India is concerned. Some of the scenes are exceedingly beautiful. The scene of Rāhula's conversion is pathetic in the extreme. The poor boy asked his mother, in the presence of the Buddha, 'Where is my father? Who is this monk in whom I am getting so much interested? Is he a relation of ours? Why is it that when I sit under his shadow I feel so comfortable?' Suddhodana had given orders that no one should reveal the relation of

Buddha to Rāhula on pain of death. The hesitation of Yasodharā to tell the truth is beautifully expressed; on the one side the son is pathetically appealing to her and on the other the order of her father-in-law is imperative; but she yields to the importunities of her son and the son at once goes to his father and asks for inheritance and that inheritance is given by handing over the little boy to Sāriputta, the chief disciple, for ordination." (*The Calcutta Review*, Sept. 1930, pp. 439-43.)

৩. অনুবাদ : উপস্থিত তিরিশ কোটি শাক্যমুনি (বলে পরিচিত) জিনেদের মধ্যে আট লক্ষ (হলেন) দীপংকর নামধারী ॥ ১ ॥

ষাট হাজার প্রদ্যোত নামধারী। তেমনি তিন কোটি (হল) পুষ্প নামক শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্ম উপদেশকারীর সংখ্যা (তর্কে যিনি সিংহ সদৃশ) ॥ ২ ॥

আঠারো হাজার (হল) মারধ্বজ নামধেয়ের। সর্বজ্ঞতা পাবার ইচ্ছা থাকলে যাঁর অধীনে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হয় ॥ ৩ ॥

পূজা করেছিল পাঁচ শো (শাক্যমুনি) পদ্মোত্তর নামক বুদ্ধকে। কৌণ্ডিন্য নামকের (আছে) আর দু হাজার ॥ ৪ ॥

অপরিমিত-সংখ্যক, কোটি কোটি ও অযুত অযুত, প্রত্যেক বুদ্ধ পূজা করেছিলেন। পূজা করেছিলেন হাজার জম্বুধ্বজ নামক বুদ্ধকে ॥ ৫ ॥

ইন্দ্রধ্বজ নামক বুদ্ধের সংখ্যা চুরাশি হাজার। কাশ্যপ এই সমান নামধারী (বুদ্ধের সংখ্যা) নব্বুই হাজার ॥ ৬ ॥

প্রতাপ নামক বুদ্ধের সংখ্যা পনেরো হাজার। আদিত্য নামক (বুদ্ধের সংখ্যা) পনেরো হাজার ॥ ৭ ॥

অন্যান্য নামধারী বুদ্ধের সংখ্যা ছ হাজার দুশো। সমিতাবি নামক বুদ্ধের সংখ্যা চৌষট্টি হাজার ॥ ৮ ॥

এইগুলি হল কোলিতশ্রী (রাজোচিত ?)। অপর বুদ্ধের সংখ্যা অপরিমিত। সকলে অনিত্যতার সমবেত, (সকলেই) দশবল এবং লোকউজ্জ্বলকারী ॥ ৯ ॥

যে-সকল ক্ষমতা 'কৌলিত' (রাজোচিত ?)— সেই শ্রেষ্ঠ লক্ষ-সংখ্যক মহাপুরুষদের, তাঁরা সকলে অনিত্যতার জন্য কালে এবং সংখ্যায় জ্ঞাত নন ॥ ১০ ॥

অনিত্যতার বল জেনে নিয়ে, সৎকর্মের পর, অনিত্যবলের ধ্বংসের জন্য বীর্য অবলম্বন আরম্ভ হয় ॥ ১১ ॥

৪. এই রকম বলা হলে পর আয়ুষ্মান্ মহাকাশ্যপ আয়ুমন্ত মহাকাত্যায়নকে বললেন— হে জিনপুত্র, ভগবান্ সম্যক-সংবুদ্ধ শাক্যমুনি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম ভূমি অবধি বর্তমান থেকে যেসব সম্যক্-সংবুদ্ধের তত্ত্বাবধানে (জগতে) কুশল নামিয়ে এনেছিলেন সেসব সম্যক্-সংবুদ্ধের নাম কী কী ছিল। এই রকম উক্ত হলে আয়ুষ্মান্ মহাকাত্যায়ন আয়ুষ্মন্ত মহাকাশ্যপকে বললেন— হে পবিত্র ধর্মধর, যেসব সম্যক-সংবুদ্ধের তত্ত্বাবধানে শাক্যবংশ প্রসূত ভগবান্ (জগতে) কুশল নামিয়ে এনেছিলেন সেসব বিপুল-বর্ণবিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ কীর্তিসম্পন্ন (সম্যক্ সম্বুদ্ধদের) নামগুলি শোনো।

পৃথিবীর সকল দেশেই, পৃথিবীর উৎপত্তি কিরূপে হইল, মানুষ কিরূপে জন্মাইল, এই দুইটি কথা লইয়া অনেক বাদানুবাদ হইয়া থাকে। খৃস্টানেরা বলেন, গোড়ায় এক পরমেশ্বর ছিলেন। তিনি বলিলেন, "আলো হউক", অমনি আলো হইল। তিনি দেখিলেন, আলো উত্তম হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছায়ই সৃষ্টি হইয়াছে। একথা লইয়াও আবার গোলমাল আছে। কেহ কেহ বলেন, যাহা ছিল না, তাহাই হইল— অর্থাৎ পরমেশ্বরের ইচ্ছায় পরমাণু হইতে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড সবই সৃষ্টি হইল। কেহ কেহ বা বলেন, পরমাণু ছিল, ঈশ্বর তাহাই ভাঙিয়া গাড়িয়া জগৎ সৃষ্টি করিলেন। আমাদের কোনো কোনো শাস্ত্রে লিখে— ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব। অমনি তিনি বহু হইয়া গেলেন। কোনো কোনো শাস্ত্রে বলে— সমস্ত জগৎ "অপ্রজ্ঞাত", "অলক্ষণ" ছিল। বিধাতাপুরুষ তাহাতে বীজ নিক্ষেপ করিলেন। সেই বীজ হইতে এক প্রকাণ্ড অণ্ড উৎপন্ন হইল। অণ্ড দুই ভাগ হইল, এক ভাগে পৃথিবী ও আর-এক ভাগে অন্তরীক্ষ হইল। দার্শনিকদের মধ্যেও কেহ কেহ বলেন এক হইতেই সব হইয়াছে ; কেহ বা বলেন, দুই-ই ছিল, দুই হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে।

বুদ্ধদেবকে সৃষ্টির কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, তোমার সে কথায় কাজ কী ? তুমি আপন চরকায় তেল দাও। তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ ? কোথায় যাইবে ? এই কথাই ভাবো। আকাশ কোথা হইতে হইল, পৃথিবী কোথা হইতে হইল, তাহা ভাবিয়া তোমার দরকার কী ? এমন-কি, মানুষ কোথা হইতে আসিল, তাহাও তিনি কোথাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া যান নাই। মহাসাংঘিকেরা কিন্তু মানুষের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটা বিশেষ মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। পরে পালিভাষায়ও সে মত প্রচার হইয়াছিল। কিন্তু মহাসাংঘিকদের মত যে অতি পুরানো, তাহা আমরা পরে দেখাইব। মহাসাংঘিকেরা বলেন, অনাদিকাল হইতেই "সম্বর্ত" (প্রলয়) ও "বিবর্ত" (সৃষ্টি) চলিতেছে। প্রলয় হইয়া গেলে সমস্ত সত্ত্ব (জীব) "আভাস্বর" নামে এক স্বর্গে উৎপন্ন

হয়। আবার যখন সৃষ্টি হয়, লোকের থাকিবার স্থান হয়, কতকগুলি "সত্ত্ব" "আভাস্বর" হইতে নামিয়া পৃথিবীতে উৎপন্ন হন। তখন তাঁহারা "স্বয়ংপ্রভ", "অন্তরীক্ষচর", "মনোময়", "প্রীতিভক্ষ", "সুখস্থায়ী" ও "কামচর" থাকেন। তাঁহাদের নিজের শরীরপ্রভায় দিগন্ত আলোকিত হয়, চন্দ্রসূর্যের প্রয়োজন থাকে না, নক্ষত্রতারার প্রয়োজন থাকে না, আকাশের দরকার হয় না, দিন থাকে না, রাত্রি থাকে না, পক্ষ থাকে না, মাস থাকে না, ঋতু থাকে না, অয়ন থাকে না, বৎসরও থাকে না। তাঁহারা, যখন যেখানে ইচ্ছা, অন্তরীক্ষে ঘুরিয়া বেড়ান। তাঁহাদের আহার প্রীতি এবং বাড়িঘর সুখ। সুখনিবাসে থাকিয়া তাঁহারা প্রীতি ভক্ষণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। তাঁহারা যাহা করেন, সবই ধর্ম।

তাহার পর পৃথিবী উদয় হইল— যেন একটি হ্রদ, জলে পরিপূর্ণ। সে জলের কী রঙ! কী.আস্বাদ! মিষ্ট যেন মধু, যেন ক্ষীরের ধারা, যেন ঘৃতের ধারা। কোনো কোনো জীব একটু লোভে পড়িয়া আঙুলের আগায় সেই মধু তুলিয়া একটু চাকিলেন, ভালো লাগিল; আবার চাকিলেন, ক্রমে খাইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদের দেখাদেখি আরো পাঁচ জনে চাকিতে ও খাইতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা পেট পুরিয়া খাইতে লাগিলেন। এতদিন জীবগণ লঘুকলেবর ছিলেন; খাইতে খাইতে তাঁহাদের শরীর ভারি হইয়া উঠিল, শক্ত হইয়া উঠিল, কর্কশ হইয়া উঠিল। তাঁহাদের যে গুণগুলি ছিল, সেগুলি ক্রমে লোপ হইল, দেহের জ্যোতি লোপ হইল, শুধু প্রীতি ভক্ষণ করিয়া আর তাঁহাদের চলে না, অন্তরীক্ষে আর তাঁহারা বেড়াইতে পারেন না; সুতরাং চন্দ্রসূর্যের দরকার হইল, নক্ষত্রের দরকার হইল; দিন, রাত্রি, মাস, সংবৎসরের দরকার হইল।

পৃথিবীর রস খাইতে খাইতে তাঁহাদের রঙও সেইমতো হইয়া গেল। এইরূপে অনেক দিন যায়। যাঁহারা অধিক আহার করেন, তাঁহাদের রঙ খারাপ হইয়া উঠে; আর যাঁহারা অল্প আহার করেন, তাঁহাদের রঙ ভালো থাকে। ভালো রঙের লোকে মন্দ রঙের লোককে অবজ্ঞা করে। সুতরাং "আমি বড়ো" "তুমি ছোটো" এই মান-অভিমান জাগিয়া উঠিল। এতদিন যে ধর্ম তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল,

অভিমানের উদয়ে সে ধর্মের প্রভাব খর্ব হইয়া গেল। পৃথিবী হইতে সে রসও লোপ হইয়া গেল। তখন তাঁহারা খান কী? পৃথিবীর সর্বত্র ভুঁইপটপটি উঠিল— চারি দিকে যেন ব্যাঙের ছাতা ফুটিয়া উঠিল। আহা, তাহার কী বর্ণ! কী রঙ! কী গন্ধ! কী আস্বাদ! মিষ্ট যেন মৌচাকের মধু। পৃথিবীর রস অন্তর্ধান হইলে জীব-সকল দুঃখে গাইয়া উঠিলেন-- হায় রস! হায় রস!

ক্রমে তাঁহারা ভুঁইপটপটি খাইতে লাগিলেন। ভুঁইপটপটির মতো তাঁহাদের রঙ হইল। এইরূপে কত কাল-কালান্তর কাটিয়া গেল। যাঁহারা অধিক আহার করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের রঙ খারাপ হইয়া আসিল : যাঁহারা অল্প আহার করিতে লাগিলেন, তাঁহাদের রঙ ভালো থাকিল। যাঁহাদের রঙ ভালো, তাঁহারা খারাপ রঙের লোককে অবজ্ঞা করেন। "আমি বড়ো", "তুমি ছোটো" এই মান-অভিমান বাড়িয়া উঠিল। ভুঁইপটপটির লোপ হইল, তাহার জায়গায় বনলতা জন্মাইল। লোকে তাহাই আহার করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের রঙ বনলতার মতো হইয়া গেল। ক্রমে বনলতার বেলায়ও মান-অভিমান আসিয়া জুটিল, বনলতারও লোপ হইল। এবার আসিলেন শালিধান।

এ ধানের কণা নাই, তুষ নাই, অতি সুগন্ধ। সন্ধ্যায় ধান কাটিলে, সকালে আবার গজাইয়া উঠে, সকালে কাটিলে সন্ধ্যায় আবার গজাইয়া উঠে ; শুধু গজাইয়া উঠে, এমন নয়, একেবারে ধান পাকিয়া উঠে, বারো ঘণ্টায় একেবারে পাকা ধান পাওয়া যায়। এই ধান খাইয়া লোকে কতকাল রহিল। প্রথম প্রথম সকলেই সকাল-সন্ধ্যা দুই বেলা ধান ঝাড়িয়া আনিত। সকাল-সন্ধ্যায়ই খাইত, সঞ্চয়ের নামটিও করিত না ; কিন্তু ক্রমে দু- একজন ভাবিল, দু বেলায়ই ধান কাটিতে হইবে কেন? এক বেলাতেই দু বেলার ধান যোগাড় করিয়া আনি। তাহারা তাহাই করিতে লাগিল। তাহাদের দেখাদেখি অনেকেই সেইরূপ করিতে লাগিল, বরঞ্চ সঞ্চয়ের মাত্রা বাড়িয়া গেল। এখন আর দু বেলার সঞ্চয়ে কুলায় না, দুই দিনের সঞ্চয় হইতে লাগিল, ক্রমে দুই সপ্তাহেরও সঞ্চয় হইতে লাগিল। ক্রমে ধানের কণা আর তুষ বাড়িতে লাগিল। আর, সকালে ধান কাটিলে সন্ধ্যায় আর গজায় না, সন্ধ্যায় কাটিলে সকালে আর গজায় না।

অন্নরসের সঙ্গে সঙ্গে আর-এক উৎপাত আসিয়া জুটিল। কতকগুলি জীবের শরীরে পুরুষের চিহ্ন দেখা দিল, কতকগুলি জীবের স্ত্রীচিহ্ন দেখা দিল। তাহারা আবার পরস্পরের প্রতি অনুরাগ দেখাইতে লাগিল, একদৃষ্টিতে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত, ক্রমে দোষ উৎপন্ন হইল। দোষ উৎপন্ন হইলে লোকে লাঠি, ঠেঙা, ঢিল, পাটকেল মারিতে লাগিল, গায়ে ধুলা দিতে লাগিল। দেশে অধর্ম উপস্থিত হইল। অধর্ম উপস্থিত হইল বলিয়া সাড়া পড়িয়া গেল। এ কী? একটি জীব আর-একটি জীবের দোষ উৎপন্ন করিয়া দেয়— এত বড়ো অন্যায়। ইহা ধর্মবিরুদ্ধ, নিয়মবিরুদ্ধ। ক্রমে ক্রমে অনেক দিনের পর এ দোষ সহিয়া গেল। লোকে মনে করিল, ইহা ধর্মসম্মত, সমাজ-সম্মত, সহবতসম্মত। লোকেও প্রথমে ভয়ে ভয়ে একদিন দুই দিন একত্র বাস করিত, এখন মাস, পক্ষ, সংবৎসর একত্র বাস করিতে লাগিল, গৃহকর্ম সকলও স্ত্রীলোকদিগকে করাইতে লাগিল, ক্রমে অধর্মের কথা চাপা পড়িয়া গেল।

ওদিকে কণাওয়ালা, তুষওয়ালা ধান খেত না করিলে আর জন্মায় না। কতকগুলি দুষ্টলোকে অন্যায় করিয়া সঞ্চয় করিতে গিয়া আমাদের এমন সুখের খোরাকে ছাই দিল। যাহা হউক, এখন আমাদের এক কাজ করিতে হইবে। এখন খেত ভাগ করিতে হইবে, সীমাসরহদ্দ বাঁধিয়া দিতে হইবে, কাহার কোন্ খেত ঠিক করিয়া দিতে হইবে— এই খেত তোমার, এই খেত আমার, এই খেত রামের, এই খেত শ্যামের। এইরূপে আবার কিছুদিন চলিল।

একজন বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল— আমার তো এই খেত, এই ধান। যদি কম জন্মায়, কী করিয়া চলিবে? সে মনে মনে ঠাহরাইল, দিক আর না দিক, অন্যের ধান আমি তুলিয়া লইব। সে আপনার ধানগুলি সঞ্চয় করিয়া অপরের খেতের ধানগুলি উঠাইয়া লইয়া আসিল। তৃতীয় ব্যক্তি দেখিতে পাইয়া বলিল, "তুমি করো কী? পরের ধান তাহাকে না বলিয়া তুলিয়া আনিতেছ? আর এরূপ করিবে না।" কিন্তু আবার সে পরের ধান না বলিয়া তুলিয়া আনিল। তৃতীয় ব্যক্তি দেখিতে পাইয়া আবার বলিল, "তুমি ফের এই কাজ করিলে?" সে বলিল, "আর এরূপ হইবে না।" কিন্তু কিছুদিন পরে

সে আবার পরের ধান উঠাইয়া আনিল। তৃতীয় ব্যক্তি এবার আর চুপ করিয়া রহিল না। সে তাহাকে বেশ উত্তম মধ্যম দিয়া দিল। তখন ধানচোর হাত তুলিয়া চিৎকার করিতে লাগিল, "দেখো ভাই. আমাকে মারিতেছে, দেখো ভাই, আমাকে মারিতেছে, কী অন্যায়! কী অন্যায়!" এইরূপে পৃথিবীতে চুরি, মিথ্যাকথা ও শাস্তির প্রাদুর্ভাব হইল।

তখন সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে লাগিল— আইস, আমরা একজন বলবান্, বুদ্ধিমান্, সকলের মন জোগাইয়া চলে— এমন লোককে আমাদের খেত রাখিবার জন্য নিযুক্ত করি। তাহাকে আমরা সকলের ফসলের অংশ দিব। সে অপরাধের দণ্ড দিবে, ভালো লোককে রক্ষা করিবে, আর আমাদের ভাগমতো ফসল দেওয়াইয়া দিবে। তাহারা একজন লোক বাছিয়া লইল। তাহাকে তাহারা ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ দিতে রাজি হইল। সকলের সম্মতিক্রমে সে রাজা হইল, এইজন্য তাহার নাম হইল মহাসম্মত। এইরূপে তেজোময় জীব অনন্ত আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে ক্রমে লোভে পড়িয়া মাটিতে মাটি হইয়া গেল। শেষে তাহাদের খেত আগলাইবার জন্য একজন খেতওয়ালার দরকার হইল। সেই খেতওয়ালাই রাজা, ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ তাহার মাহিনা।

'মহাবস্তু অবদানে' বুদ্ধদেবের জন্মকথা উপলক্ষে এই বৃত্তান্তটি দেওয়া হইয়াছে। এই মহাসম্মতের অনেক পুরুষ পরে ইক্ষ্বাকু, ইক্ষ্বাকুর অনেক পুরুষ পরে শুদ্ধোদন, শুদ্ধোদনের পুত্র বুদ্ধদেব। সুতরাং 'মহাবস্তু'র বর্ণনাটি প্রাচীন বলিয়াই বোধ হয়।

পালি 'ত্রিপিটকে'ও এইরূপ একটি গল্প আছে, 'অগ্‌গিঞ্‌ঞ সুত্ত', অর্থাৎ অগ্রণ্যসূত্র, অর্থাৎ কে সকলের আগে— গল্পচ্ছলে তাহার উপদেশ। থেরাবাদীরা এ গল্পটি স্বয়ং বুদ্ধদেবের মুখ হইতে বাহির করিয়াছেন। বুদ্ধদেবের এক শিষ্য ছিলেন, তাঁহার নাম বাশিষ্ঠ-ভারদ্বাজ, তিনি যদিও ভিক্ষু হইয়াছিলেন, ব্রাহ্মণের ছেলে বলিয়া মনে মনে গর্ব করিতেন। তাই বুদ্ধদেব একদিন তাঁহাকে এই গল্পটি শুনাইয়া দেন। তিনি বলিয়া দেন, ব্রাহ্মণ অগ্রণ্য নয়, ভিক্ষুই অগ্রণ্য।

যে-কেহ মহাবস্তুর অবদানের "রাজবংশে আদি" অধ্যায়টি ও

"অগ্রণ্য সূত্র"টি মন দিয়া পাঠ করিবেন, তাঁহারই মনে হইবে, 'মহাবস্তু' দেখিয়াই এই সূত্রটি তৈয়ারি হইয়াছে। রাজবংশের কথা বলিতে গেলে রাজা কেমন করিয়া হইলেন, সেটা জানিবার ইচ্ছা আপনিই হয়। সুতরাং ঐরূপ স্থলে রাজা যে সকলের সম্মতি অনুসারে খেত আগলাইবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন, সে কথাটি বলা আবশ্যক। খেত তো খেতই আছে, তাহার আবার আগলানো কী? সুতরাং খেত আগলাইবার কারণও বলার দরকার হয়। কেন খেত আগলাইবার দরকার হয়, বলিতে গেলে বলিতে হয়, লোকের দোষে। সে দোষ কী? কেমন করিয়া হইল, তাহাও বলিবার প্রয়োজন হয়। 'মহাবস্তুতে' এগুলি সব পর-পর বলা আছে। উহাতে বাজে কথা নাই। কিন্তু পালিসূত্রে অনেকগুলি বাজে কথা আছে: স্ত্রীপুরুষে মার খাইয়া বনে পলাইয়া গেল, ক্রমে বনে তাহাদের বাস হইল, বনে গ্রাম 'নগর পত্তন হইল, ইত্যাদি, ইত্যাদি। এ-সকল কথা এ উপলক্ষে বলার কোনো দরকারই দেখি না। তাই বলিতেছিলাম, 'মহাবস্তু' দেখিয়াই সূত্র প্রস্তুত হইয়াছে। আরো ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র চারি বর্ণের কথা, তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণ বড়ো কিনা, এ-সকল কথার মীমাংসা কি এ গল্পের দ্বারা হইতে পারে, এ যেন গণেশের মাথায় গজমুণ্ড দেওয়া। ভাষা দেখিলেও বোধ হয়, 'মহাবস্তু' আগে ও সূত্রটি তাহার পরে।

এখানে আর-একটি কথা বলা আবশ্যক। রাজার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা দেশে নানা মত চলিতেছে। রাজা যে ঈশ্বরের অংশ— এই মতটি অধিক দেশেই চলিত। রাজা যে প্রজার চাকর, একথা অনেকেই বলিতে সাহস করে না। এখনকার দিনে তো অবস্থাটি ঠিক উল্‌টাইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধদের মধ্যে এই মত অনেক দিন চলিয়াছিল। চন্দ্রকীর্তি[১] খৃ. পঞ্চম শতকে বলিয়াছেন—

গণদাসস্য তে গর্বঃ ষড়্‌ভাগেন ভৃতস্য কঃ।

"তুমি তো দেশের লোকের দাস। ফসলের ছয় ভাগের একভাগ মাহিনাই তোমার জীবিকা। তুমি আবার গুমর করো কী?"

'নারায়ণ'
বৈশাখ, ১৩২৪ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১. বৌদ্ধদর্শনের অন্যতম শাখা মাধ্যমিক দর্শনের বিশিষ্ট প্রবক্তা চন্দ্রকীর্তি নিজের রচনায় নাগার্জুন ও আর্যদেবের মতবাদ পরিপুষ্ট করেছিলেন। ভিন্‌ট্যারনিট্‌স মনে করেন, চন্দ্রকীর্তি খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকে বর্তমান ছিলেন। তারনাথের বিবরণ অনুযায়ী ইনি দক্ষিণ ভারতের সমন্ত নামে কোনো জায়গার অধিবাসী ছিলেন। অল্প বয়সেই মেধার পরিচয় দেন এবং ভিক্ষু হয়ে সমস্ত পিটক এবং নাগার্জুনের সমস্ত শাস্ত্র ও উপদেশ আয়ত্ত করেন। চন্দ্রকীর্তি ধর্মপাল এবং কমলবুদ্ধির ছাত্র ছিলেন। নালন্দায় উপাধ্যায় পদে বৃত হন। তারনাথ উল্লেখ করেছেন. তিব্বতে মনে করা হয়, চন্দ্রকীর্তি ৩০০ বছর বেঁচে ছিলেন, ছবিতে আঁকা গোরু দুইয়ে সংঘের সকলকে ক্ষীর পরিবেশন করতেন, পাথরের সিংহে চড়ে তুর্কি-সৈন্যদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এইসব অলৌকিক কিংবদন্তি থেকে তিব্বতে চন্দ্রকীর্তির প্রতিপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। মাধ্যমিক দর্শনের বিকাশের ধারায় চন্দ্রকীর্তির মতবাদকে বলা হয় প্রাসঙ্গিকবাদ। ভাব-বিবেক নামে খৃস্টীয় পঞ্চম শতকের একজন মাধ্যমিক দার্শনিক বলে-ছিলেন, কেবল অন্যের মতের স্ববিরোধ দেখানো ঠিক নয়, তার বিপক্ষে নিজেদের যুক্তি দেখানো উচিত। ভাববিবেকের উপসম্প্রদায়কে স্বতন্ত্র-মাধ্যমিক বলা হয়। এঁর সমকালীন দার্শনিক বুদ্ধপালিত মূল মাধ্যমিক বিচারপদ্ধতির সমর্থক ছিলেন। তাঁর উপসম্প্রদায় প্রাসঙ্গিক নামে পরিচিত। চন্দ্রকীর্তি এই মতই প্রবলভাবে সমর্থন করেন। শ্চেরবাট-স্কোই চন্দ্রকীর্তি সম্পর্কে লিখেছেন, "...a mighty champion of the purely negative method of establishing monism ; he succeeds in driving Bhāvavivek's school, *Mādhya-mik Svatantra*, into the shade and finally settles that form of the Mādhyamika system which is now studied in all monastic schools of Tibet and Mongolia, where it is considered to represent the true philosophic basis of Mahāyāna Buddhism."

(*Buddhist Conception of Nirvāṇa*, Varanasi, p. 67). চন্দ্রকীর্তির প্রধান রচনা 'মাধ্যমিকাবতার' এবং 'প্রসন্নপদা'। মনীষার শক্তিতে এবং যুক্তিনিষ্ঠ অথচ স্বচ্ছন্দ রচনা শৈলীর গুণে চন্দ্রকীর্তি বৌদ্ধ-পণ্ডিতদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখকের মর্যাদা পেয়ে এসেছেন। এই এই বইয়ের পৃ. ৩৪৭ সূত্র ১ দ্র.।

বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম।

বাংলা দেশের ইতিহাস পাওয়া যায় না। কিন্তু বাংলা যে বহু পূর্বকালে, এমন-কি আর্যগণের পঞ্জাবে আসিবার বহু পূর্বেও সভ্যজাতির বাস ছিল, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ব্রহ্মপুত্র ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী স্থানে অতি প্রাচীনকালে মানুষে হাতি পোষ মানাইয়াছে। 'রামায়ণে' বলো, 'মহাভারতে' বলো, বৌদ্ধ 'ত্রিপিটকে' বলো, 'জাতকে' বলো, জৈন 'অঙ্গ গ্রন্থে' বলো, সব যায়গায় পোষা হাতির কথা শুনা যায়! কিন্তু এই পোষমানানোটি বাংলা দেশের লোকেরই কাজ ছিল। যাহারা পোষ মানাইত তাহারা দীর্ঘকায়, কৃশ অথচ বলিষ্ঠ, এবং স্বর্ণবর্ণ ছিল। তাহারা ঝাঁকড়া চুল

রাখিত, চামড়া পরিত এবং হাতির সঙ্গে সঙ্গে হিমালয়ের উপর হইতে সমুদ্রের তীর পর্যন্ত গমনাগমন করিত। সে জাতি এখন কোথায় গেল বলিতে পারা যায় না। তবে তাহারা হাতি পোষ মানাইয়া পৃথিবীর একটা বড়ো উপকার করিয়া গিয়াছে।

'ঋগ্বেদে' বাংলা দেশের নাম পাওয়া যায় না। কিন্তু 'ঋগ্বেদে'র 'ঐতরেয় আরণ্যকে' তিনটি জাতির নাম পাওয়া যায়। এখানে জাতি শব্দের অর্থ ইংরাজিতে যাহাকে caste বলে তাহা নহে— কিন্তু ethnic race। একটির নাম বঙ্গ, একটির নাম বগধ এবং আর-একটির নাম চের[১]। দ্রবিড় জাতির সাধারণ নাম চের। একথা কেহ কেহ অস্বীকার করিলেও চেররা দ্রবিড় জাতির যে একটা খুব বড়ো অংশ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ছোটোনাগপুরে অনেক অর্ধসভ্য জাতি আপনাদিগকে চেরদিগের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহারা বলিয়া থাকে, রোটাস্‌গড়ের নিকটবর্তী স্থান হইতে তাহারা ছোটো-নাগপুরে আসিয়াছিল ; কিন্তু কতকাল পূর্বে, সেকথা তাহারা বলিতে পারে না। কোনো কোনো anthropologist বলেন, বঙ্গ বা বং নামে এক দ্রবিড় জাতি বাংলা দেশে বাস করিত। বগধ জাতি এখনো বাংলা দেশে আছে। রাঢ়ের বাগদিরাই তাহাদের বংশধর। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, উহারা আপনাদের ভিতরে যে ভাষায় কথাবার্তা কয়— তাহা বাংলা নয়। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রমুখ ভদ্রজাতিরা সে ভাষা কিছুই জানেন না। আবার অনেকে মনে করেন যে, মগধ ও বগধ একই জাতি, অথবা, এক জাতিরই দুই শাখা মাত্র। মগধের কথা কোনো কোনো বেদে শুনিতে পাওয়া যায়। তথায় বাস করিলে ব্রাহ্মণকে পতিত হইতে হইত।

এতদ্ভিন্ন উত্তরবঙ্গে কিরাত, পৌণ্ড্র এবং কৈবর্ত এই তিনটি জাতি ছিল। বেদের আর্যগণ এই তিন জাতিকে দস্যু বলিয়া বর্ণনা করিতেন। অর্থাৎ তাহারা আর্যদিগের শত্রু ছিল। কিরাতেরা এখন দার্জিলিং ও কাঠমুণ্ডের মধ্যে পর্বতময় দেশে বাস করে। নেপালিরা তাহাদিগকে "কিরান্তি" বলে।[২] মালদহের পুঁড়েরা পৌণ্ড্রগণের বংশ। উহাদের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্ধন[৩] অতি প্রাচীনকাল হইতে উত্তরবঙ্গের একটি প্রধান নগর ছিল। কৈবর্তরা উত্তরবঙ্গে খুব প্রবল ছিল। বল্লালসেন[৪]

কৈবর্তদিগকে ভাগ করিয়া এক দলকে উত্তরবঙ্গে রাখেন এবং আর-এক দলকে উড়িষ্যার প্রান্তদেশে বাস করান। এখনো ঐ দুই স্থলে কৈবর্তের সংখ্যা অধিক। সেন্‌সাস রিপোর্টে দেখা যায় বাংলায় যত জাতি (Caste) আছে তাহাদের মধ্যে কৈবর্তের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক।

বুদ্ধদেবের জন্মগ্রহণের পূর্বেও বাংলায় এই-সকল জাতি বাস করিত। ইঁহারা কতক পরিমাণে সভ্য হইয়াছিল ; কারণ, জৈনদিগের প্রায় সকল তীর্থংকরই বাংলা দেশে বিশেষত রাঢ়ে বহুদিন বাস, তপস্যা ও সিদ্ধিলাভপূর্বক আপন আপন ধর্মের মূলভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। জৈন যতিদিগের অনেক আচার ব্যবহার, বিশেষত তাহাদিগের পোশাক পরিচ্ছদ বাঙালিদিগের মতো। বৌদ্ধ যতিদিগেরও তাহাই।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম দুইটি সাংখ্য দর্শনের ফলে বাহির হইয়াছে। আবার, আশ্চর্যের বিষয় ইহাই যে, সাংখ্যশাস্ত্র-প্রবর্তক কপিলের আশ্রম বাংলাতেই ছিল। খুলনা জেলায় এখনো কপিলমুনি বলিয়া একটি স্থান আছে। গঙ্গাসাগরের নিকট কপিলের অন্য একটি আশ্রমও আছে। বুদ্ধদেব যে প্রথম প্রথম সাংখ্য-পণ্ডিতদিগেরই চেলা হইয়াছিলেন একথা অশ্বঘোষ[৫] স্পষ্ট করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। কপিলের মতের উপর বুদ্ধদেব কোন্‌ কোন্‌ বিষয় নূতন প্রবর্তিত করিয়া নিজ মতের উন্নতি বিধান করিয়াছেন তাহাও অশ্বঘোষ দেখাইয়া গিয়াছেন। কপিল দ্বৈতবাদী ছিলেন, কিন্তু বৈদিক ঋষিরা সকলেই প্রায় অদ্বৈতবাদী। শংকরাচার্য সাংখ্যকে "অশিষ্ট" বলিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি মনে করিতেন উহা একটা বেদবহির্ভূত মত। তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, সাংখ্য নিরাকরণে আমার প্রয়োজন নাই। তবে যে যত্ন করিয়া আমি উহার নিরাকরণ করিতেছি তাহার কারণ, মনু প্রভৃতি কয়েক জন "শিষ্ট" এই মত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া অনেকের ইহাকে শিষ্ট বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, এজন্য নিরাকরণ করা আবশ্যক। শংকরাচার্য কয়েক শতাব্দী পরে হেমাদ্রি[৬] সাংখ্য ও কপিলমতে ভেদ করিয়াছেন। তাঁহার মতে যাহারা সাংখ্যশাস্ত্রে পারদর্শী তাহাদের স্থান অতি উচ্চে এবং যাহারা কপিলমতে পারদর্শী তাহাদের স্থান অতি নীচ। এমন-কি ব্রাহ্মণদের সহিত কপিলদের এক পংক্তিতে বসাও উচিত

নহে। বাঙালিদের উপর আর্য ঋষিদিগের এবং তাঁহাদের বংশধর-দিগের অনুগ্রহ বড়োই বেশি। তাঁহারা বলেন, তীর্থযাত্রা ভিন্ন বঙ্গ দেশে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। হেমাদ্রি লিখিয়াছেন শ্রাদ্ধের পংক্তিতে বাঙালিকে বসিতে দিবে না। এই-সকল ব্যাপার দেখিয়া স্পষ্টই প্রমাণ হয় যে, বাংলা দেশ আর্যদের দেশ ছিল না। তবে বাংলায় ব্রাহ্মণ কবে আসিল? তাম্রশাসন বা পাথরের লেখা না দেখিলে যাঁহারা কিছুই বিশ্বাস করিতে রাজি হন না তাঁহাদের উপকারার্থ এই কথা বলিতে পারা যায় যে, খৃস্টীয় ৪৩৬ সালে মহারাজাধিরাজ কুমার গুপ্তের অধিকার কালে রাজশাহি অঞ্চলে একজন ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করা হয়।[৭] ইহার একশত বা দেড়শত বৎসর পরে ফরিদপুরে কতকগুলি ব্রাহ্মণ কিছু কিছু জমিজমা লইয়া বাস করে; এটাও তাম্রশাসনের কথা।[৮] তবে কোনো কোনো পণ্ডিত এই তাম্রশাসনগুলিকে জাল বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান। জাল হইলেও ১০/১২ শত বৎসরের পূর্বে ঐ জাল প্রস্তুত হইয়াছে, স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং বাংলায় ঐ কালে ব্রাহ্মণের বাসের সম্বন্ধে যে উহা প্রমাণ, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পঞ্চ ব্রাহ্মণের বাংলায় আসা আদিশূরের সময়ে ঘটে।[৯] আদিশূরের কোনো তাম্রশাসন পাওয়া যায় না— সুতরাং বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকদিগের মতে আদিশূরের নামে কোনো রাজা থাকাই সম্ভবপর নয়। অতটা বিজ্ঞান কিন্তু সংসারে চলে না। আদিশূর রাজা থাকুন আর নাই থাকুন, কিন্তু পাঁচ জন ব্রাহ্মণ যে এককালে বঙ্গ দেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বংশধরেরা রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রশ্রেণী হইয়া উঠিয়াছেন, একথা সন্দেহ করিবার কোনো কারণ দেখি না। তবে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, সেটা কোন্ কালে? প্রাচীন ঘটকের পুথিতে বলে, বেদে বাণাঙ্গ শাকে ৬৫৪ শকে অর্থাৎ ৭৩২ খৃস্টাব্দে তাঁহারা বাংলায় আসেন একথা অবিশ্বাস করিবার কোনো কারণ নাই; কারণ, তখন সমগ্র ভারতব্যাপী একটা ঘোর আন্দোলন চলিতেছিল। কুমারিল ভট্ট[১০] মীমাংসা সূত্রের শবর-ভাষ্যের এক টীকা লিখিয়া পুনরায় বৈদিকধর্ম প্রচারের চেষ্টা করিতেছিলেন। মহাকবি ভবভূতি[১১] তাঁহারই শিষ্য ছিলেন। তিনি তখন কনোজের ব্রাহ্মণগণের নেতা। কনোজ তখন একজন প্রবল পরাক্রান্ত ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী মহারাজা র

রাজধানী। সুতরাং সেখান হইতে যে কয়েক জন ব্রাহ্মণ আসিয়া অব্রাহ্মণ বঙ্গ দেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রচার করিবেন, তাহা আর বিচিত্র কী ? কনোজ হইতে ব্রাহ্মণেরা বাংলায় আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে, এদেশে সাত শত ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ আছেন। কিন্তু তাঁহারা নামেই ব্রাহ্মণ, বৈদিক ক্রিয়াকলাপ কিছু জানেন না। তাঁহাদিগের ঐ কথাও অবিশ্বাস করিবার কোনো কারণ নাই। কেন-না ইতিপূর্বে তাম্রশাসন হইতে দেখাইয়াছি যে, বাংলায় ঐকালে ব্রাহ্মণ বাস করাইবার চেষ্টা হইয়াছিল।

কিন্তু সাত শত ঘর অকর্মঠ ব্রাহ্মণ এবং পাঁচ ঘর কর্মঠ ব্রাহ্মণ লইয়া কিছু বাংলা দেশ হয় না। সুতরাং এদেশে অন্য ধর্মও ছিল এবং সে ধর্মের প্রবল একটা যাজককুলও ছিল। হুয়েনসাঙ ৬২৯ খৃস্টাব্দ হইতে ৬৪৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে থাকিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, বাংলা দেশে তখন এক লক্ষেরও অধিক বৌদ্ধ ভিক্ষুক্ ভিন্ন ভিন্ন সংঘারামে বা বিহারে বাস করিতেন। এতদ্ভিন্ন অন্য ধর্মাবলম্বী ভিক্ষুরাও ছিলেন—অর্থাৎ জৈন প্রভৃতি ধর্মের ভিক্ষুরাও ছিলেন। ভিক্ষুরা রোজগার করিয়া খান না, ভিক্ষা করিয়া খান। তিন বাড়িতে ভিক্ষা পেলে চতুর্থ বাড়িতে যাইবার তাঁহাদের নিয়ম ছিল না। আবার একবার যে বাড়িতে ভিক্ষা পাইয়াছেন, একমাসের ভিতরে সে বাড়িতে পুনরায় আসিতে পারিবেন না, ইহাও তাঁহাদের নিয়ম ছিল। সুতরাং একটি যতিকে প্রতিপালন করিতে হইলে অন্তত একশত ঘর গৃহস্থ বৌদ্ধ থাকা চাই। অতএব লক্ষাধিক ভিক্ষু প্রতিপালনের জন্য অন্তত এক কোটি বৌদ্ধ গৃহস্থ থাকা চাই। ছিলও তাহাই—দেশটা বৌদ্ধধর্মে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণকে বৌদ্ধেরা তখন গ্রাহ্যই করিতেন না। অন্য ধর্মাবলম্বীদিগকে তাঁহারা তখন বেশ দাবাইয়া রাখিতে পারিতেন।

বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্ম কবে আরম্ভ হয় তাহার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের যাহা মূল স্থান, বাংলা তাহার অতি সন্নিকট। ইহাতে বোধ হয় যে, বুদ্ধদেব জীবিত থাকিতেই এই দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচার হয়। তিনি নির্বাণের দিনে নিজেই বলিয়া গিয়াছেন, "বাংলার রাজকুমার বিজয়[১৩] আজ সিংহলে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সিংহলে আমার ধর্ম চিরস্থায়ী হইবে।" সুতরাং বুদ্ধদেবের জীবিত কালে

শুধু যে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার হইয়াছিল এমত নহে কিন্তু বাংলা দেশ হইতে অন্য দেশে বৌদ্ধধর্মের প্রচারকও যাইতেছিল।

বাংলা দেশে খুব বড়ো বড়ো দুইটি নগর ছিল— একটি পৌণ্ড্রবর্ধন এবং আর-একটি তাম্রলিপ্ত[১৪], প্রাচীন নাম দামলিপ্ত অর্থাৎ তামিল-দিগের শহর। ভ্রাতা বীতাশোক পাছে মগধ সাম্রাজ্য লইয়া তাঁহার সহিত ঝগড়া করে এইজন্য অশোক তাহাকে বৌদ্ধ-ভিক্ষু করিয়া পৌণ্ড্রবর্ধনের এক বিহারে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। সুতরাং সেখানেও পূর্ব হইতেই বিহার ছিল। তাম্রলিপ্ত বৌদ্ধদিগের একটি প্রধান আড্ডা ছিল। তাঁহারা এখান হইতে অন্যান্য দেশে বাণিজ্য ও ধর্ম প্রচার করিতে যাইতেন। এই বন্দর দিয়াই অশোকরাজা তাঁহার ছেলে ও মেয়েকে বোধিবৃক্ষের এক ডাল দিয়া সিংহল দেশে পাঠাইয়াছিলেন। সে ডালটি এখন দুই-তিন মাইল ব্যাপী অশ্বত্থ বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং হুয়েন্‌সাঙের পূর্বে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের কতদূর প্রচার হইয়াছিল তাহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া গেল। যে-সকল জাতি বাংলায় বাস করিত— কিরাত, পৌণ্ড্র, কৈবর্ত, বঙ্গ, বগধ সকলেই বৌদ্ধ হইয়াছিল। তবে বৌদ্ধদের একটা দোষ ছিল— পশুহত্যা যাহাদের ব্যবসায় ও জীবিকা তাহাদিগকে তাঁহারা দীক্ষা দিতেন না। কিন্তু যাহারা ঐরূপ জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া সুব্যবসায় গ্রহণ করিত, তাহাদিগকে দিতেন। সেই জন্যই বাংলায় হেলে কৈবর্ত ও জেলে কৈবর্ত বলিয়া দুইটি জাতি হইয়াছিল। এক দলে বৌদ্ধ-দীক্ষা পাইত আর-এক দল পাইত না। কিন্তু দীক্ষা পাইত না বলিয়া যে তাহারা বৌদ্ধ ছিল না একথা যেন কেহ মনে না করেন। কারণ শিক্ষা-দীক্ষা না পাইলেও কেবল মাত্র 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' 'ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি' 'সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি' বলিলেই তাহারা বৌদ্ধ হইতে পারিত অর্থাৎ ভিক্ষু মহাশয়েরা তাহাদিগকে কোনোরূপ শিক্ষা-দীক্ষা না দিয়াও তাহা-দিগের নিকটে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিতেন।

এখন যাঁহারা হিন্দুধর্মের ও ব্রাহ্মণদের প্রধান ভক্ত তাঁহাদের পূর্ব-পুরুষেরা প্রায় সকলেই তখন বৌদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধদের যে-সকল সংস্কৃত গ্রন্থ আছে— তাহাদের গ্রন্থকার অনেকেই কায়স্থ বলিয়া আপনা-দিগকে পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আচার্য, উপাধ্যায়,

ভদন্ত, ভিক্ষু, পিণ্ডপাতিক এবং মহোপাধ্যায় প্রভৃতি নামে ভূষিত হইতেন।

গুপ্ত উপাধিধারী বহু-সংখ্যক লোকে বৌদ্ধগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে রামপাল রাজার সময় অভয়াকর গুপ্ত[১৫] একজন পরম পণ্ডিত এবং প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। বৌদ্ধেরা তখন কোনো ব্রাহ্মণকে আপনাদের দলে টানিতে পারিলে বড়োই আনন্দিত হইত। কেন-না তাহা হইলে তাহাদের সংস্কৃত পুস্তক লিখাইবার বড়োই সুবিধা হইত। এখন নেপালে অবিবাহিত ভিক্ষু নাই। ভিক্ষুরা সকলেই বিবাহ করে, সন্তান উৎপাদন করে এবং নামে মাত্র ভিক্ষু হয়। তথাপি যদি একজন ব্রাহ্মণের ছেলে পায় তবে এখনো তাহারা অত্যন্ত আদরের সহিত তাহাকে ভিক্ষু করিয়া লয়। ঐরূপ হইবার কারণ, ব্রাহ্মণ-ভিক্ষু ও অন্য জাতি ভিক্ষুর মধ্যে একটু তফাত ছিল— ব্রাহ্মণেরা সুশব্দবাদী হইত অর্থাৎ ব্যাকরণ দুরস্ত করিয়া সংস্কৃত লিখিত কিন্তু অব্রাহ্মণ বৌদ্ধেরা একেবারেই সুশব্দবাদী ছিলেন না, ব্যাকরণের ধারও ধারিতেন না। তাঁহারা বলিতেন, আমরা দেখিব কেবল অর্থশরণতা অর্থাৎ অর্থটি যাহাতে প্রকাশ হয় অর্থাৎ এখানকার নৈয়ায়িকদের যেমন মত ছিল, "অস্মাকানাং নৈয়ায়িকানাং অর্থানি তাৎপর্য্যং শব্দানি কোশ্চিন্তা।" সে যাহা হউক ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধের সংখ্যা কিন্তু অত্যন্ত কম ছিল। গুপ্ত উপাধিধারী প্রভাকর গুপ্ত একজন ভারি বিচারমল্ল ছিলেন। তিনি শুভাকর গুপ্তের[১৬] মত প্রচার করিতেন, সর্ববাদী প্রমথনে শুভাকর সিংহস্বরূপ ছিলেন। ইঁহারা দুই জনে শুভাকর গুপ্তের দ্বারা একখানা বৌদ্ধদের স্মৃতির গ্রন্থ লেখান। তাহার কিয়দংশ পাওয়া গিয়াছে। কর উপাধিধারী অনেকেও বৌদ্ধগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। কয়েক জন তৈলিকপাদ বৌদ্ধধর্ম প্রচারে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। বণিকদের তো কথাই নাই। ইঁহারাই বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিতেন ও বিহারের অনেক খরচ চালাইতেন। তদ্ভিন্ন মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিতেন, মঠ প্রতিষ্ঠা করিতেন ও পুস্তক লিখিয়া মঠকে দান করিতেন। ঐরূপে সকল জাতির লোকেই তখন বৌদ্ধধর্মের গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। মাছ মারিয়া খায় যে কেবর্ত সেও বাদ যায় নাই। পাল রাজারা তো বৌদ্ধ ছিলেনই। তাঁহাদের অধীন যত ছোটোছোটো রাজা ছিলেন তাঁহারাও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন।

তবে মানতের বেলা তাঁহারা কোনো ধর্মই বাছিতেন না। রোগ শান্তি, ভূত শান্তি, যুদ্ধে জয়-পরাজয় এই-সকলের জন্য সব রকমের দেবতার মানত করিতেন, 'মহাভারতে'র পাঠ শুনিতেন, ব্রাহ্মণদের বাড়ি যজ্ঞে উপস্থিত থাকিতেন, হোমের ফোঁটা লইতেন, ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান করিতেন, বিষ্ণু শিব প্রভৃতির মন্দির নির্মাণ করিয়া দিতেন। অথচ তাঁহারা বৌদ্ধ ছিলেন। কারণ, ঐ সঙ্গে সকালে উঠিয়া তাঁহারা 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' 'ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি' 'সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি' বলিতেন, সংঘ-ভোজন করাইতেন, সম্যক্ সম্ভোজন* করাইতেন, স্তূপ নির্মাণ করাইতেন, বিহার নির্মাণ করাইতেন, বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করাইতেন এবং নানাবিধ বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণ করাইতেন।

বৌদ্ধধর্ম তো শুধু শীল ও বিনয় লইয়া— তাহার মধ্যে দেবদেবীর মূর্তি কোথা হইতে আসিল? ব্রহ্মদেশ, সিংহল প্রভৃতি দেশে এখনো দেবদেবীর প্রাদুর্ভাব তত নাই। কিন্তু বাংলায় খুব ছিল। যাহারা বাংলা হইতে বৌদ্ধধর্ম পাইয়াছে তাহাদের মধ্যেও খুব আছে। যাহারা সিংহলের বৌদ্ধধর্ম দেখিয়া বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা করিয়াছেন তাঁহাদের দেবদেবীর কথা শুনিলে আশ্চর্য বোধ হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবিক মহাযান মতে অনেক দেবদেবী আসিয়া জুটিয়াছিল। মহাযান মতটা বড়োই দার্শনিক মত কিনা— একেবারে সাংখ্য ভাঙিয়া অদ্বয়বাদে উপস্থিত কিনা— তাই উহাতেই দেবদেবী সকলেরা আগেই আসিয়া জুটিলেন। বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ— মহাযান মতে এই তিনটি জিনিস সূক্ষ্ম হইয়া দাঁড়াইল প্রজ্ঞা, উপায় ও বোধিসত্ত্ব। বুদ্ধ হইলেন উপায়, ধর্ম হইলেন প্রজ্ঞা এবং সংঘ হইলেন বোধিসত্ত্ব। দেখিতে দেখিতে প্রজ্ঞা ঠাকুরানী বুদ্ধের শক্তি হইয়া দাঁড়াইলেন; কারণ, উপায় পুংলিঙ্গ এবং প্রজ্ঞা স্ত্রীলিঙ্গ। উভয়ের সংযোগে বোধিসত্ত্বের উৎপত্তি হইল। প্রজ্ঞা নিষ্কাম নিষ্ক্রিয়, উপায়ও নিষ্কাম নিষ্ক্রিয়, সুতরাং সৃষ্টি-স্থিতি-লয় চলে না। একটা সকাম সক্রিয় শক্তির দরকার— তিনি হইলেন বোধিসত্ত্ব। বুদ্ধ ও ধর্মের অপেক্ষা বোধিসত্ত্বের পূজা বেশি বেশি হইতে লাগিল। কারণ, নিষ্কাম নিষ্ক্রিয়ের উপাসনা করিয়া কী হইবে? সুতরাং সকাম সক্রিয় শক্তির

---

* এক বিহারের সকল ভিক্ষুকে খাওয়ানোর নাম সংঘ-ভোজন আর নিকটবর্তী সকল বিহারের সকল ভিক্ষুকে খাওয়ানোর নাম সম্যক্ সম্ভোজন।

উপাসনা হইতে লাগিল— অনেকগুলি বোধিসত্ত্ব ঠাকুর হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের মধ্যে অবলোকিতেশ্বর প্রধান। বর্তমান কল্পের ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভ ও তাঁহার শক্তি পাণ্ডরা ইঁহাদের দুই জনের সংযোগে উৎপন্ন অবলোকিতেশ্বর— বর্তমান কল্পের প্রধান দেবতা। তাঁহার অনেক মূর্তি, অনেক মস্তক, অনেক হস্ত, অনেক পদ, অনেক নাম, অনেক মন্দির। তাঁহার ভক্তের সংখ্যাও অনেক বেশি। কারণ এই কল্পে কাহাকেও বুদ্ধ হইতে হইলে তাঁহার কৃপা ভিন্ন হইবার জো নাই। যাহা হউক, বুদ্ধাদির মূর্তিপূজা প্রচলিত হইবার সময় একটা বড়ো মুশকিল হইল— কারণ, এখন হইতে শক্তির সহিত জড়িত বুদ্ধমূর্তির উপাসনা আরম্ভ হইল। সুতরাং আমরা অর্থাৎ অভক্তেরা যাহাকে অশ্লীল বলি, সেই অশ্লীল মূর্তি সমূহেরও পূজা হইতে লাগিল। ঐ মূর্তির যে কত বিচিত্র ভঙ্গি, আছে তাহা এখনকার লোকে কল্পনা করিতেই পারে না। অনেকে ইহাকে Tantric Buddhism বলেন। তন্ত্রে শিবশক্তি পূজা, যুগলাদ্য মূর্তির উপাসনা— এখানেও বুদ্ধ ও তাঁহার শক্তি পূজা, যুগলাদ্য মূর্তির উপাসনা। সুতরাং এই উপাসনারও নাম হইল তান্ত্রিক বৌদ্ধোপাসনা। বৌদ্ধধর্মে গোড়ায় যে কঠোরতা, কাঠিন্য ছিল এখন তাহা বেশ সরস হইয়া উঠিল। উহাতে লোকেরও মন ভিজিল। লোকে সহজে নির্বাণের পথ পাইল— ইহারই নাম সহজিয়া ধর্ম। সহজিয়া ধর্মের অর্থ ভগবান্ বুদ্ধ যখন সহজ ভাবে থাকেন। যখন তিনি শক্তির সহিত মিলিত, অথচ শক্তির সন্তান-সম্ভাবনা উপস্থিত হয় নাই। এই সময় ভগবানের কাছে যাহা বর চাওয়া যায় তাহাই পাওয়া যায়। এই সময়েই তাঁহার করুণার পরমা স্ফূর্তি। সুতরাং ভক্তের পক্ষেও উপাসনার এই প্রশস্ত সময়। এই যে সরস মধুর ভাব, ইহা ক্রমে অন্য অন্য ধর্মেও ছড়াইয়া পড়িল। বৈষ্ণবের যুগল মিলনও এই সহজরূপেরই রূপান্তর মাত্র ; তবে বৈষ্ণবের সহজিয়া ও বৌদ্ধের সহজিয়া মতে একটু তফাত আছে। বৌদ্ধের সহজিয়া সম্পূর্ণভাবেই রূপক, এবং ঐ রূপক আপনাকে দিয়াও ফলাইতে পারা যায়। কিন্তু বৈষ্ণবের সহজিয়া ঠাকুর-ঠাকুরানীর সহজিয়া— তাহাতে একটু ভক্তিরস থাকে। নিজের দেহের উপর উহার experiment চলে না।

এই যে দেশব্যাপী বৌদ্ধধর্ম, ইহা এখন কোথায় গেল ? যখন সহজিয়া ধর্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাবে বাঙালি একেবারে অকর্মণ্য ও নির্বীর্য হইয়া গিয়াছিল, ঠিক সেই সময় আফগানিস্তানের খিলিজিরা আসিয়া উহাদের সমস্ত বিহার ভাঙিয়া দিল— দেবমূর্তি, বিশেষত যুগলাদ্য মূর্তি চূর্ণ করিয়া দিল— সহস্র সহস্র নেড়া ভিক্ষুর প্রাণনাশ করিল। বড়ো বড়ো বিহারে যে-সকল যথার্থ পণ্ডিত ও সাধু ছিলেন তাঁহারাও ঐ সঙ্গে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন— তাঁহারাই ঐ ধর্মের অস্থি ও মজ্জাস্বরূপ ছিলেন। অস্থি ও মজ্জার নাশ হইলে দেহেরও নাশ হয়, সেইরূপ তাঁহাদের মৃত্যুতে সহজিয়া বৌদ্ধধর্মেরও নাশ হইল।

মুসলমান বিজয়ের এক বা দুই পুরুষ পূর্বে বল্লালসেন রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের সেন্‌সাস লইয়াছিলেন। সাড়ে তিন শত ঘর রাঢ়ী ও সাড়ে চারি শত ঘর বারেন্দ্র হইয়াছিল। ইহার উপর কিছু সাতশতী, কিছু পাশ্চাত্য ও কিছু দাক্ষিণাত্য ছিল। সুতরাং ব্রাহ্মণসংখ্যা তখন সবসুদ্ধ দুই হাজার ঘরের অধিক ছিল বলিয়া বোধ হয় না। এতদিন ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের সহিত ঘোরতর বিচারে প্রবৃত্ত ছিলেন। কখনো তাঁহারা হঠিতেন, কখনো বা ইঁহারা হঠিতেন। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ প্রণীত বহু-সংখ্যক দার্শনিক পুস্তকে এই ঘোরতর বিচারের নিদর্শন পাওয়া যায়। মুসলমান বিজয়ে বৌদ্ধ-মন্দিরের ও বৌদ্ধ-দর্শনের একেবারে সর্বনাশ হইয়া গেল। উহাতে ব্রাহ্মণদের প্রভাব বৃদ্ধি হইল বটে কিন্তু বৌদ্ধের বদলে এখন মুসলমান মৌলবি ও ফকির তাহাদের প্রবল বিরোধী হইয়া উঠিল। সুতরাং দেশের যেখানে যাহার জোর বেশি সেখানে তাহার আধিপত্য বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ঐরূপে বাংলার অর্ধেক বৌদ্ধ মুসলমান হইয়া গেল এবং অপর অর্ধেক ব্রাহ্মণের শরণাগত হইল আর বৌদ্ধাদিগের মধ্যে যাহারা তখন নিজের পায়ে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল— মুসলমান ও ব্রাহ্মণ উভয় পক্ষ হইতেই তখন তাহাদের উপর নির্যাতন উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে অনাচরণীয় করিয়া দিলেন অর্থাৎ অসভ্য বাগদি, কৈবর্ত, কিরাতের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন— আর মুসলমানেরা তাহাদের উপর নানারূপ দৌরাত্ম্য করিতে লাগিল। কিন্তু

এই ধর্মপ্রচার ব্যাপারে ব্রাহ্মণদের একটু বাহাদুরি দিতে হয়। তাহারা বাংলার রাজশক্তির সাহায্য প্রায়ই পায় নাই, তথাপি পাঁচটি মাত্র প্রাণী আসিয়া অর্ধেক দেশটাকে যে অল্পকালের মধ্যে হিন্দু করিয়া ফেলিয়াছিল ইহা অল্প বাহাদুরির কাজ নয়।

বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবকালে যাহারা অনাচরণীয় ছিল এবং মুসলমানাধিকারের পরে নূতন সমাজে যাহারা অনাচরণীয় হইল— বৌদ্ধধর্ম শেষে তাহাদের মধ্যে নিবদ্ধ হইয়া পড়িল এবং তাহারা ক্রমে প্রজ্ঞা, উপায় ও বোধিসত্ত্ব ভুলিয়া গেল। শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ, করুণাবাদ ভুলিয়া গেল; দর্শন ভুলিয়া গেল। শীল বিনয় ভুলিয়া গেল। তখন রহিল জনকতক মূর্খ ভিক্ষু অথবা ভিক্ষু নামধারী বিবাহিত পুরোহিত। তাহারা আপনার মতো করিয়া বৌদ্ধধর্ম গড়িয়া লইল। তাহারা কূর্মরূপী এক ধর্মঠাকুর বাহির করিল। এই যে কূর্মরূপ ইহা আর-কিছু নহে, স্তূপের আকার। কূর্মের যেমন চারিটি পা ও গলা— এই পাঁচটা অঙ্গ থাকে, স্তূপেরও তেমনি পাঁচটা অঙ্গ থাকিত। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম চারি দিকে চারিটি ধ্যানীবুদ্ধ থাকিতেন এবং দক্ষিণ-পূর্ব কোণে আর-একটি ধ্যানীবুদ্ধ থাকিতেন— এইরূপে স্তূপটি পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের আবাসস্থান হইয়া ধর্মের সাক্ষাৎ মূর্তিরূপে পরিগণিত হইত। সুতরাং কূর্মরূপী ধর্ম ও স্তূপরূপী ধর্ম একই। পঞ্চ বুদ্ধের প্রত্যেকের যেমন একটি করিয়া শক্তি ছিল, ধর্মঠাকুরেরও তেমন একটি শক্তি হইলেন, তাঁহার নাম কামিণ্যা। তিনি সব দেবতার বড়ো। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ভগবতী, বিশালাক্ষী, বাশুলি, কালী, গণেশ, রাজা, কোটাল, মন্ত্রী, এই-সকল ধর্মঠাকুরের আবরণ দেবতা। ধর্মঠাকুর আজও যে বাঁচিয়া আছেন, সে কেবল মানতের জোরে। নদীয়ার উত্তর জামালপুরের ধর্মঠাকুরের মন্দিরে বৈশাখি পূর্ণিমার দিনে বারো শত পাঁঠা পড়ে। ধর্মঠাকুর প্রত্যেক স্থানেই কোনো-না-কোনো রোগের ঔষধ দেন। বোড়ালের ধর্মঠাকুর 'ক্ষুদিরায়' রক্তামাশয়ের ঔষধ দেন। সোঁয়াগাছির ধর্মঠাকুর পেটের অসুখের ঔষধ দেন। বৈঁচির নিকটে অচলরায় পিত্তফোটের ঔষধ দেন। তিনি অনাচরণীয় জাতির হাতে পূজা খাইতে ভালোবাসেন। তাঁহার সেবকেরা প্রায় ডোম, হাড়ি ইত্যাদি অনাচরণীয় জাতি।

ধর্মমঙ্গলের কালুরায়কে লাউসেন যখন স্বর্গে নিতে চাহিলেন, কালুরায় (ডোম) তখন জিজ্ঞাসা করিল, সেখানে মদ ও শূয়রের মাংস পাওয়া যায় কিনা। লাউসেন বলিলেন, "না।" কালুরায় উহা শুনিয়া বলিল, "আমি যাইব না।" লাউসেন তখন কালু ডোমের উপর ধর্মঠাকুরের পূজার ভার দিয়া গেল। সেই অবধি ডোমেরা তাঁহার প্রধান পূজক। বাংলা দেশে ইহাই বৌদ্ধ ধর্মের শেষ পরিণাম।[১৭]

'উদ্বোধন'
আষাঢ়, ১৩২৪ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য।

বৈশাখি পূর্ণিমায় কলকাতায় বিবেকানন্দ সোসাইটি আয়োজিত বুদ্ধোৎসব সভায় প্রবন্ধটি পড়া হয়েছিল।

১. এই বইয়ের পৃ. ৩০৫ সূত্র ৭ দ্র.

"বঙ্গা বগধাশ্চেরপাদাঃ"— 'ঐতরেয় আরণ্যকে'র এই উক্তি অবলম্বন করে শাস্ত্রীমশায়ের দৃঢ় বিশ্বাস দাঁড়িয়েছিল যে বাংলা দেশের বাগদিরাই 'ঐতরেয় আরণ্যক' উল্লিখিত 'বগধ' জাতির অধস্তন পুরুষ। নৃবিদ্যার কথা বলতে পারি না তবে শব্দবিদ্যার তরফে এই কথা জোর করে বলতে পারি যে, বগধ শব্দ থেকে বাগদি শব্দ আসা কিছুতেই সম্ভব নয়। 'ব', 'ম' হতেও পারে কিন্তু শব্দ মধ্যবর্তী 'গ' কখনো অবিকৃত থাকতে পারে না এবং 'ধ'ও নয়।

কোথা থেকে শাস্ত্রীমশায় এই সংবাদ পেয়েছিলেন যে বাগদিদের একটি স্বতন্ত্র কথ্য ভাষা ছিল, তার কোনো হদিশ নেই। তাঁর এ অনুমান আমার মতে সম্পূর্ণ মরীচিকা কল্পনা। শব্দবিদ্যার অনুসন্ধানে দীর্ঘকাল ব্যাপৃত থেকে আমি বাংলায় শুধু একটি মাত্র 'জাতি' ভাষার (Caste Language) একদা অস্তিত্বের সন্ধান পেয়েছিলুম। কিন্তু সেও ঠিক ভাষা নয়, বিশিষ্ট ভাষাকোষ (Vocabulary) মাত্র। নিম্ন দামোদর অঞ্চলে মুচিদের মধ্যে আমি বিশিষ্ট শব্দাবলীময় ভাষার অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছিলুম এবং সে ভাষার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দিয়েছিলুম *Indian Linguistics* পত্রিকার 'সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অভিনন্দন খণ্ডে' (১৯৫৫ খৃ.)

শ্রীসুকুমার সেন।

২. কিরাত শব্দটি সম্ভবত কোনো চীন-তিব্বতীয় উপজাতির নামের সংস্কৃত রূপ। পূর্ব নেপালের অধিবাসী ভোট-বর্মি কিরান্তি জাতি কিরাতদের কোনো শাখা হওয়া একান্তই সম্ভব। কিরাতেরা মঙ্গোলীয় জাতি থেকে

উদ্ভূত এবং ভারতের অন্যতম প্রাচীন আদিবাসী। এ'দের প্রাচীনতম উল্লেখ আছে যজুর্বেদে। 'বাজসনেয়িসংহিতা' (৩০.১৬) ও 'তৈত্তিরীয়-ব্রাহ্মণে' (৩.৪.১২.১) এ'দের পার্বত্য গুহাবাসী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে প্রায়ই কিরাতদের অসভ্য পার্বত্য-বন্য উপজাতি বলে উল্লেখ করা হলেও 'মহাভারতে' অর্জুনকে পরীক্ষা করার জন্য শিব ও পার্বতীর কিরাত-কিরাতীর ছদ্মবেশ নেবার গল্প আছে। এই গল্প কিরাতদের মর্যাদা স্বীকারেরই প্রমাণ বহন করছে। নৃতত্ত্ব এবং ভাষা-তত্ত্বের বিচারে মনে করা হয়, এই মঙ্গোলীয় জাতি খৃস্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে আসে এবং কালক্রমে হিমালয়ের পূর্ব ও উত্তর অঞ্চলে ছড়িয়ে যায়। দ্র. Suniti Kumar Chatterji, *Kirāta-Jana-Kṛti*. The Asiatic Society, Calcutta 1974, pp 28-36.

৩. পৌণ্ড্রবর্ধন, পুণ্ড্রবর্ধন উত্তরবঙ্গের প্রাচীনতম নগর। বর্তমান বাংলাদেশের বগুড়া শহর থেকে ১১/১২ কিলোমিটার দূরে করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে মহাস্থানগড়ের বিস্তীর্ণ এলাকায় পুণ্ড্রবর্ধনের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। স্থলপথ বাণিজ্যের যোগাযোগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এই সমৃদ্ধ নগর বহু-শতাব্দী ধরে শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং আঞ্চলিক শাসন-ব্যবস্থার প্রধান কেন্দ্র ছিল। মৌর্য আমল থেকে ত্রয়োদশ শতকে হিন্দু আমল পর্যন্ত পুণ্ড্র-বর্ধনের গৌরব অম্লান ছিল। আনুমানিক ৬৩৮ খৃস্টাব্দে হিউয়েন্-ৎসাঙ দেখেছিলেন এই নগরের পরিধি প্রায় ১০ কিলোমিটার এবং নগরটি জলাশয় ফুল-ফলের বাগানে সাজানো। উৎখননের ফলে পুণ্ড্রবর্ধনের ধারাবাহিক ইতিহাস উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

৪. এই বইয়ের পৃ. ৪৭ সূত্র ২ দ্র.

৫. এই বইয়ের পৃ. ২৫৯ সূত্র ১৯ দ্র.

৬. এই বইয়ের পৃ. ১০৯ সূত্র ১৩ দ্র.

৭. কুমারগুপ্তের রাজত্বকাল ৪১৪-৫৫ খৃস্টাব্দ। উত্তরবঙ্গ তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। শাস্ত্রীমশায় এখানে কলাইকুড়ি-সুলতানপুর তাম্রশাসনের কথা বলেছেন। শাসনটির তারিখ ১২০ সংবৎসর, গুপ্ত সংবতের ১২০ অব্দ, ১ বৈশাখ; খৃস্টাব্দ ৪৩৯-৪০। এই শাসনে শৃঙ্গবের বীথীর (আধুনিক মহকুমার মতো প্রদেশের প্রশাসনিক এলাকা) অন্তর্গত পূর্ণ-

কৌশিকা থেকে আয়ুক্তক (বীথীশাসক) অচ্যুতদাস ও এই বীথীর অধিকরণ (পঞ্চায়েতের মতো শাসনসভা) তিন জন "বাজসনেয় চরণের চতুর্বেদী" ব্রাহ্মণকে অক্ষয়নীবীস্বরূপ (দান-বিক্রির অধিকারহীন স্থায়ী-ভাবে ভোগের যোগ্য) জমি দানের নির্দেশ দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ তিন জনের নাম দেবভট্ট, অমরদত্ত এবং মহাসেনদত্ত। নামের সঙ্গে দত্ত পদবি থাকলেও শেষের দু জনও ব্রাহ্মণ। তাই একজন ব্রাহ্মণকে নয়, তিন জন ব্রাহ্মণকে জমি দানের উল্লেখ আছে। দ্র. দীনেশচন্দ্র সরকার, 'শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ', কলকাতা ১৯৮২, পৃ. ২২-২৯, ২০৯।

৮. এখানে ধর্মাদিত্যের প্রথম (৩ রাজ্যাঙ্ক) ও দ্বিতীয় কোটালিপাড়া তাম্র-শাসন এবং গোপচন্দ্রের ১৮ রাজ্যাঙ্কের কোটালিপাড়া তাম্রশাসনের কথা বলা হয়েছে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য এবং সমাচারদেব ও জয়নাগ বাংলায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছিলেন। গোপচন্দ্র এবং ধর্মা-দিত্যের মধ্যে কে আগে রাজত্ব করেছিলেন এ বিষয়ে মতভেদ আছে। ধর্মাদিত্যের শাসন দুটিতে বারক মণ্ডলে, আধুনিক ফরিদপুরে চন্দ্রস্বামী এবং বসুদেবস্বামী ও গর্গস্বামী নামে ব্রাহ্মণ জমির গ্রহীতা। গোপচন্দ্রের শাসনে গ্রহীতা লৌহিত্য-তীরবাসী কাণ্বগোত্রের ব্রাহ্মণ ভট্টগোমীদত্তস্বামী।

কোটালিপাড়ায় পাওয়া ৫ খানি তাম্রশাসনের মধ্যে ধর্মাদিত্যর দু খানি ও গোপচন্দ্রের একখানি লিপি (*I-A*, xxxix, 1910, pp. 139-216) এবং সমাচারদেবের একখানি লিপি (*J-A-S-B.*, NS. vii, p. 476) Frederic Eden Pargiter সম্পাদনা করেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই চারটিকেই জাল বলেছিলেন (*J-A-S-B.*, N.S. vi, p. 429; vii p. 289; x. p. 425) রাখালদাসের মত গ্রাহ্য হয় নি।

৯. এই বইয়ের পৃ. ৪৬ সূত্র ১ দ্র.

১০. মীমাংসা-দর্শনের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কুমারিল ভট্ট, জীবৎকাল খৃস্টীয় সপ্তম শতক। জন্মস্থান মধ্যভারত, মতান্তরে কামরূপ অঞ্চল। 'শঙ্করদিগ্বিজয়' গ্রন্থে শংকরের উক্তিতে বলা হয়েছে, বেদবিহিত কর্মে বিমুখ সুগত-পন্থীদের পর্যুদস্ত করার জন্য গুহ (কার্তিকেয়) কুমারিলরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। রাজশক্তির পোষকতায় পুষ্ট সুগত-পন্থী অর্থাৎ বৌদ্ধদের প্রতিপত্তিতে বেদ চর্চা শিথিল হয়ে এসেছিল। বৌদ্ধরা নিজেদের সিদ্ধান্তের অনুকূলভাবে শ্রুতি ও মীমাংসারও ব্যাখ্যা করতেন। এই সময়ে কুমারিলভট্ট মীমাংসাকে আস্তিক পথে আনবার জন্য যত্নবান্ হয়েছিলেন।

'শ্লোকবার্ত্তিকে'র শুরুতে কুমারিল বলেছেন—

প্রায়েনৈব হি মীমাংসা লোকে লোকায়তীকৃতা।

তামাস্তিকপথে কর্ত্তুমরং যত্নঃ কৃতো ময়া॥ এই তত্ত্বগত সংগ্রামের দায়িত্ব পালনের জন্যই তাঁকে কার্তিকেয়র অবতাররূপে মাননা করা হয়। বেদব্যাসের শিষ্য জৈমিনি 'মীমাংসাদর্শন' নামে মূল সূত্রগ্রন্থ রচনা করেন। 'মীমাংসাদর্শনে'র ভাষ্য রচনা করেন শবরস্বামী। ভারতীয় দর্শনসূত্রের ভাষ্য যা-কিছু রচিত হয়েছিল তার মধ্যে শবরস্বামীর ভাষ্যই সম্ভবত প্রাচীনতম। শবরস্বামীর ভাষ্য অনুসরণ করে কুমারিল 'শ্লোক-বার্ত্তিক', 'তন্ত্রবার্ত্তিক' ও 'টুপটীকা'— এই তিনখানি গ্রন্থ লেখেন। 'শ্লোকবার্ত্তিকে' তিনি জৈন-বৌদ্ধ প্রভৃতি মত খণ্ডন করে বেদের অপৌরুষেয়ত্ব, স্বতঃপ্রামাণ্য এবং বেদের অনুকূল সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করেছেন। 'মীমাংসাসূত্রে'র প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদ— "তর্কপাদে"র শাবরভাষ্য 'শ্লোকবার্ত্তিকে'র অবলম্বন। সম্পূর্ণ শ্লোকে রচিত। 'তন্ত্র-বার্ত্তিকে'র অবলম্বন "তর্কপাদে"র পর থেকে তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত অংশের শাবরভাষ্য। 'তন্ত্রবার্ত্তিক' গদ্য ও পদ্য মিশিয়ে লেখা। অবশিষ্ট শাবরভাষ্যের ব্যাখ্যা 'টুপটীকা' বা 'অনুষ্টুপটীকা'। অনুষ্টুপ ছন্দে লেখা 'টুপটীকা' এখন পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় গদ্য পাঠ। দ্র. ভূতনাথ সপ্ততীর্থ, "কুমারিলভট্ট", 'ভারতকোষ'; সুখময় ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ, 'পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন', কলকাতা ১৯৮৩ খৃ., পৃ. ৭-১৩।

১১. 'মহাবীরচরিত', 'উত্তররামচরিত', 'মালতীমাধব' প্রণেতা ভবভূতির কাল সম্পর্কে অনিশ্চয়তা আছে। তিনি কালিদাসের পরবর্তী লেখক। কলূহণের 'রাজতরঙ্গিণী'তে কান্যকুব্জরাজ যশোবর্মনের আনুকূল্যপুষ্ট বলে একসঙ্গে ভবভূতি এবং বাক্পতিরাজের উল্লেখ আছে। বাক্পতিরাজ যশোবর্মনের প্রশস্তিময় 'গৌড়বহ' কাব্যে ভবভূতির উদ্দেশে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। 'গৌড়বহ' ৭৩৬ খৃস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে, কাশ্মীর-রাজ ললিতাদিত্যের হাতে যশোবর্মনের পরাজয় ও লাঞ্ছনার আগে লেখা হয়েছিল। এই তথ্যের ভিত্তিতে মনে করা হয় ভবভূতি সপ্তম শতাব্দীর শেষ বা অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। কাশ্যপ গোত্রের কোনো ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বংশে তাঁর জন্ম। বাবার নাম নীলকণ্ঠ, মা জাতুকর্ণী। পদবি উদুম্বর। তাঁর নিবাস ছিল সম্ভবত বিদর্ভের পদ্ম-পুর নামে কোনো জায়গায়। 'মালতী-মাধব' নাটকের একটি পুথিতে তৃতীয় অঙ্কের পুষ্পিকায় এই নাটক কুমারিল-শিষ্যের রচনা বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। মাত্র একটি পুথির উল্লেখ থেকে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যায়

না। তবে সময়ের দিক থেকে ভবভূতির পক্ষে কুমারিলের শিষ্য হওয়া অসম্ভব নয়, বিশেষত তাঁর নাটকে মীমাংসাদর্শনে অর্জিত বিদ্যার পরিচয় আছে। দ্র. *H-S-L*, pp. 277-78.

১২. এই বইয়ের পৃ. ৮৫ সূত্র ১ দ্র.

১৩. বিজয় সিংহের কাহিনী আছে খৃস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতকে লেখা সিংহলের পালি গ্রন্থ 'দীপবংস' এবং 'মহাবংসে'। "লাঢ়" দেশের রাজা সিংহবাহুর ছেলে বিজয়। অশিষ্ট আচরণের জন্য ৬৯৯ জন অনুচর সহ সিংহবাহু তাঁকে নির্বাসিত করেন। নৌকায় ভাসতে ভাসতে বিজয় লঙ্কায় পৌঁছন বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের দিনে (৪৮৩ বা ৪৮৬ খৃ. পূ.)। সিংহলে তিনি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই কাহিনীর সত্যাসত্য নির্ণয়ের মতো কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় নি। "লাঢ়"কে বাংলার "রাঢ়" অনুমান করে বিজয় সিংহকে বাঙালি বলা হয়। ভিন্নমতে "লাঢ়" "লাট", অর্থাৎ গুজরাট। শাস্ত্রীমশায় 'মহাবংসে' বিধৃত বুদ্ধদেবের উক্তি এখানে ব্যবহার করেছেন। 'মহাবংসে'র বর্ণনায় পরিনির্বাণের সময়ে সমবেত দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্রের উদ্দেশে বুদ্ধদেবের উক্তিতে বাংলা দেশ নয়, "লাঢ়"-এরই উল্লেখ আছে।

১৪. মেদিনীপুর জেলার তমলুক, প্রাচীন নাম তাম্রলিপ্ত। সিংহলের 'মহাবংস' গ্রন্থে উল্লেখ আছে অশোকের নির্দেশে মহেন্দ্র এবং সংঘমিত্রা বোধিদ্রুমের চারা নিয়ে এই বন্দর থেকে সিংহলে গিয়েছিলেন। খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক প্লিনি এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর গ্রীক লেখক টলেমির রচনায় তাম্রলিপ্তর উল্লেখ আছে। পঞ্চম শতাব্দীর গোড়ায় চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এখানে ২২টি সংঘারাম দেখেছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন্-ৎসাঙ ১০টি সংঘারাম দেখেন। এক হাজারের বেশি ভিক্ষু এইসব সংঘারামে বাস করতেন। উৎখননে আবিষ্কৃত পুরা-নিদর্শন থেকে মৌর্য, শুঙ্গ এবং কুষাণযুগের নাগরিক সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। হিউয়েন-ৎসাঙের বিবরণ অনুযায়ী তখন সমুদ্রের একটি খাড়ির উপরে তাম্রলিপ্তের অবস্থান ছিল। স্থলপথ এবং জলপথ মিলিত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে এই নগর ব্যাবসার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

১৫. শরচ্চন্দ্র দাস তিব্বতি সূত্রে পাওয়া তথ্য নির্ভর করে অভয়াকর গুপ্ত নবম খৃস্টাব্দের মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন বলেছেন। ফণীন্দ্রনাথ বসু মনে করেন, অভয়াকরের জন্ম একাদশ খৃস্টাব্দের শেষ বা দ্বাদশের

প্রথমে। (*Indian Teachers of Buddhist Universities*, p. 81)। জন্ম গৌড়ে, শিক্ষা মগধে। অধ্যয়ন-অধ্যাপনার জন্য অভয়াকর কঠোর পরিশ্রম করতেন। শব্দবিদ্যা, শিল্পস্থানবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, হেতুবিদ্যা, অধ্যাত্মবিদ্যা— এই পাঁচ বিষয়ে তিনি পারংগম ছিলেন। রাজা রামপাল প্রাসাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য তাঁকে আহ্বান করতেন। দীপংকরের মতো অভয়াকরের রচনা ও অনুবাদের সংখ্যা অনেক। তিনি তিব্বতিভাষা ভালো জানতেন। 'শ্রীমহাকালসাধননাম', 'শ্রীমহাকালান্তরসাধননাম' প্রভৃতি ৭খানি তন্ত্রের বই তিব্বতিভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। 'শ্রীকালচক্রোদ্দান', 'শ্রীচক্রসংবরাভিসময়', 'স্বাধিষ্ঠানকর্মোপদেশনাম' প্রভৃতি ২৬খানি গ্রন্থ তাঁর মৌলিক রচনা। তেঙ্গুরের তালিকায় তাঁর নামের সঙ্গে পণ্ডিত, মহাপণ্ডিত, আচার্য, সিদ্ধ ও স্থবির বিশেষণ যুক্ত দেখা যায়।

১৬. এই বইয়ের পৃ. ২৫৮ সূত্র ১৮ দ্র.

১৭. ধর্মপূজা বিষয়ে তথ্যের জন্য এই বইয়ে পৃ. ২২২-২৬ দ্র.

হিন্দু বৌদ্ধে তফাত।

হিন্দু, দেবতা উপাসনা করেন। বৌদ্ধ, গুরুর উপাসনা করেন। হিন্দু ও বৌদ্ধে এই প্রথম ও প্রধান তফাত। হিন্দু দেবতা উপাসনা করেন; তাঁহাদের উদ্দেশ্য— দেবতার সঙ্গে একলোকে বাস করেন, সমান আকার প্রাপ্ত হন, সমান অলৌকিক শক্তি লাভ করেন, এমন-কি, একদেশে দেবতার দেহের সহিত মিলিত হন। পুরা মাত্রায় দেবতা হন, একথা তাঁহারা মনেও ধারণা করিতে পারেন না। বৌদ্ধেরা গুরু ভজনা করেন; তাঁহাদের উদ্দেশ্য— গুরু হইবেন, বুদ্ধ হইবেন, শূন্য হইবেন। শূন্যে শূন্য মিশিয়া যাইবে।

বৌদ্ধেরা দেবতাকে অত্যন্ত ছোটো বলিয়া মনে করেন। দেবতারা

মানুষের চেয়ে একটু বড়ো হইতে পারেন, কিন্তু গুরুর চেয়ে তাঁহারা অনেক নিচে। শাক্যমুনি যখন বোধিমূলে বসিয়া বোধিলাভ করিলেন, ইন্দ্র ও ব্রহ্মা তাঁহার পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। ইন্দ্র ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গের অধিপতি, ব্রহ্মা রূপলোকের অধিপতি : ইঁহারা দু জনেই বুদ্ধের কাছে জোড়হস্ত। 'নারায়ণপরিপৃচ্ছা' নামক পুস্তকে আছে যে, নারায়ণ সাজিয়া-গুজিয়া, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধারণ করিয়া, গরুড় আসনে বসিয়া বুদ্ধদেবের নিকটে আসিলেন এবং গূঢ় দার্শনিক মতের মীমাংসা করিয়া লইয়া গেলেন। শাক্যসিংহ যখন জন্মাইলেন, তখন শাক্যদের নিয়ম অনুসারে খোকাটিকে মহেশ্বরের মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইল। মহেশ্বর নিজে উঠিয়া ছেলেটিকে কোলে করিয়া লইলেন। এই-সকল দেখিয়া বেশ জানা যায় যে, আমাদের যে বড়ো বড়ো দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, সকলেই বুদ্ধ অপেক্ষা অনেক ছোটো। কিন্তু বেদের সময় হইতেই আমরা ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবতার পূজা করিয়া আসিতেছি। বেদে যজুর্বেদী ব্রাহ্মণ, দেবতাদের আহার, আহারের স্থান, সব তৈয়ার করিতেন ; ঋগ্বেদী তাঁহাদের হব বা আহ্বান করিতেন। তাঁহারা খাইতে বসিলে সামবেদী আহারের সময় তাঁহাদের স্তব উচ্চৈঃস্বরে গান করতেন। দেবতারা আহারে তৃপ্ত হইয়া তাঁহাদের বর দিয়া যাইতেন, যথা— পুত্র, পশু, দ্রবিণ ইত্যাদি। বেদের পর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর আমাদের উপাস্য দেবতা হইলেন। তাঁহাদের কাছেও আমরা বর চাহিতাম— ধন দাও, পুত্র দাও, পশু দাও। যাঁহারা পার্থিব সুখের জন্য ব্যগ্র নহেন, তাঁহারা সার্ষ্টি, সালোক্য, সারূপ্য ও বড়ো জোর সাযুজ্য প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু বৌদ্ধদের চরম প্রার্থনা, নির্বাণ ও বুদ্ধত্বপ্রাপ্তি। অনুপাধিশেষনির্বাণ বা শূন্যে মিশিয়া যাওয়া।

আমরা ঠাকুরদের ধ্যান করি। বলি—"ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং, ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী", অথবা বলি—"বন্দে শৈলসুতাসুতং", "ভজামি, প্রণমামি" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করি। কিন্তু বৌদ্ধেরা যখন তাঁহাদের দেবতাদের ধ্যান করেন, তাঁহারা "আত্মানং অমুকদেবতারূপেণ বিভাব্য" পূজা করেন, আমিই বজ্রযোগিনী হইয়াছি, আমিই লোকেশ্বর হইয়াছি, আমিই প্রজ্ঞাপারমিতা হইয়াছি বলিয়া পূজা করেন। এই-সকল দেবতা ইন্দ্র-চন্দ্রাদি দেবতা হইতে পৃথক্। ইঁহাদের কথা পরে বলিব।

আমাদের দেবতারা অনেক বৌদ্ধ দেবতার পায়ের তলে থাকেন। অনেক সময়ে আমাদের ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরেরও ঐরূপ দুর্দশা বৌদ্ধেরা করিয়া থাকেন।

মহাযানের পর বৌদ্ধদের যেসব যান হইয়াছে, তাহাতে দেবতা আছে। কিন্তু সে-সকল দেবতা দেব ও দেবী, আমাদের দেব ও দেবীদের মতো ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ বা ডিপার্টমেন্টের দেবতা নহেন ; তাঁহারা সকলেই শূন্যের প্রতিমূর্তি। আপনারা পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের[১] নাম শুনিয়াছেন। বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধি ; তাঁহারা পাঁচটি স্কন্ধের শূন্যমূর্তি। পাঁচটি স্কন্ধ কী কী ? রূপস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কারস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ ও বিজ্ঞানস্কন্ধ এই পাঁচটি স্কন্ধের শূন্যমূর্তির নাম পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধ। ইঁহাদের পাঁচটি শক্তি আছেন, রোচনা, মামকী, তারা, পাণ্ডরা, আর্যতারিকা। ইঁহাদের আবার পাঁচ জন বোধিসত্ত্ব আছেন ; গণেশ, মহাকাল, পদ্মপাণি, রত্নপাণি, বিশ্বপাণি। এই শক্তিগুলি ও এই বোধিসত্ত্বগণ সবই শূন্যমূর্তি। এই পনেরোটি শূন্যমূর্তি হইতে অসংখ্য অসংখ্য বুদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি হইয়াছে ; সবই শূন্যমূর্তি। বৌদ্ধেরা— আমরা সেই সেই মূর্তি হইয়া গিয়াছি, এই বিভাবনা বা ধ্যান করিয়া তাঁহাদের পূজা করেন। আমরা শূন্যমূর্তির ধ্যানই করি না। আমরা আমাদের সম্মুখে যে মূর্তি, তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া, তাঁহাকে দেবতা করিয়া লইয়া ধ্যান করি।

আমাদের শূন্য অন্ধকার তমোভূত। বৌদ্ধদের শূন্য প্রভাস্বর, স্বয়ংপ্রকাশ, স্বয়ংজ্যোতিঃ। আমাদের আদিসৃষ্টি আছে। বৌদ্ধদের মতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ অনাদিপ্রবাহ। উহার আদিও নাই, অন্তও নাই। বুদ্ধদেবকে সৃষ্টির কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, তোমার আপনার চরকায় তেল দাও। তুমি কোথা থেকে এলে, কোথায় যাইবে, তাই ভাবো। পৃথিবীর কথা ভাবায় তোমার দরকার নাই। আকাশ কোথা হইতে হইল, জিজ্ঞাসা করিলেও সেই কথাই বলিতেন। সুতরাং তাঁহার কাছে সৃষ্টিকথা শুনিবার আশা নাই। যখন বৌদ্ধদের মধ্যে যুবা বৃদ্ধে দলাদলি হইল, তখন যুবকেরা প্রথম যে বই লেখে, সেই 'মহাবস্তু অবদানে' লেখা আছে, আগে বহুদিন পূর্বে— কত কল্পকোটি বৎসর পূর্বে, তাহার ঠিকানা নাই, জীব ছিলেন—তাঁহারা স্বয়ংপ্রকাশ, তাঁহাদের

শরীরে ভার ছিল না, তাঁহারা দিক, কাল, আকাশে ইচ্ছামতো ঘুরিয়া বেড়াইতেন, তাঁহাদের দুঃখ ছিল না, নিরন্তর প্রীতি সুখে বিচরণ করিতেন। কিছুকাল পরে একটা হ্রদের মতো দেখা দিল। উহাতে অতি পাতলা অথচ অতি সুমিষ্ট জলের মতো একটা পদার্থ ছিল; তাই অনেকে খাইতে লাগিলেন, খাইতে খাইতে তাঁহাদের শরীরে একটু একটু ভাব বোধ হইতে লাগিল। আবার বহুকাল পরে আর-একটা কী বাহির হইল, তাহা খাইতে খাইতে তাঁহাদের শরীরে তেজ বা আলো ক্রমে কমিতে লাগিল। ক্রমে গাছ দেখা দিল, সমস্ত গাছই ফলভরে অবনত, সেই ফল তাঁহারা খুব খাইতে লাগিলেন, শরীরের ভারও একটু বাড়িল, আলোও কমিয়া গেল। তাহার পর শস্যক্ষেত্র দেখা দিল, তাঁহারা তাহাও খাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের স্ত্রীত্ব ও পুংচিহ্ন আবির্ভূত হইল, ক্রমে তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি হইতে লাগিল এবং ফসল তৈয়ারি করা দরকার হইল। যখন আমার খেতের ফসল তুমি খাইতে লাগিলে, তখন সকলে একত্র হইয়া একজন মহাকায় পুরুষকে নিয়োগ করা হইল। তাঁহার বেতন নির্ধারণ করা হইল, উৎপন্নের ৬ ভাগের একভাগ। তাঁহার নাম হইল মহাসম্মত। এইসব পড়িয়া আমরা দেখিতে পাই যে, হিন্দুরা যে অন্ধকার হইতে সৃষ্টি বলিয়াছেন, ইঁহারা তাহা বলেন না। ইঁহারা বলেন, আলো হইতেই অন্ধকার হইয়াছে। আর হিন্দুরা যে বলেন, "অষ্টাভির্লোকপালানাং মাত্রাভির্নির্ম্মিতো নৃপঃ" অর্থাৎ রাজা দেবাংশ, ইঁহারা তাহাও বলেন না। ইঁহাদের রাজা গণদাস; লোকে তাঁহাকে বাছিয়া লইয়া বেতন দিয়া রাখিয়াছে। উত্তর অঞ্চলের বৌদ্ধেরা রাজাকে কখনোই বড়ো বলিয়া মানিত না। সেইজন্য ভারতবর্ষে ও চীনে রাজাদের হাতে তাহাদের অনেক নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। সময়ে সময়ে সমস্ত বৌদ্ধ সংঘ বিনাশ করিয়া ফেলা হইত। রাজাদের হাতে হিন্দুদের এ দুর্ভোগ বড়ো ভুগিতে হয় নাই।

বৌদ্ধধর্ম নগরের পক্ষেই সুবিধা। হিন্দুধর্ম নগর ও গ্রাম, সর্বত্রই সমান ভাবে আদর পাইত। কৌটিল্য বৌদ্ধদের বড়ো ভালো চক্ষে দেখিতেন না। তিনি এক জায়গায় বলিয়াছেন, উহাদিগকে পাড়াগাঁয়ে, যেখানে লোক চাষবাস করিয়া খায়, সেখানে যাইতেই দিবে না। নূতন গাঁয়ে উহাদের প্রবেশ নিষেধ। উহারা সেখানে গেলে, লোককে ভিক্ষু

করিতে চেষ্টা করিবে, চাষবাস বন্ধ হইয়া যাইবে। হিন্দুরা গৃহস্থ, তাঁহারা সংসারের উন্নতি চান, বৌদ্ধদের সেদিকে দৃষ্টিই নাই। সেজন্য হিন্দু ও বৌদ্ধে কখনোই ঠিক বনিবনাও হইত না। অথচ হিন্দুরা ভিক্ষা না দিলে বৌদ্ধদের ভিক্ষু হওয়াই চলিত না।

হিন্দুরা বর্ণাশ্রম ধর্ম মানিতেন, তাঁহাদের শেষ আশ্রম যতি বা ভিক্ষু। যে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ না হইয়া যতি হইত, হিন্দুরা তাহাকে ভালো চক্ষে তো দেখিতই না, বরং তাহাকে শাস্তিও দিত। কিন্তু বৌদ্ধেরা বর্ণ ও আশ্রম না দেখিয়াই সকলকে ভিক্ষু করিত। বুদ্ধদেবের সময়েই এই ব্যাপার লইয়া মহা-গোলযোগ উঠে। তিনি যখন কপিলবাস্তুতে ধর্ম প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন, তখন দলে দলে শাক্যেরা বাল যুবা বৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষ ভিক্ষু হইতে লাগিল। শুদ্ধোদন দেখিলেন, ক্রমে শাক্যদের জাতি ও নাম লোপ হইতে চলিল। তখন তিনি বুদ্ধকে বলিলেন, তুমি ২১ বৎসরের আগে যদি কাহাকেও ভিক্ষু করো, তাহা হইলে তোমাকে তাহার পিতামাতার সম্মতি লইতে হইবে। তাই নিয়ম হইল, ২১ বৎসর বয়সের আগে কাহাকেও ভিক্ষু করা হইবে না। সে নিয়ম আজও আছে। বৌদ্ধদের যে কম্মবাচা আছে, তাহাতে কেহ ভিক্ষু হইতে আসিলে তাহাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা হয়, "তোমার বয়স ২১ বৎসর হইয়াছে তো?" এইরূপে শুদ্ধোদন নাবালকদিগকে ভিক্ষু হওয়ার দায় হইতে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

হিন্দুদের মতে, যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিল, সে চতুর্বর্ণ-সমাজ হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার দেহ অশুচি। তাহার সম্পত্তি উত্তরাধিকারীরা ভাগ করিয়া লইবে। সে যদি আবার ফিরিয়া আসে, তাহাকে আর বর্ণাশ্রমের মধ্যে গ্রহণ করা হইবে না। সে ভ্রষ্ট যোগী হইয়া থাকিবে। সংসারে প্রবেশ করিলে সে আর আপনার পূর্বপদ পাইবে না। বৌদ্ধেরা কিন্তু অনেককে সংঘ ত্যাগ করিয়া আবার সংসারে প্রবেশ করিতে দেয়। উহারা কয়েক বৎসরের জন্যও ভিক্ষু করিতে রাজি। অশোকরাজা একবার এক বৎসরের জন্য সংঘে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যে সংঘে যায়, সে আপনার সমস্ত সম্পত্তি-স্বত্ব লইয়া সংঘে যায়। তাহার সম্পত্তি তাহার থাকে না, উহা সংঘের হইয়া যায়। বৌদ্ধেরা হিন্দুদের ঠাট্টা করিত, হিন্দুদের তো সন্ন্যাস লওয়া নয়, পুত্র পৌত্রদের

সম্পত্তি বাঁটিয়া দিবার একটা ফন্দি। আমাদের সংঘে আসা মানে, আপনার সমস্ত সম্পত্তি সাধারণীকরণ বা দুনিয়াকে দান করা। হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে এই ব্যাপার লইয়া সর্বদা বিবাদ বিসংবাদ হইত। মনে করো, একজন বড়ো ধনী আছেন ; তাঁহার একটি ছেলেকে উহারা ভিক্ষু করিল। তাহার পিতা মরিলে তাহার অংশ সংঘের হইয়া যাইবে। অন্য ভাইয়েরা তাহাতে রাজি হইত না। সর্বদা ঝগড়া বিবাদ হইত। আমার মনে হয়, ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের পতনের এও একটা প্রধান কারণ। ভিক্ষুদের দেখিলেই সম্পন্ন গৃহস্থেরা ভয় পাইত— ছেলে ধরিতে আসিয়াছে।

হিন্দুদের ভূসম্পত্তি সবই সপিণ্ডদের হইত। ছেলে জন্মাইলেই সে সম্পত্তির অংশাধিকারী হইত। বাপ আর সে সম্পত্তি হস্তান্তর করিতে পারিতেন না। মিতাক্ষরা প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রে লেখা যে, জন্মমাত্রেই স্থাবর সম্পত্তিতে তাহার স্বত্ব হয়। কিন্তু বাংলায় এ মত চলে না। এখানে বাপ মরার সময় যে যে ছেলে, পৌত্র বা প্রপৌত্র বাঁচিয়া থাকিবে, তাহারা উত্তরাধিকারের স্বত্ব পাইবে। এটা অনেকে মনে করেন, বাংলায় বৌদ্ধ প্রাধান্য ছিল বলিয়া হইয়াছে। হিন্দুরা communal interest দেখিত, বৌদ্ধেরা personal interest দেখিত।

বুদ্ধদেব নিজে যে-সকল আইন করিয়া গিয়াছিলেন, সবই সংঘের জন্য। তাঁহার বিনয় সংঘের মধ্যেই চলিত। গৃহস্থ বৌদ্ধ উপাসক উপাসিকাদের জন্য তিনি যে-সকল নিয়ম করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাও সংঘ ও উপাসক উপাসিকার মধ্যে যে সম্পর্ক ছিল, তাহারই উপর স্থাপিত। এই-সকল নিয়মের বাহিরে উপাসক উপাসিকাদিগকে অর্থাৎ গৃহস্থ বৌদ্ধদিগকে রাজার আইন মানিয়া চলিতে হইত। দেওয়ানি ও ফৌজদারি অথবা ধর্মস্থীয় ও কণ্টকশোধন রাজার হাতে ছিল। এ-সকল বিষয়ে বৌদ্ধেরা কোনো আইন-কানুন ভারতবর্ষে করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং ভারতবর্ষের বৌদ্ধদিগকে চিরদিনই রাজার অধীন হইয়া চলিতে হইত। ইৎসিং[২] এক জায়গায় বলিয়া গিয়াছেন, কেমন করিয়া সংঘ রাজার সঙ্গে যাহাতে বিবাদ না হয়, তাহার চেষ্টা করিতেন। একজন ভিক্ষুকে কোনো কারণে সংঘ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয়, সংঘাধিপ তাহার যাহা-কিছু ভিক্ষু-সম্পত্তি ছিল, তাহার কাপড়চোপড়

বিছানা প্রভৃতি তাহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। সে আর সেই জিনিস লইবার জন্য সরকারের সাহায্য লইবার সুবিধা পাইল না। অনেক রাজা বৌদ্ধ সংঘকে গ্রাম দান করিতেন। নালন্দার মঠগুলির ২০০ খানা গ্রাম ছিল। গ্রামণীর যে কাজ, তাহা সংঘেরাই করিতেন। সুতরাং সংঘ যে একেবারে রাজার কথা মানিব না, তাহা বলিতে পারিতেন না। অনেক রাজা আবার এই-সকল গ্রাম বাজেয়াপ্ত করিবার চেষ্টা করিতেন। অনেক জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায়, এক সংঘের গ্রাম অন্য সংঘকে দেওয়া হইত। সংঘে আবার ব্যাবসা ও বাণিজ্য চলিত। সুতরাং রাজার সঙ্গে তাঁহাদিগকে ভাব রাখিয়া চলিতে হইত। রাজা বৌদ্ধবিরোধী হইলে এবং তাঁহার সভায় ব্রাহ্মণ প্রবল হইলে সংঘকে অনেক সময় বিপদে পড়িতে হইত। কিন্তু তথাপি সংঘের যথেষ্ট প্রতাপ ছিল। লোকে যখন সংঘের অনুরাগী থাকিত, রাজা সহজে তাহাদের উপর হুকুম চালাইতে বা তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিতে যাইতেন না।

রাজনীতি, সমাজ-শাসন ইত্যাদি বিষয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধে যে তফাত ছিল, তাহা কতক কতক দেখানো হইল। কিন্তু দার্শনিক মত বিষয়ে উহাদের তফাত বড়োই বেশি ছিল। হিন্দুরা এখন বলেন, তাঁহাদের ছয়খানি দর্শন— মীমাংসা, বেদান্ত, সাংখ্য, যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক। মীমাংসা বৌদ্ধদের থাকিতেই পারে না। কারণ, উহা বেদের ব্যাখ্যা লইয়া ব্যস্ত। এই শাস্ত্রকে দর্শন বলিতেও পারা যায়, নাও বলিতে পারা যায়। যখন উহা বেদের ব্যাখ্যা লইয়া নিয়ম করে, তখন উহা দর্শন নহে। কিন্তু যখন যজ্ঞ করিলে অপূর্ব হয় বলে, অপূর্বে বা অদৃষ্টের বলে স্বর্গ ও নরক হয় বলে, স্বর্গের লক্ষণ করে, প্রমাণ কয়টা ও তাহার লক্ষণ কী বলে, তখন উহা দর্শন। বেদান্ত, বেদের উপনিষৎগুলি প্রমাণ মনে করিয়া, তাহার উপর ব্রহ্ম, অপবর্গ প্রভৃতি কথার বিচার করে, তখন উহা নিশ্চয়ই দর্শন। যখন এ দুখানি দর্শন বেদকে ভিত্তি করিয়া তৈয়ারি হইয়াছে, তখন ইহার সহিত বৌদ্ধদের কোনো সম্পর্ক নাই।

পাতঞ্জল দর্শন যোগের কথা। যোগ সবাই করে— বৌদ্ধেরাও করে, জৈনেরাও করে, হিন্দুরাও করে; সুতরাং উহাকে দর্শন না বলিলেও চলে। একজন দর্শনসমূহের ইতিহাস লেখক জৈন-পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন, যোগ দর্শন নয়, উহা কতকগুলি নিয়ম মাত্র; সকল যোগীই

উহা মানিয়া চলেন। পতঞ্জলির যোগসূত্রে আমাদের বা বৌদ্ধদের কোনোই আপত্তি নাই।

সাংখ্য লইয়া মহা-গোল। সকল দর্শনের চেয়ে সাংখ্য পুরানো। জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায় উঠিবার অনেক আগে সাংখ্যদর্শন হইয়াছিল। সকলেই উহা হইতে আপন আপন মতের মালমশলা সংগ্রহ করিয়াছেন। অশ্বঘোষ[৩] 'বুদ্ধচরিতে' স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, বুদ্ধদেবের যে দু জন গুরু ছিলেন, দু জনেই সাংখ্যমতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের যে কৈবল্য, তাহা বুদ্ধদেবের পছন্দ হয় নাই। তাই তিনি উঁহাদিগকে ছাড়িয়া ছয় বৎসর ধ্যানধারণার পর পরমার্থ-জ্ঞান প্রাপ্ত হন। সে পরমার্থ-জ্ঞান কিন্তু ঐ সাংখ্য মতের উপরই দাঁড়াইয়া আছে। তবে সাংখ্যদের মূল কথা যে সৎকার্যবাদ, তাহা উনি ত্যাগ করিয়াছেন। কারণ সৎ, তাহা হইতে সৎ কার্যের উৎপত্তি অর্থাৎ কার্যকারণের পরিণাম মাত্র। বুদ্ধদেব সৎকার্যবাদটিকে ঘুচাইয়া বলিলেন, "সর্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকম্।" গোড়ায় যদি সৎকার্যবাদ বন্ধ করিয়া ক্ষণিকবাদ হইল, আগায়ও তাহা হইলে কেবলবাদ ভাঙিয়া গিয়া শূন্যবাদ হইল। বুদ্ধদেব বলিলেন, "সর্ব্বং শূন্যং শূন্যম্।" সাংখ্যও সব জিনিসের সংখ্যা করিয়া থাকে বলিয়া সাংখ্য নাম পাইয়াছে। বৌদ্ধেরাও তেমনি সকল বিষয়েরই সংখ্যা করিয়া গিয়াছেন। মূল সাংখ্য ২২টি সূত্র মাত্র। প্রত্যেকটিরই একটি করিয়া সংখ্যা আছে। যথা— ১. অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ। ২. ষোড়শ বিকারাঃ। ৩ পুরুষ— ইত্যাদি। বৌদ্ধেরাও তেমনি বলেন, চতুরার্যসত্য, ষট্‌পারমিতা, দশভূমি ইত্যাদি। যদিও বৌদ্ধদের সাংখ্যদের মতো সূত্রাবলী নাই, কিন্তু দার্শনিক পদার্থগুলির সংখ্যা করা সম্বন্ধে দু জনই একপন্থী।

কপিলসূত্রগুলিতে বেদ যে প্রমাণ, সেকথা নাই। তাই হিন্দুরাও বইখানাকে নাকচ করিয়া দিয়াছিলেন। সাংখ্য বলিতে তাঁহাদের কাছে 'ষষ্টিতন্ত্র' বুঝাইত। 'ষষ্টিতন্ত্রে'র পুথি এখনো পাওয়া যায় নাই। কিন্তু উহার এক সূচি 'অহির্বুধ্ন্য পঞ্চরাত্রে' পাওয়া গিয়াছে। আর ঐ 'ষষ্টিতন্ত্র' সংক্ষেপ করিয়াই ঈশ্বরকৃষ্ণ তাঁহার কারিকা লিখিয়াছেন। ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকাই হিন্দু সাংখ্যের প্রাচীনতম পুথি। উহাতে বেদ যে প্রমাণ, সে-কথা আছে। কিন্তু সে বেদ সাংখ্যজ্ঞান হইতে অনেক নিচে। "দৃষ্ট-

বদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ”— দৃষ্ট পদার্থ হইতে যেমন একান্ত ও অত্যন্ত দুঃখ নিবৃত্তি হয় নাই, আনুশ্রবিক অর্থাৎ বেদোদিত ক্রিয়াকলাপ হইতেও সেইরূপ অত্যন্ত ও একান্ত দুঃখনিবৃত্তি হয় না। নাই হউক, তথাপি উহা বেদ মানে, উহাকে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু কপিলকে গ্রহণ করা যায় না, সে বেদ মানে না। কপিলের উপর হিন্দুদের এত ঘৃণা যে, শ্রাদ্ধসভায় যদি কপিল বা লোকায়ত উপস্থিত হয়, উহাদিগকে শিয়াল কুকুরের মতো তাড়াইয়া দিতে হইবে। 'সাংখ্য-প্রবচনভাষ্য'ও সাংখ্যের একখানি নূতন পুথি। এখানিও হিন্দুরা গ্রহণ করিয়াছেন, যেহেতু ইহাতে বেদকে প্রমাণ বলিয়া মানে। সুতরাং দু রকম সাংখ্য আছে ; একরকম হিন্দুদের ও আর-একরকম বৌদ্ধদের। বৌদ্ধেরা কপিল-সূত্রের প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন এবং ঈশ্বরকৃষ্ণকারিকা চীন দেশের 'ত্রিপিটকে' পাওয়া যায়।

বৈশেষিক লইয়া আরো গোল। প্রবাদ আছে, বৈশেষিক আঠারো রকম। আমরা তো অত পাই নাই। একরকম সকলেই জানে, কণাদের ষট্‌পদার্থী— উহাতে বেদের কথা আছে— “বুদ্ধিপূর্বা বাক্যকৃতির্বেদে” ; সুতরাং হিন্দুরা উহা গ্রহণ করিয়াছেন। আর-একরকম দশপদার্থী বৈশেষিক চীন দেশ হইতে পাওয়া গিয়াছে, উহাতে বেদের উল্লেখ একেবারে নাই, হিন্দুরা উহা গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু বৌদ্ধেরা উহা রাখিয়াছে। বৈশেষিক একরকম “ফিসিকাল সায়েন্স” ; সুতরাং উহাতে সকলেরই দরকার। লইতে সকলেরই হইবে, সকলেই আপন আপন মত করিয়া লইয়াছেন।

আরো বেশি গোল ন্যায়শাস্ত্র বা লজিক লইয়া। দু পক্ষেই বলেন, উহা অক্ষপাদের লেখা। অক্ষপাদ দু জনেরই ভরসা। কিন্তু টীকায় দু রকম হইয়া গিয়াছে। আমি অনেকগুলি প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, অক্ষপাদের সূত্রগুলি শুদ্ধ মাত্র তর্কশাস্ত্র। আমরা উহাতে কিছু কিছু প্রক্ষেপ করিয়া উহাকে দর্শনশাস্ত্র করিয়া তুলিয়াছি।[৪] সে-সকল কথা এখানে আর পুনরুক্তি করিব না। উহাতে চারিটি প্রমাণের কথা আছে, সেকথাও পরে বলিব। এখানে এই মাত্র বলি যে, বাৎস্যায়ন ঐ সূত্রের টীকা লিখিলে দিঙ্‌নাগ[৫] উহার ঘোর প্রতিবাদ করেন। আবার উদ্যোতকর[৬] ঐ ভাষ্যের বার্তিক লিখিয়া দিঙ্‌নাগের মত খণ্ডন করেন।

আবার বৌদ্ধেরা ঐ মত খণ্ডন করেন। আবার বাচস্পতি মিশ্র[৭] তাহার খণ্ডন করেন। এইরূপে বহুবার খণ্ডন-মণ্ডনের পর দুই সম্প্রদায়ের মত দুই রকম হইয়া গিয়াছে। দিঙ্‌নাগের মত চীন ও জাপানে খুব চলিতেছে। ভারতবর্ষে বাৎস্যায়নের মতই প্রবল।

তর্কশাস্ত্রের ইতিহাস অতি বিচিত্র। চাণক্যের সময় বোধ হয়, গোতমের সূত্র চলিত না। কারণ, আমরা অনুমান বলি ও অনুমান শব্দ প্রয়োগ করি। তিনিও অনুমান শব্দ প্রয়োগ করেন বটে, কিন্তু আমরা যাহাকে অনুমান বলি এবং যাহার জন্য অনুমান শব্দ প্রয়োগ করি, তাঁহার মতে তাহা সাদৃশ্যজন্যজ্ঞানজন্য জ্ঞান। গোতমসূত্র চলিত থাকিলে উনি এরূপ করিতে পারিতেন না। অশোকের সময় 'কথাবস্তু' নামে একখানি বৌদ্ধদের বিচারগ্রন্থ লেখা হয়।[৮] উহাতে বিচার করিয়া বৌদ্ধদের সমস্ত মত স্থাপন করা হয়। উহা উঁহাদের তৃতীয় সংগীতির সময় রচিত হয় এবং সমস্ত স্থবিরবাদের আচার্যগণ উহাতে সম্মতি দিয়াছিলেন। উহার বিচার-প্রণালী বিচিত্র। মুসলমান আমলে আদালতে যেমন জবাব, হুদ্দজবাব, রদ্দজবাব চলিত ছিল, উহা কতকটা সেইরূপ। একটা কথা উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে অনেক ফেকড়ি উঠিল, সব ফেকড়ি উদ্ধার করিয়া তবে মূলকথার বিচার হইল। মীমাংসকদের বিচার-প্রণালী আর-একরকম। ১. সন্দেহ। ২. বিষয়। তাহার পর পূর্বপক্ষ, তাহার পর উত্তর। তাহার পর নির্ণয়। এই পাঁচটির নাম অধিকরণ। কিন্তু মহাযানীরা ঠিক ইংরাজি সিলজিসম (syllogism) মতো কথা কহিত, উহাকে তাহারা প্রয়োগ কহিত, উহাতে বিচারটা বেশ পরিষ্কার হইয়া যাইত।

বিচার-প্রণালী হইতেই প্রমাণের কথা উঠে— উভয় সম্প্রদায়ের প্রমাণাবলী বড়ো বিচিত্র। বুদ্ধদেব সাত রকম প্রমাণ মানিতেন। পৌরাণিকেরা আট রকম, কেহ কেহ প্রতিভা বলিয়া আর-একটা প্রমাণও মানিতেন। মীমাংসকেরা ছয়টি মানিতেন। গোতম একদিকে আর নাগার্জুন আর-একদিকে; দু জনেই প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শাব্দ, এই চাররূপ প্রমাণ মানিতেন। বৈশেষিকেরা দুইটি মাত্র প্রমাণ মানেন বলিয়া কথা আছে। কিন্তু কণাদের পুথিতে আগাগোড়াই আগমের কথা আছে। কণাদ, প্রত্যক্ষ ও অনুমানের দ্বারা বায়ু প্রমাণ করিতে

অক্ষম হইয়া, আগমের উপর নির্ভর করিয়া বায়ু নামক পদার্থ স্থাপিত করিয়াছেন। আকাশের স্থাপনা সেইরূপে। সুতরাং বলিতেই হইবে, তিনি আগমও মানিতেন। ঈশ্বরকৃষ্ণ এই তিনটি প্রমাণই মানিয়া গিয়াছেন। চার্বাকেরাই[৯] কেবল প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ মানিতেন না।

নাগার্জুনের ও বর্তমান আকারে গোতমসূত্রের পর চারিটি প্রমাণই পণ্ডিতসমাজে আদর পায়। কিন্তু ইহার একশত বৎসর পরে মৈত্রেয়[১০] নামে একজন বৌদ্ধ নৈয়ায়িক উপমান প্রমাণ স্বীকারের প্রয়োজন দেখেন না। তিনি তিনটি প্রমাণই যথেষ্ট মনে করিতেন। তাঁহারো এক শত বৎসর পরে দিঙ্‌নাগ নামে একজন বড়ো পণ্ডিত প্রাদুর্ভূত হইয়া বলিলেন, শব্দও প্রমাণ হইতে পারে না। প্রমাণ দুই বৈ নয়— প্রত্যক্ষ আর অনুমান। একেবারে বর্তমান ইউরোপীয় লজিকের মতো হইয়া গেল—perception and inference। অনুমান প্রমাণ হইলেই কিরূপে অনুমান করিতে হয়, তাহাতে কয়বার বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়, তাহা লইয়া বিবাদ হয়। এই বাক্য-প্রয়োগের নাম "অবয়ব"। গোতমের পূর্বে দশ রকম অবয়ব ছিল। বাৎস্যায়ন বলেন, গোতম প্রথম পাঁচটি অবয়ব উড়াইয়া দিয়া, পাঁচটি অবয়বের অনুমান সাজাইয়া গিয়াছেন। নৈয়ায়িকেরা এখনো পাঁচ অবয়বেই অনুমান সাজান। দিঙ্‌নাগ কিন্তু আর-দুইটি তুলিয়া দিলেন। বলিলেন, তিনেই যথেষ্ট। প্রতিজ্ঞা, হেতু আর উদাহরণ। প্রথমটিতে পক্ষ ও সাধ্য নির্দেশ, দ্বিতীয়টিতে হেতু নির্দেশ ও তৃতীয়টিতে সাধ্য ও হেতুর মধ্যে ব্যাপ্তি দেখানো। অবয়ব কম হওয়ায় বৌদ্ধদের বিচার-প্রণালী পরিষ্কার ও সংক্ষেপ হইয়া উঠিল। উহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠা ভার হইয়া উঠিল। দিঙ্‌নাগের সংস্কৃত বই এতদিনের পর পাওয়া গিয়াছে ও ছাপা হইতেছে ['ন্যায়-প্রবেশ' ; *G-O-S* ; No. 38, 39 ; Baroda 1930]। বইখানি ছাপা হইলে উহাতে আমাদের ও বৌদ্ধদের ন্যায়শাস্ত্র বুঝিবার খুব সুবিধা হইবে।

বৌদ্ধদের মেটাফিজিক্‌সের ইতিহাস আছে। বুদ্ধদেবকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত, নির্বাণের পর কী থাকিবে ? তিনি তাহার জবাব দিতেন না। যদি বা কিছু বলিতেন তো বলিতেন, সে কথায় তোমার কী ? তুমি তো জন্মজরামরণের হাত হইতে এড়াইয়া গেলে, তোমার

তো ত্রিতাপ নাশ হইল, সে-ই যথেষ্ট। শূন্য জিজ্ঞাসা করিলেও তিনি তাহাই বলিতেন। ৫০০ বৎসর পরে অশ্বঘোষও তাহাই করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রধান উক্তি—

দীপো যথা নির্বৃতিমভ্যুপেতো
নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরিক্ষম্।
দিশং ন কাঞ্চিৎ বিদিশং ন কাঞ্চিৎ
স্নেহক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্ ॥
কৃতী তথা নির্বৃতিমভ্যুপেতো
নৈবাবনিং গচ্ছতি নান্তরিক্ষম্।
দিশং ন কাঞ্চিৎ বিদিশং ন কাঞ্চিৎ
ক্লেশক্ষয়াৎ কেবলমেতি শান্তিম্ ॥[১১]

কিন্তু তাহার পর একশত বা দেড় শত বৎসরের পর নাগার্জুন সাহস করিয়া নির্বাণ বা শূন্যের লক্ষণ করিলেন— "সদসৎ তদুভয়ানুভয়চতুষ্কোটিবিনির্মুক্তং শূন্যম্।" উহা সৎও নয়, অসৎও নয়। দুয়ে জড়াইয়াও নয়, দুই ছাড়াও নয় অর্থাৎ উহা অনির্বচনীয়। শূন্যই পরমার্থ, শূন্যই সত্য, শূন্যই বজ্র। শূন্যবাদ ক্রমে দুই ভাগ হইয়া গেল।

দৃঢ়ং সারমসৌশীর্য্যমচ্ছেদ্যাভেদ্যলক্ষণম্।
অদাহি অবিনাশি চ শূন্যতা বজ্রমুচ্যতে ॥[১২]

এই একদল বলিল, শূন্য ছাড়া আর-কিছুই নাই। উহার নাম অপ্রতিষ্ঠিতসর্বধর্ম। আর-একদল মায়োপমাদ্বৈতবাদ। শূন্য ছাড়া সব বস্তু মায়ার মতো। শংকরাচার্য ইহার সাত শত বৎসর পরে মায়াবাদ প্রচার করেন। সে মত বৈষ্ণবেরা প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ বলিয়া ত্যাগ করিয়া নানাবিধ ভক্তিমত প্রচার করিলেন। বিষ্ণুস্বামী বৈদিক ক্রিয়া-কলাপের সঙ্গে বৈষ্ণব মত প্রচার করেন। রামানুজ[১৩] বিশিষ্টাদ্বৈত মত, মধ্বাচার্য[১৪] দ্বৈতাদ্বৈত মত প্রচার করেন। শংকরের উপর কিন্তু সকলেরই রাগ— তিনি প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ। শংকরের দুই-তিন শত বৎসর পরে উদয়নাচার্য[১৫] সমস্ত বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া, আমাদের দেশের ন্যায়মত দৃঢ়ভাবে স্থাপিত করিয়া যান। তিনি শূন্যবাদ খণ্ডন করেন, ক্ষণিকবাদ খণ্ডন করেন ও অদৃষ্ট-সহকৃত ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব স্থাপন করিয়া যান।

দর্শনশাস্ত্র অতি কঠিন, সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না। আমার এতক্ষণ ধরিয়া দর্শনের চর্চাটা ভালো হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না, উহা শেষ করিয়া উঠা কঠিন। তবে কালচারের কথা বলিতে গেলে দর্শনশাস্ত্রের কথাটা না বলা ভালো নয়।

বৌদ্ধেরা গোড়ায় দেশীয় ভাষায়ই বই লিখিতেন। আমরা এখন যাহাকে পালি বলি, উহাতে কত ভাষা আছে, তাহা বলা যায় না। প্রাচীন পুথিগুলির ভাষা প্রায়ই পৃথক্ পৃথক্। বৌদ্ধেরা আর-এক ভাষায় পুথি লিখিতেন, তাহার নাম মিশ্রভাষা;[১৬] উহার কতক সংস্কৃত কতক প্রাকৃত। এই ভাষায় অনেক বই আছে। গদ্যে এই লেখা, মাঝে মাঝে প্রমাণস্বরূপ পদ্য। পদ্য ও গদ্যের ভাষা একরূপ নহে, পদ্যের ভাষা পুরানো। ক্রমে গদ্য অংশ সংস্কৃত হইতে আরম্ভ হইল। সে সংস্কৃত পড়িলেই মনে হইবে, এ 'মহাভাষ্যে'র ভাষা নয়, কোনো প্রাকৃতের তর্জমা মাত্র। এসব কথা আগে কেহ বিশ্বাস করিত না। কিন্তু 'সদ্ধর্ম্ম-পুণ্ডরীক'[১৭] নামে একখানি বই আছে, উহার গদ্যটা ঐরকম সংস্কৃত, আর পদ্যটা মিশ্র। নেপাল হইতে যে কয়খানি পুথি পাইয়াছি, সব ঐ রকম। কিন্তু তকলামাকান মরু খুঁড়িয়া যে 'সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীকে'র প্রাচীন পুথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার সবটাই ঐ মিশ্র ভাষায় লেখা।

শেষ অবস্থায় বৌদ্ধেরা অনেকেই সংস্কৃত লিখিতেন। দার্শনিকেরা ভালো সংস্কৃতই লিখিতেন। তথাপি কুমারিল[১৮] তাঁহাদের অব্যুৎপন্ন শব্দ, অশুদ্ধ শব্দ লইয়া বিশেষ বিদ্রূপ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা দার্শনিক ছিলেন না, তাঁহাদের সংস্কৃত বুঝাই যায় না। তাঁহারা বলিতেন, আমরা ব্রাহ্মণদের মতো সুশব্দবাদী নই, আমাদের অর্থ বোধ হইলেই হইল। আমরা পুংলিঙ্গ স্থানে স্ত্রীলিঙ্গ লিখিব, প্রথমা স্থানে সপ্তমী লিখিব, আত্মনেপদের স্থানে পরস্মৈপদ লিখিব, একবচন স্থানে বহুবচন লিখিব, যাহা খুশি করিব, অর্থ বোধ হইলেই হইবে।

বৌদ্ধদের ভিতর একদল পাণিনির[১৯] টীকা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা সমস্ত বাঙ্ময় পাণিনির সূত্র হইতেই বাহির করিতে চান, কাত্যায়ন[২০] ও পতঞ্জলিকে[২১] একেবারে নস্যাৎ করিয়া দেন। পাণিনির সূত্র ভালো করিয়া বুঝিতে গেলে ইঁহারাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি পাণিনির সমালোচনা করিয়াছেন, অব্যাপ্তি অতি-

ব্যাপ্তি দেখাইয়াছেন। ইঁহারা তাহা করেন না। লক্ষ্মণসেন বৈদিক সূত্রগুলি বাদ দিয়া একখানি ব্যাকরণ করিতে চান। তিনি সে ব্যাকরণের ভার দিয়াছিলেন একজন বৌদ্ধ-পণ্ডিতের উপর। তাঁহার নাম পুরুষোত্তম।[২২]

ভাস্করাচার্য[২৩] বলিয়াছেন, বৌদ্ধদের জ্যোতিষ বিচিত্র। তাঁহারা মনে করেন, চন্দ্র সূর্য, গ্রহ তারা দুই প্রস্থ, জোড়াজোড়া আছে। আজ যাহারা উদয় হয়, কাল তাহারা আসে না, পরশু দিন তাহারা আবার আসিবে। হিন্দুদের কিন্তু এরূপ নাই। সেই গ্রহনক্ষত্রই রোজ উদয় হয়।

ধর্ম ও বিশ্বাস সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও হিন্দুর ভিতর যে ভেদ আছে, তাহা কিছু কিছু বলিলাম। এখন আহার বিহার, আচার ব্যবহারে তাঁহাদের যে ভেদ আছে, তাহাই বলিতে চেষ্টা করিব। হিন্দুদের আহারের ব্যবস্থা চারায়ণ ঋষি[২৪] করিয়া গিয়াছেন। লোকে পূর্বাহ্ণে ও অপরাহ্ণে ভোজন করিবে। কেহ কেহ বলেন, অপরাহ্ণে না হইয়া সন্ধ্যার পর ভোজন করিবে। ইহা ছাড়াও সংস্কৃত পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাতঃকালে অনেকে একটা প্রাতরাশ করিয়া থাকিতেন। তাহার আর-একটা নাম ছিল কল্যবর্ত। ক্রমে এতবার খাওয়া উঠিয়া গিয়া একবার দিনে ও একবার রাত্রে খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, এক সূর্যতে দুইবার খাইতে নাই। এ খাওয়ার মানে আচমনীয় দ্রব্য, অর্থাৎ যাহা খাইয়া আচমন করিতে হয়, অর্থাৎ মুখ ধুইতে হয়; কিন্তু ফলাহার যখন তখন করা যায়; ফলাহার শব্দের অর্থ ফল খাওয়া, কিন্তু উহার এখন একটা পারিভাষিক অর্থ হইয়াছে। পাণিফলের জিলিপি, পাণিফলের কচুরি, এগুলিও ফলাহারের মধ্যে গণ্য হইয়াছে; যখন তখন খাওয়া যায়। খাইয়া মুখ না ধুইলেও চলে।

বৌদ্ধদের খাওয়ার ব্যবস্থা কিন্তু আর-একরকম। তাঁহারা একবার খাইবেন; বারোটার আগে সে খাওয়াটি হইয়া যাওয়া চাই। খাইতে খাইতে যদি বারোটা বাজে, অমনি উঠিয়া যাইতে হইবে। ছায়াটা দু আঙুল পূর্বে হেলা পর্যন্ত সময়ে খাইতে চাহিয়াছিল বলিয়া বৌদ্ধদের ভিতর ঘোর দলাদলি হইয়া যায়। অনেকে বারোটার পূর্বেও একটু আধটু জলযোগ করিতেন। বারোটার পর কিন্তু তরল পদার্থ ভিন্ন

আর কিছুই খাইবার নিয়ম ছিল না। তরল পদার্থ যথা— নারিকেলের জল, ফলের রস, ইত্যাদি। দক্ষিণ দেশের বৌদ্ধেরা অর্থাৎ সিংহল, বর্মা, শ্যাম প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধেরা এখনো এই নিয়ম পালন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু উত্তরের বৌদ্ধেরা, গোড়াগুড়িই খাওয়া দাওয়ার বিষয়ে একটু শিথিল ছিলেন। তাই নিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ-বৌদ্ধদের ভিতর ঝগড়া, তাই নিয়েই দলাদলি। ক্রমে যখন মহাযান মত প্রবল হইল, তখন খাওয়া দাওয়ার বাঁধাবাঁধিটা একেবারে উঠিয়া গেল। এখনকার নেপালি ও তিব্বতি বৌদ্ধদের সম্বন্ধে একজন ইংরাজ বলিয়াছেন, সকল ধর্মেই আছে, fast and worship— এদের দেশে কিন্তু feast and worship; না খাইয়া তাহারা কিছু করে না। আর আমাদের বাংলার ব্রাহ্মণদের "ভুক্ত্বা কিঞ্চিন্ন চাচরেৎ"— আহার করিয়া কোনোরূপ ধর্ম কর্ম করিবে না; ভিক্ষুককে ভিক্ষামুঠাও দিবে না।

উপবাস॥

উপবাস শব্দের অর্থ কী? উপ উপসর্গ ও বস্ ধাতু। এ থেকে 'না খাওয়া' হল কেমন করে? এ সম্বন্ধে 'শতপথ-ব্রাহ্মণে' লেখা আছে যে, যজমান যেমন যজ্ঞ করিবেন বলিয়া সংকল্প করিলেন অর্থাৎ যজ্ঞশালা বাঁধিলেন, দেবতারা অমনি রাত্রে আসিয়া সে যজ্ঞশালার নিকটে ঘুরিতে লাগিলেন। যজ্ঞশালার নিকটে দেবতারা বাস করেন বলিয়া তাহার নাম হইল উপবাস। তার পর দিন এই-সকল দেবতা অতিথিকে না খাওয়াইয়া যজমান খাইতে পারে কিনা, ইহা লইয়া বিচার উঠিল। একদল বলিলেন, "অনশন", আর-একদল বলিলেন, না, কিছু খাইতে হইবে। শেষের মত প্রবল হইল, অল্পবিস্তর বৃক্ষের ফল খাইতে পারিবে, কিন্তু সে পেট ভরিয়া খাইলে হইবে না। পিতৃকৃত্য করিতে গেলে কিন্তু একেবারেই খাইতে পারিবে না। আমাদের দেশে কিন্তু এ বিষয়ে বড়োই কড়াকড়ি। ভট্টাচার্য মহাশয়েরা সর্বদাই বলেন, "ভুক্ত্বা কিঞ্চিন্ন চাচরেৎ।" বৈষ্ণবেরা কিন্তু কিছু আহার না করিয়া সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন না। তান্ত্রিকেরাও তাই করেন। স্মার্ত পঞ্চোপাসক কিন্তু কড়াকড়ি করিয়া "ভুক্ত্বা কিঞ্চিন্ন চাচরেৎ" করেন।

বৌদ্ধেরা অষ্টমী, চতুর্দশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় উপবাস করেন। প্রথম প্রথম উহার নাম ছিল— উপোসথ, পোসধ। জৈনেরা কিন্তু তাহাও ছাড়িয়া দিয়া শুধু 'পো' করিয়াছেন। ঐ দিন তাঁহারা না খাইয়া বিহারে যাইতেন ও বৈকাল বেলাটা ধর্মকথা শুনিয়া কাটাইতেন। বারব্রত ইত্যাদিতে উত্তরের বৌদ্ধেরা বড়ো উপবাস করেন না। খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনো নিয়ম নাই। আমরা যেমন অনেক বাছিয়া গুছিয়া খাই, তাঁহারা তেমন করেন না। যে বুদ্ধের অহিংসা প্রধান কথা, তাঁহার শিষ্যেরা এখন মাংস খাইতে কোনোরূপ দ্বিধাই করেন না। তবে অনেকে নিরামিষ-ব্রত করিয়া থাকেন। চীনেরা আমিষ বলিয়া দুধ ঘি-ও খায় না। তাহারা উহাকে animal food বলে। পেঁয়াজ রসুনে বৌদ্ধদের কিছুমাত্র দ্বিধা নাই। মদেও তাহাদের আপত্তি নাই। আমার বন্ধু ইন্দ্রানন্দ বলিতেন, যে যত বড়ো পণ্ডিত হইবে, সে তত বেশি মদ খাইবে।

ক্ষৌরকার্য॥

প্রাচীনকালে হিন্দুরা কামাইতে হইলে দু জন নাপিত রাখিতেন; একজন নাভির ঊর্ধ্বটা কামাইত— আর-একজন অধঃটা কামাইত। যে উপরের দিকটা কামাইত, সে আচরণীয় হইত, যে নিচের দিকটা কামাইত, সে অনাচরণীয় হইত। বাৎস্যায়ন 'কামসূত্রে' বলেন, দাড়ি ও গোঁপ কামানো চতুর্থ দিনে করিতে হয়, নখ কাটাও তাই। অধোদেশ উৎপাটন করিয়া কামাইলে দশ দিন, না হলে পাঁচ দিন। উরত কামাইতে হইলে ফেনা ব্যবহার করিতে হইত। সন্ন্যাসীদের ও স্ত্রীলোকদের বগল কামাইতে নাই। সন্ন্যাসীদের অধোলোম কামাইতে নাই। মাথার সব চুল রাখা সেকালে পুরুষের মধ্যেও চলিয়াছিল। এখনো দক্ষিণ দেশে পুরুষেরা সব চুল রাখে ও বিনুনি করিয়া খোঁপা কাটে। মাথাটি ওল করিয়া কামাইয়া মধ্যে খুব বড়ো রকমের টিকি রাখা আর্যাবর্তে চলিয়াছিল— সন্ন্যাসীরাই কেবল সমস্ত মাথাটা কামাইতেন, শিখা পর্যন্তও রাখিতেন না।

বৌদ্ধ-ভিক্ষুরা মাথাটি তল করিয়া কামাইতেন, তাঁহারা মাথার চুল পনেরো দিনের বেশি রাখিতে পারিতেন না। নয় দিনের মধ্যেই

কামাইতে হইত। যেখানে যেখানে বৌদ্ধ-মঠের ঢিপি পাওয়া গিয়াছে, সেখানে সেখানেই অনেক খুর পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে অনেকে অনুমান করেন যে, বৌদ্ধেরা নিজে নিজেই কামাইতেন। অনেকেই শরীরের সমস্ত লোম কামাইয়া ফেলিতেন। গৃহস্থ বৌদ্ধদের গ্রাম্য নাপিতেরাই কামাইত। হয়তো ভিক্ষুদেরও কামাইত। কিন্তু বিহারে মেলা খুর পাওয়ায় সে বিষয়েও একটু সন্দেহ হইয়াছে। নাপিতেরা পাটনি, চণ্ডাল, মুচি, হাড়ি প্রভৃতি অনেক জাতিকেই কামাইত না। এইসব জাতির নিজের জাতির মধ্যেই নাপিত থাকিত। তাহারাই আপনাদের জাতিদের মধ্যে কামাইত। গ্রাম্য নাপিতেরা মুসলমানদের কামাইত; এমন-কি, তাহাদের পায়ের নখ কাটিতেও আপত্তি করিত না। কিন্তু এই-সকল জাতিকে তাহারা কখনোই কামাইতে যায় না। অনেক সময় মজা হয়। একজন মুচি যদি মুসলমান হয়, গ্রাম্য নাপিতেরা তাহাকে কামাইবে; কিন্তু যদি সেই মুচি ভেক লইয়া বৈষ্ণব হয় তো তাহাকে কামাইবে না। হাড়িদের নাপিত নাই। তাহারা নিজে নিজেই কামায়। সেজন্য আমাদের দেশে একটা কথা আছে, হাড়ির খুরে তোকে কামাইয়া দিব, অর্থাৎ তোকে একেবারে অনাচরণীয়, অব্যবহার্য করিয়া দিব, অর্থাৎ কোনো নাপিত তোকে কামাইবে না।

বিছানা॥

হিন্দুরা অতি প্রাচীন কাল হইতে চারপাই ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। চারপাইয়ের নাম আসন্দী। দড়ির ছাওয়া, বাঁশের বা কাঠের চার-পা। ক্রমে খাট-পালং, তক্তপোষ প্রভৃতি নানারূপ শয্যাধার চলিতে লাগিল। এমন-কি, আমরা এখন শ্রাদ্ধের দানেও একখানা খাট, একখানা তক্তপোষ, অন্তত একখানা পিঁড়িও দিয়া থাকি। বৌদ্ধেরা কিন্তু উচ্চাসন এবং মহাসন একেবারেই বর্জন করেন। উচ্চাসন বর্জন করিলে তাঁহার খাট, পালং ও চৌকি, চারপাই চলে না। মাটিতে মাদুর বিছাইয়া শুইতে হয়। মহাসন ত্যাগ করায় গদি, তোশক, বিছানার চাদর, তাকিয়া, গিদ্ধে, বালিশ, পাশ-বালিশ, গাল-বালিশ, পা-বালিশ, সব ত্যাগ করিতে হয়। বড্ড বড়োমানুষি

করো. একখানি কার্পেটের উপর শুইয়া থাকো, না-হয় গালিচা কাঁথাই তাঁহাদের বেশি সম্বল। বিচিত্র বিচিত্র কারিকরি করা কাঁথা, ফুল-তোলা কাঁথা বৌদ্ধদের জন্য হইয়াছিল বোধ হয়। এখনো অনেক জাতীয় সন্ন্যাসীর কাঁথাই সম্বল।

পোশাক ॥

বেদের সময় ব্রাহ্মণরা মাথায় একটা পাগড়ি দিতেন। এখনো কোনো বৈদিক কার্য করিতে গেলে একটা উষ্ণীষ লইতে হয়। তাঁহারা জুতাও ব্যবহার করিতেন। উপানহ না হইলে তাঁহাদের চলিত না। একখানা ধুতি ও একখানা চাদর থাকিত। তাহার উপর উপবীতও থাকিত। এখন তো উপবীত, কয়েক খেই কাপাশের সুতা হইয়াছে, কিন্তু পইতার সময় চামড়ার পইতা ব্যবহার করিবার কথা আছে। চামড়া পাওয়া যায় না বলিয়া অন্তত একটুকরাও কালসারের চামড়া বাঁধিয়া দিতে হয়। আগে বোধ হয়, একখানা চামড়া দিয়া গাটা ঢাকিয়া রাখিতেন। জামা বোধ হয় থাকিত না। কারণ, সেলাই করা কাপড় লইয়া কোনো ধর্মকর্ম করিবার বিধি নাই।

বৌদ্ধদের কিন্তু এক ধুতি আর এক চাদর। এ ছাড়া আর-কোনো পোশাকের কথা শোনা যায় না। চাদরখানা এক কাঁধে ফেলিয়া আর-কাঁধ হইতে খুলিয়া রাখা হইত। সে কাপড় ও উত্তরীয় আবার খুব সেলাই-করা হইত। সেলাইয়ে তাঁহাদের আপত্তি ছিল না। সে কাপড়ও তাঁহারা সর্বদা যে পরিষ্কার রাখিতেন, এমন নহে, কিন্তু ছোপাইয়া পারিতেন। কী দিয়া ছোপানো হইত, ঠিক জানা যায় না। কখনো কখনো বলে কাষায় বস্ত্র, কখনো বলে রক্ত বস্ত্র। রাঙা রঙ দিয়া ছোপাইতেন, কি কাষায় রঙ দিয়া ছোপাইতেন, অথবা হয় তো দুই রঙকেই তাঁহারা রক্ত বলিতেন। তবে দেশের নিয়মানুসারে তাঁহারা যে জামা বা চৌবন্দি ব্যবহার করিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নেপালি বৌদ্ধেরা নেপালি গৃহস্থের মতোই কাপড় পরেন। তবে নেপালে এখন বিহারও নাই, মঠও নাই। যাঁহারা বিহারে বাস করেন, তাঁহারা যদিও আপনাদিগকে ভিক্ষু বলেন, তথাপি বিবাহ করেন ও ছেলেপিলে লইয়া সংসার করেন।

স্নান ॥

ব্রাহ্মণদের অতি প্রাচীন কাল হইতেই নানা রকম স্নানের ব্যবস্থা আছে— ভস্মস্নান, গোময়স্নান, ঘৃতস্নান, দুগ্ধস্নান, দধিস্নান, অবগাহন স্নান, শিখামজ্জন স্নান, উষ্ণজলে স্নান তোলাজলে স্নান। বৌদ্ধদের ভিতর এতরূপ স্নান ছিল না। হিন্দুরাও যে এত রকম স্নান সর্বদাই করিতেন, তা নয়, যজ্ঞে ব্রতী হইবার পূর্বে যজমানকে এরূপ স্নান করাইতেন, অভিষেকের পূর্বে রাজাকে এরূপ স্নান করাইতেন, অন্য সময় অবগাহন স্নানই প্রায় করিতেন। না পারিলে মাথা ধুইয়া ফেলিতেন। অথবা গা ধুইয়া ফেলিতেন। বিবাহের সময় বরকন্যাকে তোলাজলে স্নান করাইতেন। বৌদ্ধদের স্নান জলে জলেই হইত, ভস্মাদির স্নান সম্বন্ধে বড়ো শুনা যায় না। কিন্তু স্নানের সময় তাঁহারা মন্ত্র পড়িতেন, "যথা হি জাতমাত্রেণ স্নাপিতাঃ সর্বতথাগতাঃ। তথাহং স্নাপয়িষ্যামি শুদ্ধং দিব্যেন বারিণা ॥ ওঁ সর্বতথাগতাভিষেকসময়শ্রিয়ে হূং হূং।"[১৫]

মুখ ধোওয়া ॥

ব্রাহ্মণেরা অধিকাংশ স্থানেই দাঁতন করিতেন। দাঁতনের কাঠি হয় আট আঙুল, না-হয় বারো আঙুল থাকিত। কিন্তু শ্রাদ্ধাদির সময় তাঁহারা দাঁতন করিতেন না, পাছে দাঁত দিয়া রক্ত পড়িয়া ক্ষতাশৌচ হয়। ক্ষতাশৌচ হইলে শ্রাদ্ধাদিতে অধিকার থাকে না, সেজন্য শ্রাদ্ধের দিন ১২টা কুলকোচা করিয়া মুখ ধোওয়া ব্যবস্থা করা আছে। মাজনে তাঁহাদের আপত্তি ছিল না। অনেক জিনিস দিয়া তাঁহারা মাজন তৈরি করিতেন। কিন্তু তর্জনী অঙ্গুলি দিয়া দাঁত মাজা অত্যন্ত নিষেধ। মধ্যমা অঙ্গুলি দিয়া দাঁত মাজাই খুব প্রশস্ত। কারণ, অঙ্গুলির মধ্যে উহাই সর্বাপেক্ষা কমজোর। উহা দিয়া ঘষিলে দাঁতে চাড় লাগে না। তর্জনী দিয়া ঘষিলে চাড় লাগে ও উহাতে বিলক্ষণ ক্ষতি হয়। দাঁতন সম্বন্ধে ব্রাহ্মণেরা অনেক গাছ পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং সকল স্মৃতির পুস্তকেই কোন্ কোন্ কাঠে দাঁতন করিতে হয় এবং কোন্ কোন্ কাঠে দাঁতন করিতে নাই, তাহার লম্বা ফর্দ আছে। যে কাঠ নরম, অনায়াসে চিবাইয়া তুলি করা যায়, তাহাই প্রশস্ত। বেশি বয়সে দাঁত

পড়িয়া গেলে দাঁতন ছেঁচিয়া দাঁত পরিষ্কার করিয়া দিতে হয়। যেসব গাছে কষ আছে, সেই গাছের ডালেই ভালো দাঁতন হয়, তাহাতে দাঁতের গোড়াও শক্ত হয়।

বৌদ্ধেরা দাঁতন করিতেন। কিন্তু তাঁহাদের দাঁতন প্রায়ই বারো আঙুল হইত। আট আঙুল দাঁতন তাঁহারা বড়ো ব্যবহার করিতেন না। দাঁতন বারো আঙুল হইলে উহা দ্বারা জিব-ছোলারও কাজ করিতে পারা যায়। বৌদ্ধেরা ধাতুদ্রব্য ব্যবহার করিতেন না। কাজেই তাঁহাদের ধাতুনির্মিত জিবছোলা থাকিত না। সুতরাং তাঁহারা বারো আঙুল দাঁতনই পছন্দ করিতেন। আট আঙুল দাঁতন দিয়া জিব ছুলিতে গেলে দাঁতে আঙুল লাগিত এবং কাটিয়া যাইবার সম্ভাবনা ছিল। মাজন দিয়া দাঁতন করিলে প্রায় দাঁতে পাথুরি হয়। মাড়ি ও দাঁতের মধ্যে একটা পাথরের মতন শক্ত জিনিস জন্মিয়া মাড়িকে আল্‌গা করিয়া দেয়। সেজন্য মাজনটা সেকালে দন্তরোগ ব্যতিরেকে বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ, কেহই ব্যবহার করিতে চাহিতেন না। দাঁতন করিতে গেলে দাঁতনটি বার বার ধুইতে হইত। একবার মুখ হইতে বাহির করিলেই তাহা ধুইয়া আবার ব্যবহার করিতে হইত। ইৎসিং-এর পুস্তকে আমরা পড়ি যে, চীনেরা আমাদের কাছ থেকে দাঁতন করা শিখিয়াছিল। কিন্তু আমরা এখন দাঁতন করাটা অসভ্যতা বলিয়া মনে করি। দাঁতন নিত্য নূতন হওয়ার কথা ছিল। না পাইলে একদিন কাটিয়া পাঁচ দিন ব্যবহারও চলিত।

মুখ ধোওয়ার সংস্কৃত নাম আচমন। আচমনে তিনবার জল মুখের মধ্যে দিতে হয়। তারপর দুইবার ওষ্ঠ ও অধর স্পর্শ করিতে হয়। তাহার পর চক্ষু কর্ণ নাসিকা স্পর্শ করিতে হয় অর্থাৎ ঐগুলি ধুইতে হয়। ততকরগুপ্ত[২৬] বলেন, দাঁতন করিবার সময় মন্ত্র পড়িতে হয়, "ওঁ নমো রত্নত্রয়ায়, নমো হারিত্যৈ, মহাযক্ষিণ্যৈ, অন্নে পানে ফুঃ স্বাহা।"[২৭]

কাপড়কাচা ও তেলমাখা ॥

ধোবা বা রজকে ব্রাহ্মণের কাপড় কাচিত। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা নিজ হাতে রোজই কাপড় ধুইয়া ফেলিতেন। ছেঁড়া কাপড় অথবা ময়লা কাপড় পরা তাঁহাদের নিষেধ ছিল। কয়দিন অন্তর তাঁহারা কাপড়

ধোবাবাড়ি দিতেন, তাহা জানা যায় না। তবে রোজ কাপড় কাচায় তাঁহাদের কাপড় শীঘ্র ময়লা হইত না। বৌদ্ধেরা কিন্তু তাঁহাদের কাপড় ধোবাবাড়ি দিতেন, একথা শুনা যায় না। কিন্তু স্নানের পর যে রোজ তাঁহারা কাপড় কাচিতেন, সেটা ঠিক। নিজের হাতে কাপড়খানি নিঙড়াইয়া শুকাইয়া লইতেন। ব্রাহ্মণেরা গামছা ব্যবহার করিতেন এবং তেলও মাখিতেন। বৌদ্ধেরা তেল মাখিতেন ও গামছা ব্যবহার করিতেন কিনা, কোনো পুস্তকে দেখিতে পাই না। ব্রাহ্মণদের অভ্যঞ্জন অর্থাৎ স্নানের পূর্বে মাখিবার অনেক জিনিস ছিল। আমলকীবাটা তাহাদের মধ্যে একটা। তাঁহারা ঐ দ্রব্য একদিন তৈরি করিয়া দুই-তিন দিন ব্যবহার করিতেন। কিন্তু অনেক ধর্মকর্মের সময় তাঁহারা অভ্যঞ্জন স্নান করিতেন না। স্বামী বিদেশে গেলে স্ত্রীলোকেরা রুক্ষস্নান করিতেন।

বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের মঠে পাঁইখানা থাকিত। পাইখানার ভিতর কলসি-ভরা জল থাকিত ও একটি ছোটো পাত্র (কুণ্ডি) থাকিত। পাইখানার ভিতর দেয়ালে একটা ডাণ্ডা গোঁজা থাকিত। ভিক্ষুরা সেইখানে কাপড় রাখিতেন। তাঁহারা সেখানে তিনটি মাটির গুলি লইয়া যাইতেন। কার্য শেষ হইলে দুইটি গুলির দ্বারা দুই বার শৌচ করিতেন। আর তৃতীয়টি দ্বারা বাঁ হাতটি ধুইয়া ফেলিতেন। তাহার পর বাহিরে আসিয়া সেখানে একখানা ইটের উপর পনেরোটি গুলি সাজানো থাকিত। সাতটি দ্বারা সাতবার বাঁ হাত ধুইতেন আর সাতটি দ্বারা সাতবার দুই হাত ধুইতেন। অবশিষ্টটির দ্বারা জলপাত্র, বাহু, তলপেট এবং পা ধুইয়া ফেলিতেন। তাহার পর তথা হইতে বাহির হইয়া আসিতেন। ততকরগুপ্ত তাঁহার 'আদিকর্ম্মরচনা'য় বলিয়াছেন—

"রত্নত্রয়শরণগতানাং বৌদ্ধানাং প্রত্যূষমাদায় বর্চ্চোমূত্রকরণাদি যা যা শিক্ষোক্তা ভগবতা বিনয়াদিষু সামান্যেন সা সর্ব্বা উচ্যতে। তথা চ—

কুর্য্যাৎ কৃত্যাং গূঢ়াং প্রাতঃ বর্চ্চপ্রস্রাবকর্ম্মকম্।
ততোঽপি বহুভিশ্চৈব মৃদ্ভিঃ প্রক্ষালয়েৎ গুদম ॥
বামে পাণৌ ততঃ সপ্ত বিহিতা শুদ্ধয়ে মৃদঃ।
উভয়োরপি সপ্তৈব পৃথক্ পৃথগবস্থিতাঃ ॥
ইতি হস্তাদি যত্নেন ক্ষালয়েৎ বহুনাম্বুনা।
শারীপুত্রাদিয়ং শিক্ষা দুষ্কৃতাত্বন্যথা ভবেৎ ॥"[২৮]

তাহা হইলে বোধ হইতেছে যে, শারীপুত্রের সময় হইতেই ইৎসিং ও ততকরগুপ্তের সময় পর্যন্ত একই শিক্ষা চলিয়া আসিতেছিল। হিন্দুদের কিন্তু ব্যাপার অন্যরূপ। তাঁহাদের পাইখানার ব্যবস্থা ছিল না। নগরের প্রান্তে উপস্থিত হইয়া, সেখান হইতে তীর ছুঁড়িলে যেখানে গিয়া পড়ে, সেখানে তাঁহারা শৌচ করিতে যাইতেন। শৌচ কার্যটা জলের দ্বারা সাধিত হইত। তাঁহারা দুই হাতেই হাতমাটি করিতেন। কিন্তু যতক্ষণ তৈল ও গন্ধ দূর না হইত, ততক্ষণ হাতে মাটি করিতে ছাড়িতেন না। অন্তত বারো বার হাতে মাটি করিতেন। এখনকার লোকের মতন মাটিতে বাঁ হাত ঘষিয়াই কাজ সারিতেন না। স্মৃতিতে যদিও পাইখানার নাম পাওয়া যায় না, অশোক রাজার পাইখানা ছিল। তিনি সেখানেও রাজকার্য করিতেন। বল্লালসেনেরও পায়ুক্ষালনমন্দির ও স্বেদাগার ছিল। প্রস্রাব করিয়া জল নেঁওয়া উভয় পক্ষেরই বিধি ছিল।

ব্রাহ্মণেরা ঘুম ভাঙিলেই ঠাকুর দেবতার নাম করিয়া উঠেন, অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করেন—

লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে।[১৮]

বৌদ্ধেরা প্রাতঃকালে উঠিয়াই "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি" ও এই সম্বন্ধীয় অনেকগুলি গাথা পাঠ করেন।

দিনের কাজে বৌদ্ধ ও হিন্দুদের যে ভেদ, তাহা দেখাইলাম। এখন উভয়ের সংস্কারগুলি দেখাইব। হিন্দুদের দশবিধ সংস্কার— গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রামণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ। এখনকার নেপালি বৌদ্ধদের দুইটি মাত্র সংস্কার। একটি পাঁচ বছরে, তাহার নাম ভিক্ষু হওয়া। আর-একটি ১৭ বৎসরে— তাহার নাম বজ্রাচার্য বা গুভাজু হওয়া। আমাদের

সংস্কারের মানে যে, আমরা প্রথম যে কার্যটি করিব, সেটি মন্ত্রপূত করিয়া করিব। কোনো সংস্কার করিতে হইলে গণপতি পূজন, গৌর্যাদি ষোড়শ মাতৃকা পূজা, বসুধারা, অয়ুষ্য-মন্ত্র জপ ও নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিয়া, কুশণ্ডিকা বা বহ্নিস্থাপন করিতে হয়। সেই মন্ত্রপূত বহ্নিকে সাক্ষী করিয়া তাঁহারা প্রথম কার্যটি করিয়া থাকেন। গর্ভাধানও তাই, পুংসবনও তাই, সীমন্তোন্নয়নও তাই, বরাবরই তাই। কার্যটি যখন করি, তখন মন্ত্র পাঠ করি। গর্ভাধানের অর্থ বলিয়া দিতে হইবে না। পুংসবনের অর্থ এই যে, সাত মাস গর্ভের সময়— যখন গর্ভস্থ শিশুর পুরুষ বা স্ত্রীচিহ্ন প্রকট হইবার সময় হয়, সেই সময় স্বামী গৌর্যাদি পূজা করিয়া, প্রাতঃকালে গ্রামের ঈশান কোণে যে বটগাছ থাকে, তাহারই ঈশান কোণে কোনো সুঁয়ার ঠিক নিচে দুটি ফল ধরিয়াছে দেখিয়া, ফলসুদ্ধ সেই সুঁয়াটি কাটিয়া, মাটিতে না ছোঁয়াইয়া, সেইটি বাড়িতে আনেন— আনিয়া এমন উঁচু জায়গায় রাখিয়া দেন, যেন মাটি না স্পর্শ করিতে পারে। তাহার পর কোনো কোনো জিঁয়াচ পোয়াতি আসিয়া সেটি বাঁটিয়া দিলে স্বামী, অগ্নির সমীপে স্ত্রীর পিছনে দাঁড়াইয়া, সেই বাটা বটের সুঁয়া প্রথমে তাহার ডান নাকে ও তৎপর তাহার বাঁ নাকে শোঁকান। সংস্কার, এই কাজ করিলেই পুত্রসন্তান হইবে। জাতকর্মেও এইরূপ নাড়িচ্ছেদের পূর্বে বহ্নিস্থাপনান্ত সমস্ত কার্য করিতে হয়। তাহার পর নাড়িচ্ছেদ। কিন্তু ইহাতে প্রায়ই বিলম্ব হওয়া প্রযুক্ত নাড়ি মোটা হইয়া যায়, ছেদেও কষ্ট হয়— বালকেরও প্রাণনাশ হয়। তাই নাড়িচ্ছেদের পর এসব কার্য হয়। যখন ব্রাহ্মণেরা অগ্নিহোত্রী ছিলেন, অর্থাৎ বাড়িতে অগ্নিশালা থাকিত এবং সেখানে গার্হপত্য, দক্ষিণ ও আহবনীয়, এই তিন প্রকার আগুন থাকিত, তখন এ-সকল দুর্ভোগ ভুগিতে হইত না। গৌর্যাদি ষোড়শ মাতৃকার পূজা হইতে আরম্ভ করিয়া বহ্নিস্থাপন পর্যন্ত তাঁহাদের করাই থাকিত। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র বাঁশের চেঁচাড়ি মন্ত্রপূত করিয়া, সেই অগ্নিতে তাতাইয়া অবিলম্বেই নাড়িচ্ছেদ করা হইত। যতদিন ব্রাহ্মণেরা সাগ্নিক ছিলেন অর্থাৎ এক অগ্নি রক্ষা করিতেন, তাঁহাদেরও এ দুর্ভোগ ভুগিতে হইত না। এ-সকল দুর্ভোগ শুধু নিরগ্নিক হইয়াছি বলিয়াই ভুগিতে হয়। নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণও ঠিক ঐরূপ সংস্কার। বহ্নিস্থাপন পর্যন্ত করিয়া,

সেই বহ্নির সম্মুখে বসিয়া, মন্ত্র পড়িয়া করিতে হয়। এক উপনয়নের মধ্যে আমরা চারিটা সংস্কার সারিয়া লই। উপনয়ন মানে ছেলেকে গুরুর কাছে লইয়া যাওয়া। গুরু তাহাকে প্রথমে সাবিত্রী উপদেশ দেন-- দিন কতক পরে তাহার বেদারম্ভ হয়। বহুকাল পরে তাহার বেদপাঠ সমাপ্ত হইলে তাহার সমাবর্তন হয়, অর্থাৎ সে আবার ঘরে ফিরিয়া আসে। আমরা কিন্তু এই চারিটি সংস্কারকেই এক উপনয়ন নাম দিয়া ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে সারিয়া দিই। বিবাহও এইরূপই সংস্কার। বিবাহ শব্দের আসল মানে— বৌটিকে পিতৃগৃহ হইতে পতিগৃহে বহিয়া লইয়া যাওয়া। কন্যাদান, স্ত্রী-আচার, কুশণ্ডিকা, লাজাহোম, অরুন্ধতী দর্শন— এ-সকলগুলিই বিবাহটিকে সংস্কার করিবার জন্য, উহাকে মন্ত্রপূত করিয়া পবিত্র ভাবে গ্রহণ করিবার জন্য। নেপালি বৌদ্ধদের মধ্যে এত সব সংস্কার কিছুই নাই। উহাদের একটা সংস্কার আছে গর্ভপরিহার, অর্থাৎ সুপ্রসব হইবে, তাহার জন্য প্রার্থনা। তাহার পর ছেলে ৫/৬ বৎসর হইলে, সে যে বিহারের ছেলে, সেই বিহারের যিনি সর্বাপেক্ষা বয়সে বড়ো ভিক্ষু, তাঁহার কাছে লইয়া যাইতে হয়। সে বলে, আমি ভিক্ষু হইব। বুড়াটি বলেন, তুমি হইও না, বড়ো কষ্ট করিতে হয়— বড়ো বিধিনিষেধ মানিয়া চলিতে হয়, তুমি ও কাজ পারিবে না, তুমি ছেলে মানুষ। সে বলে, আমি নিশ্চয়ই করিব, নিশ্চয়ই পারিব, আমি শাক্যপুত্র— আমি পারিব না কেন ? বুড়াটি তখন একখানি রূপার খুর বাহির করিয়া, তাহার মাথাটি মুড়াইয়া দেন, আপনার কাছে রাখেন ও হবিষ্য খাওয়ান। পাঁচ-সাত দিন হবিষ্য খাইবার পর সে বলে, মহাশয়, আমি আর পারি না, আমি মা-র কাছে যাব। বুড়া তাহাকে আবার বুঝান, তোমার যাওয়া উচিত নয়। কিন্তু সে কিছুতেই মানে না। তখন তাহাকে একটু মদ ও শূকরের মাংস খাওয়াইয়া মায়ের কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। এখান থেকেই সে ভিক্ষু হয়, ঠাকুরঘরে যেতে পারে, ঠাকুর ছুঁতে পারে, পুষ্পপাত্রে ফুল সাজাইতে পারে ও পূজার আয়োজন করিয়া দিতে পারে। ইহার পর তাহার আর-এক সংস্কার আছে— সেটা সতেরো বছরের সময়। যদি সে সতেরো বছরের মধ্যে একেবারে স্ত্রী-সংসর্গ না করে, তাহা হইলে তাহাকে আবার মাথা মুড়াইয়া কতগুলি মন্ত্র পড়িতে হয়, তাহা হইলে সে বজ্রাচার্য বা গুভাজু

হয়। সে তখন ঠাকুরঘরে পূজার অধিকারী হয়, তাহার পাঁচটি অভিষেক হয়— মুকুটাভিষেক, ঘণ্টাভিষেক, মন্ত্রাভিষেক, সুরাভিষেক, পট্টাভিষেক। তখন সে পুরা বজ্রাচার্য হয় এবং সকল প্রকার ধর্মকার্যেই তাহার অধিকার হয়। কিন্তু যদি সতেরো বছরের আগে স্ত্রী-সংসর্গ করে, তাহা হইলে সে কখনো বজ্রাচার্য হইতে পারে না, তাহার বংশও ভিক্ষু থাকিয়া যায়। উহাদের বিবাহ সংস্কার নহে। বিবাহ মানে শক্তিগ্রহণ, অর্থাৎ যোগমার্গে ও জ্ঞানমার্গে যাইবার জন্য শক্তি সঞ্চয় করা। মোটামুটি ভিক্ষুদের বিবাহ আগে একটা গাছের সঙ্গে হয় অথবা ফলের সঙ্গে হয়। তাহার পর সে যাহাকে শক্তি বলিয়া গ্রহণ করে, তাহারই সঙ্গে থাকে, স্ত্রীপুরুষের ন্যায় থাকে ; ছেলেপুলে হয়, গৃহস্থালি করে। দুই প্রকার বিবাহের বা শক্তি-গ্রহণের প্রণালী আমি পাইয়াছি— একটি তো ভদ্রসমাজে প্রকাশ করিবার মতো নহে। বৌদ্ধেরা কিন্তু বলে, এসব কেতাবি কথা, কাজের নয় ; আমাদের আসল শক্তিগ্রহণ ওরূপ নয়।

এই তো গেল নেপালি ভিক্ষুদের কথা— ইহারা সব গৃহস্থ হইয়া গিয়াছে, একটিও আসল সন্ন্যাসী নাই। শেষ আসল ভিক্ষু একশত বৎসরের উপর হইল মরিয়া গিয়াছেন— তাঁহার পর সবই এক হইয়া গিয়াছে। ভিক্ষুর ছেলে ভিক্ষু হয়— বজ্রাচার্যের ছেলে বজ্রাচার্য হয়, কিন্তু বৌদ্ধদের আসল বজ্রাচার্য অনেক উচ্চে। যে কেহ বৌদ্ধ হইবে— গৃহস্থই হউক, ভিক্ষুই হউক, তাহাকে প্রথম পঞ্চ শীল গ্রহণ করিতে হইত। আমি প্রাণিহিংসা করিব না, না দিলে পরের জিনিস লইব না, ব্রহ্মচর্য খণ্ডন করিব না, মিথ্যা কথা বলিব না, সুরা, মৈরেয় ও মদ্য পান করিব না। যাহারা এই-সকল শীল গ্রহণ করিয়া অভ্যস্ত হইয়া যাইত, তাহাদিগকে আরো তিনটি শীল দেওয়া হইত— কটুবাক্য বলিব না, গান-বাজনা করিব না, স্রকচন্দনাদি ব্যবহার করিব না। গৃহস্থেরা কিন্তু ইহার অধিক শীল লইতে পারিবে না। ইহার অধিক আর দুইটি শীল শুধু ভিক্ষুদের জন্য— একটি উচ্চাসন ও মহাসন ত্যাগ ও একটি রজতকাঞ্চন ত্যাগ, স্থবিরবাদে, অর্থাৎ দাক্ষিণী বৌদ্ধদের শেষ ও চরম ; কিন্তু উত্তর দেশের বৌদ্ধদের ইহার উপরও কিছু আছে। তাঁহারা শীলকে সম্বল বলেন— এই দশটা

শীল তাঁহারা অষ্ট সম্বল করিয়া তুলিয়াছেন ; নবম সম্বলের নাম বোধিসত্ত্বসম্বল।

ততকরগুপ্ত রত্নত্রয় শরণের কথা বলিয়া বলিতেছেন, "অনেনৈব রত্নত্রয়শরণেন বৌদ্ধ ইতি গীয়তে। ইদঞ্চৈতৎ রত্নত্রয়শরণং বৌদ্ধদর্শনস্য উপাসকাদিসর্বসম্বলানাং বীজভূতম্। সম্বলাশ্চৈতানি (?) কতিসংখ্যাস্তে সম্বলা উচ্যন্তে বিভাষায়াম্। উপাসকাদিপোষধান্তা অষ্টৌ। বোধিসত্ত্ব-মহাযানে পূর্বোক্তা এব অষ্টৌ বোধিসত্ত্বসম্বলো নবমঃ অগ্রনয়মহাযানে পূর্বোক্তা এবং নব বজ্রব্রতসম্বরো দশমঃ তত্র উপাসক উপাসিকা শ্রামণের ভিক্ষু শ্রামণেরী শিক্ষমাণা ভিক্ষুণী ত্রিসপ্তানাং স্ত্রীপুরুষাশ্রয়ভেদাৎ সপ্তসম্বরাঃ ॥"[৩০]

তাহা হইলে বুঝা গেল, হীনযানী বৌদ্ধ অপেক্ষা মহাযানীদের আরো দুইটা সম্বল আছে। একটা বোধিসত্ত্বসম্বল, আর-একটা বজ্রব্রতসম্বল। বোধিসত্ত্বসম্বল বলিতে গেলে নিশ্চয়ই বুদ্ধত্ব লাভ করিব, এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। বজ্রব্রতসম্বল অর্থাৎ আমি শূন্য হইয়া গিয়াছি, এই ধারণা। বজ্র বলিতে গেলে শূন্যতাকেই বুঝায়।

বৌদ্ধ ও হিন্দুদের সংস্কারের কথা সব বলা হইল। এখন উহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কথা। অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণেরা উহাকে ইষ্টি বলিতেন। অগ্নিত্রয়সাধ্য যাগের নাম ইষ্টি। সাগ্নিকেরাও ইষ্টি করিতেন, কিন্তু তাঁহারা একাগ্নিতেই কার্য করিতেন। আমাদের এখন বহ্নিস্থাপন করিয়া, উহাকে মন্ত্রপূত করিয়া দাহ করিতে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত শবদাহ না হয়, ততক্ষণ সেই শব আত্মীয় স্বজন ভিন্ন কেহ স্পর্শ করিতে পারে না, অন্তত আপনার জাতির লোক ভিন্ন অন্য কেহ স্পর্শ করিতে পারে না। শব স্পর্শ করিলেই অশৌচ হয়, যাহারা দহন বহন করে তাহাদেরও অশৌচ হয়। চুল্লিটি ভালো করিয়া পরিষ্কার করা, যাহারা শবদাহ করে, তাহাদের প্রধান কর্তব্য। যদি একখানি কয়লা চুল্লিতে পড়িয়া থাকে, তাহা হইলেও তাহাদের প্রত্যবায় হয়। সাধারণ লোকের সংস্কার, চুল্লিটি পরিষ্কার করিলে আর-জন্মে লোকটি ফর্সা হয়, আর যদি একখানিও কয়লা পড়িয়া থাকে, তবে তাহার গায়ে তিল হয়। চুল্লি অপরিষ্কার রাখিলে সে লোকটা কালো হয়। দাহকারীদের আর-একটা প্রধান কর্তব্য, শবের যে অংশ পোড়ে না, সে

অংশ গভীর জলে ফেলিয়া দেওয়া ও অস্থি সঞ্চয় করিয়া দূর জলে ফেলিয়া দেওয়া।

আমরা শবকে অশুচি মনে করি, অস্থিকেও অশুচি মনে করি। তাই হাড় ছুঁইলেই আমাদের স্নান করিতে হয়। বৌদ্ধেরা কিন্তু সেরূপ করেন না। শুধু হাড় নয়— আমরা নখ, চুল কাটা হইয়া গেলে তাহাকে অস্পৃশ্য মনে করি— তাহা ছুঁইলেও আমাদের অশৌচ হয়। বৌদ্ধেরা কিন্তু এই নখ, চুল ও হাড়কে পরম পবিত্র বলিয়া মনে করেন, তাহাকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য পাথরের বাক্স বা কৌটায় পুরিয়া রাখেন এবং তাহার উপরে বড়ো বড়ো স্তূপ নির্মাণ করেন, স্তূপের চারি দিকে প্রদক্ষিণ করেন, স্তূপের পূজা করেন, স্তূপের চারি দিকে দিঙ্‌মালা দেন। এই জায়গায় বৌদ্ধ হিন্দুতে বড়োই তফাত। বৌদ্ধদের শব অনেক সময় ফেলিয়া দেয়, অনেক সময়ে শ্মশান-রক্ষকের নিকট পোড়াইবার জন্য কিছু পয়সা দিয়া আসে। কিন্তু বড়লোক মরিলে খুব জাঁক করিয়া, সে দেহ তৈলদ্রোণীতে পুরিয়া দাহ করে এবং হাড়গুলি পুঁতিয়া, তাহার উপর স্তূপ নির্মাণ করে। বুদ্ধদেবের হাড়গুলি প্রথম আট ভাগ হইয়া যায় ও আট জায়গায় স্তূপ হয়। রাজা অশোক তাহাদের মধ্যে সাতটির “সলিলনিধান” উঠাইয়া, তাহার চৌরাশি হাজার ভাগ করেন এবং তাহার উপর চৌরাশি হাজার স্তূপ নির্মাণ করেন। নেপালে এখনো অনেকগুলি স্তূপ অশোক-স্তূপ বলিয়া পরিচিত। সাহেবেরা বলেন, ওগুলিকে অশোকের বলিতে দ্বিধা করা উচিত নয়। কারণ, উহাদের পরিমাণ অশোক-স্তূপের মতো ও উহাদের মাল-মসল্লাও অশোক-স্তূপের মতো। তাহার পর শ্রাদ্ধ। অগ্নিহোত্রীরা পিতৃপিণ্ড নামে যজ্ঞ করিতেন। উহা অগ্নিত্রয়সাধ্য। সাগ্নিক ও নিরগ্নিকেরা শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন। শ্রাদ্ধ মানে— মৃতের উদ্দেশে শ্রদ্ধাপূর্বক অন্ন, বস্ত্র ও পিণ্ডদান। ইহা সমস্তই বেদমন্ত্রে হইয়া থাকে। শ্রাদ্ধ নানা রকম আছে— প্রেতশ্রাদ্ধ, মাসিক শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডীকরণ, পার্বণ শ্রাদ্ধ, অমাবস্যা শ্রাদ্ধ, নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ, একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ ইত্যাদি। ভূতের ভয়ে অনেকরূপ শ্রাদ্ধ করিতে হয়। সে শ্রাদ্ধ যে কেহ করিতে পারে— তাহার অধিকারী, অনধিকারী নাই। ইহার মধ্যে প্রধান ত্রিপিণ্ড শ্রাদ্ধ। যব, মাষ ও তিল— এই তিনের

ত্রিপিণ্ড করিতে হয়। ততকরগুপ্তের মতে বৌদ্ধেরাও নানারূপ শ্রাদ্ধ করে। তিনি বলেন, ভগবান্ গৃহস্থাশ্রমীদের জন্য শ্রাদ্ধেরও ব্যবস্থা করিয়াছেন। অতএব তাহার বিধি বলিতেছি। নিত্যশ্রাদ্ধের সময় বলিতে হয়। বোধিসত্ত্বচর্যা গ্রহণ করিয়া বুদ্ধেরা যেমন পূর্বে শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ করিব— "ওঁ অদ্য অমুক মাসে, অমুক তিথিতে, অমুক গোত্রে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, তাহাদের পত্নীদের ও অতিথিদের জন্য বজ্রতণ্ডুল হইতে উৎপন্ন সঘৃত অন্ন আঃ হুং স্বাহা", এইটি তিনবার পাঠ করিয়া দিবেন। তাহার পর সেই বুদ্ধেরা যেমন সকল পুণ্য-কর্মের পরিণামস্বরূপ সম্যক্ সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ করিব। আমার এই পুণ্য মোক্ষের হেতু হইবে। পার্বণশ্রাদ্ধ ও অপরপক্ষের শ্রাদ্ধেও এই বিধান। একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে যাহার শ্রাদ্ধ, কেবল তাহারই নাম গোত্র উচ্চারণ করিবে, আর-সকলই পূর্বের মতো। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধও এইরূপে করা যায়। কোথায় হাঁটু পাতিতে হইবে, কোথায় হাত মুখ রাখিতে হইবে, কোথায় তিল কুশ গ্রহণ করিতে হইবে— এইসব নিজেই বিচার করিয়া লইতে হইবে।

ব্রাহ্মণভোজন ও সংঘভোজন ॥

ব্রাহ্মণেরা ছোঁয়া লেপাটা বড়োই দোষ মনে করেন। পইতা হওয়ার দিন হইতে ব্রাহ্মণের ছেলেরা ব্রাহ্মণ হয়। সেইদিন থেকে তাহারা কাহারো এঁটো খায় না এবং কেউ ছুঁলেও খায় না। সুতরাং ব্রাহ্মণভোজনে প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আসন দিতে হয় ও মাঝখানে একটু ফাঁকও রাখিতে হয়। জলপাত্র ডান দিকে দিতে হয়। যাতে ছোঁয়া লেপা না হয়, সেজন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়।

ইৎসিং বলেন, সেকালে ভারতবর্ষে সংঘভোজনেও এরূপ করা হইত। সাত ইঞ্চি উঁচু পিঁড়ির উপর বসিয়া, উবু হইয়া (আসনপিঁড়ি হইয়া বসা দোষ) বসিয়া তাঁহারা খাইতেন। দুখানা পিঁড়ির মধ্যে অন্তত এক ফুট জায়গা খালি থাকিত। ব্রাহ্মণভোজনে সকলের পাতে পরিবেষণ না হইলে ব্রাহ্মণেরা খাইতে পারিতেন না। এবং খাইতে

বসিয়া মাঝে কেউ উঠিয়া যাইতেন না। কিন্তু সংঘের লোকেরা যাঁর পাতে যখন পরিবেষণ হইত, অমনি খাইতে পারিতেন, অন্য লোকের জন্য অপেক্ষা করিতে হইত না। ব্রাহ্মণেরা খাইতে বসিয়া জল খাইতে হইলে ঘটি বাঁ হাতে ধরিয়া আলগোছে জল খান, অথবা ডান হাতে ধরিয়া চুমুক দিয়া খান। বৌদ্ধেরা বাঁ হাতে চুমুক দিয়া জল খাইতেন। ইৎসিং বলেন, তিনি বৌদ্ধদের সম্বন্ধে যাহা বলিতেছেন, সমস্তই বুদ্ধদেবের বহি হইতে বলিতেছেন। তাহলে সংঘভোজনেও ব্রাহ্মণদের মতো এত ছোঁয়া লেপা ছিল না। কিন্তু আমি ১৮৯৮ সালে এক সম্যক্ সম্ভোজনে উপস্থিত ছিলাম। নেপালের সমস্ত বিহারে যত সংঘ ছিল, সব সেখানে উপস্থিত ছিল— প্রায় ১৩ হাজার ভিক্ষু একত্র খাইতেছিলেন। তাঁহাদের কিন্তু সব ছোঁয়া লেপা। সারি সারি চাদর" বিছাইয়া বসিয়াছেন। একের চাদরের উপর আর-একজনের চাদর পড়িয়াছে। যত বড়ো মানুষের সারি, চাদরও তত বড়ো। চাদরে যা পড়িতেছে, খাওয়ার হইলে ভিক্ষুরা তাহা তখনই খাইতেছেন ; ভাত, ব্যঞ্জন, লুচি, পরটা, মুলো সিদ্ধ, ডাল— সব সেখানে বসিয়াই খাইতেছেন— কড়ি, পয়সা, চাল, সুপারি, এলাচ, লবঙ্গ প্রভৃতি যাহা বসিয়া খাবার জিনিস নয়, সেগুলি পাতে রহিতেছে— যাবার সময় সঙ্গে লইয়া যাইবেন। তাহা হইলে আর ছোঁয়া লেপার বাকি কী রহিল ? আমাদের দেশে পালি-পার্বণে গঙ্গাতীরে দেখিয়াছি— ভিখারি বৈষ্ণবেরা ওরূপ করিয়া চাদর বিছাইয়া বসে, তাহাদের কিন্তু রান্না খাবার কেউ দেয় না ; দেয়— চাল, ডাল, কড়ি, পয়সা, ফল। ইহাদিগকে যেমন সকলেই কিছু কিছু দেয়, সম্যক্ সম্ভোজনে কিন্তু ঠিক সেরূপ নহে। দানপতি (আমরা ইঁহাকে কৃতী বলি) সকলকেই পরিতোষ করিয়া দিবেন, একজনকেও ফাঁক রাখিতে পারিবেন না। অন্যান্য বৌদ্ধেরা— তাঁহারা গৃহস্থই হউন, ভিক্ষুই হউন বা গুভাজুই হউন, সকলেই দান করিবার জন্য কিছু কিছু লইয়া আসিবেন। একজনে হয় তো এক মন চাউল লইয়া আসিয়াছেন ; তাহাতে যত জনকে দেওয়া হয়, দেওয়া হইল। তারপর তিনি চলিয়া গেলেন। একজন হয় তো সুপারি লইয়া আসিয়াছেন। পাঁচ হাজারটি সুপারি পাঁচ হাজার লোককে দিলেন।

বাকি ৭ হাজারকে দিতে পারিলেন না— তিনি চলিয়া গেলেন। সম্যক্ সম্ভোজনের অধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলাম, এক-একজন লোক কী পাইল? তিনি বলিলেন, রান্না জিনিস তো তাহারা খাইয়া ফেলিয়াছে। তাহার উপর নগদে ও জিনিসে প্রত্যেকে সাড়ে দশ আনা করিয়া পাইয়াছে।

আমি এ পর্যন্ত হিন্দু ও বৌদ্ধদের যে তুলনামূলক সমালোচনা করিলাম, ইহার উদ্দেশ্য, এ দুয়ে কতটুকু তফাত, তাহার কিছু সন্ধান দেওয়া। পূর্ণ সমালোচনা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। কারণ, আচার-ব্যবহার সব দেশে সমান নয়— এই আড়াই হাজার বৎসরের মধ্যে কত জায়গায় যে কত বদল হইয়াছে, তাহার ঠিকানা নাই। হিন্দু বলিতে গেলেও অসংখ্য জাতি, অসংখ্য ধর্ম বুঝায়। বৌদ্ধ বলিতে গেলেও তাই। তবে মোটামুটি কথা এই, বৌদ্ধেরা গুরু মানে, গুরুকে দেবতার চেয়ে বড়ো বলে মানে, গুরুপদ পরমপদ বলে মনে করে। গুরুকে তন-মন-ধন কিছুই দিতে দ্বিধা করে না, আর সম্পূর্ণরূপে গুরুর মতো হইতে চায়, গুরুই শূন্য, গুরুই পরমার্থ। শূন্য যেমন শূন্যে মিশাইয়া যায়, গুরুও তেমনি শূন্যে মিশাইয়া গিয়াছেন। আমরাও তেমনি গুরুতে— শূন্যে মিশাইয়া যাইব। এরূপ মত— আমরা এখন যাঁহাদিগকে হিন্দু বলি, তাঁহাদের মধ্যেও অনেক আছে।

ততকরগুপ্ত বলিয়াছেন, "গুরুর্বুদ্ধো গুরুর্ধর্ম্মো গুরুঃ সঙ্ঘঃ প্রকীর্ত্তিতঃ। স্বয়ং তথাগতির্যস্মাৎ গুরুরেবাত্র কারণম্ ॥ সংবুদ্ধেভ্যো যথাদত্তে [···] ফলং তথা। তেনৈব সূত্রতন্ত্রেষু গুরুপূজা প্রকাশ্যতে। প্রদত্তে পুনরন্যেভ্যঃ ফলং পাত্রানুরূপকম্। বিনয়েষ্বপি সূত্রেষু তন্ত্রেষ্বপি জগৌ মুনিঃ ॥"[৩১]

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'
দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৩১ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ৩ শ্রাবণ শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশেষ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণরূপে শাস্ত্রীমশায় "হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ" নামে এই প্রবন্ধটি পড়েন। পরিষদের কার্যবিবরণে উল্লেখ আছে, "প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু বাহাদুর সি. আই. ই, আই. এস. ও, এফ. সি. এস. এম. বি, রসায়নাচার্য্য মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, 'আজ আমরা অনেক জ্ঞান লাভ করিলাম। বাঙ্গালায় তাঁহার মত জ্ঞানবান্ আর কেহ নাই। তিনি সাহিত্য-পরিষদের সভাপতিরূপে বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। শ্রোতা ও সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।"

১৩৩১ বঙ্গাব্দের দ্বিতীয় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এই অভিভাষণ প্রকাশিত হয়। ১৩৩১-এর মাঘ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে প্রবন্ধটির কিছু অংশ ছাপা হয়েছিল।

১. এই বইয়ের পৃ. ৩৩৬ সূত্র ১০ দ্র.

২. চীনা পরিব্রাজক ইৎসিং, ঈ-ৎসিঙের জন্ম চীনের চি-লি প্রদেশে, ৬৩৫ খৃস্টাব্দে। ৬৭১ খৃস্টাব্দে সমুদ্রপথে প্রথমে সুমাত্রা দ্বীপের পালেম্‌বাং বা শ্রীবিজয়ে আসেন, সেখান থেকে ৬৭৩ খৃস্টাব্দে তাম্রলিপ্তে এসে পৌঁছন। সমকালীন বৌদ্ধ তীর্থ ও বিদ্যাকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করে তিনি দশ বৎসর স্থায়ীভাবে নালন্দায় বাস করেন। নিবিষ্ট চর্চায় ঈ-ৎসিঙ বৌদ্ধবিদ্যায় পাণ্ডিত্য অর্জন করে ৬৯৫ খৃস্টাব্দে দেশে ফিরে যান। জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি তিনি ভারত থেকে সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়া বৌদ্ধশাস্ত্রের অনুবাদ এবং বৌদ্ধতত্ত্ব-জিজ্ঞাসুদের জীবন ও সাধনা বিষয়ে রচনায় নিয়োজিত ছিলেন। ৭১৩ খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। বৌদ্ধসংস্কৃতির ইতিহাস চর্চায় তাঁর দুখানি বই— ফরাসি অনুবাদে *Memoir Compose a l'e'poque de la Grande Dynastic T'ang sur les*

Religieux Eminents qui allirènt chercher la Loi dans les pays d'Occident, tr. E. Chavannes, Paris 1894 এবং ইংরেজি অনুবাদে *A Record of the Buddhist Religion as Preached in India and Malaya Archipelago, 671-695 A.D.*, tr. J. Takakusu, Oxford 1896 বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

৩. এই বইয়ের পৃ ২৫৯ সূত্র ২০ দ্র.

৪. তর্কশাস্ত্র অর্থে ন্যায় শব্দটির ব্যবহার প্রথম খৃস্টাব্দের আগে পাওয়া যায় না। এই বিদ্যাকে আগে বলা হত আন্বীক্ষিকী, হেতুশাস্ত্র বা তর্কবিদ্যা। তর্কশাস্ত্র অর্থে ন্যায় শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায় 'মহাভারত', 'বায়ুপুরাণ', 'মৎস্যপুরাণ', 'পদ্মপুরাণ' ও 'যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা' প্রভৃতি গ্রন্থে। এইসব গ্রন্থের যে অংশগুলিতে ন্যায় শব্দের ব্যবহার রয়েছে সেগুলি খৃস্টীয় অব্দে লেখা। দ্বিতীয় খৃস্টাব্দ থেকে শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে থাকে। এই সময়ে 'ন্যায়সূত্র' লেখা হয়েছিল। বাৎস্যায়ন 'ন্যায়ভাষ্যে' (আ. ৪০০ খৃ.) বলেছেন, অক্ষপাদের (আ. ১৫০ খৃ) আগেই ন্যায়দর্শনের বিকাশ হয়েছিল। উদ্দ্যোতকরের 'ন্যায়বার্তিকে' (আ. ৬০০ খৃ.) বলা হয়েছে, অক্ষপাদই প্রথম ন্যায়শাস্ত্রকে শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপ দেন। কিন্তু 'পদ্মপুরাণ', 'স্কন্দপুরাণ' প্রভৃতি গ্রন্থে গোতম বা গৌতমকে ন্যায়শাস্ত্রের প্রবর্তক বলা হয়েছে। কিংবদন্তি অনুসারে ('ন্যায়কোষ') গোতম ঈশ্বরের অনুগ্রহে পায়েও দুটি চোখ পাওয়ায় অক্ষপাদ নামে পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু গোতম ছিলেন মিথিলার অধিবাসী, অক্ষপাদ কাথিয়াওয়ারের অন্তর্গত প্রভাসের অধিবাসী ('ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ' অনুসারে)—দু জন এক ব্যক্তি হতে পারেন না। তবে 'ন্যায়সূত্রে' গোতমের প্রাথমিক রচনা অক্ষপাদের হাতে পরিণত সংহত রূপ পেয়ে থাকতে পারে।

"History of Naya *Ś*āstra from Japanese Source" এবং "An Examination of the Naya-Sūtras" প্রবন্ধ দুটিতে শাস্ত্রীমশায় এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। দ্র. *H-I-Lc*, pp. 47-50.

৫. 'তর্ক-পুঙ্গব' আচার্য দিঙ্‌নাগের জন্ম মাদ্রাজের কাঞ্চীর কাছে সিংহবিক্রমে। জন্মকাল খৃস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষ দিকে। পণ্ডিত নাগদত্তের কাছে দীক্ষা নিয়ে দিঙ্‌নাগ প্রথমে বাৎসীপুত্রীয় সম্প্রায়ভুক্ত হন এবং 'ত্রিপিটকে' প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। পরে আচার্য বসুবন্ধুর শিষ্য হন এবং তাঁর কাছে পড়াশুনো করে মহাযান ও হীনযান শাস্ত্রে পূর্ণতর জ্ঞানের অধিকারী

হয়ে ওঠেন। নালন্দায় আহূত হয়ে দিঙ্‌নাগ সুদুর্জয় প্রভৃতি ব্রাহ্মণদের তর্কে পরাস্ত করে বৌদ্ধমতে আনেন। এজন্য তাঁকে তর্ক-পুঙ্গব বলে উল্লেখ করা হত। দিঙ্‌নাগ ওড়িশা, মহারাষ্ট্র ও মাদ্রাজে পরিভ্রমণ করেন এবং বিরুদ্ধবাদীদের তর্কে পরাস্ত করে খ্যাতি অর্জন করেন।

দিঙ্‌নাগ বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রের যথার্থ প্রবর্তক। তাঁর আগে বৌদ্ধ-বিদ্যার পণ্ডিতেরা ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় ন্যায়ের সাহায্য নিতেন, কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রের স্বতন্ত্র মর্যাদা স্বীকৃত হয় নি। তিনিই প্রথম বৌদ্ধবিদ্যায় ন্যায়শাস্ত্রের স্বতন্ত্র মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেন। দিঙ্‌নাগের শ্রেষ্ঠতম রচনা সংস্কৃতে অনুষ্টুভ ছন্দে লেখা 'প্রমাণসমুচ্চয়' মূল পাওয়া যায় না। তেঙ্গুর সংগ্রহের অন্তর্গত তিব্বতি অনুবাদ পাওয়া গেছে। প্রত্যক্ষ, স্বার্থানুমান, পরার্থানুমান, হেতু-দৃষ্টান্ত, অপোহ এবং জাতি— এই ছয় অধ্যায়ে 'প্রমাণসমুচ্চয়' গ্রন্থটি সম্পূর্ণ। তিব্বতি অনুবাদে দিঙ্‌নাগের 'আলম্বন-পরীক্ষা', 'ত্রিকাল-পরীক্ষা', 'হেতুচক্র সমর্থন', 'ন্যায়প্রবেশ', 'ন্যায়মুখ'— এই সংক্ষিপ্ত রচনাগুলিও পাওয়া গেছে। মূল সংস্কৃতে 'প্রমাণসমুচ্চয়'-এর কিছু বিচ্ছিন্ন অংশ H. N. Randle *Fragments of Dinnāga* (London 1926) বইয়ে সংকলন করেন। মূল সংস্কৃতে 'ন্যায়প্রবেশ' প্রকাশিত হয়েছে গাইকোয়াড় ওরিয়েন্টাল সিরিজে (No. 38, 39 ; Baroda 1930)।

শাস্ত্রীমশায় মনে করতেন দিঙ্‌নাগের গ্রন্থগুলি পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ২৫ বছরের মধ্যে লেখা হয়েছিল। জৈন লেখক হরিভদ্রর 'ষড়্‌দর্শন সমুচ্চয়' গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতির সূত্রে তিনি এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন। দ্র. "Some Notes on the Dates of Subandhu and Diṅnāga", *J-A-S-B*, NS I, 1905, pp. 253-55.

৬. 'ন্যায়বার্তিক'-কার উদ্দ্যোতকরের নামান্তর ভারদ্বাজ, পাশুপতাচার্য। ইনি পাশুপত শৈব সম্প্রদায়ের গুরু ছিলেন। উদ্দ্যোতকরের জন্মস্থান নির্দিষ্ট-ভাবে জানা যায় না, তবে তাঁর রচনায় শ্রুঘ্ন নামে থানেশ্বরের প্রায় ৬৮ কিলোমিটার উত্তরের একটি জায়গার উল্লেখ আছে। সম্ভবত 'ন্যায়-বার্তিক' রচনার সময় তিনি থানেশ্বর নিবাসী ছিলেন এবং থানেশ্বররাজের পরিপোষণ লাভ করেছিলেন। উদ্দ্যোতকর আনুমানিক ৬৩৫ খৃস্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। 'ন্যায়বার্তিক' রচনার উদ্দেশ্য তাঁর পূর্ববর্তী বৌদ্ধ নৈয়ায়িক দিঙ্‌নাগ, নাগার্জুন প্রভৃতির মত খণ্ডন। দ্র. *H-I-Lc.*, pp. 123-32.

৭. নবম শতাব্দীর মানুষ, মিথিলার অধিবাসী বাচস্পতি মিশ্র দর্শনের সব

শাখায় সমান পারংগম হয়েও কোনো বিশেষ মতবাদের বশ্যতা স্বীকার করতেন না। তাঁকে বলা হত সর্ব-তন্ত্র-স্বতন্ত্র। তাঁর গুরু ছিলেন ত্রিলোচন। বাচস্পতির বেদান্ত-ভাষ্যের টীকা 'ভামতী', সাংখ্য-কারিকার টীকা 'সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী' প্রসিদ্ধ। বৌদ্ধ-নৈয়ায়িকদের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ ভাষ্যকারদের মতবাদ সমর্থন করে তিনি 'ন্যায়বার্তিক-তাৎপর্য-টীকা' রচনা করেন। 'ন্যায়সূত্রে' কোনো প্রক্ষিপ্ত অংশের অনুপ্রবেশ রোধের জন্য তিনি 'ন্যায়-সূচি-নিবন্ধ' নামে একটি সূচি প্রস্তুত করেছিলেন। 'ন্যায়-কণিকা' নামে তাঁর আর-একটি গ্রন্থ পাওয়া যায় নি। 'ন্যায়বার্তিক-তাৎপর্য-টীকা'য় বাচস্পতি মাধ্যমিক, বিজ্ঞানবাদ, সৌত্রান্তিক ও বৈশেষিক— এই চারটি বৌদ্ধদর্শনের উল্লেখ করেছেন এবং দিঙ্‌নাগ ও ধর্মকীর্তির মতের কঠোর সমালোচনা করেছেন। দ্র. *H-I-Lc*, pp. 133-41.

৮. এই বইয়ের পৃ. ৩৪৯ সূত্র ৬ দ্র.

৯. চার্বাক কোনো ব্যক্তি-নাম কিনা জানা যায় নি। চার্বাক মত সম্পর্কে কোনো মূল রচনাও পাওয়া যায় না। বৌদ্ধশাস্ত্র এবং 'মহাভারতে'র উল্লেখ থেকে এই বিশিষ্ট মতবাদ অনেক প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত ছিল অনুমান করা যায়। বেদ ও শ্রুতির প্রামাণ্য এবং যাগযজ্ঞে এঁদের আস্থা ছিল না। অধ্যাত্মবাদী শাস্ত্রকারেরা এই নাস্তিক মতবাদ খণ্ডনের জন্য যেটুকু উল্লেখ করেছেন চার্বাকপন্থীদের সম্পর্কে সেইসব উল্লেখ ভিন্ন আর-কোনো তথ্য না পাওয়ায় একে কোনো পূর্ণাঙ্গ দার্শনিক-প্রস্থানরূপে সংগঠন করে নেওয়া সম্ভব নয়। চার্বাক মতবাদকে লোকায়ত ও বার্হস্পত্য বা বৃহস্পতি প্রবর্তিত মতবাদও বলা হয়।

১২৮১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের "চার্বাক-দর্শন" প্রবন্ধটি থেকে এ বিষয়ে আধুনিক চর্চার সূত্রপাত। শাস্ত্রীমশায় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচনার ইঙ্গিত অনুসরণ করে ১৯২৫ খৃস্টাব্দে লেখেন *Lokāyata* পুস্তিকা। দ্র. Haraprasad Shastri, *Lokāyata and Vrātya*, Haraprasad Shastri Gaveshana Kendra, Naihati 1982.

১০. সুগিউরার মতে মৈত্রেয়, মৈত্রেয়নাথ আনুমানিক খৃস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মানুষ। শাস্ত্রীমশায় মনে করেন এঁর সময় ১৫০-২৬৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে। ইনি যোগাচার মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন। মনে করা হয় অসঙ্গকে ইনি প্রভাবিত করেছিলেন। 'বোধিসত্ত্ব-চর্চা-নির্দেশ', 'সপ্তদশ-ভূমি-শাস্ত্র-

যোগাচার্য' এবং 'অভিসময়ালংকার-কারিকা' মৈত্রেয়র রচনা। প্রথম দুটি গ্রন্থ যথাক্রমে ৪১৪-২১ ও ৬৪৬-৪৭ খৃস্টাব্দে চীনা ভাষায় এবং তৃতীয় গ্রন্থ ১০৫৯-১১০৯ খৃস্টাব্দের মধ্যে তিব্বতি ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল। তিব্বতি অনুবাদে মৈত্রেয়নাথের নামে 'ধর্মধর্মতাবিভঙ্গ' ও 'মহাযান উত্তর-তন্ত্র' নামে আরো দুটি বই পাওয়া গেছে। 'অভিসময়ালংকার-কারিকা'য় মৈত্রেয় ক্ষণিকবাদ ও শূন্যবাদ সমর্থন করেছেন। 'সপ্তদশ-ভূমি-শাস্ত্র-যোগাচার্য' গ্রন্থের পঞ্চদশ খণ্ডে ন্যায়ের আলোচনা আছে। তাঁর মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং আগম বা শাস্ত্রোক্তি— এই তিনটি প্রমাণের সাহায্যে প্রতিপাদ্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

মৈত্রেয়নাথ সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায়ের মন্তব্য—

"Shortly after the time of Nāgārjuna and Ārya-deva there appeared one Maitreyanātha who wrote Kārikās or verses in eight Chapters and started the theory of Vijñānavāda or yogācāra ; in fact, many Buddhists were not satisfied with Śūnyavāda and questioned,— What is it ? Shall we be mere void ? No intelligence ? No sensation ? Is that mukti ? Is that nirvāṇa ? Is that the aim for which people sholud work so hard and so strenuously and for so many millions of years ? That cannot be. There must be consciousness. All Buddhists believe in the momentary character of all phenomena. There is nothing permanent except Śūnya, the *Paramārtha.* Now Maitreya said, 'No'. There should be Śūnya but there should be consciousness of Śūnya. But this is impossible in those who believe all things to be momentary, even ideas. But the stream of ideas may be permanent though not the ideas, the acts of consciousness. This transcendental stream of consciousness took the place of bare Śūnya in his school. This is Vijñānavāda. This is Yogācāra ; no one speaks of Maitreya as the founder of this theory. The great exponent of this theory was Asaṅga in the fourth or fifth century of the Christian era. But Yuan Chwang

says that Asaṅga received his inspiration from Maitreya the coming Buddha. We in the twentieth century are not prepared to accept such a story specially when we know that a real historical person preceded Asaṅga and his name was Maitreyanātha. About the historicity of Maitreya there is another evidence. Sadajiro Sigiura, a Japanese scholar, in his thesis on Hindu logic says that Nāgārjuna in the second century A.D. believed in four pramāṇas and that Maitreyanātha in the third century did away with the third pramaṇa (analogy on upamāna). It is well known that the Prajñā pāramitā of 8000 ślokas was modified and enlarged into the Pañcaviṃśati-sāhasrikā according to the Kārikās of Maitreyanātha. So there is no doubt about the existence of an historical person Maitreya preceding Asaṅga." ("The Northern Buddhism", *I-H Q*, Sept. 1925, pp 465-66); দ্র. Shastri, "Discovery of Abhisamayālaṃkāra by Maitreyanāth", *J-A-S-B*, August 1910; Sadajiro Sugiura, *Hindu logic as preserved in China and Japan*, Philadelphia 1900.

১১. অনুবাদ : প্রদীপ যেমন নিবে গেলে মাটিতে চলে যায় না আকাশেও নয়, কোনো দিকেও নয় কোনো বিদিকেও নয়, কেবল তেল ফুরিয়েছে বলে শান্তি পায় ॥ সার্থক ব্যক্তি তেমনি নির্বাণ প্রাপ্ত হলে মাটিতে চলে যায় না আকাশেও নয়, কোনো দিকেও নয় কোনো বিদিকেও নয়, শুধু ক্লেশ (অর্থাৎ কর্মফল) নষ্ট হওয়ায় শান্তি পায় ॥

১২. অনুবাদ : কঠিন, সারবান্, ফাঁপা নয়, ভাঙা যায় না, কাটা যায় না, পোড়ানো যায় না, ধ্বংস করা যায় না— এইসব লক্ষণ থাকায় শূন্যতাকে বজ্র বলা হয় ।

১৩. এই বইয়ের পৃ. ৩০৩ সূত্র ৪ দ্র.

১৪. ভারতের পশ্চিম উপকূলে উদিপিতে ১১৯৭ খৃস্টাব্দে মধ্বাচার্যের জন্ম ।

অচ্যুতপ্রেক্ষ নামে এক বৈষ্ণব মধ্বের মা বাবার অনুমতি নিয়ে তাঁকে সন্ন্যাস-দীক্ষা দেন, তাঁর নাম হয় পূর্ণপ্রজ্ঞ। মধ্বাচার্য 'ব্রহ্মসূত্র', 'ঋগ্-বেদে'র সূচনা অংশ, দশটি 'উপনিষদ' এবং 'ভগবদ্গীতা'র ভাষ্যে তাঁর দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর গ্রন্থ সংখ্যা ৩৭। প্রতিটি রচনা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার দিক থেকে একসূত্রে গাঁথা। পরবর্তীকালে সব রচনা এক সঙ্গে 'সর্বমূল' নামে সংকলিত হয়। মধ্বাচার্যের আলোচনা পদ্ধতি মূলত জ্ঞানতত্ত্ব নির্ভর। জ্ঞানকে তিনি স্বতঃসিদ্ধ মানেন। ব্যক্তির আত্মা বা ব্যক্তির অন্তর্গত "সাক্ষী" সমস্ত অবস্থায় বর্তমান থাকে এবং ইন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই "সাক্ষী" জ্ঞানের মূল। জ্ঞানকে মধ্ব অদ্বয় বা অভেদ মনে করেন না, কারণ, দুটি পদার্থের অভেদ কল্পনার মধ্যে ভেদের ধারণা অবশ্যই প্রচ্ছন্ন থাকে। জ্ঞান নির্বিকল্প নয়, জ্ঞান মাত্রেরই কোনো-না-কোনো বিষয় আছে। প্রত্যেক বিষয় বিভিন্ন উপাদানে গঠিত এবং প্রত্যেক বিষয় অন্যসব বিষয়ের সমবায়ে গঠিত একটি বৃহত্তর শৃঙ্খলার অন্তর্গত। প্রত্যেক বিষয় তাই একই সঙ্গে ভেদযুক্ত এবং ঐক্যে বিধৃত। বিষয়কে বা বিষয়ের কোনো রূপকে এই শৃঙ্খলা থেকে ছিন্ন করে নেওয়া সম্ভব নয়— নির্বিকল্প জ্ঞানের তত্ত্বে সেই অসম্ভব চেষ্টাই করা হয়ে থাকে। মধ্ব নিজের পরিচয় দিয়েছেন "ত্যক্তবেদ" বলে, তাঁর উপরে শ্রুতি বা বেদের প্রভাব নেই। এই উক্তির অর্থ, বেদকে তিনি স্বতঃপ্রমাণ মানেন না। তাঁর মতে বেদ জ্ঞানের একটি করণ বা উপায়। জ্ঞান শাস্ত্র-বচনকে ব্যবহার করে, শাস্ত্রবচনের কর্তৃত্বে পরিচালিত হয় না। শংকর-রামানুজ প্রভৃতি বেদান্ত-দার্শনিকদের মধ্যে আর-কেউ এভাবে বেদের কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন নি। মধ্ব বলেন, ব্রহ্ম সর্বোত্তম। জগৎ ব্রহ্মের সৃষ্টি, তার প্রকাশরূপ। ব্রহ্ম ভিন্ন কোনো কিছুর অস্তিত্ব সম্ভব নয়। এই জন্যই শ্রুতি অভেদের কথা বলে। আবার ব্রহ্ম সৃষ্টির মধ্যে নিঃশেষ হয় না, সৃষ্টিসীমা অতিক্রম করে বিরাজিত। তাই শ্রুতিতে ভেদের কথা বলা হয়েছে। ভেদ ও অভেদ, দ্বৈত ও অদ্বৈতকে পৃথক মনে করাই বন্ধন বা দুঃখের কারণ। সর্বোত্তম ব্রহ্মকে দ্বৈতাদ্বৈত রূপে জানাই যথার্থ জ্ঞান। দ্র. *C-H-I*, Vol. III, pp. 313-32.

১৫. এই বইয়ের পৃ. ১৮৫ সূত্র ১৫ দ্র.

১৬. এই বইয়ের পৃ. ২৫৪ সূত্র ১১ দ্র.

১৭. মহাযান-সূত্রের নয়খানি গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক'। মহাযান বৌদ্ধধর্মের বিশিষ্টতার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় এই বইয়ে পাওয়া যায়।

'সদ্ধর্মপুণ্ডরীকে' বর্ণিত আছে, একদা বুদ্ধদেব বারো শো ভিক্ষুর সঙ্গে রাজগিরের গৃধ্রকূটে অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে তাঁর মহানির্দেশ বা সমস্ত বস্তুর পরিচয় প্রকাশের ইচ্ছা হল। তিনি অন্তর্নির্দেশ সমাধিতে মগ্ন হলেন। গৃধ্রকূটে এবং সব বৌদ্ধতীর্থে পুষ্পবৃষ্টি শুরু হল, বুদ্ধের ভ্রূসন্ধি থেকে বিচ্ছুরিত আলো গিয়ে পড়ল। মঞ্জুশ্রী মৈত্রেয়কে জানালেন, বুদ্ধ মহানির্দেশ প্রকাশ করবেন— তাই এই অলৌকিক আয়োজন। বইটিতে কাহিনীর পর কাহিনীর মাধ্যমে বুদ্ধের অপার মহিমা প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এইসব নীতিমূলক কাহিনীর সার কথা— বুদ্ধদেবকে স্মরণ করে কোনো সৎকাজ করলে যে-কোনো মানুষ বুদ্ধত্ব অর্জন করতে পারে। 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীকে'র গদ্য অংশ শুদ্ধ সংস্কৃতে এবং গাথা অংশ মিশ্র-সংস্কৃতে লেখা। রচনাকাল আনুমানিক প্রথম খৃষ্টাব্দ।

খৃস্টীয় অব্দের শুরু বা তার আগে থেকে পঞ্চদশ খৃস্টাব্দ অবধি মধ্য-এশিয়ার মরু শহরগুলিতে বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তি ছিল। আবুল রৈহান্ মহম্মদ ইব্‌ন্ আহ্‌মদ অল্‌-বীরুনী মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধধর্মের বিবরণ লিখে গিয়েছেন (*Alberuni's India*, Vol. I, Carl Edward Sachau tr. London 1888) ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্মানি, রাশিয়া, জাপান, সুইডেন এবং ফিন্‌ল্যাণ্ড থেকে বৌদ্ধ পুথিপত্রের সন্ধানে পূর্ব-তুর্কিস্তান অঞ্চলে অভিযান চালানো হয়। তাক্‌লামাকান মরুভূমির বালিতে চাপা পড়া মঠ থেকে প্রচুর পুথি পাওয়া গেল। অবশ্য প্রায় সবই খণ্ডিত পুথি। 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীকে'রও এই ধরনের কয়েকটি খণ্ডিত পুথি স্টাইন, পেট্রোফস্কি, ওটানি এবং হ্যর্নলে সংগ্রহ করেন। কার্ন পেট্রোফস্কির পুথিগুলি পরীক্ষা করে মন্তব্য করেন, নেপালের পুথির ভাষার তুলনায় এইসব পুথি অশুদ্ধ সংস্কৃতে লেখা। মধ্য-এশিয়ায় পাওয়া ২৮০ পাতার একটি পূর্ণতর পুথি রাশিয়ার লেলিনগ্রাদ সংগ্রহে আছে। দ্র. *S-B-L-N*, pp. 203-07; *H-I-L*, Vol. II, pp. 295-305; H. Kern and Bunyin Nanjio ed., *Saddharmapuṇḍarīka*, Bibliotheca Buddhica, X, St. Petersburg 1908-12.

১৮. এই বইয়ের পৃ. ৪৯৭ সূত্র ১০ দ্র.

১৯. এই বইয়ের পৃ. ৬৩ সূত্র ৭ দ্র.

২০. এই বইয়ের পৃ. ১৮২ সূত্র ৫ দ্র.

২১. এই বইয়ের পৃ. ৭২ সূত্র ১৩ দ্র.

২২. এই বইয়ে "পুরুষোত্তমদেব" প্রবন্ধ দ্র.

২৩. ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা ভাস্করাচার্যের জন্ম ১১১৪ খৃস্টাব্দে, দাক্ষিণাত্যের বীজ্জলবীড় গ্রামে। বাবা মহেশ দৈবজ্ঞ। ভাস্করাচার্য লীলাবতী. বীজগণিত, গ্রহগণিতাধ্যায় ও গোলাধ্যায় এই চার ভাগে সম্পূর্ণ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'সিদ্ধান্তশিরোমণি' রচনা করেন ১১৫০ খৃস্টাব্দে। প্রথম দুই ভাগ গণিত সম্পর্কিত, তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক আলোচনা। প্রাচীনকাল থেকে বিকশিত গণিত ও জ্যোতিষের তত্ত্ব ও পদ্ধতিগুলি ভাস্করাচার্যের রচনায় শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং সম্পূর্ণ পরিণতি পায়। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জ্যোতির্বিদ্যার বিবেচ্য বিষয়ের বেশির ভাগ ভাস্করাচার্যের বিশ্লেষণের অন্তর্ভুক্ত, এইজন্য তিনি আধুনিক পাশ্চাত্ত্যের পণ্ডিতদের কাছে মান্য অগ্রগামী রূপে স্বীকৃত। তাঁর অপর গ্রন্থ 'করণকুতূহল' রচনা করেন ৬৯ বৎসর বয়সে।

২৪. কৌটিলীয়-অর্থশাস্ত্রে এবং বাৎস্যায়ন-কামসূত্রে চারায়ণ বা দীর্ঘচারায়ণের উল্লেখ আছে। ইনি কোশলরাজ প্রসেনজিতের মন্ত্রী ছিলেন। বাৎস্যায়ন বলেন, কামশাস্ত্রের 'সাধারণ অধিকরণ' চারায়ণ পৃথক্‌ভাবে নিজের মত অনুযায়ী সংকলন করেছিলেন।

২৫. অনুবাদ: যেমন সকল তথাগত জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে অভিষিক্ত হয়েছিলেন তেমনি আমি শুদ্ধ ও স্বর্গীয় বারি দ্বারা অভিষেক করছি। ওঁ...।

২৬. ততকরগুপ্ত সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায়ের মন্তব্য, "Besides these the catalogue [নেপাল দরবার লাইব্রেরির তান্ত্রিক ও বৌদ্ধ পুথির ক্যাটালগ] contains descriptions of some very interesting works, *viz.*, a work on Buddhist rituals prepared about the 9th century A.D. by Tatakara Gupta. As the ritualist works of the Northern Buddhists are very rare, this work deserves more than a passing remark. Tatakara was encouraged in his work by one Prabhakara Gupta, and he embodied in it the ideas of Śubhākara Gupta, an eminent scholar

of the Vikramasīla-Vihara who is already known from other sources. From Tatakara's book we come to know that there were married monks known as Āryas in his time, that Buddhist priests considered Mahāyana or Bodhisatvayāna and Mantrayāna as sacraments, that any one who took refuge in the three jewels was regarded as a Bauddha, that the castes such as Kaivarta, Kheṭa and Khaṭika who made a living by habitual animal killing were never admitted into the Buddhist community unless they gave up the habit of killing animals, and that in that century the Buddhists like Hindus made use of the Tāntrika formulas like Jang, Bhang, Dhang, Rang, Lang in the performance of every act necessary for human life, such as bathing, eating, etc., and also for their worship ; that they used to eat among themselves but never with other people, and that they had no objection to accepting cooked food even from Mlecchas and washermen. It is a very interesting work, and fully deserves publication, though the manuscript begins from the 8th leaf."— *Report on the Search for Sanskrit Manuscripts*, (1906-1907 to 1910-1911), The Asiatic Society 1911, p. 3.

২৭. অনুবাদ : প্রণাম তিন রত্নকে, প্রণাম মহাযক্ষিণী হারিতীকে ; অম্নে পানীয়ে ফুঃ স্বাহা।

২৮. অনুবাদ : তিন রত্নের শরণাগত বৌদ্ধদের ভোরবেলার বিষ্ঠামূত্রত্যাগ প্রভৃতি যে-যে উপদেশ বলেছেন ভগবান্ সাধারণভাবে বিনয় প্রভৃতি গ্রন্থে সেসব বলা হচ্ছে। যেমন—

সকালবেলায় অবশ্য করণীয় মলমূত্রত্যাগ কাজ গোপনে করবে। তারপর অনেকটা মাটি দিয়ে গুহ্যদ্বার ধুয়ে ফেলবে।

(এই) শুদ্ধির জন্য তখন বাঁ হাত দিয়ে সাত (টুকরো) মাটি নেওয়া উচিত। দুইয়ের (জন্যে) সাত (টুকরো মাটি) আলাদা

আলাদা রাখা (থাকবে)। এর পর খুব যত্ন করে অনেক জল দিয়ে হাত ইত্যাদি ধুতে হবে।

এই উপদেশ শারীপুত্রের থেকে আসা, দুষ্কর্মকারীর কাছ থেকে অন্য রকম।

২৯. অনুবাদ : হে লোকনাথ, হে চৈতন্যময়, হে দেবতার দেবতা, হে লক্ষ্মী-কান্ত, হে বিষ্ণু, আপনার আজ্ঞাতেই প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করে আপনার প্রীতি কামনায় সংসারের কাজে যোগ দেব।

৩০. অনুবাদ : এইভাবে তিন রত্নের শরণ নেওয়াতেই বৌদ্ধ— এই কথা বলা হয়। এই তিন রত্নের শরণ গ্রহণই বৌদ্ধ দর্শনের উপাসক প্রভৃতির সকল সম্বলের বীজ স্বরূপ। সম্বল এইগুলি। সে সম্বলের সংখ্যা কত (তা) বলা হচ্ছে অনেকভাবে— উপাসক থেকে উপোস পর্যন্ত আটটি। বোধি-সত্ত্ব-মহাযানে উপরে উক্ত আটটি বোধিসত্ত্ব-সম্বল। নবম— অগ্রগামী-মহাযানে উপরে উক্তগুলি এবং বজ্রব্রতসম্বর (হলেন) নতুন দশম। উপাসক উপাসিকা শ্রমণপন্থী ভিক্ষু শ্রমণপন্থী শিক্ষার্থিনী ভিক্ষুনী— একুশ জন— স্ত্রী ও পুরুষ প্রকৃতিভেদ থাকায় সাত সম্বর।

৩১. অনুবাদ : বুদ্ধ গুরু, ধর্ম গুরু, সংঘ গুরু— বিশেষভাবে বলা হয়েছে। সেই হেতু তথাগত স্বয়ংই এখানে কার্যকর গুরু॥ সংবুদ্ধদের কাছে যেমন নেওয়া হয়··· ফল, সেইভাবেই সূত্র ও তন্ত্র নিবন্ধ সকলে গুরু পূজা প্রকাশিত আছে। কিন্তু অন্যদের পাত্র অনুযায়ী ফল দেওয়া হয়। (এই কথা) বিনয়-নিবন্ধগুলিতে সূত্র-নিবন্ধগুলিতে এবং তন্ত্র-নিবন্ধগুলিতে মুনি বলেছেন।

বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করিতেন।

আজিকার বক্তৃতার বিষয় এই যে, বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করিতেন ? একে ভাষার কথা, তার পর ব্যাকরণের কথা, পাণিনির কথা— কাব্য নহে, ধর্ম নহে, ভক্তি নহে ; একথা নিশ্চয়ই নীরস হইবে, কঠিন হইবে। কিন্তু ব্যাকরণের কথা গোড়ায় না বলিলে বৌদ্ধ সাহিত্য বিষয়ে বুঝা কষ্ট হইবে। সেইজন্য যদিও আপনাদের কষ্ট হইবে, বুঝিতে পারিতেছি, তথাপি আমি আপনাদের কাছে প্রার্থনা করি, ধীরভাবে কথাগুলি শুনিবেন।

বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন, ইহা লইয়া অনেক বিবাদ-বিসংবাদ আছে, এবং এখন পর্যন্ত কত ভাষায় বৌদ্ধধর্মের

বই লেখা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধেও আমাদের দেশের লোক খবর বড়ো কম রাখে। বর্মা, শ্যাম, আনাম, চাটগাঁ আরাকান দেশে বৌদ্ধধর্ম সিংহল দ্বীপ হইতে আসিয়াছে। সিংহলে বৌদ্ধধর্মের পুথি এখন প্রায়ই পালি ভাষায় লেখা। সিংহলি পণ্ডিতেরা বলেন, বুদ্ধদেব পালি ভাষাতেই ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন।

কথাটা অত সহজ নয়। তিনি যে পালিতে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তার কোনো প্রমাণ নাই। পালি ভাষাটা কী, কোথা হইতে আসিল, কোন্ দেশে ইহার উৎপত্তি হইল, সে সম্বন্ধে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। সিংহলের লোকে বলে, "সা মাগধী মূলভাসা নরেয় আদি-কপ্পিতা।"[১] মাগধী যে মূল ভাষা, একথা বিশ্বাস করিতে পারি না; সিংহল দেশের লোক বিশ্বাস করিতে পারে; ভারতবর্ষের লোক—বিশেষত ব্রাহ্মণেরা পারে না। এই পালি ভাষাটা কোন্ দেশের ভাষা, কেহ বলিতে পারে না, কোন্ সময়ে হইয়াছে, তাও কেহ বলিতে পারে না, পালি শব্দের অর্থ যে কী, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। কেহ ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করেন—"পল্লী" হইতে পালি হইয়াছে। অনেকে দেখাইয়া দিয়াছেন—"পল্লী" হইতে "পালি" হয় না—আর বাস্তবিক পল্লীর ভাষাও পালি নয়। তারপর একটা মীমাংসা হইয়াছে। এ মীমাংসা সকলে গ্রহণ করিয়াছেন কিনা, জানি না; আমি তো গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নই। মীমাংসাটা এই—শাস্ত্রের পংক্তিকে পালি বলে। সুতরাং পালি ভাষা মানে শাস্ত্রের পংক্তির ভাষা অর্থাৎ মোটামুটি শাস্ত্রেয় ভাষা।[২] আমাদের সংস্কৃত পণ্ডিতেরা যেমন বচন বলেন, কোনো একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেই শাস্ত্রের বচন তুলিয়া উত্তর দেন—যাহাকে বাংলায় পাঁতি দেওয়া বলে। কেহ কেহ বলেন, পংক্তি হইতে পাঁতি হইয়াছে। সেইরূপ পাঁতি অর্থে "পল্লী" ব্যবহার হইত। সেইরূপ "পল্লী" হইতেই "পালি" হইয়াছে। কথাটা বিশ্বাস হয় না। তারপর কোন্ সময়ে পালি ভাষা হয়, তাহা নিয়া বিস্তর বাদানুবাদ হইয়াছে। অনেকে বলেন, পালি ভাষা অশোকের দুই-তিন শত বৎসর পরে চলিয়াছে। এখন সংস্কৃত ভাষায় যেমন (কথাবার্তা হয় না, কিন্তু) পুথি লেখা হয়, তেমনি পালি একটা ভাষা—তাহাতে বই লেখা

হইত ; কিন্তু কথাবার্তা হইত না। কার্ন সাহেব [Johann Hendrick Kasper Kern] বলেন, পালিভাষা হইতেছে, মগধ দেশের সরকারি কাগজের (court language) ভাষা। সেটা দুই শত বৎসর পরে শাতকর্ণীদের সময়, অন্ধ্র দেশে গিয়া পড়ে। তখন ইহা যে আকার ধারণ করে, তাহারই নাম পালিভাষা। এই সমস্ত হইতেছে কল্পনা মাত্র। ইহাতে কোনো বিষয় ভালো করিয়া প্রমাণ হয় না।[৩] প্রমাণের মধ্যে এইমাত্র পাওয়া যায়, অশোক রাজার যে-সকল শিলালেখ আছে, তার চেয়ে এ ভাষাটা অনেক নূতন। আর-একটি জিনিস পাওয়া যায়, সেটি হাতিগুম্ফার শিলালেখ।[৪] এই শিলালেখের ভাষা পালির অনেক কাছাকাছি। ইহার তারিখ চন্দ্রগুপ্তের ১৬৫ বৎসর পরে। আর-একটা কথা আছে। যতগুলি প্রাকৃত ব্যাকরণ আছে, তার মধ্যে চণ্ডের লেখা ব্যাকরণখানি সকলের চাইতে পুরানো। হরন্লি সাহেব ১৮৮০ হইতে ১৮৯০ বৎসরের মধ্যে ব্যাকরণখানি যত্ন করিয়া ছাপিয়াছিলেন।[৫] তার ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন, এই ব্যাকরণের ভাষা পালির খুব কাছাকাছি। সুতরাং দেখিতে গেলে যিশু খৃস্টের দুই শত বৎসর পূর্বে ও দুই শত বৎসর পরে— এই চারি শত বৎসরের মধ্যে পালিভাষা যেভাবে এখন আছে, সেইভাবে উপস্থিত হইয়াছে। এক জায়গায় পড়িলাম, যিশু খৃস্টের দ্বিতীয় শতাব্দীতে খাঁটি পালি সাহিত্য শেষ হইয়া যায়। তারপর যা-কিছু পালি আছে, সেটা হইতেছে টীকা-টিপ্পনী ও প্রকরণ ; এগুলি পরে লেখা হইয়াছে। তাহা হইলে এটা মনে করিয়া নেওয়া যাইতে পারে যে, যিশু খৃস্টের জন্মাবার দুই শত বৎসর আগে হইতে দুই শত বৎসর পর পর্যন্ত পালিভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে। কোন্ জায়গায় গড়িয়া উঠিয়াছে, তা জানি না। বোধ হয়, দক্ষিণ দেশে— অন্ধ্র দেশে, সে দেশের রাজধানীর নাম ধান্যকটক ছিল— যাহাকে আমরা অমরাবতী বলি, যেখান হইতে অনেক ভালো ভালো পাথরের কাজ বাহির হইয়াছে। ভারতবর্ষে অনেক অমরাবতী আছে, এ অমরাবতীর নাম নূতন। একটা বন ছিল— জঙ্গল-টঙ্গল হইয়া গিয়াছিল। একশত বৎসর আগে একজন জমিদার সেখান হইতে পাথর লইয়া একটা নগর তৈরি করেন। জমিদার সে নগরের নাম

রাখেন অমরাবতী। সেই অমরাবতী অর্থাৎ প্রাচীন ধান্যকটকে পালি-ভাষার উৎপত্তি হয়। এই প্রাচীন ধান্যকটকই অন্ধ্র দেশের প্রথম রাজধানী। পাইটানা অথবা প্রতিষ্ঠান এবং বিলবাইকুর, অন্ধ্র দেশের আর দুইটি রাজধানী ছিল। কিন্তু আদত বা মূল জায়গা ছিল ধান্যকটক।

যাহা হউক, পালিভাষা লইয়া আমাদের কথা নয়। আমাদের কথা, বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছেন, কোথায় করিয়াছেন। দেখিতে গেলে বুদ্ধদেবের বাড়ি গোরক্ষপুরের উত্তরে— নেপাল-প্রান্তে। সেখানে তিনি বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেন। তাঁর বক্তৃতার সীমা একদিকে অঙ্গরাজ্য— যার রাজধানী চম্পানগর বা ভাগলপুর ; আর-একদিকে শ্রাবস্তী— লক্ষ্ণৌ হইতে দুই শত মাইল উত্তরে। আর-একটা সীমা হইতেছে গয়া, আর-একটা সাঙ্কাশ্য। মথুরায় তিনি বক্তৃতা করিয়াছেন কিনা, জানি না ; তবে তাঁর শিষ্যেরা অনেকে মথুরায় বক্তৃতা করিয়াছেন। শ্রাবস্তী হইতে গয়া— ইহার মধ্যে অনেক জায়গায় তিনি বক্তৃতা করিয়াছেন। তার ভিতরে যেটুকু বেহারে— গয়া, রাজগৃহ, বৈশালী, পাবাপুরী, কুশীনগর ; কোশলে— কাশী, শ্রাবস্তী, সাকেত, সাঙ্কাশ— এখন এইটুকুতেই আটটি বিহারি ভাষা আছে ; তা ছাড়া মিথিলার ভাষা আছে, অযোধ্যার অনেক ভাষা আছে ; এখনো আছে, তখনো ছিল। এ সম্বন্ধে একটি বিষয় বোঝার দরকার। এখন নানা রকম গতায়াতের সুবিধা হইয়াছে— রেলওয়ে আছে, নৌকা আছে, স্টিমার আছে, গাড়ি ঘোড়া মোটরকার হইয়াছে, এখন ভাষা অনেকটা এক হইয়া গিয়াছে। ব্যবহারের জিনিস যেমন এক হইয়া গিয়াছে, তেমনি ভাষাও এক হইয়া গিয়াছে। সেকালে তাহা ছিল না— সেকালে ছিল যোজনান্তর ভাষা, চারি ক্রোশ অন্তর ভাষা।[৬] কলিকাতার লোকের ভাষা কলিকাতার চারি ক্রোশ তফাতের লোক বুঝিতে পারিত না। এমনি করিয়া এ-পাড়ায় ও-পাড়ায় ভিন্ন ভাষা ছিল। সেকালে এত ভাষা ছিল, বুদ্ধদেব এত লোককে কী করিয়া এক ভাষায় বুঝাইতেন, এ প্রশ্নের সমাধান হয় না। সমাধান করিতে গিয়া কার্ন সাহেব একটা কথা বলিয়াছিলেন, সেটাও মজার কথা। বুদ্ধদেব যে জেলায় যাইতেন, সেই জেলার ভাষায় বক্তৃতা

করিতেন। জেলা কতগুলি ছিল, জানি না ; ডায়েলেক্‌ট কী, তাও জানি না ; ডিস্ট্রিক্‌ট ডায়েলেক্‌টে বক্তৃতা করিতেন বলিলে বেশি খবর পাওয়া গেল না। ইহার চাইতে বলিয়া দেওয়া ভালো, "জানি না ; বলিতে পারিলাম না।" তবে রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবাস্তু, শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী, এই-সকল নগরের লোকে পরস্পরের ভাষা অনেকটা বুঝিতে পারিত। নগরে নগরে যাতায়াতের দরুন পরস্পরের সম্পর্কে অনেক জিনিস তাঁদের জানা থাকিত। পাড়াগাঁয়ে তাহা থাকিত না।[৭] সেখানে গিয়া কী করিয়া তিনি বক্তৃতা করিতেন ? পাড়াগাঁয়ে রীতি ছিল, যেখানে চাষবাস হয়, সেসব জায়গায় বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের ঢুকিতে দেওয়া হইত না। যেমন নট, নর্তকী, গাইয়ে, বাজিয়ে, ইত্যাদি— কোনো গ্রামে গেলে গ্রামের লোককে কাজকর্ম ফেলিয়া, ইহাদের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদে মিশিয়া থাকিতে হয়, চাষবাস হয় না। সেইরূপ বৌদ্ধ-ভিক্ষুকেরা গ্রামে গেলে গ্রামবাসীরা কাজকর্ম বন্ধ করিত ; তাঁহারা গ্রামের ভিতর গিয়া ধর্মের বক্তৃতা করিতেন। গ্রামের লোকের কাজকর্ম বন্ধ হইয়া যাইত। তাই ভিক্ষুদের গ্রামে ঢুকিতে দেওয়া হইত না ; একথা চাণক্যের পুথিতে লেখা আছে। পূর্বে যাহা বলিয়াছি, এই কয়টা নগর পরস্পরের ভাষা এক রকম করিয়া বুঝিত। তাহারা যে ভাষায় কথা কহিত, সে ভাষার শিলালেখও বড়ো একটা পাওয়া যায় না। অনেক কষ্টে একটি ছোট্ট শিলালেখ বাহির হইয়াছে ; কোথায় সেটি পাওয়া যায় ? সেটি পিপ্রাহায় পাওয়া যায়। পেপিস সাহেব তাঁর জমিদারিতে একটা প্রকাণ্ড স্তূপ ভাঙিয়া, তাহার ভিতর হইতে একটা বড়ো পাথরের সিন্দুক পান। সিন্দুক খুলিয়া অনেক কৌটা পাওয়া যায়— একটা স্ফটিকের কৌটা, আর-একটা পাথরের কৌটা পাওয়া যায়। পাথরের কৌটায় বুদ্ধদেবের অস্থি ছিল, ছাই ছিল। সেই ছাই লইয়া নানা রকম মতামত আছে ; তন্মধ্যে দুইটি মত প্রধান। একটা মত এই, বুদ্ধদেব যখন মরিয়া যান, কুশীনগরে ডান হাত গালে দিয়া মরেন, সে সময় তাঁহাকে দাহ করা হয়, সংকার করা হয়। সংকারে যে ছাই হয়, তাহা আট ভাগ করিয়া আট জন রাজা লইয়া যান। এক ভাগ শাক্যেরা পায় ; অশোক-রাজা তার সাত ভাগ লইয়া গিয়া চুরাশি হাজার স্তূপ করেন। ইহার

মধ্যে এখন ১৬৫টা নেপালে আছে। তার মধ্যে পাঁচটা ঠুনো চৈত্য অর্থাৎ স্থূল চৈত্য, আর বাকি সানু চৈত্য অর্থাৎ ছোটো চৈত্য। অশোকরাজা শাক্যদের ভাগের ছাই তুলিয়া লইয়া যান নাই, তাহা যথাস্থানে ছিল। পেপিস সাহেবের জমিদারি হইতে তাই বাহির হইয়াছে। অনেকে বলেন, পেপিস সাহেবের জমিদারিতে যে সিন্দুক বাহির হইয়াছে, সেই সিন্দুকের কোটার ভিতর যে ছাই ছিল, তাহাই হইতেছে আসল ছাই— শাক্যদের ভাগের ছাই ; অনেকে বলেন— তা নয়। কিন্তু বুদ্ধদেবের নির্বাণের কিছুদিন পরে শ্রাবস্তীর রাজা বিরূঢ়ক শাক্যদের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া একটা হত্যাকাণ্ড করেন এবং শাক্যদের মৃতদেহের সংকার করিয়া, সেই ছাই পেপিস সাহেবের জমিদারিতে পুতিয়া রাখেন। সেই ছাই এখন বাহির হইয়াছে। কথাটি কতদূর বিশ্বাসযোগ্য, তাহা জানি না।

যাহাই হউক, ছাই বুদ্ধের নিজেরই হউক বা তাঁহার জ্ঞাতিদেরই হউক, যে শিলালেখটি পাওয়া গিয়াছে, সেটি একটি বাক্যমাত্র (sentence)। পাথরের (কোটার) উপর যে লেখ আছে, সে লেখটি বুদ্ধদেবের নির্বাণের ২০/২৫ বৎসরের মধ্যে লেখা, এটা স্বীকার করিতে পারা যায়। তার অক্ষরগুলি অশোকের অক্ষর হইতে অনেক পুরানো। সে শিলালেখটি এই — "ইয়ং সলিলনিধনে বুধস ভগবতে সকিয়নং সুকিতিভতিনং সভগনিকনং সপুতদলনং।" অর্থাৎ এই যে শরীর-নিধান অর্থাৎ ছাই বা হাড়গোড় ভগবান্ বুদ্ধের, শাক্যদের, ভাই ভগিনী ও সুত দারার সহিত।[৮]

যাহা হউক, এই ছাইটা যে বুদ্ধদেবের বা তাঁর জ্ঞাতিদের, তা নিশ্চয়। যেখানে লেখা, সেটা কোটার চারি পাশে আটা, গোল হইয়া গিয়াছে। কোথা হইতে পড়া আরম্ভ হইবে, তাহা নিয়া নানা রকম মতামত আছে। এটা যে সময়কার ভাষা, তাহাতে বলিতে পারা যায়, ভাষাটি চমৎকার ; ইহার ভিতর একটিও সংযুক্ত বর্ণ নাই, সংযুক্ত অক্ষরের নাম নাই। আর ট, ঠ, ড, ঢ, শ, ষ, হ, ক্ষ নাই। সুতরাং সংস্কৃত হইতে ভাঙিয়া যে অসংখ্য বুলি (dialect) হইয়াছে, এ ভাষাটি তাহারই একটি। এ ভাষাটিকে আমরা মনে করিতে পারি, সে সময়কার ভাষা। আর-একটা আশ্চর্য রকম উদাহরণ আমরা

পাইয়াছি, বুদ্ধদেবের জন্মাবার কিছু পূর্বেই হউক, কিংবা কিছু পরেই হউক।

আপনারা জানেন, 'মহাভারতে'র সময় মগধ দেশে জরাসন্ধ নামে এক রাজা ছিলেন। ভীম তাঁহাকে মারিয়া ফেলিলে তাঁহার ছেলে সহদেব মগধের রাজা হন। তাঁহার বংশে এই রাজত্ব বহু শত বর্ষ থাকে। বুদ্ধদেবের জন্মের কিছু পূর্বে সেই বংশ ধ্বংস করিয়া শিশুনাগ মগধে রাজ্য স্থাপন করেন। বুদ্ধদেব যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন মগধ দেশে রাজা তিনিই। শিশুনাগ সম্বন্ধে একটা ভাষার কথা আছে—

"শ্রূয়তে হি মগধেষু শিশুনাগো নাম রাজা ; তেন দুরুচ্চারান্‌ অষ্টৌ বর্ণান্‌ অপাস্য স্বান্তঃপুর এব প্রবর্তিতো নিয়মঃ। টকারাদয়শ্চত্বারো মূর্দ্ধন্যাঃ তৃতীয়বর্জ্জং উষ্মানস্ত্রয়ঃ ক্ষকারশ্চেতি।"[৯]

শুনা যায়, মগধ দেশে শিশুনাগ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি আপনার অন্তঃপুরে (court) নিয়ম প্রবর্তিত করিয়াছিলেন যে, যে-আটটি অক্ষর উচ্চারণ করিতে কষ্ট হয়, তাহা বর্ণমালা হইতে তফাত করিয়া দিতে হইবে। যথা— ট, ঠ, ঢ, ণ, শ, ষ, হ আর ক্ষ।

আরো— "শ্রূয়তে হি শূরসেনেষু কুবিন্দো নাম রাজা। তেন পরুষসংযোগাক্ষরবর্জ্জং অন্তঃপুর এবেতি।" ইত্যাদি। শূরসেন অর্থাৎ মথুরায় কুবিন্দ নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি অন্তঃপুরের মধ্যে নিয়ম প্রচার করিয়াছিলেন যে, যে-সকল সংযুক্ত অক্ষর কর্ণকঠোর হয়, তাহাদের ব্যবহার চলিবে না।

সংস্কৃত হইতে সহজ করিয়া নিয়া যে সময় অনেক প্রাকৃত হইয়াছে, সে সময় একটি ভাষা হইয়াছে শাক্যদের দেশে— যাহাতে একটিও সংযুক্ত বর্ণ নাই ; শ, ষ, ক্ষ নাই ; দুই-একটি সংযুক্ত বর্ণ হইলেও সেগুলি অসংযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। অসংযুক্ত বর্ণ ককারাদি হকারান্ত।[১০] তাহা হইলে এ রকম একটা ভাষা ছিল, সে ভাষা আমরা বুদ্ধদেবের ভাষা বলিয়া নিতে পারি। তাহার উদাহরণের মধ্যে এই একটি বাক্যমাত্র পাইয়াছি। আর এই একটি খবর পাইলাম, এটি বিশ্বাসযোগ্য। কেন-না, রাজশেখর সমগ্র আর্যাবর্তে প্রায় ১১ শত বৎসর আগে প্রবলপ্রতাপ লোক ছিলেন। রাজশেখরের নাম আপনারা সকলেই জানেন ; তাঁহার 'কাব্যমীমাংসা'য় এই-সকল কথা আছে।[১১]

এই দুইটি প্রমাণ ছাড়া বুদ্ধদেব কী ভাষায় কথাবার্তা বলিতেন, তা জানি না। কিন্তু জানি না বলিলে তো হইবে না ; তিনি বক্তৃতা তো করিতেন। অশোকের আগে এবং অশোকের সময়ে অনেক শিলালেখ আছে, কতকগুলি পাথরের থামে, আর-কতকগুলি আছে পর্বতের গায়ে। সেগুলি আবার আশ্চর্য ব্যাপার ; সব প্রায়ই এক জিনিস—এগুলি তৈয়ারি হইত অশোক রাজার দপ্তরে। সেখান হইতে গিয়া যে জায়গায় পৌঁছিত, সেখানকার উচ্চারণ, সেখানকার বানান, সেখানকার বোল (ইডিয়ম) বদল হইত। খাইবার পাসে দুইখানি এক রকম, আর উড়িষ্যা কলিঙ্গ দেশে দুইখানি আর-এক রকম ; তাহাদের ভাষা এক, প্যারাগ্রাফ এক, শুধু বানানের তফাত— এখানে প, ওখানে প্র ; একটু তফাত। সুতরাং এটা মনে করিতে হইবে, রাজভাষা—কোর্টভাষা ; সেটা একটু বদল করিয়া লইলে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সে আজ্ঞাপত্র বুঝা যায় ও চলে। বুদ্ধদেবের সময়কার শিলালেখ পাওয়া গেল, অশোক রাজার সময়েরও পাওয়া গেল। অশোকরাজা ও বুদ্ধদেব আড়াই শত বৎসরের তফাত ; সুতরাং অশোকের ভাষা বুদ্ধের ভাষা বলা ঠিক নয়।[১২]

সংস্কৃত বরাবর ছিল। আপনারা অবশ্য অনেকে শুনিয়াছেন, অনেকে বিশ্বাস করেন এবং একজন খুব জোর গলায় বলিয়াছেন যে, যেই বৌদ্ধধর্ম প্রচার আরম্ভ হইল, অমনি সংস্কৃত ঘুমাইল। তারপর সংস্কৃত জাগিল, সাত শত বৎসর পরে। একথা তখন অনেকে খুব বলিতেন ; আমাদের দেশে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ যাঁহারা আছেন, তাঁহারাও একথা বলিয়াছেন। কিন্তু এ কথাটা একেবারেই সত্য নয়। সংস্কৃত ঘুমায় নাই। যদি সংস্কৃত ঘুমাইত, তবে ব্রাহ্মণ জাতি লোপ হইত। কিন্তু সে জাতি বরাবর জাগিয়া আছে। তারপর আমি সাহিত্য হইতে দেখাইয়া দিয়াছি যে, এই সাত শত বৎসর ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলে সংস্কৃতে অনেকগুলি বড়ো বড়ো বই বাহির হইয়াছে— পাণিনির ব্যাকরণ, পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য', কৌটিল্যের সূত্র, 'মহাভারত' ও 'রামায়ণ' (যে ভাবে এখন পাইতেছি), ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র', বাৎস্যায়নের 'কামশাস্ত্র', বাৎস্যায়নের 'ন্যায়ভাষ্য' ইত্যাদি। এই সময় বৌদ্ধেরাও সংস্কৃতে অনেকে বই লেখেন। জৈনেরাও অনেক সংস্কৃত বই লিখিয়াছেন। তারপর

পুরাণ সম্বন্ধে অনেক কথা এই সময়ে আলোচনা হইয়াছে। সুতরাং সংস্কৃত ঘুমায় নাই ; বরং তাহার ক্রিয়া অধিক হইয়াছে।[১৩] এই সাত শত বৎসরের প্রথম তিন-চারি শত বৎসর সংস্কৃত ভাষাকে মার্জিত করিবার বিশেষ চেষ্টা হইয়াছে ; সে চেষ্টা এই ব্যাকরণশাস্ত্র। পাণিনি, কাত্যায়ন, বররুচি, ব্যাড়ি, শাকবন্দী, পতঞ্জলি— এই কয়জনের নাম করিলাম ; আরো অনেক নাম আছে। যে সময় একদিকে বুদ্ধদেবের দল বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছে, সে সময় ব্রাহ্মণেরা সর্বপ্রযত্নে যত সংস্কৃত বই ছিল, কাটিয়া কুটিয়া পরিষ্কার করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন। একজন দুই জনের চেষ্টা নয় ; তাঁহাদের সম্প্রদায় ছিল, তাঁহারা বংশানুক্রমে ব্যাকরণ তৈরি করিয়াছেন। তাই যদি হইল, তবে পাণিনির পূর্বে যে আর্ষ ব্যাকরণ ছিল, সংস্কৃত ব্যাকরণ ছিল, পাণিনি যখন সূত্রের পাঠ পরিষ্কার করিলেন, কী রকম করিয়া করিলেন ? তিনি পূর্ব-পূর্ব ব্যাকরণকারদের মত, তাঁহাদের নাম তুলিয়া, হয় খণ্ডন করিলেন, নয় নিলেন।

পাণিনির সঙ্গে বুদ্ধদেবের একশত বৎসরের তফাত।[১৪] পাণিনি হইয়াছেন ৪৫০-৫০০, আর বুদ্ধদেব ৫০০ থেকে ৫৪৩ খৃ. পূ.। ইহার আগে কী ছিল ? ইহার আগে একখানি ব্যাকরণের কতকটা সন্ধান পাইয়াছি ; সেখানি শাকটায়ন ব্যাকরণ। পাণিনির তিন শত বৎসর আগে শাকটায়ন ব্যাকরণ তৈরি করেন। শাকটায়নের পরিচয় এইমাত্র দেওয়া আছে যে, তিনি হইতেছেন শ্রুতকেবলীদেশীয়। শ্রুত-কেবলী— মহাবীরের নিকট না শুনিয়া, তাঁহার শিষ্যদের কাছে শুনিয়া যিনি কেবলী হইয়াছেন ; ইহাই হইতেছে শ্রুতকেবলীর অর্থ ; শ্রুত-কেবলীদেশীয় মানে শ্রুতকেবলী হইতে একটু কম। তা যদি হয়, তাহা হইলে শ্রুতকেবলী শাকটায়ন বর্ধমানের শ্রুতকেবলীদেশীয় হইতে পারেন না।[১৫] কেন-না, বর্ধমান, পাণিনির সময় হইতে ৫০/৬০ বৎসর আগে হইতে পারেন। তাহার মধ্যে শ্রুতকেবলী হইতে পারেন ; কিন্তু শ্রুতকেবলীদেশীয় হইতে পারেন না। তাহা হইলে বলিতে হইবে এই যে, শাকটায়ন পার্শ্বনাথের শ্রুতকেবলীদেশীয়। এই পার্শ্বনাথ[১৬], বর্ধমানের ২০০/২৫০ বৎসর আগেকার লোক। তাঁহার বাড়ি কাশীতে ; তিনি ৩০ বৎসর বয়সে সন্ন্যাসী হন— হইয়া নানা দেশে

ঘুরেন। তার ২০০/২৫০ বৎসর পরে বর্ধমান। তিনি বৈশালীতে জন্মেন এবং ৩০ বৎসর পরে সন্ন্যাসী হইয়া জৈনমন্দিরে থাকেন, সেখান হইতে গিয়া রাঢ়ে ১২ বৎসর থাকেন। বর্ধমানের শ্রুতকেবলীদেশীয় হইতে গেলে তাঁহার নির্বাণের অন্তত ১০০/১৫০ বৎসরের পর না হইলে হয় না। তাহা হইলে শাকটায়ন পাণিনির তুল্যকালে হইয়া পড়েন। কিন্তু শাকটায়ন পাণিনির অনেক পূর্বে। পাণিনি শাকটায়নের সূত্র উদ্ধার করিয়াছেন। এখন দক্ষিণ দেশ হইতে একখানা শাকটায়ন ব্যাকরণ প্রকাশ হইয়াছে। তাহাতে পাণিনি যাহা উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা আছে। কিন্তু বিশেষজ্ঞেরা বলেন, উহা আসল শাকটায়ন নহে : সেই শাকটায়ন অবলম্বন করিয়া আর-কেহ বই লিখিয়াছে। যাহাই হউক, দক্ষিণের শাকটায়ন পুরানো শাকটায়ন হউন, আর নাই হউন, শাকটায়ন যে পূর্বেকার একজন ব্যাকরণকার, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। শাকটায়নের মতো আরো কয়েকজন ব্যাকরণকারকে পাণিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং পাণিনির পূর্বেও সংস্কৃত ভাষা ছিল এবং ব্যাকরণও ছিল। তাঁহাদের ব্যাকরণ কাটছাঁট করিয়া পাণিনি সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখিয়াছেন।

পাণিনির যে ব্যাকরণ, তাকে আমরা সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ বলি। তার একটা বিশেষ নাম দিতে গেলে আমরা সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করি। পাণিনি কিন্তু নিজে "ভাষা" শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন, "সংস্কৃত ভাষা" ব্যবহার করেন নাই। পাণিনির ব্যাকরণে কিন্তু আর-একটা ভাষার বহু উল্লেখ আছে : তাহাকে বলে ছান্দস্ ভাষা। উহাকে বেদের ভাষা বলিতে প্যারি কিনা, জানি না। কেন-না, ছান্দসের মধ্যে ঋকের জন্য স্বতন্ত্র সূত্র আছে, যজুর জন্য স্বতন্ত্র সূত্র আছে, ব্রাহ্মণের জন্য স্বতন্ত্র সূত্র আছে, মন্ত্রের জন্য স্বতন্ত্র সূত্র আছে। তাহা হইলে ঋক্, যজু, ব্রাহ্মণ ও মন্ত্র, ইহা ছাড়া সেকালে আর-একটা ভাষা ছিল, এই ভাষাটা ছান্দস্। আমার বোধ হয়, ব্যাস এই ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।[১৭]

ব্যাসের ভাষা অনেকটা পাণিনির কাছাকাছি।[১৮] বৈদিক ভাষার ছন্দ ভাঙিয়া বরাবর চলিয়া আসিতেছিল। পাণিনির ব্যাকরণের ভাষা, যাহা পাণিনি বাঁধিয়া দিয়া গেলেন, তাহা পরিষ্কার করিয়া দিলেন পতঞ্জলি। পতঞ্জলির উপর পাণিনির প্রভাব ছিল। পতঞ্জলির আট

শত বৎসর পরের বৌদ্ধেরা বলিলেন— আমরা ভালো সংস্কৃত লিখিব, পাণিনিকে নিব— ব্যাড়ি কিংবা পতঞ্জলিকে নিব না ; সব জিনিসই পাণিনির সূত্র হইতে বাহির করিব। সেজন্য তাঁহাদের দরকার হইল টীকা করা। তাঁহারা পাণিনির সূত্র ও কাত্যায়নের[১৯] 'বার্তিক' নিয়া তাহারই উপর টীকা করিতে লাগিলেন। সেই টীকার নাম 'কাশিকা' ; টীকাকারের নাম জয়াদিত্য ; তিনি টীকা শেষ করিয়া যান নাই, শেষ করিলেন বামন।[২০] দুই জনেই বৌদ্ধ। 'কাশিকার' আবার একজন টীকা করিলেন ; তার নাম 'কাশিকাবিবরণপঞ্জিকা' ; সেটা বৌদ্ধদের লেখা— পতঞ্জলিকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া শুধু পাণিনি ও কাত্যায়নের উপর টীকা। এই রকম করিয়া বৌদ্ধেরা পাণিনির অনেক টীকা করিয়াছেন। কেন বৌদ্ধদের নূতন করিয়া পাণিনির টীকা করা দরকার হইল, জানি না। বোধ হয়, তাঁহাদের সমাজের যে অবস্থা ছিল, তাহাতে তাঁহাদের দরকার হইয়াছিল। তাঁহারা একখানি বই— ছোটো সংস্কৃত ব্যাকরণ— লিখাইয়াছেন, তার নাম 'ভাষাবৃত্তি', গ্রন্থকার পুরুষোত্তম।[২১] তাহাতে ছন্দঃসূত্র নাই। মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, ছন্দের যতগুলি সূত্র ছিল, তাহা বাদ দিয়া সে বইখানি লেখা হইয়াছে।

পাণিনির পাঁচ-ছয় শত বৎসর পরে বৌদ্ধেরা খাঁটি সংস্কৃতে বই লিখিতে আরম্ভ করেন। এই-সকল বইয়ের মধ্যে অশ্বঘোষের[২২] দুই-খানি মহাকাব্য প্রধান। একখানির নাম 'বুদ্ধচরিত', আর-একখানির নাম 'সৌন্দরানন্দ'। প্রথমখানি বিলাত হইতে কাউয়েল সাহেব সম্পাদন করিয়াছেন, দ্বিতীয়খানি আমি বিব্লোথিকায় সম্পাদন করিয়াছি। এ সংস্কৃত ঠিক পাণিনির সংস্কৃত নয়, অনেক অ-পাণিনেয় প্রয়োগ আছে এবং অনেক প্রয়োগই ভাষ্যবিরুদ্ধ অর্থাৎ পতঞ্জলির অনুমোদিত নয়।

কিন্তু অশ্বঘোষ কোন্ ভাষায় বই লিখিয়াছেন, সেটা তো আমাদের কথা নয়। বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চেলারা কোন্ ভাষায় সেই-সকল বক্তৃতা লিখিয়াছেন, সেইটাই হইতেছে আমাদের আজিকার বক্তৃতার বিষয়। পূর্বেই বলিয়াছি, তিনি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছেন— এইটাই কার্ন সাহেবের মত। কিন্তু সেটা কি সম্ভব ? কলিকাতার লোক কি ঢাকার

ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারে, না ঢাকার লোক কলিকাতার ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারে ? তবে সাবধান হইয়া বক্তৃতা করিলে, এমন ভাষায় বক্তৃতা করা যায় যে, সারা বাংলার লোক বুঝিতে পারে। বুদ্ধদেবও বোধ হয়, সেইরূপ ভাষাতেই বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার ভাষা চম্পা অর্থাৎ ভাগলপুর হইতে শ্রাবস্তী অর্থাৎ বলরামপুর পর্যন্ত সমস্ত দেশের লোকেই বুঝিতে পারিত।

কিন্তু সে ভাষায় কেহ তাঁহার বক্তৃতা লিখিয়া লয় নাই। তখন সর্টহ্যাণ্ড টাইপিস্টও ছিল না, ছাপাখানার মামলাও ছিল না। লেখার উপকরণ, এখন যেমন সস্তা কাগজ হইয়াছে, তাহাও ছিল না। সুতরাং তাঁহার বক্তৃতাগুলি শুনিবার অনেক পরে, তাঁহার চেলারা আপনার মনে বুঝিয়া লিখিয়াছে ; যে যে-ভাষায় পারিয়াছে, সে সেই-ভাষায় লিখিয়াছে। কারণ, আমরা দেখিতে পাই যে, সংস্কৃত ভাষায় যে-ছন্দে একটি কবিতা আছে, ঠিক সেই ছন্দে পালি ভাষাতেও সেই কবিতাটি আছে এবং প্রাকৃত ভাষাতেও সেই ছন্দে সেই কবিতাটি আছে। এইরূপে 'ধর্ম্মপদ'[২৩] নামে যে বইখানি আছে, তাহা একটা সংস্কৃত, একটা পালি এবং একটা প্রাকৃত— তিন ভাষাতেই পাওয়া যায়। এখন এই যে তিনটা জিনিস, ইহাকে তিনটা ভিন্ন ভাষা বলিব কী ?

আমার বোধ হয়, না বলাই ভালো। আমরা উহাকে পাঠ বলিব। এবং তাহার প্রমাণও আছে। ভরতের 'নাট্যশাস্ত্রে' ১৭ অধ্যায়ের ২৫ শ্লোকে আছে—

ভাষা চতুর্ব্বিধা জ্ঞেয়া দশরূপে প্রয়োগতঃ।
সংস্কৃতং প্রাকৃতং চৈব তত্র পাঠ্যং প্রযুজ্যতে ॥

অর্থাৎ ভাষা চার রকম, প্রত্যেকেরই দুই রকম করিয়া পাঠ; একটার নাম সংস্কৃত, আর-একটা পাঠের নাম প্রাকৃত। চারিটা ভাষা কী ? তাহা ২৬-এর শ্লোকে আছে—

অভিভাষার্য্যভাষা চ জাতিভাষা তথৈব চ।
তথা জাত্যন্তরী চৈব ভাষা নাট্যে প্রকীর্ত্তিতা ॥

অর্থাৎ ভাষা চারিটি— অভিভাষা, আর্যভাষা, জাতিভাষা ও জাত্যন্তরী ভাষা।

অভিভাষা কাহাকে বলে ?— অভিভাষা তু দেবানাং।

আর্যভাষা কাহাকে বলে ?— আর্যভাষা তু ভূভুজাম্।

এই দুই ভাষার লক্ষণ কী ?

সংস্কৃতপাঠসংযুক্তা সম্যক্ গ্রামপ্রতিষ্ঠিতা।

অর্থাৎ উহাতে সংস্কৃত পাঠই বেশি এবং বড়ো বড়ো গ্রামে উহা প্রতিষ্ঠিত।

জাতিভাষা কাহাকে বলে ?—

বিবিধা জাতিভাষা চ প্রয়োগে সমুদাহৃতা।
ম্লেচ্ছশব্দোপচারা চ ভারতং বর্ষমাশ্রিতা ॥

অর্থাৎ জাতিভাষা বিবিধ, তাহাতে অনেক ম্লেচ্ছশব্দ থাকিবে। কিন্তু সে ভাষা ভারতবর্ষেরই ভাষা।

জাত্যন্তরী ভাষা কাহাকে বলে ?—

অথ জাত্যন্তরী ভাষা গ্রামারণ্যপশূদ্ভবা।
নানাবিহঙ্গজা চৈব নাট্যধর্মিপ্রয়োগজা ॥

জাত্যন্তরী ভাষা গ্রামে পাওয়া যায়, বনে পাওয়া যায়, পশুদের মধ্যে পাওয়া যায়। এমন-কি, বিহঙ্গদের মধ্যেও পাওয়া যায়।

জাতিভাষা ও জাত্যন্তরী ভাষার লক্ষণ কী ?—

জাতিভাষাশ্রয়ং পাঠ্যং দ্বিবিধং সমুদাহৃতং।
সংস্কৃতং প্রাকৃতঞ্চৈব চাতুর্ব্বর্ণ্যসমাশ্রয়ম্ ॥

অর্থাৎ জাতিভাষা ও জাত্যন্তরী ভাষার দুই রূপ পাঠ আছে ; এক সংস্কৃত, আর প্রাকৃত। ইহা চারি বর্ণের মধ্যেই চলে।

মোটামুটি এই-সকল কথা বলিয়া, নাটকে কোথায় সংস্কৃত ও কোথায় প্রাকৃত পাঠ দিতে হইবে, 'ভরতনাট্যশাস্ত্রে' তাহার বিশেষ বিবরণ আছে। বক্তৃতা বাড়িয়া যায় বলিয়া, সেকথা আমি আর উল্লেখ করিব না। যাঁহাদের ইচ্ছা হয়, তাঁহারা 'ভরতনাট্যশাস্ত্রে'র সতেরো অধ্যায়ের একত্রিশ হইতে তেতাল্লিশ পর্যন্ত তেরটি কবিতা পড়িয়া লইবেন। 'ভরতনাট্যশাস্ত্রে'র চুয়াল্লিশ কবিতা কী বলে শুনুন—

ন বর্ব্বরকিরাতান্ধ্রদ্রবিড়াদ্যাসু জাতিষু।
নাট্যযোগে তু কর্ত্তব্যং কাব্যং ভাষাসমাশ্রয়ম্ ॥

অর্থাৎ বর্বর, কিরাত, দ্রবিড়াদি জাতির ভাষা লইয়া কাব্য করিবে না। কেন-না, সে-সমস্ত ভাষা বোঝা যায় না।

পূর্বে জাতিভাষার কথা বলা হইয়াছে; তাহার মধ্যে কোন্ কোন্ জাতির ভাষা লইয়া কাব্য হইতে পারে? এ সম্বন্ধে 'ভরতনাট্যশাস্ত্র' বলিতেছেন—

মাগধ্যবন্তিয়া প্রাচ্যা শূরসেন্যর্দ্ধমাগধী।
বাহ্লীকা দাক্ষিণ্যাত্যা চ সপ্ত ভাষা প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

(১৭ অধ্যায়, ৪৮ শ্লোক)

অর্থাৎ মাগধী, অবন্তিয়া, প্রাচ্যা, শূরসেনী, অর্ধমাগধী, বাহ্লীকা, দাক্ষিণাত্যা—এই সাতটি ভাষা অর্থাৎ জাতিভাষা। আবার—

শবরাভীরচণ্ডালসচরদ্রাবিড়োড্রজা।
হীনা বনেচরাণাঞ্চ বিভাষা নাটকে স্মৃতা ॥

অর্থাৎ শবর, আভীর, চণ্ডাল, সচর, দ্রবিড়, ওড্র ইহাদের ভাষাও বুনো লোকের ভাষা, নাম বিভাষা। তাহা হইলে বুঝা গেল যে, জাতিভাষা—মাগধী, আবন্তী, প্রাচ্যা, শূরসেনী, অর্ধমাগধী, বাহ্লীকা ও দাক্ষিণ্যাত্যা, এই ভাষাগুলিই প্রশস্ত। আর শবর, আভীর, চণ্ডাল, সচর, দ্রবিড়, ওড্র ও বুনোদের ভাষা প্রশস্ত নয়; তবে দরকার হইলে ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু বর্বরাদি কয়েকটি জাতির ভাষা একেবারেই ব্যবহার হইবে না।

এসব হইল জাতিভাষা ও জাত্যন্তরী ভাষা: ইহারো দুই রূপ পাঠ— সংস্কৃত ও প্রাকৃত। আর তাহা হইলে দাঁড়াইল এই, শৌরসেনীর সংস্কৃত পাঠও আছে; প্রাকৃত পাঠও আছে; মাগধীর সংস্কৃত পাঠও আছে, প্রাকৃত পাঠও আছে; আবন্তীর সংস্কৃত পাঠও আছে, প্রাকৃত পাঠও আছে; এইরূপ সব জাতিভাষা ও জাত্যন্তরী ভাষার সংস্কৃত ও প্রাকৃত, দুই রূপই পাঠ আছে।

অভিভাষা ও আর্যভাষার পাঠ সংস্কৃতেই অধিক। যিশু খৃস্টের জন্মের পাঁচ-ছয় শত বৎসর পূর্বে আর্যাবর্তে ভাষার এইরূপ একটা বিভ্রাট ছিল; তাহার উপর একটা পাঠেরও বিভ্রাট ছিল। আমরা যেমন এখন সংস্কৃত বলিতে একটা ভাষা বুঝি, তখন দেখিতেছি, সেইরূপ কেহ বুঝিত না। সকল জাতি বা সকল দেশের ভাষাতেই দুইটা করিয়া

পাঠ ছিল। ইহাতে বিভ্রাট আরো বাড়িয়া গিয়াছিল। 'ভরতনাট্য-শাস্ত্রে' বলে, বন্য পক্ষীরও ভাষা ছিল এবং তাহারো দুই রকম পাঠ ছিল।

আর-একটা ব্যাপারে এই বিভ্রাট আরো বাড়িয়া গিয়াছিল। বুদ্ধদেবের জন্মের একশত বৎসরের পর, দুই শত বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধদের ভিতরে একটা মস্ত দলাদলি হয়। অনেক চেষ্টাতেও সে দলাদলি মিটিল না, দুইটা দল হইয়া গেল। একটা হইল থেরবাদ বা স্থবিরবাদ; ইঁহারা বই লিখিতে লাগিলেন চলিত ভাষায়— প্রাকৃত পাঠে। ইহা তিন-চারি শত বৎসর পরে পালিতে গিয়া দাঁড়াইল। আর-একদল হইল মহাসাংঘিক অর্থাৎ ইঁহারা দলে পুরু। ইঁহারা বই লিখিতে লাগিলেন, একটা নূতন রকম ভাষায়; তাহার নাম সেনার সাহেব [Emile Charles Marie Senart] লিখিয়াছেন— mixed Sanskrit। কেহ কেহ বলেন, Sanskritized vernacular। কেহ কেহ বলেন, vernacularised Sanskrit।[২৪] 'কাব্যাদর্শে'[২৫] আমরা দেখিতে পাই, মিশ্রভাষা বলিয়া একটা ভাষা ছিল। আমরা মহা-সাংঘিকদিগের বইগুলি মিশ্রভাষায় লিখিত বলিয়া বলিব। একই বাক্যের মধ্যে কতকগুলি শব্দ সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র মানিয়া চলে, আর কতকগুলি শব্দ প্রাকৃতের সূত্র মানিয়া চলে। আবার কোথাও কোথাও কোনো সূত্রই মানে না। এ ভাষায় প্রথম বই 'মহাবস্তু'।[২৬] উহা মহাসাংঘিকদের "বিনয়"। কিন্তু উহাতে ধর্ম, বিনয়, সূত্র সব একত্রে মিশানো আছে। বইখানি বোধ হয়, দলাদলির পর লেখা হইয়াছিল। কিন্তু সেনার সাহেব বলেন, উহাতে যোগাচার সম্প্রদায়ের নাম আছে। সুতরাং উহা যিশু খৃস্টের পাঁচ শত বৎসর পরের লেখা। কিন্তু আমি দেখিয়াছি, যে-যে স্থানে যোগাচার শব্দ আছে, সে-সে স্থানে উহা যোগাচার সম্প্রদায়ের নাম নহে, যোগ ও আচারের কথা। সুতরাং সেনার সাহেবের কথা এখানে মানিয়া চলা যায় না। আর যদি না যায়, তাহা হইলে বলিতেই হইবে, দলাদলির পর এই বই লেখা হয়। বুদ্ধের জীবনচরিত 'ললিতবিস্তর'[২৭] নামে বই যদিও অ-পাণিনেয় ও ভাষা-বিরুদ্ধ সংস্কৃতে লেখা, তথাপি উহার প্রতি অধ্যায়ের শেষে মিশ্র-ভাষায় কতকগুলি কবিতা দেওয়া থাকে। সেই কবিতাই মূল সংস্কৃত

অংশের প্রমাণস্বরূপ। 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক'[২৮] নামে আর-একখানি সংস্কৃত বই আছে, উহাও ঐরূপ সংস্কৃতে লেখা, উহারো প্রতি অধ্যায়ের শেষে প্রমাণস্বরূপ মিশ্রভাষার কতকগুলি শ্লোক আছে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তাক্‌লামাকান মরুভূমি খুঁড়িয়া 'সদ্ধর্মপুরীকে'র যে-সকল পাতা পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে অধ্যায়ের গোড়াটাও সংস্কৃতে নয়, মিশ্রভাষায়। 'রত্নসঞ্চয়গাথা' নামে আর-একখানি পুঁথি আছে, সেখানি 'শতসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'র সারসংগ্রহ। সেখানি সমস্তটাই মিশ্রভাষায় লেখা। অনেক জায়গার ছোটো ছোটো শিলালেখ মিশ্রভাষায় লেখা। মিশ্র-ভাষার দুই-চারিটা উদাহরণ গদ্যেও দিতেছি, পদ্যেও দিতেছি—

"কল্পান শতসহস্রং সংধাবিত্বান বোধিপরিপাকং।
সুচিরস্যান্তরতনো বুদ্ধো লোকস্মিং উপপন্নো ॥

ইত্থং বদিত্বান তে সংবহুলাঃ শুদ্ধাবাসকায়িকা দেবপুত্রা মম পাদৌ শিরসা বন্দিত্বা প্রক্রামি।"[২৯] (মহাবস্তু, ৫৬ পত্র)।

"অদ্দশাসি মহামৌদ্‌গলায়ন মেঘো মাণবা ভগবতং দীপংকরং দূরতো যেন আগচ্ছন্তং দ্বাত্রিংশতীহি মহাপুরুষলক্ষণেহি সমন্বাগত-মশীতিহি অনুব্যঞ্জনেহি উপশোভিতশরীরং অষ্টাদশেহি আবেণিকেহি বুদ্ধধর্মেহি সমন্বাগতং দশহি তথাগতবলেহি বলবং চতুর্হিবৈশারদ্যেহি সমন্বাগতং।"[৩০] (মহাবস্তু, ২৩৭ পত্র)।

ঐ পাতে— "চিরস্য চক্ষু উদপাসি লোকে
চিরস্য উৎপাদো তথাগতানাং।
চিরস্য মহ্যং প্রণিধে সমৃদ্ধা
বুদ্ধো ভবিষ্যামি ন মে চ সংশয়ঃ ॥[৩১]

এই মিশ্রভাষা লইয়াও আর-একটা বিভ্রাট হইল। মহাসাংঘিকেরা বলেন, বুদ্ধদেব এই ভাষাতেই বক্তৃতা করিতেন ও উপদেশ দিতেন। মহাসাংঘিকদিগেরই উত্তরাধিকারী মহাযান মতাবলম্বীরা বলেন, বুদ্ধদেব সংস্কৃত ভাষাতেই বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার 'প্রজ্ঞাপারমিতা' নামে বইগুলি সংস্কৃতে লেখা, বহুদিন লুকানো ছিল, নাগার্জুন পাতাল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। সুতরাং এ কথাটায় বিভ্রাট আরো বাড়িয়া গেল।

এতক্ষণ যে-সকল কথা বলিলাম, সে-সমস্ত অতি প্রাচীন কালের কথা। খৃস্টীয় নবম বা দশম শতাব্দীতে বৌদ্ধদের মধ্যে একটা মত

প্রচলিত ছিল যে, বুদ্ধদেব সর্বজ্ঞ ভাষায় ধর্ম উপদেশ দিয়াছিলেন, সে ভাষায় হরি, হর, ব্রহ্মা কেহই ধর্ম উপদেশ দিতে পারেন নাই। তাহার ভাষা ইতর প্রাণীরাও বুঝিতে পারিত— "এবং দ্বাদশখণ্ডেষু স্বর্গমর্ত্তপাতালেষু নানাসত্ত্বরুতৈঃ সঙ্গীতিকারকৈঃ যানত্রয়ং লিখিতং * * * * * ভগবান্ সর্বজ্ঞভাষয়া ধর্ম্মদেশকঃ নান্যো হরিহরাদিনাং।"

সুতরাং আমাদের দেশেও অনেক দিন হইতে একটা মত চলিতেছিল যে, বুদ্ধদেব যে ভাষায় কথা কহিতেন, তাহা সকল দেশের লোকেই বুঝিতে পারিত, ইতর প্রাণীরাও বুঝিতে পারিত। ইতর প্রাণীদের কথা ছাড়িয়া দিলেও বুদ্ধদেব যে ভাষায় কথা কহিতেন, আর্যাবর্তে সমস্ত দেশের লোকই তাহা বুঝিতে পারিত। সে ভাষা যে কী, তাহা জানিবার উপায় নাই। বুদ্ধদেবের সময়ে যে ভাষা চলিত ছিল, তাহার একটি মাত্র বাক্য (sentence) পাওয়া গিয়াছে, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। তাঁহার সময়ে রাজবাড়িতে ট, ঠ, ড, ঢ, শ, ষ, হ, ক্ষ উচ্চারণ হইত না এবং সংযুক্ত অক্ষরও চলিত না।[৩২] বুদ্ধদেবের নির্বাণের পর তাঁহার বড়ো বড়ো চেলারা আপনার আপনার দেশের ভাষায় স্মৃতিশক্তির সাহায্যে বুদ্ধদেবের বক্তৃতাগুলি লিখিয়া রাখিতেন। ক্রমে বৎসরের পর বৎসর এবং শত বৎসরের পর শত বৎসর যাইতে যাইতে সেই লেখাগুলি কোথাও পালিতে, কোথাও প্রাকৃতে, কোথাও মিশ্রভাষায় লেখা হইল। তাহার পর আর্যাবর্তে যিশু খৃস্টের জন্মের সময় এক রকম সংস্কৃতে সেই বক্তৃতাগুলি লেখা হইত। পূর্বেই বলিয়াছি, সে সংস্কৃত অ-পাণিনেয় ও ভাষ্য-বিরুদ্ধ। ক্রমে এই অ-পাণিনেয় ও ভাষ্য-বিরুদ্ধ সংস্কৃত ভাষার কী আকার হইয়াছিল, তাহার একটা উদাহরণ দিই, "তেষাং চ সুশব্দ বাদিনাং সুশব্দগ্রহবিনাশায় অর্থশরণতাং আশ্রিত্য ক্বচিৎ বৃত্তে অপশব্দ। ক্বচিৎ বৃত্তে যতিভঙ্গ ক্বচিৎ অবিভক্তিকং পদং। ক্বচিৎ বর্ণস্বরো লোপ ক্বচিৎ বৃত্তে দীর্ঘে হ্রস্ব। হ্রস্বেঽপি দীর্ঘ। ক্বচিৎ পঞ্চম্যর্থে সপ্তমী, চতুর্থ্যর্থে ষষ্ঠী। কুত্রচিৎ পরস্মৈপদিনাং ধাতৌ আত্মনেপদং। আত্মনেপদিনি পরস্মৈপদং। ক্বচিৎ একবচনে বহুবচনং, বহুবচনে একবচনং। পুংলিঙ্গে নপুংসকলিঙ্গং, নপুংসকলিঙ্গে পুংলিঙ্গং। ক্বচিৎ তালব্যশকারে দন্ত্য-মূর্দ্ধন্যৌ। ক্বচিৎ মূর্দ্ধন্যে দন্ত্যতালব্যৌ। ক্বচিৎ দন্ত্যে তালব্যমূর্দ্ধন্যৌ

এবং অন্যোপি অনুসর্ত্তব্যাঃ। তন্ত্রদেশকোপদেশেন ইতি।" ('লঘু-কালচক্রতন্ত্ররাজটীকা', 21A)।

ঐ পত্রেই আরো আছে, "এবং টীকায়ামপি সুশব্দাভিধাননাশায় লিখিতব্যং ময়া অর্থশরণতামাশ্রিত্য ইতি। অথ যেন যেন প্রকারেণ কুলবিদ্যা সুশব্দাভিমানক্ষয়ো ভবতি তেন তেন প্রকারেণ অর্থশরণতা-মাশ্রিত্য বুদ্ধানাং বোধিসত্ত্বানাং ধর্ম্মদেশনা দেশভাষান্তরেণ শব্দশাস্ত্র-ভাষান্তরেণ মোক্ষার্থং।"

অর্থাৎ আমরা ব্যাকরণশাস্ত্র মানিব না, আমাদের মানেটা লোকে যাহাতে বুঝিতে পারে, তাহাই করিয়া লিখিব। সুশব্দটা কেবল অভিমান মাত্র : ওটা ক্ষয় না হইলে মোক্ষ হইবে না।

কত ভাষায় বৌদ্ধগ্রন্থ লেখা হইয়াছে. তাহার একটা তালিকা প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক হইতে দিয়া আমি এ'বক্তৃতা শেষ করিব—

"ইহ তথাগতাভিসংবুদ্ধ আর্য্যবিষয়ে ভগবতি পরিনির্বৃতে সতি সঙ্গীতিকারকৈঃ যানত্রয়ং পুস্তকে লিখিতং। তথাগতনিয়মেন পিটকত্রয়ং মগধভাষয়া। সিন্ধুভাষয়া সূত্রান্তং। সংস্কৃতভাষয়া পারিমিতানয়ং। মন্ত্রনয়ঃ তন্ত্রতন্ত্রান্তরং সংস্কৃতভাষয়া প্রাকৃতভাষয়া অপভ্রংশভাষয়া অসংস্কৃতশবরাদিম্লেচ্ছভাষয়া। ইত্যেবমাদিঃ সর্বজ্ঞেন দেশিতো ধর্ম্মঃ সঙ্গীতিকারকৈঃ লিখিতঃ। তথা ভোটবিষয়ে যানত্রয়ং ভোটভাষয়া লিখিতং। চীনে চীনভাষয়া। মহাচীনে মহাচীনভাষয়া। পারসীকদেশে পারসীকভাষয়া। সীতানদ্যুত্তরে চম্পকবিষয়ভাষয়া। বানরবিষয়ভাষয়া। সুবর্ণাক্ষবিষয়ভাষয়া। তথা নীলানদ্যুত্তরে রুম্মাখ্যাবিষয়ভাষয়া। তথা হিমবন্ত তস্যোত্তরে সুরম্যবিষয়ভাষয়া। এবং কোটিকোটিগ্রামাত্মকেষু ষণ্ণবতিবিষয়েষু ষণ্ণবতিবিষয়ভাষয়া। এবং দ্বাদশখণ্ডেষু স্বর্গমর্ত্তপাতালেষু নানাসত্ত্বরুতৈঃ সঙ্গীতিকারকৈঃ যানত্রয়ং লিখিতমিতি। শ্রাবকৈঃ শ্রাবক-যানং। প্রত্যেকৈঃ প্রত্যেকযানং। বোধিসত্ত্বৈঃ পারমিতামহাযানং মন্ত্রমহা-যানং হেতুফলাত্মকং নানাসঙ্গীতিকারকৈঃ সত্ত্বানাং বৈনেয়ার্থং। অনয়া নানাসঙ্গীতিকারকৈঃ নানাবিষয়ভাষয়া লিখিতাগমযুক্ত্যা বিচার্য্যমানো বুদ্ধভগবান্ সর্বজ্ঞঃ সর্বজ্ঞভাষয়া ধর্ম্মদেশকঃ নান্যো হরিহরাদীনাং।"

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'
দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৩৩ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে ৬ চৈত্র ১৩৩২, ২০ মার্চ ১৯২৬, শনিবার অপরাহ্ণ ৬টায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ বিশেষ অধিবেশনের কার্য-বিবরণে উল্লেখ আছে, "সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম. এ., সি. আই. ই মহাশয় 'বৌদ্ধধর্ম্ম' সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম বক্তৃতা করিলেন। এই বক্তৃতা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।" ১৩৩৩-এর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত "বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় বক্তৃতা করিতেন?" প্রবন্ধের পাদটীকায় উল্লেখ আছে এইটিই পঞ্চদশ বিশেষ অধিবেশনে পড়া প্রবন্ধ।

শাস্ত্রীমশায় ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে "The Relation of Bengali to Pali and Sanskrit. Which is more Intimate?" নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। (*The Journal of the Buddhist Text and Research Society*, 1894, part III, pp. iii-v). এই প্রবন্ধে তিনি অয়গ্যান্ জুলিয়স থিয়োডোর হুল্‌ট্‌শ Eugen Julius Theodor Hultzch-এর *South Indian Inscriptions* গ্রন্থ অনুসরণে সিদ্ধান্ত করেছিলেন, পালি বিভিন্ন অঞ্চলে রাজকীয় ভাষা ছিল এবং ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে সহজেই প্রভাবিত করেছিল। সংস্কৃতের চেয়ে পালি ভাষার সঙ্গেই বাংলার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ— এই ছিল প্রবন্ধটির প্রতিপাদ্য। পরবর্তী ভাষাতাত্ত্বিকদের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে এ মত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এর ৩২ বছর পরে লেখা বর্তমান প্রবন্ধটিতেও পালিভাষা সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায়ের অবলোকন সর্বত্র যুক্তিযুক্ত নয়। ১৯২৬-এর মার্চ মাসে শাস্ত্রীমশায় এই প্রবন্ধ পড়েন, এই বছরেই জুন মাসে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *The Origin and Development of the Bengali Language* গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের জন্য শাস্ত্রীমশায় অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়কে নিজের বাড়িতে সংবর্ধনা জানান ১৯ ডিসেম্বর তারিখে (দ্র. সুকুমার সেন, 'দিনের পরে দিন যে গেল', ১৯৮২, পৃ. ১৩০)। "...a splendid work" বলে সংবর্ধিত গ্রন্থখানির বিশ্লেষণ প্রবন্ধটি লেখার সময়ে শাস্ত্রীমশায় দেখার সুযোগ পান নি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বুদ্ধদেবের ভাষা এবং পালিভাষা সম্পর্কে লিখেছেন—

"Following the nomenclature of the Prakrit gramma-

rians describing MIA. of the second period, Western Prācya can be called Ardha-māgadhī and Eastern Prācya, Māgadhī; and these dialects as they were during the first MIA. period [600-200 B.C.] can be described as Old Ardha-māgadhī and Old Māgadhī. Old Ardha-māgadhī as spoken in Kōsala was undoubtedly the speech of Buddha ; on it was based a current speech of Eastern Aryan India, in which Buddha and Mahāvīra gave their discourses, and which became the language of the court and administration in Eastern India. Aśōka's court language, as in the Midland and eastern inscriptions, present varieties of this speech. ... Ample testimony is borne to the political power of the Prācyas ('Prasioi') in the 4th century B.C. by Greek writers. There is no wonder that their dialect would have some prestige, and cast into shade for a time the Midland and other western speeches. During the time of the Mauryas, and specially of Aśōka, this 'Standard East Indian' was dominant as the official language practically all over India ; and, as is evident from the presence of eastern forms— the so-called 'Māgadhisms'— in the language of the Girnar, Shahbazgarhi and Mansehra inscriptions, it exerted a great influence on other forms of MIA. ··· The oldest records in this dialect are the Brāhmī inscriptions down to Aśōka (the Piprahwa vase inscription, the Sohgaura inscription, and the eastern inscriptions of Aśōka), and the fragments from the Buddhist Sanskrit drama found in Central Asia (early Kuṣāṇa period).

"The discourses of Buddha and of Mahāvīra were originally in this Prācya speech. Those of Buddha later (*i.e.* after Aśōka) were renderd into a Western dialect, undoubtedly that of the Midland (an old form of Śaurasēnī) ; but as it happens in such cases, when a text is rendered from one dialect into another, a great many forms of the original dialect remained, and showed themselves as a

substratum. ... This western dialect into which Buddha's teachings were translated came to be known as 'Pali', which simply means *texts*, and its grammar amply shows that at its basis it is Midland speech." (*O-D-B-L*, Vol. I, London 1970, pp. 55-57).

১. 'সা মাগধী মূলভাসা নরা যায়' 'আদিকপ্‌পিকা ব্রহ্মানো চ' অস্‌সুতালাপা সম্বুদ্ধা চাপি ভাসরে।
অনুবাদ : মাগধী হল মূল ভাষা যে ভাষায় আদি কল্পের মানুষেরা, ব্রহ্মা যারা কখনো কোনো কথা শোনে নি তারা এবং বুদ্ধেরা কথা বলেন।
এই উক্তি সম্পর্কে চাইল্‌ডার্স মন্তব্য করেছিলেন— "The authorship of the well-known stanza asserting Pali to be the original language is still unknown. Turnour (Mah. xxvii) says it comes from Payoga Siddhi, a grammar of the fourteenth century ; but this is a mistake, for on examining a MS. of that work I find that the stanza is merely referred to, the first pāda only being quoted. It may possibly be in Moggallāna Vyākaraṇa, a twelfth-century work, but I am inclined to think it is yet older." (Robert Cæsar Childers, *A Dictionary of the Pali Language*, London 1875, Preface, p. xiii. Fn. 2).

২. Mrs. Caroline Augusta Folley Rhys Davids তাঁর *Pali Literature and Language* গ্রন্থের ভূমিকায় এই মত প্রকাশ করেছেন।

৩. ভাষার অর্থে পালি শব্দটির ব্যবহার প্রথম পাওয়া যায় থের পণ্ডিত বুদ্ধঘোষের (খৃস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী) 'জাতকত্থকথা'য়। মনে হয় শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে "পরিভাষা"র এক তদ্ভিতান্ত রূপ "পারিভাষ" থেকে। "পরিভাষা" মানে ছিল style of discourse। এ অর্থ বুদ্ধবাণীর পক্ষে খাটে।

শ্রীসুকুমার সেন।

৪. এই বইয়ের পৃ. ৪২৮ সূত্র ৪ দ্র.

৫. Augustus Roudolf Frederich Hoernle ed., *The Prakrit-Lakshanam or Chanda's Grammar of the Ancient (Arsha) Prakrit, Bibliotheca Indica Series*, 1880.

৬. পূর্বে চম্পা, পশ্চিমে শ্রাবস্তী, উত্তরে নেপাল তরাই ও দক্ষিণে কীকট মগধ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে বুদ্ধদেব পর্যটন করে নিজের বাণী প্রচার করেছিলেন। এই ভূখণ্ডে এখন অনেক আর্যগোষ্ঠীর ভাষা প্রচলিত। শাস্ত্রীমশায় অনুমান করেছেন যে বুদ্ধের সময়ে এই অঞ্চলে সংবদ্ধ ভাষার সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। তাঁর ধারণা ডাক-তার-রেলওয়ে ও আনুষঙ্গিক বিবিধ কারণে এ অঞ্চলে এখন সংবদ্ধ ভাষার সংখ্যা অনেক কমে গেছে। এ ধারণা অত্যন্ত ভ্রান্ত। আড়াই হাজার বছরে এই ভাষার গতি গঙ্গার মতোই বেড়ে চলেছে।

"যোজনান্তর ভাষা" এই লোকোক্তির প্রয়োগও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এখানে "ভাষা" বলতে বলবার ঢঙ বোঝায়। সে ঢঙ সাধারণত শব্দের অল্পসল্প বদলে অথবা এক-আধটি ইডিয়মের বৈশিষ্ট্যে পর্যবসিত। অত সূক্ষ্মভাবে দেখলে প্রত্যেক মানুষের "ভাষা"ই স্বতন্ত্র। শাস্ত্রীমশায় যে সময়ের কথা বলছেন তখন লোকে এখনকার মতো ঘেষাঘেঁষি থাকত না বটে তবে যোগাযোগ বেশিই ছিল।

বুদ্ধদেব যে অঞ্চলে পর্যটন করেছিলেন সেই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত অশোক অনুশাসনগুলির ভাষার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। এবং এই অশোক অনুশাসনের যে কেন্দ্রীয় অনুশাসন সেই সারনাথ লিপির ভাষাকে পালির সমসাময়িক রূপ বললে বিন্দুমাত্র অন্যায় হয় না।

শ্রীসুকুমার সেন।

৭. এখনকার দিনের মতো সেকালেও যে "নগর" ও "গ্রাম"-এর মধ্যে শিক্ষার ও সহবতের সুস্পষ্ট ভেদ ছিল— শাস্ত্রীমশায়ের এ কল্পনা সমর্থন-যোগ্য নয়। সেকালে "নগর" ও "গ্রাম"-এর পার্থক্য ছিল স্থাপত্য নিয়ে, আর কিছু নিয়ে নয়।

শ্রীসুকুমার সেন।

৮. উত্তর প্রদেশের বস্তী জেলার পিপ্‌রাহ্‌ওয়া স্তূপ থেকে William Claxton Peppe ১৮৯৮ খৃস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে লেখ সমন্বিত এই পাথরের কৌটাটি আবিষ্কার করেন এবং *Journal of the Royal*

Asiatic Society of Great Britain and Ireland (1898, pp. 573-78) পত্রিকায় "The Piprāhawā Stūpa, containing relics of Buddha" প্রবন্ধে এর বিবরণ দেন। লেখটির শব্দ পরম্পরা এখন এই ভাবে পড়া হয়—

"সুকিতি-ভতিনং স-ভগিনিকনং স-পুত দলনং/ইয়ং সলিল-নিধনে বুধস ভগবতে সকিয়নং।"

এই লেখ আনুমানিক খৃস্টপূর্ব তৃতীয় শতকের ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা এবং ভাষা অশোকের সমসাময়িক প্রাকৃত।

৯. অনুবাদ : শোনা যায় যে মগধ দেশে শিশুনাগ নামে রাজা (ছিলেন); তিনি নিয়ম করেছিলেন— দুরুচ্চার্য আটটি বর্ণ অন্তঃপুরে উচ্চারণ করা চলবে না। ট বর্গের তৃতীয়টি ছাড়া চারটি (ট, ঠ, ঢ, ণ), তিনটি উষ্ম-বর্ণ (শ, স, ষ) এবং ক্ষ।

('কাব্যমীমাংসা' দশম অধ্যায়)।

১০. শাস্ত্রীমশায় এখানে ঠিক বলেন নি। অশোকের সময়ে এবং পরেও কিছুকাল পর্যন্ত দু-একটি সংযুক্ত বর্ণ ছিল ভদ্র ভাষায়। আর ভদ্র-অভদ্র সব ভাষাতেই যুগ্মধ্বনি ছিল এবং এ ধ্বনি যুগ্মই উচ্চারিত হত। তবে লেখায় একটি ধ্বনি লেখা হত। অর্থাৎ যেখানে "বুধস" লেখা আছে সেখানে পড়তে হবে "বুদ্‌ধস্‌স"। সেকালের লিপির আর-একটা অসুবিধা আমাদের কাছে— দীর্ঘস্বর না লেখা। যা "সলিল নিধনং" লেখা আছে তা পড়তে হবে "সলীল নিধানং"।

শ্রীসুকুমার সেন।

১১. নবম শতাব্দীর শেষ এবং দশম শতাব্দীর প্রথম দিকে রাজশেখর বর্তমান ছিলেন মনে করা হয়। রাজশেখরের রচনায় বিস্তৃত আত্মপরিচয় পাওয়া যায়। বাবা দর্দু'ক অথবা দুহিক, মা শীলাবতী। রাজশেখরের পূর্ব-পুরুষদের অনেকেই কবি ও পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর প্রপিতামহ অকাল-জলদ-এর রচনা অনেক সংকলনে বিধৃত আছে। রাজশেখরের পূর্বপুরুষেরা মহারাষ্ট্রে বাস করতেন, কিন্তু তিনি নিজে জীবনের বেশির ভাগ মধ্যদেশে কাটিয়েছিলেন। রাজশেখর কনৌজের রাজা মহেন্দ্রপাল ও তাঁর ছেলে মহীপালের (৯১৭ খৃ.) উপাধ্যায় এবং পরে ত্রিপুরীর কলচুরি বংশীয় যুবরাজ কেয়ূরবর্ষের পোষকতা পেয়েছিলেন। 'কাব্যমীমাংসা'য় রাজশেখর সশ্রদ্ধভাবে তাঁর স্ত্রী, ক্ষত্রিয় চৌহান বংশীয় অবন্তীসুন্দরীর নাম করেছেন। খুব বড়ো কবি প্রতিভার অধিকারী না হলেও বিভিন্ন বিদ্যায়

রাজশেখরের অধিকার ছিল। বিভিন্ন ভাষায় দখল নিয়ে তিনি নিজেই গর্ব প্রকাশ করেছেন। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছাড়া দেশভাষাতেও তাঁর ভালো দখল ছিল। কখনো কখনো রচনার মধ্যে তিনি দেশভাষার শব্দ, প্রবচন ও ছন্দ-রীতি ব্যবহার করেছেন। 'বালরামায়ণ', 'বালভারত' (অসম্পূর্ণ), 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা' এবং 'কর্পূরমঞ্জরী'— রাজশেখরের এই চারটি নাটককে সংস্কৃত নাটকের অবক্ষয়-যুগের ভালো নমুনা বলা যায়। ১৮ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ 'কাব্যমীমাংসা' বইটিকে বলা যায় কাব্য রচনার সহায়ক গ্রন্থ। দ্র. *H-S-L*, pp. 453-61, 546-47.

১২. ভাষাছাঁদের দিক দিয়ে অশোকের অনুশাসনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। একভাগে পড়ে দীর্ঘ অনুশাসনগুলি যা তাঁর অধিকারের প্রান্তীয় অঞ্চলে পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা, আর-এক তাঁর রাজ্যের মাঝখানের সমস্ত স্তম্ভলিপি ও ছোটোখাটো শিলাখণ্ড-লিপি। প্রথম শ্রেণীর অনুশাসনগুলি সব স্থানীয় ইডিয়মে লেখা, এবং এ ইডিয়ম মোটামুটি তিনটি। ১. উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে ও পশ্চিম-পঞ্জাবের দুটি লিপির ভাষা (এ দুটির ভাষায়ও আঞ্চলিক পার্থক্য আছে), ২. সৌরাষ্ট্রে গিরনার লিপির ভাষা, ৩. ওড়িশার ও কলিঙ্গের লিপি দুটির ভাষা। দ্বিতীয় শ্রেণীর লিপিগুলির ভাষা মোটামুটি এক রকম এবং তা অশোকের রাজ্য-শাসনের ভাষা বলে নেওয়া সঙ্গত। এ ভাষার সঙ্গে পালিভাষার মিল আছে।

শ্রীসুকুমার সেন।

১৩. পঞ্চম খৃস্টপূর্বাব্দে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুত্থানের ফলে সংস্কৃত চর্চা ক্রমে কমে যায় এবং আবার চতুর্থ খৃস্টাব্দে বৌদ্ধপ্রভাবের বিলয়ে সংস্কৃতের পুনর্জাগরণ ঘটে ম্যাক্স মূলারের এই তত্ত্ব এক সময়ে মানা হত। য়োহান্ গেঅর্গ বূল্যর, রমেশচন্দ্র দত্ত, মার্সডেন প্রভৃতি লেখক এই তত্ত্বের ভিত্তিতে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসের কাঠামো দাঁড় করাতে চেষ্টা করেছিলেন। সাত শো বছর সংস্কৃতচর্চা হয় নি, সংস্কৃত ঘুমিয়ে ছিল— একথা বলেন মার্সডেন। 'জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল'-এ একটি ছোটো নিবন্ধে শাস্ত্রীমশায় 'কৌটিল্য-অর্থশাস্ত্র', 'কামন্দকি নীতিশাস্ত্র', পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য', ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র', 'মনু-সংহিতা', বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র' ও ন্যায়সূত্রের ভাষ্য, প্রশস্ত পাদের বৈশেষিক সূত্রের ভাষ্য, 'মাঠর-ভাষ্য', চরকের 'অগ্নিবেশ-সংহিতা', জৈমিনি-সূত্রের 'সবর-ভাষ্য', 'কাতন্ত্র-সূত্র', মৎস্য-বিষ্ণু-বায়ু ইত্যাদি প্রাচীনতর মহাপুরাণ, 'মৃচ্ছকটিক' নাটক, 'মহাভারত', 'রামায়ণ' প্রভৃতি

গ্রন্থের কালানুক্রম নির্দেশ করে দেখান ম্যাক্স মূলারের তত্ত্ব গ্রহণযোগ্য নয়। এমন-কি থেরবাদী বৌদ্ধেরা দেশ-ভাষায় ধর্মপ্রচার করলেও কালক্রমে মহাসাংঘিক ও মহাযানপন্থীরা মিশ্র সংস্কৃত এবং সংস্কৃত ভাষাতেই তাঁদের শাস্ত্র রচনা করেন। এই ধারায় রচিত হয় 'মহাবস্তু অবদান', 'লংকাবতার-সূত্র', নাগার্জুনের 'মাধ্যমিক-কারিকা', মৈত্রেয়নাথ-আর্যদেব প্রভৃতি লেখকের গ্রন্থ। জৈন শাস্ত্রেও সংস্কৃত ভাষা আশ্রয় করা হয়, রচিত হয় উমাস্বাতিবাচকের 'তত্ত্বার্থধিগম-সূত্রে'র মতো বিরাট কোষ গ্রন্থ। এইসব তথ্য দিয়ে ম্যাক্সমূলারের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করে শাস্ত্রীমশায় মন্তব্য করেন—

"The theory of revival of Sanskrit is untenable for the following amongst other reasons :—

"(1) Brahmins wielded great influence and could not have been idle in the matter of literature.

"(2) Some of the non-Brahminic sects gradually Sanskritised their vernaculars and in the end took to Sanskrit.

"(3) Greek works were translated into Sanskrit and not in any of the vernaculars. Sanskrit therefore continued during all these seven centuries as the language of culture, of science, and of art, though some non-Brahaminic sects clung to their vernaculars.

"With such a vast Sanskrit literature— Brahminic, Buddhistic and Jaina— before us, is it possible to say that with the death of Buddha Sanskrit went to sleep for seven hundred years only to awake by the middle of the fourth century A.D. ?"

সংস্কৃত-চর্চায় ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ইতিহাস-চেতনা সঞ্চার করেছিলেন— এ জন্য কৃতজ্ঞতা বোধ সত্ত্বেও শাস্ত্রীমশায় মনে করতেন, ভারতবিদ্যা বিষয়ে সর্বদা ইউরোপীয় পণ্ডিতদের গুরু মানা ঠিক নয়। *Sanskrit Culture in Modern India* অভিভাষণে (Fifth Indian Oriental Conference, Lahore, 1928) বলেন—

"They should not be slavishly followed by Indians in matters relating to India. One instance will suffice. The Indian literary chronology set up by Oriental Scholars of Europe, I do not think, will

stand. It will be not only greatly modified, but I think, should also be thoroughly revised." (p. 43).

পরবর্তী ঐতিহাসিকরা ম্যাক্স মূলার-ব্যুল্যরদের মতবাদ গ্রহণ করেন নি। দ্র. Shastri, "Refutation of Max Müller's theory of the Renaissance of Sanskrit literature in the fourth century A.D., after a lull of seven centuries from the time of the rise of Buddhism." (*J-A-S-B*, 1910, NS : VI, pp. 305-10) ; Friedrich Max Müller, *India, what it can teach us*, London 1882.

১৪. এই বইয়ের পৃ ৬১ সূত্র ৭ দ্র.

১৫. "শ্রুতকেবলীয়" শব্দের মানে "শ্রুতকেবল" দেশ জাত। "শ্রুতকেবল" শব্দের মানে সোজাসুজি হলে, "যেখানে কেবলই শোনার ব্যাপার", অর্থাৎ যে দেশে লেখার চলন ছিল না। সবই মুখে মুখে রচিত হত আর মুখে মুখে ফিরত। এমন অর্থ করলে মন্দ কী?

শ্রীসুকুমার সেন।

১৬. এই বইয়ের পৃ. ৩০৮ সূত্র ১৮ দ্র.

১৭. "সংস্কৃত" নাম পাণিনি ব্যবহার করেন নি, পতঞ্জলিও নয়। তা ছাড়া পাণিনির কোনো সূত্রে "ভাষা" শব্দটি আধুনিক অর্থে ব্যবহার করা হয় নি। পাণিনির সময়েও বিভিন্ন ভাষার অস্তিত্ব কল্পনা জাগে নি। তখন পর্যন্ত ছিল "বাক্"— অর্থাৎ কথা বলা, কথা বলার শক্তি। "ভাষায়াং সদবসশ্রুবঃ" ইত্যাদি সূত্র থেকে পাণিনি যে "ভাষা" শব্দটি discourse (অর্থাৎ উপনিষদের ছাঁদ) অর্থে ব্যবহার করেছিলেন তা বোঝা যায়। এদিক থেকে আমরা পাণিনির "ভাষা"কে "পালিভাষা"র অর্থেই পাচ্ছি।

শ্রীসুকুমার সেন।

১৮. ব্যাসের ভাষা বলতে শাস্ত্রীমশায় কী মনে করেছেন তা ধরা শক্ত। যদি 'বেদান্ত সূত্রে'র কথা ধরি তা হলেও তাঁর উক্তি অলীক। যদি 'মহাভারতে'র ভাষা ধরি তা হলেও তাঁর উক্তি অযথার্থ। ব্যাস বলে কোনো লেখকের রচনা চিহ্নিত করা যায় এমন-কিছু আমরা পাই নি।

শ্রীসুকুমার সেন।

১৯. এই বইয়ের পৃ. ৭০ সূত্র ১১ দ্র.

২০. এই বইয়ের পৃ. ১১৫ সূত্র ১৮ দ্র.

২১. এই বইয়ের "পুরুষোত্তমদেব" প্রবন্ধ দ্র.

২২. এই বইয়ের পৃ. ২৫৯ সূত্র ১৯ দ্র.

২৩. বিনয়পিটক, সুত্তপিটক এবং অভিধম্মপিটক নিয়ে 'ত্রিপিটক'। সুত্তপিটক দীঘ, মঝ্‌ঝিম, সংযুত্ত, অঙ্গুত্তর, খুদ্দক এই পাঁচ নিকায় বা সংগ্রহ নিয়ে গঠিত। খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত পনেরোখানি বইয়ের মধ্যে দ্বিতীয় 'ধম্মপদ'। 'ধম্মপদে'র ২৬ বর্গে বিন্যস্ত গাথা সংখ্যা ৪২৩। অশোকের সময়ের আগেই 'ত্রিপিটক' সংকলন সম্পন্ন হয়েছিল মনে করা হয়। সুতরাং খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ-তৃতীয় শতকের মধ্যে 'ধম্মপদ' পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছিল বলা যায়। বৌদ্ধদের বিশ্বাস 'ধম্মপদ' বুদ্ধদেবের মুখে উচ্চারিত বাণী। ছন্দোবদ্ধ এই গাথাগুলি বুদ্ধদেবের অবিকল উক্তি নিশ্চয়ই নয়, তবে তাঁর উপদেশই এইসব গাথায় বিধৃত রয়েছে। 'ধম্মপদে' কোনো অতীন্দ্রিয়তা বা তত্ত্ববিচার নেই, সহজ বুদ্ধির অধিগম্য জীবন-নীতির কথা সরাসরি প্রকাশ পেয়েছে। যেমন প্রকীর্ণবর্গের ১৫ সংখ্যক গাথা—

> "দূরে সন্তো পকাসেন্তি হিমবন্তো ব পব্বতো।
> অসন্তেত্থ ন দিস্‌সন্তি রত্তিখিত্তা যথা সরা ॥"

অনুবাদ : "সৎপুরুষেরা হিমবন্ত পর্বতের মতো দূর থেকেই প্রকাশিত হন। অসৎদের রাতে নিক্ষিপ্ত শরের মতো দেখা যায় না ॥"

২৪. এই বইয়ের পৃ. ২৫৪ সূত্র ১১ দ্র.

২৫. এই বইয়ের পৃ. ৩৫৩ সূত্র ১০ দ্র.
'কাব্যাদর্শে' বলা হয়েছে—

> "তদেতদ্বাঙ্ময়ং ভূয়ঃ সংস্কৃতং প্রাকৃতং তথা।
> অপভ্রংশশ্চ মিশ্রং চেত্যাহুরাপ্তাশ্চতুর্বিধম্ ॥" (১।৩২)

অনুবাদ : বিজ্ঞরা বলেছেন এই হল চার রকম ভাষা—সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ এবং মিশ্র।

"Daṇḍin again classifies Kāvya according to its language. These are four,— Sanskrit, Prakrit, Apabhraṃśa, and Mixed. (1) Sanskrit he calls the celestial speech. (2) Prakrit includes (i) tat-sama, (ii) tat-

bhava, and (iii) deśī. He names Mahārāṣṭrī as the best of Prakrits in which are written works like the *Setu-bandha.* (3) The languages of Āhīras and others are spoken of as Apabhraṃśa ; and Daṇḍin gives *Bṛhat-Kathā* as an example ; but takes the precaution to say that Śāstra-kāras call any language outside Sanskrit as Apabhraṃśa. Mixed language is summed up cryptically in three words— 'Nāṭakādi tu miśrakam.' The commentators have explained that this means that Nāṭakas are written partly in Sanskrit, partly in Prakrit, and partly in Apabhraṃśa. This explanation is unsatisfactory as it is a form of literature, and not a language. But a better explanation of the above definition is now available, when we know that there was a mixed language in which the *Mahāvastu-avadāna*, the *Ratna-sañcaya-gāthā*, and other works were wholly and (2) *Sad-dharmapuṇḍarīka* and (1) *Lalita-vistara* were partially written. The oldest form of *Sad-dharma-puṇḍarīka* as found in the Taklamakan desert is wholly written in that language ; and it is wonderful that undoubtedly the oldest historical drama yet discovered is written in this language. The drama, I mean, is *Śāradvatī-putra-naṭaka* by Aśva-ghoṣa found in the same desert. All post-Aśoka inscriptions in Sāñcī and Mathurā are also written in this language. This language was first discovered by Rājā Rājendra-lāla Mitra who calls it the Gāthā language, for, he found it in the gāthās of *Lalita-vistara.* Senart calls it mixed Sanskrit. He finds Sanskrit and Sanskritic forms of words in the same sentence and has written a grammar of it. In Daṇḍin's time, perhaps, the dramas used to be written in this language in the locality in which he flourished." (*Shastri-Cat.*, Vol. VI, pp. clxxxviii-xxxix).

২৬. এই বইয়ের পৃ. ২৫৪ সূত্র ১১ এবং পৃ. ৪৬৮ সূত্র ১ দ্র.

"Northern Buddhism" প্রবন্ধে 'মহাবস্তু অবদানে'র ভাষা এবং রচনাকাল সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায় লেখেন—

"When I am speaking of the earliest work of the schism, the *Mahāvastu*, I cannot leave it without saying a word about its chronology and its language. The prevailing opinion is that it is written in a mixed language into which Sanskrit and Prākṛt idioms equally enter and that it is an artificial language. But I think this was the spoken language of N. India which purged by the rules of Pāṇini, Kātyāyana and Patañjali became the standard language of the Brāhmaṇas of N. India. The *Bharata Nātya Śāstra* distinctly says that when that work was written about the second century B.C., there were in India seven languages, and that each had two forms, the Saṃskṛta and the Prākṛta, *i.e.*, pure or grammatical and the ordinary, and the seven languages were all geographical. The *Mahāvastu* is written in the ungrammatical form of the language prevailing in Kośala and Vajji countries. It is neither an artificial language nor Vernacularized Sanskrit nor Sanskritised Vernacular. The work is written in prose but every prose piece is supported by a versified piece which looks like the authority on which the prose narration is based. There is a slight variation in their language, as there must be, between prose and verse. The prose is homely and the verse is a little dignified. There are other books also written in this language. The *Lalitavistara*, I suppose, was at one time written entirely in this language but at present the prose has become Sanskrit of a sort and the poetry has retained the old language. The *Saddharma Puṇḍarīka*, as we have it, is written in the style of prose in Sanskrit and poetry in this identical language. But the palm-

leaves that have been dug out from the Taklamakan desert contain an old version of the work in which both the prose and the verse are in this language. There is another work of which I have recently got a copy which is all in verse in this language but which appears to be more modern. The short dedicatory inscriptions in Sāñci, Barhaut, Mathura and other places are also in this language. It seems to have been the prevailing language of the N. Buddhists in the centuries following the schism.

"So far for the language of the *Mahāvastu*; and the time for its composition or compilation is, I think, the second and third centuries of the Nirvāṇa era, namely, the third and second centuries B.C. Some scholars think that it was composed or compiled in the 3rd century A.D. because it contains the word Yogācāra and the Yogācāra sect was founded in that century. The word Yogācāra in the *Mahāvastu* is not used in the sense of a sect; there it has the ordinary meaning of *Yoga* and *ācāra* and it is not in the nature of things that the vigorous sect which defied the majority of the elders should wait six centuries to write their sacred books. I think the work was written or the works were compiled in the course of the very first or second century of its existence. There would be no meaning in their composition or compilation six hundred years after, when it is well known again that the Mahāsaṅghikas within one, or one and half a century was split up into six different sects." ("Northern Buddhism-II", *I-H-Q*, Vol-I, No. 2, June 1925, pp. 204-06.)

২৭. মহাযানের অন্যতম বৈপুল্যসূত্র রূপে গৃহীত 'ললিতবিস্তর' মূলে সম্ভবত

সর্বাস্তিবাদীদের লেখা একটি বুদ্ধজীবনী ছিল। কালক্রমে সেই কাঠামোর মধ্যে বুদ্ধদেব সম্পর্কে নানা কিংবদন্তি এসে মিলে বুদ্ধের অলৌকিক মহিমার বিবরণে পরিণতি পেয়েছে। রচনাটি যেভাবে পাওয়া গেছে তাতে কোনো একজন লেখকের পরিকল্পিত লেখা মনে হয় না। ভাষাতেও অসমতা আছে। গদ্য অংশ সংস্কৃতে এবং গাথা অংশ মিশ্র সংস্কৃতে লেখা। 'ললিতবিস্তর' কোন্ সময়ে বর্তমান রূপ পেয়েছিল জানা যায় নি। ৮৫০-৯০০ খৃস্টাব্দের মধ্যে জাভায় বোরোবুদুরের মন্দির ভাস্কর্যে 'ললিতবিস্তরে'র কোনো পাঠ অনুসরণ করে শিল্পীরা কাজ করেছিলেন— এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। এর অনেক আগেই 'ললিতবিস্তর' সমাদৃত হয়েছিল ধরে নেওয়া যেতে পারে। দ্র. *H-I-L*, Vol. II, pp. 248-56.

২৮. এই বইয়ের পৃ. ৫৩ ; সূত্র ১৭ দ্র.

২৯. অনুবাদ : শত সহস্র কল্প ধরে বোধিপরিপক্কতা লাভ করে, সুদীর্ঘকাল অতিক্রম করে বুদ্ধ এই সংসারে উৎপন্ন হলেন।

এই কথা বলে সেই সমাগত শুদ্ধ বাসকায়িক দেবপুত্রগণ আমার পা দুটি মাথায় ঠেকিয়ে চলে গেল।

৩০. অনুবাদ : মেঘের অনুচরেরা মহামৌদ্গলায়নকে দূর থেকে আসতে দেখিয়ে দিলেন— ভগবান্ দীপংকর কে, যাঁর শরীর বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ এবং আশিটি উপলক্ষণে সুশোভিত, আঠারোটি নিরপেক্ষ বুদ্ধধর্মে সমন্বিত, দশটি তথাগত বলে বলবান, চারটি বিচক্ষণতায় মণ্ডিত।

৩১. অনুবাদ : চির-কাল পরে সংসারে চোখ ফুটল। চির-কাল পরে তথাগতদের আবির্ভাব হল। আমি বুঝতে পারছি যে চির-কাল পরে আমার সমৃদ্ধির ফলে আমি বুদ্ধ হব— তাতে আমার সংশয় নেই।

৩২. আর্যবর্গের কোনো ভাষাতে কোনো কালে 'ট ঠ, ড ঢ, হ' এই ধ্বনিগুলি ছিল না এ কল্পনা অত্যন্ত উদ্ভট। এখানে শাস্ত্রীমশায় ভুল করেছেন।

শ্রীসুকুমার সেন।

অভিভাষণ

বাংলার বৌদ্ধ সমাজ :

হিন্দু ও বৌদ্ধ

বাংলা দেশে কিরূপে হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মকে গিলিয়া ফেলিয়াছে, সেই কথাটা আজ কিছু বলিব। যখন আফগানেরা বাংলা দখল করেন, তখন পূর্বভারতের অধিকাংশ লোক বৌদ্ধ ছিল। তাহার পূর্বে পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধেরাই বাংলা ও বিহারে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সেনেরা ইহার মধ্যে একশত বৎসর ধরিয়া বাংলার একাংশে রাজা

ছিলেন মাত্র। পালেরা বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা যে শুদ্ধ বাংলা ও বিহারে রাজত্ব করিতেন, এমন নহে ; এ দুয়ের বাহিরে অনেক দেশে তাঁহাদের অধিকার ছিল। একশত বৎসর ধরিয়া তাঁহারা পেশোয়ার হইতে গোদাবরীর মুখ পর্যন্ত আপনাদের অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। বাংলা ও মগধের বৌদ্ধ সাহিত্য, বৌদ্ধ ব্যাকরণ, বৌদ্ধ কোষ, বৌদ্ধ শাস্ত্র, বৌদ্ধ দর্শন, বৌদ্ধ শিল্প ও বৌদ্ধ সভ্যতা সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষ ছাইয়া গিয়াছিল।

ইংরাজি ৭৩২ অব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণ বাংলায় শুভাগমন করিয়াছিলেন।[১] তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি বাংলায় বৈদিক ধর্ম ও বৈদিক সভ্যতা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। কুমারিলের[২] প্রভাবে তাঁহারা বাংলায় আসিয়াছিলেন এবং আসিয়া অবধি তাঁহারা প্রভাব বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কয়জন ছিলেন ? বল্লালসেন[৩] তাঁহাদের সংখ্যা করিয়াছিলেন ; দেখিয়াছিলেন, ৩৫০ ঘর রাঢ়ী ও ৪৫০ ঘর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ মাত্র বাংলায় ছিলেন। তাহার উপর আর ৭০০ ঘর সাতশতী, আর ৫০০ ঘর বিদেশীয় ব্রাহ্মণ ধরিলেও ২০০০ ঘরের বেশি ব্রাহ্মণ এ দেশে ছিলেন না। ২০০০ ঘর ব্রাহ্মণে বাংলায় ২৫টা জেলা হিন্দু করা যায় না, উহার দশ ভাগের এক ভাগও হিন্দু করা যায় না। সুতরাং এ অঞ্চলে অধিকাংশ বৌদ্ধ ও সামান্য অংশ হিন্দু ছিলেন।

কেমন করিয়া এই ২০০০ ঘর ব্রাহ্মণে এই বিশাল দেশকে ৭০০ বৎসরের মধ্যে হিন্দু করিয়া তুলিয়াছেন, বৌদ্ধের নাম পর্যন্ত লোপ করিয়া দিয়াছেন, তাহা একটা মহা-সমস্যা, একটা বিরাট ব্যাপার, একটা রহস্যময় ঘটনা। বাংলা দেশ যে বৌদ্ধময় হইয়া গিয়াছিল, তাহা এখন রিসার্চ করিয়া বাহির করিতে হয়। প্রথম তো বিশ্বাসই হয় না, তাহার পর ঘাড় পাতিয়া লইতে হয়। একবার ঘাড় পাতিয়া লইলে চক্ষু ফুটে— তখন বাংলার অনেক রহস্য জলের মতো বুঝিতে পারা যায় ; বৌদ্ধদের অমিত শক্তি অনুভব করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। বাঙালি ব্রাহ্মণের অমিত শক্তি, অমিত ধৈর্য ও অমিত পরাক্রম স্মরণ করিয়া আশ্চর্য হইতে হয়।

বাংলায় যদি কোনো ইতিহাসের গূঢ় কথা থাকে, যদি কোনো নিগূঢ় কথা থাকে, তবে তাহা এই। রহস্য-জাল ভেদ করিয়া এই কথাটি

খুলিয়া দিলে বাঙালির চক্ষু স্পষ্ট দেখিতে পায়— তাহারা কী ছিল, কী হইয়াছে ও ভবিষ্যতে কী হইতে পারে। অতীতে তাহাদের অগৌরবের কিছুই নাই, সবই গৌরবময়। ভবিষ্যতের গৌরব অগৌরবের কথা তাহাদের নিজের হাতে।

ছেলেবেলা গল্প শুনিতাম, যদি একটি কাঁচপোকা ও একটি আরশুল্লাকে একটা শিশি বা বোতলের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে কিছুদিন পরে দেখিতে পাওয়া যাইবে. আরশুল্লাটা কাঁচপোকা হইয়া গিয়াছে ; দুইটাই কাঁচপোকা হইয়া গিয়াছে। তাহাদের ইতরবিশেষ করা যায় না। মুসলমান অধিকাররূপ শিশিতে বা বোতলে হিন্দু ও বৌদ্ধ দুই জাতিকে বন্ধ রাখিয়া এই সাত শত বছরের পর দেখা যাইতেছে, দুই-ই এক হইয়া গিয়াছে, ইতর-বিশেষ করা যায় না। আবার ইংরাজ অধিকাররূপ বোতলে হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতি বন্ধ হইয়া থাকিলে, কয়েক শত বৎসর পরে তাহারা যে এক হইয়া যাইবে না, ইহা কে বলিতে পারে ? এখনই তো অনেকে বলেন যে, এই যে মুসলমান জাতি এখন বাংলা দেশে অর্ধেকের উপর বলিয়া গর্ব করিতেছেন, ইঁহারা সেই বিশাল বৌদ্ধসমাজের একদেশ মাত্র। অর্থাৎ বাংলায় হিন্দু ও মুসলমান একজাতি মাত্র।

বৌদ্ধ কাহাকে বলে ?

হিন্দু ও বৌদ্ধ, এই দুই জাতি লইয়া যখন বাংলা দেশ, তখন হিন্দু কাহাকে বলে ও বৌদ্ধ কাহাকে বলে, এটা ঠিক করিয়া লওয়া বড়ো দরকার। লোকে বলিবে, এ তো সহজ কথা, এর আবার ঠিক করা কী ? সহজ কথাই বোঝা যায় না। সকলেই মনে জানে, আমি ঠিক বুঝি ; কিন্তু জেরায় টিকে না। অনেক পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা মনে করেন যে, বৌদ্ধ বলিতে শুদ্ধ ভিক্ষুসমাজ বুঝায় ; কেন-না, বুদ্ধদেব নিজে ভিক্ষুসমাজ লইয়াই থাকিতেন। তাঁহার বিনয় ভিক্ষুদের জন্য, তাঁহার যত কিছু আইন-কানুন, পাচিত্তিয় পারাজিকা[৪] ভিক্ষুদের জন্য। সুতরাং বৌদ্ধ বলিতে গেলে ভিক্ষুসম্প্রদায় ছাড়া আর-কিছু বুঝায় না।

আর-একদল বলেন, না। গৃহস্থ বৌদ্ধও ছিল, যাহারা ব্রাহ্মণ মানিত না। ভিক্ষুদের কাছে ধর্ম ও নীতি উপদেশ লইত। ভিক্ষুদের

খাওয়াইত, আদর করিত, ভিক্ষুদের জন্য বিহার, সংঘারাম তৈয়ার করিয়া দিত, ভিক্ষুদের ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিত, তাহাদের অন্তর্বাস বহির্বাস জোগাইত, তাহারাই গৃহস্থ বৌদ্ধ। ভিক্ষুরা তো রোজগার করিত না, ভিক্ষা করিয়া খাইত। যাহারা তাহাদের ভিক্ষা দিত, তাহারাই গৃহস্থ বৌদ্ধ। একজন ভিক্ষু তিন বাড়ির অধিক চারি বাড়িতে ভিক্ষা লইতে পারিত না। যে বাড়িতে একবার ভিক্ষা পাইয়াছে, এক মাসের মধ্যে আর সে বাড়িতে যাইতে পারিত না। সুতরাং একজন ভিক্ষুর জন্য ৯০ ঘর গৃহস্থ বৌদ্ধের দরকার হইত। ইহার উত্তরে এই কথা বলা যায় যে, হিন্দুরাও তো ভিক্ষা দিত ; তাহারাও ভিখারি ফিরাইত না। সুতরাং গৃহস্থ বৌদ্ধ না থাকিলেও গৃহস্থ হিন্দুর দ্বারাই ভিক্ষুদের ভরণ-পোষণ হইতে পারিত।

আর-একদল বলেন যে, না। বুদ্ধদেব ভিক্ষুর জন্য দশ শীল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ; কিন্তু ধার্মিক গৃহস্থের জন্য অষ্ট শীল, আর অপরাপর গৃহস্থের জন্য পঞ্চ শীল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।[৫] সুতরাং গৃহস্থ বৌদ্ধ অনেক ছিল। বৌদ্ধ-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য— সংসার ত্যাগ বা ভিক্ষু হওয়া। সুতরাং যে-গৃহস্থ সেই উদ্দেশ্যের দিকে যত অগ্রসর হইতে থাকিবে, তাহার তত সম্মান ও আদর হইবে। তাহা হইলেও পঞ্চ শীল লইবার জন্য যে শিক্ষা দীক্ষা প্রয়োজন হইত, তাহাই বা কজনের ছিল ? অথচ শুনিতে পাওয়া যায়, গ্রামকে গ্রাম, নগরকে নগর, দেশকে দেশ বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহা কিরূপে হইতে পারে ?

অতএব সব বৌদ্ধকে ভুক্ত করিয়া লইতে পারে, এমন একটা বৌদ্ধের লক্ষণের দরকার হইল। সে লক্ষণ দেখা দিল এগারো শতকে। তিন জন গুপ্ত একখানি বই লিখিয়া বইখানির নাম দিলেন— 'আদিকর্ম্ম-রচনা'।[৬] তাঁহারা বলিলেন, যে-কেহ প্রাতঃকালে উঠিয়া বলিবেন— বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি ও সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, তিনিই বৌদ্ধ। অনেক দিন ধরিয়া এই তিনটি মন্ত্র শিখাইবার জন্য পুরোহিত দরকার হইত না, কিন্তু পরে হইয়াছিল। সুতরাং যাহার জন্য পুরোহিত দরকার হইত না, উপাসক নিজেই ইচ্ছা করিলে মন্ত্র লইতে পারিতেন, তাহার দ্বারা যে, ধর্মের শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে আশ্চর্য কী ? আপামর সাধারণ আপনি আপনি এই তিনটি মন্ত্র

উচ্চারণ করিলেই বৌদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতেন। বৌদ্ধের সংখ্যা বাড়িয়া যাইত।

কিন্তু "শীল" দিবার সময় বড়ো গোল বাধিত। যাহারা মাছ ধরিয়া খায়, মাছ ধরা, শিকার করা যাহাদের জাতীয় ব্যবসায়, চুরি করা যাহাদের জাতীয় ব্যবসায়, তাহারা শীল লইতে পারিত না। বৌদ্ধধর্মে তাহাদের ধর্ম বিষয়ে উন্নতি লাভের আশা থাকিত না। তবে তাহারা জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া, হালিকাদি ব্যবসায় আরম্ভ করিলে, তাহাদিগকে শীল দিবার কোনো আপত্তি থাকিত না। যাহারা জাতীয় ব্যবসায় ছাড়িত না, তাহারা হয় বৌদ্ধধর্মের সর্বনিম্ন স্তরে পড়িয়া থাকিত, অথবা তাহাদের জন্য ধর্মান্তরের ব্যবস্থা হইয়াছিল। যথা— কৌলধর্ম, মৎস্যেন্দ্রনাথের ধর্ম, মীননাথের ধর্ম, গোরক্ষনাথের ধর্ম ইত্যাদি।[৭]

একবার বৌদ্ধ হইলে, সে পঞ্চ শীল লইতে পারিত, অষ্ট শীল লইতে পারিত, দশ শীল লইয়া ভিক্ষু হইতে পারিত; ভিক্ষু হইলে ক্রমে উন্নতি করিয়া স্রোতাপন্ন, সকৃতাগামী, অনাগামী, অর্হৎ এবং পরে বোধিসত্ত্ব হইয়া বুদ্ধ বা জগদ্‌গুরু হইতে পারিত। কিন্তু সে-সকল জন্মজন্মান্তরসাধ্য।

হিন্দু কাহাকে বলে ?

যাঁহারা মনে করেন, ব্রাহ্মণ ভিন্ন দেবতার পূজা হয় না, ধর্ম উপদেশ পাওয়া যায় না, তাঁহারাই হিন্দু। হিন্দুরা জাতিভেদ মানেন। এক জাতিতে জন্মিলে এ জন্মে আর উচ্চ জাতিতে যাওয়া যায় না, যাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস, তাঁহারাই হিন্দু। যাঁহারা দেবতা মানেন, কিন্তু দেবতা হইতে চান না, তাঁহারাই হিন্দু। ব্রাহ্মণ হিন্দুদের মধ্যে সকলের উঁচু। ধর্ম ও নীতি তাঁহাদেরই হাতে। ক্ষত্রিয়েরা দেশ শাসন করেন। বৈশ্যেরা কৃষি, পশু-পালন ও বাণিজ্য করেন। শূদ্রেরা উপরের তিন জাতির সেবা করেন। বাংলায় কিন্তু ব্রাহ্মণ আর শূদ্র ভিন্ন জাতি নাই। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বাংলায় লোপ পাইয়াছে অর্থাৎ তাঁহারা বৌদ্ধ হইয়া জাতিভেদের হাত এড়াইয়াছেন।

ব্রাহ্মণের সকল বই-ই সংস্কৃত ভাষায় লেখা। সংস্কৃত ব্রাহ্মণ ভিন্ন কেহ পড়িতে পারিবে না। যাঁহারা হিন্দু হইয়া শূদ্র-শ্রেণীভুক্ত, তাঁহারা

সংস্কৃত শিখিতে পারিবেন না। কিন্তু বৌদ্ধেরা— বিশেষ বৌদ্ধ-ভিক্ষুরা সংস্কৃত পড়িতেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের সংস্কৃত পড়া বন্ধ করিতে পারেন নাই। অনেক সময় বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের লেখা বই তাঁহাদিগকে পড়িতে হইত ও পড়াইতে হইত ; তাহা তাঁহারা অম্লানবদনে করিতেন। কিন্তু তাঁহারা বৌদ্ধদের সংস্কৃতকে অশুদ্ধ বলিতেন ও তাহা পড়িয়া নাক সিঁটকাইতেন। বৌদ্ধেরা বলিতেন, আমরা সুশব্দবাদী নহি সত্য, কিন্তু আমরা যাহা বলি, তাহা সর্ববাদীসম্মত ও সত্য। বৌদ্ধেরা অন্য ভাষায়ও বই লিখিতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃত ছাড়া প্রধানত অন্য ভাষায় বই লিখিতেন না।

ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ-দলভুক্ত লোকদিগের সহিত আহার ব্যবহারাদি সামাজিক সম্বন্ধ রাখিতেন। এবং নিতান্ত নীচধর্মী ও নীচ-কর্মী লোক ভিন্ন আর-কাহাকেও অস্পৃশ্য বলিতেন না। কিন্তু তাঁহাদের মতে হিন্দু ভিন্ন আর-সকল জাতিই অনাচরণীয় ছিল। অর্থাৎ যুদ্ধের সময় যেমন শত্রুপক্ষকে বড়ো এবং ছোটো সকল প্রকার সম্পর্ক হইতে বঞ্চিত করা হয়, তেমনি হিন্দুরা বিধর্মীদিগকে অনাচরণীয় মনে করেন। তাঁহাদের মতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ বলাইলেও তাহারা অনাচরণীয়। কারণ, তাহারা বিদেশী ও বিধর্মী। মুসলমানেরা অনাচরণীয়, যেহেতু তাহারা বিধর্মী। বৌদ্ধেরাও অনাচরণীয়। এই-সকল অনাচরণীয় জাতিরা অনেকে এখন ব্রাহ্মণ লইয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা সেই-সকল ব্রাহ্মণকে পতিত ও অনাচরণীয় মনে করেন।

পূর্বকালে যখন বৌদ্ধেরা প্রবল ছিলেন, তাঁহারাও হিন্দুদিগকে অনাচরণীয় মনে করিতেন। এ সম্বন্ধে 'চতুঃশতিকা' নামক বৌদ্ধ গ্রন্থের টীকায় চন্দ্রকীর্তি[৮] একটি গল্প দিয়াছেন— একটি যুবক সর্বদা এক বৌদ্ধ বিহারে যাতায়াত করিত এবং বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের খুব সম্মান করিত। ভিক্ষুরা তাহাকে দীক্ষা দিবার জন্য বড়োই আগ্রহ করিতেন। সে দীক্ষা লইত না, বলিত— এখনো দেরি আছে। তিন-চারি মাস পরে সে একদিন আসিয়া বলিল, আমার দীক্ষা লইবার সময় হইয়াছে। ভিক্ষুরা জিজ্ঞাসা করিলেন, এতদিন হয় নাই, এখন হইয়াছে কেন ? সে বলিল, এখন আমার ব্রাহ্মণ দেখিলেই মনে হয়, ইহাকে এক কোপে কাটিয়া ফেলি ; সুতরাং আমার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের ঠিক সময় হইয়াছে।

সুতরাং অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় করার জন্য এখন যে ব্রাহ্মণদিগকেই দোষী করা হয়, সেটা ঠিক নয়। সকল ধর্মের লোকই বিরুদ্ধ ধর্মের লোককে অনাচরণীয় করিয়া থাকে। অনেক জায়গায় একেবারে তাহাদের বিনাশ সাধনও করিয়া থাকে।

যাহারা সংসার ধর্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হয়, হিন্দুরা তাহাদের খুব সম্মান করেন। কিন্তু যদি সে আবার সংসারে আসিতে চায় অথবা আসে, তাহাকে তাঁহারা মনে করেন— পতিত ও অনাচরণীয়। অনেক জাতীয় যোগী এইরূপে হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণের চক্ষে অনাচরণীয় হইয়া আছে। যাহারা সংসার ছাড়িয়া গেল, তাহারা চতুর্বর্ণ সমাজও ছাড়িয়া গেল। আবার ফিরিয়া আসিলে তাহারা চতুর্বর্ণ সমাজের বাহির অর্থাৎ অনাচরণীয় হইয়া রহিল।

বৌদ্ধ-সাহিত্য ॥

যখন বৌদ্ধধর্মের খুব প্রাদুর্ভাব, তখন তাঁহারা সংস্কৃতে বই লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা প্রথম চলিত ভাষায় বই লিখিতেন। প্রবল প্রতাপের সময় তাঁহারা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক করিবার জন্য চলিত ভাষা ছাড়িয়া সংস্কৃতে বই লিখিতেন। প্রথম প্রথম তাঁহারা ব্রাহ্মণের ব্যাকরণ পাণিনি[৯] লয়েন নাই। অন্য নানা ব্যাকরণের সাহায্যে বই লিখিতেন। পরে তাঁহারা নিজেদের জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখিতে আরম্ভ করেন, এবং এইরূপ ব্যাকরণ কয়েকখানা খুব চলিয়াও যায়। তাহার পর তাঁহারা পাণিনির টীকা লিখিতে আরম্ভ করেন। এই টীকায় তাঁহারা পতঞ্জলির[১০] মহাভাষ্যকে এক হিসাবে ছাঁটিয়া ফেলিতে চান। তাঁহাদের পাণিনির টীকা বাংলায় খুব চলিয়া যায়।

কোষে তাঁহাদের অসীম প্রভুত্ব। তাঁহাদের 'অমরকোষ'[১১] সকল-কেই লইতে হইয়াছিল। 'অমরকোষে'র যত পরিশিষ্ট আছে, প্রায় সবই তাঁহাদের। আরো অনেক কোষ তাঁহাদের লেখা। কোষের তিন অঙ্গ— পর্যায়, অনেকার্থ ও লিঙ্গ। তিন বিষয়েই তাঁহাদের অনেক বই আছে। ব্রাহ্মণেরাও সেই-সকল বই পড়েন, পড়ান ও তাহাদের টীকা লিখেন।

ছন্দেও তাঁহাদের ভালো ভালো বই আছে। তাঁহারা পিঙ্গল নাগের[১২] অনুসরণ করিয়া অনেক ছন্দের বই লিখিয়া গিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন, ভামহ[১৩] বৌদ্ধ ছিলেন। তাহা হইলে অলংকারে তাঁহাদের প্রভুত্ব খুবই বলিতে হইবে। কারণ, ভামহ অতি প্রাচীন। তাঁহারই বই অনেকে অলংকারের চলিত বইয়ের মধ্যে প্রথম বলিয়া মনে করেন। কাশ্মীরে ব্রাহ্মণেরা কিন্তু অলংকারে সকলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিলেন।

বানানের বই বৌদ্ধদের ঢের বেশি। আমার বোধ হয়, বাঙালি বৌদ্ধেরাই বেশি বেশি বানানের বই লিখেন এবং তাহাদের প্রভাব এখনো চলিতেছে। কারণ, বাঙালির সংস্কৃত উচ্চারণ অন্য দেশের সংস্কৃত উচ্চারণ হইতে অনেক তফাত।[১৫] তাই এইখানেই বানানের বইয়ের বেশি দরকার হয়।

এ তো গেল শব্দশাস্ত্রের কথা। দর্শনেও বৌদ্ধদের প্রভাব ঢের বেশি। তাঁহাদের দর্শন সমস্ত এশিয়া এখনো পড়িতেছে, পড়াইতেছে ও তাহার টীকা-টিপ্পনী লিখিতেছে। তাঁহাদের তর্কশাস্ত্রেরও সেইরূপ এশিয়ায় সর্বত্র আদর। এখনো জাপানে বৌদ্ধ-মন্দিরে বৌদ্ধ-তর্কশাস্ত্র পড়া হয়, এবং ইউনিভার্সিটিতে ইউরোপীয় লজিক পড়ানো হয়। এই দুই দলে সময়ে সময়ে তর্ক বাধে, কিন্তু ভারতীয় বৌদ্ধ-তর্কশাস্ত্রেরই প্রায় জয়লাভ হইয়া থাকে, এবং শিক্ষিত লোকে এই বাদানুবাদের খুব উৎসাহ দিয়া থাকেন।

বৌদ্ধদের গল্পের বইগুলি অতি চমৎকার। পালিভাষার কথা আমার এখানে বলার কোনো দরকার নাই। সংস্কৃতে বৌদ্ধদের দুই জাতীয় গল্প আছে— ১. জাতক, ২. অবদান। জাতক বুদ্ধদেবের পূর্বজন্মের কথা, আর অবদান বুদ্ধদেব ও তাঁহার চেলাদের পূর্বজন্মের কথা। সকল দেশের গল্পই একটা কাঠামোতে গাঁথা থাকে। 'আরব্য উপন্যাসে'র একরূপ কাঠামো, 'কথাসরিৎসাগরে'র আর-একরূপ কাঠামো। বৌদ্ধদের কাঠামো নাই; সব গল্পগুলিই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। বৌদ্ধদের গল্পে পশুপক্ষী ও ইতর জন্তুর কথাও আছে। 'কথাসরিৎসাগর' ও 'আরব্য উপন্যাসে' তাহা নাই। বরং আমাদের 'হিতোপদেশ', 'পঞ্চতন্ত্র', 'বেতালপঁচিশী' ও 'বত্রিশ সিংহাসনে' জন্তু জানোয়ারের কথা

অনেক। সেগুলিরও একটা কাঠামো আছে। খুব আঁট কাঠামো নহে, বড়ো আল্‌গা। বৌদ্ধদের কাঠামোই নাই।

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক যদি কাব্য বা নাটক লিখিতে বসেন, জিনিসটা একঘেয়ে হইয়া যায়। বৌদ্ধদের কাব্য নাটক যে এরূপ একঘেয়ে নয়, সেকথা বলা যায় না। তবে তাহাতে কল্পনার খুব দৌড় আছে এবং সৌন্দর্যও খুব সৃষ্টি হইয়াছে। অন্য সম্প্রদায়ের লোকও তাহা পড়িলে তাহার মাধুর্য, ওজঃ ও প্রসাদগুণে মুগ্ধ হইয়া যায়। ব্রাহ্মণেরা ইঁহাদের কাব্য নাটক পড়িতেন, তাহাতে মনোনিবেশ করিতেন এবং ব্যাকরণশুদ্ধ বলিয়া অনেক সময় উদ্ধারও করিতেন।

বুদ্ধদেবের নিজের বচন বলিয়া যে-সকল বই আছে, বৌদ্ধেরা তাহারই অধিক দোহাই দেন। সেগুলি বৌদ্ধসম্প্রদায়বিশেষের উক্তি—অনেক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লেখা এবং তাহার সংস্কৃতও বিভিন্ন রকমের। 'প্রজ্ঞাপারমিতা'য়[১৪] ভাব এক, ভাষা এক, উপদেশ এক এবং ধর্ম এক। আর 'চণ্ডমহাবোধন তন্ত্রে'র ভাব আর-এক, ভাষা আর-এক, উপদেশ আর-এক, আর ধর্মও আর-এক। দুই-ই কিন্তু বুদ্ধবচন।

বৌদ্ধদের এমনি কোনো স্মৃতির পুস্তক ছিল না, যাহাতে উপাসক ও সংঘ, দুইয়েরই কাজ চলিতে পারে। তাঁহাদের বিনয় শুদ্ধ সংঘের জন্য। দশ ও এগারো শতকে তাঁহারা স্মৃতির বই লিখিতে আরম্ভ করেন। তাহাতে অবৌদ্ধকে দীক্ষা দেওয়া, বৌদ্ধকে দীক্ষা দেওয়া, মন্দির নির্মাণ, মূর্তিপ্রতিষ্ঠা, নিত্য কর্ম, দিনের কাজ প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

বুদ্ধবচনে তন্ত্রের উৎপত্তি। কিন্তু সে শেষের দিকের বুদ্ধবচনে। ইহাতে মূলমন্ত্র, মন্ত্রোদ্ধার, মন্ত্রসাধনা, দেবতা-মূর্তি প্রভৃতির অনেক কথা লেখা আছে। ইহা হইতেই বৌদ্ধদের দেবমূর্তি সমূহের উৎপত্তির ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়।

এ সাহিত্য গেল কোথায়?

এ বৌদ্ধ-সাহিত্য গেল কোথায়? এ জিজ্ঞাসার এক উত্তর— হয় হিন্দুরা তাড়াইয়া দিয়াছে, নয় গ্রাস করিয়াছে। কেমন করিয়া গ্রাস করিয়াছে বা গিলিয়া ফেলিয়াছে, তাহার কতক কতক আভাস এখন

দিব, ও তাহার পর কেমন করিয়া প্রকাণ্ড বৌদ্ধ সমাজটা গ্রাস করিয়াছে বা গিলিয়াছে, তাহারো কতক কতক আভাস দিব।

বৌদ্ধ-ব্যাকরণ গেল কোথায় ?

গোড়ায় ব্যাকরণ ধরিয়াছি। ব্যাকরণ গ্রাসের কথাটাই আগে বলি। আমরা জানি, পাণিনিই সংস্কৃতের ব্যাকরণ। ইহার সঙ্গে কাত্যায়নের বার্তিক, ব্যাড়ির সংগ্রহ ও পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য', এই পণ্ডিত-ব্রাহ্মণদের ব্যাকরণ। ব্যাড়ির সংগ্রহ এখন আর পাওয়া যায় না, তাই এই ব্যাকরণ-শাস্ত্রকে ত্রিমুনি ব্যাকরণ বলে। কিন্তু ইহা ছাড়া সাধারণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের জন্য ছোটো ছোটো ব্যাকরণ ছিল এবং সে ব্যাকরণ সিদ্ধ উদাহরণ দিয়া শেখানো হইত : সূত্রের সঙ্গে তাহাদের বড়ো একটা সম্পর্ক ছিল না। কৌমার ব্যাকরণ এইরূপ উদাহরণ দিয়া শিখানো হইত। সর্ববর্মা সেই উদাহরণগুলি লইয়া, কতকগুলি সূত্র করিয়া 'কাতন্ত্র ব্যাকরণ' ছয় মাসের মধ্যে সাঁতবাহন রাজাকে শিখাইবার জন্য প্রস্তুত করেন। তাহাতে সাধারণ লোকের কার্য চলিত। ক্ষত্রিয়গণ, ব্যবসাদারেরা ও অন্য অন্য ভদ্রলোকের কাজ এইরূপ ব্যাকরণ দিয়াই চলিত। 'গরুড়-পুরাণে' ব্যাকরণের উপর যে দুটি অধ্যায় আছে, তাহা দেখিলে এ কথাটি বেশ বুঝা যায়। বৌদ্ধেরা প্রথম যখন খাঁটি সংস্কৃতে বই লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন এইরূপ ব্যাকরণ দিয়াই কাজ চালাইতেন।

পরে তাঁহাদের নিজের একখানি ব্যাকরণ লেখা দরকার হয়। তাঁহারা যে ব্যাকরণ তৈয়ারি করেন, তাহার নাম 'চান্দ্র ব্যাকরণ'।[১৫] গ্রন্থকার চন্দ্র গোমী। তিব্বতীয় ভাষায় 'পগ্‌-সম্‌-জোন্‌-জঙ্‌' নামে যে বই আছে, তাহাতে বলে যে, চন্দ্র গোমীর বাড়ি বরেন্দ্রভূমে, তিনি থাকিতেন চন্দ্রদ্বীপে, তাঁহার সময় ৪৫০ হইতে ৫০০ ইংরাজি সন। কেন-না, তিনি বলিয়াছেন, গুপ্তেরা হুনদের জয় করিয়াছে। এ স্থলে তিনি লঙ্‌ ব্যবহার করিয়াছেন। লঙ্‌ ব্যবহারের অর্থ, ঘটনাটা তাঁহারই সময়ে ঘটিয়াছিল, তিনি ইচ্ছা করিলে দেখিতে পারিতেন। হুনেরা ঐ সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল।

চান্দ্র ব্যাকরণ— ধাতুপাঠ, লিঙ্গানুশাসন, সূত্রপাঠ, বৃত্তি প্রভৃতিতে চারি দিকে পাণিনির মতো পূর্ণ ব্যাকরণ হইয়াছিল ; উহার বহু-সংখ্যক

টীকা ছিল, সেগুলিও প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইত ; টীকাকারেরা প্রায়ই বৌদ্ধ। এখন সে ব্যাকরণ ভারতবর্ষে একেবারে পাওয়া যায় না। সম্পূর্ণ ব্যাকরণ তিব্বতীয় তর্জমায় পাওয়া যায়। প্রোফেসর বেণ্ডল নেপাল হইতে ও বিউলার সাহেব কাশ্মীর হইতে ইহার কোনো কোনো অংশ পাইয়াছিলেন। আমি উহার একখানি পুরা সূত্রপাঠ পাইয়াছিলাম ; সেখানি জর্মানিতে ছাপা হইয়াছে। এত বড়ো ব্যাকরণখানা লোপ হইল কিরূপে ?

'সংক্ষিপ্তসার' নামে একখানি ব্যাকরণ আছে ; সেখানি বাংলায় রাঢ়দেশে চলে— এখনো চলিতেছে। ইহার সূত্রকার ক্রমদীশ্বর একজন শৈব ছিলেন। তিনি হিন্দুদের জন্য বই লিখেন। যেখানে যেখানে চন্দ্র ও পাণিনি দুই রকম মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেখানে সেখানে তিনি আপন সূত্রে বিকল্প শব্দ যোজনা করিয়াছেন। যেখানে যেখানে পাণিনি-সূত্রে, পাতঞ্জল ভাষ্য ও বৌদ্ধবৃত্তি দুই রকম মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেখানে তিনি প্রায়ই বিকল্প বিধান করিয়াছেন। অথবা বৌদ্ধমত পরিত্যাগ করিয়া ভাষ্যের মত প্রবল করিয়াছেন। অনেকে বলেন, তিনি পাণিনির সংক্ষিপ্তসার ; কিন্তু তিনি বাস্তবিক সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রের সংক্ষিপ্তসার। চান্দ্রের প্রতি তিনি যে ব্যবহার করিয়াছেন, কাতন্ত্রের প্রতিও তিনি সেই ব্যবহার করিয়াছেন অর্থাৎ সংক্ষিপ্তসারে চান্দ্রের ও কাতন্ত্রের যাহা কিছু ভালো, সব লওয়া হইয়াছে। তাই চন্দ্র ভারতে একবারে লোপ পাইয়াছে আর কাতন্ত্র কাশ্মীর ও পূর্ববঙ্গে লুকাইয়া আছে।

চাঙ্গুদাস[১৬] নামে একজন কায়স্থ-বৌদ্ধ একখানি ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন ; তাঁহার বইখানি লোপ পাইয়াছে। কিন্তু ব্যাকরণ বা ব্যাকরণের টীকা লিখিয়া যেমন গ্রন্থকার বা টীকাকার কারক, সমাস, তদ্ধিতের জন্য কতকগুলি কারিকা করেন, চাঙ্গুদাসও সেইরূপ কতকগুলি কারিকা করিয়াছিলেন। চাঙ্গুদাসের সেই কারিকাগুলি এখনো উড়িষ্যায় পড়া হয়। কারিকার টীকাকার একজন বৈষ্ণব। তিনি বলিয়াছেন, চাঙ্গুদাস বুদ্ধদেবকে নমস্কার করেন কেন ? তিনি বলেন, গ্রন্থকারেরা প্রায়ই নিজ নিজ ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া বই লেখেন। ব্রাহ্মণেরা নিজ ইষ্টদেব বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া বই লেখেন। কায়স্থেরা নিজ

ইষ্টদেব বুদ্ধকে স্মরণ করিয়া বই লেখেন। বৈশ্যেরা স্মরণ করে সূর্য-দেবকে, শূদ্রেরা শিব ও অন্যান্য দেবতাকে স্মরণ করে। যেমন চাঙ্গুদাসের কারিকা আছে, তেমনি বৌদ্ধ রভস নন্দীরও কতকগুলি কারিকা আছে। সেগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার ব্যাকরণও লোপ পাইয়াছে।

এই-সকল হেতুতে বোধ হয়, সংক্ষিপ্তসারের প্রভাবে চান্দ্র, কাতন্ত্র, রভস, চাঙ্গু লোপ পাইয়াছেন। বাংলায় চান্দ্রের যদিও বা কিছু আলোচনা হইত, 'প্রয়োগরত্নমালা' তাহা একেবারে লোপ করিয়া দিয়াছে। এই গ্রন্থখানি কোচবিহারে তৈয়ারি হয়। কামতাপুর রাজ্য ভাঙিয়া দিয়া গৌড়ের বাদশাহ্ আলাউদ্দীন হুসেন শাহ্[৭১] যখন সমস্ত কামতাপুর রাজ্য আপন রাজ্যভুক্ত করিতে পারিলেন না, তখন কোচ ও হাজোরা বাংলার উত্তরে এক প্রকাণ্ড রাজ্য স্থাপন করিল। সেই কোচবিহারের রাজাদের অনুরোধে পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ নামে একজন পণ্ডিত 'প্রয়োগরত্নমালা' নামে এক ব্যাকরণ লিখিলেন খৃ. ১৫৮০ [১৫৬৮ ?] সালে।[১৮] চন্দ্রের যাহা কিছু জ্যোতি ছিল, 'রত্নমালা'র আলোতে তাহা আরো ম্লান হইয়া গেল। 'রত্নমালা' বাংলা ও আসামের অনেক অংশে পুরাদমে চলিতেছে।

পাণিনির বৌদ্ধ টীকাগুলির খুব আদর ছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়দের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভট্টোজী দীক্ষিত ও তাঁহার শিষ্যেরা সেই-সকল পুস্তকে অনেক অপাণিনেয় ও ভাষ্যবিরুদ্ধ প্রয়োগ দেখিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিলেন। তাহাতে ২/৩ শত বৎসরের মধ্যে তাহাদের প্রচার এক প্রকার বন্ধ হইয়া আসিল। শেষে এমন হইল যে, পঠনপাঠন তো দূরে যাক, তাহদের পুথি পর্যন্ত পাওয়া যায় না। যে কষ্ট করিয়া লোকে সেই-সকল টীকা সংগ্রহ করিয়া ছাপাইয়াছে, তাহা পড়িলে আশ্চর্য হইতে হয়। আমার সুযোগ্য সহযোগী স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় 'ন্যাস' বা 'কাশিকাবিবরণপঞ্জিকা'র পুরা পুথি কোথাও পাইলেন না; সমস্ত ভারত ভ্রমণ করিয়া, টুকি টুকি করিয়া সংগ্রহ করিয়া, অনেক বৎসর খাটিয়া পুরা পুথিখানি ছাপাইয়াছেন।[১৯] এই-সকল পুথি বারেন্দ্রদেশে কিছু ছিল। তাহাতেই বারেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির উদ্বোধ হয়, এ-সকল পুথি ছাপানো উচিত। একখানি

বৌদ্ধের লেখা পাণিনি মতের ব্যাকরণ বারেন্দ্র অঞ্চলে কোথাও কোথাও চলিতেছিল, কিন্তু উহার পঠনপাঠনও বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

এইরূপে বাংলা দেশে বৌদ্ধ ব্যাকরণকারদের নাম পর্যন্ত লোপ পাইয়াছিল। যাঁহারা এই লোপের মূল, তাঁহারা রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ— রাঢ় দেশে বাড়ি। 'সংক্ষিপ্তসার' ব্যাকরণের যত টীকাকার আছেন, প্রায় সবই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, বিশেষত গয়ঘড় বাঁড়ুরী। ইহার উপর আবার মহারাষ্ট্রদেশের 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণ মহারাষ্ট্রে স্থান না পাইয়া, গঙ্গার দু ধার আশ্রয় করিল এবং মিথিলার 'সুপদ্ম-ব্যাকরণ'[20] মিথিলায় স্থান না পাইয়া যশোর, খুলনা ও ২৪ পরগনা আশ্রয় করিল। বৌদ্ধ ব্যাকরণগুলি লুপ্ত হইয়া গেল। 'মুগ্ধবোধে'র বহু-সংখ্যক টীকাকার আছেন, এক ভরত মল্লিক ছাড়া সবই বাঙালি ব্রাহ্মণ। একজন ছাড়া 'সুপদ্মে'র টীকাকারগুলি সব বাঙালি ব্রাহ্মণ। এইরূপে বাঙালি ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধ-ব্যাকরণগুলিকে তাঁহাদের শেষ আশ্রয়স্থান বাংলা হইতে লোপ করিয়া দিয়াছেন। অথচ তাহাদের যা-কিছু ভালো ছিল, সব আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন।

বৌদ্ধ অভিধান॥

অভিধানের ব্যাপার কিন্তু আর-এক রকম। সংস্কৃত অভিধান তিন জিনিস লইয়া— পর্যায়, নানার্থ ও লিঙ্গ। পর্যায় মানে, এক মানের অনেক শব্দ। নানার্থ মানে, এক শব্দের নানা অর্থ। লিঙ্গ শব্দে— কোন্ শব্দের কোন্ লিঙ্গ। বররুচি, ব্যাড়ি, কাত্য, কালিদাস, অমর প্রভৃতি অনেকেই ইহার এক-একটি অংশের বই লিখিয়া যান। কিন্তু বৌদ্ধ অমর সিংহ এই তিনটি অংশ লইয়াই 'নামলিঙ্গানুশাসন' এবং 'ত্রিকাণ্ড' নামে একখানি সরল ও সুন্দর পুস্তক লেখেন; আগেকার সব পুথি কানা হইয়া যায়: উহার এত প্রচার হয় যে, উহার তিন-চারিখানি পরিশিষ্ট লেখা হয়। একখানির নাম 'শেষামর', একখানির নাম 'ত্রিকাণ্ডশেষ' ও আর-একখানির নাম 'বিশ্বলোচন' বা 'মুক্তাবলী'। স্বয়ং নৈষধকার[21] উহার এক ভীষণ তীব্র, কিন্তু ছোটো সমালোচনা করেন। উহার বহু-সংখ্যক টীকা লেখা হয়। অমর ও তাঁহার গ্রন্থের নাম ব্রাহ্মণেরা লোপ করিতে পারেন নাই।

অমরের পর 'বিশ্বপ্রকাশ'[২২] অভিধান বৌদ্ধের লেখা; উহা কিন্তু নানার্থ শব্দ মাত্র। গ্রন্থকার আপনার অনেক পুরুষের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার পূর্বপুরুষেরা সাহসাঙ্ক নরপতির চিকিৎসক ছিলেন এবং কান্যকুব্জের রাজাদেরও চিকিৎসক ছিলেন। তিনি বোধ হয়, বাঙালি ছিলেন। কেন-না, তাঁহার বইয়ে এক অংশ আছে বানানের জন্য। অভিধানে বানানের কথা এই প্রথম। বইখানি লেখা ১১১১ খৃ. অব্দে।

আর-একজন বৌদ্ধ অভিধানকার পুরুষোত্তমদেব; তিনি অমরের পরিশিষ্ট লিখেন। অমরের পর বৌদ্ধধর্মের অনেক সম্প্রদায় হয়। সেই-সকল সম্প্রদায় কত নূতন নূতন শব্দ চলিত করিয়া দেয়; সে-সব তিনি সংগ্রহ করিয়া তাহার পরিশিষ্টে জুড়িয়া দিয়াছেন।

তাঁহার আরো একখানি অভিধান আছে, তাহার নাম 'হারাবলী'। যেখানে যত অপ্রচলিত শব্দ আছে, 'হারাবলী'তে তাহার মানে দেওয়া আছে। তাঁহার একখানি ব্যাকরণ আছে, নাম 'ভাষাবৃত্তি'। 'অষ্টাধ্যায়ী'র সূত্রগুলি হইতে স্বর ও বৈদিক অংশ বর্জন করিয়া যাহা থাকে, তাহারই বৌদ্ধমতে ব্যাখ্যা। লোকে বলে, লক্ষ্মণসেনের আজ্ঞায় এই বই তিনি লিখিয়াছিলেন।

তাঁহার আর-এক কার্য আছে— সেটা বানান দুরস্ত করা। অন্যান্য দেশে সংস্কৃত বানানের বইয়ের দরকার হয় না; কিন্তু বাংলায় আমরা অন্তঃস্থ "য" ও বর্গীয় "জ", এই উভয়ের ভেদ করিতে পারি না। অন্তঃস্থ "ব" ও বর্গীয় "ব"-এর উচ্চারণ-ভেদ করিতে পারি না। মূর্ধন্য "ণ" ও দন্ত্য "ন"-কার উচ্চারণ-ভেদ করিতে পারি না। তিনটা "শ" "ষ" "স"-ও আমরা একই ভাবে উচ্চারণ করি। এজন্য বানানে আমাদের অনেক গোলমাল হয়। তিনি এইসব বানানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গিয়াছেন এবং যে-সকল শব্দের দুই রকম বানান হইতে পারে, তাহারো একটা তালিকা করিয়া দিয়াছেন।

ব্রাহ্মণেরা এই-সকল গ্রন্থ লোপ করিতে পারেন নাই। নৈষধকার শ্রীহর্ষ অমরের উপর নানা দোষারোপ করিয়াও তাঁহার কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা অমরের ভালো ভালো টীকা লিখিয়াছেন, মূল হইতে টীকার আদর অধিক হইয়াছে। অমরের প্রথম বাঙালি টীকা ১১৫৯ ইংরাজি অব্দে তৈয়ারি হয়— টীকাকার

সর্বানন্দ বাঁড়ুর্জ্যা[২৩]। আমাদের দেশে তাঁহার বইয়ের পুথি থাকিলেও দাক্ষিণে তাঁহার অনেক পুথি পাওয়া যায় এবং সেখানে ইহার আদর অধিক। আমাদের দেশে আর-একখানি টীকার আদর অধিক; সেখানে বৃহস্পতি মতিলালের।[২৪] ইনি ১৪৩১ অব্দে টীকা লিখেন। তখন একজন হিন্দু বাংলার সুলতান হইয়া মুসলমানধর্ম গ্রহণ করেন। ইনি বৃহস্পতির প্রতি বড়োই সদয় ছিলেন, ইঁহাকে অনেক উপাধি দেন। 'রায়মুকুট' উপাধি দিবার সময় ইঁহাকে হাতির উপর চড়াইয়া অভিষেক করা হয়। ইঁহাকে অনেক জড়োয়া গহনা দেওয়া হয়, দুটি ছত্র দেওয়া হয়, ঘোড়া দেওয়া হয়, আর রায়মুকুট উপাধি দেওয়া হয়। ইঁহাদের দু জনের টীকা ভালো করিয়া পড়িলে দেখা যায়, কেমন করিয়া বৌদ্ধ-সাহিত্যের লোপ হইতেছে। সর্বানন্দ প্রায় ৩০ খানি বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে শব্দের শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ণয় করিয়াছেন, আর রায়মুকুটে মাত্র দশখানি। ইঁহার পর বাংলায় অমরের ঢের টীকা-টিপ্পনী হইয়াছে; তাহাতে বৌদ্ধ-সাহিত্য হইতে কিছুই উদ্ধার করা হয় নাই, বরং দেখাইতে চেষ্টা হইয়াছে যে, অমর বিষ্ণুকেই নমস্কার করিয়া তাঁহার বই লিখিয়াছেন, বুদ্ধদেবকে নহে; তিনি হিন্দু ছিলেন, বৌদ্ধ ছিলেন না। আর অমরের বইকে চাপিয়া রাখিবার জন্য অনেক নূতন নূতন অভিধান লেখা হইয়াছে। কিন্তু অমর যে অমর, সেই অমরই আছেন— তিনি মরেন নাই।

ছন্দঃশাস্ত্র ॥

ছন্দঃশাস্ত্রে অনেকেই বই লেখেন, কিন্তু আগে সেই পিঙ্গল নাগের 'ছন্দঃসূত্র'ই চলিত। পরে 'বৃত্তরত্নাকর' চলিতেছে। তাহার পর 'ছন্দোমঞ্জরী' বৈদ্য গোপালদাসের পুত্র গঙ্গাদাসের লেখা। বৌদ্ধদের একখানি খুব বড়ো অঙ্গের ছন্দের বই ছিল; লেখক— রত্নাকরশান্তি[২৫]। ইনি বিক্রমশীল বিহারের দ্বারপণ্ডিত ছিলেন এবং একজন প্রসিদ্ধ তীক্ষ্ণবুদ্ধি নৈয়ায়িক ছিলেন। অধিক বলিতে কি, ইনি দীপংকর শ্রীজ্ঞানের গুরু আর দীপংকর শ্রীজ্ঞান তিব্বত দেশে এখনো দ্বিতীয় বুদ্ধদেব বলিয়া পূজা পাইয়া থাকেন। কিন্তু এত বড়ো যে রত্নাকরশান্তি, তাঁহারো ছন্দের বই টিঁকিল না— লোপ পাইল।

অলংকার ॥

ভামহ যদি বৌদ্ধ না হন— না হইবার সম্ভাবনা অধিক, তবে বৌদ্ধদের অলংকারের বই সব লোপ পাইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে যে অলংকারের বই ছিল না বা অলংকারের চর্চা ছিল না, একথাও বলিতে পারি না। কারণ, কালিদাসের কাব্যগুলির তীব্র সমালোচনা বৌদ্ধদের হাতেই হইয়াছিল। একথা মল্লিনাথ বলিয়া গিয়াছেন এবং সমালোচক যে-সে লোক নন—স্বয়ং দিঙ্‌নাগ।

ন্যায় ॥

ন্যায়শাস্ত্রে অর্থাৎ লজিকে বৌদ্ধ-পণ্ডিতেরা খুব উন্নতি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সব বই লোপ পাইয়াছে, কিন্তু ঐ-সকল বইয়ের তর্জমা এশিয়ার নানা ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব আমাদের মীমাংসকদের ন্যায় ৭/৮টি প্রমাণ মানিতেন। কিন্তু ক্রমে খসিয়া খসিয়া প্রমাণগুলি নাগার্জুনের সময় চারিটিতে দাঁড়ায়— প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। মৈত্রেয়নাথ উপমান পরিহার করেন; তাহার পর দিঙ্‌নাগ শব্দকেও প্রমাণের লিস্ট হইতে বাদ দেন। তখন বৌদ্ধদের দুইটি মাত্র প্রমাণ দাঁড়ায়— প্রত্যক্ষ আর অনুমান। আমাদের 'ন্যায়সূত্র'খানি নাগার্জুনের সময়ে বা তাহার একটু পরে লেখা হয়। ইঁহারাও ৪টি প্রমাণ মানিলেন। ইঁহারা সেই চারিটিই ধরিয়া আছেন এবং বৌদ্ধদের সঙ্গে প্রমাণ লইয়া ঘোরতর তর্ক করিয়া আসিতেছেন। বাৎস্যায়ন,[২৬] 'ন্যায়বার্তিক'কার বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি সকলেই চারিটি প্রমাণ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দিঙ্‌নাগ, ধর্মকীর্তি,[২৭] ধর্মোদয়, শীলভদ্র[২৮] প্রভৃতি সকলেই দুই প্রমাণ মানিয়া গিয়াছেন এবং দুই প্রমাণ স্থাপনের জন্য তুমুল তর্ক করিয়া গিয়াছেন।

প্রত্যক্ষের লক্ষণ করিতে গিয়া আমাদের নৈয়ায়িকেরা 'ন্যায়সূত্রে'র লক্ষণই খাঁটি রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধেরা সে লক্ষণ পরিহার করিয়া কল্পনাপোঢ় প্রথম ও তাহার পর "কাল্পনাপোঢ়ম-ভ্রান্তম্" লক্ষণ স্থির করিয়াছেন।

আমাদের গোতমসূত্র তিন রূপ অনুমান স্বীকার করেন— ১. পূর্ববৎ অর্থাৎ কারণ হইতে কার্য, ২. শেষবৎ অর্থাৎ কার্য হইতে কারণ

এবং ৩. সামান্যতো দৃষ্ট। বৌদ্ধেরা দুই রূপ অনুমান মানেন— স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান। ইহার মধ্যে পরার্থানুমানের জন্যই অবয়বের দরকার হয়; অবয়ব অর্থাৎ সিলোজিসম্। আমাদের নৈয়ায়িকেরা পাঁচটি অবয়ব মানেন, বৌদ্ধেরা তিনটি বৈ মানেন না। তাঁহাদের পুস্তকসমূহে অনুমানের যে প্রয়োগ খাটান, তাহাতে উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন, এই তিনটি অবয়ব দেখান, কিন্তু আমাদের পঞ্চ অবয়ব শুদ্ধ অনুমানের মূল নহে, উহা তর্কের মূল; তর্ক করিতে বসিলেই অবয়ব সাজাইতে হয়। গোতম আমাদের অবয়ব অনুমান প্রমাণের মধ্যে না দিয়া, দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্তের পর দিয়াছেন। অর্থাৎ অনুমান ছাড়া অন্যত্রও অবয়বের দরকার হয়। কিন্তু অবয়ব সাজানো বড়ো জটিল ব্যাপার দেখিয়া আমাদের নৈয়ায়িকেরা ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্মতা, এই দুইটিকেই অনুমানের কারণ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন এবং ব্যাপ্তির লক্ষণ করিতে গিয়া অসাধারণ সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন। ব্যাপ্তির পক্ষধর্মতা অবয়বেরই, সার কথা। উদাহরণ হইতে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়, ব্যাপ্তিজ্ঞান হইলে তাহার একটি যদি পক্ষে অথবা পর্বতে থাকে, তবেই অনুমান হয়। কিন্তু ব্যাপ্তি শব্দটা এবং ব্যাপ্তির ধারণাটা কোন্ পক্ষ হইতে উঠে, তাহা ঠিক বলা যায় না। বোধ হয়, বৌদ্ধ পক্ষ হইতেই প্রথম উঠে।

কিন্তু উদাহরণ হইতে যে ব্যাপ্তিজ্ঞান উঠে, তাহাতে অনেক সময় উদাহরণ পাওয়া যায় না। বহ্নি ও ধূম স্থলে অনেক জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায়, বহ্নি ও ধূম এক জায়গায়। কিন্তু উচ্চ অনুমান স্থলে, যথা— ঈশ্বরানুমান অথবা ধর্মকায়ানুমানে, উদাহরণ পাওয়া যায় না। সেখানে বৌদ্ধেরা সাহস করিয়া বলিয়া ফেলিলেন, উদাহরণ ব্যতিরেকেও ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়; উহার নাম অন্তর্ব্যাপ্তি। অন্তর্ব্যাপ্তির উপর রত্নাকরশান্তির এক বই আছে; তাহার নাম 'অন্তর্ব্যাপ্তিসমর্থন'। রত্নাকরশান্তি খৃস্টীয় ১০৩৮ [1040] সালেও জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার শিষ্য যখন তিব্বত দেশে যাত্রা করেন, তখন তিনি বিস্তর নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে নিষেধ তিনি শুনেন নাই।

বারো শতকের শেষ ভাগে মিথিলায় মঙ্গলবনী নামক গ্রামে গঙ্গেশোপাধ্যায়[২৯] আমাদের ন্যায়শাস্ত্র ঘুঁটিয়া চারিটি প্রমাণের উপর

চারিখানি 'চিন্তামণি' রচনা করেন। চারিখানির সাধারণ নাম 'তত্ত্বচিন্তামণি'। এই পুস্তক রচনা বা সংকলনের উদ্দেশ্য— "প্রচণ্ড-পাষণ্ডতমস্তিতীর্ষয়া", অর্থাৎ বৌদ্ধদিগের প্রচণ্ড মত খণ্ডন করা। গঙ্গেশোপাধ্যায়ের বই আমাদের দেশে মূল বলিয়া বিখ্যাত। এই মূলের বহু-সংখ্যক টীকা হইয়াছে। এই-সকল টীকার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ-ন্যায়শাস্ত্র বাংলা— এমন-কি ভারতবর্ষ হইতেও তিরোহিত হইয়াছে। দু-একখানি ন্যায়ের গ্রন্থ পশ্চিম-ভারতের জৈনভাণ্ডার হইতে পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, ন্যায়শাস্ত্র বৌদ্ধেরা খুব সোজা করিয়া আনিয়াছেন। আর আমাদের ন্যায়শাস্ত্র এখন ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া শেষে দুর্বোধ হইয়া পড়িয়াছে।

বৌদ্ধ-দর্শন প্রথম হইতেই ক্ষণিকবাদী। এখনকার নৈয়ায়িকেরা বলেন, জ্ঞান ত্রিক্ষণস্থায়ী— এক ক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি ও তৃতীয় ক্ষণে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধেরা বলেন, উহার উৎপত্তি ও ধ্বংস এক ক্ষণেই হয়, উহার স্থিতি নাই। উঁহারা দুই সত্য মানেন— এক সাম্বৃত সত্য, আর-এক পরমার্থসত্য। সাম্বৃত সত্য পরীক্ষা করিতে করিতে দেখা যায়, উহার মূল নাই, উহা মায়া। আরো পরীক্ষা করিতে করিতে দেখা যায় যে, সে মায়াও নাই। এই মাধ্যমিকদের শেষ বিচার। ইহার নাম অপ্রতিষ্ঠিতসর্বধর্মবাদ। উহাদের পরমার্থসত্য ধর্মধাতু। ধর্মধাতু অনির্বচনীয়, উহার আর-এক নাম শূন্য। শূন্য অভাববাদ নয়, ভাববাদও নয়; উহা অনির্বাচ্য একটা স্বরূপ— যাহা বাক্য মনের অগোচর। উহা অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অচ্ছিদ্র, দৃঢ়, সার, অদাহি, অবিনাশী— এই শূন্যতার নামই বজ্র। ইহা ভাব নয়, অভাব নয়, ভাবাভাব নয়, অভাবাভাব ভাবাভাবও নয়। মানে আমরা উহা ধারণা করিতে পারি না অথচ উহা যে আছে, তাহাও অস্বীকার করিতে পারি না।

এই যে সূক্ষ্ম দার্শনিক মত বৌদ্ধদের মধ্যে ছিল, তাহা দুই দিক হইতে হিন্দুরা আক্রমণ করিয়া খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এক-দিকে শংকরাচার্য ও তাঁহার পরমগুরু গৌড়পাদাচার্য[৩০] এই সমস্তগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া আপনাদের মত প্রচার করিয়াছেন। গৌড়পাদ তাঁহার 'মাণ্ডূক্যকারিকা'য় এবং শংকর তাঁহার ভাষ্যে এই মতই প্রচার করিয়াছেন।

বৌদ্ধদের 'বোধিচর্যাবতারে'র নবম পরিচ্ছেদ, প্রজ্ঞাপারমিতাবতার পড়িয়া যাঁহারা শংকর ও গৌড়পাদের এই দুখানি বই পড়িবেন, তাঁহাদের এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকিতে পারিবে না। শংকরের পরবর্তী পণ্ডিতেরা বলিতেন— "মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব তৎ।" এখন দুই হাতে দুই মতের বই লইয়া পড়িলে প্রচ্ছন্ন শব্দটা আর ব্যবহার করিতে ইচ্ছা হইবে না ; মনে হইবে— "প্রকাশং বৌদ্ধমেব তৎ।" তবে গৌড়পাদ ও শংকর উপনিষদ্ প্রভৃতি হইতে এই মত সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া উহা সৎশাস্ত্র বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। আর বৌদ্ধেরা বেদ মানেন না বলিয়া উহা অসচ্ছাস্ত্র হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু দেখিতে হইবে, মায়া জিনিসটা নাগার্জুন ২য় শতকে লেখেন আর শংকর সেটা ৮ম শতকে গ্রহণ করেন। ইংরাজি ১৮ শতকের গোড়ায় একখানি বই বাংলায় রাঢ় দেশে লেখা হয় ; সেখানির নাম 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী'। তাহাঁতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিচারের কথা লেখা আছে। যখন বৌদ্ধ ও বৈদান্তিক পরস্পর বিচার করিতে আসিলেন, বৌদ্ধ বেদান্তীকে কহিলেন— ভাই, তোমায় আমায় কিছুই ভেদ নাই। কেবল তুমি বলো, "আছে আছে", আমি বলি, "নাই"। অর্থাৎ তুমি বলো— ব্রহ্ম, আমি বলি— শূন্য। কিন্তু কাজে আমরা দুই জনেই এক।

বাংলার ব্রাহ্মণেরা কিন্তু এরূপে বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে যুদ্ধ করেন নাই। তাঁহারা "তোর শিল তোর নোড়া, তোরই ভাঙি দাঁতের গোড়া" করেন নাই। তাঁহারা ন্যায় ও বৈশেষিক, এই দুইটি দর্শনের ঐক্য করিয়া বৌদ্ধদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রধান আচার্য উদয়ন। তিনি 'দ্রব্যকিরণাবলী' ও 'গুণকিরণাবলী' নামে বৈশেষিকের টীকা লিখিয়া তাহার পর 'আত্মানাত্মবিবেক' রচনা করেন। ইহার প্রথমেই তিনি আত্মসম্বন্ধে যত রূপ মত হইতে পারে, সেগুলিকে কয়েকটি ভাগ করিয়াছেন। তাহার পর তাহাদের আবার যত অবান্তর মত হইতে পারে, তাহার উল্লেখ করিয়া, এক-এক করিয়া খণ্ডন করেন ও তাহার পর আপনাদের ন্যায়-বৈশেষিকের জীবাত্মা ও পরমাত্মা স্থাপন করেন। তাঁহার মতের সারসংগ্রহ হইতেছে— গঙ্গেশের অনুমান-খণ্ডের ঈশ্বরানুমান অধ্যায়। এই মত যত ঘনীভূত হইতে লাগিল,

বৌদ্ধেরা ততই হঠিতে লাগিল। 'আত্মানাত্মবিবেকে'র নাম হইল 'বৌদ্ধাধিক্কার'; একটু সাধু ভাষায় উহার নাম হইল 'বৌদ্ধাধিকার'। একশত বৎসর পূর্বে অনেক নৈয়ায়িকই এই বই পড়িতেন ও পড়াইতেন। কিন্তু বৌদ্ধমত, বৌদ্ধদের পুথি হইতে, তাঁহাদের জানা না থাকায় বলিতেন, এ অতি কঠিন গ্রন্থ। বৌদ্ধেরা যে ন্যায়-বৈশেষিক মতের প্রভাবেই হঠিয়াছিলেন, একথা বলা যায় না। দেশে মুসলমান অধিকার হওয়ায় তাঁহাদের শাস্ত্র ও ধর্মের লোপ হইয়াছে, এও একটা কারণ। বৌদ্ধদের সঙ্গে যখন ন্যায়-বৈশেষিকওয়ালাদের বিচার হয়, সে সময় তর্কবিতর্কের যে-সকল বই লেখা হয়, তাহার মধ্যে বৌদ্ধদের দু-চারখানি আমি পাইয়াছি ও ছাপাইয়াছি।[৩১] একখানির নাম— 'সামান্যদূষণদিকৃপ্রসারিতা'। বৌদ্ধেরা ক্ষণিকবাদী। তাহারা এক ক্ষণে একটিমাত্র পদার্থ দেখে, সুতরাং অনেক পদার্থ লইয়া যে সামান্য বা জাতি হয়, তাহারা তাহা মানে না। তাহারা বলে, গাছ বুঝি, কিন্তু বন বুঝি না। তাহারা বলে, তোমার হাতে তো পাঁচটা আঙুল আছে, সামান্য মানিলে তো ছয়টা মানিতে হয়; কিন্তু তোমরা তো সকলে ছ-আঙুলে নও।

স্মৃতি ॥

স্মৃতি বলিতে কী বুঝায়? শংকরাচার্য এক জায়গায় 'মহাভারত'কে স্মৃতি বলিয়াছেন, আর-এক জায়গায় 'গীতা'কে স্মৃতি বলিয়াছেন। 'মনুস্মৃতি'তে ধর্মশাস্ত্র আছে, অর্থশাস্ত্র আছে, মোক্ষশাস্ত্রও আছে। ব্রাহ্মণের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি স্মৃতিতে আছে। তাঁহারা বলেন, অন্য-অন্য জাতি আমাদের দেখিয়া শিখুক। বৌদ্ধদের বিনয়— সে বুদ্ধের হুকুম; পুরানো ধার্মিক লোকের স্মৃতি নহে। সে বিনয়ও ভিক্ষুদের জন্য, গৃহস্থের জন্য নহে। তবে যে গৃহস্থ ভিক্ষু হইতে যাইবে, সে বিনয়-মত ব্যবহার করিবে। কিন্তু সকলের তো ভিক্ষু হওয়ার উদ্দেশ্য নয়, তাহারা কী করিবে? একথার এক উত্তর, তাহারা ব্রাহ্মণদের আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিবে। তাই বৌদ্ধধর্মে স্মৃতির উল্লেখ বড়ো দেখা যায় না। রাজকার্য ব্রাহ্মণে করিতেন, ধর্মকার্যও ব্রাহ্মণেই করিতেন। বিচার ব্রাহ্মণের হাতেই ছিল। তাই যখন

বৌদ্ধেরা খুব প্রবল, তখনো ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া ছিলেন।

ব্রাহ্মণের স্মৃতি পড়িতে পড়িতে মনে হয় যে, যত দিন যাইতে লাগিল এবং সমাজের পরিবর্তন হইতে লাগিল, অনেক বিষয় স্মৃতি হইতে খসিয়া পড়িল, আবার অনেক জিনিস তাহাতে আসিয়া জুটিতে লাগিল। দেবপ্রতিষ্ঠা, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা মনুতে দেখা যায় না। যখন শৈব ও বৈষ্ণবেরা প্রবল হইতে লাগিলেন, তখন প্রতিষ্ঠা ব্যাপারটা স্মৃতিভুক্ত হইয়া গেল। দীক্ষা বহুকাল স্মৃতির বাইরে ছিল। বৈদিক দীক্ষা 'বেদে' ও বৈদিক বইয়ে ছিল। তান্ত্রিক দীক্ষা তন্ত্রে ছিল। স্মার্ত দীক্ষা ছিল না, পৌরাণিক দীক্ষাও ছিল না। কিন্তু রঘুনন্দন দীক্ষার উপর এক তত্ত্ব লিখিয়া গেলেন। বৌদ্ধদের স্মৃতির বই নাই। কিন্তু ৯/১০ শতকে লেখা কয়েকখানি স্মৃতির বই আমার হস্তগত হইয়াছে। অধিকাংশ গুপ্ত উপাধিধারী বৌদ্ধদের লেখা। তাহার ব্যাপার দেব-প্রতিষ্ঠা, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, অবৌদ্ধকে দীক্ষা দেওয়া (নাম— আদিকর্ম), দিনের কাজ, বারব্রত ইত্যাদি। কিন্তু এই-সকল বইয়ের সংখ্যা বড়ো কম। তবুও উহাতে কোটেশন আছে; তাহাতে মনে হয়, আরো ছিল— লোপ হইয়াছে। এ-সকল কিন্তু বিনয় ছাড়া।

আমার মনে হয়, বৌদ্ধস্মৃতির বিষয়গুলি শৈব ও বৈষ্ণবেরা প্রথম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের কাছ হইতে ব্রাহ্মণেরা লইয়াছেন।

মুসলমান অধিকারের সূত্রপাত হইতেই হিন্দুরা সমাজ বজায় রাখিবার জন্য যেখানে তাঁহাদের রাজক্ষমতা লাভ হইয়াছে, নিবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির উপকারার্থ এরূপ প্রায় দুই শত নিবন্ধ লেখা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে প্রায় পঞ্চাশখানা আস্ত পাওয়া গিয়াছে। "আস্ত নিবন্ধ" বলিতে রঘুনন্দনের ২৮ তত্ত্বের মতো বড়ো বড়ো নিবন্ধ। আর ১৫০ খানার খণ্ড পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লেখাই আছে, এটা অমুক আস্ত নিবন্ধের খণ্ড। এ ছাড়া আবার স্মৃতির ভিন্ন ভিন্ন বিষয় লইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধও আছে।

এই যে বিশাল নিবন্ধ-সাহিত্য, ইহাতে বৌদ্ধদের স্মৃতি একেই তো কম, সব মিশিয়া গিয়াছে, আর বাকি লোপ হইয়াছে। মন্দিরপ্রতিষ্ঠা,

তান্ত্রিক দীক্ষা, দেবপ্রতিষ্ঠা, মন্দির নির্মাণ, এসব আমরা লইয়াছি। আর বৌদ্ধদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের স্মৃতি চলিয়া গিয়াছে। বিনয়ে বৌদ্ধেরা যে পঞ্চ শীল, অষ্ট শীল, দশ শীল লইয়াছিলেন এবং তাহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভেদ বাহির করিয়া একটা প্রকাণ্ড জিনিস করিয়াছিলেন, তাহাকেও আমরা লই নাই। তাঁহাদের স্মৃতিতে জাতিভেদেরও লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

তন্ত্র ॥

তন্ত্রের উৎপত্তি লইয়া নানা মত আছে। ব্রাহ্মণেরা বলেন, উহা 'অথর্ববেদে'র অংশ। যাহার কিছু গোড়া পাওয়া যায় না, তাহাই 'অথর্ববেদ'। একথার কী মূল্য জানি না। আমি গুপ্তাক্ষরের শেষ অবস্থায় লেখা দুখানি পুথি দেখিয়াছি। একখানিতে ঋচীক ও মতঙ্গ কথা কহিতেছেন নৈমিষারণ্যে। একজন বলিতেছেন, এ আবার কী হইল? আমরা তো বৈদিক দীক্ষাই জানি, এখন আবার এ একটি কী দীক্ষা আইল? ইহাকে তান্ত্রিক দীক্ষা বলে। আর-একজন বলেন, তান্ত্রিকও পুরানো দীক্ষা— বিষ্ণু শিবের নিকট এই দীক্ষা লইয়াছিলেন। সুতরাং তন্ত্রের গোড়া তো এইখানেই পাওয়া গেল।

আর-একখানি পুথিও ঐ অক্ষরেই লেখা। এখানির নাম 'কুলালিকাম্নায়' বা 'কুব্জিকামত'। ইহাতে ঈশ্বর দেবীকে বলিতেছেন—

"গচ্ছ ত্বং ভারতে বর্ষে অধিকারায় সর্ব্বতঃ।"
"যাবন্নৈবাধিকারস্তে ন সঙ্গমস্তয়া সহ ॥"[৩২]

ইহাতে বুঝা যাইতেছে, তন্ত্র ভারতের বাহির হইতে আসিয়াছে। বলিবে, কৈলাস পর্বত হইতে আসিয়াছে। কিন্তু কৈলাস তো ভারতবর্ষের বাহিরে বলিয়া কেহ বলে না। পুথি দুখানিই ৮ম শতকের শেষ ভাগের লেখা।

আমার বোধ হয়, খৃ ৭ ও ৮ শতকে যখন উম্মেদিয়া ও আব্বাসিয়া খলিফাগণ[৩৩] তুর্কিস্তানে আপনাদের আধিপত্য ও ইসলামধর্ম বিস্তার করিতেছিলেন, তখন সেখানে নানা রকমের লোক-চলিত ধর্ম ছিল। তাঁহারা সে-সকল ধর্ম নষ্ট করায় তাহাদের পুরোহিতেরা পলাইয়া ভারতে আসেন; তাঁহারাই তন্ত্র এদেশে প্রচার করেন। তখন ভারতে কোথাও

তন্ত্র ছিল না, তাহার কারণ, জলন্ধর, কামাখ্যা, ওড়িয়ান, পূর্ণা, শ্রীপর্বত, এই-সকল স্থানই দেবী দখল করেন ও সেইসব স্থান হইতে ভারতবর্ষে নানা দেশে উহার প্রচার হয়। আমার মনে হয়, এ-ই তন্ত্রের গোড়া। তন্ত্র শব্দ ইহার পূর্বে ছিল। বরাহমিহিরের[৩৪] টীকাকার ভট্ট উৎপল[৩৫] নানা তন্ত্রের নাম করিয়া গিয়াছেন, সে সমস্তই কিন্তু জ্যোতিষের নাম।

সকল তন্ত্রেই দেখিতে পাই, অন্য অন্য তন্ত্রের নাম করিয়াছে। কিন্তু আমার দুইখানি পুথিতে পূর্ববর্তী তন্ত্রের নাম নাই। একবার কেবল আছে "পূর্বতন্ত্রে", কোনো তন্ত্রের নাম নাই। এই-সকল কারণে আমার মনে হয়, তন্ত্র ভারতের বাহির হইতে ৭/৮ শতকে আসে এবং ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। বৌদ্ধেরা তখন প্রবল, উহারা সেই তন্ত্র লইয়া আপনাদের প্রচার-কার্যে নিয়োগ করে। ব্রাহ্মণেরা ধর্মপ্রচার করিবেন না, তাঁহারা লন নাই। শৈব ও বৈষ্ণবেরা প্রচার করে, উহারাও লইয়াছিল। শৈবেরা "তন্ত্র" বলিত আর বৈষ্ণবেরা বলিত "পঞ্চরাত্র"। ঐ বাহিরের আসা জিনিস ভারতে আসিয়া খুব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বাংলায় পঞ্চরাত্র বড়ো ছিল না: পঞ্চরাত্রের দুই শতের উপর বই আছে। বাংলায় তাহার কিছুই পাওয়া যায় না। একখানি পঞ্চরাত্র এশিয়াটিক সোসাইটি বাংলা হইতে সংগ্রহ করিয়া ছাপাইয়াছিল— উহা 'নারদপঞ্চরাত্র'। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে— উহা জাল। শৈব-তন্ত্রগুলি কাশ্মীরে ও মধ্যভারতে বেশি, উহাদেরও বাংলায় পাওয়া যায় না। বাংলায় যাহা পাওয়া যায়, তাহা প্রায়ই বৌদ্ধতন্ত্র ভাঙা। বাংলায় বৌদ্ধতন্ত্রের প্রধান আড্ডা ছিল। বিক্রমশীল বিহারে (ভাগলপুরের কাছে), জগদ্দল বিহারে ও নালন্দাতেও শেষ অবস্থায় অনেক তন্ত্র জমিয়াছিল। বৌদ্ধ বিহার মাত্রেই তন্ত্র ছিল। সুতরাং বাংলায় বৌদ্ধতন্ত্রেরই প্রাদুর্ভাব বেশি হইয়াছিল।

শেষ সময় পর্যন্ত ব্রাহ্মণের লেখা তন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় না; উঁহারা বেদ স্মৃতি লইয়াই বেশি থাকিতেন। নুগড়াচার্যের[৩৬] বেদের টীকাই বোধ হয়, বেদের আদি টীকা। উহা লোপ পাইয়াছে। ভবদেব,[৩৭] নারায়ণ,[৩৮] হলায়ুধ,[৩৯] পশুপতি, জীমূতবাহন,[৪০] ইঁহারা বেদ ও স্মৃতি লইয়াই থাকিতেন।

বৌদ্ধতন্ত্রই বাংলায় খুব বেশি ছিল। বাঙালি ব্রাহ্মণেরা তন্ত্রে

বেশি মন দিতে পারেন নাই। কিন্তু মুসলমান অধিকারের পর দুই শত বৎসরের ইতিহাস পাওয়া যায় না, যাইবার কথাও নয়। মুসলমান অধিকারের আরম্ভ হইতেই মারামারি কাটাকাটি বেশি আরম্ভ হয়। তাহাতে হিন্দু অপেক্ষা বৌদ্ধদেরই ক্ষতি বেশি হয়। ভিক্ষুরা হয় কাটা পড়ে অথবা পলাইয়া যায়। তাহাদের বিহার লুঠ হয়। ঠাকুর সব ভাঙা পড়ে। মুসলমানেরাও বড়ো সুস্থির ছিল না। বক্তিয়ার খিলিজি[৪১] গৌড় দখল করিয়া আসাম আক্রমণ করিয়া দখল করেন। তাহার পর প্রচুর সৈন্য সঙ্গে তিব্বত দখল করিতে যান। সেখানে তিনি কিছুই করিতে পারেন নাই। অনেক সৈন্য মারা যায়। ফিরিয়া আসিবার পথে আসামিরা অবশিষ্ট সৈন্য জলে ভাসাইয়া দেয়। বক্তিয়ার ২০টি মাত্র সিপাহি লইয়া ঘোড়াঘাটে উপস্থিত হন্। এবং ক্ষোভে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পর আলি মর্দান[৪২] নামক একজন বাংলার কর্তা হন। তাঁহার কর্তৃত্ব বেশিদিন থাকে নাই। তাঁহার পর হইতে ১২৮০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত যে বাংলায় আসে, সে-ই স্বাধীন হইতে চেষ্টা করে, আর দিল্লি হইতে তাহাকে দমন করিবার চেষ্টা হয়। ক্রমে বাংলার নাম "ঝগড়ার দেশ" হইয়া উঠিল। একবার ১২৮০ সালে গিয়াসুদ্দিন বুলবন[৪৩] বাংলায় আসেন। তিনি সোনারগাঁয়ের "রায়" বা রাজার সঙ্গে সন্ধি করেন। অনেক লোক মারিয়া মুসলমান-বিদ্রোহ দমন করেন ও আপনার বড়ো ছেলেকে বাংলার কর্তা করিয়া দিয়া যান, এবং বলিয়া যান যে, তুমি যদি দিল্লি হইতে পৃথক হইতে চাও তোমাকেও শূলে দিব। তিনি আবার বাংলাকে এত ভালোবাসিতেন যে, দিল্লির সিংহাসনে নিজের ছেলেকে বসাইয়া নিজে বাংলায় রহিলেন। তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্র ও পৌত্রকে দিল্লির সুল-তানেরাও সুলতান বলিত। এই তিন পুরুষেই তাঁহারা পূর্ব-বাংলার হিন্দু রাজত্ব লোপ করেন। আবার ১৩২৫ সালে জেলালুদ্দিন খিলিজি বাংলায় আসিয়া, বাংলা তিন ভাগে ভাগ করিয়া দিয়া যান— সাতগাঁ, গৌড় ও সোনার গাঁ। এই তিন কর্তায় আবার ঘোরতর লড়াই ঝগড়া বাধান এবং শেষ ১৩৪৫ সালে শমসুদ্দিন ইলিয়াস্ শাহ্ সমস্ত বাংলার রাজা হন। হিন্দু ব্রাহ্মণেরা ইঁহার খুব সাহায্য করিয়াছিলেন। ইঁহারা তিন পুরুষে বাংলায় কতক শান্তি স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন।

ইঁহাদের পর রাজা গণেশ[৪৪] বাংলার কর্তা হন এবং তিন পুরুষ রাজত্ব করেন। এই সময় হইতেই বাংলা আবার গজাইতে আরম্ভ করে। ইঁহারা একজন ব্রাহ্মণকে খুব সম্মান করিতেন। তাঁহার কথা পূর্বেও বলিয়াছি। তিনি শুদ্ধ 'অমরকোষে'র টীকা লিখিয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহা হইতেই বাংলা ও সংস্কৃতের চর্চা বাংলায় নবজীবন লাভ করে। দুই শত বৎসর বাংলায় যে কী দুর্দশা ঘটিয়াছিল, বলা যায় না। এই দুই শত বৎসরের মধ্যে যে, কোনো বাংলা বা সংস্কৃত বই লেখা হইয়াছিল, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। এমন-কি, কোনো সংস্কৃত বা বাংলা বই যে কপি করা হইয়াছিল, তাহাও পাই নাই। ইতিহাসের মধ্যে এই দুই শত বৎসর যেন সব সাদা।

বৃহস্পতি হইতে আবার বাংলা ও সংস্কৃতের নবজীবন। বৃহস্পতি কতকগুলি চলিত সংস্কৃত কাব্যের টীকা লিখিয়া, তাহাদের পঠন-পাঠনের সুবিধা করিয়া দেন এবং 'স্মৃতিকণ্ঠহার' নামে একখানি স্মৃতির বই লিখিয়া হিন্দুর সমাজ বাঁধিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারই সময় কৃত্তিবাস বড়ো গঙ্গা পার হইয়া, গৌড়ে আসিয়া সুলতানের কাছে আদর ও অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হন। মিথিলায় বিদ্যাপতি এই সময়েই তাঁহার সুমধুর গানে দেশ মুগ্ধ করেন এবং তাঁহার শৈব ও স্মার্ত পুস্তক-সকল রচনা করেন। চণ্ডীদাসও এই সময়ে তাঁহার গানে বাংলায় একটা নূতন জাগরণ আনিয়া দেন।[৪৫] সুতরাং গণেশবংশীয় রাজাদের সময়েই বাংলার হিন্দুসমাজের জাগরণ হয়। এ সময়েও বৌদ্ধেরা বেশ প্রবল ছিলেন। ১৪২৬, ১৪৩৬ ও ১৪৪৪ সালেও বাংলায় ভালো ভালো বৌদ্ধ গ্রন্থ কপি করা হয়। বর্ধমানের বেণুগ্রামের মিত্রেরা 'বোধিচর্য্যাবতার' কপি করাইয়াছিলেন। একজন ভিক্ষু লিখিয়াছিলেন, আর-একজন সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন এবং আর-এক ব্যক্তির পড়ার জন্য কপি করা। মিত্র মহাশয় নিজে ও তাঁহার পুত্র দুই জনই 'বোধিচর্য্যাবতার' পড়িয়াছিলেন।

১৪০০ হইতে ১৫০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ব্রাহ্মণেরা বাংলা ও সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিতেছিলেন, আর বৌদ্ধেরাও স্বধর্মের গ্রন্থ-সকল পাঠ করিতেছিলেন। সে সময়েও ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধকাব্য ও বৌদ্ধ-ধর্মপুস্তক পড়িতেন ও তাহা হইতে উদ্ধার করিতেন।

মুসলমান অধিকারের পূর্বেও বৌদ্ধদের অনেক তন্ত্রের বই ছিল। কিন্তু ঐ অধিকারের পর হইতে আর বড়ো একটা তাঁহাদের বাংলা দেশে লেখা তন্ত্রের বই দেখা যায় না। বৃহস্পতি রায়মুকুটের সময় ব্রাহ্মণদের মধ্যে শংকরাচার্য নামে একজন আবির্ভূত হইয়া তন্ত্র প্রচার আরম্ভ করেন। বড়ো শংকরাচার্য হইতে তাঁহাকে পৃথক করিবার জন্য তাঁহার নাম হইয়াছে গৌড়ীয় শংকরাচার্য[৪৬]। তিনি অনেক বই লেখেন। লোকে বলে, তাঁহার বংশধরেরা আজিও রাঢ় দেশে হুগলি জেলায় বাস করিতেছেন। তিনি কালীমন্ত্রের উপাসক ছিলেন এবং অনেক বইও লিখিয়াছেন ; তাহার মধ্যে ৫/৬ খানা বই পাওয়া গিয়াছে। 'প্রপঞ্চ-সার' বড়ো শংকরাচার্যের নামে চলিতেছে। কিন্তু পড়িলে উহা একে-বারে অদ্বৈতাচার্যের লেখা বলিয়া বোধ হয় না। যিনি লিখিয়াছেন, তিনি কমলাকরের পুত্র শংকর। তাঁহার অনেক চেলা ছিলেন, সকলেই কালীবাড়ি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আমার বোধ হয়, আমডাঙার কালীবাড়ি তাঁহারই কোনো চেলার তৈয়ারি। উহাতে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত ১৪টি সমাজ ছিল। সমাজগুলি ঐ কালীবাড়ির মোহান্তদিগের। পাঁজিতে এক শংকরাব্দ পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের জন্মের ৩৬ বৎসর পূর্বে উহার আরম্ভ। উহা এই শংকরাচার্য প্রবর্তন করেন। উনি বৌদ্ধদের তন্ত্র হিন্দুদের মধ্যে প্রচার করেন। অনেক বৌদ্ধ সংকেত ও অনেক বৌদ্ধ নাম ইঁহার পুথিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু যাঁহারা বৌদ্ধতন্ত্র পূর্ব-বাংলায় হিন্দুদের মধ্যে প্রচার করেন, তাঁহারা তিন জন— ত্রিগুণানন্দ, তাঁহার চেলা ব্রহ্মানন্দ ও তাঁহার চেলা পূর্ণানন্দ। পূর্ণানন্দের 'তত্ত্বচিন্তামণি' ১৫৭৯ খৃস্টাব্দে লেখা। সুতরাং তাঁহাদের সময় ১৫০০ হইতে ১৬০০ মধ্যে। ইঁহাদের এক গাড়ি বই পাওয়া যায়।[৪৭] রসিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইঁহাদের অনেকগুলি বই ছাপাইয়াছেন।[৪৮] তাহার মধ্যে ব্রহ্মানন্দের 'তারারহস্য' একখানি। সেখানিতে বোধিসত্ত্ব প্রভৃতির কথা আছে। তারা, পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের একজনের শক্তি। নেপালের বৌদ্ধ-পণ্ডিতেরা বলেন যে, তারাই প্রজ্ঞা, বুদ্ধের শক্তিও ধর্মের রূপান্তর বা নামান্তর মাত্র। 'তারারহস্য' পড়িয়া আমারও তাই বোধ হইয়াছিল। উহাতে যে-সকল ক্রিয়া দ্বারা সিদ্ধি লাভ হ: দর অকথ্য পঞ্চ মকার। পঞ্চ মকারগুলির সকলই

উহাতে বিদ্যমান আছে, বরং তাহা হইতেও অহিন্দু ব্যবহারের কথা উহাতে আছে। লোকে বলে, ঢাকার রমনার কালীবাড়ি ব্রহ্মানন্দেরই স্থাপিত। উনি ঐ মূর্তি কামাখ্যা হইতে আনিতে আনিতে ঐখানে ক্লান্ত হইয়া পড়েন এবং ঐখানেই তাহাকে স্থাপন করেন। আমার সংস্কার, ইঁহারা তিন জনেই বৌদ্ধতন্ত্রকে হিন্দু করিয়া দিয়া যান। বৌদ্ধতন্ত্রগুলি লোপ পায়। আর ইঁহাদের শিষ্য-সেবক বেশি হইয়া উঠে। আমাদের এখানেও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ[৪৯] অনেকগুলি বৌদ্ধ দেবতাকে তাঁহার 'তন্ত্রসারে' স্থান দিয়াছেন। তাহার মধ্যে দুটি আমার খুব মনে পড়ে— একটি ক্ষেত্রপাল, আর-একটি মঞ্জুঘোষ— বৌদ্ধ মঞ্জুশ্রীর অপভ্রংশ। রাঢ় দেশে শুনিয়া আসিয়াছি, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে এখনো মঞ্জুঘোষের উপাসক আছেন। তন্ত্রের এই-সকল গ্রন্থকার প্রামাণিক লোক ছিলেন, না দেখিয়া না পড়িয়া তাঁহারা কিছুই লেখেন নাই। 'তন্ত্রসারে'র দেবতারা কৃষ্ণানন্দের সময়ে পূজা পাইতেন, তাই তিনি আপন গ্রন্থে তাঁহাদের স্থান দিয়াছেন। কৃষ্ণানন্দের পৌত্র যে 'আগমকল্পলতিকা'[৫০] বলিয়া বই লেখেন, তাহাতে আরো অনেক বৌদ্ধ দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি দেওয়া আছে। এইরূপে আস্তে আস্তে বৌদ্ধতন্ত্র লোপ পাইল, আর তাহাদের মধ্যে যাহা লইবার ছিল, ব্রাহ্মণেরা সেগুলি আপন তন্ত্রভুক্ত করিয়া লইলেন। কোনো কোনো বিষয় আপনাদের স্মৃতিতেও উঠাইলেন। এই-সকল দেবতা, ক্রিয়া ও পূজা নিজ গ্রন্থভুক্ত করিবার অর্থ কী? উঁহাদের উপাসক ও পূজকদিগকে আপনাদের ব্রাহ্মণ্যসমাজভুক্ত করিয়া লওয়া।

অন্য কথা কী বলিব, পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের পাঁচটি শক্তি আছেন; তাঁহাদের নাম— রোচনা, মামকী, তারা, পাণ্ডরা, আর্যতারিকা। ইঁহাদের দু জনের— মামকী ও পাণ্ডরার পূজা দুর্গোৎসবের মধ্যে হইয়া থাকে। বৌদ্ধদের যে পঞ্চরক্ষা আছেন— মহাপ্রতিসরা, মহামায়ূরী, মহাশীতবতী, মহাসাহস্রপ্রমর্দিনী, মহামন্ত্রানুসারিণী— দুর্গোৎসবের মধ্যে ইঁহাদেরও পূজা হইয়া থাকে।

অনেক দেবতার ধ্যান বৌদ্ধদেরও যেরূপ, আমাদেরও সেইরূপ। উদাহরণ— ক্ষেত্রপাল, উদাহরণ— কালী। এই-সকল দেখিয়া মনে হয়, বাংলায় বৌদ্ধতন্ত্র ক্রমে হিন্দুতন্ত্র ভুক্ত হইয়া গিয়াছে, আর যাহা হয় নাই, তাহা লোপ পাইয়াছে।

বৌদ্ধতন্ত্রের পুথিগুলি এইরূপে হিন্দু হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধদের তো দেবতা নাই। সাংখ্যের ন্যায় বৌদ্ধ-দর্শনও দেবতাদিগকে মানুষের চেয়ে অধিক ক্ষমতাশালী জীব বলিয়া মনে করে। তাহারা ইন্দ্র চন্দ্রাদির, এমন-কি ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতিরও পূজা করে না। তবে তাহাদের আর-একরূপ দেবতা আছে : সে বোধিজ্ঞানের পর জন্মায়— ধর্মধাতু হইতে তাহার উৎপত্তি। অথবা তাহারা ধর্মধাতুর বিবর্তমাত্র। তাহাদের নামে প্রায়ই বজ্র শব্দ জোড়া থাকে, যেমন বজ্রবারাহী, বজ্রযোগিনী, বজ্রধাত্বীশ্বরী। ভক্ত আপনাকে সেই দেবতাস্বরূপ মনে করিয়া সাধনা করে।

এই-সকল দেবতা আমরা গ্রহণ করিয়াছি। বৌদ্ধদের ত্রিরত্ন আমরা গ্রহণ করিয়াছি। বুদ্ধদেব আমাদের জগন্নাথ হইয়াছেন, তিনি বিষ্ণুর অবতার। বুদ্ধও বিষ্ণুর অবতার হইয়াছেন। ধর্ম ধর্মঠাকুর হইয়াছেন। বৌদ্ধ ত্রিরত্নের মধ্যে ধর্ম অনেক সময় স্তূপের আকারে পূজা পাইতেন। স্তূপের পাঁচ দিকে পাঁচটি কুলুঙ্গি থাকে। তাহাতে দেখিতে কচ্ছপের মতো হয়। ধর্মঠাকুরও কচ্ছপাকৃতি। যেখানে ধর্মঘরে যোগী ধর্ম-ঠাকুরের পূজারী, সেখানে ধর্মঠাকুর এখনো বৌদ্ধই আছেন : কেন-না, এই যোগী পূজারীরা ব্রাহ্মণ মানেন না। কিন্তু যেখানে অন্য জাতি পূজারী, সেখানে ধর্মঠাকুর হিন্দু হইয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণে তাঁহার পূজা করেন, অন্তত পূজারীরা ব্রাহ্মণ মানেন।

সংঘ আর দেবতা নাই, তিনি শঙ্খ হইয়া গিয়াছেন। শুনিয়াছি, ময়নায় একটা পুকুর খুঁড়িতে ধর্মঠাকুরের একটা মূর্তি এবং একটা শঙ্খ পাওয়া গিয়াছিল। যে-সকল গন্ধবণিক সংঘে গন্ধদ্রব্য বিক্রয় করিতেন, তাঁহারা এখন শঙ্খ আশ্রম হইয়াছেন। আর সংঘ শব্দ এখন আমাদের সাংঘাতের মধ্যে আছেন। যেমন— "সই সাংঘাতিন নাতিন মিতিন।" সংঘ আর দেবতা নাই।

বৌদ্ধ দেবতাগুলি আমরা আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছি বটে, তাহাদের হিন্দু পোশাক পরাইবার যত্ন করিয়াছি বটে, তাহাদের অনেকটা রূপান্তর করিয়া ফেলিয়াছি বটে— কিন্তু তাহাদের বীজ এখনো ঠিক আছে। সেটা বৌদ্ধদেরও যাহা ছিল, আমাদেরও তাহাই আছে। এই বীজ দিয়াই ধরা পড়ে— কে কাহার কাছ হইতে ধার লইয়াছে। আমাদের

তান্ত্রিক দেবতার বীজের আমরা অর্থ করিতে পারি না। কেন এই বীজে এই দেবতা হয়, তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু বৌদ্ধেরা ঠিক পারে। তাহাদের বীজ হইতেই দেবতার চেহারার আদরা আসে। আমাদের আসে না। তাই বোধ হয়, আমরাই ঋণী ও বৌদ্ধেরা মহাজন।

দেখুন না, আমরা যখন "ধ্যায়েন্নিত্যং", "ধ্যেয়ঃ সদা" ইত্যাদি মন্ত্রে শিব বিষ্ণু ইত্যাদি দেবতার ধ্যান করি, তখন আমরা হিন্দু। আর যখন "আত্মানং বিষ্ণুস্বরূপং বিভাব্য" বলিয়া পূজা করি, তখন আমরা বৌদ্ধ। যখন আমরা লিঙ্গমূলে বীজমন্ত্র ধ্যান করি, তাহার পর অনাহতে তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলি, নাভিমূলে তাহাকে স্বর্ণবর্ণ দেখি, হৃদয়ে তাহার হস্ত-পদ বাহির হয়, কণ্ঠদেশে সে স্পষ্ট দেবমূর্তি হয়, আর আজ্ঞাচক্রে মস্তকে সহস্রদল পদ্ম নিম্নাভিমুখ রহিয়াছে, তাহা হইতে নিঃসৃত ক্ষীরধারা ভক্ষণ করি, তখন আমরা খাঁটি বৌদ্ধ। আমরা যখন—

> "অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
> চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥"

বলি, তখন আমরা বৌদ্ধ। আবার যখন আমরা বলি—

> "অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
> তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥"

তখনো আমরা বৌদ্ধ। বুদ্ধ শব্দে প্রথম প্রথম কল্যাণমিত্র বুঝাইত, ক্রমে উহা গুরুতে আসিয়া দাঁড়ায়। লামা শব্দের অর্থ গুরু; বৌদ্ধেরা গুরু ভজনা করে, তাই তাহারা "গুভাজু"। আর আমরা দেবতা ভজনা করি বলিয়া আমরা "দেবভাজু"। আমরা বাঙালি ব্রাহ্মণেরা এখন অর্ধ-হিন্দু, অর্ধ-বৌদ্ধ। যখন আমরা সাবিত্রী দীক্ষা লই, তখন আমরা ব্রাহ্মণ। আর যখন গুরু আমাদের কানে ফুঁ দিয়া যান, আর আমরা গুরুর পায়ে লুটাইয়া পড়ি, তখন আমরা বৌদ্ধ।

আচ্ছা, যে ভাবে তোমরা বাংলায় আসিয়াছিলে, সে ভাব ত্যাগ করিয়া এরূপ আধা-বৌদ্ধ আধা-হিন্দু ভাব লইলে কেন? তাহার কারণ এই যে, আমরা সংখ্যায় কম ছিলাম। পাঁচ জন বৈ তো আসি নাই। বল্লালের সময় ৪০০ ঘর মাত্র হইয়াছিলাম। আমরা রাজার সাহায্য পাইতাম, তা রাজা বৌদ্ধই হউন, আর হিন্দুই হউন।

আমাদের সমাজও ছোটো ছিল ; যাহারা অবৌদ্ধ অথবা ব্রাহ্মণ-পক্ষ ছিল, তাহাদিগের সহিত ব্যবহার করিতাম। আমাদের একটি সমাজ ছিল। তাহার পর মুসলমান যখন দেশ অধিকার করিল, তখন আমরা রাজার সাহায্য হারাইলাম। আমাদিগকে মুসলমানদের অধীন হিন্দু প্রজাদের উপরই কেবল নির্ভর করিতে হইত। সুতরাং আমাদের দল বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হইল। আমাদের সুবিধাও হইল। ভিক্ষুশূন্য বৌদ্ধসমাজ এক রকম বেওয়ারিশ মাল। যে যাহাকে পারে, আপন দলভুক্ত করিতে লাগিল।

এ-সকল ঘটনা বোধ হয়, ১২০০ হইতে ১৪০০ সাল, এই দুই শত বৎসরের মধ্যে হইয়াছিল। যাহারা প্রথম হিন্দুদলভুক্ত হইয়াছিল, তাহারা ভালো ব্যবহার পাইয়াছিল; তাহাদিগকে "নবশাখ" বলে অর্থাৎ নূতন শাখা। তাহার পর কায়স্থগণ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মান-সম্ভ্রম ও সামাজিক মর্যাদা ছিল। ব্রাহ্মণের দলে আসিয়া তাঁহারা সে মর্যাদা হারান নাই। কায়স্থদের কথা একটু বেশি করিয়া বলা ভালো। বাংলায় জমাজমি সম্বন্ধে কায়স্থগণের ক্ষমতা অসীম ছিল। ফরিদপুরের যে চারিখানি তাম্রশাসনকে রাখালবাবু [রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়] জাল বলিয়াছিলেন এবং পার্জিটর সাহেব যেগুলিকে প্রমাণ বলিয়াছিলেন, জাল নয়, সেগুলি খৃ. ৫০০ হইতে ৬০০-এর মধ্যে লেখা।[৫১] তাহাতে দেখা যায়, বৃদ্ধ কায়স্থ ও কায়স্থগণের অনুমতি ভিন্ন কেহ একটুকুও জমি গ্রামের মধ্যে পাইতে পারিত না। তেঙ্গুরে যে-সকল সংস্কৃত পুস্তকের নাম আছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি কায়স্থের রচিত। টঙ্কদাস[৫২] নামে একজন বৃদ্ধ কায়স্থ তন্ত্রের পুথি লিখিয়াছেন। 'চাঙ্গুকারিকা'গুলি কায়স্থ বৌদ্ধ চাঙ্গুদাসের লেখা। 'চাঙ্গুকারিকা'র টীকাকার বলেন, কায়স্থদের ইষ্টদেবতা বুদ্ধ। সুতরাং কায়স্থদিগের মধ্যে অনেকে যে বৌদ্ধ ছিলেন, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। মুসলমান অধিকার হওয়ায় তাঁহাদের ক্ষমতা বাড়িয়াছিল বৈ কমে নাই। কারণ, দেশের জমির হাট-হদ্দ তাঁহারাই জানিতেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে মাঝে মাঝে আছে— "নেড়ে সেটা ...দ্দ করবি যদি কায়েৎ ডেকে আন।" ১৪০০ হইতে ১৬০০ পর্যন্ত দিয়াই ...য়স্থগণই বাংলায় বেশি পরাক্রমশালী হইয়াছিলেন। প্রথম, রাজা

গণেশ, যিনি বাংলার সুলতান হইয়াছিলেন, তিনি উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ ; দিনাজপুরের রাজারা তাঁহারই দৌহিত্রবংশ। তাহার পর চৈতন্য-পরিকরের মধ্যে বাসু ঘোষ ও মাধব ঘোষ খুব প্রবল হইয়াছিলেন।[৫৩] সুবুদ্ধি[৫৪] গৌড়ের মুসলমান বাদশাহের ডান হাত ছিলেন। হিরণ্য ও গোবর্ধন সাতগাঁ দখল করিয়া লইয়া, সেখানকার রাজা হইয়াছিলেন। 'আইন-ই-আকবরী'তে লেখা আছে, কায়স্থরাই জমিদার, তাঁহাদের বিস্তর সৈন্য-সামন্ত ও হাতি ঘোড়া ছিল।

কিন্তু তখনো কায়স্থদিগের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম চলিতেছিল। বেণুগ্রামে মিত্রদিগের বাড়ি তখনো বৌদ্ধধর্মের বই নকল হইতেছিল। তখনো দেশে অনেক ভিক্ষু ছিল এবং যে বই নকল হইতেছিল, তাহা কোনো বিশেষ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বই নয়, একেবারে মহাযানের বই, মহাযানের মর্ম বোধের বই। সে বইখানা ইংরাজি ১৪৩৬ সালে নকল করা হয়। এই সময়ে আরো বৌদ্ধ বই নকল হইয়াছিল, তাহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। কালচক্রযানের অতি শুদ্ধ বাংলা অক্ষরের একখানি বই কেম্ব্রিজে আছে। 'কলাপ-ব্যাকরণে'র টীকা-টিপ্পনী সুদ্ধ বই বৌদ্ধ মঠধারীর জন্য কপি করা হয়। সেখানি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে।

এই-সকল দৃষ্টে বেশ জানা যায় যে, ১৪০০ হইতে ১৫০০ মধ্যে বৌদ্ধধর্ম এ দেশে চলিতেছিল এবং অনেক কায়স্থও বৌদ্ধ ছিলেন। চৈতন্যদেবের জীবনচরিত লইয়া যে-সকল বই লেখা হয়, তাহাতে বৌদ্ধদের বাংলায় থাকার কথা নাই। চৈতন্যদেব নিজে দক্ষিণ দেশে বৌদ্ধ দেখিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ তাঁহাদের হিমালয়ের মধ্যে দেখিয়াছিলেন। কেবল চূড়ামণিদাস বলিয়াছলেন যে, চৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করায় বৌদ্ধেরা খুব আনন্দিত হইয়াছিল।[৫৫] এই-সকল বই যদিও চৈতন্যের জীবনের ঘটনা লইয়া লেখা, তথাপি এগুলি ১৫৫০ হইতে ১৬০০ মধ্যে লেখা হইয়াছিল।

১৫০০ হইতে ১৬০০ মধ্যে নবদ্বীপের ভট্টাচার্যদিগের অভ্যুত্থান। বাসুদেব সার্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, টীকাকার মথুরানাথ, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, গোবিন্দ কবিকঙ্কণাচার্য, শ্রীকর, শ্রীনাথ, রঘুনন্দন— এই সময়েই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং বাংলায় ন্যায় ও স্মৃতির প্রচার

করেন। স্মৃতির প্রচার মানে সমাজ বাঁধা। ইঁহাদের পুস্তকে বৌদ্ধদের নাম বড়ো একটা নাই, কিন্তু ইঁহাদের পূর্ববর্তী স্মৃতিকার শূলপাণি লিখিয়াছেন— বৌদ্ধ দেখিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। বৌদ্ধ যদি দেশে অধিক থাকিত তাহা হইলে এই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত। যে দিকেই হউক, ১৫০০ হইতে ১৬০০ পর্যন্ত এই একশত বৎসরের মধ্যে ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধদের নাম লোপ হয়, আর ব্রাহ্মণেরা সমস্ত দেশটাকে হিন্দু করিয়া তুলেন। এই সময় হইতেই কায়স্থ মহাশয়েরা অবচ্ছেদাবচ্ছেদে হয় শাক্ত অথবা বৈষ্ণব হন অর্থাৎ হিন্দু হন এবং সমাজ শাসনে ব্রাহ্মণদিগের একমাত্র সহায় হন। বারো ভুঁইয়ার মধ্যে যে কয়জন কায়স্থ ছিলেন, সবাই হিন্দু এবং ব্রাহ্মণদিগের কথামতো সমাজ শাসন করিতেন।

পূর্বেই বলিয়াছি, গুপ্ত উপাধিধারী লোকেরাই বৌদ্ধদিগের জন্য স্মৃতির বই লিখিতেন, পূজা আদির বই লিখিতেন, ব্যবস্থার বই লিখিতেন, দীক্ষার বই লিখিতেন। কিন্তু তখন তাঁহাদের উপর ভিক্ষুরা ছিল। ভিক্ষুরা মারা গেলে বা পলাইয়া গেলে তাঁহারাই বৌদ্ধধর্মের কর্তা হইলেন। কিন্তু কিরূপে তাঁহারা আপনাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস এখনো পাওয়া যায় নাই। তবে চৈতন্যদেবের সময় অনেক গুপ্ত ও তাঁহাদের কুটুম্ব বৈদ্যগণ চৈতন্যদেবের ধর্ম আশ্রয় করেন, ঐ ধর্ম সম্বন্ধে বই লেখেন এবং তাহাদের বংশধরেরা এখনো গুরুগিরি করিতেছেন।

১৪০০ হইতে ১৬০০ পর্যন্ত যাঁহারা বৌদ্ধধর্মের মায়া কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই, ধনের গৌরবে, পদমর্যাদার গৌরবে, বিদ্যার গৌরবে বা অন্য কোনো কারণে বৌদ্ধধর্মেই লাগিয়া ছিলেন, নবদ্বীপের ভট্টাচার্য মহাশয়েরা তাঁহাদিগকে অনাচরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। চৈতন্যদেব তাঁহাদের হিন্দু করিলেও, নিত্যানন্দদেব তাঁহাদের মন্ত্র দিলেও তাঁহারা অনাচরণীয় হইয়াই রহিয়াছেন। তাহার পর তাঁহারা ব্রাহ্মণ লইয়াছেন। কবিকঙ্কণ লিখিয়া গিয়াছেন, "বর্ণবিপ্র হয় মঠধারী" অর্থাৎ অনাচরণীয় জাতিগণের যাঁহারা বিপ্র হইয়াছেন, তাঁহারা মঠধারী অর্থাৎ ভিক্ষু। আমরা পূর্বপুরুষদের নিকট শুনিয়াছি যে, এই-সকল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নহেন, ইঁহাদের গলায় পইতা দেওয়া হইয়াছিল মাত্র। তাহার পর রাঢ়ীয়,

বারেন্দ্র, বৈদিক প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা অনেক সময় জীবিকার আশায়, অনেক সময়ে অন্য কারণে বর্ণের ব্রাহ্মণ হইয়াছেন এবং আপনাদের পূর্ব গাঞী-গোত্র উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই-সকল পতিত বলিয়া পরিচিত ব্রাহ্মণদের গোড়া খুঁজিতে গেলে ৯ বা ১০ পুরুষের বেশি পাওয়া যায় না। তাঁহাদের পূর্বে বর্ণের যেসব ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা "মঠধারী"। কিন্তু এই-সকল ব্রাহ্মণকে বাধ্য হইয়া মঠধারীদের সহিত বিবাহাদি করিতে হইত, সুতরাং ইঁহারা এখন এক-একটি স্বতন্ত্র জাতি হইয়া উঠিয়াছেন। বর্ণব্রাহ্মণদের একটু বিশেষত্ব এই যে, এক বর্ণের ব্রাহ্মণ অন্য বর্ণের ব্রাহ্মণকে অনাচরণীয় মনে করেন। তাঁহারা যদি এক হইয়া বসেন, তাহা হইলে আমরা একেবারে মারা যাইব। কারণ, তাঁহাদের সংখ্যা অনেক বেশি। কিন্তু তাঁহারা তাহা করিতে রাজি নহেন। কেন নহেন, তাহার মূলতত্ত্ব একটি প্রধান রিসার্চের কথা। ঐ মূল কথাটি বাহির হইলে সমাজ সংস্কারের যে ঢেউ উঠিয়াছে, উহার অনেক সমাধা হইবে এবং জোরে সংস্কার চলিতে পারিবে।

'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'
প্রথম সংখ্যা, ১৩৩৬ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

২৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬, ৯ জুন ১৯২৯ রবিবার অপরাহ্ণ ৬টায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৩৫তম বর্ষিক অধিবেশনে শাস্ত্রীমশায় সভাপতির অভিভাষণ রূপে এই প্রবন্ধ পড়েন। এই অধিবেশনের কার্যবিবরণে উল্লেখ আছে—

"সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিবার পূর্ব্বে বলিলেন, 'এই পরিষদের সঙ্গে আমার একটা আত্মীয়তাবুদ্ধি বহু দিন হইতে জন্মিয়াছে, কেন, তা বলি। ছেলেবেলায় বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে মিশিয়া অল্প অল্প বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনা করিতে শিখি। তখন কাশীদাস, কৃত্তিবাস অল্প অল্প আলোচনা করিতাম মাত্র। তারপর কালে বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান হই। তখন বাধ্য হইয়া নানা রকম বাঙ্গালা বই পড়িতে হইত। দেখিলাম যে, যাহাকে বাঙ্গালার ইতিহাস বলে, তা একখানিও নাই। রামগতি ন্যায়রত্ন, রমেশচন্দ্র দত্ত, গঙ্গাচরণ সরকার প্রভৃতি অনেকেরই বই দেখিলাম। তাহাতে দেশের প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া যায় না, অনেক কথা সেসব পুস্তকে নাই— অনেক জিনিষ দিবার আছে। সেসব কথা প্রচার করিবার প্রবল ইচ্ছা হইল। এই পরিষৎ প্রতিষ্ঠার পর হইতে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বাঙ্গালা দেশের নানা স্থান হইতে প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এসিয়াটিক সোসাইটির মারফতে আমিও অনেক পুঁথি সংগ্রহ করি। এই সকল পুঁথি আলোচনায় কত যে অমূল্য জিনিষ বাহির হইয়াছে, তাহা আপনারা জানেন। এই পরিষৎই যে, এই বিষয়ে আলোচনার প্রকৃত ক্ষেত্র, তাহা বুঝিয়া আমি ইহার সহিত মিলিত হই, পরিষৎ তাহার ৩৫ বছরের গৌরবের ইতিহাসে সে সকল বিষয়ের আলোচনায় প্রচুর নিদর্শন দিয়াছে। আর আমিও যে ইহার কোন না কোন কাজ করিতে পারিয়াছি— ইহার গঠনে একখানি কাঠও যে যোগান দিতে পারিয়াছি, তাহা আমার পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের কথা। ধর্ম্ম-মঙ্গল জিনিষটা কি? ইহা পূজা বলিয়াই সকলে জানিতেন। এ বিষয়ে Research করিয়া আমার ধারণা হয় যে, এটা বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ— Tail end। এইসব ধারণার মূল হইল, সকল রকম পুঁথির আলোচনা, এ সকল বিষয়ে Research করিতে নেপাল যাই। সেখানে নানা গান, দোঁহা ও পুঁথি পাই। লালগোলার মহারাজের দয়াতে ও পরিষদের চেষ্টায় বৌদ্ধগান ও দোঁহা প্রকাশিত

হইয়াছে। আমি বলেছি, ইহাতে হাজার বছরের বাঙ্গালার নমুনা আছে। কোন কোন সমালোচক বলেন যে, ইহা ১৩/১৪ বছরের পুরাণো। এই বই প্রকাশ করিয়া পরিষৎ দেশের মধ্যে ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় যে যুগান্তর আনিয়াছে, তাহা এখন সর্ব্ববাদিসম্মত। পরিষৎ যে এইরূপ Research পথেই চলিবে, তাহা আমার দৃঢ় ধারণা, আর এই জন্যই পরিষদের সহিত আমার আত্মীয়তা হইয়াছে। আমার এখন শেষ অবস্থা, তার উপর আমি পীড়িত। এই অবস্থাতেও আপনাদের নিতান্ত নির্ব্বন্ধাতিশয্যে আজ কিছু বলিতে হইবে। আজ আপনাদিগকে বঙ্গদেশে হিন্দুধর্ম্ম কিরূপে বৌদ্ধধর্ম্মকে গ্রাস করিল সে সম্বন্ধে আমার ধারণার কথা বলিব।' এই কথা বলিয়া, সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিলেন। তৎপরে তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে অনুরোধ জানাইয়া বলিলেন যে, বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণগণ বাঙ্গালা ও সংস্কৃত— এই উভয় সাহিত্য আলোচনার দ্বারা উভয় সাহিত্যকেই জীবিত রাখিয়াছেন। এই হেতু সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের সহিত এই পরিষদের সংযোগ রাখিতে এবং সম্ভব হইলে উভয় সাহিত্য-পরিষদের amalgamation করিতে চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিলেন।" (সা-প-প, ১৩৩৭, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃ. ৫-৬).

১. এই বইয়ের পৃ. ৪৬ সূত্র ১ দ্র.

২. এই বইয়ের পৃ.৪৯৭ সূত্র ১০ দ্র.

৩. এই বইয়ের পৃ. ৪৭ সূত্র ২ দ্র.

৪. পাচিত্তিয়ো, প্রায়শ্চিত্তীয় ধর্ম। 'বিনয়পিটকে' ভিক্ষুদের পালনীয় ৯২টি প্রায়শ্চিত্তীয় ধর্মের উল্লেখ আছে। মিথ্যা কথা বলা, অশিষ্ট কথা বলা, কোনো ভিক্ষুর নিন্দা করা, মাটি খোঁড়া, গাছ নষ্ট করা, অন্য কোনো পুরুষের অনুপস্থিতিতে কোনো নারীকে ধর্ম উপদেশ দিতে পাঁচ-ছটি কথার বেশি কথা বলা, সংঘের আদেশ ছাড়া কোনো ভিক্ষুনীকে উপদেশ দিতে চাওয়া— এইসব এবং পোশাকপরিচ্ছদ, খাওয়া-শোওয়া ইত্যাদি বিষয়ে নির্দিষ্ট ৯২টি আচরণ বিধি কোনোভাবে লঙ্ঘন করলে সংঘনায়কের সামনে সেই অপরাধ স্বীকার করতে হত।

পারাজিকা, পারাজিক ধর্ম। 'বিনয়পিটকে' ভিক্ষুদের চারটি পারাজিক পাপের উল্লেখ আছে। ১. ব্যভিচার, ২. অদত্ত বস্তু নেওয়া, ৩. হত্যা করা বা কাউকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করা, ৪. অলৌকিক ক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও নিজের অলৌকিক ক্ষমতার কথা বলে বেড়ানো।

এই চারটি পাপের যে কোনো একটিতে অপরাধী ভিক্ষুকে আর সংঘে রাখা হত না।

৫. এই বইয়ের পৃ. ৩১২ সূত্র ২২ দ্র.

৬. এই বইয়ের পৃ. ৫৩৯ সূত্র ২৬ দ্র.

৭. মৎস্যেন্দ্রনাথের রচনা বলে প্রচলিত 'কৌলজ্ঞাননির্ণয়' (রচনাকাল একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ) গ্রন্থে মৎস্যেন্দ্র নিজেকে "কৌল" বলেছেন। অষ্টম শতাব্দী বা তারও আগে থেকে বাংলা দেশে তান্ত্রিকভাবের দুটি ধর্মমত পাশাপাশি চলে এসেছে। একটি বৌদ্ধ সহজ মত, অন্যটি শৈব নাথ মত। নাথ মতে দেহ ব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক। ব্রহ্মাণ্ডের শক্তি দেহে কুলকুণ্ডলিনীরূপে সুপ্ত থাকে। যোগ সাধনায় কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত এবং ক্রম ঊর্ধ্বমুখী করে দেহস্থিত চক্রগুলির ঊর্ধ্বতম সহস্রদল মণ্ডলে প্রতিষ্ঠা করতে পারলে সাধক পরমপদের সন্ধান পান, যোগীকুলের অন্তর্গত হন, কৌল পদ লাভ করেন। নাথ পন্থার সাধনা, দেহভাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডে মিলিয়ে নিয়ে দেহভাণ্ডকে অজরামর নিত্যরূপ দেওয়া। জীবন্মুক্ত হওয়া। "অজরামর পিণ্ডো যো জীবন্মুক্তঃ স এব হি" ('যোগীরাজ, ১৭১)। দেহের নিপাত না হওয়া সত্ত্বেও তিনি কর্মফলের আবদ্ধতা অতিক্রম করে বিরাজ করেন।

বৌদ্ধ এবং শৈব নাথ— দুই ঐতিহ্যেই মৎস্যেন্দ্রনাথের নাম পাওয়া যায়। 'কৌলজ্ঞাননির্ণয়' গ্রন্থের বিবরণ অনুযায়ী মৎস্যেন্দ্রের জন্ম বাংলা দেশে, শাস্ত্র প্রচার করেছিলেন কামরূপে। নাথ ঐতিহ্যে আদি-নাথ শিব, তারপরেই মৎস্যেন্দ্রনাথ। এ'র নামান্তর মীননাথ, মচ্ছঘ্নপাদ, মচ্ছেন্দ্রপাদ ইত্যাদি। প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী শিব পার্বতীকে পরম-জ্ঞানের কথা শোনাচ্ছিলেন, মীননাথ মাছের রূপ ধরে শিবের কথা শুনে পরমজ্ঞান লাভ করেন। অন্য কাহিনীতে এ'র জন্ম মাছের পেট থেকে। 'কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে'র বিবরণে ইনি ব্রাহ্মণ সন্তান, কিন্তু চন্দ্রদ্বীপে (শাস্ত্রী-মশায়ের মতে চন্দ্রদ্বীপ বাখরগঞ্জ জেলায়, প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে নোয়াখালি জেলার সন্দীপ) মাছ মারতেন এবং মাছের পেট থেকে পরমজ্ঞানের পুথি উদ্ধার করেন। চর্যাপদের কবি লুইপাদের নামের "লুই" শব্দটি "রোহিত" শব্দ থেকে উদ্ভূত এই যুক্তিতে প্রবোধচন্দ্র বাগচী এ'কে নাথযোগী মৎস্যেন্দ্রের সঙ্গে অভিন্ন বলেছেন। নেপাল থেকে শাস্ত্রীমশায় লুয়ের ছবি (হ-র-সং-২ দ্র.) এনেছিলেন, ছবিতে আঁকা আছে লুই মাছের আঁত খাচ্ছেন। প্রসঙ্গটি 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসেও বর্ণিত আছে।

তবে সিদ্ধাচার্যরা লুই এবং মৎস্যেন্দ্রকে পৃথক ব্যক্তি মনে করতেন। 'চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয়' টীকায় "তথা চ পরদর্শনে মীননাথঃ" বলে মীননাথের অর্থাৎ মৎস্যেন্দ্রের দোহা উদ্ধৃত করা হয়েছে।

নাথ ঐতিহ্যে গোরক্ষনাথ মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য। কদলী রাজ্যে নারী বশীভূত আত্মবিস্মৃত মৎস্যেন্দ্রকে গোরক্ষ উদ্ধার করেন। এঁর শিষ্যা রাজা গোপীচন্দ্রের মা ময়নামতী। গোরক্ষের কাছে পাওয়া জ্ঞানবলে ছেলের স্বল্পায়ুর কথা জেনে ময়নামতী গোপীচন্দ্রকে সন্ন্যাস নিতে বাধ্য করেন। সেই জনপ্রিয় কাহিনী নিয়ে পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর-ভারতে কাব্য নাটক রচনার ধারা চলে এসেছে। উত্তর এবং পশ্চিম-ভারতে গোরক্ষনাথের প্রভাব ব্যাপক, তাঁকে নিয়ে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। এসব কাহিনী থেকে তাঁর নির্ভরযোগ্য কোনো ব্যক্তি পরিচয় দাঁড় করানো অবশ্য সম্ভব নয়। দ্র. P. C. Bagchi ed. *Kaulajñana-nirṇaya and some minor texts of the school of Matsyendranāth*, Calcutta Sanskrit Series, Calcutta 1934 ; Sukumar Sen, "The Nāth Cult", *C-H-I*, Vol. IV, pp. 280-90 ; *O-R-C*, pp. 442-52 ; কল্যাণী মল্লিক, 'নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস, দর্শন ও সাধনপ্রণালী', কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫০ খৃ.।

৮. এই বইয়ের পৃ. ৪৮১ সূত্র ১ দ্র.

৯. এই বইয়ের পৃ. ৬৩ সূত্র ৭ দ্র.

১০. এই বইয়ের পৃ. ৭২ সূত্র ১৩ দ্র.

১১. অমরসিংহ সংকলিত শব্দকোষ 'নামলিঙ্গানুশাসন' 'অমরকোষ' নামেই প্রসিদ্ধ। বিক্রমাদিত্যের রাজসভার নবরত্নের অন্যতম অমরসিংহের জীবনকাল সঠিকভাবে জানা যায় নি। অনুমান করা হয়, তিনি ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যে কোনো সময়ে বর্তমান ছিলেন। অমরসিংহ সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায়ের মন্তব্য—

"Wilkins found an inscription at Bodh Gayā of Amara-deva dated 581 A.D. But the inscription has been lost, and it is doubtful whether the Amara-Siṃha and the Amara-deva are one and the same person. Amara's work is entitled *Nāma-liṅgānu-Śāsana.* It has three kāṇḍas divided into twenty-

four vargas containing altogether 1503 verses unequally distributed. In the preamble it gives the pari-bhāṣās of the dictionary. Each group of synonyms is either preceded by 'atha' or followed by 'tu'. The homonymous portion is arranged after the final consonants. Avyayas form a separate varga. The book ends with certain general rules for determining genders, so it is a complete koṣa giving all the three phases, homonyms, synonyms and genders. There are altogether 1503 verses in the work (Madras III, p. 1129).

"Lassen says that it was translated into Chinese prior to the 6th century A.D. The earliest quotations from this work is to be found in *Nayāsa* of Jinendravuddhi, which has been placed by its editor between 725 and 750 A. D. Amara seems to have cast all previous koṣas into shade and they have gone out of currency." (*Shastri-Cat.*, Vol. VI, p. cxxiv).

১২. 'ছন্দসূত্র' নামে সংস্কৃত ছন্দ-শাস্ত্রের লেখক পিঙ্গল বা পিঙ্গলনাগ। এ'র ব্যক্তি-পরিচয় জানা যায় নি। প্রচলিত কাহিনীতে পাণিনির ছোটো ভাই বলে উল্লেখ পাওয়া যায়, আবার পতঞ্জলি এবং পিঙ্গলকে একই ব্যক্তি বলা হয়েছে। ভিন্‌ট্যর্‌নিট্‌স মনে করেন পিঙ্গল পতঞ্জলির কাছাকাছি সময়ের মানুষ এবং সম্ভবত ১৫০ খৃস্টপূর্বাব্দে বর্তমান ছিলেন। শাস্ত্রীমশায় মনে করেন, পিঙ্গলের সময় চতুর্থ খৃস্টপূর্বাব্দের দ্বিতীয় অর্ধ।

"The age of Piṅgala was never properly investigated. But the tradition embodied in the *Kāvyamīmāṃsā* by Rāja-śekhara in the begining of the 10th century, places him immediately after Paṇini, and both of them were tested at Pāṭali-putra, and Piṅgala -nāga was in his old age, the preceptor of Vindusāra's sons. So he must have flourished in the 2nd half of the 4th century B.C. As Paṇini has embodied in his great grammar both chāndasa language and

bhāṣā, so Piṅgala has also embodied in his great prosody, both Vedic and laukika. As Paṇini was preceded by several grammarians, who wrote on bhāṣā, some of whom he names ; so Piṅgala was preceded by several writers on laukika chandaḥ, of whom he names at least four, e.g., Saitava, (See. ch. VII, Sūtra 10.) Rāta and Māṇḍavya, (ch. VII, Sūtra 34) and Kāśyapa (ch. VII, Sūtra 9)." (*Shastri-Cat.*, Vol. VI, p. clv.) দ্র. *H-I-L*, pp. 37-39.

১৩. ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের 'কাব্যালংকার' গ্রন্থের লেখক ভামহ। এঁর ব্যক্তি-পরিচয় কিছুই জানা যায় না। 'কাব্যালংকার' ৬ অধ্যায়ে বিভক্ত ৩৯৮টি শ্লোকে সম্পূর্ণ। ভামহ সম্ভবত খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষ এবং অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে বর্তমান ছিলেন। 'কাব্যালংকারে'র বস্তু এবং আলোচনা পদ্ধতি বিচার করতে গিয়ে অনেকে ভামহকে বৌদ্ধ মনে করেছেন। যেমন সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেন, "ভামহ বৌদ্ধ ছিলেন এবং তিনি দিঙ্‌নাগের 'কল্পনাপোঢ়ম্' অর্থাৎ যাহা কল্পনাবিরহিত তাহাকেই প্রত্যক্ষ বলা যায়, দিঙ্‌নাগের এই প্রত্যক্ষ লক্ষণ গ্রহণ করিয়াছেন।" ('কাব্য-বিচার' পৃ. ১৯)। এই মত সকলে মানেন না। কে. পি. ত্রিবেদী সম্পাদিত বিদ্যানাথের 'প্রতাপ-রুদ্রযশোভূষণ' গ্রন্থের অষ্টম পরিশিষ্টে 'কাব্যালংকার' প্রথম প্রকাশিত হয় (Bombay Sanskrit Series-65, 1909)।

১৪. এই বইয়ের পৃ. ২৫৮ সূত্র ১৭ দ্র.

১৫. এই বইয়ের পৃ. ১১১ সূত্র ১৭ দ্র.

১৬. "Cāngu-dāsa was a Kāyastha and he was a Bauddha. He commences his work with an obeisance to Sugata and to Mañju-śrī. His Kārikās are entitled *Vaiyākaraṇa-jīvātu.* The number of Kārikās is sixty. They deal with the Paribhāṣās and the philolsophy of grammar. This is often called *Cāngu-vṛtti* and even *Cāng-sūtra.* The commentator on these sūtras in 4414 (Copied in Puruṣottama Kṣetra by Vaiṣṇava

Raghu-dāsa) says, 'why has Cāngu-dāsa made his obeisance to Sugata, leaving aside (the real) God Viṣṇu' ? The fact is that every one makes obeisance to his *Iṣṭa-devatā* just as Pitrāṃkuru says, 'I make obeisance to Buddha. All Brāhmaṇas are followers of Viṣṇu, all Kāyasthas are follwers of Sugata, all merchants are the followers of the Sun, Sūdras and others follow Śiva'. On the authority of *Tri-kāṇḍa-śeṣa*, a lexicon by a Buddhist, the commentator says that Mañju-Śri is Sugata. He also says that, the Pāramitā is measured in 16000 ślokas of 32 syllables each. Cāngu-dāsa says that Mañju-Śrī suppressed four enemies called Māras .and the commentator explains the four Māras as Deva-māra, Rāja-mara, Vraja-māra and Manuṣya-māra. The anonymous commentary is entitled *Sūtrāṇvarthinī*." (*Shastri-Cat*, Vol. VI, pp. lxxv-xxvi).

১৭. সুলতান সামসুদ্দিনের স্বৈরাচারে বিক্ষুব্ধ রাজপুরুষেরা তাঁকে সিংহাসনচ্যুত ও হত্যা করে হুসেন শাহ্‌কে সিংহাসনে বসান। হুসেন শাহ্‌র রাজত্বকাল ১৪৯৩-১৫১৯ খৃ.।

১৮. "One of the Rājās of Cooch Bihar in the latter half of the 16th century requested their court-paṇḍita Puruṣottama-vidyā-vāgīśa of Khāgḍā-bāḍi in Cooch Bihar to write a grammar. The paṇḍita wrote a number of kārikās and to explain these he wrote a grammatical work entitled *Prayoga-ratnamālā*, in the year 1568 A.D. ...

"Purusottama was proficient in Pāṇini and *Kātantra* and he has tried to blend together the nomenclature of both these systems. He includes Kṣ in the Sanskrit alphabet and says he has done so only for mantras, that is, because the tāntrikas accepted the Kṣ as the last letter of the alphabet.

He also says that he included that letter to show that he was not a slavish imitator of Pāṇini. In the same breath he says that the letters from A to Au may be called either Svara (*Kalāpa*) or Ac (Pāṇini). Puruṣottama's grammar is not an elementary grammar, but a grammarian's grammar. It deals with many grammatical puzzles.

"In the main, Puruṣottama has used the nomenclature of *Kātantra* and has taken examples from that grammar. In his time, the grammar of Candra used to be studied in Bengal. On several occasions he has quoted Candra. ...

"Another grammarian whom he quotes occasionally is Subhūti.* Puruṣottama is fond of quoting from Buddhist works ; he quotes *Tri-kāṇḍa-śeṣa* ; he mentions Mañju-Śri. He points out non-grammatical expressions from Buddhist works. 'सो बुद्धः पातु युष्मान् व्यवगतकलुषो लोकनाथो मुनीन्द्रः ।' Para 134. He names his chapters as Vinyāsas or dispositions.

"The grammar is studied in Cooch Bihar, Jalpaiguri, Gaurīpura, Hākāmā, Salkacha Lakṣmīpura, Bijni, Habarā-ghāt, Kāmrūpa, Assam, Pāṅgū and other places." (*Shastri-Cat*, Vol. VI, pp. xciii-civ).

১৯. এই বইয়ের সূত্র পৃ. ১১৫ সূত্র ১৮ দ্র.

২০. "In the 14th century of the Christian era, Mithilā was ruled by a Brahmin dynasty founded by Nānyadeva at the beginning of the 12th century after the fall of the Karṇāṭaki kingdom. They wanted a grammar of their own as they had smṛtis and nāya works of their own. So Padma-nābha wrote the *Supadma vyākaraṇa* with the object of giving a clear and full (स्फुटं, पूर्णं) idea of Sanskrit grammar to ordinary students, but at the same time, leading them to

Pāṇini school, if they wanted to be experts in grammar. Padma-nābha gives his own date in his work entitled *Pṛṣodarādi-vṛtti* (H. P. R., I, 228) as 1297 of the Śaka era equal to 1373 [1375 ?] A.D. Padma-nābha himself, besides the *Supadma-vyākaraṇa*, its Pañjika and Pryoga-dīpikā, wrote many other works as *Uṇādi-vṛtti* ; *Dhātu-candrikā* (or *Kaumudi*) ; *Yaṁluk-vṛtti* ; *Paribhāṣā-vṛtti* ; a poem named *Gopāla-carita* ; a commentary on *Ānanda-Laharī* ; on Māgha ; *Chando-ratna*, a work on prosody ; a work on smṛti named *Ācāra-candrikā* and a lexicon named *Bhūri-prayoga*. (H. P. R., I, 223 and I. O. Catalogue 890).

... ...

"Padma-nābha was an inhabitant of Bhora-grāma, a few miles from Dārbanga. Padma-nābha's work, however, is not much studied in Mithilā. Its study is confined to the districts of Jessore and Khulna, and the towns of Naihaṭi and Bhātpārā." (*Shastr-Cat.*, Vol. VI, lxxxviii-lxxxix).

২১. এই বইয়ের পৃ. ২৭৪ সূত্র ২ দ্র.

২২. ডেস্‌ক্রিপ্‌টিভ ক্যাটালগের ভূমিকায় 'বিশ্বপ্রকাশ' অভিধান সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য—

"The author seems to have belonged to Eastern India where va and ba are similarly pronounced and where little distinction is made in the pronunciation of the three sibilants śa, ṣa and sa. This is not the case in middle India and in other parts of India. The author has a supplement to his *Viśva-prakāśa* named *Śabda-bheda-prakāśa* which among others have two sections Vakāra-bheda and Uṣma-bheda. Maheśvara admits the compound lettter kṣa in the Sanskrit alphabet. This is rarely done by brahmins.

The dictionary has a commentary called *Viśva-nighaṇṭu* by Parameśvara Bhaṭṭa, but MSS. of the commentary come from Southern India. (*Shastri-Cat.*, Vol. VI, p. Cxxxiv).

এই লেখক 'সাহসাঙ্কচরিত' নামে একটি কাব্যও রচনা করেছিলেন।

২৩. এই বইয়ের পৃ. ১১০ সূত্র ১৪ দ্র.

২৪. এই বইয়ে "বৃহস্পতি রায়মুকুট" প্রবন্ধ দ্র.

২৫. এই বইয়ে "রত্নাকর শান্তি" প্রবন্ধ দ্র.

২৬. ন্যায়সূত্রের ভাষ্য যা আমাদের হাতে এসেছে তার মধ্যে প্রাচীনতম বাৎস্যায়নের 'ন্যায়ভাষ্য'। এই বাৎস্যায়ন এবং 'কামসূত্র'-কার বাৎস্যায়ন ভিন্ন ব্যক্তি। 'ন্যায়ভাষ্য'-কার বাৎস্যায়নের নামান্তর দ্রামিল, অর্থাৎ দ্রাবিড়। পদবি পক্ষিলস্বামী। নাম এবং পদবি থেকে মনে করা হয় ইনি দাক্ষিণাত্যের মানুষ এবং সম্ভবত খৃস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। দ্র. *H-I-Lc*, pp. 115-23.

২৭. অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ নৈয়ায়িক ধর্মকীর্তির বাবা কোরুনন্দ একজন ব্রাহ্মণ তীর্থিক পরিব্রাজক ছিলেন। ধর্মকীর্তির জন্ম দক্ষিণ ভারতের চূড়ামণি রাজ্যে, নামান্তর ত্রিমালয় রাজ্য। ঈ-ৎসিঙ ৬৭৩-৯৫ খৃস্টাব্দে ভারতে ছিলেন, তিনি ধর্মকীর্তির মনীষার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। ধর্মকীর্তি ধর্মপালের কাছে পড়েছিলেন— এই ধর্মপাল ৬৩৫ খৃস্টাব্দে বর্তমান ছিলেন। সুতরাং ধর্মকীর্তির সময় সপ্তম শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকে শেষ অবধি ধরা যায়। বালক বয়সে তিনি অসাধারণ মেধার পরিচয় দেন। ক্রমে বেদ, বেদাঙ্গ, ব্যাকরণ, আয়ুর্বেদ এবং সব কটি তীর্থিক দর্শনে পারঙ্গম হয়ে ওঠেন। ক্রমে তাঁর মনে হয় বুদ্ধের শিক্ষা ত্রুটিহীন এবং বৌদ্ধ উপাসকের বেশ ধারণ করে জাতিচ্যুত হন। ফলে তিনি জন্মভূমি ত্যাগ করে মধ্যদেশে (তিব্বতি সাহিত্যে মধ্যদেশ হল মগধ, কিন্তু মনু বলেন—উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত, পুবে প্রয়াগ ও পশ্চিমে সরস্বতী নদী— এর মাঝখানের অঞ্চল মধ্যদেশ। 'মনুসংহিতা' ২.২১) চলে আসেন। এখানে ধর্মপালের কাছে পড়ে 'ত্রিপিটক' আয়ত্ত করেন। ধর্মকীর্তির সঙ্গে বিতর্কে ব্রাহ্মণ, নির্গ্রন্থ (জৈন) এবং তীর্থিকদের পরাজয়ের বিস্তারিত বিবরণ প্রসঙ্গে তারনাথ বলেছেন, কুমারিল ছিলেন তাঁর মামা

এবং কুমারিলের অনুগামীদেরও তিনি পরাস্ত করেছিলেন। কোনো ভারতীয় ঐতিহ্যে অবশ্য কুমারিল-ধর্মকীর্তির বিবরণের সমর্থন পাওয়া যায় না। দিঙ্‌নাগের পরে ধর্মকীর্তি বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রে বড়ো প্রতিভা। তাঁর রচনার মাধ্য 'প্রমাণবার্তিক-কারিকা', 'প্রমাণবার্তিক-বৃত্তি', 'প্রমাণ বিনিশ্চয়', 'ন্যায়বিন্দু' বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্র. *Tāranāth*, chap 26 ; *H-I-Lc*, pp. 303-19.

২৮. হিউয়েন্-ৎসাঙ উল্লেখ করেছেন, তাঁর গুরু নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ শীলভদ্র সমতটের ব্রাহ্মণ রাজবংশের সন্তান। সমতটের এই রাজবংশ রাত রাজবংশ হওয়া সম্ভব। শশাঙ্কর (রাজত্বকাল আ. ৬০০-২৫ খৃ.) সমকালীন এই রাত রাজাদের রাজধানী ছিল কুমিল্লার কাছে ময়নামতী পাহাড়ের দক্ষিণে চণ্ডীমুড়ার দেবপর্বতে। রাত রাজবংশ বৌদ্ধ ছিল না, শীলভদ্র পরে বৌদ্ধ হন। বৌদ্ধ হবার আগেই শীলভদ্র 'অথর্ববেদ', সাংখ্য, হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। নালন্দার অধ্যক্ষ ধর্মপালের কাছে তিনি বৌদ্ধবিদ্যা অধ্যয়ন করেন এবং বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন। যৌবনেই তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। ধর্মপাল অবসর নিলে শীলভদ্র নালন্দার অধ্যক্ষ হন। নালন্দার সবচেয়ে গৌরবের সময়ে শীলভদ্র অধ্যক্ষ ছিলেন। এই সময়ে মহাবিহারের ছাত্র সংখ্যা ছিল দশ হাজার। হিউয়েন্-ৎসাঙ শীলভদ্রের কাছে যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। হিউয়েন্-ৎসাঙ বলেছেন, সেই সময়ে নালন্দায় এক হাজার শ্রমণ সূত্র ও শাস্ত্রের ২০টি সংগ্রহের ব্যাখ্যা করতে পারতেন, পাঁচ শো জন ৩০টি সংগ্রহের ব্যাখ্যা করতে পারতেন, ৫০টি সংগ্রহের ব্যাখ্যা করতে পারতেন দশ জন, একমাত্র শীলভদ্রই সমগ্র সংগ্রহ ব্যাখ্যায় সক্ষম ছিলেন। মহাবিহারে সকলে শীলভদ্রকে সদ্ধর্মনিধি বলে সম্বোধন করতেন। তেঙ্গুর সংগ্রহে শীলভদ্রের রচনাবলীর মধ্যে 'আর্যভূমি-ব্যাখ্যান' নামে একখানি মাত্র গ্রন্থের অনুবাদ পাওয়া যায়। দ্র. দীনেশচন্দ্র সরকার, 'শিলালেখ-তাম্রশাসনাদির প্রসঙ্গ', কলকাতা ১৯৮২, পৃ. ৭০।

২৯. মৈথিলি ব্রাহ্মণ নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় খৃস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন মনে করা হয়। তাঁর 'তত্ত্বচিন্তামণি' গ্রন্থকে 'প্রমাণচিন্তামণি' বলেও উল্লেখ করা হয়ে থাকে। হিন্দু ন্যায়ে আধুনিক যুগের সূচনা 'তত্ত্বচিন্তামণি' গ্রন্থে। দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত 'তত্ত্বচিন্তামণি' মিথিলার পণ্ডিতদের গভীর অনুশীলনের বিষয় ছিল, পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাসুদেব সার্বভৌম বাংলা দেশে

এই গ্রন্থের চর্চা প্রবর্তন করেন। ১৫০৩ খৃস্টাব্দে নবদ্বীপ বিদ্যাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠার পর থেকে রঘুনাথ শিরোমণি এবং অন্যান্য পণ্ডিতদের চেষ্টায় বাংলা দেশে গ্রন্থখানির অনুশীলন ব্যাপক হয়ে ওঠে। ক্রমে মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, কাশ্মীর প্রভৃতি প্রদেশের পণ্ডিত সমাজে 'তত্ত্বচিন্তামণি' গৃহীত হয়। বিগত ৫০০ বছরের সংস্কৃতবিদ্যার প্রতিটি শাখায় এই গ্রন্থের প্রভাব পড়েছে। 'তত্ত্বচিন্তামণি'র চারটি খণ্ডের নাম প্রত্যক্ষ-খণ্ড, অনুমান-খণ্ড, উপমান-খণ্ড এবং শব্দ-খণ্ড। গ্রন্থটির মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় ৩০০। দ্র. *H-I-Lc*, pp. 405-53.

৩০. প্রচলিত মতে শংকরাচার্যের গুরু গোবিন্দ, গোবিন্দর গুরু গোড়পাদ। অদ্বৈতবাদী গোড়পাদ অষ্টম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন অনুমান করা হয়। ২১৫টি কারিকায় সম্পূর্ণ, চারটি প্রকরণে বিভক্ত গোড়পাদের 'মাণ্ডুক্যকারিকা' গ্রন্থে প্রথম অদ্বৈতবাদের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়।

৩১. শাস্ত্রীমশায়ের সম্পাদনায় বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা সিরিজে প্রকাশিত *The Six Buddhist Nyāya Tracts in Sanskrit* (১৯১০ খৃ.)। ছয়খানি বই: রত্নকীর্তি রচিত 'অপোহসিদ্ধি, 'ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি', 'ক্ষণভঙ্গসিদ্ধি'; পণ্ডিত অশোক রচিত 'অব্যয়বিনিরাকরণ', 'সামান্য-দূষণদিক্-প্রসারিতা'; রত্নাকর শান্তি রচিত 'অন্তর্ব্যাপ্তিসমর্থন'।

৩২. অনুবাদ: ভারতবর্ষে যাও, চারিদিকে অধিকার বিস্তার করতে। যতক্ষণ না তোমার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় ততক্ষণ আমার সঙ্গে তোমার মিলন নেই।

৩৩. ইসলামে ধর্মীয়-রাষ্ট্রের প্রধানকে খলিফা বলা হয়। মহম্মদের তিরো-ভাবের (৬৩২ খৃ.) পর আবুবকর খলিফা হন। এর পরে ক্রমে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। ৬৬১-৭৪৯ খৃস্টাব্দ ওম্যায়া বা উম্মেদিয়া খলিফাদের আধিপত্যের কাল। মুয়াবিয়া, এজিদ প্রভৃতি বিচক্ষণ শাসক ওম্যায়া বংশের কর্তৃত্ব অপ্রতিহত করে তুলেছিলেন। এই বংশের পতনে কর্তৃত্বে আসেন আব্বাসীয় বংশ, আব্বাসীয় শাসনের সূত্রপাত মহম্মদের পিতৃব্য আব্বাসের বংশধর আবদুল্লা আস্সাফ্ফা থেকে। এই বংশের রাজত্বকাল ৭৪৯-১২৫৮ খৃ.।

৩৪. বরাহমিহির খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতকের মানুষ, তাঁর জন্ম-মৃত্যু তারিখ নিশ্চিত-ভাবে জানা যায় না। জন্ম আনুমানিক ৫০৫ খৃস্টাব্দে। মৃত্যু ৫৭৮,

মতান্তরে ৫৮৭ খৃস্টাব্দে। তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা 'বৃহৎসংহিতা' ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম অর্ধেই রচিত হয়েছিল। অন্যান্য রচনা 'বৃহদ্বিবাহপটল', 'স্বল্প-বিবাহপটল', 'যোগযাত্রা', 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা', 'বৃহজ্জাতক' এবং 'লঘু-জাতক'। কিংবদন্তি অনুসারে তিনি অবন্তীর অধিবাসী এবং বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্যতম।

৩৫. উৎপল ভট্ট, ভট্টোৎপল খৃস্টীয় দশম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তিনি বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতা'র টীকা রচনা করেন। এই টীকায় প্রাচীনতর জ্যোতির্বিদ্‌দের মত উদ্ধৃত আছে। উৎপল একখানি 'হোরাশাস্ত্র' (কোষ্ঠী রচনা বিষয়ক শাস্ত্র) রচনা করেছিলেন।

৩৬. শাস্ত্রীমশায়ের ধারণা ছিল বাঙালি বেদ ব্যাখাতাদের মধ্যে নুগড়াচার্যই প্রথম। তাঁর এই ধারণার ভিত্তি তেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ সম্পাদিত হলায়ুধের 'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব' গ্রন্থের এই উল্লেখ, "কিং তস্মিন্নুগড়েন বর্ত্ম রচিতম্"। "Literary History of the Pala Period" প্রবন্ধে শাস্ত্রীমশায় লেখেন—"It is not known when this commentary was written, but the author's name is Naguḍa. He had a large body of followers and some commentaries written by his followers have come down to the present day. These commentators refer to him as their authority. This is the earliest commentary on the Vedas yet known. Sāyaṇa is at least three hundred years posterior to Naguḍa. The descendants of the first settlers, who lived in Western Bengal, all professed the *Sāmaveda*, and performed their religious ceremonies according to the Sūtras of that Veda ; and they early felt the necessity of a commentary of that Sūtra. Such a commentary was written by Nārāyaṇa, contemporary of Devapāla. This commentary settled the liturgy of Sāmavedin Brāhmaṇas. Later on, Bhavadeva, a contemporary of Hari Varmā, a king of the coast countries of Bengal and Orissa, wrote a number of works for the same purpose. Halāyudha and Paśupati, contemporaries of Lakṣmaṇa Sena, settled the liturgy of the professors

of the White *Yajurveda*." (*J-B-O-R-S*, Vol. V, part II, p. 173). নগুড়াচার্য/নুগড়াচার্য বিষয়ে শাস্ত্রীমশায়ের এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে দুর্গামোহন ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন, "কিন্তু শ্লোকের এই অংশ বিভিন্ন পুথিতে বিভিন্নরূপে লিখিত দেখা যায়। মনে হয়, উহার প্রকৃত পাঠ হইবে, 'কিংতাস্মিন্নুবটেন বত্ম' রচিতম্'। বারানসী হইতে প্রকাশিত 'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে' এই পাঠ গৃহীত হইয়াছে। ইণ্ডিয়া অফিস্ লাইব্রেরীর পুথিতেও এইরূপ পাঠ আছে। উবট-রচিত যজুর্ব্বেদভাষ্য সুপ্রসিদ্ধ। হলায়ুধ যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে বসিয়া পূর্ব্বাচার্য্যরূপে উবটের নামোল্লেখ করিয়াছেন, ইহাই সম্ভব। উবট তাঁহার ভাষ্যের শেষে আত্ম-পরিচয়ে বলিয়াছেন,—ভোজের রাজত্বকালে অবন্তিতে বসিয়া তিনি 'মন্ত্র-ভাষ্য' রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং বঙ্গের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই।" ("প্রাচীন বঙ্গে বেদ-চর্চ্চা", 'হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা', দ্বিতীয় খণ্ড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ১৩৩৯ ব., পৃ. ২১৮-১৯)।

৩৭. ভবদেব ভট্ট একাদশ শতাব্দীর শেষ এবং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন মনে করা হয়। তিনি হরিবর্মদেবের সান্ধিবিগ্রাহক মন্ত্রী ছিলেন এবং সম্ভবত হরিবর্মার ছেলের রাজত্বকালে তাঁর উপদেষ্টা ছিলেন। সমকালীন বাংলা দেশে পাণ্ডিত্যে, রাজনৈতিক বিচক্ষণতায় ভবদেব অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন। বৌদ্ধবিদ্বেষী ভবদেব ব্রহ্ম-বিদ্যাবিদ্; মীমাংসাশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্বেদ, অস্ত্রবেদ, সিদ্ধান্ত, তন্ত্র, গণিত, জ্যোতিষ ও জ্যোতির্বিদ্যায় "কৃতধীরদ্বিতীয়"। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রচনার উল্লেখ থাকলেও সব বই পাওয়া যায় নি। পাওয়া গেছে কুমারিল ভট্টের অনুসরণে জৈমিনির পূর্ব-মীমাংসার ব্যাখ্যা 'তৌতাতিত-মততিলকে'র খণ্ডিত পুথি এবং 'প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ' ও 'ছান্দোগ্য-কর্মানুষ্ঠান' বা 'দশকর্মপদ্ধতি'। দ্র. হ-র-সং-১, পৃ. ৩৯৫-৯৭।

৩৮. নারায়ণের পূর্বপুরুষেরা উত্তর-রাঢ়ের অধিবাসী ছিলেন। ইনি 'ছান্দোগ্য-পরিশিষ্ট প্রকাশ' নামে কাত্যায়নের 'ছান্দোগ্যপরিশিষ্টে'র টীকা রচনা করেন।

৩৯. হলায়ুধ লক্ষ্মণসেনের (আ. ১১৭৯/৮০-১২০৬ খৃ.) ধর্মাধ্যক্ষ বা বিচারপতি ছিলেন। বাবার নাম ধনঞ্জয়, মা উজ্জ্বলা। হলায়ুধের প্রসিদ্ধ রচনা 'ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব'। এই গ্রন্থে তিনি বাজসনেয় 'যজুর্ব্বেদে'র কান্বশাখী ব্রাহ্মণদের গার্হস্থ্যকর্মের উপযোগী ৩০০র বেশি মন্ত্র ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রন্থের সূচিতে দাঁতমাজা থেকে অন্ত্যেষ্টি পর্যন্ত ৪০টি অনুষ্ঠানের উল্লেখ

আছে। হলায়ুধ তাঁর সময়ে বেদচর্চায় শিথিলতার নিন্দা করেছেন। বলেছেন, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্ররা বেদ মুখস্থ করেন না, কেবল যজ্ঞের উপযোগী মন্ত্রের অর্থ শেখেন। এই সমালোচনা থেকে অনুমান করা হয়, লক্ষ্মণসেনের সময়ে বাংলায় বেদচর্চা কমে এসেছিল। হলায়ুধ 'ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্বে', 'মীমাংসাসর্ব্বস্ব', 'বৈষ্ণবসর্ব্বস্ব', 'শৈবসর্ব্বস্ব' ও 'পণ্ডিতসর্ব্বস্ব' নামে তাঁর আর চারখানি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন।

হলায়ুধের লেখায় তাঁর বড়ো ভাই পশুপতির 'শ্রাদ্ধকৃত্য-পদ্ধতি' ও 'পাকযজ্ঞ-পদ্ধতি' নামে দুখানি গ্রন্থের নাম জানা যায়। দ্র. 'হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা' দ্বিতীয় খণ্ড, ১৩৩৯ ব., পৃ. ২২৪-২৫।

৪০. এই বইয়ের পৃ. ১০৯ সূত্র ১২ দ্র.

৪১. ইখ্‌তিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন্‌ বখ্‌তিয়ার খল্‌জি তুর্কি বাহিনীর সেনানায়ক ছিলেন। মিন্‌হাজুদ্দিনের বিবরণ অনুযায়ী বখ্‌তিয়ার আনুমানিক ১১৯৩ খৃস্টাব্দে বিহার অধিকার করেন। তারপরে আকস্মিক আক্রমণে "নওদীয়া বা নবদ্বীপ" জয় করে নেন, লক্ষ্মণসেন পুব-বাংলায় পালিয়ে যান। নওদীয়া শহর ধ্বংস করে দিয়ে বখ্‌তিয়ার গৌড়ে অধিষ্ঠিত হন। আনুমানিক ১২০৫ খৃস্টাব্দের শীতের শেষে তিনি কামরূপ (আসাম) এবং তিব্বতে অভিযান করেন। দুরূহ এই অভিযানে বাগমতী বা তিস্তা নদী পেরিয়ে তাঁকে প্রবল আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়। পিছিয়ে আসবার সময়ে নদী পার হতে গিয়ে অনাহারে পর্যুদস্ত সৈন্য এবং ঘোড়ার বেশির ভাগ স্রোতে ভেসে যায়। বিপুল শক্তি-ক্ষয়ে বিপর্যস্ত বখ্‌তিয়ারের প্রতিপত্তি শিথিল হয়ে গেল। অসুস্থ বখ্‌তিয়ারকে আলি মর্দান খল্‌জি ১২০৬ খৃস্টাব্দে হত্যা করেন।

বখ্‌তিয়ার মুহম্মদ ঘুরির নামে টঙ্কা— সোনার টাকা চালু করেন। এই মুদ্রায় তাঁর গৌড় অধিকারের তারিখ আছে ১৯ রমজান ৬০১ হিজরি। খৃস্টাব্দের হিসাবে দাঁড়ায় ১০ মে ১২০৫। দ্র. *H-B*-II, pp. 9-11 ; দীনেশচন্দ্র সরকার, 'পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত', কলকাতা ১৯৮২, পৃ. ১৩০-৩৩ ; Nalinikanta Bhattasali, "Muhammad Bakhtyar's Expedition to Tibet", *Mahamahopadhya Haraprasad Sastri Memorial* Vol. *I-H-Q*, 1933.

৪২. তিব্বত অভিযানের সময়ে বখ্‌তিয়ার রাজ্যের পুব সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব দিয়ে আলি মর্দানকে ঘোড়াঘাটে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ১২০৬

খৃস্টাব্দে বখ্‌তিয়ার আলি মর্দানের হাতে নিহত হলে খল্‌জি জায়গিরদারদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু হয়। আনুমানিক ১২০৭ খৃস্টাব্দে মুহম্মদ শিরহান আলিকে বন্দি করেন। আলি পালিয়ে দিল্লিতে কুতবুদ্দিন আইবকের আশ্রয়ে চলে যান। কুতবুদ্দিনের ঘজ্‌নি অভিযানে আলি অন্যতম প্রধান সহায়ক ছিলেন, ঘজ্‌নিতে তিনি বন্দি হন। ১২১০ খৃস্টাব্দে ঘজ্‌নি থেকে লাহোরে ফিরে এলে কুতব তাঁকে গৌড়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এই বছরেই কুতবের মৃত্যু হওয়ায় আলাউদ্দিন নাম নিয়ে তিনি গৌড়ের স্বাধীন সুলতান হন। ১২১৩ খৃস্টাব্দে হুসামুদ্দিন সুলতান আলাউদ্দিনকে হত্যা করেন। দ্র. *H-B*-II, pp. 10-20.

৪৩. এই বইয়ের পৃ. ১০৫ সূত্র ১ দ্র.

৪৪. এই বইয়ের পৃ. ১০৭ সূত্র ৬ দ্র.

৪৫. *Vernacular Literature of Bengal Before The Introduction of English Education* (১৮৯১ খৃ.) পুস্তিকায় শাস্ত্রীমশায় লিখেছিলেন, "The age of Krittivasa is not known but he is said to have flourished one hundred years after the death of Chaitanya." (হ-র-সং-২, পৃ. ৮২৪)। সুকুমার সেন বলেছেন, "দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ সকলে কৃত্তিবাসকে পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়াকার কবি বলিয়া নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমি টানিয়া টুনিয়া তাঁহাকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষপাদের আগে তুলিতে পারি নাই। আমার এই প্রচেষ্টাও দ্বিধাগ্রস্ত। আমার দৃঢ় ধারণা কৃত্তিবাসের জীবৎকাল সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের আগে নয়। কম্বুলেটোলা লিটরেরি ক্লাবের অভিভাষণে আমার ধারণার সমর্থন পাইলাম।" ('স্মারকগ্রন্থ', পৃ. ২৩৯)। কৃত্তিবাসের কাল সম্পর্কে শাস্ত্রীমশায় এই মত পরে পরিবর্তন করেন। *Notices of Sanskrit Mss.*, Vol. XI-র (১৮৯৫ খৃ.) ভূমিকায় তিনি কৃত্তিবাসকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের মানুষ বলেছেন। বিদ্যাপতির জীবৎকালের আনুমানিক শেষ সীমা ১৪৬০ খৃস্টাব্দ। চণ্ডীদাসকেও অত প্রাচীন কবি ধরায় অসুবিধা আছে। দ্র. হ-র-সং-২।

৪৬. এশিয়াটিক সোসাইটি সংগ্রহের ৬৩২০ সংখ্যক পুথি 'তারারহস্যবৃত্তিকা' গৌড়ীয় শংকরাচার্যের রচনা। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি সংগ্রহের আর

একটি পুথিতে (10., IV. 2603) নাম আছে শংকর আগমাচার্য। এ'র বাবার নাম কমলাকর, ঠাকুর্দা লম্বোদর। ইনি গৌড়ভূমিনিবাসী অর্থাৎ বাংলা দেশের অধিবাসী ছিলেন। শংকরের সময়ে গৌড়ই বাংলার রাজধানী ছিল, সম্ভবত এই জন্য তিনি নিজেকে গৌড়ভূমিনিবাসী বলেছেন। নেপাল দরবার লাইব্রেরির একটি পুথিতে লিপিকাল আছে ৫১১ লক্ষ্মণ সংবৎ (১৬৩০ খৃ.)। গৌড়ের পতন সম্পূর্ণ হয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে। তাই শংকর এই সময়ের কিছু আগে বর্তমান ছিলেন মনে করা হয়। ১৫টি পটল বা অধ্যায়ে সম্পূর্ণ 'তারারহস্য-বৃত্তিকা'য় তারা পূজা সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য বিবৃত হয়েছে। 'শিবার্চ্চনমহা-রত্ন', 'ষট্‌চক্রভেদ-টিপ্পনী' নামে দুটি বই শংকরের রচনা মনে করা হয়। দ্র. *Shastri-Cat*. Vol. VIII, Part II, p. xli; চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, "বাংলার শঙ্করাচার্য্য", 'প্রবাসী', বৈশাখ ১৩৬০, পৃ. ৭-৯।

৪৭. "*Tārārahasya*, No. 148, by Bfahmānanda, the spiritual guide of Pūrṇānanda and the disciple of Tripurānanda deals with the worship of Tārā. She is repeatedly represented to be identical with, or, better to express the idea, she is never to be differentiated from Ekajaṭā Kālikā and Nīla Sarasvatī. There are five regions one above the other all called Śūnyas or void. Tārā's abode is in the fourth Śūnya and Kālikā's in the fifth Śūnya. On the forehead of Tārā is Akṣobhya. Virocana, Māmaka Pāṇḍara are Āvaraṇa devatās or divine guards. Mahāpratisarā is a goddess who is often mentioned in this work. The worship it enjoined should be conducted in strict accordance with the customs of Mahācīna or China Proper. Fasts, &c., are not congenial to the goddess Tārā. All prohibited meat might be used in the worship of this goddess. These facts confirm the idea that Tārā was a Buddhist Tāntrika diety grafted into the Hindu system. Brahmānanda was not, however, the first to graft, as he quotes a number of Hindu works on Tārā." (*Notices-Shastri*, Vol. I, part III, 1900, pp. xxix-xxx). ব্রহ্মানন্দগিরি খৃস্টীয় ষোড়শ

শতাব্দীর প্রথম বা মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন। 'তারারহস্য' ভিন্ন তাঁর আর-একটি বই 'শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী', শাক্ত আচার অনুষ্ঠানের বিবরণ।

"Pūrṇānanda was a great Tāntrika compiler of the sixteenth century. He was a Vārendra Brāhmaṇa born in the district of Rajshahi, left an orphan at a tender age. Brahmānanda, a great Tāntrika writer of his time, brought him up and initiated him in the mysteries of Tantra. The place where he obtained siddhi or success is still known as siddhi-nagara. Pūrṇananda became the guru or spiritual guide to a number of influential Brahmans in the North and East Bengal and his descendants are still to be found in many places, working as spiritual guides. Kāṭhihar in Maimensing appears to be the great stronghold of his descendants. *Tatta-Chintāmaṇi* his great work runs through several thousands of ślokas. The influence which he and his Guru still exercises over the Brahmans of Bengal is very great. He was devoted to the left-handed worship." পূর্বোক্ত-সূত্র pp. xxviii-xxix).

শাস্ত্রীমশায় পূর্ণানন্দের জন্মস্থান রাজশাহি জেলায় বলেছেন, পরবর্তী গবেষকেরা মনে করেন তিনি ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা মহকুমার কাটিহালি গ্রামে জন্মেছিলেন। পূর্ণানন্দের 'শ্রীতত্ত্বচিন্তামণি' ১৪৯৯ শকাব্দে, ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে লেখা। অন্য রচনা— 'শ্যামারহস্য', 'শাক্তক্রম', 'তত্ত্বানন্দ-তরঙ্গিণী' ও 'ষট্‌কর্মোল্লাস'। দ্র. চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, 'তন্ত্রকথা', বিশ্বভারতী ১৩৬২ ব., পৃ. ৩৭।

৪৮. রসিকলাল চট্টোপাধ্যায় 'বিবিধমূলতন্ত্র' ও 'বিবিধতন্ত্র সংগ্রহ' নামে বাংলা দেশে প্রচলিত অনেকগুলি তন্ত্র বাংলা লিপিতে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর 'অরুণোদয়' মাসিক পত্রিকাতেও অনেক তন্ত্রের বই প্রকাশ করেন।

৪৯. 'তন্ত্রসার' গ্রন্থের লেখক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মধ্যযুগের বাংলার অন্যতম অগ্রগণ্য পণ্ডিত। ইনি চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন মনে করা হয়। শৈব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য প্রভৃতি সব সম্প্রদায়ের তন্ত্র গ্রন্থের সার

সংকলন করে কৃষ্ণানন্দ 'তন্ত্রসার' গ্রন্থটিকে সকল-সম্প্রদায়ের ব্যবহারযোগ্য কোষ গ্রন্থের রূপ দিয়েছিলেন। বাংলা দেশে দীর্ঘকাল ধরে 'তন্ত্রসার' প্রামাণিক গ্রন্থ রূপে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। বাংলার বাইরেও এই গ্রন্থের প্রচার ছিল। এশিয়াটিক সোসাইটি সংগ্রহে দুখানি নেওয়ারি লিপিতে (6187-88) এবং তিনখানি নাগরি লিপিতে (6190-91, 6576) লেখা 'তন্ত্রসারে'র পুথি আছে। প্রচলিত মতে কৃষ্ণানন্দই বাংলা দেশে পূজিত কালীমূর্তি উদ্ভাবন এবং এই রূপে কালী পূজা প্রবর্তন করেছিলেন। দ্র. *Shastri-Cat.*, Vol. VIII, part II, p. xxvi ; সং-সা-বা-দা, পৃ. ৩১৮-২৫।

৫০. এশিয়াটিক সোসাইটি সংগ্রহে শ্রীগোপাল পঞ্চাননের রচনা 'তন্ত্রদীপিকা' পুথির (6230) একটি পুষ্পিকায় এ'র পরিচয়— আগমবাগীশপৌত্র, হরিনাথ ভট্টাচার্য্যাত্মজ। সোসাইটি সংগ্রহের ডেস্ক্রিপ্‌টিভ ক্যাটালগে 'আগমকল্পলতা' নামে কোনো গ্রন্থের উল্লেখ নেই। 'আগমকল্পবল্লী'র (6219) পুষ্পিকায় 'আগমকল্পলতা' নাম রয়েছে।

৫১. এই বইয়ের পৃ. ৪৯৭ সূত্র ৮ দ্র.

৫২. পাণ্ডুভূমি বিহারে রচিত 'সুবিশদ-সম্পুট' নামে 'হেবজ্রতন্ত্রে'র টীকার লেখক টঙ্কদাস বা ডঙ্কদাস। ইনি রাজা ধর্মপালের (৭৭০/৭৭৫-৮১০ খৃ.) সমসাময়িক। তেঙ্গুরের তালিকায় এ'র লেখা 'হেবজ্রতন্ত্র-রাজটীকা সুবিশদসম্পুট' গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

৫৩. উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ গোবিন্দ-মাধব-বাসুদেব ঘোষেরা আট ভাই ছিলেন, এ'রা তিন জন চিরকুমার এবং চৈতন্যের নবদ্বীপ লীলার সঙ্গী। পূর্ব নিবাস কুমারহট্টে, পরে নবদ্বীপে উঠে আসেন। চৈতন্যের সঙ্গে পুরীতে থেকে যাবেন ইচ্ছা থাকলেও তাঁর আদেশে নিত্যানন্দের সঙ্গে মাধব এবং বাসুদেব বাংলা দেশে ফিরে যান। তিন ভাই-ই পদ রচনায় নিপুণ ছিলেন। হরিদাস দাসের হিসাবে ('শ্রীশ্রী গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান') মাধবের পদ সংখ্যা ১২। কাটোয়ার কাছে দাঁইহাটে তাঁর শ্রীপাট। বাসুদেব গৌড়চন্দ্রিকা পদের অন্যতম প্রধান পদকর্তা, রচিত পদের সংখ্যা ৮০। শেষ জীবনে তমলুকে বাস করতেন, সেখানে এ'র শ্রীপাট আছে।

৫৪. সুবুদ্ধি রায় গৌড়ে "অধিকারী" ছিলেন, তখন হুসেন খাঁ সৈয়দ তাঁর কর্মচারী। হুসেনকে কাজে ত্রুটির জন্য সুবুদ্ধি চাবুক মারেন। গৌড়ের

অধীশ্বর হবার পরে হুসেন শাহ্ স্ত্রীর প্ররোচনায় সুবুদ্ধি রায়ের মুখে কারোয়ার— নারকেলের লোটার জল দিয়ে তাঁর জাতিনাশ করলেন। কাশীর পণ্ডিতরা বিধান দিলেন, গরম ঘি খেয়ে মৃত্যু বরণে এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত। বৃন্দাবনে যাবার পথে চৈতন্য কাশী এলে সুবুদ্ধি রায় তাঁর উপদেশ চাইলেন। চৈতন্য তাঁকে বৃন্দাবনে গিয়ে কৃষ্ণনাম করতে উপদেশ দিলেন। মথুরা ও বৃন্দাবনে সুবুদ্ধি অতি দীনভাবে জীবন যাপন করে সঞ্চিত অর্থে বৈষ্ণবসেবা করতেন।

৫৫. এই বইয়ের পৃ. ৪০০ সূত্র ৮ দ্র.

ভারতের ভক্তি সাধনায় বৌদ্ধ প্রভাব।

মানুষ ইচ্ছা করুক আর না-ই করুক, ত্রিবর্গ তাহাদের সাধন করিতেই হয়। এই ত্রিবর্গের নাম ধর্ম, অর্থ ও কাম অথবা দরকার দেখিয়া যদি বলিতে হয় অর্থ কাম ও ধর্ম— অর্থ সকলের চেয়ে দরকারি, কেন-না, নহিলে শরীর ধারণ হয় না, আর শরীর নহিলে কোনো কাজই হয় না। তাহার পর কাম নহিলে বংশরক্ষা হয় না, জাতিরক্ষা হয় না। তাহার পর ধর্ম যাহাতে ধরিয়া রাখে বাঁধিয়া রাখে অর্থাৎ সমাজ বাঁধিয়া রাখে, বংশের ধারা ধরিয়া রাখে।

এই ত্রিবর্গ সাধনের প্রধান বই 'বৃহস্পতিসূত্র'।[১] তিনি বলেন তোমরা যদি অর্থ সঞ্চয়ে মনোযোগ করিতে চাও লোকায়তিকই

তোমাদের একমাত্র শাস্ত্র। যদি কামসাধন করিতে চাও কাপালিকই তোমাদের একমাত্র শাস্ত্র, আর যদি ধর্ম উপার্জন করিতে চাও তাহা হইলে আর্হতই তোমাদের একমাত্র শাস্ত্র। তিনি এই ত্রিবর্গ সাধনের উপায় বলিয়া দিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাকে নাস্তিক পাষণ্ড প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করিয়া গাল দিয়া থাকি। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ত্রিবর্গ সাধন করিলেও সে আস্তিক হইবে না। আস্তিক হইতে গেলে আর-একটি জিনিস চাই, সেটি পরলোকবিশ্বাস। চলিত কথায় ঈশ্বর না মানিলেই নাস্তিক হয়, মানিলেই আস্তিক হয়; কিন্তু কথাটা তা নয়, ঈশ্বর মানো আর না-ই মানো পরলোক মানিলেই আস্তিক, নহিলে নাস্তিক। সাংখ্যেরা নিরীশ্বরবাদী হইয়াও আস্তিক।

আস্তিক হইতে গেলেই, পরলোক মানিতে গেলেই, পরলোক যাহাতে ভালো হয় তাহার জন্য একটা সাধনা করিতে হয়। সে সাধনাও ত্রিবর্গ সাধনার মধ্যে পড়ে কি-না। অনেকে মনে করেন, ধর্ম সাধনার মধ্যে সেটাও পড়ে। দেবলোক, স্বর্গলোক, পিতৃলোক, ব্রহ্মলোক, বিষ্ণুলোক পাইতে গেলে ধর্ম সাধনাই প্রধান অবলম্বন। সুতরাং অনেকে ত্রিবর্গ সাধনাই মনুষ্যের পক্ষে পর্যাপ্ত বলিয়া বিবেচনা করেন। অনেকে মনে করেন ত্রিবর্গ সাধনা ছাড়া আরো একটা সাধনা আছে, উহা শুদ্ধ পরলোকের জন্য, উহার নাম মোক্ষ সাধনা। এইরূপে ত্রিবর্গ হইতে আমরা চতুর্বর্গে উঠিতে পারি। কিন্তু মোক্ষ সাধনা একেবারে তো অতীন্দ্রিয় সাধনা। পরকালের সকল কথাই অতীন্দ্রিয়, সুতরাং অতীন্দ্রিয় লইয়া জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হয়। স্বর্গবাসই কি পরলোক সাধনার চরম? পিতৃলোক বাসই কি পরলোক সাধনার চরম? আবার তো ফিরিয়া আসিতে হইবে? আবার তো সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে হইবে। তাহা হইলে উহা চরম হইতে পারে না। ঐ-সকল উচ্চলোক প্রাপ্তি তো ক্ষণস্থায়ী, যেমন পাপ বা পুণ্য করিবে তেমনই তাহার ফলভোগ করিবে— পরলোকে তা সুখই ভোগ করো আর দুঃখই ভোগ করো। সেইজন্য প্রথম হইতে লোকে জন্ম-জরা-মরণ— এ ত্রিতাপের হাত হইতে আত্যন্তিক এবং একান্তিক মুক্তি লাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। তখন হইতেই মোক্ষ সাধনা জমিয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহারা মনে করিলেন জন্ম, জরা ও মরণের

হাত এড়াইতে পারিলেই যথেষ্ট হইল। নির্বাণলাভের পর কী থাকিবে একথা জিজ্ঞাসা করিলে বুদ্ধদেব বলিতেন, সে কথায় তোমার কাজ কী? তোমায় আর জন্মাইতে হইবে না, বৃদ্ধ হইতে হইতে মরিতে হইবে না, এই হইলেই তোমার যথেষ্ট হইল, তুমি ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকো। সাংখ্যেরা বলিতেন, তুমি প্রকৃতির নাচ দেখিলে, তুমি প্রকৃতি হইতে পৃথক একথা বুঝিলে, তোমার বিবেকখ্যাতি হইলেই যথেষ্ট, আর সাধনার প্রয়োজন কী? কিন্তু কোনো বিষয়ে চিন্তাস্রোত একবার বহিতে থাকিলে তাহাকে রোধ করা অসম্ভব। উহাতে "যথেষ্ট" শব্দের প্রয়োগ আর চলে না। শুদ্ধ জন্ম-জরা-মরণ রোধ করিয়া লোক ক্ষান্ত থাকিল না। ক্রমেই উচ্চ হইতে উচ্চে উঠিতে লাগিল।

নির্বাণ তো শান্ত হইয়া যাওয়া। প্রদীপ নিবিলে যেমন ঠাণ্ডা হইয়া যায় তেমনি ঠাণ্ডা হইয়া যাওয়া। দীপো যথা।

সাংখ্যদের কৈবল্য তো কেবল হইয়া যাওয়া। আমি আছি, আমি জন্ম-জরা-মরণের হাত এড়াইয়াছি। কিন্তু আমার সঙ্গে জগতের কাহারো সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নাই।

পরকালের এইরূপ ধারণায় লোক বেশিদিন তৃপ্ত থাকিতে পারে না, সুতরাং পণ্ডিতেরা ইহার পর কী হইবে তাহার সন্ধান আরম্ভ করিতে লাগিলেন। বুদ্ধ ও কপিল যেখানে দাঁড়ি টানিয়া দিয়াছেন তাহা উঠাইয়া দিয়া তাহার বাহিরেও যাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শৈবেরা স্থির-গণ-পদ-প্রাপ্তি ও শুদ্ধ-গণ-পদ-প্রাপ্তি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবেরা সামীপ্য সারূপ্য সালোক্য ও সাযুজ্য চাহিতে লাগিলেন, জৈনেরা কেবলী[২] শ্রুতকেবলী হইতে চাহিলেন। আস্তিকেরা পরব্রহ্মে লীন হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধেরা নির্বাণ হইতে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি, তাহা হইতেও ধর্মকায় ও সম্ভোগকায় ও নির্মাণকায় আকাঙ্ক্ষা করিয়া ধর্মকায়ই প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।[৩] সকলেরই চেষ্টা হইল আর ফিরিতে না হয়, কিন্তু ফিরিলাম না তো সেখানে কী ভাবে থাকিব তাহাই লইয়া সকলেই মাথা ঘামাইতে লাগিলেন।

দেখিতে পাওয়া যায়, যখনই যখনই মুক্তির লক্ষণ চরমে উঠে তখনই তখনই ভক্তি আসিয়া উপস্থিত হন এবং মুক্তির তেজ কমাইয়া দেন।

এ সম্বন্ধে ‘মহাভারত’ ও ‘শ্রীমদ্ভাগবত’ হইতে একটি উদাহরণ দিব। উদাহরণটির রস বড়োই করুণ। এত করুণরস মহাকাব্যেও দুর্লভ। উদাহরণটি এই—

কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন ব্যাস সংসারী ছিলেন। তাঁহার পুত্র শুকদেব কিন্তু সন্ন্যাসী এবং মুক্তিকামী। গর্ভাবস্থা হইতেই তিনি একরূপ মুক্ত পুরুষ। প্রবৃত্তি তাঁহার কিছুতেই ছিল না। একটু বয়স হইলেই শুকদেব মুক্তি-লাভের জন্য সূর্যের দিকে যাত্রা করিলেন। আপনারা সকলেই জানেন, মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণ্যধর্ম-অবলম্বীদিগের আত্মা দুই পথে যাত্রা করেন, এক পিতৃযান ও আর-এক দেবযান। পিতৃযানে যাইতে হইলে চন্দ্রের মধ্য দিয়া যাইতে হয়, দেবযানে যাইতে হইলে সূর্যের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। চন্দ্রলোকে যাইলে পুনরাবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী। সূর্যলোক দিয়া গেলে পুনরাবৃত্তি নাই। শুকদেব মুক্তিকাম, সুতরাং তিনি সূর্যমণ্ডলাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। ব্যাসদেব পুত্রবিরহে কাতর হইয়া হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া ‘করুণ ক্রন্দনে দিগন্ত ভরাইয়া দিয়া চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, “বাবা, যেও না, যেও না, ফিরে এসো, ফিরে এসো।” শুকদেবও উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, “আর না, আর না।” দেবাসুর, যক্ষ, রক্ষ, নাগ, কিন্নর স্তব্ধ হইয়া দেখিতে লাগিল, শুকদেব নক্ষত্রবেগে সূর্যমণ্ডলে পতিত হইলেন— আর তাঁহার কিছুই দেখা গেল না। ‘মহাভারতে’ এই পর্যন্তই শেষ। শুকদেব মনুষ্য-জীবনের চরম সীমা মুক্তিলাভ করিলেন। সকলেই ব্যাসদেবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া রহিল।

‘ভাগবতে’র প্রথম স্কন্ধে এই গল্পটি ঠিক আছে, কিন্তু ইহার পরে আরো অনেক কথা আছে—

শুকদেব সূর্যমণ্ডল ভেদ করিয়া, লোকের পর লোক উঠিয়া, তথায় তিনি বিষ্ণুর সামীপ্য, সালোক্য, সারূপ্য প্রাপ্ত হইলেন, অর্থাৎ তিনি বিষ্ণুলোকেই থাকিতেন ও তিনি বিষ্ণুর ন্যায় চতুর্ভুজ আকৃতি ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি বিষ্ণুর সবই পাইয়াছিলেন, কেবল আধিপত্য পান নাই। একদিন ভগবান্ শ্বেতদ্বীপে গিয়া উপস্থিত, সঙ্গে শুকদেব আছেন। সেখানকার সব অধিবাসী ঐকান্তিক অর্থাৎ সব ছাড়িয়া আপনাদের মন-প্রাণ সমস্তই বিষ্ণুকে অর্পণ করিয়া বসিয়া আছেন।

আর-কিছুরই ভাবনা নাই, আর-কিছুরই চিন্তা নাই। ইহাদিগকে দেখিয়া ভগবান্ শুকদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শুকদেব, তুমি এখানে কী করিতেছ ? তুমি তোমার বাবার কাছে ফিরিয়া যাও, সেখানে ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া পুরাণ লেখো, যাহাতে ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তির প্রচার হয়।" শুকদেব আবার দ্বিভুজ কৌপীনধারী মূর্তি ধারণ করিয়া বদরিকাশ্রমে পিতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পিতাও বহুকাল পরে হারানিধি ফিরিয়া পাইয়া স্নেহভরে তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন এবং ভগবানের আদেশ মতো তাঁহাকে 'শ্রীমদ্ভাগবত' রচনায় সাহায্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রথম ও প্রধান ভক্তিশাস্ত্রের আবির্ভাব হইল।

যখন শাক্যসিংহ ও মহাবীর জ্ঞানপ্রধান বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম প্রচার করিতেছিলেন, সেই সময়েই ভক্তিমূলক বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মের উৎপত্তি। আবার যখন বৌদ্ধগণ শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ ও মহাসুখবাদ লইয়া এবং শংকরাচার্য প্রভৃতি বেদান্তবাদীগণ সচ্চিদানন্দঘন মত লইয়া আন্দোলন করিতেছিলেন, তখনই দ্রাবিড় দেশে বিষ্ণুস্বামী[৪] আবির্ভূত হইয়া ভক্তি-মার্গ প্রচলন করিলেন। ইনিই সব প্রথম বলিয়া দিলেন, "মায়াবাদ-মসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব তৎ।" বিষ্ণুস্বামীর মত প্রায় ২০০ বৎসর খুব চলিয়াছিল। তারপর, রামানুজ[৫], মধ্বাচার্য[৬], নিম্বাদিত্য[৭] প্রবল হইয়া উঠিয়া তাঁহার মতকে চাপা দিলেন। সকলেই ভক্তিমার্গের উপাসক, কিন্তু ভক্তির সহিত দর্শনের অদ্বৈত মত চলিতে পারে না। তাই ভক্তিশাস্ত্র ক্রমে দ্বৈতভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মধ্বাচার্য ও নিম্বাদিত্য দুই জনেই পুরা মাত্রায় দ্বৈতবাদী ছিলেন। ইঁহাদের মত এখনো চলিতেছে, এবং কোটি কোটি লোক ইঁহাদের উপদেশ অনুসারে চরিত্র গঠন করিতেছে, সংসার-যাত্রা নির্বাহ করিতেছে ও হৃদয়ের সান্ত্বনা লাভ করিতেছে। তাহারা প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগ করিয়াই বলে—

> "লোকেশ চৈতন্যময়াদিদেব
> শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
> প্রাতঃ সমুত্থায় ভবৎ-প্রাসাদাৎ
> সংসারযাত্রামতিবর্ত্তয়িষ্যে ॥"[৮]

বিষ্ণুস্বামীর মত দ্রাবিড়ে লোপ হইলেও, ৩০০ বৎসর পরে গোকুল

বৃন্দাবনে আবার জাগিয়া উঠিল। বিষ্ণুস্বামীর মতাবলম্বী লক্ষ্মণ আর্য নামক একজন লোক অন্ধ্র দেশ হইতে আসিয়া কাশীবাস করেন। তাঁহারই পুত্র বল্লভাচার্য[৯] গোকুল বৃন্দাবনে গিয়া বিষ্ণুস্বামীর মত পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। ইঁহারা বর্ণাশ্রমধর্ম পালন করেন, যাগ-যজ্ঞাদি করেন, অথচ বিষ্ণু সেবায়ই আত্মসমর্পণ করেন।

খৃস্টের পর ১২ শতকে ভক্তিটা দক্ষিণ দেশেই খুব প্রসার পাইয়াছিল, উত্তর-ভারতে ছিল না। সেই সময়ে একটা কথা উঠে—

"উৎপন্না দ্রাবিড়ে ভক্তিবৃ'দ্ধিং কর্ণাটকে গতা।
ক্বচিৎ ক্বচিন্ মহারাষ্ট্রে গুর্জরে প্রলয়ং গতা ॥"[১০]

কিন্তু ইহার পর হইতেই আর্যাবর্তে ভক্তির খুব প্রচলন হয়। গুজরাটেই প্রথম নরসিংহ[১১] ভক্তিধর্মের ধ্বজা তুলেন। তাহার পর যে কত বৈষ্ণব উত্তর-ভারতে ভক্তিধর্মের প্রচার করেন, তাহার সীমা নাই। বল্লভাচার্যের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। রামানন্দের[১২] মত এতদিন বড়ো জানা ছিল না, এখন তাঁহার মত লইয়া বেশ আন্দোলন চলিতেছে। আমাদের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ১৪৮৬ খৃস্টাব্দে আবির্ভূত হইয়া আসাম, বাংলা, উড়িষ্যা প্রভৃতি দেশ ভক্তির স্রোতে ডুবাইয়া দেন। সে স্রোতে—

"শান্তিপুর ডুবু ডুবু ন'দে ভেসে যায়।"

তাঁহার দল চারি শত বৎসর ধরিয়া ক্রমেই প্রবল হইতেছিল। এক-এক সময় মনে হয় যেন বাংলায় আর-সকল ধর্ম লোপ হইয়া চৈতন্য-প্রতিষ্ঠিত ধর্মই প্রতিষ্ঠিত হইবে।

কিন্তু ভক্তিধর্মের কথা বলিতে বলিতে অনেক কথাই বলিলাম। কিন্তু জ্ঞানপ্রধান ধর্মে ভক্তি কোথা হইতে আসিবে? তখন আমার মনে হইল, আমার বাল্যকালের বন্ধু, গুরু ও দেবতা ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়[১৩] মহাশয় বলিতেন, "বুদ্ধদেব হইতেই ভক্তির প্রাদুর্ভাব হয়, কারণ ভক্তি মানুষের উপরই হয়, দেবতাকে দেখিতে পাওয়া যায় না, তাঁহার উপর হয় না। বুদ্ধের ন্যায় লোকোত্তর মনুষ্যের উপরই প্রথম ভক্তি হয়, এবং সেইখান হইতেই ভক্তির আরম্ভ।" কথাটা সত্য কি মিথ্যা জানি না, কিন্তু কথাটা মনে লাগিয়াছিল।[১৪] মনে পড়িল, রামচন্দ্র কবিভারতী[১৫] নামক

একজন লোক গৌড় দেশে বারেন্দ্রভূমে বেরবতী নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া ১২২০ খৃস্টাব্দে সিংহলে যান। তথায় পরাক্রমবাহু নামক রাজা তাঁহাকে "বুদ্ধাগমচক্রবর্তী" উপাধি প্রদান করেন। তিনি 'বুদ্ধশতক' বা 'ভক্তিশতক' নামক একখানি পুথি রচনা করেন। পুথিখানি পড়িয়া তখন রাজকৃষ্ণবাবুর কথাটা কতক সত্য বলিয়া মনে হইয়াছিল। পুথিখানি খুঁজিয়া লইয়া পড়িলাম। উহা হইতে কয়েকটি ভক্তিরসের কবিতা আপনাদিগকে উপহার দিতেছি। ২৫ নং কবিতাটি এই—

"ত্বদ্ বৈরাগ্য-সমস্ত-ভূত-করুণা-প্রজ্ঞাদি-নানা-গুণ-
স্ফূর্য্যচ্চন্দন-পঙ্ক-সিন্ধু-পতিতো গন্তুং ক্ষমো নান্যতঃ।
ভূপা বা যদি দণ্ডয়ন্তি বিবুধা নিন্দন্তি বা বান্ধবা
মুঞ্চন্তি ক্ষণমপ্যহং জিনপিতঃ জীবামি ন ত্বাং বিনা॥"[১৬]

২৪ নং কবিতাটি এই—

"নাহং লাভার্চনার্থী ন চ ভয়চকিতো নাপি সংকীর্তিকামো
ন ত্বং ঘর্মাংশুপ্রভব ইতি মুনে নাপি বিদ্যাশয়া তে।
পারম্পর্য্যান্ন চ ত্বাং শরণমুপগতঃ কিন্তু তে সার্বজন্যং
সম্যগ্ জ্ঞানং সমীক্ষ্য ত্বয়ি ভবজলধিং সন্তরীতুং প্রবৃত্তঃ॥"[১৭]

২২ নং—

"মূর্দ্ধন্ বুদ্ধং নম ত্বং, শ্রবণ শৃণু সদা ধর্ম্মমদ্বৈধবাদি-
প্রোক্তং, সর্বজ্ঞরূপং নয়ন নিরূপমং পশ্য জিহ্বাংঘ্রিপদ্মম্।
ঘ্রাণ ত্বং চ অর্কবন্ধোঃ, স্তুহি সখি রসনে, শ্রীঘনং পূজয়েথাঃ
সিদ্ধং পাণে ব্রজাংঘ্রে জিনসদনম্, অদঃ সদ্‌গুণং
চিত্ত চিন্ত্য॥"[১৮]

১৩ নং—

"পুনরপি শরণং ব্রজামি বুদ্ধং পুনরপি লোকগুরুং
গুরুং করোমি।
পুনরপি কথয়ামি নৌমি বন্দে ত্বয়ি মম গোতম নৈব
তৃপ্তিমাস্তে॥"[১৯]

২৭ নং—

"তবৈবাহং দাসো গুণপণগৃহীতোঽস্মি ভবতা
তবৈবাহং শিষ্যঃ স্ববচনবিনীতোঽস্মি ভবতা।
তবৈবাহং পুত্রঃ স্মৃতিকৃতিসুখস্তদ্‌গতিগতো
গুরো, বুদ্ধ, স্বামিন্‌, মম জনক মাং পাহি ভবতঃ ॥"[২০]

৩৩ নং—

"জগদুপকৃতেরেব বুদ্ধপূজা তদপকৃতে স্তব লোকনাথ পীড়া।
জিন জগদপকৃৎ কথং ন লজ্জে গদিতুমহং তব
পাদপদ্মভক্তঃ ॥"[২১]

৮৯ নং—

"স্নানে, কর্মণি, ভোজনে, বিতরণে, ঘ্রাণে, কথাকর্ণনে,
ধ্যান-স্পর্শন-দর্শনাদিষু তথা, সম্ভাষণদাবপি।
প্রাতঃ, সায়মথ, দিবা চ, নিশি চ, তৎপাদপদ্মে প্রভো,
চিত্তং মে রমতাং, মুনীন্দ্র, সততং, যূনাং যুবত্যাং ইব ॥"[২২]

১০৪ নং—

"অপি গগনমনন্তং সর্বসত্ত্বোপ্যনন্তঃ
সকলমিদম্‌ অনন্তং চক্রবালং বিশালম্‌।
বদসি জিন বিদিত্বানন্তয়া জ্ঞানগত্যা
তব চ গুণমনন্তং বেৎসি বুদ্ধ ত্বমেব ॥"[২৩]

বৌদ্ধধর্মে ভক্তি আর-একদিক হইতে আসিয়াছে। গোড়ায় বৌদ্ধরা গুরু বলিয়া একটা পদার্থ স্বীকারই করিত না। আমরা যাহাকে গুরু বলি তাহারা তাহাকে "কল্যাণমিত্র" বলিত। সকলেই যেখানে সমান, সেখানে একজন আর-একজনের গুরু হইবে কী করিয়া? কিন্তু মহাযানে যখন দার্শনিক মত এত গভীর হইয়া দাঁড়াইল যে, সাধারণে তাহা বুঝিতে পারে না, তখন সেই মত যাহারা প্রচার করিত তাহাদের গুরু না বলিয়া পারা যাইত না। গুরুর তুলনায় শিষ্য আপনাকে যতই দীন বলিয়া মনে করিতে লাগিল— আপনার দৈন্য যতই তাহার নিকট প্রকট হইতে লাগিল, ততই সে গুরুকে আঁকড়াইয়া ধরিতে লাগিল। তনু, মন, গুরুকে অর্পণ করিতে লাগিল। ধন অর্পণ করা সোজা কথা, তনু অর্পণ

করা অনেক কঠিন, মন অর্পণ করা আরো কঠিন। কিন্তু শিষ্যেরা গুরুকে সবই অর্পণ করে। আগে বৌদ্ধধর্মে এক গুরু ছিলেন— তিনি স্বয়ং শাক্যসিংহ; কিন্তু পরে অনেক গুরু হইতে লাগিল। যাহার নিকট সান্ত্বনা পাইত তাহাকেই গুরু বলিত। লামা শব্দের অর্থ গুরু। সে গুরু যদি আবার সংসারী না হইয়া সন্ন্যাসী হন, তাঁহার উপর ভক্তি বাড়িবার ছাড়া কমিবার কথা নয়। এখন যে-সকল বৌদ্ধেরা দল বাঁধিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, প্রত্যেক দলে অনেকগুলি গুরু ও অনেকগুলি শিষ্য থাকে। তাহাদের মধ্যে একজন শিষ্যের সহিত ভাব করিয়া আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "গুরু তোমাদের কী উপদেশ দেন?" সে বলিল, "কিছুই উপদেশ দেন না। কাছে থাকিতে দেন এই যথেষ্ট। আমরা বহুদিন মন-প্রাণ দিয়া তাঁহার সেবা করিয়া তাঁহার মনের কথা বুঝিতে পারি। আমরা যেসব বিষয়ে উপদেশ চাই, সে-সকল উপদেশ কথায় দেওয়া যায় না। গুরুর কৃপা হইলে সে-সকল আপনিই মনে উদয় হয়।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমরা এরূপ গুরুর সেবা করিতে পারি না?" সে বলিল, "একেবারেই পারেন না। সেরূপ 'ধ্যান দেওয়া' আপনাদের পক্ষে অসম্ভব। এই যে ভক্তি ইহা সহজে লাভ করা যায় না।" শিষ্যের এইসব কথা শুনিয়া আমার কাহ্নপাদের চর্যা মনে পড়িল—

> "ভণ কইসেঁ সহজ বোলবা জায়
> কাঅ বাক্ চিঅ জসু ণ সমাঅ ॥
> আলে গুরু উএসই সীস।
> বাক্পথাতীত কাহিব কীস ॥
> জে তই বোলী তে তবি টাল
> গুরুবোধসে সীস কাল ॥
> ভণই কাহ্ন জিনরঅণ বি কসইসা।
> কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা ॥"[২৪]

কথাটা ঠিক। যাহা স্বসংবেদ্য তাহা কে কাহাকে বুঝাইবে? বুঝাইবার সময় গুরু বোবা, শিষ্য কালা। তথাপি যাঁহার কৃপায় সে জিনিসটি আমার স্বসংবেদ্য হয়, তাঁহাকে ভক্তি করিয়া আমি কুলাইয়া উঠিতে পারি কি?

শেষাশেষি অবস্থায় একবার ভক্তিশাস্ত্রে যিনি আমাদের গুরুর গুরু পরম গুরু, তাঁহার কথা কিছু আলোচনা না করিয়া ছাড়া যায় না। তিনি ভক্তিশাস্ত্র-প্রণেতা শাণ্ডিল্য ঋষি[২৫]। তাঁহার সঙ্গে আরো এক জনের নাম করিতে হয়— ইনি স্বপ্নেশ্বর— 'ভক্তিসূত্রে'র টীকাকার। স্বপ্নেশ্বরবাংলায় এক প্রসিদ্ধ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে শাণ্ডিল্য গোত্রে বাঁড়ুয্যে বংশে নরহরির নাম খুব প্রসিদ্ধ। তাঁহার উপাধি ছিল বিশারদ। তাঁহার পুত্র বাসুদেব সার্বভৌম[২৬] মিথিলা হইতে ন্যায়শাস্ত্র আনিয়া প্রথম বাংলায় প্রচার করেন; এবং শেষ বয়সে শ্রীক্ষেত্রে গিয়া বাস করেন এবং তথায় অতি বৃদ্ধ বয়সে চৈতন্যদেবের সহিত মিলিত হইয়া ভক্তিতে উন্মত্ত হইয়া 'চৈতন্যশতক' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার পুত্র জলেশ্বর উড়িষ্যাধিপতির বাহিনীপতি নিযুক্ত হন। জলেশ্বরের পুত্র স্বপ্নেশ্বর 'শাণ্ডিল্যসূত্রে'র টীকাকার।

শাণ্ডিল্য মুনি ভক্তির লক্ষণ করিয়াছেন— "সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।" স্বপ্নেশ্বর টীকায় বলিয়াছেন— "পরমেশ্বরবিষয়কান্তঃকরণবৃত্তিবিশেষ এব ভক্তিঃ।"

একজন উপকার করিলে তাঁহার প্রতি যে ভক্তি হয় সে ভক্তি ভক্তি নয়। যখন মনের মালিন্যাদি নিরস্ত হয় তখন ভগবানের প্রতি অনুরাগ মাত্রেই মুক্তি হয়, যথা গোপীদের হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চমাংশে আছে—

> "তচ্চিন্তা বিপুলাহ্লাদ ক্ষীণাপুণ্যচয়া সতী।
> তদপ্রাপ্তিমহাদুঃখ বিলীনাশেষপাতকাঃ ॥
> চিন্তয়ন্তী জগৎসূতিং পরব্রহ্মস্বরূপিণম্।
> নিরুচ্ছ্বাসতয়া মুক্তিং গতান্যা গোপকন্যকা ॥"[২৭]

পরানুরাগ হইতেই গোপীদিগের মুক্তি হইয়া গেল।

'শাণ্ডিল্যসূত্র' ও স্বপ্নেশ্বরের টীকায় ভক্তি সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। জ্ঞান ও ভক্তির প্রভেদ কী, সেটি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া আছে। যাঁহারা জীবব্রহ্মে ভেদ আছে মনে করেন, তাঁহারা পরমেশ্বরের মতো ঐশ্বর্যবিশিষ্ট পদার্থের উপর ভক্তি হয় বলিয়া স্বীকার করেন। যাঁহারা

জীব ও ব্রহ্মের কল্পনাকে মিথ্যা বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা শুদ্ধ চিদাত্মাকেই ভক্তির বিষয় বলিয়া মনে করেন, কিন্তু শাণ্ডিল্য মুনি উভয়কেই ভক্তির বিষয় বলিয়া মনে করেন। যেরূপেই হউক, এই ভক্তিসূত্রে ঈশ্বর ভিন্ন অন্যত্র পরাভক্তি হইতে পারে একথা স্বীকার করেন না। সুতরাং ইঁহার মতে বৌদ্ধেরা যখন ঈশ্বর মানে না, আত্মাও মানে না তখন বৌদ্ধধর্মের ভক্তি থাকা অসম্ভব। কিন্তু আমরা দেখিতে পাইতেছি, বৌদ্ধধর্মেও ভক্তির প্রভাব খুব হইয়াছিল এবং এখনো খুব আছে, তবে ভক্তির লক্ষণ দু জায়গায় স্বতন্ত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে অথবা 'শাণ্ডিল্যসূত্রে' ঈশ্বর শব্দে বুদ্ধকেও মিলাইয়া লইতে হইবে।

এ স্থলে আমরা আমাদের ভক্তকবি রামপ্রসাদ সেনের[২৮] একটি পদ উদ্ধার করিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিব। তিনি বলিয়াছেন—

"সকলের সার ভক্তি—মুক্তি তার দাসী।"

অনেক ভক্ত মুক্তি চানই না। তাঁহারা বলেন, আমরা শিবের গণ হইয়া থাকিব আমরা বিষ্ণুলোকে বিষ্ণু-সামীপ্য, বিষ্ণু-সালোক্য ও বিষ্ণু-সারূপ্য লইয়াই খুশি থাকিব, নির্বাণ মুক্তি আমাদের দরকার নাই। অনেক বৌদ্ধ ভক্তিই প্রার্থনা করেন— অনুপাধিশেষ নির্বাণও তাঁহারা চাহেন না। বুদ্ধভক্তি তাঁহাদিগকে জীবের মুক্তি দিতে শিখাইয়াছে। যতক্ষণ একটি প্রাণীও অমুক্ত থাকিবে ততক্ষণ তাঁহারা নির্বাণ চাহেন না। অতএব রামচন্দ্র কবিভারতী বলিয়াছেন—

"উপপতিমসতীব চিত্তবৃত্তিঃ
ব্রজতি ভবন্তমপাস্য পঞ্চকামম্।
অপিচ বিষয়িণো ন মোক্ষসিদ্ধিঃ
কিমু করবাণি মুনীন্দ্র দেহি দাস্যম্॥"৩৫॥[২৯]

"স ভবতি মতিমান্ স না কুলীনঃ
স চ গুণবান্ স চ কীর্ত্তিমান স সুরঃ।
স জগতি মহিতঃ সুখী স এব
ত্বয়ি জিন যস্য সুনিশ্চলাস্তি ভক্তিঃ॥"৫৭॥[৩০]

"অপি সকলমধীত অত্র তেন
শ্রুতমপি সর্ব্বমনুষ্ঠিত চ তেন।
অপিজ্জিতমজ্জিতেন তেন বিশ্বম্
ত্বয়ি জিন যস্য সুনিশ্চলাস্তি ভক্তি" ॥৫৮॥[৩১]

"সুগতপদপরাঙ্মুখস্য পুংসঃ
কিমু তপসা যশসা কিম্ কিমন্যৈঃ
সুগতপদ্যপরাঙ্মুখস্য পুংসঃ
কিমু তপসা যশসা কিম্ কিমন্যৈঃ।[৩২]

রামপ্রসাদ সেনের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া আবার বলি,

"সকলের সার ভক্তি মুক্তি তার দাসী।"

'শারদীয়া বসুমতী'
১৩৫৭ ॥

প্রাসঙ্গিক তথ্য

১৩৫৭ বঙ্গাব্দের শারদীয়া 'বসুমতী' পত্রিকায় এই প্রবন্ধের সঙ্গে সম্পাদকীয় মন্তব্য ছিল—

"বাঙলা দেশের অন্যতম বিখ্যাত পণ্ডিত চর্য্যাপদের আবিষ্কারক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইং ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে চব্বিশ পরগণা জেলার নৈহাটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কমললোচন [রামকমল] ন্যায়রত্ন (ভট্টাচার্য্য)। হরপ্রসাদ সংস্কৃত, ইংরেজী, পালি, জর্ম্মন, তিব্বতীয় প্রভৃতি বহু ভাষায় ছিলেন সুপণ্ডিত। পালি ভাষায় হরপ্রসাদের জ্ঞান ছিল অসামান্য। তিনি নেপাল প্রভৃতি স্থান থেকে বহু দুষ্প্রাপ্য পুঁথি সংগ্রহ করেন। ঐতিহাসিক গবেষণায় হরপ্রসাদের অসীম পাণ্ডিত্যের পরিচয়ে বাঙলা সাহিত্য পরিপুষ্ট হয়েছে। আমরা অনেক অজানা ইতিহাসের সন্ধান পেয়েছি।

"বৌদ্ধধর্ম্মের অনুশীলন ছিল হরপ্রসাদের গবেষণার প্রধানতম বিষয়বস্তু। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব সম্বন্ধে হরপ্রসাদের এই অসমাপ্ত রচনাটি এ যাবৎ ছিল অপ্রকাশিত। সম্প্রতি উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছে।"

১. ভারতীয় নাস্তিক দর্শনের প্রবর্তক বৃহস্পতি, নাস্তিকেরা বার্হস্পত্য নামে পরিচিত। 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে' মাধবাচার্য চার্বাককে বৃহস্পতি-মতের অনুগামী নাস্তিকশিরোমণি বলেছেন। 'মৈত্র্যুপনিষদে' (৭.৯) নাস্তিক মতবাদী বৃহস্পতির উল্লেখ আছে। প্রাচীন শাস্ত্রে একাধিক বৃহস্পতির নাম পাওয়া যায়। 'বৃহস্পতিসংহিতা' প্রণেতা ধর্মশাস্ত্রকার বৃহস্পতি; দেবতাদের পুরোহিত আর-এক বৃহস্পতি; 'মহাভারতে' অহিংসাধর্ম উপদেষ্টা বৃহস্পতি (১৩.১১২.১-৩) ও বঞ্চনাশাস্ত্রকার বৃহস্পতি (১৩.৩৯.৬, ৮-১০); 'ঋগ্বেদে'ও দু জন বৃহস্পতি আছেন, একজন আঙ্গিরস (১০.৭১) আর-একজন লৌক্য (১০.৭২)। এঁদের মধ্যে কে নাস্তিক দর্শনের প্রবক্তা— তা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। বৃহস্পতি রচিত কোনো নাস্তিক দর্শনের বই পাওয়া যায় নি। 'বৃহস্পতিসূত্র' নামে কোনো লুপ্ত সূত্রগ্রন্থ থেকে সদানন্দযতি 'অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি' গ্রন্থে, ভাস্করাচার্য তাঁর বেদান্তদর্শনের ভাষ্যে, শংকরাচার্য 'শারীরকভাষ্যে' এবং মাধবাচার্য

'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে' কয়েকটি করে সূত্র উদ্ধার করেছেন। দ্র. রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, "চার্ব্বাকদর্শন", 'বঙ্গদর্শন', শ্রাবণ ১২৮১ ; বিধুশেখর ভট্টাচার্য্য, "ভারতীয় নাস্তিকদর্শনের ইতিবৃত্ত", বিপিনবিহারী ঘোষ সম্পাদিত 'অনুসন্ধান' প্রথম খণ্ড, কলকাতা ১৩১৯ ; এই বইয়ের পৃ. ৫৩৪ সূত্র ৯।

২. জৈন মতে কর্মবন্ধন ক্ষয় হয়ে গেলে মোক্ষলাভের আগে কেবল জ্ঞানের উদয় হয়। সর্বজ্ঞতা-সর্বদর্শিতাকে কেবল জ্ঞান বলা হয়।

৩. হীনযানপন্থীরা বুদ্ধকে ঐতিহাসিক পুরুষ মানতেন। মহাযানপন্থীরা ঐতিহাসিক বুদ্ধে বিশ্বাসী নন। মহাযান মতে সত্যের দুই প্রকার ভেদ — পারমার্থিক ও ব্যবহারিক। বুদ্ধের দুই প্রকার ভেদ— ১. পারমার্থিক-বুদ্ধ বা ধর্মকায়-বুদ্ধ। ২. ব্যবহারিক জগতে বুদ্ধের দুই রূপ—নির্মাণকায় ও সম্ভোগকায়। লোকশিক্ষক বুদ্ধ নির্মাণকায় মাত্র। বোধিসত্ত্বদের কাছে যিনি গূঢ় তত্ত্ব প্রকাশ করেন তিনি সম্ভোগকায় বুদ্ধ। নির্মাণকায় ও সম্ভোগকায় বুদ্ধ বহু। কিন্তু ধর্মকায় এক, পারমার্থিক সত্যস্বরূপ বুদ্ধ অদ্বিতীয় ধর্মকায়ে অবস্থিত।

শাস্ত্রীমশায় লিখেছেন—

"...Dharmakāya...is the totality of the Universe to which nothing can be added and nothing can be subtracted, which is full of Prajñā, or 'all comprehending knowledge' and karuṇā 'all comprehending love or activity.' Then comes Sambhoga-kāya in which aspect the Dharma-kāya is said to enjoy the bliss of the Universe. This is a mysterious form which reveals itself only to the enlightened Bodhisattvas. This form is endowed with thirty-two Lakṣaṇas and eighty Anuvyañjanas. The third aspect is Nirmāṇa-kāya or 'the body of transformation.' Śākya-Siṃha is a Nirmāṇa-kāya emanating from the Universal Dharma-kāya." (*ADVAYAVAJRA-SAṀGRAHA*, G-O-S, No. XL, Introduction, p. xxii.)

৪. আনুষঙ্গিক পরোক্ষ প্রমাণ থেকে বিষ্ণুস্বামীকে দশম শতাব্দীর মানুষ মনে করা হয়। ইনি সম্ভবত কাবেরী নদীতীরে বাস করতেন, তাই তাঁকে

কোবর বা কাবের বিষ্ণুস্বামী নামে উল্লেখ করা হয়। বেলভালকর অবশ্য মনে করেন, কোবর বলতে গোবর অর্থাৎ গোস্বামী বোঝায়। 'সম্প্রদায়-প্রদীপ' (১৫৫৩ খৃ.) গ্রন্থে গদাধর বলেছেন, বিষ্ণুস্বামী দ্রাবিড়দেশের কোনো রাজার মন্ত্রীর ছেলে। জ্ঞানপূর্ণ রচিত বরদরাজের 'তার্কিকরক্ষা'র টীকার শেষ শ্লোকে উল্লেখ আছে বিষ্ণুস্বামীর বাবার নাম যজ্ঞেশ্বরহরি। প্রচলিত বিশ্বাস বিষ্ণুস্বামী 'উপনিষদ', 'ব্রহ্মসূত্র', 'গীতা' এবং 'ভাগবত' — এই চার প্রস্থানের ভাষ্য রচনা করেছিলেন। মেধাতিথির রচনায় বিষ্ণুস্বামীর প্রসঙ্গ থেকে বোঝা যায়, মীমাংসা দর্শন বিষয়েও তিনি আলোচনা করেছিলেন। বিষ্ণুস্বামী নৃসিংহ মূর্তির আরাধনা করতেন। ভক্তিধর্মের এই আদি প্রবর্তক দ্বৈতবাদী ছিলেন এবং তাঁর প্রবর্তিত মতবাদ আচার্য পরম্পরায় দীর্ঘ দিন প্রভাব বিস্তার করেছিল। দ্র. G. H. Bhatt, "Viṣṇusvāmī and Vallabhācārya", *Proceedings and Transactions of the Seventh All-India Oriental Conference*, (Baroda 1933), Baroda 1935.

৫. এই বইয়ের পৃ. ৩০৩ সূত্র ৪ দ্র.

৬. এই বইয়ের পৃ. ৫৩৬ সূত্র ১৪ দ্র.

৭. স্বাভাবিক দ্বৈতাদ্বৈতবাদী নিম্বাদিত্য, নিয়মানন্দ, নিম্বার্ক রামানুজের কনিষ্ঠ সমসাময়িক, মৃত্যু হয় আনুমানিক ১১৬৫ খৃস্টাব্দে। ইনি তেলুগু ব্রাহ্মণ। সম্ভবত বেলারি জেলার নিম্ব বা নিম্বপুরের অধিবাসী ছিলেন। 'দশশ্লোকী'র টীকায় হরিব্যাসদেবের উল্লেখ অনুযায়ী নিম্বার্কের বাবার নাম জগন্নাথ, মা সরস্বতী। রচিত গ্রন্থ 'বেদান্তপারিজাতসৌরভ', 'দশ-শ্লোকী', 'কৃষ্ণস্তবরাজ', 'গুরুপরম্পরা', 'মধ্বমুখমর্দ্দন', 'বেদান্ততত্ত্ববোধ', 'বেদান্তসিদ্ধান্তপ্রদীপ', 'স্বধর্ম্মাধ্ববোধ', 'শ্রীকৃষ্ণস্তব'। বেদান্ত-দর্শনে ব্রহ্ম ও বিশ্বসৃষ্টির সম্পর্ক ব্যাখ্যার মতান্তর থেকে বিভিন্ন মতবাদের উৎপত্তি হয়েছে। নিম্বার্ক বিরোধী মতবাদগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে বিশ্বসৃষ্টি ব্রহ্মেরই পরিণাম, তাই ব্রহ্ম থেকে অভিন্ন, কিন্তু বিশ্বসৃষ্টি ব্রহ্মের মতোই নিত্য ও সত্য। ব্রহ্ম ও বিশ্বসৃষ্টি অভিন্ন হয়েও ভিন্ন।

৮. অনুবাদ : হে লোকনাথ, হে চৈতন্যময়, হে দেবতার দেবতা, হে শ্রীকান্ত, হে বিষ্ণু, আপনার আজ্ঞাতেই প্রভাতে শয্যা ত্যাগ করে আপনার প্রীতি কামনায় সংসারের কাজে যোগ দেবো।

৯. শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লভাচার্যদের পরিবারের আদি নিবাস ছিল মাদ্রাজের ৮০.৪৫ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে কঙ্কববদ গ্রামে। এঁরা তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ ভরদ্বাজ গোত্রীয়। বল্লভের বাবা বারাণসীতে উঠে আসেন, বারাণসীর পথে রায়পুরের কাছে চম্পারণ্যয় ১৪৭৩ খৃস্টাব্দে বল্লভের জন্ম হয়। শিক্ষা বারাণসীতে। তিনবার সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করে তিনি বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। বিজয়নগর রাজসভায় বল্লভ আচার্য উপাধি পেয়েছিলেন। বল্লভের স্থায়ী বাস ছিল এলাহাবাদের ৩.২২ কিলোমিটার দূরে আদেল গ্রামে, রচিত গ্রন্থ ব্রহ্মসূত্রের 'অনুভাষ্য', ভাগবতের ভাষ্য 'সুবোধিনী', 'তত্ত্বার্থদীপ' নিবন্ধ। তাঁর সব রচনা পাওয়া যায় নি। বল্লভাচার্যের বংশে কোনো এক ধরনের বৈষ্ণব-মান্যতা প্রচলিত ছিল, গোপালকৃষ্ণের মূর্তি পূজিত হত। বল্লভের মতে ব্রহ্ম এবং কৃষ্ণ অভিন্ন; সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ নিত্য, অপরিণামী, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান্। বিপরীত গুণের আধার ব্রহ্ম বা কৃষ্ণ কখনো মায়ায় আচ্ছন্ন হন না। ব্রহ্ম ও বিশ্বসৃষ্টি দুই-ই শুদ্ধ। এই শুদ্ধ অদ্বৈতের সঙ্গে ভক্তির বিরোধ নেই। ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ এবং সৌন্দর্যভাবময় ভক্তি উপলব্ধি বল্লভের শিক্ষার মূল। তাঁর মতবাদের প্রভাবে সংস্কৃত, হিন্দি ও গুজরাটি সাহিত্যে এবং সংগীত ও শিল্পকলায় সৃষ্টির নতুন উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল।

বিষ্ণুস্বামীর সঙ্গে বল্লভাচার্যের আদৌ সম্পর্ক ছিল কিনা এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

১৫৩১ খৃস্টাব্দে বল্লভাচার্যের মৃত্যু হয়। দ্র. Govindlal Hargovind Bhatt, "The School of Vallabha", *C-II-I*, Vol. III.

১০. অনুবাদ: ভক্তি উৎপন্ন হয়েছিল দ্রাবিড়ে। বৃদ্ধি পেয়েছিল কর্ণাটকে। কিছু কিছু মহারাষ্ট্রে। গুজরাটে লুপ্ত হয়েছে।

১১. নরসিংহ মেহ্তা, নরসী— গুজরাটের প্রসিদ্ধ ভক্তকবি। জীবনকাল ১৪১৪-৮০ খৃস্টাব্দ। রাধাকৃষ্ণ প্রেম নিয়ে লেখা তাঁর গান 'সুরত-সংগ্রাম'-এ সংকলিত আছে। তাঁর ভজন আজও গুজরাটে সমাদৃত।

১২. মধ্যযুগের সাধক কবি রামানন্দের জন্ম এলাহাবাদের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে। রামানন্দ খৃস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর মানুষ। তাঁর আগেই উত্তর-ভারতে ভক্তিধর্ম আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল, তিনি এই

আন্দোলন জনজীবনে পরিব্যাপ্ত করেন এবং রবিদাস-কবীর-ধন্না-সেনা প্রভৃতি রামানন্দ শিষ্য মানবপন্থী ভক্তিধর্মের দীর্ঘ পরম্পরা অব্যাহত রাখেন। রামানন্দ প্রেম ও করুণাময় এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। সম্প্রদায় ও জাতিভেদ মানতেন না, মনে করতেন মানুষমাত্রেই এক পরিবারভুক্ত। রামানন্দের একটি মাত্র কবিতা 'গ্রন্থসাহেব'-এ সংকলিত আছে, আর-কোনো রচনা পাওয়া যায় নি।

১৩. "রাজকৃষ্ণবাবুর জীবনী", হ-র-সং-২ দ্র.

১৪. বৌদ্ধশাস্ত্রে "ভক্তি" শব্দটির প্রাচীনতম উল্লেখ আছে 'থেরগাথায়'— "সো ভত্তিমা নাম চ হোতি পণ্ডিতে…"। কিন্তু প্রাচীন থেরবাদী শাস্ত্রে "ভক্তি" বা "শ্রদ্ধা" শব্দ কোথাও কৃষ্ণ বাসুদেবের উপাসনার মতো বুদ্ধের উপাসনা বা বুদ্ধে সমর্পণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নি। কোনো কোনো পণ্ডিত ত্রিশরণ — বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘের শরণের তত্ত্বটিকে ভক্তিবাদ প্রভাবিত মনে করেন। আদি থেরবাদী শাস্ত্রে এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় না, কারণ, বুদ্ধকে সেই আদি পর্বে ত্রাতা মনে করা হত না। মহাপরিনির্বাণের সময়ে বুদ্ধদেব আনন্দকে অন্যের শরণ না নিয়ে আত্ম-শরণের উপদেশই দিয়েছিলেন। পরে, জনপ্রিয় এবং পরিব্যাপ্ত হবার পর্যায়ে ক্রমে বৌদ্ধধর্মে ভক্তিভাবনা প্রবেশ করে। উত্তর পর্বের থেরবাদী শাস্ত্রে ভক্তিভাব প্রশ্রয় পেয়েছে দেখা যায়। বুদ্ধঘোষ 'সুমঙ্গলবিলাসিনী' গ্রন্থে শরণাগমণের দুই তাৎপর্য নির্দেশ করেছেন, একটি লোকোত্তর— নির্বাণমুখী, অপরটি লৌকিক— বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘে আত্মসমর্পণ। ক্রমে বুদ্ধকে শাস্তা (শিক্ষক), মার্গকোবিদ (পথ নির্দেশক), মহাকারুণিক, লোকনাথ রূপে দেখানো শুরু হল। মহাযানে আরো পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল, বুদ্ধ হলেন লোকপিতা, চিকিৎসক, সর্বপ্রজানাথ। বুদ্ধের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব অবতার-কল্পনায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। গীতার কৃষ্ণের উক্তির (৪.৭-৮) মতোই 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীকে' বুদ্ধকে দিয়ে বলানো হয়— মানুষ যখন অবিশ্বাসী, অজ্ঞতায় আচ্ছন্ন, ভোগাসক্ত, দুঃখাভিমুখী হয় তখনই তিনি আবির্ভূত হন। মহাযানে বুদ্ধের চেয়ে বোধিসত্ত্বের ধারণা বড়ো হয়ে উঠল। অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী প্রভৃতি বোধিসত্ত্বের উপাসনায় মহাযান বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ অবাধ স্বীকৃতি পেল। খৃস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম লোকসমাজে ব্যাপক প্রতিষ্ঠা পায়। সম্ভবত এই সময়েই বাসুদেব-কৃষ্ণ এবং নারায়ণ-বিষ্ণুর সম্মিলনে ব্রাহ্মণ্য ধারায় প্রবল ভক্তিধর্মের অভ্যুদয় হয়েছিল। আদি বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদের বীজ থাকা সম্ভব নয়, ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের ভক্তিধর্মের প্রভাবেই পরবর্তী বৌদ্ধ-ধর্মে ভক্তিভাবনা প্রবেশ করেছিল। দ্র. Vishnupada Bhattacharya,

"The Evolution of Bhakti-Cult In Āryāvarta, The Revival of Bhakti-Cult In South India", *S. K. De Memorial Volume*, Calcutta 1972 ; S. K. Nanayakkara, "Bhakti", *E-B*, Vol. II.

১৫. ১০৭ স্তবকে সম্পূর্ণ গৌতম বুদ্ধের প্রশস্তিমূলক সংস্কৃত কাব্য 'ভক্তিশতক'-এর লেখক রামচন্দ্র কবিভারতী। এই বাঙালি ব্রাহ্মণ রাহুল বাচিস্‌সর সংঘরাজের কাছে পড়াশুনো করার উদ্দেশ্যে সিংহলে যান এবং রাহুল তাঁকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দেন। শাস্ত্রীমশায়ের দেওয়া তারিখ ঠিক নয়। রামচন্দ্র তাঁর কাব্য চতুর্থ পরাক্রমবাহুকে (রাজত্বকাল ১৪১২-৬৭ খৃ.) উৎসর্গ করেন। প্রীত রাজা কবিকে একটি সোনার পদক উপহার দেন এবং বুদ্ধাগম-চক্রবর্তী উপাধি দিয়ে অন্যতম মন্ত্রী করে নেন। দ্র. Shastri, "BHAKTI SATAK", *J-B-T-S* 1893, part 2, pp. 21-43.

১৬. অনুবাদ : তোমার বৈরাগ্য যা সমস্ত ঐশ্বর্য, করুণা ও প্রজ্ঞা প্রভৃতি দীপ্ত চন্দন অবলেপের সাগরে পড়ে গিয়ে অন্যত্র নড়তে অসমর্থ। রাজারা যদিও (আমাকে) দণ্ড দেন, পণ্ডিতেরা যদিও (আমাকে) নিন্দা করেন, আত্মীয়-স্বজন যদিও (আমাকে) পরিত্যাগ করেন, তবুও, হে জিন পিতা, তোমাকে ছাড়া আমি এক মুহূর্তও থাকতে পারি না।

১৭. অনুবাদ : আমি লাভ অথবা সংবর্ধনাকামী নই। ভয় পাওয়াও নই। সংকীর্তির প্রশংসাও চাই না। হে মুনি, তুমি সূর্য থেকে জাত বলে তোমার কাছে (আমি) বিদ্যালাভের আশাও করি না। অপরের দেখাদেখি— অর্থাৎ cue করে আমি তোমার আশ্রয়ে আসি নি। সংসার সমুদ্র পার হতে গিয়ে শুধু তোমার সর্বজনীন সম্যক জ্ঞান লক্ষ করে আমি তোমার শরণে (এসেছি)।

১৮. অনুবাদ : মস্তক, তুমি বুদ্ধকে প্রণাম করো। কর্ণ সর্বদা অ-দ্বৈতবাদীর কথিত ধর্ম শোনো। চক্ষু, নিরুপম সর্বজ্ঞের রূপ দেখো। নাসিকা তুমি সূর্যের বন্ধুর (বুদ্ধের) পাদপদ্মের গন্ধ আঘ্রাণ করো। সখী জিহ্বা, শ্রীঘনকে (বুদ্ধকে) স্তব করো, পূজা করো। ওগো হাত, সিদ্ধকে (বুদ্ধকে) পূজা করো। ওগো পা, জিনের (বুদ্ধের) মন্দিরের দিকে যাও। হে চিত্ত, সদ্‌গুণ চিন্তা করো।

১৯. অনুবাদ : আবার আমি শরণ নিই বুদ্ধের। আবার আমি লোকগুরুকে গুরু বরণ করি। আবার আমি বলি— প্রণাম করি, বন্দনা করি। হে গৌতম, তোমার বিষয়ে আমার তৃপ্তি নেই।

২০. অনুবাদ : আমি তোমারই দাস, (আপনার) গুণ-মূল্য দিয়ে তুমি কিনেছ। আমি তোমারই শিষ্য, নিজের উপদেশ দিয়ে আমাকে তালিম দিয়েছ। আমি তোমারই পুত্র, তোমার স্মরণ-সুখ পাই, তোমার পথ ধরেছি। গুরু, বুদ্ধ, স্বামী, পিতঃ, আমাকে উদ্ধার করো সংসার থেকে।

২১. অনুবাদ : জগতের উপকার সাধনই বুদ্ধকে পূজা করা। হে লোকনাথ, তার (জগতের) অপকার সাধনই তোমাকে ক্লেশ দেওয়া। হে জগতের উপকারী জিন, কেন আমার লজ্জা হয় না বলতে, আমি তোমার পাদপদ্মের ভক্ত।

২২. অনুবাদ : স্নানে, কাজকর্মে, ভোজনে, দানকার্যে, আঘ্রাণে, কথা শোনায়, ধ্যানে, স্পর্শ কার্যে, দেখা ইত্যাদি ব্যাপারে, সম্ভাষণ ইত্যাদি কাজে এবং সকাল, সন্ধ্যা ও দিন রাত্রিতে হে প্রভু, হে মুনিশ্রেষ্ঠ (আমার) মন যেন সর্বদা তোমার পাদপদ্মে মেতে থাকে, যেমন যুবকদের (মন) যুবতীদের প্রতি।

২৩. অনুবাদ : আকাশও অনন্ত, সকল জীবও অনন্ত, দিগন্ত চক্রবাল (পর্যন্ত) এই সবই অনন্ত। হে জিন, (তোমার) অনন্ত জ্ঞান দিয়ে জেনে (তুমিই) বর্ণনা করতে পারো। হে বুদ্ধ, তোমার অনন্ত গুণও তুমিই জানো।

২৪. অনুবাদ : বলো কিসে সহজ বলা যায়, যাতে কায়বাকচিত্ত প্রবেশ করে করে না। বৃথাই গুরু শিষ্যকে উপদেশ দেয়। বাক্যপথের অতীত (ভাব) কিসে বলা যায়? যতই বলে ততই ভুল করে। গুরু বোদা (পাঠান্তরে 'বোবা'), শিষ্য কালা। কাহ্ন বলে— জিনরত্ন কেমন? যেমন কালাকে দিয়ে বোবাকে বোঝানো।

২৫. J. R. Ballantyne ed., *BHAKTI-SŪTRA* (with the commentary of Svapneśvara), Bibliotheca Indica Series, 1861; *BHAKTI-SŪTRA*, Tr. E.B. Cowell, B-I-S, 1878.

২৬. এই বইয়ের পৃ. ৬০ সূত্র ২ দ্র.

২৭. অনুবাদ : তোমার স্মরণে বিপুল আনন্দে অপুণ্যরাশি ক্ষীণ হয়ে যাওয়ায়, তোমাকে না পাওয়ার মহাদুঃখে অশেষ পাতক সমূহ বিলীন হওয়ায়, জগতের সৃষ্টিকর্তা পরব্রহ্মস্বরূপ (তোমাকে) চিন্তা করতে করতে প্রাণত্যাগ হলে অপর গোপকন্যা মুক্তি পেল ।

২৮. রামপ্রসাদ সেনের জন্ম অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আনুমানিক ১৭২০ খৃস্টাব্দে, আধুনিক হালিশহরের অন্তর্গত কুমারহট্ট গ্রামে । বাবা রামরাম, মতান্তরে রামদুলাল । 'বিদ্যাসুন্দরকাব্য' সম্ভবত রামপ্রসাদের প্রথম রচনা । তাঁর আর-একটি বই 'কালী-কীর্তন' পাঁচালি গানের ধরনে লেখা । রামপ্রসাদের কবিখ্যাতি এবং সমাদর স্থায়ী হয়েছে ভক্তিভাবের গানগুলির জন্য । বাংলা গানে একটি বিশিষ্ট রীতি রামপ্রসাদের দান ।

কবির মৃত্যু হয় আনুমানিক ১৭৮১ খৃস্টাব্দে ।

২৯. অনুবাদ : উপপতিতে অসতীর মতো তোমায় ছেড়ে আমার চিত্তবৃত্তি যায় পাঁচ কামোপভোগের দিকে । বিষয় বাসনায় মোক্ষসিদ্ধি নেই । হে মুনিশ্রেষ্ঠ, কী করব আমি ? দাও (আমায় তোমার) দাসত্ব ।

৩০. অনুবাদ : সে হয় জগতে বুদ্ধিমান্, সে পুরুষ (হয়) কুলীন, সেই (হয়) গুণবান্, সেই কীর্তিমান্, সে (হয়) দেবতা— জগতে পূজিত, সেই (হয়) সুখী— হে জিন, যার সুদৃঢ় ভক্তি তোমার উপর ।

৩১. অনুবাদ : হে জিন তোমার প্রতি যার অচলা ভক্তি, এখানে (সংসারে) সবই তার অধীত, সবই শ্রুত, সবই অনুষ্ঠিত ; অবিজিত সে সকল বিশ্ব জয় করেছে ।

৩২. অনুবাদ : বুদ্ধের অনুগতি যে পুরুষ আকাঙ্ক্ষা করে না তার তপস্যায় কী, যশোলাভেই বা কী, অন্য-সকলেই বা কী । বুদ্ধের উপদেশ নেয় না যে পুরুষ তার তপস্যায় কী, নামডাকেই বা কী, আর-সকলেই বা কী ।

পরিশিষ্ট

Buddhism in Bengal Since the Muhammadan Conquest

Whatever might have been the fate of Buddhism in other parts of India, in the Provinces of Eastern India, it had to suffer serious persecution, nay, it may be said, that Buddhism was expelled from Eastern India by fire and sword. In making excavations at Kuśīnagara ashes were discovered after a certain depth, plainly indicating that fire was one of the agencies employed in the expulsion of Buddhism.[1] At Sārnāth in Benares, the excavations laid open cook-rooms containing half-boiled rice rotting there for centuries.[2] The catastrophe was so sudden that the poor Bhiksus could not even complete their meals. Sir A. Cunningham quotes two passages, one from Tibetan and another from Muhammadan sources, to shew that at the last Buddhist capital of Bihār, Bakhtiyār Khilji put a large number of shaven Brāhmaṇs, *i.e.*, Buddhist Bhikṣus assembled at a monastery, to the sword.[3]

All these facts plainly shew that fire and sword were employed in the destruction of Buddhism in Eastern India. But who employed them ? In the case of Ōdantapurī, the last capital of Bihār, it was certainly the Muhammadans,

1. Rep. Arch. Sur., Ind., Vol. xviii, pp. 62-63
2. The same, Vol. I, pp. 126-30
3. The same, Vol. xi, p. 185

and presumably in other cases also, they were the destroyers. The Hindu mode of persecuting Buddhists, was quite different. It was persecution and annoyance, and not desruction, Śaśāñka cut down the Bō tree.[4] Udayana held a disputation with the life of his Buddhist antagonist at stake.[5] Gaṇgēśōpādhyāya wrote his great work on Logic with the express object of प्रचण्ड पाषण्डतमस्तितीर्षया *i.e.*, for dispelling the darkness created by powerful heretics; and Udayana wrote a work entitled *Bauddha-dhikkāra*, or, 'Fie on the Buddhist!' Another Hindu revivalist prohibited the sounding of the bell at Buddhist Vihāras, till he was worsted in disputation.[6] This is the Hindu way of persecution. The Sēna rājās of Bengal used to grant lands to Brāhmaṇs bordering on Buddhist Vīhāras, thus setting up a perpetual source of annoyance to the inmates of the monastery.[7] Ridicule was one of the powerful weapons used by the Hindus in annoying the Buddhists, who were held up in dramas like the *Probōdha Cadrōdaya*, as great libertines, fond of wine and women. In later Tantras too, Buddha and his fallowers are regarded as men of pleasure. Their method of obtaining spiritual success, was by means of wine and women. In the Cīnācāra-tantra Tantra, Vaśiṣṭha is sent to China for obtaining success by means of the Tārā-mantra from Buddha, who lived surrounded by women in China. This is annoyance and teasing, but not destruction.

Assuming, therefore, that the Muhammadan conquest dealt a death blow to the expiring efforts of Buddhism in Eastern India, it may be asked, was the destruction of

4. The same, Vol. III, pp. 80 81
5. Gaurē Brāhmaṇ, pp. 102-05
6. *Travels in the Western World*, translated from Chinese by Beal, Vol. II
7. *Gaurē Brāhmaṇ*, p. 281, line xii.

Buddhism caused by Muhammadam conquest complete ? People think it to be so, but this is phisically impossible. The Muhammadan conquest itself was not a complete conquest, the Pāṭhāns held the country simply in military occupation. They held some of the big cities and left the rest of the country to govern itself the'best it could. It was not possible for them to destory Buddhism all over the country. Then again, it is difficult to say that the conquerors could distinguish between Hinduism and Buddhism. They were iconoclasts. They destroyed idols, no matter whether they were HIndu or Buddhist. In fact, the pressure of the conquest was felt by both Hindus and Buddhists alike. The Brāhmaṇs from Rāṛh and Varéndra flocked to Vikramapura,[8] the last stronghold of the Sēna rājās, and up to this date there are more Rāṛhī Brāhmaṇs at that remote corner of Bengal than in Rāṛha itself, especially the higher class *Kulīns*. To drive away Brāhmaṇs and to destroy a few families is one thing, but quite another thing is the wholesale massacre of Buddhist monks, assembled in central Vihāras during the *Vassō*. If one single monastery is destroyed with all its monks, a whole district, nay, even a larger area, will be without religious leaders and religious teachers altogether. A few cases of massacre like that at Ōdantapurī, would leave the entire Buddhist population of Bengal and Bihār without leaders. One would be disposed to account for the existence of a vast Muhmmadan population in the districts of Bengal, amounting to 25 millions of people, by the easy conversion of the Buddist population after the destruction of their monasteries.

The helpless Buddhists would naturally be inclined more to Muhmmadanism, which has no restriction of

---

8. See the article Kulīna in the *Viśva Koṣa*

food, &c., than to Hinduism, which imposes thousands of restrictions on every action of life.

But was Buddhism actually effaced from the soil of Bengal and Bihār ? People think so, but there were traces of Buddhism till very lately. A Kāyastha belonging to Magadha, copied a Buddhist Ms. in 1446. The Ms. is now at Cambridge.[9] That shews signs of lingering Buddhism. Dr. Hoey has discovered an inscription at Sēt, dated in the thirteenth century, dedicating a temple to the Buddha.[10] Buddhist monks were at Bōdh Gayā so late as 1331. The Bōdh Gayā temple was repaired by a King of Arakan in 1305. A biographer of Caitanya, named Cuḍāmaṇī Dāsa, makes Buddhists rejoice at the birth of Caitanya. One of the great millionaires of Sātgāõ in Caitanya's time, belonging to the Sōnārbānia caste, refuses to accept Vaiṣṇavism on the ground that he would not like to be saved, when the whole world round him is plunged in misery.[11] This is pure Buddhistic sentiment absolutely unknown to the Hindus. Śūlapāṇi, writing after the Muhmmadan conquest, makes the very sight of a Buddhist an occasion for performing expiatory ceremonies. The word of the text he quotes is *Nagna*, or naked, which he explains as Bauddhādayaḥ. How could he explain that word that way if there were no Buddhists in his country ?

These facts will lead to one conclusion that traces of Buddhism were to be found so late as Caitanya's time. In speaking of Buddhism I do not take into consideration the fact of the Buddha's being regarded as the ninth incarnation of Viṣnu, for in that case all Hindus would be in one

9. See *Catalogue of Buddhist Sanskrit Mss.* in the University Library, Cambridge, Preface, p. 4 and Book, pp. 69-70
10. See pp. 70-71 of *The Sharqī Architecture of Jaunpur*, Vol. I
11. *Rep. Arch. Surv.*, III, pp, 104-05

sense, Buddhists. No trace of Buddhism has been found after Caitanya's time.

It seems, however, surprising that a religion which existed in Eastern India in such splendour from 600 B.C. to 1200 A.D., should be so utterly destroyed that no vestige of its existence could be found any where in Bengal at this day only 700 years after its final overthrow. But fortunately it is not so. A sort of corrupt Buddhism mixed up with a variety of Aryan and non-Aryan forms of worship, still obtains in Bengal amongst a very large number of lower class people. Of the various castes inhabiting Bengal, Ḍōms never acknowledge the superiority of Brāhmaṇs. They get all the religious ceremonies of the caste, performed by paṇḍits of the Ḍōm tribe, and these Ḍōms are the constituted Purōhitas of Dharma, a deity whom I ventured to identify with Buddha-dēva. One of the names of Buddha is Dharma-rāja, and this is precisely the name by which the deity Dharma is spoken of by his worshippers. The ancient Bengali literature consists of works describing the way in which different deities manifested themselves in this world and the way their worship become prevalent. I have elsewhere given an account of the prevalence of the worship of Manasā, or Goddess of serpents. There are works also describing how the deity Dharma-rāja manifested himself, and how his worship became prevalent.

According to Ghana-rāma who wrote in 1710 his magnificent work the *Śrī-dharma-maṅgala*, on this subject, his work is based on two previous works, one by Rūpa-rāma and another by Maūra-bhaṭṭa. All these again are said to be based on the Hākanda-purāṇa. My enquiries have led to the fact that works of Rūpa-rāma and Maūra-bhaṭṭa are still extant, but I have not yet succeeded in getting copies of these works.

The story as given by Ghana-rāma, is this. The son of

the great King of Gauḍa, Dharmapāla, had appointed his brother-in-law Mahāmada, as his minister. Mahā-mada had another sister named Rañjā, for whom he had a dislike, but she was a special favourite of Dharma-rāja. Mahā-mada tries in various ways to destroy his sister's son, Lāu-Sēn, but Dharma always protects him. Lāu-sēn, is persecuted in various ways, but all these persecutions fail. Lāu-Sēn is then sent to lead arduous expeditions against distant countries, such as Kāma-rūpa and Orissa. In all of these Dharma makes him successful. Mahā-mada at laast comes to his senses and takes his nephew into favour. Kālu Ḍōm, Laū-sēn's favourite general, becomes the constituted Purōhita of Dharma and obtains the privilege of being allowed to drink wine and eat hog's flesh. Dharma is described as superior to Brahmā, Viṣṇu and Mahēśvara, and has having Hanumat as his great general. Ghana-rāma's work is a lengthy one, it repays perusal both as a work of poetic art and as embodying curious information about ancient Bengal.

The great Buddhist monarch Dharma-pāla, is very well known. He was the first great monarch of the Pāla dynasty, who were Buddhist. It is also known that he conquered Gauḍa and led expeditions to Kāma-rūpa, where also a branch of this dynasty ruled for a long time. It is probable that Buddhism mixed up with some aboriginal form of worship, gave rise to a new form of worship, namely, that of Dharma during the ascendency of the Pāla dynasty in Bengal, and that it being suited to the genius of the people, obtained a currency which still lasts. That Buddhism has a wonderful aptitude in assimilaling various forms of Demon and other worships, is well known from the history of Buddhism in Nēpāl and Tibet. The Dharma worship appears to be a similar assimilation of some old-world superstition with Buddhism.

My recent investigations into the mode of Dharma

worship, during the Durgā Pūjā holidays in the sub-division of Cuṭwa, has added another link to the arguments for proving the identification of Dharma-rāja with the Buddha. There is a Dharma temple at Śuōngāchi near Pāṭuli, the priest of which belongs to the Mayarā caste. He was questioned about the method of worship, and his answers let to important results. He said cooked food is never offered to Dharma ; this is precisely the case with Buddhist and Jaina idols. They are regarded as emancipated men and not deties. Any cooked food when eaten by men becomes impure, and so no cooked food is offered to them. Any caste may worship Dharma. The Ḍōms do worship him and often offer hog's flesh to him, but the Mantra by which Dharma is meditated upon, is very curious. It leaves no doubt that he is the Buddha.

यस्यान्तो नादिमध्यो न च करचरणं नास्ति कायन्निदानम्
नाकारं नादिरूपं नास्ति जन्मभ्न यस्य [च] (ह्य अस्य ?) ।
योगीन्द्रो ज्ञानगम्ये सकलजनहितं सर्वलोकैकनाथम्
तत्त्वं तं च निरञ्जनं मरवरद पातु वः शून्यभुर्त्तिः ।।

He who has no end, no beginning and no middle ; he who has neither hands nor legs, he who has no germ of body ; he who has no form, no primordial form ; he who has no birth ; that Yōgīndra, approachable by knowledge, friendly to all men, one protector of all creatures, the truth, the spotless, the giver of boons to mortal men ; whose form is Śūnya or void ; may he protect you !

The word Yōgīndra applies to the Buddha, as he is called Munīndra in the *Amarkōṣa*. He is approachable by knowledge, while Hindu deities are approachable by devotion.

Most of this adjectives may, though by some stretch of imagination, apply to Śiva or Viṣṇu. But there is

one which can never be applied to a Hindū deity and which is a peculiar attribute of the Buddha. This is *Śūnya-mūrti,* identifying him with void ; this is what the Prajña Paramitā teaches, and is what constitutes the peculiarity of Buddhist teaching that everything resolves itself into *Śūnya* or void. The Sanskrit of the Mantra as obtained from the Mayarā priest, is perfectly ungrammatical, and so I tried to get another version of it from a different part of the country, and if possible from a higher class man. This I succeeded in getting from a small village near the Rājbandh station in Bānkurā.

Though this version is nearer to grammatical Sanskrit, yet it contains one serious grammatical blunder, and though the form in which it is put, looks like the Dhyāna or Mantra for meditating on a Hindu deity by saying चिन्तयेन् शून्यमुर्त्तीं, I fail to understand how the mind can be fixed on a void without beginning and without end, without legs, without arms, without head, and so on. This is in fact an attempt to give to a high Buddhist spiritual conception, a Hindu personified form, and the attempt is a miserable failure. The Mantra too, appears to have been written by an ignorant man in some form of ancient Prākrit, which many have tried to put in a sanskritised form.

Many would not like to believe that this low worship, accompanied with the sacrifice of pigs, and with Dhyāna and other Hindu forms of worship, can have anything to do with Buddhism, whose first vow was to refrain from killing animals, and which in its earliest forms at least, did away with worship altogether. But that it is so, will appear from translations from the history of Buddhism, by Lama Tāranātha of Tibet, kindly made for me by Babu Śarat Chandra Dās, C.I.E. and appended to this article.

I beg to draw attention to one passage of this

translation. "He (the Ḍōmācārya) preached the Tāntrik doctrine of Buddhism, called Dharma, to the people of Tippera, and obtained numerous followers. Many among them became *Siddhas* too. He was then invited to the country of Rāḍha, called Rārā in the common language of the people. The Rājā of that country was a bigoted follower of Brahmaṇs, but seeing the supernatural powers of Ḍamācrya, and his goodness and learning, he became changed in his views, and henceforth the 'Dharma' Buddhism, in its Tāntrik phase became greatly honored and followed by the people of Bengal, Rāḍha and Tippāra. By the worship of Dharma, is meant, that of the Buddhist deities, such as Vajra-yōginī ; Vajra-vārāhī ; Vajra-bhairava (kṣētrạ-pāla) ; Vajra-dākinī ; the Nātha, and so on. In fact, in the latter days of Buddhism, the Dik-pālas, Dharma-pālas and other spirit protectors of Buddhism, became the object of worship to the exclusion of the Buddhas and Bōdhisattvas."

That Vajra-Yōginī, Vajra-bhairavas, and other Buddhist Tāntrik deities used to be worshipped in Bengal, there is no doubt. Many of them are still worshipped in a Hinduized form. But Kṣetra-pāla is still worshipped under his proper name in a non-brahmanic form by low caste priests. Kṣetrā-pāla is represented by some tree. The earth on which it grows has the miraculous power of removing barrenness, and producing male children in one who gives birth to daughters only. There is a Kṣētra-pāla tree at Khaḍ-daha, eight miles from Calcutta, and another at Śingi, in Burdwan.

From very ancient times Buddhist monks used to dispense medicines ; that was one of the sources of their influence, nay, of their income. The Dharma priests to this day do dispense medicine. They generally pretend to have received certain specifics for certain diseases from their deity, and if the patient with a devout

mind uses the medicine and pays the votive offering after cure, he is sure to get rid of the disease. The Śuōngāchi Dharma has a specific for diarrhœa. The Jāmālpur Dharma cures not only diseases but grants whatever is desired of him. The Acalēśvara Dharma has a specific for bilious eruptions, and so on.

Journal of the Asiatic Society of Bengal
1895

অনুক্রমণী

সংযোজন-সংশোধন

পৃষ্ঠা/পঙ্‌ক্তি	শুদ্ধ পাঠ
১৯/১	একালের কেহই
৬০/৫	পৃ. ৪৭
৬২/১২	surgeon
৬৩/২৩	lxxxiv
৬৪/৩২	Kātyāyana
১০৭/২২	সংবলিত
১১১/২৪	শাকটায়নঃ
১১৩/৪	Kāśika
১৩০/৩	মন্মনোমূর্তিকেয়ং
১৩১/২৩	নিষ্ফল
১৩৬/১৮	*Asiatica*
১৩৬/২৩	Interest
১৩৬/২৩	*Hitopadeśa* (1799)
১৩৬/২৪	*Gita Govinda* (1789)
১৯৮/১০	adhyāyas
১৯৮/৩৪	Guṇāḍhya
২২৮/৩	ক্ষিতীশপ্রসাদ
২২৮/৩১	পরিণত
২৯১/২৩	শকিয়া
২৯২/১২	বলিতেছেন
২৯৭/৩০	হইয়াছিলেন
৩১৯/২৭	either
৪২৩/১৬	যশোমতী
৪৩১/৩৩	বিষ্ণুরূপে পূজিত, কিন্তু
৪৩৬/২৪	এবং ১১ দ্র.
৪৮৩/৭	জায়গায়
৫২২/১৯	সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে ।[২৯]
৫৩৬/১১	analogy or
৫৮৬/১০	হুসেন শাহ্[১৭]